~ www.amarboi.com ~

হারুকি
মুরাকামি

সমুদ্রতটে কাফকা

অনুবাদ
অভিজিৎ মুখার্জি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হারুকি মুরাকামি-র জন্ম ১৯৪৯ সালে জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োতো শহরে; ছোটবেলাটা কেটেছে কোবে নামক বন্দর শহরে। পড়াশোনা করেছেন জাপানের ইয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম জীবনে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শুরু করেছিলেন একটি জ্যাজ গানের বার্। *নোরুউয়ে নো মোরি* (*Norwegian Wood*) উপন্যাস লেখার পর তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রগাঢ় অনুরাগী, পাশ্চাত্য সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক মুরাকামির মধ্যে জাপানি গদ্য সাহিত্যের ধারাবাহিকতা অটুট, তবে বহিরঙ্গে পশ্চিমের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ছাপটা অনেকটা বেশি। অজস্র সাহিত্য-পুরস্কারের মধ্যে আছে, ফ্রানৎজ কাফকা পুরস্কার, ইয়োমি-উরি পুরস্কার, জেরুসালেম পুরস্কার ইত্যাদি। টোকিওতে একটি স্থায়ী ঠিকানা থাকলেও মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সময় কাটান নিভৃতির সহজলভ্যতার কারণে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজিৎ মুখার্জি-র জন্ম ১৯৫৮, কলকাতায়; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ্ লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজেস্-এর প্রাক্তন জয়েন্ট ডিরেক্টর এবং বর্তমানে জাপানি ভাষা শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। পড়িয়েছেন জাপানের কানাজাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি, বহুবার জাপানি ভাষার শিক্ষকতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন জাপান ফাউন্ডেশনের। এর আগে লিখেছেন দুটি বই: সাম্প্রতিক ইংরেজি সাহিত্যে জন্মসূত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অবদান নিয়ে, *যে ভারতীয়রা ইংরিজিতে লিখছেন*, আর জাপানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে, *যেটুকু জাপান*। তাঁর প্রিয় জাপানি লেখকেরা হচ্ছেন কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি, হারুকি মুরাকামি, এবং কাজুও ইশিগুরো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রতটে কাফকা

১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রতটে কাফকা

হারুকি মুরাকামি

১

অনুবাদ

অভিজিৎ মুখার্জি

আমার বই

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা
২০১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

UMIBE NO KAFUKA

Copyright © Haruki Murakami, 2002

All rights reserved, including those of translations into other languages. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the written permission of the publisher.

Samudratate Kafka Volume 1
Translated from the Japanese
by Abhijit Mukherjee

হারুকি মুরাকামি, *সমুদ্রতটে কাফকা,* প্রথম খন্ড।

অনুবাদ স্বত্বঃ অভিজিৎ মুখার্জি, ২০১৬

Published with financial assistance from the Japan Foundation

জাপান ফাউন্ডেশনের
অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

ISBN 978-93-83660-25-4

প্রকাশক
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০৩২

মুদ্রক
হায়াম এন্টারপ্রাইসেস

প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র দীপ্তনীল রায়
পুস্তক অলঙ্করণ ঊর্মিরূপা পাল

মূল্য ৩০০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের নিবেদন

হারুকি মুরাকামির *উমিবে নো কাফুকা* উপন্যাসটি প্রথম জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল দুটি খন্ডে। বাংলা ভাষায় অনূদিত এই সংস্করণটিও দুই খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাদের যারা নানাভাবে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে মিসাকো ফুতসুকি, আতু পঙ্গেনের, রক্স্যান এদুয়ার এবং সোফি হ্যারিসকে ধন্যবাদ জানাই। জাপান ফাউন্ডেশনের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের কথা

টোকিওর এক নির্জন ও অভিজাত মহল্লায় একটা খুন হয়েছে। পুলিশ বলছে এক বিখ্যাত ভাস্কর খুন হয়েছেন, বোকাসোকা নাকাতা বলছে যে খুন হয়েছে জনি ওয়াকার, কাফকা তামুরা নিশ্চিত যে একজন খুন হয়েছে। এ কাহিনীর শেষে কি আমরা জানি, কে খুন হয়েছে, জানা কি সম্ভব সবার পক্ষে নির্দিষ্ট করে? খুনটার জন্য দায়িই বা কে? যে ছুরি বসিয়ে দিল বুকে সে, না কি যে মনে মনে আন্তরিক ভাবে চেয়েছিল যে লোকটা খুন হোক? কিন্তু সত্যান্বেষণের সংজ্ঞাই যে পালটে দিলেন মুরাকামি হারুকি, এই উপন্যাসে! সৃষ্টির গভীরতর রহস্যের গভীর দর্শনের রাস্তায় অবলীলায় হাঁটালেন থ্রিলার পড়ার উত্তেজনায় সম্মোহিত পাঠককে। হ্যাঁ, পৃথিবীর সব কোণের পাঠককে, সংস্কৃতির, জ্ঞানের, রুচির, পাঠাভ্যাসে পক্ষপাতের যাবতীয় ভিন্নতার ওপরে উঠে। সাহিত্যের মানচিত্রে একটা মাইলস্টোন জন্ম নিল যা আপামরের অধিগম্য।

জাপানিতে *উমিবে নো কাফুকা*, যার বাঙলায় তর্জমা করলাম 'সমুদ্রতটে কাফকা', দু'খন্ডের উপন্যাস। প্রথম খন্ডে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে অভিন্নতার ধারণার, অখন্ডতার ধারণার আর পাঠকের ধারণাশক্তিকে আভাস দিয়ে রাখা হচ্ছে অবলোকনকারী ও তার অভিজ্ঞতার পারস্পরিক অবিভাজ্যতার, যার ব্যাখ্যা আছে কোয়ান্টাম-তত্ত্বে। অবিভাজ্যতা আর অবিচ্ছিন্নতার সত্য ও দর্শনের উপন্যাস এটি। এরকম উপন্যাস সম্বন্ধে হয়তো বলা যায়, এ পৃথিবী একবার পায় তারে আর পায় না'ক, কিন্তু মানবসভ্যতাকে এই সত্যে অচঞ্চল ভাবে স্থির থাকতে হবে নিরন্তর, সভ্যতার দাবি অটুট রাখতে। আজকের এই সময় যত অবিসংবাদিত ভাবে এর প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করায় তার জুড়ি ইতিহাসে মেলা ভার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোকাসোকা নাকাতাকে বেরিয়ে আসতে হবে টোকিওর নাকানো ওয়ার্ডের বাইরে তার নিরুপদ্রব জীবনের চৌহদ্দির মায়া ছেড়ে, পেরিয়ে যেতে হবে হোনশু আর শিকোকুর মধ্যে সেতু, সেই গভীর রহস্যময় সত্যের সন্ধানে। সমস্ত আবদ্ধতাকে জয় করে, যোগসূত্রের সেতুর খোঁজে মানুষের যাত্রাই মানুষের অস্তিত্বের অর্থময়তা। পৃথিবীর প্রতিটি সত্ত্বা, সজীব কি নির্জীব, যাবতীয় অন্য সত্ত্বার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যত বেশি করে এই সম্পর্কগুলোকে আবিষ্কার করে অনুধাবন করা যায়, চেতনায় স্থান দেওয়া যায়, তত গভীরতর হয়ে ওঠে তার 'অর্থ'। কিশোর কাফকা তামুরাকে ভেতর থেকে যে যেন সাবধান করে দেয়, দূরত্বের ওপর বেশি ভরসা কোরো না—সময় কিংবা পরিসর এই অখন্ডতায় ছেদ আনতে পারে না, পারে শুধু অন্ধকার, অজ্ঞানতা, অপ্রেম।

ভেদ নেই, যা কিছু মানুষের অন্তরের ইচ্ছায় ধৃত, কল্পনায় রূপ নেওয়া, আর যা কিছু বাহ্য বাস্তবতায় দৃশ্যমান, এই দু'য়ের মধ্যে। তাই অন্তরের শুদ্ধতার শর্ত অলজ্ঘ্য। স্বপ্ন, মেটাফর, অ্যালিগোরি, অ্যানালজিই ইতিহাসের প্রাণ, শুধুই ইতিহাসের আয়না নয়।

অনুবাদকের ভূমিকাটাকেও এই সুমহান দর্শনের মধ্যে খুঁজে নেওয়া কঠিন নয়। সে পাঠককেও বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে নাকানো-ওয়ার্ডের বাইরে, সেতুটুকু পেরিয়ে যেতে, কখনো সাহিত্যের জগতকে সাহায্য করে এমনকি সেতু তৈরি করতেও। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবী জুড়ে আড়াই কোটি কপি বিক্রি হয়েছে যে উপন্যাস, বাংলা ভাষায় তার সঙ্গে একটা সেতু তৈরির কাজটা তো কারুকে করে উঠতেই হবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা যতরকম অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব উদ্যম দেখিয়ে এই অনুবাদের বৈধ অনুমতি যোগাড় করেছে, অন্যান্য ব্যবস্থা ও রসদগত প্রতিকূলতাকে ধৈর্য ধরে অতিক্রম করেছে, তার জন্য প্রকাশনার অধিকর্তা ও তার অক্লান্ত পরিশ্রমী ইউনিটটি আমার অভিভূত বিস্ময়ের উৎস। আর যে দু'জন ছাড়া ঠিক ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে এই অনুবাদ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল তাঁরা হলেন বর্তমানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতি প্রার্থনা ভট্টাচার্য আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানিভাষার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষিকা শ্রীমতি শুভা বোস। আমার যেসব অসমবয়সী বন্ধু ও সুহৃদরা এই কাজটিতে আমার নিজের যোগ্যতায় বিশ্বাসী হওয়ার একমাত্র অবলম্বন, তাঁদের আর ধন্যবাদ দেব কি, এখানেই তো ফুরোলো না আমার নির্ভরশীলতা।

১৬ জানুয়ারি, ২০১৬

কলকাতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

~ www.amarboi.com ~

কারাসু নামে ছেলেটা

“এখন তাহলে শুধু টাকা পয়সার দিকটা?” স্বভাবসিদ্ধ কিছুটা অলস গলায় কারাসু নামের ছেলেটা বলে। এই ধরণের কণ্ঠস্বর লোকের হয় গভীর ঘুম থেকে ওঠার ঠিক পরটায়, মুখের পেশিগুলো যখন ভার হয়ে থাকে, সহজে নাড়ানো যায়না। কিন্তু এটা ওর ভান। ভালরকমই জেগে আছে, অন্যসব সময়ে যেমন থাকে।

আমি মাথা নাড়ি।

“কত?”

আমি মাথার ভেতরে সংখ্যাটা একবার ঝালিয়ে নিয়ে উত্তর দিই, “নগদে প্রায় চারলাখ ইয়েন আর অল্প কিছু টাকা এটিএম থেকে কার্ডে পাওয়া যাবে। বুঝতেই পারছি যে খুব বেশি হলনা, এখনকার মতো খানিকটা তো হল।”

“একেবারে মন্দ নয়,” কারাসু[1] নামে ছেলেটা বলে, “এখনকার মতো।”

আমি আরেকবার মাথা নাড়ি।

“মনে হচ্ছে, এটা ঠিক সান্টা ক্লজের থেকে প্রত্যেক বছর বড়দিনের জন্য পাওয়া টাকা নয়।”

“হ্যাঁ, ওভাবে পাইনি,” উত্তরে আমি বলি।

একটা বাঁকা হাসি হেসে চারপাশে একবার চোখটা বুলিয়ে নেয় কারাসু, “আন্দাজ করছি, শুরুটা হয়েছিল ড্রয়ার হাতড়ে হাতড়ে, ঠিক কিনা?”

আমি কিছু বলিনা। ও খুব ভালই জানে, টাকাটা তাহলে কার, সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। আমাকে একটু চাপে রাখার চেষ্টা করছে মাত্র।

[1] জাপানি ভাষায় ‘কারাসু’ হল কাক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"অসুবিধে কিছু নেই," কারাসু বলে, "টাকাটা তোমার নেহাতই দরকার এবং সেটা একসময় পেয়েও যাবে—চেয়েচিন্তে, ধার করে কিংবা হাতিয়ে নিয়ে। তোমারই বাবার টাকা, কা'র তাতে কী এসে যায়, ঠিক কি না? ঐ টাকাটা হাতে এলেই তোমার চলে যাবে। তবে, এখনকার মতো। কিন্তু, খরচ হয়ে যাওয়ার পর কী করবে বলে ভেবেছো? টাকাপয়সা তো আর বনের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা নয়—আপনা থেকে গজাতে থাকে না, এটুকু তোমার জানা। খেতে হবে, শোয়ার একটা জায়গা চাই। একদিন ফুরিয়েই যাবে।"

"সেরকম হলে তখন ভাবা যাবে সেই নিয়ে," আমি বলি।

"সেরকম হলে তখন," কারাসু কথাটার এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করে, যেন হাতে নিয়ে ওজন যাচাই করে দেখছে।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"কাজ ধরবে একটা, বা ওরকম কিছু?"

"হয়তো," আমি বলি।

কারাসু মাথা ঝাঁকায়। "দ্যাখো, জগত সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কিছু জানতে হবে। বলো দেখি—অনেক দূরে একটা জায়গায়, যেখানে সে আগে কখনও যায়ইনি, একটা পনেরো বছর বয়েসের ছেলে কী ধরণের কাজ পাবে? জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়াটাই তো শেষ হয়নি এখনও। কে তোমাকে কাজে রাখবে শুনি?"

আমার মুখটা সামান্য লাল হয়। একটুতেই আমার মুখ লাল হয়ে যায়।

"যাকগে, ওসব কথা থাক," ও বলে। "সবে শুরু করতে যাচ্ছ এখনই অত দমিয়ে দেওয়ার মতো কথা তোমাকে বলে কাজ নেই। তুমি তো ঠিক করেই ফেলেছো কী করবে, এখন চাকাটা চলতে শুরু করলেই হল। মানে, জীবনটা তো তোমার। আদতে তোমার যা ঠিক বলে মনে হবে সেটাই তো তোমাকে করে যেতে হবে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেকথা ঠিক। সব কিছুর পরেও, জীবনটা আমারই।

"কিন্তু এখন থেকে তোমাকে আরও অনেক টাফ হয়ে উঠতে হবে, নইলে হবে না।"

"আমি যতটা পারি চেষ্টা করছি সেটাই," আমি বলি।

"নিশ্চয়ই করছো," কারাসু বলে। "এই গত ক'বছরে তুমি অনেকটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছো। এটা মানতেই হবে আমাকে।"

আমি আবার মাথা নাড়ি।

"যত যা-ই হোক, তুমি এখনও সবে পনেরো," কারাসু বলে যায়, জীবন সবে শুরু হয়েছে, জীবনে এরকম অজস্র জিনিস রয়ে গেছে যা এখনও তুমি দেখনি। এমন সব জিনিস যা তুমি কল্পনায়ও আনতে পারবে না।"

যেমনটা হয়, আমরা পাশাপাশি বসে আছি বাবার পড়ার ঘরের পুরনো সোফাটায়। এই পড়ার ঘরটা কারাসুর খুব পছন্দ, সঙ্গে চারপাশের ছোটখাটো জিনিসপত্রগুলোও। সেই মুহূর্তে একটা মৌমাছির মতো দেখতে পেপারওয়েট নিয়ে ও নাড়াচাড়া করছিল। এটুকু বলা যায়, বাবা বাড়ি থাকলে কারাসু এদিকে ঘেঁষতোই না।

"যেকোনও পরিস্থিতিতেই আমাকে এখান থেকে বেরোতেই হবে," আমি বলি। "একথার কোনও নড়নচড়ন হবে না।"

"হয়তো তা-ই," পেপারওয়েটটা টেবিলের ওপর রেখে ও হাতদু'টো মাথার পেছনে নিয়ে জড়ো করে। "ওতে করে মোটেই সব সমাধান হয়ে যায় না। আমি মোটেই বাগড়া দিতে চাইছি না, তবু বলি, যতই দূরে যাও না কেন সত্যি এখান থেকে মুক্তি পেয়েছো কি না বুঝে উঠতে পারবে না। বরং যেটা থেকে দূরে যেতে চাও সেটার থেকে বেশি প্রত্যাশা না রাখাই ভালো বলে মনে হয়।" আমি এবার নতুন করে দূরে যাওয়া নিয়ে ভাবতে থাকি।

লম্বা করে শ্বাস ফেলে কারাসু নামে ছেলেটা, বোজা চোখের প্রত্যেকটার ওপর আঙুলের ডগা স্থাপন করে, তারপর সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের ভেতর থেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

“এবারে আমাদের খেলাটা শুরু করলে কেমন হয়?” ও বলে।

“করা যায়,” আমি বলি। চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস টেনে নিই।

“বেশ, কল্পনা কর একটা ভয়ঙ্কর বালির ঝড়,” ও বলতে থাকে। “মাথা থেকে ওটা ছাড়া আর সব কিছু এখন ঝেড়ে ফেল।”

ওর কথা মতোই, আমিও মাথা থেকে আর সব কিছু ঝেড়ে ফেলি। এমনকি, ভুলে যাই কে এই আমি। একদম ফাঁকা। ক্রমে একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগলো এমন সব জিনিস যা আমরা দুজনেই দেখতে পাচ্ছি।

“একেক সময় ভাগ্য জিনিসটা, ছোটখাটো বালির ঝড়ের মতোই, কেবলি যাত্রাপথের অভিমুখ পালটাতে থাকে,” কারাসু নামের ছেলেটা বলে।

একেক সময় ভাগ্য বলে জিনিসটা বালুর ঝড়ের মতোই কেবলি যাত্রাপথের অভিমুখ পালটাতে থাকে। তুমি দিক পরিবর্তন করলেও বালির ঝড় তোমার পিছু ছাড়বে না। তুমি আরেকটু ঘুরে গেলে তো ঝড়ও সেইমতো ঘুরবে। বারবারই একই জিনিস হতে থাকে, একেবারে যেন রাত্রির শেষ যামে মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে কোনও অশুভ নৃত্যের মতো। কেন এমনটা হয়? কারণ, আসলে এই ঝড়টা দূর থেকে আসা, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোনও জিনিস নয়। এককথায় তোমার নিজেরই ব্যাপার। তোমার মধ্যেরই কিছু একটা। নিজেকে সঁপে দিয়ে সোজা সেই ঝড়ের মধ্যে প্রবেশ কর, চোখ, কান ভাল করে বন্ধ রেখে যাতে বালু না ঢুকতে পায়, আর এক’পা এক’পা করে এগিয়ে যাও। হয়তো সেখানে কোনও সূর্য নেই, চাঁদ নেই, দিকচিহ্ন নেই, আর সেক্ষেত্রে সময় বোঝার উপায় পর্যন্ত নেই। হাড়ের গুঁড়োর মতো সাদা আর সূক্ষ্ম বালি পাক খেয়ে আকাশে ওপরের দিকে উঠছে। এরকম একটা বালির ঝড় কল্পনা কর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি ঠিক সেরকম একটা বালির ঝড়ের কথা ভাবতে থাকি। একটা সাদা ঘূর্ণিঝড় আকাশের দিকে মোটা একটা দড়ির মতো সোজা উঠে যাচ্ছে। আমি দুটো হাত দিয়ে চোখ আর কান ভাল করে বন্ধ করে রেখেছি। শরীরের ভেতরে যাতে কিছুতেই সেই সূক্ষ্ম বালি প্রবেশ করতে না পারে। সেই বালির ঝড় দ্রুত এইদিকে ক্রমেই কাছে চলে আসছে। বাতাসের সেই চাপটুকু আমি দূর থেকেই আমার ত্বকে অনুভব করতে পারছি। এসে আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করলো বলে।

একসময় কারাসু নামের ছেলেটা এসে আলতো করে আমার কাঁধে হাত রাখলো আর অমনি, সেই বালুর ঝড়ও মিলিয়ে গেল। তখনও চোখ বন্ধই রেখেছি।

"এখন থেকে তোমাকে জগতের সবচেয়ে টাফ পনেরো বছরের ছেলেটি হয়ে উঠতেই হবে, কোনও কিছুতেই আর তা ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা। এছাড়া আর জগতে টিঁকে থাকার কোনও রাস্তা নেই। আর তারজন্য তোমাকে নিজেকেই বুঝতে হবে প্রকৃত অর্থে টাফ হওয়া ব্যাপারটা আসলে কী। বুঝতে পারছো তো?"

আমার চোখ তখনও বোজা। ওর হাতটা যে আমার কাঁধে সেটা অনুভব করতে করতে আমি ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে চাই। মৃদু ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ কানে আসে।

"তুমি জগতের সবচেয়ে টাফ পনেরো বছরের ছেলে হতে চলেছো," আমি ঘুমিয়ে পড়ছি আর আমার কানে খুব শান্তভাবে কথাটা ফিরে ফিরে আসছে। আমার হৃৎপিন্ডে ঘন নীল রঙের হরফে কে যেন উল্কি দেগে দিচ্ছে।

তবে তোমাকে কিন্তু সেই হিংস্র ঝড়ের মধ্যে দিয়ে সত্যিই যেতে হবে। সেটাকে মেটাফিজিকাল ঝড়ই বলো, আর প্রতীকী ঝড়ই বলো। মেটাফিজিকালই হোক, কি প্রতীকী, একই সঙ্গে এ কিন্তু শরীরটাকে হাজারো ক্ষুরের ফলা দিয়ে ফালাফালা করে দেবে। অনেক মানুষের রক্ত ঝরেছে, তোমারও ঝরবে। গরম, লাল রক্ত। দুহাত পেতে সেই রক্ত তুমি নেবে। সেটা যেমন তোমার রক্ত, অন্য আরো অনেকেরও রক্ত। তারপর সেই বালির ঝড় থেমে গেলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কীভাবে তুমি নিজে সেটার মধ্যে দিয়ে গিয়েও টিঁকে রইলে, তা সম্ভবত বুঝে উঠতে পারবে না। তবে একটা ব্যাপার একেবারে নিশ্চিত, এই ঝড় থেকে নিষ্ক্রান্ত তুমি, আর যে তুমি এতে ঢুকে পড়তে প্রথম পা বাড়িয়েছিলে, এরা কিছুতেই একই লোক নয়, আর এটাই বালির ঝড় জিনিসটার অর্থ।

পঞ্চদশ জন্মদিনটি এলেই আমি বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও অচেনা কোনও শহরে গিয়ে, ছোট্ট একটা লাইব্রেরির এক কোণে স্থান করে নেব।

অবশ্যই আনুক্রমিক বিশদে সবটা বলতে গেলে হয়তো হপ্তাভর বলেই যাওয়া যাবে। তবে আপাতত শুধু মুখ্য ব্যাপারগুলো বললে মোটামুটি যা দাঁড়ায় তা হল—*পঞ্চদশ জন্মদিনটি এলেই আমি বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও অচেনা কোনও শহরে গিয়ে, ছোট্ট একটা লাইব্রেরির এক কোণে স্থান করে নিলাম*। হয়তো রূপকথার গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু রূপকথার গল্প নয়। কোনও অর্থেই তা নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১

বাড়ি ছাড়ার সময় আমি বাবার পড়ার ঘর থেকে যে নগদ কিছু টাকাই শুধু নিলাম তা কিন্তু নয়। নিলাম পুরনো ছোট্ট একটা সোনার লাইটার—এটার ডিজাইনটা আমার খুব পছন্দ, ওজনটাও—ভাঁজ করা যায় এমন ছুরি একটা, যার ফলাটা ভয়ানক ধারালো। হরিণের চামড়া ছাড়াবার ছুরি ওটা, ফলাটার দৈর্ঘ বারো সেন্টিমিটার মতো, বেশ ভারি। বিদেশে গিয়ে হয়তো কোনোবার কিনেছিলেন। এছাড়াও ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে ছিল একটা বেশ জোরালো আলোর পকেট-টর্চ, সেটাও নেওয়া স্থির হল। আর, একটা আকাশী নীল রেভো সানগ্লাস, বয়েস লুকোতে ওটা কাজে লাগবে।

একবার ভাবলাম বাবার অতি সাধের রোলেক্সের অয়েস্টার ঘড়িটাও নিই, কিন্তু খানিক ইতস্তত করে, শেষ অবধি নিলাম না। যন্ত্র হিসেবে ঘড়িটার সৌন্দর্য আমাকে আকর্ষণ করলেও, ওরকম প্রয়োজনের অতিরিক্ত দামি ঘড়ির মাধ্যমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম না। আমার নিজেরটা প্লাস্টিকের একটা শস্তা ক্যাসিও ঘড়ি, অ্যালার্ম আর স্টপ-ওয়াচ আছে, ওতেই হয়ে যাবে, সম্ভবত ওটাই বেশি কাজে লাগবে। অনিচ্ছায় হলেও, আমি রোলেক্সটা আবার ড্রয়ারেই রেখে দিলাম।

এছাড়া আমার আর আমার দিদির ছোটবেলার একটা ফোটোগ্রাফ, দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা। ঐ ছবিটাও ডেস্কের ড্রয়ারে একদম পেছন দিকে ছিল। কোথাও একটা সমুদ্রতীরে আমি আর দিদি হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে, যেন বেশ মজা পেয়েছি। দিদির মুখটা একপাশে ফেরানো, মুখের অর্ধেকটা ছায়ায় ঢেকে গেছে। এতে করে হাসিমুখটা যেন মাঝখান দিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের ছবিতে দেখা গ্রীক ট্র্যাজেডির মুখোশ বলে মনে হচ্ছে। একই মুখে যেন দু'টো অর্থ আরোপ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। আলো ও ছায়া। প্রত্যাশা ও হতাশা। হর্ষ ও বিষাদ। ভরসা আর অসহায়তা। অপরদিকে আমি নেহাতই সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে মুখ করে আছি। সমুদ্রতটে আমরা দু'জন ছাড়া আর কারো চিহ্নমাত্র নেই। আমি আর দিদি দুজনেই সাঁতারের পোশাক পরে আছি। দিদি লালরঙের ফুল ফুল ছাপ ওয়ানপিস পরে আর আমার পরনে একটা নীলরঙের বেঢপ ব্যাগি ট্রাংক্স। আমার হাতে যেন কী একটা ধরা। প্লাস্টিকের লাঠি বলে মনে হচ্ছে দেখে। ঢেউগুলো ফেনা হয়ে এসে পা ধুয়ে দিচ্ছে। কোথায়, কবে, কে যে এই ছবি তুলেছিল তা কে জানে! কেন যে ওরকম মজা পাওয়া মুখ করে রেখেছিলাম তা-ই বা কে জানে। আদৌ ওরকম মজা পাওয়া মুখ কীভাবে করে উঠতে পেরেছিলাম তা-ও বোঝা কঠিন। ঠিক এই ছবিটাই যে কেন বাবা হাতের কাছে রেখে দিয়েছিলেন তা-ই বা কে বলবে! সবটাই রহস্যে ভরা! আমার তখন সম্ভবত বছর তিনেক বয়েস, দিদির বছর ন'য়েক। আমার আর দিদির মধ্যে এত ভাব, সত্যি ছিল কি কখনো? বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সমুদ্রে যাওয়ার কোনও স্মৃতিই আমার একেবারেই নেই। কোথাও যাওয়ার কোনও স্মৃতিই নেই। কিন্তু এরকম একটা ছবি পিতৃদেবের কাছে রেখে যাওয়ার এতটুকু ইচ্ছে আমার হলনা। সেই পুরনো ছবি অতএব আমার পার্সের মধ্যে ঢোকালাম। মা'র কোনও ছবি নেই। মা'র ছবি, একটিও না রেখে বাবা নির্ঘাত সবগুলোই কোথাও ফেলে দিয়েছেন।

খানিক ভেবে মোবাইল ফোনটা সঙ্গে নেওয়া স্থির করলাম। মারা গিয়েছি বুঝলে বাবা হয়তো টেলিফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে চুক্তিটা বাতিল করে দেবেন। সেক্ষেত্রে আর কোনও কাজেই লাগবে না। তবু, রুক্স্যাকে ভরে নিলাম জিনিসটা। রিচার্জ করার অ্যাডাপটারটাও ভরে নিলাম। নেহাতই হালকা জিনিস সব। আর কাজ করছে না বুঝলে তখন ফেলে দেওয়া যেতে পারে।

ঠিক করেছি রুক্স্যাকে শুধু দরকারি জিনিসপত্রই নেব। সবচেয়ে কঠিন হল পোশাক আশাক নির্বাচন করা। আন্ডার-গারমেন্টস ক'সেট নেওয়া জরুরি? সোয়েটারই বা ক'খানা দরকার হবে? শার্ট, ট্রাউজারস, দস্তানা, মাফলার, শর্ট-প্যান্ট, কোট এইসব? ভেবে কূল পাওয়া যায় না। তবে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে আছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিশাল একখানা বোঝা কাঁধে নিয়ে, ঠিক যেন বাড়ি থেকে পালানো ছেলের মতো চেহারা করে অচেনা জায়গায় এদিক সেদিক হেঁটে ঘোরাঘুরির কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। ওরকম হলেই অল্প সময়ের মধ্যেই কারুর একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসবো। পুলিশের হেফাজতে অবিলম্বে আবার বাড়িতে ফেরত পাঠানো হবে। নচেৎ অঞ্চলের যাবতীয় মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ছেলেদের কোনও দলের পাল্লায় পড়তে হবে।

খুব বেশি ঠান্ডার জায়গায় না যাওয়াই ভাল। আমি এমত সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম। এর মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। ঠান্ডা নয়, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, এরকম জায়গাতেই তাহলে যাই। সেক্ষেত্রে কোটেরও প্রয়োজন পড়বে না। দস্তানাও জরুরি নয়। ঠান্ডার কথা ভাবতে না হলে, প্রয়োজনীয় পোশাকের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। কাচাকাচির পরে সহজেই অল্পসময়ে শুকোনো যাবে, অনেকটা জায়গা নেবে না যথাসম্ভব এরকম পোশাক বেছে নিয়ে, ভাঁজ করে ছোট করে নিয়ে রুক্স্যাকের ভেতরে ঠেসে দিলাম। জায়গা বাঁচাতে একটা ছোট ফোল্ডিং থ্রী-সীজন স্লীপিং ব্যাগ, সামান্য টয়লেট্রির একটা কিট, বৃষ্টিবাদলার জন্য একটা পনচো, খাতা আর একটা বলপেন, টেপ করা যায় এমন একটা সোনির এমডি (মিনি ডিসক্) ওয়াকম্যান, দশখানা মতো ডিসক্ (গানবাজনা যে কোনও পরিস্থিতিতেই খুব জরুরি), একস্ট্রা একটা রিচার্জেবল ব্যাটারি, এইসব আর কি। ক্যাম্পের মতো রান্নার বাসনপত্র অবধি যাওয়ার দরকার নেই। ওজনও বেশি হবে, আয়তনও বেশি হবে। খাবারদাবার কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে কিনে নিলেই হবে। দীর্ঘ সময় ধরে আমি জিনিসপত্রের লিস্ট যতটা পারা যায় ছোট করার চেষ্টা করে গেলাম। নানা জিনিস সেই লিস্টে একবার করে লিখে আবার তারপর মুছে দিলাম। আবারও অনেক কিছু লিখে, সেগুলোও আবার মুছে দিলাম।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য পঞ্চদশ জন্মদিনটাই সবচেয়ে যুৎসই সময় বলে ভেবে উঠেছিলাম। তার আগে হলে বেশ একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যেত, আর তার পরে হলে হয়তো বড্ড দেরি হয়ে যেত। জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে অবধি, দু'বছর ধরে আমি এই দিনটার জন্য, মন দিয়ে নিজের শরীরটাকে পোক্ত করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাইমারি স্কুলের নিচু ক্লাস থেকে জুদো ক্লাসে গিয়েছি, আর জুনিয়র হাইস্কুলে এসেও একটা লেভেলে চালিয়েই গেছি। কিন্তু স্কুলের কোনও টীমে যোগ দিইনি। সময় পেলেই স্কুলের মাঠে দৌড়োতাম, সাঁতার কাটতাম কিংবা স্থানীয় একটা জিমে যেতাম। ওখানকার অল্পবয়েসী ট্রেনাররা আমাকে বিনে পয়সায় শেখাত, ওরাই আমাকে সবচেয়ে কার্যকরি স্ট্রেচিং এক্সারসাইজগুলো শিখিয়েছিল, তার সঙ্গে ফিটনেস মেশিন ব্যবহার করে কীভাবে শরীরটাকে পুষ্ট করে তোলা যায়। শিখিয়েছিল কোন পেশিগুলো আমরা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করি আর কোনগুলোকে মেশিন ব্যবহার করে স্ফীত করে তুলতে হয়, এমনকি বেঞ্চপ্রেসের সঠিক কায়দাও ওখানেই শেখা। এমনিতেই আমার দৈহিক উচ্চতা বেশ ভালই, সঙ্গে এইসব ব্যায়ামে আমার কাঁধ বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠলো, বুকের ছাতি বেড়ে গেল অনেকটা। যারা চিনতো না তারা ভাবত আমার বয়েস হয়তো সতেরো হবে। বাড়ি থেকে পালানোর সময় যদি আমার আসল বয়েসটা ধরা যায়, কীরকম মুশকিল যে হবে সে আপনারা আন্দাজই করতে পারেন।

জিমের প্রশিক্ষকরা আর আমাদের বাড়িতে যে কাজ করতে আসত একদিন অন্তর, তাদের সঙ্গে—আর স্কুলে একেবারে যেটুকু না বললেই নয়—এছাড়া আমি আর খুব একটা কথাবার্তা কারো সঙ্গে বলতাম না। দীর্ঘদিন আমি আর বাবা পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে চলেছি। একই ছাদের নিচে থেকেও আমাদের দৈনন্দিনের অভ্যেস একেবারে আলাদা। ওঁর সারাদিনই প্রায় কেটে যায় স্টুডিওতে, বহুদূরে, আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করি ওঁকে এড়িয়ে চলতে।

আমি যে জুনিয়র হাইস্কুলে যাই সেটা সমাজের বেশ উঁচুতলার ছেলেমেয়েদের জন্য, নিদেনপক্ষে উচ্চবিত্ত। এই ধরণের স্কুলে সাধারণতঃ, একেবারে মরীয়া হয়ে সে সুযোগ হাতছাড়া না করলে, সকলেই ক্যাম্পাসের মধ্যেই যে হাইস্কুল তাতে আপনা থেকে প্রোমোটেড হয়ে যায়। সকলের পোশাক-আশাক পরিপাটি, চমৎকার সুবিন্যস্ত দাঁত, আর সঙ্গে সকলেই অসহ্য রকম বিশেষত্বহীন। স্বাভাবিকভাবেই আমার কোনও বন্ধু হয়নি। নিজের চারপাশে একটা দেওয়াল তুলে নিয়েছিলাম, কারুকে ভেতরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসতেও দিইনি, চেষ্টা করেছি নিজেও ওটির বাইরে না যেতে। এরকম কারুকে কা'র পছন্দ হয়? সবাই একটু দূর থেকে আমাকে নজরে রাখে। হয়তো ওরা খুবই অপছন্দ করে আমাকে, ভয়ও পেতে পারে, কিন্তু আমাকে যে ঘাঁটায়নি তাতেই আমি খুশি। কেননা, আমি তখন হাজারো ব্যাপারে ব্যস্ত, তার মধ্যে আছে সময় পেলেই স্কুলের লাইব্রেরিতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে বই খুলে গিলতে থাকা।

তবে, ক্লাসে যা কিছু বলা হত তা আমি বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনতাম। ঠিক যেরকমটি কারাসু করতে বলেছিল।

যেসব তথ্য এবং পদ্ধতি কিংবা অন্য যা কিছু ক্লাসে শেখানো হবে তা যে আর বাস্তবের পৃথিবীতে তেমন একটা কাজে আসবে না, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। টিচাররা তো অধিকাংশই একদল চালচুলোহীন পরিত্যক্ত লোক। কিন্তু এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে: তুমি কিন্তু বাড়ি থেকে পালাতে চলেছ। আর হয়তো কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হবেনা, অতএব সুযোগ পেলেই, ভাল লাগুক না লাগুক যা কিছু পাচ্ছ একেবারে শুষে নাও। একেবারে ব্লটিং পেপার হয়ে গিয়ে সব শুষে নাও। পরে ভেবে দেখলেই হবে কী তুমি রাখবে আর কী ঝেড়ে ফেলবে।

ও যা কিছু বলেছিল আমি মেনে চলেছি, যেমন সব সময়েই মানি। আমার মস্তিষ্কটা যেন একটা স্পঞ্জ, ক্লাসের যাবতীয় কথা অভিনিবেশ সহকারে শুনে একেবারে পুরোটা শুষে নিচ্ছিলাম, এগুলোর অর্থ কী তা অনুধাবন করে নিয়ে সবটা স্মৃতিতে ভরে নিচ্ছিলাম। এতে করে, ক্লাসের বাইরে আর পড়াশুনো করতেই হচ্ছিল না, তবু পরীক্ষায় একেবারে ওপরের দিকেই থাকছিলাম।

আমি ক্রমেই আরো একাচোরা ও মিতবাক হয়ে উঠলেও আমার পেশিগুলো হয়ে উঠছিল ইস্পাতের মতো দৃঢ়। প্রাণপণ চেষ্টা করতাম কোনওমতেই যাতে কোনওরকম আবেগ না প্রকাশ করে ফেলি, কেউ যাতে—সে সহপাঠিরাই হোক বা টিচাররাই হোক—কোনও আন্দাজ না পায় আমি কী ভাবছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি গিয়ে পড়ব প্রাপ্তবয়স্কদের কঠিন দুনিয়ায়, জানতামই যে আমাকে অন্য যেকারুর চেয়ে টাফ হয়ে উঠতে হবে, যদি টিঁকে থাকতে চাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আয়নায় আমার চোখ টিকটিকির শীতল চোখের মতো দেখায়, আমার অভিব্যক্তি স্থির ও তার অর্থোদ্ধার অসম্ভব। মনেই পড়ে না শেষ কবে হেসে উঠেছি বা এমনকি স্মিত হাসিও অন্য কারুর নজরে এসেছে। আমার নিজের তো নয়ই।

এর মানে কিন্তু এই নয় যে একেবারে সর্বক্ষণই আমার পক্ষে এই নির্বাক, বিচ্ছিন্ন রূপটি বজায় রাখা সম্ভব ছিল। চারপাশে খাড়া করা দেওয়ালটা একেক সময় ভেঙে পড়তো। খুব ঘনঘন হোত না, কিন্তু কখনও কখনও, কী হতে চলেছে সেটা খেয়াল করে ওঠার আগেই দেখতাম, আমার সমস্ত প্রতিরোধ উধাও, আমি একেবারে নিরাবরণ হয়ে পড়েছি এবং সব গুলিয়ে গেছে। একেবারেই দিশাহীন হয়ে পড়তাম। আর তার সঙ্গে হত কী যেন ভবিষ্যতবাণী, কেমন অথৈ কালো জলের মতো!

ভবিষ্যতবাণীটা কালো রহস্যময় জলের মতোই। হয়তো ছিলই সর্বক্ষণ, কোথাও লুকোনো ছিল। সময় হতেই নিঃশব্দে ধেয়ে এসেছে, তোমার শরীরের প্রতিটি কোষ হিম হয়ে গেছে তাতে। সেই নিস্তারহীন প্লাবনে তুমি ডুবে যাচ্ছ, শ্বাসও নিতে পারছো না। ঘরের ছাদের কাছে ঘুলঘুলিটা থেকে যাতে দূরে না সরে যাও তার জন্য লড়াই চালাচ্ছ, কিন্তু নিঃশ্বাসের বাতাস শুকনো, গলা খাক হয়ে যাচ্ছে তাতে। জল আর তৃষ্ণা, ঠান্ডা আর উষ্ণ—এইসব আপাত-বিপরীত উপাদান সম্মিলিত শক্তিতে একযোগে তোমাকে আক্রমণ করেছে।

দুনিয়াটা একটা বিশাল জায়গা, কিন্তু তোমাকে ধারণ করবে যতটুকু পরিসর—সেটা খুব বড় হওয়াও জরুরি নয়—সেটুকুও কোথাও মিলবে না। তুমি কোন কণ্ঠস্বর প্রত্যাশা করলে মিলবে শুধু গভীর নৈঃশব্দ্য। তুমি যখন নৈঃশব্দ্য চাইছ তখন বার বার কানে আসবে এই ভবিষ্যৎবাণী। কখনও কখনও সেটা তোমার মাথার মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা গোপন সুইচকে যেন টিপে দেয়। তোমার হৃদয় যেন দীর্ঘ বৃষ্টিপাতের পরে কূল ছাপানো বিশাল নদীর মতো। মাটির ওপরের যাবতীয় হদিস চিহ্ন সেই স্রোতে ডুবে এখনও হয়তো অন্ধকার কোনও জায়গায় বাহিত হয়ে চলেছে। নদীর ওপরে এখনও বৃষ্টি প্রবলভাবে হয়েই চলেছে। নিউজে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরকম বন্যার দৃশ্য দেখলে তুমি মনে মনে বল: হ্যাঁ, এরকমই, এটাই আমার হৃদয়ের ছবি।

বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আগে আমি হাত মুখ পরিস্কার করে ধুয়ে নিলাম, নোখ কাটলাম, কান পরিস্কার করে নিলাম আর দাঁত মাজলাম। সময় নিয়ে ভাল করে গাত্রমার্জনা করে নিলাম। একেক সময় ঠিকমতো পরিচ্ছন্ন থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়ে। আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকালাম। বাবা আর মা'র জিন থেকে—মায়ের চেহারার কোনও স্মৃতিই অবশ্য আমার নেই—এই মুখশ্রী আমি পেয়েছি। কোনও আবেগ যাতে প্রকাশ না করে ফেলি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করাই যায়, চোখ দেখে যাতে কিছু ধরা না যায়, মাসল্ তোলার, কিন্তু চেহারার ব্যাপারে কিছু করা যায় না। বাবার দীর্ঘ, ঘন ভুরু আর তাদের মাঝখানে গভীর রেখাগুলো আমার মধ্যে থেকেই গেছে। হয়তো চাইলে আমি তাঁকে হত্যা করতে পারি (সেটুকু শক্তি আমার শরীরে আছে)। মায়ের সমস্ত চিহ্ন একেবারে মুছে দিতে পারি। কিন্তু তাদের দিয়ে যাওয়া ডিএনএ যাবে কোথায়? সেগুলোকে হটাতে গেলে নিজের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পেতে হবে আমাকে।

আর আছে সেই ভবিষ্যতবাণী, আমার মাথার ভেতরে একটা যন্ত্রের মতো বসিয়ে দেওয়া।

ওটা আমার মাথার ভেতরে একটা যন্ত্রের মতো বসিয়ে দেওয়া আছে।

আলো নিভিয়ে আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসি।

বাড়ির ভেতরটায় একটা আর্দ্র, ভারী নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে। এ আসলে অস্তিত্বহীন লোকেদের ফিসফিসানি আর মৃতদের দীর্ঘশ্বাস। চারপাশ দেখে নিয়ে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমি গভীর একটা শ্বাস টেনে নিই। ঘড়ির কাঁটাটা বিকেল তিনটের আশেপাশে। কাঁটা দুটো কেমন যেন শীতল, দূরত্ব বজায় রাখছে। নিরপেক্ষতার ভান করলেও আমি জানি ওরা আমার দিকে নেই। বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এল। ব্যাক্‌প্যাকটা তুলে কাঁধে গলিয়ে নিলাম। কতই তো এটাকে কাঁধে বয়েছি, কিন্তু এবার যেন বড্ড ভারী বোধ হল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিক করলাম শিকোকুই যাব। শিকোকুই হতে হবে এর কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু ম্যাপ দেখতে দেখতে মনে হল ওটাই আমার গন্তব্য। যতবার ম্যাপটা দেখি, প্রত্যেকবারই টের পাই যে শিকোকু আমাকে টানছে। তোকিওর থেকে অনেকটা দক্ষিণে, মূল ভূখন্ড থেকে সমুদ্রপথে, বেশ গরমের জায়গা। এমন জায়গা যেখানে আগে কখনও যাইনি, একজনও পরিচিত কেউ নেই, একজনও আত্মীয় কেউ নেই। সুতরাং কেউ যদি আমাকে খুঁজতে বেরোয় (সেরকম কেউ আছে বলে মনে করতে পারছি না), শিকোকুর দিকে তার যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

আগেই বুক করা ছিল, টিকিটটা সংগ্রহ করলাম কাউন্টার থেকে, আর তারপর গিয়ে চড়ে বসলাম রাতের বাসে। সবচেয়ে কম খরচে তাকামাৎসু যাওয়ার এটাই উপায়, দশহাজার ইয়েনের সামান্য কিছু বেশি পড়ে। কেউ আমাকে খেয়ালই করলো না, বয়েস কতও জিজ্ঞেস করলো না, মুখের দিকে তাকালোও না, কেবল কন্ডাকটার এসে যান্ত্রিক ভাবে টিকিট চেক করে চলে গেল।

সীটের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ভর্তি হয়েছে। বেশিরভাগ যাত্রীই একা একা যাচ্ছে, আমারই মতো, আর বাসের ভেতরটা আশ্চর্যরকম নিঃশব্দ। তাকামাৎসু অবধি দীর্ঘ পথ, লেখা আছে দশঘন্টার রাস্তা, খুব ভোরে গিয়ে পৌঁছোব। আমার কোনওই অসুবিধে নেই এতে, হাতেও অঢেল সময়। ঠিক আটটার সময় বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়লো, আমিও সীটটাকে, আরাম করার জন্য, পেছনে ঠেলে নিলাম। থিতু হতে না হতেই আমার চেতনা, ফুরিয়ে আসা ব্যাটারির মতোই, কেমন স্তিমিত হয়ে আসতে থাকলো, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে একসময় প্রবল বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মাঝেমাঝেই চটকা ভেঙে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে ঝড়ের বেগে ধেয়ে যাওয়া হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। কাচের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা এসে আছড়ে পড়ছিল, রাস্তার পাশের স্ট্রীটলাইট ঝাপসা আর একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর দূরে চলে চলে যাচ্ছিল। পৃথিবীর উপরিভাগকে মেপে ফেলার জন্য ওদের বসানো হয়েছে কিনা। একেকবার একটা একটা আলো একেবারে কাছে এসে হাজির হয়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার মুহূর্তে পেছন দিকে মিলিয়ে যায়। ঘড়িতে দেখলাম মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠেলে সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হল যেন আমাকে, আর এসে গেল আমার পঞ্চদশ জন্মদিন।

'জন্মদিনের অভিনন্দন', কারাসু নামের ছেলেটা বলে ওঠে।

'ধন্যবাদ', আমি বলি।

কিন্তু সেই ভবিষ্যতবাণী ছায়ার মতো লেগে আছে আমার সঙ্গে। আমার চারপাশের দেওয়ালটা অটুট আছে তো, আমি যাচাই করে নিই। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২

নিচে যে নথিটি পেশ করা হচ্ছে, এটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর সর্বোচ্চ গোপনীয়তার জন্য চিহ্নিত করেছিলো। ১৯৮৬ সালে পাবলিক অ্যাকসেস টু অব ইনফর্মেশন অ্যাক্ট মোতাবেক জনগণের অবগতির জন্য সেই গোপনীয়তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এখন এটিকে রাখা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিতে জাতীয় সংগ্রহশালায় (NARA), ওখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।

এখানে নথিভুক্ত তদন্তটি মেজর জেমস পি. ওয়ারেন-এর নির্দেশে ১৯৪৬ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সংঘটিত ও সম্পন্ন করা হয়। তদন্তকারীরা হলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রবার্ট ও'কোনর এবং মাস্টার সার্জেন্ট হ্যারল্ড কাতায়ামা। তদন্তের ঘটনাস্থল ইয়ামানাশি জেলার * * মহকুমা। বয়ান গ্রহণের সময় প্রশ্নকর্তা ছিলেন লেফটেন্যান্ট ও'কোনর। দোভাষীর কাজ চালান সার্জেন্ট কাতায়ামা, আর প্রাইভেট উইলিয়াম কোহেন ভার নিয়েছিলেন নথিপত্র প্রস্তুত করার।

ইয়ামানাশি জেলার *** শহরের টাউন হলের অভ্যর্থনা কক্ষে বারো দিন ধরে নানা জনের বয়ান নেওয়া হয় সাক্ষাতকারের মাধ্যমে। যাঁরা এককভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট ও'কোনরের প্রশ্ন অনুসারে, তাঁরা হলেন: *** মহকুমার *** শহরের পাবলিক স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী, একই শহরে বসবাসকারী এক চিকিৎসক, স্থানীয় ফাঁড়ির দুই চৌকিদার, আর ছ'জন শিশু। এই সঙ্গেই ঐ এলাকার ১:১০,০০০ এবং ১:২০০০ অনুপাতের যেসব মানচিত্র পেশ করা হচ্ছে সেগুলো পাওয়া গেছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের টোপোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের সৌজন্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগের গোয়েন্দা (MIS) রিপোর্ট
তাং : ১২ই মে, ১৯৪৬
বিষয় : রাইস-ব্যোল পাহাড়ের ঘটনার রিপোর্ট, ১৯৪৪
নথি নং **PTYX-722-8936745-42216-WWN**

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিচের সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হয় শ্রীমতি সেৎসুকো ওকামোচি(২৬)-র সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে। ইনি *** মহকুমার *** শহরের পাবলিক স্কুলের ক্লাস ফোরের বি সেকশনের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকা। এই সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র দেখার জন্য আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে PTYX-722-SQ-118 সংখ্যাটি।

সাক্ষাৎকার গ্রাহক লেফটেন্যান্ট রবার্ট ও'কোনরের মন্তব্য: শ্রীমতি সেৎসুকো ওকামোচি একজন ছোটখাট চেহারার বেশ আকর্ষণীয়া মহিলা, বুদ্ধিমতি ও দায়িত্বশীলা, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একেবারে ঠিকঠাক এবং সততার সঙ্গে। অবশ্য এই ঘটনার ধাক্কা সামলে উঠতে যেন এখনও খানিক বাকি আছে। যখনি স্মৃতি হাতড়ে জবাব দিতে হচ্ছিল তখনই সময়ে সময়ে যেন বেশ মানসিক চাপ অনুভব করছিলেন, আর এরকম হলেই আরো ধীরে বলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল।

যদ্দূর মনে পড়ছে, সকাল দশটার পরে পরেই আকাশে অনেক উঁচুতে আমি একটা রূপোলি রঙের আলো দেখতে পাই। একটা উজ্জ্বল রূপোলি ঝলক। ঠিকই ধরেছেন, নির্ঘাত ধাতব কিছু থেকে প্রতিফলিত আলো। আকাশে পূব থেকে খুব ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে চলে গেল। আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে B-29 বুঝিবা। এক্কেবারে ঠিক আমাদের মাথার ওপরে, তাই দেখার জন্য সোজা ওপরে তাকাতে হচ্ছিল। পরিষ্কার নীল আকাশ, আলো এত উজ্জ্বল যে শুধু ঐ রূপোলি ডিউরালুমিন[†] ধরণের জিনিসটাই চোখে পড়ছিল।

কিন্তু এত উঁচুতে যে জিনিসটার অবয়বটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না। ধরে নিয়েছিলাম যে ওরাও আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, তাই আক্রমণ করতে পারে বা হঠাৎ করে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু হতে পারে এরকম কোনো আশঙ্কা করছিলাম না। অবশ্য ওখানে, ওরকম পাহাড়ি জায়গায়, বোমাবর্ষণ একেবারেই অর্থহীন। ধরে নিয়েছিলাম যে প্লেনটা হয়তো কোথাও কোনো বড় শহরে বোম ফেলতে যাচ্ছে অথবা হানা দেওয়ার পরে ফিরে যাচ্ছে। তাই আমরা হাঁটতেই থাকলাম। শুধু আলোটার যে কেমন একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য ছিল, সেটার কথাই একবার মনে হয়েছিল।

[†]অ্যালুমিনিয়াম ঘটিত এক মিশ্রধাতু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সামরিক বিভাগের তথ্য বলছে ঐ সময় ঐ এলাকার ওপর দিয়ে কোনো মার্কিনি বোমারু বিমান অথবা অন্য কোনোরকম বিমান উড়ে যায়নি, অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের ৭ই নভেম্বর বেলা দশটা নাগাদ।

আমি কিন্তু ওটা পরিস্কার দেখেছি, আমার ক্লাসের বাচ্চারাও দেখেছে। আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে ওটা B-29ই হবে। ততদিনে আমরা নানা ধরনের B-29 বিমানের ঝাঁক দেখেছি, আর অত উপর দিয়ে সম্ভবত একমাত্র ঐ ধরণের বিমানই উড়ে যেতে পারে। আমাদের জেলায় একটা ছোট্ট মত বিমানঘাঁটি আছে, মাঝে মাঝে জাপানি প্লেনও উড়তে দেখেছি, কিন্তু সেসবই ছিল অনেক ছোট আর যত ওপর দিয়ে আমি যেতে দেখলাম ততটা উঁচুতে উঠতেই পারতো না। এছাড়াও ডিউরালুমিন যেভাবে আলো প্রতিফলিত করে অন্য ধাতুতে তা হয় না, আর একমাত্র B-29ই ও দিয়ে তৈরি। আমার অবশ্য একবার একটু আশ্চর্যই লেগেছিল, একটা প্লেন যে কোনো ঝাঁক ছাড়াই একা একা উড়ে যাচ্ছে।

আপনার কি এই এলাকাতেই জন্ম?

না, আমার জন্ম হিরোশিমায়। ১৯৪১-এ বিয়ে হয়ে আমি এই অঞ্চলে আসি। এই জেলার এক জুনিয়র হাইস্কুলে আমার স্বামী মিউজিক টিচার ছিলেন। ১৯৪৩-এ ওঁকে যুদ্ধে যেতে হয় আর ১৯৪৫-এর জুনে লুজোনে উনি যুদ্ধেই মারা যান। পরে যেটুকু শুনতে পেয়েছি তা হল, ম্যানিলার ঠিক বাইরেই এক জায়গায় উনি এক অস্ত্রসম্ভারের পাহারায় ছিলেন আর সেই সময় মার্কিনি গোলা এসে পড়ে পুরোটা বিস্ফোরণে উড়ে যায়, উনিও মারা যান। আমাদের কোনও সন্তান ছিল না।

বাচ্চাদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি, সেদিন যে বেরিয়েছিলেন, আপনার তত্ত্বাবধানে কতজন বাচ্চা ছিল?

ছেলে আর মেয়ে মিলিয়ে মোট ষোলজন। দুজন অসুস্থ বলে আসতে পারেনি, ক্লাসের বাকি সকলেই ছিল। আটটি ছেলে আর আটটি মেয়ে। এদের মধ্যে পাঁচজন আবার টোকিও থেকে যে বাচ্চাদের সরিয়ে আনা হয়েছিল সেই দলের।

সকাল ন'টায় আমরা স্কুল থেকে রওনা দিই। সচরাচর বাইরে যাওয়া যেরকম হয়, একেবারে সেরকমই, তাই সকলের সঙ্গেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল টিফিন বাক্স। ঠিক কী আমরা পর্যবেক্ষণ করব তা আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল না; আমরা পাহাড়ে চড়াই বেয়ে উঠছিলাম মাশরুম বা খাওয়া যায় এরকম অন্যান্য বুনো উদ্ভিদ-টুদ্ভিদের খোঁজে। আমরা মোটামুটিভাবে যে এলাকার লোক সেটা কৃষিপ্রধান, তাই খাবারের ব্যাপারে খুব দুরাবস্থায় আমরা পড়িনি—তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আমাদের খাদ্যের সংস্থান ছিল অফুরান। খাবারের যোগান ছিল মাপা এবং আমরা অধিকাংশই সর্বক্ষণই খানিকটা ক্ষুধার্ত থাকতাম।

সেই কারণে বাচ্চাদের উৎসাহ দেওয়া হত যেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, খাবারের খোঁজে থাকতে। দেশটা তো তখন যুদ্ধে ব্যস্ত, পড়াশুনোর চেয়ে খাবারের গুরুত্ব তখন বেশি। সকলেই তখন স্কুল থেকে আয়োজন করা এই ধরণের ঘুরে আসাতে যোগ দিত—বলা হত, শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত শিক্ষা। আমাদের স্কুলটা ছিল পাহাড় আর বনে ঘেরা, তাই প্রায়ই বেশ সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাওয়া হত। একদিক থেকে এটাকে একপ্রকার আশির্বাদই বলা চলে। শহরের লোকেরা তখন সকলে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাইওয়ান কিংবা মহাদেশের অন্যত্র থেকে যোগান আসার রাস্তা তদ্দিনে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, শহরাঞ্চলে খাবার আর জ্বালানির ভয়ানক অনটন চলছে।

আপনি বললেন টোকিও থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল এরকম পাঁচজন ছিল আপনার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। স্থানীয় বাচ্চাদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারছিল ওরা?

অন্তত আমার ক্লাসের ওরা ভালই পারছিল। যে পরিবেশে এই দুদল ছেলেমেয়ে বেড়ে উঠেছিল তা অবশ্যই ছিল একেবারেই পৃথক—একদল একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে আর অন্যদল একেবারে টোকিওর কেন্দ্রে। কথা বলতো অন্যভাবে, এমনকি পোষাক পর্যন্ত ছিল ভিন্ন। স্থানীয় বাচ্চাদের অধিকাংশই ছিল গরীব চাষীর ঘরের, অন্যদিকে টোকিওর বাচ্চাদের একটা বড় অংশের বাবারা কাজ করতো হয় বড় কোম্পানিতে নতুবা সিভিল সার্ভিসে। সুতরাং এটা বোধহয় বলা যাবে না যে ওরা পরস্পরকে ভালই বুঝতো।

বিশেষ করে প্রথম দিকটায় দুটো গ্রুপের মধ্যে খানিকটা টেনশন টের পাওয়া যেত। আমি বলবো না যে একে অপরকে নির্যাতন করতো কিংবা মারামারিতে জড়িয়ে পড়তো, কেননা কখনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেরকম কিছু হয়নি। আমি বলবো যে আসলে কোনো গ্রুপই বুঝতে পারতো না অন্য গ্রুপটা ঠিক কী ভাবছে। তাই নিজেরা নিজেদের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতো, স্থানীয় বাচ্চারা অন্য স্থানীয় বাচ্চাদের সঙ্গে আর টোকিওর বাচ্চারা নিজেদের ছোট দলটার মধ্যে। তবে এটা ছিল প্রথম দুমাসের ব্যাপার। তারপরে ভালই মেলামেশা শুরু হয়ে গেল। যেমন হয় আর কি। বাচ্চারা একবার একসঙ্গে খেলতে শুরু করলে যা করছে তার মধ্যে পুরোটা ডুবে গিয়ে আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আমি অনুরোধ করছি, আপনি যতটা পারেন বিশদে সেই স্পটটা সম্বন্ধে একটু বলুন, যেখানে সেদিন আপনি ক্লাস নিচ্ছিলেন।

এভাবে বেরোলেই এই পাহাড়টাতে আমরা প্রায়ই যেতাম। গোল, উল্টোনো বাটির মতো একটা পাহাড়। আমরা ওটাকে সাধারণত 'ও-বান ইয়ামা' বলে বলতাম। স্কুল থেকে পশ্চিমমুখো খানিকটা হেঁটে যেতে হত, আদৌ খুব খাড়াই নয়, যে-কেউই তাই উঠতে পারতো। বাচ্চাদের গতিতে গেলে একেবারে চূড়ায় উঠতে মোটামুটি ঘন্টা দুয়েক লাগে। যেতে যেতে ওরা মাশরুম খুঁজে বের করছিল, আমরা সাধারণ রকম লাঞ্চ সেরে নিলাম। বাচ্চারা খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্লাসরুমে বসে পড়াশুনোর চেয়ে এই ধরণের অভিযান অনেক বেশি পছন্দ করতো।

আকাশে অত উঁচুতে ঐ ঝকমকে প্লেনটা দেখে মুহূর্তের জন্য যুদ্ধের কথা মাথায় এসেছিল বটে, কিন্তু সে খুব অল্প সময়ের জন্য, আমরা বেশ খুশিতেই ছিলাম। আকাশে একটুও মেঘ ছিল না, বাতাসও দিচ্ছিল না তেমন, চারপাশটা কেমন ঝিম মেরে ছিল—শুধু বনের মধ্যে পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। যুদ্ধ যেন তখন অনেক দূরের কোনও দেশে, আমাদের সঙ্গে যেন কোনও সম্বন্ধ নেই। পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা গান গাইছিলাম, কখনো পাখির ডাক নকল করে করে। যুদ্ধ যে তখনও হচ্ছিল, সেটুকু বাদ দিলে একটা একেবারে নিখুঁত সকাল।

এরোপ্লেনের মতো জিনিসটা চোখে পড়ার পরেপরেই আপনারা জঙ্গলে ঢুকলেন, তাই তো?

ঠিক তাই। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা জঙ্গলে ঢুকি। পাহাড়ে ওঠার মূল রাস্তাটা ছেড়ে আমরা একটা পায়ের চাপে চাপে তৈরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুঁড়িপথ ধরলাম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওপরের দিকে। এটা বেশ খাড়াই একটা রাস্তা। দশমিনিট মতো যেতেই গিয়ে পড়লাম একটা পরিস্কার জায়গায়, অনেকটা জমি, একেবারে টেবিলের ওপরটার মতো সমতল। জঙ্গলে ঢুকতেই চারপাশে আর কোনো আওয়াজ ছিল না, সূর্য আড়াল পড়ে গিয়ে বেশ শীত শীত করছিল, ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পড়তেই কেমন যেন ছোটখাটো টাউন স্কোয়ারের মতো মনে হল, মাথার ওপরে আকাশ আবার আলো ঝলমলে। ও-বান ইয়ামাতে চড়তে এসে আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ সময়ই এইখানটায় এসে থামতো। খুব শান্ত লাগতো, কেন যেন আমাদের বেশ ভাল লাগতো, আরামও হত।

এই 'স্কোয়্যারে' এসে আমরা একটু বিরতি নিলাম, কাঁধের ব্যাগ ট্যাগ নামিয়ে রাখলাম, বাচ্চারা এরপরে তিন কি চারজনের ছোট ছোট গ্রুপে মাশরুম খুঁজতে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। আমি পইপই করে বলে দিলাম কেউ যেন নজরের বাইরে না যায়। রওনা দেওয়ার আগে সবাইকে একত্র করে ভাল করে বুঝিয়ে বললাম। জায়গাটা আমাদের ভালোমতোই চেনা, কিন্তু তবু, জঙ্গল তো, কেউ একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে হারিয়ে গেলে আমাদের তাকে খুঁজতে খুব হয়রানি হবে। সব কিছুর পরেও, বাচ্চা তো, একবার মাশরুম খুঁজতে লেগে পড়লে এসব নিষেধ-টিষেধ কিছুই মনে থাকবে না। আমি তাই মাশরুম খুঁজতে খুঁজতেও একটা চোখ ওদের ওপরে আগাগোড়া রেখে যাচ্ছিলাম আর তার সঙ্গে ক্রমাগত মাথা গুণে যাওয়া।

মাশরুম কুড়োনো শুরু করার দশ মিনিট মতো পরেই বাচ্চারা লুটিয়ে পড়তে লাগলো।

প্রথম যখন চোখে পড়লো যে ওদের তিনজন মাটিতে পড়ে আছে আমি ভাবলাম নির্ঘাৎ ওরা বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়েছে। এইখানে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা অজস্র আছে, একটাতেই মৃত্যু হওয়া সম্ভব। স্থানীয় বাচ্চারা জানে কোনগুলো তুলতে নেই, কিন্তু কিছু কিছু আছে যা আলাদা করা যায় না। সেই কারণেই আমি বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম যাতে কিছুতেই ওরা ওগুলো মুখে না দেয় যতক্ষণ না স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পর একজন বিশেষজ্ঞ ওগুলো যাচাই করে দেন। কিন্তু বাচ্চারা সর্বদা যে সেসব শুনে চলবে এরকম তো আর প্রত্যাশা করা যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি দৌড়ে গিয়ে যে বাচ্চারা পড়ে ছিল তাদের তুললাম। শরীরগুলো নেতিয়ে পড়েছে, রোদ্দুরে ফেলে রাখা রাবারের মতো। শুকনো খোলার মতো শরীরগুলো, সমস্ত শক্তি উবে গেছে। কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছিল ঠিকঠাক, নাড়ির গতিও স্বাভাবিক, জ্বরও আসেনি। শান্তই দেখাচ্ছিল, আদৌ কোনও কষ্টের ছাপ ছিল না। বুঝলাম মৌমাছির হুল কিংবা সাপে কাটার ব্যাপার নয়। নেহাতই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ছিল ওদের চোখ, শরীর এমন নেতিয়ে পড়েছে যেন কোমায় চলে গেছে, কিন্তু চোখগুলো খোলা, মনে হবে যেন কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে চোখে পলকও পড়ছে, সুতরাং ঘুম বলে মনে হওয়ার উপায় নেই। চোখের মণি ধীরে একপাশ থেকে আরেকপাশে সরে যাচ্ছে, যেন অনেক দূরের দিগন্তে কিছু একটা নজর করে দেখছে। ওদের চোখ অন্তত অচেতন হয়ে পড়েনি। তবে ওরা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জিনিসকে দেখছিল না, অন্তত আমি সেরকম কিছু দেখিনি। কয়েকবার হাত নাড়লাম ওদের মুখের কাছে এনে, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হল না তাতে।

এক এক করে তিনটি বাচ্চাকেই তুললাম, প্রত্যেকে একইরকম। প্রত্যেকেই অচেতন, চোখ একপাশ থেকে আরেকপাশে ধীরে নড়ছে, এরকম অদ্ভুত ব্যাপার এর আগে কখনো দেখিনি।

যে গ্রুপটা প্রথম লুটিয়ে পড়লো তাদের সম্বন্ধে একটু বলুন।

এই গ্রুপটার সকলেই মেয়ে। তিনজনের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বেশ ভাল বন্ধু। ওদের নাম ধরে ডাকলাম, গালে চড়ও মারলাম—বলতে কী, বেশ জোরেই—কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। ওদের তখন কোনো বোধই নেই। একটা বিচিত্র অনুভূতি হল, শূন্যতাকে স্পর্শ করার মতো।

প্রথমে ভাবলাম কারুকে একটা পাঠাই দৌড়ে স্কুলে ফিরে গিয়ে সাহায্য করার লোক আনাতে। আমি একা কোনোমতেই তিন তিনজনকে বয়ে নিয়ে নামতে পারতাম না। তাই খোঁজ করলাম ক্লাসে সবচেয়ে জোরে যে দৌড়তে পারতো তার, ছেলেদের মধ্যে একজন। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতেই দেখি সবগুলো বাচ্চা লুটিয়ে পড়েছে। ১৬ জনের সকলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

জ্ঞান হারিয়েছে। তখনও জ্ঞান আছে এবং দাঁড়িয়ে একমাত্র আমি, ঠিক যেন... যুদ্ধক্ষেত্র।

সেই পরিস্থিতিতে একটু অন্যরকম কিছু কি খেয়াল করেছিলেন? কোনো বিচিত্র গন্ধ অথবা শব্দ—কিংবা আলো?

[কিছুক্ষণ কী ভাবলেন] না, আগেই যা বলেছি, সবই খুব শান্ত, শান্তিপূর্ন ছিল। কোনোরকম অস্বাভাবিক শব্দ কিংবা আলো অথবা গন্ধ টের পাইনি। একমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার হল আমার ছাত্রছাত্রীরা জনে জনে প্রত্যেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে এবং অচেতন হয়ে আছে। কী যে একা বোধ হচ্ছিল, যেন পৃথিবীতে আমিই শেষ ব্যক্তি, তখনও বেঁচে আছি। সেই চূড়ান্ত একাকিত্বের অনুভূতি আমি বর্ণনা করতে পারবো না। যেন বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়, কোনো কিছু চিন্তা না করতে হলে।

যদিও তা করা হয়নি—ওদের শিক্ষিকা হিসেবে আমার তখন দায়িত্ব ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি সেই উৎরাই বেয়ে জোরে দৌড়ে নামতে থাকলাম, পা দু'খানায় যতটা জোর আনা যায়। স্কুল থেকে সাহায্য করার লোক আনতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩

ঘুম যখন ভাঙলো তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। নির্ঘাত এতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, সবকিছু থেকে জল ঝরছে। পূবের আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ অসম্ভব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, প্রত্যেকটি যেন আলোর ফ্রেমে বাঁধানো। আকাশের দিকে তাকিয়ে একেকবার মনে কী যেন আশঙ্কা ভর করে, আবার একটু পরেই বেশ মনোরম। একেক কোণ থেকে একেকরকম।

বাসটা হাইওয়ে ধরে অবিচল গতিতে এগিয়ে যায়, সঙ্গে টায়ারের গুঞ্জন, না কখনো একটু জোরে হচ্ছে না কখনো একটু মৃদু। ইঞ্জিনেরও সেই একই ব্যাপার, টানা একঘেয়ে একটা শব্দ যেন মোলায়েম করে সময় আর বাসের ভেতরের লোকগুলোর চেতনা পিষেই যাচ্ছে। অন্য যাত্রীরা যে যার সীটে এলিয়ে পড়ে আছে, সবাই ঘুমন্ত, পর্দাগুলো টাইট করে টানা। জেগে আছি শুধু ড্রাইভার আর আমি। নিঃসাড়ে এবং নিপুণভাবে আমাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার যার গন্তব্যের দিকে।

তেষ্টা পেল, তাই ব্যাকপ্যাকের পকেট থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল বের করে ইষদুষ্ণ জল খানিকটা পান করলাম। একই পকেট থেকে এক বাক্স সোডা ক্র্যাকার্ বের করে চিবুলাম কয়েকটা, চেনা শুকনো স্বাদটা বেশ ভালই লাগল। আমার ঘড়িতে এখন চারটে বেজে বত্রিশ মিনিট। তারিখ আর সপ্তাহের কোন বার সেটা দেখে নিলাম, দেখে রাখা ভাল। বাড়ি ছাড়ার পর তের ঘন্টা হয়ে গেল। সময় লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়ওনি, আবার একেবারে অপ্রত্যাশিত রকম মুখ ফিরিয়েও থাকে নি। এখনও জন্মদিনের দিনটা আছে, আমার একেবারে আনকোরা নতুন জীবনের প্রথম দিনটাও। একবার চোখ বন্ধ করলাম, আবার খুললাম তারপর, আবারও ঘড়িতে বার আর তারিখ দেখে নিলাম। তারপর রীডিং লাইটটা জ্বেলে নিয়ে একটা পেপারব্যাক বই বের করে পড়তে শুরু করলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচটা বাজতেই, আগে থেকে কিছু জানান না দিয়ে বাসটা হঠাৎই হাইওয়ে থেকে সরে এসে রাস্তার ধারের একটা জিরিয়ে নেওয়ার জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। বাতাস বেরুনোর একটা হিসস্ শব্দ হয়ে বাসের সামনের দরজাটা খুলে গেল,ভেতরের আলোটা ক'বার দপদপ করে, তারপর জ্বলে উঠলো আর ড্রাইভার সংক্ষেপে ঘোষণা করলো, "সকলকে জানাই সুপ্রভাত। আশা করি ঠিকমতো বিশ্রাম করতে পেরেছেন। আমরা একেবারে ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাটায় চলেছি, ঘন্টাখানিকের মধ্যে আমাদের শেষ স্টপ তাকামাৎসু স্টেশনে পৌঁছে যাব। তবে, এখানে আমরা কুড়ি মিনিটের একটা বিরতি নেব। বাস ছাড়বে পাঁচটা তিরিশে, তার মধ্যে অবশ্যই বাসে ফিরে আসবেন।"

এই ঘোষণায় অধিকাংশ লোকের ঘুম ভেঙে গেল, নিঃশব্দে তারা কোনোমতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো, তারপর হাই তুলতে তুলতে, হোঁচট খেতে খেতে বাস থেকে বেরিয়ে এল। তাকামাৎসু পৌঁছনোর আগে এইখানটায় তারা নিজেদের একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়। আমিও বেরিয়ে আসি, কয়েকবার গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে ভোরের টাটকা বাতাসে কিছু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ সেরে নিই। হেঁটে গিয়ে পুরুষদের টয়লেটে ঢুকে মুখে খানিকটা জলের ঝাপটা দিই। শালা কোথায় যে আমরা এখন তাই বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে গিয়ে চারদিকে তাকাই। কোনোই বিশেষত্ব নেই, একেবারেই টিপিকাল রাস্তার ধারের দৃশ্য, যেকোনো হাইওয়ের পাশে। হতে পারে নেহাতই আমার মনের ভুল, পাহাড়গুলোর আদল আর গাছেদের রঙ যেন ফেলে আসা টোকিওর থেকে অনেকেই আলাদা।

কাফেটারিয়ার ভেতরে ফ্রীতে পাওয়া গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় আমার পাশের প্লাসটিক সীটটাতে এই মেয়েটা এসে বসে পড়লো। ওর ডানহাতে ধরা কাগজের কাপে গরম কফি, ভেন্ডিং মেশিন থেকে কিনেছে, গরম ধোঁয়ার ভাপ উঠছে ওটা থেকে, বাঁহাতে ধরা একটা ছোট প্যাকেটের ভেতরে স্যান্ডুইচ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটাও সেই ভেন্ডিং মেশিনেরই পসরা।

বিচিত্র চেহারা মেয়েটার। কেমন যেন বেখাপ্পা—চওড়া কপাল,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাকের ডগাটা গোল, গালে মেচেতার দাগ, আর কানদুটো ছুঁচলো। বিসদৃশ নানা অংশ জড়ো করে তৈরি রুক্ষ মুখশ্রী, তবে নজর এড়াবে না। আর সবটা মিলিয়ে অতটা খারাপও লাগে না। নিজে দেখতে কেমন সেই নিয়ে মনে হয় না তেমন মাথাব্যথা আছে মেয়েটির, বরং সে যা তা নিয়ে যথেষ্ট সচ্ছন্দ, এবং সেটাই আসল কথা। শিশুসুলভ কিছু একটা আছে ওর মধ্যে যাতে বেশ উদ্বেগমুক্ত হওয়া যায়, অন্তত আমি তো হলাম। তেমন দীর্ঘাঙ্গিনী নয়, তবে পা দুটো দেখতে বেশ আর ওরকম ছিপছিপে শরীরে সুন্দর বুক।

মেয়েটার কানের সরু ধাতব দুল ডিউরালুমিনের মতো ঝকমক করছে। ঘন বাদামি, একটু লালচে রঙ করা চুল কাঁধ পর্যন্ত, লম্বা হাতা, ক্রু-গলার শার্ট, তাতে বেশ চওড়া স্ট্রাইপ। একদিকের কাঁধ থেকে ঝুলছে চামড়ার ছোট ব্যাকপ্যাক আর গলায় জড়ানো আছে একটা হালকা সোয়েটার। এছাড়া আর পোষাক বলতে ঘিয়ে রঙের মিনি-স্কার্ট, মোজা নেই। বোঝাই যাচ্ছে যে মুখটা ধুয়ে এসেছে, কয়েক গাছা চুল, গাছের খুব সরু শেকড় যেন, চওড়া কপালের সঙ্গে সেঁটে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐ আলগা ক'গাছা চুলের জন্য আমি ওর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হলাম।

"তুমি বাসটাতে ছিলে, ছিলে না?" মেয়েটা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, গলার আওয়াজটা একটু বসা।

"হ্যাঁ, ছিলাম।"

কফিতে চুমুক দিয়ে ভুরুটা একটু কোঁচকালো, "কত বয়েস তোমার?"

"সতেরো," আমি সত্য গোপন করি।

"তার মানে, হাইস্কুলে পড়ো।"

আমি মাথা নাড়ি।

"যাচ্ছো কোথায়?"

"তাকামাৎসু।"

"আমিও," মেয়েটা বলে। "বেড়াতে যাচ্ছো, না কি থাকো ওখানে?"

"বেড়াতে যাচ্ছি," আমি উত্তর দিই।

"আমিও। এক বন্ধুর কাছে। বান্ধবী। তুমি?"

"আত্মীয়স্বজন।"

ওহ্‌আচ্ছা, বলার মতো করে মাথা নাড়ে ও। আর কোনো প্রশ্ন করে না। "তোমার বয়েসি আমার এক ছোট ভাই আছে," এমনভাবে হঠাৎ করে বলে ওঠে যেন এইমাত্র মনে পড়লো সেটা। "কিছু কিছু ঘটনায়, আমরা আর অনেকদিনের মধ্যে দেখা করিনি... আচ্ছা,জানো তো? তোমাকে যে অনেকটা ঐ লোকটার মত দেখতে। কেউ বলেনি সেকথা তোমাকে কখনও?"

"কোন লোকটা?"

"আরে ঐ যে, ঐ ব্যান্ডটাতে গায় যে লোকটা! বাসের মধ্যে তোমাকে দেখা মাত্রই আমার মনে হয়েছিল কথাটা, কিন্তু নামটা মনে আনতে পারছি না যে। মনে করার চেষ্টা করে করে আমার বোধহয় মগজে একটা বড় গর্তই খুঁড়ে ফেললাম। এককেসময় এরকম হয়, হয়না? একেবারে জিভের ডগায় এসে আটকে আছে, অথচ মনে আনতে পারছো না। কেউ কখনো এর আগে বলেনি তোমায়—যে তোমাকে দেখে কারুর কথা মনে পড়ছে?"

আমি মাথা ঝাঁকাই। কেউ কখনও এরকম কিছু বলেনি। মেয়েটা এখনও আমার দিকে চেয়ে আছে, চোখটা কুঁচকে, গভীরভাবে। "কীরকম লোকেদের কথা বলতে চাইছো তুমি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"টিভির লোক একজন।"

"টিভিতে দেখা যায় এরকম লোক একজন?"

"একদমই তাই," ও বলে, তারপর একটা হ্যাম স্যান্ডুইচ তুলে নিয়ে খুব অন্যমনস্ক ভাবে একটা কামড় দিয়ে, এক ঢোক কফির

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সেটুকু গিলে ফেলে। "কী একটা ব্যান্ডে যেন গান গায় লোকটা। ধুত্তোরি—কিছুতেই এমনকি ব্যাণ্ডটার নামও মনে আনতে পারছি না। লম্বা মতো, উচ্চারণে কানসাই অঞ্চলের টান আছে। কার কথা বলছি সেটার কোনও ধারণা করতে পারছো না বোধহয়, না?"

"সরি, আমি তো টিভি দেখিনা।"

ভুরু কুঁচকে মেয়েটা আমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। "একেবারেই দেখ না?"

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়ি। একটু দাঁড়ান—আমার এখানে কী করা উচিত, মাথা নেড়ে 'না' বলা উচিত, না কি সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বলার কথা? আমি সামনে মাথা ঝোঁকালাম।

"তুমি বোধহয় খুব একটা কথা বল না, বল কি? একবারে এক লাইনের বেশি নয়। সব সময়েই কি এরকম চুপ করে থাকো?"

আমার মুখটা একটু লাল হয়। মূলত আমি একটু চুপচাপই, কিন্তু বেশি কথা যে বলছি না, তার আরেকটা কারণও আছে, আমার গলাটা এখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। বেশির ভাগ সময়েই গলাটা মৃদুই থাকে, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ করে ভাঙা গলার বিষম সরু আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে আমায় বিপদে ফেলে। সেই কারণেই যেটুকু বলি সংক্ষেপে আর সুন্দর করে বলার চেষ্টা করি।

"সে যা-ই হোক," মেয়েটা বলতে থাকে," আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হল, তোমাকে দেখতে অনেকটাই সেই কানসাই টানের গায়কটার মতো। এমন মোটেই নয় যে তোমারও কানসাই টান বা ওরকম কিছু আছে। কেবল—ঠিক করে বলতে পারছি না, কী যেন একটা আছে তোমার মধ্যে যেটা অনেকটাই ঐ লোকটার মতো। লোকটাকে বেশ ভালো লাগে বলে, আর কিছু নয়।"

মেয়েটার ঠোঁটের হাসিটা ক্ষনিকের জন্য মিলিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে, আর ততক্ষণ আমি লাল হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি। "তোমার চুলটা একটু পালটালেই আরো বেশি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে ওর সঙ্গে মিল তৈরি হবে," ও বলে। "চুলটা আরেকটু বড় হতে দাও, তারপর কোনো একটা জেল ব্যবহার করে একটু ফাঁপিয়ে নাও। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি তখন। ওরকমই ভালো দেখাবে নির্ঘাৎ। আসলে, আমি একজন হেয়ারড্রেসার।"

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আমি চায়ে চুমুক দিই। কাফেটারিয়া একেবারে নিস্তব্ধ। যেসব মিউজিক সাধারণত বাজতে থাকে, সেগুলো নেই, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ কোনো কথা বলছে না।"

"তোমার সম্ভবত কথা বলতে ভাল লাগছে না, তাই না?" একটা হাতের ওপর মাথা রেখে আমার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে মেয়েটা বলে।

আমি মাথা নাড়ি। "না, না, তা নয়।"

"তোমার কি কষ্ট হয় লোকের সঙ্গে কথা বলতে?"

আবারও মাথা নাড়ি।

মেয়েটা অন্য স্যান্ডুইচটা তুলে নেয়, এটাতে হ্যামের বদলে স্ট্রবেরি জ্যাম, তারপর ভুরু কুঁচকে কেমন সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকায়। "এটা একটু খেয়ে নেবে? আমার কাছে স্ট্রবেরি জ্যামের স্যান্ডুইচের চেয়ে খারাপ আর কিছু হয়না। সেই ছোটবেলা থেকেই।"

ওটা ওর থেকে নিলাম। স্ট্রবেরি জ্যাম স্যান্ডুইচ এমনকি আমারও সবচেয়ে পছন্দের তালিকায় দশটার মধ্যেও নেই, কিন্তু মুখ থেকে একটি কথাও না খসিয়ে খেতে শুরু করলাম।

যতক্ষণ না শেষ টুকরোটাও খেয়ে ফেলছি, মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, "আমার একটা উপকার করবে?"

"উপকার?"

"তাকামাৎসু যাওয়া অবধি তোমার পাশে কি বসতে পারি? একা একা নিশ্চিন্ত মনে বসতে পারিনা আমি। সর্বক্ষণ মনে হতে থাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই বুঝি কোনো উটকো লোক আমার পাশে এসে বসে পড়লো, আর তখন কিছুতেই ঘুম আসে না। টিকিট কেনার সময় বললো সীটগুলো সব সিঙ্গল সীট, কিন্তু বাসে চড়ে দেখি সবগুলোই ডাবল সীট। পৌঁছনোর আগে চল্লিশবার অন্তত চোখের পাতাটা বুজতে চাই , তোমাকে মনে হচ্ছে ভালোই লোক। তোমার আপত্তি আছে?"

"কোনোই সমস্যা নেই।"

"ধন্যবাদ, কথায় বলে, 'বেড়ানোর সময় সাথী'।"

আবার মাথা সামনে ঝোঁকাই, কেবল এটাই করে যাচ্ছি—যেন এর বেশি কিছু আর পারি না। কিন্তু বলার আছেটাই বা কী?

"এর পরেরটুকু যেন কী?"

"কীসের পরেরটুকু?"

"বাকিটুকু কী, 'সাথী'-র পরে? মনে পড়ছে না। জাপানিটা একেবারেই ঠিকমতো শেখা হয়নি।"

"আর জীবনে সমব্যথী," আমি বলি।

"বেড়ানোর সময় সাথী, আর জীবনে সমব্যথী," ফের একবার বলে ঠিক কিনা যাচাই করে নেয়। কাগজ পেনসিল থাকলে, যদি লিখেও নিত আমি অবাক হতাম না। "অর্থটা প্রকৃতপক্ষে তাহলে কী, আরেকটু সহজ করে বললে?"

আমি ভাবতে থাকি। ভাবনাটা গুছিয়ে নিতে আমার একটু সময় লাগে, কিন্তু ও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

"মনে হয়, এর অর্থ হল," আমি বলতে শুরু করি, "আমাদের চলার পথে নানা আকস্মিক ঘটনাই আমাদের চলার শক্তি যোগায়। আরেকটু সহজে বললে।"

খানিকক্ষণ এটা নিয়ে ভাবে ও, তারপর ধীরে হাতদুটো টেবিলের ওপরে পাশাপাশি এনে আলতো করে রাখে। "মনে হয়, ঠিকই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলেছো—আকস্মিক ঘটনাই চলার শক্তি যোগায়।"

একবার ঘড়ির দিকে তাকাই, ৫-৩০ বেজে গেছে। "এবার বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ, এবার বোধহয় ফেরাই দরকার। যাওয়া যাক।" বলে বটে, কিন্তু ওঠার বিশেষ উদ্যোগ করে না।

"আচ্ছা একটা কথা, আমরা এখন কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কোনোই ধারণা নেই," মেয়েটা বলে। তারপর গলাটা বাড়িয়ে জায়গাটাতে চোখ বুলিয়ে নেয়। ওর কানের দুলগুলো সামনে পেছনে এমনভাবে দুলতে থাকে যেন যেকোনো মুহূর্তে ঝরে যেতে পারে এমন দুটো ফল খসে পড়লো বলে। "ঘড়িতে যে সময়, তাতে মনে হচ্ছে আমরা এখন কুরাশিকির কাছেই কোথাও, কিন্তু না-ও হতে পারে। হাইওয়েতে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা জিনিসটা নেহাত যাওয়ার পথে থাকে কোথাও। এপ্রান্ত আর ওপ্রান্তের মধ্যে।" ডান হাতের তর্জনি আর বাঁ হাতের তর্জনি দুটো উঁচিয়ে ধরে, মাঝখানে ৩০ সেন্টিমিটার মতো ফাঁক।

"কী নাম তাতে কীই বা এসে যায়?" মেয়েটা বলেই যায়। "বাথরুম টাথরুম সারা হয়ে গেছে, খাবারও পেয়ে গেছ। ফ্লুওরেসেন্ট লাইটও রয়েছে, প্লাস্টিকের চেয়ারও। জঘন্য কফি। স্ট্রবেরি জ্যাম স্যান্ডুইচ। কোনোই প্রয়োজন নেই নামের—অবশ্য যদি ধরে নিতে হয় যে তুমি কিছু একটা প্রয়োজন বের করতে চাইছো। কোথাও একটা থেকে আসছি আমরা, কোথাও একটা যাব। এইটুকু জানলেই হবে, ঠিক কি না?"

আমি আবারও সামনে মাথা ঝোঁকাই, বারবারই যা করে যাচ্ছি।

বাসে ফিরে গিয়ে দেখি আর সবাই ততক্ষণে উঠে বসে আছে, কেবল আমাদের অপেক্ষায়। ড্রাইভার বেশ অল্পবয়েসি, চোখের দৃষ্টি এমন তীব্র যে আমার এক কঠোর পাহারাওয়ালার কথা মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে গেল। আমাদের দুজনের দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকালো কিন্তু মুখে কিছু বললো না, মেয়েটা একটা 'সরি-দেরি-হয়ে-গেছে' গোছের ভালমানুষী চাহনি ফিরিয়ে দিল ওর দিকে। ড্রাইভার হাত বাড়ালো একটা কোনো লিভারের দিকে আর হিসসস শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ছোট্ট একটা স্যুটকেস নিয়ে এসে মেয়েটা আমার পাশে বসে পড়লো—কী একখানা স্যুটকেস, কোথাও ডিসকাউন্টে কেনা নির্ঘাৎ। আমিই ওর হয়ে ওটা তুলে মাথার ওপরের তাকে রেখে দিলাম। সাইজের তুলনায় ভয়ানক ভারী! মেয়েটা আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সীটটা পেছনে হেলিয়ে নিয়ে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লো। বাসটাও, যেন আর তর সইছিল না এইভাবে আমরা বসা মাত্র চলতে শুরু করল। পেপারব্যাকটা বের করে যেখানে পড়া থামিয়েছিলাম সেখান থেকে শুরু করলাম।

মেয়েটা অচিরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, প্রত্যেকবার বাঁকের মুখে বাসটা কাৎ হতেই ওর মাথাটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ছিল, তারপর একসময় ওখানেই থেকে গেল। মুখ বন্ধ, নাক দিয়ে নিঃসাড়ে শ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওর নিঃশ্বাস আমার ঘাড় ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর দিকে তাকাতেই ওর ক্রু-গলার শার্টের কলারের ভেতর দিয়ে ওর ব্রা-র স্ট্র্যাপ চোখে পড়লো। ঘিয়ে রঙের সরু স্ট্র্যাপ। স্ট্র্যাপের অন্যপ্রান্তের মোলায়েম বস্ত্রখন্ডের বুনোট যেন মনশ্চক্ষে ফুটে উঠলো। তার নিচে নরম স্তন। আমার আঙুলের ডগা স্পর্শ করলে গোলাপি স্তনবৃন্ত কীভাবে শক্ত হয়ে উঠবে। এগুলো কল্পনা করতে যে কোনোরকম চেষ্টা করতে হচ্ছিল তা নয়, আপনিই ভেসে উঠছিল। আর তার সঙ্গে—আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—একটা স্ফীত দৃঢ়তা আমার ক্ষেত্রেও ঘটলো। এত শক্ত যে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম শরীরেরই একটা অংশ এতটা শক্ত হয় কী করে।

ঠিক সেই সময় একটা কথা মনে হল। এমন তো হতে পারে—নেহাতই সম্ভাবনা—যে এই মেয়েটা আমারই দিদি। একই বয়েস মোটামুটি। এর অদ্ভুত চেহারাটা ফটোর মেয়েটার মতো নয় একদমই কিন্তু সেটাতে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়না। কীভাবে নেওয়া হয়েছে ছবিটা তার ওপর নির্ভর করে লোকের চেহারা পুরোপুরি পালটে যায় অনেক সময়। মেয়েটা বলছে যে আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বয়েসি ওর এক ভাই আছে যার সঙ্গে বহুকাল দেখা হয়নি। আমিও তো হতে পারি সেই ভাই—একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

ওর বুকের দিয়ে চেয়ে থাকি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঢেউ জেগে ওঠার মতো করে দুটো নিটোল শৃঙ্গ ওঠানামা করছে। কীভাবে যেন সমুদ্রের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর আলতো করে বৃষ্টি নেমে আসার কথা মনে পড়লো আমার। ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে আমিই একমাত্র সমুদ্রযাত্রী, আর মেয়েটা যেন সমুদ্র। আকাশটা যেন ধূসর একটা কম্বল, ধূসর সমুদ্রের সঙ্গে দিগন্তে মিশে যাচ্ছে। আকাশ আর সমুদ্রকে আলাদা করা যাচ্ছে না। সমুদ্রযাত্রী আর সমুদ্রে কোনো ফারাক নেই। বাস্তবে আর হৃদয়ের সৃষ্টিতে।

মেয়েটার আঙুলে দুটো আংটি, একটাও বিয়ের কিংবা বাগদানের আংটি নয়, সস্তার আংটি, মেয়েরা যেসব সাজের দোকানে কেনাকাটা করে, সেখানে পাওয়া যায়। আঙুলগুলো সরু আর বেশ দীর্ঘ কিন্তু দেখে মনে হয় সবল, নখগুলো দীর্ঘাকৃতি নয়, ছোট করে কাটা আর তাতে হালকা গোলাপি নেল-পলিশ। মিনিস্কার্ট থেকে বেরিয়ে আসা উরুর ওপরে হাত দুটো আলতো করে রাখা। হাত দুটো ছুঁতে খুব ইচ্ছে করছে, ছোঁব না যদিও কিছুতেই। ঘুমের মধ্যে মেয়েটাকে শিশুর মতো লাগছে। একটা ছুঁচলো কান কয়েক গাছা চুলের মধ্যে দিয়ে মাশরুমের মতো উঁকি মারছে, আশ্চর্য রকমের পাতলা।

বইটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ সরে সরে যাওয়া বাইরের দৃশ্য দেখলাম তাকিয়ে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, কিছু বোঝার আগেই, নিজেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগের গোয়েন্দা (MIS) রিপোর্ট
তাং: ১২ই মে, ১৯৪৬
বিষয়: রাইস-ব্যোল পাহাড়ের ঘটনার রিপোর্ট, ১৯৪৪
নথি নং: PTYX-722-8936745-42216-WWN

নিচের সাক্ষাৎকারটি শ্রী নাকাজাওয়া জুইচির, ঘটনার সময়ে উনি *** শহরে চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস করতেন। সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হয়েছে। এই সম্পর্কিত যাবতীয় নথিপত্র সন্ধান করার জন্য কোড নম্বর হচ্ছে, PTYX-722-SQ-162 থেকে 183 ।

প্রশ্নকর্তা লেফটেন্যান্ট রবার্ট ও'কোনরের মন্তব্য : <ডাঃ নাকাজাওয়ার শরীরের পুষ্ট হাড় ও রোদে পোড়া মুখ দেখে চিকিৎসকের চেয়েও কৃষিশ্রমিক বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ধীরস্থির আচরণ কিন্তু কথাবার্তায় চটপটে এবং গুছিয়ে কথা বলেন। মনে যা আছে তা সরাসরি মুখে বলেন। চশমার পেছনে উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ। স্মৃতিশক্তি, মনে হয় বেশ নির্ভরযোগ্য।>

হ্যাঁ, আমি ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ সকাল এগারোটার পরে শহরের পাবলিক স্কুলের আসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাইয়ের থেকে ফোনে একটা কল পাই। আগে থেকেই আমি এই স্কুলের দায়িত্বে থাকা ডাক্তার ছিলাম বলে আমার সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করেন ওঁরা। বেশ ভালোরকম দিশেহারা অবস্থা ওখানে তখন।

শুনলাম যে কোনো একটা ক্লাসের সবাই মিলে পাহাড়ে মাশরুম কুড়োতে গিয়ে সেখানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। একেবারেই অচৈতন্য। একমাত্র যে শিক্ষয়িত্রীর ওপর এদের নেতৃত্ব ও দেখাশুনোর ভার ছিল, তাঁর জ্ঞান আছে, এদের উদ্ধার করার উপায় বের করতে তিনি পাহাড় থেকে নেমে তক্ষুণি স্কুলে ফিরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসেছেন। কিন্তু তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে তার কাছ থেকে সব শুনেও ঠিক যে কী হয়েছে, পরিস্থিতি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এইটুকু নিশ্চিত যে পাহাড়ে এখনও ষোলোটি শিশু অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

যেহেতু মাশরুম কুড়োতে গিয়েছিল, আমি প্রথমে ভাবলাম বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে ফেলে স্নায়ু অসাড় হয়ে গেছে কি না। তা হলে তো ভয়ানক ব্যাপার। মাশরুম নানা রকমের, একেকটায় একেকরকম বিষ, ফলে তার চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন। আমরা অবিলম্বে যেটা করতে পারি সেটা হল পেটের ভেতরের যাবতীয় কিছু বমি করিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা। কিন্তু বিষ যদি তীব্র হয়, আর যদি হজম প্রক্রিয়া অনেকটা এগিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর তেমন করার কিছু নেই। এই অঞ্চলে প্রত্যেক বছরই কয়েকজন করে মাশরুম খেয়ে প্রাণ হারায়। আমি তৎক্ষণাৎ জরুরি পরিস্থিতিতে কাজে দেয় এরকম ওষুধপত্র ব্যাগে ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে সাইকেলে চড়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। ততক্ষণে খবর পেয়ে দুজন পুলিশও এসে গেছেন স্কুলে। বাচ্চারা অজ্ঞান হয়ে থাকলে শহর অবধি তাদের তো বয়ে আনতে হবে, সেই কাজে লোক দরকার। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেটা, অল্পবয়সী পুরুষমানুষ অধিকাংশই মিলিটারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি আর সেই দুজন পুলিশ, বয়স্ক একজন শিক্ষক, অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টারমশাই ও হেডমাস্টারমশাই, স্কুলের ঝাড়ুদার আর তার সঙ্গে ঐ ক্লাসের ভারপ্রাপ্তা সেই অল্পবয়সী শিক্ষিকা, সবাই মিলে রওনা দিলাম পাহাড়ের দিকে। যেক'টা সাইকেল ছিল সেগুলোতে চড়ে বসলাম সকলে, যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল না বলে কেউ কেউ একেকটা সাইকেলে দুজন করে চাপলো।

জঙ্গলের মধ্যে সেই জায়গাটায় ক'টা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলেন?

পৌঁছেই ঘড়িতে সময় দেখে নিয়েছিলাম বলে এখনও ভালমতই মনে আছে। ঠিক এগারোটা পঞ্চান্নতে। পাহাড়ে ঢোকবার মুখটায় যতদূর যাওয়া যায় আমরা সাইকেলেই গিয়েছিলাম, তারপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাহাড়ে ওঠার রাস্তা ধরে ধেয়ে যাব ঠিক করে চড়তে শুরু করলাম।

আমরা যতক্ষণে গিয়ে পৌঁছেছি, কয়েকটি শিশু ততক্ষণে খানিকটা জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে। তা, কতজন হবে? তিন কি চারজন হবে। উঠে বসেছে বলছি বটে, জ্ঞান তখনো পুরোটা ঠিকমত ফেরেনি, টলতে টলতে শরীরটাকে তুলে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো মাটিতে চার হাত পায়ে ভর করে যেন বসে আছে। বাকি বাচ্চারা মাটিতে তখনো লুটিয়ে পড়ে আছে। তবে তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার, জ্ঞান ফিরে আসবে আসবে, মোড়ামুড়ি দিয়ে নড়তে শুরু করেছে, বড় সাইজের পোকার মত দেখতে লাগছিল। সে এক অতি বিচিত্র দৃশ্য। শিশুরা লুটিয়ে পড়ে আছে, জঙ্গলের মাঝখানে অদ্ভুত সমতল একটা ফাঁকা জায়গা, যেন শুধু ঐ জায়গাটুকুই কেটে সাফ করা হয়েছে, আর সেখানে শরতের উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে। আর তার মাঝখানে কিংবা আশেপাশে ষোলোজন প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চা একেকজন একেক ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। কেউ নড়ছে, কেউ একেবারে স্থির। একেবারে আধুনিকতম কোনো নাটকের দৃশ্যের মতো দেখাচ্ছিল।

ডাক্তার হিসেবে আমার করণীয় ভুলে, ঢোঁক গিলে, আমি স্থাণুবৎ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। একা আমিই শুধু না। যারাই হাজির, তারা সকলেই অল্পবিস্তর চলচ্ছক্তিহীন অবস্থার কবলে পড়ে দাঁড়িয়েছিল ঘন্টাখানিক। একটু অদ্ভুত শোনাবে হয়তো, মনে হচ্ছিল যেন সাধারণ মানুষের এরকম কিছু চোখেই পড়ার কথা নয়, কোনোরকম ভ্রান্তিবশতঃ এরকম একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যুদ্ধের সময়, তাই জায়গাটা মফস্বলের দিকে হলেও আমরা সবসময়েই চিকিৎসক হিসেবে কাজে নেমে পড়তে প্রস্তুত থাকতাম। যা-ই ঘটুক না কেন, নিজের কর্তব্য পালন করতে না পেরে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যর্থ হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু সেই দৃশ্য আমাকে আক্ষরিক অর্থেই হিমশৈলের মতো স্থাণুবৎ করে দিল।

তবে অবিলম্বে আমি সামলে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়া বাচ্চাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একজনকে জড়িয়ে ধরে তুললাম। বাচ্চা মেয়ে একটি। শরীরে এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই, কাপড়ের পুতুলের মতো শিথিল হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত, কিন্তু জ্ঞান নেই। অথচ চোখ স্বাভাবিক ভাবেই খোলা, ডানে বাঁয়ে নড়ে কী যেন দেখছে। আমি ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে চোখের মণিতে আলো ফেললাম। কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। চোখ কাজ করছে, কী যেন দেখছে অথচ আলোতে সাড়া দিচ্ছে না। অলৌকিক ব্যাপার! আমি একাধিক বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে উঠিয়ে একই পরীক্ষা করে দেখলাম, সকলেরই এক প্রতিক্রিয়া।

এরপর আমি বাচ্চাদের নাড়ির গতি আর শরীরের তাপমাত্রা মেপে দেখলাম। নাড়ির স্পন্দন গড়ে কমবেশি ৫০ থেকে ৫৫, শরীরে তাপমাত্রা সকলেরই ৩৬ ডিগ্রীর নিচেই দেখাছে। সাড়ে পয়ত্রিশ মতোই ছিল বোধহয়। আর, হ্যাঁ, ঐ বয়সি বাচ্চাদের পক্ষে নাড়ির স্পন্দন একটু ধীরই, তাপমাত্রাও এক ডিগ্রী মত কম। শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘ্রাণ নিয়ে দেখলাম, অস্বাভাবিক গন্ধ কিছু পেলাম না। গলায় কিংবা জিভেও কোনও পরিবর্তন নেই। খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম, কেউই বমিটমি করেনি। পায়খানা টায়খানাও কেউ করে ফেলেনি। কারুর কোনো কষ্ট নেই। খারাপ কিছু খেয়ে ফেললে, এতটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে এই তিনটের মধ্যে একটা অন্তত হবেই। বিষক্রিয়া খুব সম্ভবত নয় বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তবে ভয়ংকর অশুভ কিছু ঘটে থাকলে সেটা একেবারেই আমার ধারণার বাইরে। একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই একেবারে সংক্রামক অসুখের মতো আশেপাশের যাবতীয় বাচ্চা একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অথচ সময়টা নভেম্বর মাস। তার ওপর আবার বনের ভেতর ঠান্ডা আবহাওয়ায়। একজন দুজন হলে তবু একরকম, একেবারে ষোলোটি বাচ্চার সকলেরই ওরকম একটা জায়গায় সানস্ট্রোক হল, এও ভাবা সম্ভব নয়।

এরপরে আর ভাবা যায়, গ্যাস। বিষাক্ত গ্যাস, সম্ভবত নার্ভগ্যাস ধরণের কিছু। প্রাকৃতিক গ্যাস হতে পারে, আবার কৃত্রিমভাবে তৈরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিছুও হতে পারে। লোকালয় থেকে এতটা দূরে বনের মধ্যে গ্যাস এল কী করে তা অনেক ভেবেও কিছু কূলকিনারা করতে পারলাম না। তবে আপাতত যদি ধরে নিই যে এর কারণ বিষাক্ত গ্যাস, তবেই একমাত্র এরকম একটা পরিস্থিতির অন্ততপক্ষে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খাড়া করা যায়। সবাই বাতাসের সঙ্গে সেই জিনিসের শ্বাস নিয়ে ফেলে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সঙ্গের দিদিমণির যে কিছু হয়নি তার কারণ হয়তো, গ্যাসের ঘনত্ব কম ছিল আর পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে কোনোক্রমে তা সহ্য হয়েছে।

এখন তবে কী চিকিৎসা করা ভাল, তার কূলকিনারা করা মুশকিল। আমি নেহাতই মফস্বলের ডাক্তার, বিশেষ বিশেষ ধরণের বিষাক্ত গ্যাসের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতো জ্ঞান তো নেই। একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা হল। এদিকে, পাহাড়ের মাঝখানে যে ফোন করে কোনো বিশেষজ্ঞের থেকে পরামর্শ চাইব তারও উপায় নেই। আরেকটা সত্যিকারের সমস্যা হল, বাচ্চাদের কয়েকজন একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে, আরো খানিক সময় গেলে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান ফিরে আসবে কিনা তাও তো জানিনা। পুরোটাই একটা খুব আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঠিকই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, অন্যরকম কিছু ঠিক ভেবে উঠতে পারলাম না। সুতরাং ঠিক হল যে এখন কিছুক্ষণ ওখানেই শুয়ে বিশ্রাম নিক ওরা, তারপর, পরিস্থিতি কী হয় দেখতে হবে।

আশেপাশের বাতাসে একটু অন্যরকম কিছু টের পেয়েছিলেন কি?

সেটা আমারও মনে এসেছিল বলে, কোনো রকম গন্ধ যা সচরাচর পাওয়া যায় না, পাচ্ছি কিনা দেখতে আমি বাতাসে বেশ ক'বারই গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে দেখলাম। কিন্তু দেখলাম যে নেহাতই পাহাড়ের মাঝখানে বনের বাতাস যেমন হয় তেমনটাই। গাছপালার গন্ধ। তাজা বাতাস। ফুলের গাছটাছেও অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেলাম না। একটু অন্যরকম আকার বা অন্যরকম রঙ, এরকম জিনিসও চোখে পড়ল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বাচ্চারা যেসব মাশরুম তুলে ছিল সেগুলোকে একটা একটা করে বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। মনে হল, কুড়োতে শুরু করে, অল্পক্ষণের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল হয়তো। একেবারেই, সচরাচর খাওয়া হয় যে মাশরুম, সেই জিনিস। এই এলাকায় বহুদিন ডাক্তারি করছি বলে মাশরুমের প্রকারভেদ বেশ ভাল করেই জানা আছে। মন দিয়ে সেগুলো জড়ো করে ফেরার পথে সঙ্গে করে এনে, পরে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার যা মনে হয়েছিল সেরকমই, বিষটিষ ছিল না, সবগুলোই সাধারণ মাশরুম।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলা বাচ্চাদের ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করছি, চোখের মণি ডাইনে বাঁয়ে করতে থাকা ছাড়া অন্য কোনোরকম অস্বাভাবিক উপসর্গ বা প্রতিক্রিয়া কি ছিল না? যেমন ধরুন, চোখের মণি বড় হয়ে যাওয়া বা চোখের সাদা অংশের রঙ, অথবা চোখের পলক দ্রুত পড়ছিল, না কি ধীরে, এইসব?

না, চোখের মণি সার্চলাইটের মতো ডাইনে বাঁয়ে সরতে থাকা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। আর সবকিছু একেবারে ঠিকঠাক কাজ করছিল। বাচ্চারা কিছু একটা দেখেই যাচ্ছিল। আরো সঠিক ভাবে বললে বলতে হয়, দেখে মনে হচ্ছিল বাচ্চারা, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা না দেখে, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি না সেরকম কিছু দেখছিল। নাহ্, কিছু একটা দেখার চেয়েও বরং পর্যবেক্ষণ করছিল বললেই আরেকটু কাছাকাছির একটা ধারণা হবে হয়তো। মুখে কোনো অভিব্যক্তি ছিল না বটে, কিন্তু বেশ একটা প্রশান্তির ছাপ ছিল সকলেরই, কোনো কষ্ট অথবা ভয়ের চিহ্নমাত্র নজরে পড়েনি। ওরা ওখানেই ঐ অবস্থায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় যে দেখতে চেয়েছিলাম তার পেছনে এগুলোও কারণ হিসেবে কাজ করছিল। ঠিক সেই মূহূর্তে কোনো কষ্ট যখন হচ্ছে না, কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকলে ক্ষতি নেই বলে মনে হয়েছিল।

গ্যাস যে একটা কারণ হতে পারে সেই ব্যাপারে কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হ্যাঁ। করেছিলাম। কিন্তু আমার মতোই কারুরই তেমন ধারণা নেই। পাহাড়ে গিয়ে কারুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকে গেছে এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি। ওখানে, যদ্দূর মনে পড়ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাই বললেন যে অ্যামেরিকান সৈন্যরা ঐ গ্যাস ছড়িয়ে গেছে কি না কে জানে। বিষাক্ত গ্যাসের বোম ফেলে গেছে কি না। সে কথায়, ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন যে দিদিমণি তিনি বললেন যে পাহাড়ে ঢোকার আগেটায় B29 প্লেনের মতো দেখতে কী একটা, আকাশে দেখেছিলেন। ঠিক এই পাহাড়ের সরাসরি ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। ঐটাই কিনা কে জানে, সকলে সমস্বরে বলে উঠলো। অ্যামেরিকান মিলিটারির আবিষ্কার করা নতুন ধরণের কোনও বোম কিনা কে বলতে পারে। অ্যামেরিকান সৈন্যবাহিনী যে নতুন একধরণের বোম তৈরি করছে এরকম একটা গুজব আমরা যেখানে থাকতাম সেই এলাকায় ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এরকম একটা জিনিস এতদূর পর্যন্ত বয়ে এনে এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ের মধ্যে কেন ফেলতে হবে সেটা অবশ্য কারো জানা নেই। কিন্তু ভুল হওয়া বলে একটা জিনিসও তো পৃথিবীতে আছে, কী হতে পারে আর কী পারে না, কেউ বলতে পারে না।

তারপর বাচ্চারা একটু একটু করে ফের স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগলো, তাই না?

মোটামুটি সেরকমই। কী যে স্বস্তি হল, কী বলব। একেবারে প্রথমে বাচ্চারা খানিক মোড়ামুড়ি দিয়ে তারপর টলতে টলতে উঠে বসলো এবং একটু একটু করে হুঁশ ফিরে পেল। এটা যখন ঘটছে তখন কারো কোনো কষ্ট হচ্ছে এমন আভাস কিন্তু দেয়নি। খুবই শান্তভাবে, যেন গভীর ঘুম থেকে স্বাভাবিক ভাবে জেগে উঠছে এইভাবে হুঁশ ফিরে পাচ্ছিল। হুঁশ ফিরে পাওয়ার সঙ্গেই চোখের দৃষ্টিও ক্রমে ক্রমে ফের ঠিকঠাক হয়ে আসছিল। পকেট টর্চ দিয়ে চোখের মণিতে আলো ফেলতেই একদম স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তবে মুখে কথা ফুটতে খানিকটা সময় লেগে গেল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠার পর লোকের যেমনটা হয় একেবারে সেইরকম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যারা হুঁশ ফিরে পেয়েছে, আমরা এবার একেক করে তাদের কাছে গিয়ে আদৌ কী হয়েছিল সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলাম। কিন্তু তারা সকলেই কেমন হতভম্ব হয়ে রইল। যেন যা একেবারেই স্মরণে নেই সেই নিয়ে জেরা করা হচ্ছে। পাহাড়ে এই জায়গাটায় এসে সকলে মাশরুম তুলতে শুরু করেছিলো অবধি বাচ্চারা মোটামুটি মনে করতে পারছে। কিন্তু তার পরে কী হল, সেই স্মৃতি মুছে গেছে। সময় যে তারপর অনেকটা কেটে গেছে সেই বোধটুকুও নেই। মাশরুম তুলতে শুরু করে, তারপর সেখানেই যেন যবনিকা পড়ে গেল, পরের দৃশ্যে আমরা বড়োরা ওদের ঘিরে রয়েছি আর ওরা মাটিতে শুয়ে আছে। আমরা কেন ওরকম উৎকণ্ঠিত মুখে হৈচৈ বাঁধিয়ে তুলেছি বাচ্চারা সেটা একেবারেই বুঝতে পারেনি, উল্টে বরং আমাদের উপস্থিতিতে ঘাবড়েই গেছে বলে মনে হচ্ছিল।

তবে, দুঃখের বিষয়, ওদের মধ্যে একজনের শুধু, একটা বাচ্চা ছেলের, কিছুতেই জ্ঞান ফিরে এল না। টোকিও থেকে সরিয়ে আনা বাচ্চাদের একজন, নাম বললো, নাকাতা সাতোরু। এই নামই বলেছিল বলে মনে পড়ছে। ছোটখাটো ফর্সা একটা ছেলে। এই বাচ্চাটা কিছুতেই হুঁশ ফিরে পেল না। মাটিতে শুয়ে চোখের মণি ডাইনে বাঁয়ে নাড়াতেই থাকলো। আমরা ওকে কাঁধে করে বয়ে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলাম। অন্য বাচ্চারা যে যার পায়ে হেঁটে পাহাড় থেকে নেমে এল, যেন কিছুই হয়নি।

ঐ নাকাতা নামের বাচ্চাটিকে বাদ দিলে, অন্য বাচ্চাদের মধ্যে কি আর এরপরে কোনোওরকম উপসর্গ দেখা যায় নি?

হ্যাঁ, খালি চোখে ধরা পড়ে এরকম অস্বাভাবিক কিছু একেবারেই দেখা যায়নি। স্কুলে ফিরে আসার পর, সবাইকে রোল নাম্বার ধরে ধরে স্কুলেই ডাক্তারের চেম্বারে ডেকে নিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে, স্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্টের আওয়াজ শুনে, অনুভূতির ক্ষমতা পরীক্ষা করে, সেই মূহূর্তে যা কিছু পরীক্ষা করে দেখা যায় সব করে দেখলাম। সহজ পাটিগণিতের ক্যালকুলেশন করালাম, চোখ বন্ধ করে একপায়ে দাঁড় করিয়ে দেখলাম। কিন্তু সকলেরই শরীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একেবারে ঠিকঠাক কাজ করছে বলে দেখা গেল। তেমন শারীরিক অবসাদও দেখা গেল না। খিদেও ছিল। দুপুরের খাওয়াটা হয়নি বলে খিদে পেয়েছে বলেও বলছিল। তখন নিগিরি-মেশি[†] এনে দেওয়াতে সকলে এমনভাবে খেল যে একটি দানাও পড়ে রইলো না।

মনটা ওতেই পড়েছিল বলে এর কয়েকদিন পরেই আমি আবার স্কুলে গিয়ে মুখ দেখালাম। সেই ঘটনার মুখোমুখি হওয়া বাচ্চাদের অবস্থা সরেজমিনে একটু দেখে আসতে। কয়েকজনকে ডাক্তারের ঘরে ডেকে নিয়ে খুব সাধারণ কিছু কথাবার্তা একটু অন্তরঙ্গ ভাবে বলে দেখলাম। কিন্তু মোটেই কোন বিচ্যুতি চোখে পড়লো না। ওদের শরীরে, মনে এতটুকু ছাপ ফেলে নি ব্যাপারটা। ওরকম একটা ব্যাপার যে ঘটেছিল তা যেন এমনকি মনেও আনতে পারছে না। বাচ্চারা আবার প্রাত্যহিক রুটিনে ফিরে এসে কোনোরকম হেরফের ছাড়াই আগের মতো জীবন যাপন করছে। ক্লাসে হাজির থাকছে, গান গাইছে, বিরতির সময়টায় মহা উদ্যমে স্কুলের মাঠ চক্কর দিচ্ছে দৌড়ে। বিপরীতে, ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন যে ক্লাস-টিচার, সেই দিদিমণি কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে তখনও খুব শক্‌ড হয়ে রয়েছেন। কেবল নাকাতা বলে সেই বাচ্চা ছেলেটির জ্ঞান এক রাত কেটে যাওয়ার পরেও না ফেরায় পরের দিন শহরের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তার অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য তাকে মিলিটারির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। যাই হোক না কেন, এই শহরে তার আর দ্বিতীয়বার ফেরা সম্ভব হয়নি। সেই বাচ্চাটার কী হল, শেষ অবধি আমাদের আর তা জানানোও হয়নি।

পাহাড়ে গিয়ে বাচ্চারা যে দলবদ্ধভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সেই ঘটনা আর খবরের কাগজে বেরোয়নি। সম্ভবত মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে এই বিবেচনায় কর্তৃপক্ষই খবরটা বের করার অনুমতি দেয়নি। তখন যুদ্ধ চলছে, মিলিটারি সেই সময় যে কোনো গুজবের ব্যাপারে অসম্ভব নার্ভাস হয়ে আছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি খুব অনুকূল নয়, এমনকি দেশের দক্ষিণাঞ্চলেও পিছু হটে আসা, মর্যাদা বজায়

[†] নিগিরি-মেশি হচ্ছে মুঠো করে তৈরি ভাতের দলা

থাকতে থাকতে আত্মহনন এসব অব্যাহত রয়েছে, মার্কিনসেনা শহরাঞ্চলেও বোমাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। এইসব কারণে অসামরিক নাগরিকদের মধ্যে যুদ্ধবিরোধিতা ও যুদ্ধবিমুখতার প্রবণতা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় থাকতো ওরা। এই ঘটনা সম্পর্কিত কোনোরকম অপ্রয়োজনী কথা মুখ ফস্কে যাতে বলে না ফেলি, সেই মর্মে টহলদার পুলিশ এসে আমাদের জোরালো সতর্কবার্তা দিয়ে গেল কয়েকদিন বাদেই।

যাই হোক, প্রকৃতই রহস্যাবৃত একটা অঘটনের বিস্বাদ স্মৃতি রয়ে গেল। বলা উচিত, আমার বুকে এখনও একটা ভার হয়ে চেপে আছে এই ঘটনাটা।

~ www.amarboi.com ~

৫

বাস যখন স্থলভাগে ঢুকে আসা সমুদ্রের ওপর দিয়ে বিশাল নতুন ব্রিজটা পার হচ্ছিল, আমি তখন ঘুমোচ্ছি। এর আগে শুধু ম্যাপে দেখেছি ব্রিজটা আর সেই থেকেই অপেক্ষা করে আছি আসলটা দেখব বলে। কেউ একটা আলতো করে আমার কাঁধে টোকা দিল আর আমি জেগে গেলাম।

"আমরা এখন এখানে," মেয়েটা বলল।

আড়মোড়া ভেঙে, হাতের পেছনটা দিয়ে চোখ ডলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বোঝাই যাচ্ছে যে বাসটা এখন গিয়ে ঢুকছে একটা জায়গায়, যেটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো স্টেশনের সামনে একটা চত্বর। সকালের সজীব সূর্যালোকে চারদিক আলো হয়ে গেল। প্রায় চোখ ধাঁধানোর মতো হলেও, কিছুটা যেন চোখ সওয়া, টোকিওতে যেমন আলোতে আমি অভ্যস্ত তার চেয়ে কিন্তু অন্যরকম। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ৬:৩২।

"উফ্, যাচ্ছি তো যাচ্ছিই," ক্লান্তভাবে বলল মেয়েটা। "প্রথমে ভেবেছিলাম কোমরটার জন্য পারবো না। এখন ঘাড়ের জন্য শেষ হয়ে যাচ্ছি। সারারাতের বাসে আর আমাকে কেউ নিতে পারবে না। এরপর থেকে প্লেনে, যতই খরচ পড়ুক। ঝাঁকুনি, হাইজ্যাক— যা খুশি হোক না কেন। প্লেন হলেই হবে।"

মাথার ওপরের তাক থেকে ওর স্যুটকেস আর আমার ব্যাকপ্যাক নামিয়ে আনলাম। "তোমার নাম কী?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার নাম?"

"হ্যাঁ।"

"সাকুরা," মেয়েটা জানায়। "আর তোমার নাম?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তামুরা কাফকা," আমি উত্তর দিই।

"তামুরা কাফকা," একবার আউড়ে নেয়। "বিচিত্র নাম। যদিও, মনে রাখা সহজ।"

আমি সম্মতি জানিয়ে সামনে মাথা ঝোঁকাই। একেবারে অন্য একজন লোক হয়ে যাওয়া হয়তো সহজ নয়, কিন্তু অন্য নাম নেওয়া তো ছেলেখেলা।

বাস থেকে নেমে মেয়েটা স্যুটকেসটাকে মাটিয়ে নামিয়ে রাখে আর তারপর নিজে বসে পড়ে ওটার ওপর। ঘাড়ে ঝোলানো ছোট ব্যাক্‌প্যাকের পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কিছু একটা লেখে, তারপর পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। একটা ফোন নাম্বার, অন্তত দেখে তো তাই মনে হল।

"আমার মোবাইল-নম্বর," ভুরু দুটো কপালে তুলে, মুখের ভাব সিরিয়াস করে আমায় বলে। "বন্ধুর ওখানে ক'দিন থাকবো আমি, কখনো কারুর সঙ্গে দেখা করতে মন চাইলে আমাকে একটা কল দিও। আমরা গিয়ে বাইরে কোথাও খাওয়াদাওয়া করতে পারি বা ওরকমই কিছু। যেন কখনো পরিচয়ই হয়নি এমনটা কোরো না, কেমন? 'আলাপ যদি দৈবাৎও'... এর পরেরটুকু যেন কী?"

"'কর্ম নির্ধারিত'।"

"ঠিক, ঠিক," ও বলে ওঠে, "কিন্তু মানেটা কী?"

"অর্থাৎ জীবনের সবকিছুই আগের সব জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এমনকি সবচেয়ে ছোটখাটো ঘটনার ক্ষেত্রেও কো-ইনসিডেন্স বা নেহাতই আপতিক বলে কিছু হয়না।"

হলুদ স্যুটকেসের ওপরে বসে, নোটবুক হাতে, এটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। "হুমম... বেশ একটা দার্শনিক ব্যাপার না? ভাবনা হিসেবে নেহাত মন্দ নয়। কী বলা যায়, রিইনকারনেশন? খানিক নিউ এজ গোছের ব্যাপারও আছে, তাই না? তা ভাই তামুরা কাফকা, এগুলো মনে রেখো। আমি সহজে আমার মোবাইলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নম্বর কারুকে দিই না, জান তো। বুঝলে, কী বলতে চাইলাম?"

ধন্যবাদ, আমি বলি। ফোন-নম্বর লেখা কাগজটা একবার ভাঁজ করে উইন্ড-চীটারের† পকেটে ঢোকাই। তারপর কী মনে করে মানিব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখি।

"তুমি কবে অবধি আছো তাকামাৎসুতে?" সাকুরা জানতে চায়। এখনো জানি না,আমি বলি। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রোগ্রাম পালটে যেতে পারে ভেবে।

ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মাথা ঝোঁকায়। যেন বলতে চায়, আচ্ছা বেশ। তারপর ট্যাক্সিতে চড়ে বসে, হাতটা সামান্য নাড়তে নাড়তে কোথাও চলে যায়। আমি এবার আবার একা। মেয়েটার নাম সাকুরা, আমার দিদির নাম নয়। তবে কিনা নাম তো সহজেই পালটানো যায়। বিশেষ করে মানুষ নিজেকে কারুর থেকে লুকিয়ে রাখবে মনস্থ করলে তো বটেই।

আমি আগে থেকেই তাকামাৎসু শহরের ভেতরে বিজনেস-হোটেলে ঘর বুক করে রেখেছিলাম। টোকিওর ওয়াইএমসিএ-তে ফোন করেছিলাম, ওরা ঐ হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। ওয়াইএমসিএ-র মাধ্যমে গেলে অনেক কম পয়সায় হয়ে যায়। তবে এই সুবিধে মাত্র প্রথম তিন রাত্তিরের জন্য, তারপর থেকে পুরো চার্জ পে করতে হয়।

পয়সা বাঁচাব ভাবলে স্টেশনের কোনো বেঞ্চে শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। তেমন ঠান্ডা নেই, কোনো পার্কে গিয়ে সঙ্গের স্লীপিং-ব্যাগটা পেতে শুলেও চলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে, পুলিশের নজরে পড়ে গেলে নির্ঘাত এসে পরিচয় পত্র বা আই-ডি দেখাতে বলবে। এই একটি পরিস্থিতির আমি কিছুতেই মুখোমুখি হতে চাইনি। ফলে আপাতত প্রথম তিনদিনের জন্য হোটেলই বুক করেছি। এরপর কী হবে তা পরে ভাবলেও চলবে।

স্টেশনের কাছেই একটা উদোনের†† দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে নেব। চারপাশে চোখে বুলিয়ে যেটা চোখে পড়বে সেটাতে ঢুকলেই হবে। টোকিওতে জন্মে ওখানেই বেড়ে উঠেছি বলে উদোন খাওয়ার

†জাপানে অবশ্য উইন্ড-ব্রেকার কথাটা বেশি চালু।

††একধরণের নুডল, কিন্তু সরু সরু নয়, মোটা একটা দড়ির মতো, স্যুপের মধ্যে থাকে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

অভ্যাস খুব একটা নেই। কিন্তু এই উদোন আলাদা, আমার এখন অবধি খাওয়া উদোনের মতো নয়। এগুলো টাটকা, চিবিয়ে আরাম আর স্যুপের দারুন সুবাস। দামও আশ্চর্যরকম কম। খেতে খুব ভাল লাগলে আরো নেব। অনেকদিন পরে পেটটা বেশ ভালরকম ভরে মনও থাকবে ভাল। এরপর স্টেশনের সামনের খোলা জায়গাটায় বসে পরিস্কার আকাশ দেখব। আমি এখন স্বাধীন। এখানে যতদিন আছি, আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘের মতোই একা এবং স্বাধীন।

সন্ধ্যে অবধি সময়টা লাইব্রেরিতে কাটিয়ে আসতে হবে। তাকামাৎসু ও তার আশেপাশের লাইব্রেরি সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। একেবারে ছোটবেলা থেকে আমি চিরকাল লাইব্রেরির রীডিংরুমে সময় কাটিয়ে এসেছি। বাড়িতে আর ফিরতে না চাইলে ছোট বাচ্চার যাওয়ার মতো জায়গা আর কোথায়? চায়ের দোকানেও সে ঢুকতে পায়না, সিনেমা হলেও না। রইলো তবে একমাত্র লাইব্রেরি। প্রবেশমূল্য নেই, বাচ্চা ছেলে একা এসে ঢুকলেও কেউ আপত্তি করে না। চেয়ারে বসে পছন্দমতো বই পড়ে যাও। স্কুল থেকে ফিরেই আমি সাইকেলে করে কাছেপিঠে ঐ মহল্লার সরকারি লাইব্রেরিতে চলে যেতাম। ছুটির দিনেও অধিকাংশ সময় ওখানে একা একাই কাটিয়ে আসতাম। নানা উপকথা, উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, হাতের কাছে যা পাওয়া যেত ওখানে, পড়তে থাকতাম। বাচ্চাদের বইগুলো একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতাম, সবরকমের বই যেখানে পাওয়া যায় সেই জেনারেল সেকশনে গিয়ে বড়দের বই পড়তাম। ভাল বুঝতে পারছি না এরকম বইও কোনোক্রমে একেবারে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে যেতাম। বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, পেড-ফোনের কোনো বুথে গিয়ে বসে গানটান শুনতাম। গান বাজনা সম্বন্ধে একেবারে কোনো জ্ঞানই ছিল না বলে, ওখানে যা কিছু আছে, ডানদিক থেকে শুরু করে একে একে ক্রমানুসারে শুনতে থাকতাম। এইভাবে আমি ডিউক এলিংটন, বীটলস, লেড জেপেলিন, এঁদের মিউজিকের পরিক্রমা করে ফেললাম।

লাইব্রেরিই ছিল আমার দ্বিতীয় বাড়ি। সত্যি বলতে কি, বরং লাইব্রেরিটাই সম্ভবত ছিল আমার ক্ষেত্রে একেবারে নিজের বাড়ি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রত্যেকদিন যাতায়াত করতে করতে লাইব্রেরিয়ান মহিলাদের সঙ্গে ভালরকম মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল। ওঁরা আমার নাম জানতেন, মুখোমুখি হয়ে গেলে সম্ভাষণ করে স্নেহভরে কিছু বলতেন (যদিও আমি এমনই ভয়ানক লাজুক ছিলাম যে ঠিকমতো উত্তরও দিতে পারতাম না)।

তাকামাৎসুর শহরতলিতে, এক বনেদি বংশীয় পয়সাওয়ালা ব্যক্তি নিজেদের বাড়ির লাইব্রেরি সংস্কার করে, বাড়িয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার লাইব্রেরি বানিয়েছেন। বেশ বিরল বইয়ের সংগ্রহও আছে সেখানে, স্থাপত্য, বাগান, সবই চেয়ে দেখার মতো। এই লাইব্রেরির ফটো আমি "তাই-ইয়ো" (সূর্য) পত্রিকায় দেখেছি। সাবেক আমলের বিশাল জাপানি স্টাইল বাড়ি, বৈঠকখানা ঘরের মতো সুন্দর রীডিংরুম, বেশ আরামদায়ক সোফায় বসে লোকেরা বই পড়ছিল সেই ছবিতে। ছবিটা দেখা মাত্র আমার মনে এক অস্বাভাবিক রকম আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। কখনো সুযোগ পেলেই আমি যে করে হোক দেখতে যাব বলে মনস্থ করে রেখেছিলাম। লাইব্রেরির নাম কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগার।

স্টেশনের ট্যুরিস্ট গাইডেন্স ডেস্কে গিয়ে কোওমুরা লাইব্রেরি কোথায় খোঁজ করি। কাউন্টারের মধ্যবয়স্ক সহৃদয় মহিলাটি ট্যুরিস্ট-ম্যাপ দিলেন একটা, তাতে লাইব্রেরির জায়গাটাতে একটা x দেগে দিলেন, ট্রেনে কীভাবে উঠতে হবে সেটাও বলে দিলেন। গন্তব্য স্টেশনে ট্রেনে যেতে ২০ মিনিট মাত্র লাগে। আমি শিষ্টতাসূচক ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশনের টাইম টেবিলটা দেখে নিলাম। মোটামুটি ২০ মিনিট অন্তর একটা করে ট্রেন যায়। ট্রেন আসতে আরো কিছু সময় বাকি আছে, তাই স্টেশনের একটা দোকান থেকে সাদামাটা রকমের লাঞ্চবক্স কিনে নিলাম দুপুরের খাওয়া হিসেবে।

দুই বগির ছোট্ট ট্রেন। রেললাইন কখনো যাচ্ছে শহরের প্রাণকেন্দ্রের সার সার বাড়ি পেরিয়ে, কখনো ছোট ছোট দোকান আর বসতবাড়ি মেশানো এলাকা দিয়ে, কখনো বা পার হয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরি আর গুদামের সামনে দিয়ে। কোথাও পার্ক, কোথাও বিরাট ম্যানসনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্থাপত্য। আমি জানালায় মুখ ঠেকিয়ে অচেনা জায়গার দৃশ্য মহা উৎসাহে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। সব কিছুই আমার চোখে একেবারে নতুন ঠেকছে। টোকিও ছাড়া অন্য শহরের দৃশ্য এখনও অবধি খুব একটা দেখা হয়নি আমার। সকালের ডাউন ট্রেন খাঁ খাঁ করছে ফাঁকা বটে, উলটো দিকের প্ল্যাটফর্মে দেখছি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গ্রীষ্মের ইউনিফর্ম পরা মিডল-স্কুল আর হাই-স্কুলের ছেলেতে ভরে গেছে। ওরা এখন স্কুলে যাবে। কিন্তু আমি না। আমি একা ওদের ঠিক বিপরীত অভিমুখে চলেছি। আমি ওদের থেকে পৃথক রেলে চেপেছি। কী যেন একটা হয়ে গেল এই সময়, বুকটা যেন কী এক আশঙ্কায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়লো। যেন হঠাৎ করে চারপাশের বাতাস পাতলা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো। আমি সত্যি সত্যিই ঠিক কাজ করছি তো? এরকম একটা চিন্তা এসে ভর করলে ভয়ানক দমিয়ে দেয়। আমি আর ওদের দিকে তাকাবোই না, মনস্থ করলাম।

রেললাইন সমুদ্রের ধার ঘেঁষে কিছুটা গিয়ে স্থলভাগের অভ্যন্তরে ঢুকে এল। ঘন ফলনের ভুট্টার ক্ষেত রয়েছে, আঙুরের বাগিচা, ঢালু জমি কাজে লাগিয়ে কমলা ফলান হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় জলসেচের জন্য পুকুর, সকালের সূর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। সমতলে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া নদীর জলের শীতল ছোঁয়ায় ফাঁকা জমি সব গ্রীষ্মের ঘাসে ছেয়ে গেছে। কুকুর রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রেন চলে যাওয়া দেখছে। এইসব দৃশ্য চোখ মেলে দেখতে দেখতে আমার মনেও খুশির ভাবটা একসময় ফিরে এল। সব ঠিক আছে, আমি বড় করে গভীর শ্বাস নিয়ে নিজের মনোবলটা বাড়িয়ে নিলাম। এভাবেই সামনে এগিয়ে যাওয়া এখন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে, যেমন বলে দেওয়া ছিল, যে রাস্তাটার দুপাশে সার সার পুরনো বাড়ি, সেইটে ধরে উত্তরমুখে হাঁটা দিতে হবে। যতদূর চোখ যায়, রাস্তার দুদিকেই প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে ফেন্সিং করা। এরকম অজস্র সংখ্যক নানা ধরণের ফেন্সিং জন্মে থেকে এই প্রথম দেখলাম। কালো রঙের বোর্ড ফেন্সিং, সাদা দেওয়ালের ফেন্সিং, একটার ওপর একটা গ্রানাইট পাথর চাপিয়ে ফেন্সিং, পাথরের দেওয়ালের ওপরে লতাগুল্ম দিয়ে ফেন্সিং। চারপাশ নির্জন, পথচারী জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। গাড়ি ঘোড়াও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলে না বললেই চলে। বাতাসে ঘ্রাণ নিলে যেন সমুদ্রের গন্ধ মৃদু পাওয়া যায়। নির্ঘাত কাছেই কোথাও সমুদ্রতীর আছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঢেউয়ের আওয়াজ কানে এল না। যেন দূরে কোথাও কনস্ট্রাকশন ওয়র্ক হচ্ছে, বৈদ্যুতিক করাতের আওয়াজ মৌমাছির গুঞ্জনের মতো হয়ে অস্ফুট কানে আসছে। স্টেশন থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় তীরচিহ্ন দেওয়া ছোট ছোট বোর্ড চোখে পড়ে, তাই পথ ভুল হওয়ার উপায় নেই।

"কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগার"-এর রাজকীয় তোরণের সামনের জমিতে বেশ পরিচ্ছন্ন অবয়ব দেওয়া দুটো উমে[†] গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গেট দিয়ে ঢুকলে নুড়ি বিছানো রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে, বাগানের মাচায় লতানো উদ্ভিদ চমৎকার কেয়ারি করা, কোথাও একটা গাছের পাতাও ঝরে পড়ে নেই। পাইন, ম্যাগনোলিয়া, হলুদ গোলাপ। অ্যাজেলিয়া। লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় সাবেক আমলের বাতি কয়েকটা, ছোট ছোট জলাশয়ও চোখে পড়লো। ক্রমে একটা প্রবেশদ্বারের কাছে এসে পৌঁছোলাম। অসাধারণ কারুকাজ করা প্রবেশদ্বার। উন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভেতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না স্থির করে উঠতে পারলাম না কিছুক্ষণ। আমি যত লাইব্রেরি দেখেছি তার থেকে এটি একেবারে আলাদা। তবে কিনা, এতদূর যখন খুঁজে খুঁজে এসেছি, এখন আর না ঢুকে উপায় নেই। প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকেই একটা কাউন্টার, সেখানে বসা অল্পবয়েসি একজন আমার মালপত্র জমা রাখলো। আমি ব্যাকপ্যাক নামিয়ে, সানগ্লাস খুলে, টুপিটা খুললাম।

"এখানে কি এই প্রথমবার?" ছেলেটা জানতে চায়। খুব রিল্যাক্সড শান্ত গলা। কী বলব, আওয়াজটা একটু চড়ার দিকেই, কিন্তু মসৃণ, কর্কশ ভাবটা একেবারে নেই।

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ি। গলার আওয়াজ ভাল শোনাবে না। আমার একটু টেনশন হচ্ছে। এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা একেবারেই অনুমান করিনি। দুই আঙুলের মধ্যে একটা সরু লম্বা শিসের পেনসিল রেখে, আমার মুখের দিকে খানিকক্ষন গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলো। পেছনে রাবার লাগানো হলুদ রঙের পেনসিল। নবীনের মুখশ্রীটি ছোটখাটো গড়নের। হ্যান্ডসাম বলার

[†] উমে অনেকটা আলুবোখরা ধরনের একরকম ফল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চেয়ে বরং সুন্দর বললেই আরো ঠিক বলা হবে হয়তো। সূতির সাদা বাটন-ডাউন ফুল-স্লীভ শার্ট আর অলিভ গ্রীন চিনোর প্যান্ট পরা। কোথাও একটু ভাঁজ নেই। চুলগুলো লম্বা, ঝুঁকলে সামনের চুল কপালের ওপরে এসে পড়ছে, মাঝেমাঝে খেয়াল করে সরিয়ে নিচ্ছে। জামার হাতা কনুই অবধি গোটানো, সরু ফর্সা কবজি দেখা যাচ্ছে। সরু পাতলা ফ্রেমের চশমাটা মুখের আদলের সঙ্গে বেশ মানানসই। বুকে "ওশিমা" লেখা ছোট একটা প্লাসটিকের ট্যাগ লাগানো। এযাবৎ আমার দেখা যাবতীয় লাইব্রেরি-কর্মীর থেকে এ আলাদা।

"বইয়ের এখানে যেমন খুশি চলে আসতে পার। যে বইটা পড়তে চাও সেটা পাওয়া গেলে সোজা রীডিংরুমে নিয়ে যেতে পার। শুধু, অমূল্য বলে যে বইগুলোতে লাল সীল দেগে দেওয়া আছে, সেগুলোর বেলায় প্রত্যেকবার পড়তে নিয়ে ডিমান্ড কার্ডে লিখিয়ে নিতে হবে। ওদিকে গিয়ে ডানহাতের ঘরটা হল তথ্য-বিভাগ, ওখানে ইনডেক্সের কার্ড, সার্চ করার জন্য কম্পিউটার আছে, প্রয়োজন মতো স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করতে পার। বই পড়তে বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজ আমরা রাখি না। ক্যামেরা বারণ। কপি করাও নিষিদ্ধ। কিছু খেতে হলে বা পান করতে হলে বাগানের বেঞ্চিতে কিংবা গাছপালার ওখানে গিয়ে। পাঁচটায় বন্ধ হয়।"

এরপর পেনসিলটা ডেস্কের ওপর রেখে, যোগ করে, "হাইস্কুলের ছাত্র?"

বড় করে শ্বাস টেনে নিয়ে আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"সচরাচর অন্যান্য লাইব্রেরি যেমন হয়, এ জায়গাটা তার চেয়ে একটু ভিন্ন", ছেলেটি বলে। "একটু বিশেষ ধরণের সব বিষয়ের ওপর বইয়ের সংগ্রহ কিনা। পুরনো আমলের চারণ কবি কিংবা হাইকু কবি, এরকম সব লোকেদের প্রাচীন বইয়ের সংগ্রহ। অবশ্যই সাধারণ্যের পাঠযোগ্য বইও এই সংগ্রহে আছে, কিন্তু দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে চেপে এতদূর বয়ে আসা লোকেদের বেশিরভাগই ঐ ধরণের সাহিত্যকৃতি ও পুঁথিপত্রের ওপর বিশেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গবেষণা করছে। স্টিফেন কিং পড়তে চেয়ে আসা লোক বেশি নেই। আর তোমার মত বয়েসের লোক খুবই বিরল। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণা করছে এমন স্কলাররাই আসে। আচ্ছা, তুমি কি তানকা[†] কিংবা হাইকু নিয়ে গবেষণা করছো?

"না," আমি উত্তরে বলি।

"আমারও তাই মনে হয়েছিল।"

"আমার মতো কেউ এলে কোনো অসুবিধা নেই তো?" আমি গলার আওয়াজটা যাতে বেরিয়ে না পড়ে, এইভাবে সাবধানে এবং একটু কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"অবশ্যই না," ছেলেটা মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলে। তারপর ডেস্কের ওপরে দুটো হাত এনে আঙুলগুলো একত্র করে।

"এটা তো লাইব্রেরি, বই পড়তে চেয়ে যে কেউ এলেই স্বাগত জানাব। বড়মুখ করে বলার মতো নয়, কিন্তু আমার যেমন তানকা কিংবা হাইকুতে বিশেষ কোনো আগ্রহই নেই।"

"কী চমৎকার একখানা বাড়ি," আমি বলি।

ও সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। "কোওমুরা বাড়ি সেই এদো যুগ থেকেই বড়োসড়ো সাকের[††] ব্যাপারি। বর্তমান মালিকের বাবা বইপত্র সংগ্রহের সূত্রে সারা দেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যাকে বলে বই পাগল আর কি। তাঁরও বাবা, অর্থাৎ দুই পুরুষ আগে, নিজেই চারণগান গাইতেন বলে, সেই সূত্রে বহু সারস্বত ব্যক্তি শিকোকুতে এলে এখানে পদধূলি দিয়ে যেতেন। বাকায়ামা বোকুসুই, ইশিকাওয়া তাকুবোকু কিংবা ধর, শিগা নাওইয়া। বেশ শান্তিতে সুব্যবস্থার মধ্যে থাকা যায় বলেই কি না, দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গেছেন এরকমও অনেকে আছেন। সাহিত্যসংক্রান্ত জিনিসে অকৃপণ ভাবে অর্থব্যয় করা বনেদি বাড়ি ছিল তো। এধরণের পরিবার সচরাচর জলের দামে সম্পত্তি খুইয়ে বসে বলে দেখা যায়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোওমুরা ফ্যামিলির বেলায় তা ঘটেনি। শখ শখের মতো থেকেছে, পরিবারের বৈষয়িক ব্যাপারকে

[†] পাঁচ লাইনের ছোট জাপানি কবিতা।

[††] ধান থেকে তৈরি জাপানি সুরাকে সাকে বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা বলে অবহেলা করেননি এঁরা।

"অবস্থাপন্ন," আমি বললাম।

"খুবই," ও বলে। বলে ঠোঁটটা অল্প বাঁকায়। "যুদ্ধের আগে যতটা ছিল ততটা হয়তো নয়। তা হলেও, এখনও যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। তবেই না এরকম চমৎকার একখানা লাইব্রেরি চালু রাখতে পারছে। এটাকে একটা ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করলে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা কমবে, সেকথাও ভাবা হয়েছে বইকি, তবে সে তো অন্য প্রসঙ্গ। এই বাড়িটা নিয়ে কৌতূহল থাকলে, আজ বেলা দুটো থেকে একটা ছোটখাটো ট্যুরের ব্যবস্থা আছে, তাতে যোগ দিতে পার। সপ্তাহে একবার, মঙ্গলবার করে হয়, ঘটনাক্রমে আজই মঙ্গলবার। দোতলায় সব বিরল ছবি আর লেখার কালেকশন আছে, স্থাপত্যের দিক থেকেও গভীর আগ্রহ জাগানোর মতো বাড়ি এটা। দেখে রাখলে ক্ষতি নেই।"

ধন্যবাদ, আমি বলি।

দোও ইতাশিমাশতে[1], বলে ছেলেটা স্মিত হাসে। তারপর পেনসিলটা আবার তুলে নিয়ে পেছনে লাগানো রাবারটা দিয়ে ঠকঠক করে ডেস্কটাকে ঠুকতে থাকে, বেশ নিবিষ্টভাবে, যেন আমাকে উৎসাহ দিতে।

"আপনিই কি ঘুরিয়ে দেখাবেন?"

ওশিমা স্মিত হাসল। "আমি কেবল সহকারী হিসেবে আছি। শ্রীমতি সায়েকি এখানকার ইন-চার্জ, উনিই আমার বস। কোওমুরা পরিবারের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কও আছে বটে। উনিই ঘুরিয়ে দেখাবেন। মানুষটি চমৎকার, দেখো। আমার তো মনে হয়, তোমার পছন্দ হবেই।"

উঁচু সীলিং-এর বিশাল বইয়ের ঘরে ঢুকে বইয়ের র‍্যাকের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি মনোমত বই খুঁজতে থাকি। সীলিং-এর এধার থেকে ওধার মোটা মোটা কয়েকটা দেখার মতো কড়ি-বর্গা। গ্রীষ্মের প্রারম্ভের সূর্যকিরণ জানালা দিয়ে ঢুকে আসছে।

[1] ধন্যবাদ জানালে প্রত্যুত্তরে 'দোও ইতাশিমাশতে' বলার প্রথা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাচের জানালার পাট বাইরের দিকে মুখ করে খুলে রাখা আছে আর বাগানে আসা ছোট পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। হাতের সামনের র‍্যাকটাতে, ওশিমা যেমন বলেছিল, চারণ কবি আর হাইকু কবিদের ওপর অনেকগুলো বই। চারণকবিতা সংকলন, হাইকু সংকলন, কিংবা রিভিউ আর জীবনী। স্থানীয় ইতিহাসের বইও অনেক।

ভেতরের দিকের র‍্যাকগুলোতে সারি সারি হিউম্যানিটিজ সংক্রান্ত বাজার চলতি বই। জাপানি সাহিত্য সমগ্র, বিশ্ব-সাহিত্য সমগ্র, ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের সাহিত্যসংগ্রহ, ক্লাসিক, দর্শন, নাটক, আর্ট বিষয়ক, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, জীবনী, ভূগোল...। হাতে নিয়ে খুললে অনেক বইয়েরই পাতার ভেতর থেকে পুরনো কালের গন্ধ পাওয়া যায়। দুই মলাটের মধ্যে হয় দীর্ঘদিন নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে থাকা জ্ঞান, নতুবা শাণিত আবেগের সুবাস, বিশেষ রকমের সুগন্ধ। আমি সেই গন্ধে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে, কয়েকটা পাতায় চোখ বুলিয়ে আবার বইয়ের তাকে রেখে দিই।

শেষ পর্যন্ত চমৎকার বাঁধাইয়ের বার্টন এডিশনের 'সহস্র এক আরব্যরজনী'-র কয়েক ভল্যুমে সম্পূর্ণ সেট থেকে একটা ভল্যুম বেছে নিয়ে রীডিংরুমে নিয়ে গেলাম। অনেকদিন ধরেই পড়ার ইচ্ছে ছিল। সবে খুলেছে, তাই লাইব্রেরির রীডিংরুমে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ওরকম রাজকীয় একটা ঘর পুরোটা আমি একা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারি। সেই ম্যাগাজিনের ছবির মতো করে। উঁচু সীলিং, হাত-পা ছড়িয়ে থাকার মতো প্রশস্ত, তার ওপরে বেশ উষ্ণতাও আছে। খুলে রাখা জানালা দিয়ে মাঝেমাঝেই ঢুকে আসছে মৃদুমন্দ বাতাস। সাদা পর্দা নিঃশব্দে দুলছে। বাতাস সমুদ্রতীরের গন্ধও বয়ে আনছে। সোফা এত আরামদায়ক যে আয়েশের এতটুকু ঘাটতি হয়না। ঘরের এককোণে সাবেক আমলের আপরাইট পিয়ানো রাখা আছে, সব মিলিয়ে মনে হয় যেন কোনো ঘনিষ্ঠজনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।

সোফায় বসে চারপাশ দেখতে দেখতে মনে হল, এরকমই একটা জায়গা, এই ঘরটার মতো, আমি যেন বহুদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ঠিক এরকমই একটা জায়গা, লোকচক্ষুর অন্তরালে পৃথিবীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোথাও একটা খোঁদলের মতো, আমি যেন খুঁজে আসছি বলে মনে হল। কিন্তু এখন অবধি সেটা যেন কোনো গল্পে শোনা একটা গোপন স্থান হয়েই ছিল। এরকম একটা জায়গা যে সত্যিই কোথাও বাস্তবেই রয়ে গেছে তা তখনও যেন ভাল করে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। চোখ বুজে নিঃশ্বাস নিলাম, আর সেটা যেন হালকা মেঘের মতো আমার ভেতরেই রয়ে গেল। একটা সুন্দর অনুভূতি। আমি ঘিয়ে রঙের কাভার পরানো সোফায় ধীরে ধীরে হাতের তালু বোলাতে লাগলাম। উঠে দাঁড়িয়ে আপরাইট পিয়ানোর সামনে গিয়ে, ডালা খুলে, হলুদ হয়ে যাওয়া কী-বোর্ডের ওপর দশটা আঙুল আলতো করে রেখে দেখলাম। পিয়ানোর ডালা বন্ধ করে, আঙুরের প্যাটার্ন তোলা পুরনো কার্পেটের ওপর হাঁটাহাঁটি করতে থাকলাম। জানালা খোলা আর বন্ধ করার জন্য একটা পুরনো হ্যান্ডল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলাম। ফ্লোর-স্ট্যান্ডের আলো সুইচ অন করে জ্বালিয়ে আবার অফ করে দিলাম। দেওয়ালে ঝোলানো ছবি একটা একটা করে ভাল করে নিরীক্ষণ করলাম। তারপর আবার একবার গিয়ে সোফায় বসে বইয়ের পরের অংশটুকু পড়তে শুরু করলাম। বই পড়াতেই মনঃসংযোগ করলাম।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হলে ব্যাকপ্যাক থেকে মিনারেল ওয়াটার আর লাঞ্চবক্স বের করে বাগানের ধারে গ্রীনজোনে গিয়ে বসে দুপুরের খাওয়া সারলাম। নানারকম পাখি এসে এক গাছ থেকে আরেক গাছে ওড়াউড়ি করছে, জলাশয়টার চারধারে নেমে এসে জল খাচ্ছে, প্রসাধন সেরে নিচ্ছে। আগে কখনো দেখিনি এরকম পাখিও আছে। চায়ের মতো গাঢ় বাদামি রঙের পেল্লায় বেড়ালটার দেখা পেতেই পাখিরা তড়িঘড়ি করে উড়ে গেল বটে, বেড়ালটা কিন্তু পাখিদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। সে কেবল রাস্তার ধারের পাথরের স্ল্যাবের ওপর অলস ভাবে রোদ পোহানোর অভিলাষী।
"আজ কি স্কুল ছুটি?" রীডিংরুমে ফিরবো বলে ব্যাকপ্যাক আবার জমা রাখতে গেছি, তখন ওশিমা জানতে চাইল।

"ছুটি নয়, নিজেই ক'দিন ছুটি করে নিয়েছি", খুব সাবধানে শব্দচয়ন করে আমি উত্তর দিই।
"স্কুলে যেতে অস্বী[illegible]
"হয়তো তাই[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুব কৌতূহলের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ওশিমা। "হয়তো?"

"অস্বীকার ঠিক নয়, কেবল যাব যে না সেটুকুই মনস্থ করেছি", আমি বলি।

"ধীরেসুস্থে নিজেই ঠিক করলে যে যাওয়া বন্ধ করবে?"

আমি কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। কী বলা উচিত উত্তরে, ভেবে উঠতে পারিনা।

"প্লেটোর 'ব্যাঙ্কোয়েট'-এর অ্যারিস্টোফেনিসের কাহিনীতে আছে যে পৌরাণিক উপকথার জগতে তিনপ্রকারের মানুষ হত", ওশিমা বলে। "জানো, সেকথা?"

"না, জানি না," আমি বলি।

"প্রাচীনকালে জগতে ছিল, নারী আর পুরুষ নয়, পুরুষ-পুরুষ আর পুরুষ-নারী এবং নারী-নারীদের বাস। বলতে পার, এখনকার দুজন মিলে একজন করে মানুষ হত তখন। এভাবেই সকলে সুখে শান্তিতে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। হল কী, ভগবান ধারালো কিছু দিয়ে সব্বাইকে ভাগ করে দিলেন। এক্কেবারে ঠিক অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করে। এর ফলে সমাজে রইলো শুধু পুরুষ আর নারী, সকলেই যথাসাধ্য বাকি অর্দ্ধেকের খোঁজে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে জীবন কাটাতে লাগল।"

"ভগবান এরকম করলেন কেন?"

"মানুষকে দুভাগ করে দিলেন কেন? কেন, সে তো আমারও জানা নেই। ভগবানের কাজকর্ম অধিকাংশই আমি তেমন ভাল বুঝতে পারিনা। কেমন রাগী রাগী, একটু যেন বেশিই, কী বলবো, আদর্শবাদী প্রবণতা। অনুমান করছি, কিছু একটার শাস্তি হিসেবেই এরকম করেছিলেন হয়তো। বাইবেলের সেই আদম আর ঈভের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মতো, তাই না?"

"আদি পাপ," আমি বললাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হুঁ, আদি পাপ," ওশিমা বলে। তারপর লম্বা পেনসিলটা মাঝের আঙুল আর তর্জনির মধ্যে রেখে ব্যালান্স করার মতো করে আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকে। "আসলে আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল মানুষের পক্ষে একা একা বেঁচে থাকাটা কিন্তু ভয়ানক কঠিন।"

আমি রীডিংরুমে ফিরে, 'ভাঁড় আবু আল হাসানের কাহিনী'-র বাকি অংশটুকু পড়তে শুরু করি। কিন্তু কিছুতেই বইয়ে মন বসাতে পারছিলাম না। পুরুষ-পুরুষ, পুরুষ-নারী আর নারী-নারী।

ঘড়ির কাঁটায় যখন দুটো, আমি বই পড়ায় ছেদ টেনে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই এবং সেই সৌধ ঘুরে দেখার ট্যুরে গিয়ে যোগ দিই। যিনি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন সে মিস সাএকি একটু ক্ষীণাঙ্গিনী এক মহিলা, দেখে মধ্য চল্লিশের কোঠায় বয়েস বলে মনে হয়। ঐ বয়সী মহিলা হিসেবে এঁকে বেশ দীর্ঘাঙ্গিনীই বলতে হয়। পরণে নীলরঙের হাফহাতা ওয়ানপিস, তার ওপর দিয়ে হালকা ঘিয়ে রঙের কার্ডিগান গলিয়ে নিয়েছেন। ফিগার বেশ সুন্দর, চুল লম্বা, পেছনে আলগা করে খোঁপা করা। পরিশীলিত ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। সুন্দর চোখ। তার ওপর সর্বদাই ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিটি ছায়ার মতো লেগেই রয়েছে। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কেমন একটা পরিতৃপ্তির ছাপ সেই হাসিতে। দেখলেই ছোট একটা রৌদ্রালোকিত পরিসর মনে ভেসে ওঠে। যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে তৈরি হওয়া কোনো বিশেষ আকার ধারণ করা এক টুকরো সূর্যালোকিত পরিসর। নোগাতাতে আমার বাড়ির বাগানে এরকম একটা জায়গা ছিল, ওরকমই একটা রোদ এসে পড়া জায়গা। ছোটবেলা থেকেই আমার ঐ সূর্যালোকিত জায়গাটুকু খুব পছন্দ। আমার মনে বেশ জোরালো ভাবে ছাপ ফেললেন মহিলা, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণও মিশে আছে তাতে। আমার মনে হল, এই মানুষটা আমার মা হলে ভাল হত। মধ্যবয়সী কোনো মহিলা দেখতে বেশ সুন্দরি হলে, অথবা দেখে আমার ভাল লাগলে, এরকমই মনে হত। এই মানুষটা আমার মা হলে কত ভাল হত। বলাই বাহুল্য, মিস সাএকি আমার মা, এরকম হওয়ার সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে প্রায় শূন্যই। কিন্তু তা হলেও, থিয়োরেটিকালি বলা যায় যে খুবই অল্প হলেও এটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কেননা, মায়ের মুখও আমার মনে পড়ে না, এমনকি নামও জানা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলা যেতে পারে, উনি যে আমার মা হতে পারেন না এটা জোর দিয়ে বলার মতো কোনো যুক্তি পাওয়া যাবে না।

সেই ট্যুরে আমি ছাড়া আর ছিল ওসাকা থেকে আসা মধ্যবয়সী এক দম্পতি। মহিলাটি বেশ স্বাস্থ্যবতী আর চোখে জোরালো পাওয়ারের চশমা। স্বামী কিঞ্চিত কৃশকায়, হেয়ারস্টাইলে বেশ শক্ত চুল তারের ব্রাশ দিয়ে পাট করে আঁচড়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা। সরু চোখ, চওড়া কপাল, একদৃষ্টে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে এরকম যেসব মূর্তি দেখা যায় দক্ষিণের দ্বীপগুলোতে, দেখতে অনেকটা সেইরকম। মহিলাটিই মূলত কথাবার্তা যেটুকু বলছেন, স্বামী নেহাত হুঁ হাঁ করে যাচ্ছেন। এছাড়া স্বামীটি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে মন দিয়ে শুনছেন, কখনো কখনো অস্ফুটে টুকরো টুকরো কথা বলছেন যা ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। উভয়েরই পরণের পোশাক লাইব্রেরি দেখতে আসার চেয়ে পাহাড়ে চড়ার পক্ষে বেশি মানানসই। দুজনেরই পরনে অনেকগুলো পকেটওয়ালা ওয়াটারপ্রুফ ভেস্ট, বেশ পোক্ত ফিতেওয়ালা হাই-শ্যু পায়ে, মাথায় পর্বতারোহণের টুপি। সম্ভবত, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরোলে এই দম্পতি সর্বদা এই পোষাকেই বেরোন। মনে হয় এরা লোক খারাপ নন। এরা আমার বাবা-মা হলে ভাল হত, এরকম কোনও ইচ্ছে মনে জাগলো না বটে, ট্যুরে যে কেবল আমি একা নই এটা ভেবে স্বস্তি হল।

মিস সাএকি প্রথমে কীভাবে এই কোওমুরা স্মৃতি গ্রন্থাগার সৃষ্টি হল সেটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। মোটামুটি ওশিমা আমাকে যা বলেছিল সেই একই বৃত্তান্ত। কয়েক পুরুষ ধরেই কর্তারা সংগ্রহ করছিলেন নানা পুঁথিপত্র, চিত্রকলা, সেগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রসারে কিছু অবদান রাখতেই এই লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন। কোওমুরা ফ্যামিলির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয়, সেই ফাউন্ডেশন এখন লাইব্রেরির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে। কখনো কখনো এর মাধ্যমে বক্তৃতাসভা, কি চেম্বার মিউজিক কনসার্ট ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়। মেইজি[†] যুগের প্রথম দিকে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল মূলত একটা আউট-হাউজ হিসেবে যেটা হবে কোওমুরা ফ্যামিলির বইয়ের ঘর আর গেস্টদের থাকার ব্যবস্থা। তাইশো[†]

[†] মেইজি (১৮৬৮-১৯১২)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুগে আরও বড় করে নতুন কলেবর দেওয়া হয় ওটাকে, দোতলা করা হয়, সেখানে ঠাঁই পাওয়া সাহিত্যিকদের জন্য লিভিং রুমগুলো সব কী চমৎকার! তাইশো থেকে শুরু হয়ে শোবা[††] যুগ জুড়ে বহু স্বনামধন্য মানুষেরা কোওমুরা ফ্যামিলি সন্দর্শনে এসে পায়ের ছাপ রেখে গেছেন। অতি সমাদরে থাকতে পেয়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কবিরা কবিতা রেখে গেছেন, হাইকু কবিরা হাইকু রেখে গেছেন, লেখকরা তাঁদের লেখা, চিত্রশিল্পীরা তাঁদের ছবি রেখে গেছেন।

"বেশ কিছু বাছা বাছা এরকম অমূল্য ও ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক নিদর্শন দোতলার প্রদর্শনকক্ষে আপনারা সবাই দেখতে পাবেন," মিস সাএকি বললেন। "এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের আমলের সব আঞ্চলিক সংস্কৃতির সম্ভারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কোনও স্থানীয় সরকারি উদ্যোগ নয়, মূলতঃ কোওমুরাদের বাড়ির মতো সৌখিন চরিত্রের অবস্থাপন্ন পরিবারেরা। এঁরাই, এককথায় বলতে গেলে, এতদিন সমস্তরকম সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার পৃষ্টপোষকের ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। কাগাওয়া জেলা থেকে যে বহু অসামান্য তানকা কবি ও হাইকু কবি উঠে এসেছেন, তার পেছনে একটা বাস্তব সত্য হল যে মেইজি থেকে পরবর্তী কয়েকযুগে এই কোওমুরা পরিবারই এই অঞ্চলে উঁচুমানের শিল্পের একটা সার্কল গড়ে ওঠা ও বজায় রাখায় আন্তরিক প্রচেষ্টার উৎসমুখ ছিল। গভীর ভাবে মনোযোগী এই সাংস্কৃতিক সার্কলের গড়ে ওঠা, বিবর্তন, ইত্যাদির বিষয়ে এখন অবধি বহু গবেষণাগ্রন্থ, ভাষ্য, স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছে, সেইসব নথিপত্র রীডিংরুমে সংগ্রহ করে রাখা আছে। আপনাদের সুবিধে মতো একবার চোখ বোলাতে পারেন।

বিভিন্ন প্রজন্মের সাহিত্য বিষয়ে কোওমুরা পরিবারের কর্তারা ছিলেন অত্যন্ত গভীররকম জ্ঞানী, এবং অসামান্য বোধশক্তিসম্পন্ন। রক্তেই আছে বলা উচিত হয়তো। ওঁরা সকলেই নকল ও আসলকে দেখেই পৃথক করতে পারতেন, সত্যিকারের ঔৎকর্ষকেই একমাত্র বিবেচনা করতেন এবং এই উঁচু নজর খুব গুরুত্ব দিয়ে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু জানাই কথা, জগতে একেবারে নিখুঁত বিচার বলে কিছু হয় না। দুঃখের বিষয়, এঁদের বিচারের আনুকূল্য না

[†]তাইশো (১৯১২-১৯২৬), [††]শোবা (১৯২৬-১৯৮৯) হল পরপর তিনজন সম্রাটের রাজত্বকাল, এবং এগুলোকে পৃথক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, ক্যালেন্ডারও সেই অনযায়ী নতুন করে পরিবর্তিত হয়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেয়ে, প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি এরকম অতি উৎকৃষ্ট লেখকও যে নেই এমন নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, হাইকু স্রষ্টা তানেদা সানতোওকার লেখার কথা, দুর্ভাগ্যক্রমে যার অধিকাংশই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। অতিথিদের নামের লিস্ট দেখলে দেখা যায় বহুবারই সানতোওকা এখানে এসে থেকেছেন, এবং হাইকু ও লেখা রেখে গেছেন, কিন্তু কর্তা তাঁকে হামবড়াই করা ভিখিরি বলে অগ্রাহ্য করে, দেখাও না করে, অধিকাংশ লেখা ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।"

"এমা, নষ্ট করে ফেললেন!" ওসাকা দম্পতির মহিলাটি প্রকৃতই ক্ষুন্ন হয়ে বললেন। "সানতোওকার হলে তো এতদিনে এর দাম হত অনেক, তাই না?"

"ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেইসময় সানতোওকার মোটেই তেমন খ্যাতি ছিল না বলে হয়তো কিছু করার ছিল না। কিছু দিন না গেলে বোঝা যায় না, এরকম তো কতকিছুই আছে।" মিস সাএকি হাসিহাসি মুখে বললেন।

"ঠিকই, ঠিকই", স্বামীটি সায় দিলেন।

এরপর আমাদের নিয়ে মিস সাএকি একতলাটা ঘোরাতে নিয়ে গেলেন। বইয়ের ঘর, পড়ার ঘর, অমূল্য সব পুঁথিপত্র সংগ্রহের ঘর। "তৎকালীন কর্তা এই পড়ার ঘর বানাতে গিয়ে, একেবারে খুব সূক্ষ্মরুচির ও এলিট-সুলভ কিয়োতো-স্টাইল টি-সেরিমনির কক্ষ বানানো থেকে বিরত থেকে, বসতবাড়ির মতো করে, বেশ গাঁ-গঞ্জের স্টাইলে বানালেন। কিন্তু দেখলে বুঝতে পারবেন, বাড়ির ফ্রেমওয়র্কটা যেরকম পোক্ত আর যেরকম খোলামেলা, সেটা তাইশো আমলের মতো, এবং এর আসবাবপত্র, ছবি ইত্যাদিতে আইডিয়ার দিক থেকে, বিলাসবাহুল্যের দিক থেকে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। যেমন বলা যায়, কাঠের প্যানেলের-এর এই নকশার যে বহমানতা, এরকমটা অন্য জায়গায় দেখা আবে না। স্থাপত্যের ব্যাপারে বলা যায় যে সমকালীন শিকোকুর বিখ্যাত প্রযুক্তি যেন একজায়গায় সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে।"

এরপরে সবাই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। সিঁড়ির একটা অংশ উঁচু ভেন্টিলেশনের কাজ করছিল। কালো আবলুস কাঠের রেলিং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এমন চকচকে করে পালিশ করা যে মনে হয় ছুঁলেই আঙুলের দাগ পড়ে যাবে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ উঠেই সামনের দেওয়ালে জানালায় রঙীন কাঁচের নকশা। যেন হরিণ গলা বাড়িয়ে আঙুর খাচ্ছে। দোতলায় দুটো ড্রইংরুম, বড় হলঘরও আছে। নির্ঘাত পুরনো দিনে এই হলঘরে বিছানো তাতামি[1] সেঁটে তার ওপর ভোজসভা কিংবা জনসমাগমের আয়োজন করা হত বলে মনে হয়। এখন মেঝেতে কাঠের পাটাতন, দেওয়ালে অনেক ক্যালিগ্রাফি, ঝোলানো পটচিত্র, জাপানি পেইন্টিং শোভা পাচ্ছে। একেবারে মাঝখানে বড় শো-কেস, তাতে নানা স্মারক, কোনো ইতিহাস আছে এরকম জিনিস, সব সারি দিয়ে রাখা। দুটো ড্রইংরুমের একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলের, অন্যটা জাপানি স্টাইলের ঘর। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের ঘরটাতে একটা বড় রাইটিং ডেস্ক আর একটা সুইভেল চেয়ার, এখনও কেউ ওগুলো ব্যবহার করে লেখালেখি করে বলে দেখে মনে হয়। ডেস্কের পেছনের জানালা দিয়ে পাইন গাছের সারি চোখে পড়ে, তাদের ফাঁক দিয়ে সামান্য দিগন্তরেখা।

ওসাকার দম্পতি নানা কিছুর ব্যাখ্যা সম্বলিত প্যামফ্লেট পড়তে পড়তে হলঘরের যাবতীয় সামগ্রী ক্রমানুসারে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। মহিলাটি বেশ উচ্চস্বরে কিছু একটা মন্তব্য করে বসলে ভদ্রলোক উনি যাতে নিরুৎসাহ না হন সেভাবে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুজনের মধ্যে কোনোরকম মতবিরোধ একেবারেই নেই বলেই মনে হচ্ছিল। ওখানে প্রদর্শিত জিনিসপত্রে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না বলে আমি বরং বাড়িটার নানা খুঁটিনাটি দিক দেখে বেড়াতে থাকলাম। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের ঘর ঘুরে দেখার সময় মিস সাএকি চলে এলেন।

"আগ্রহ থাকলে, ঐ চেয়ারটাতে বসে দেখতে পার", মিস সাএকি বললেন। শিগা নাওইয়া, তানিজাকি জুনইচিরো, ওঁরাও ওখানে বসেছিলেন। অবশ্য একেবারে এখনকার এই চেয়ারটায় নয়।" আমি সুইভেল চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম। তারপর দুটো হাতই রাখলাম ডেস্কের ওপর। "কী, কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে?"

আমি একটু লাল হয়ে গিয়ে ঘাড় নাড়লাম। মিস সাএকি হেসে

[1] তাতামি অনেকটাই এখানকার বাঁশ বা বেতের বোনা মাদুর বা পাটির মতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাশের ঘরে ওসাকা দম্পতির খোঁজে ফিরে গেলেন। আমি চেয়ারে বসে বসে পেছন থেকে ওঁর অপসৃয়মান শরীর কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলাম। দেহ সঞ্চালন আর নিম্নাঙ্গের দেহভার বহন। সব মিলিয়ে চলার ভঙ্গীটাই পরিতৃপ্ত, স্বাভাবিক আর দৃষ্টিনন্দন। ঠিকমতো ব্যক্ত করতে পারছি না, ওতে যেন কী একটা বিশেষত্ব আছে। পেছন থেকে যেমন দেখাচ্ছে তার মাধ্যমে উনি যেন আমাকে কী একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন বলে মনে হল। যা কথায় বলা যায় না। সামনাসামনি জানিয়ে দেওয়া যায় না এমন কিছু। কিন্তু সেটা যে কী তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। অনেক কিছুই আছে যা আমি বুঝি না।

চেয়ারে বসে বসে আমি ঘরের ভেতরে চারপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলাম। দেওয়ালে ঝোলানো অয়েলপেইন্টিং-এ সম্ভবত এখানকারই সমুদ্রতীরের দৃশ্য আঁকা রয়েছে। ছবির স্টাইলটা পুরনো, কিন্তু কালারিং একেবারে ফ্রেশ। ডেস্কের ওপরে একটা বড় অ্যাশ-ট্রে আর সবুজ শেডের ল্যাম্পস্ট্যান্ড। সুইচ টিপতেই আলো জ্বলে উঠলো। সামনের দেওয়ালে পুরনো আমলের কালো দেওয়ালঘড়ি। দেখে অ্যান্টিক বলে মনে হলেও কাঁটা দুটো একদম ঠিক সময় দেখাচ্ছে। কাঠের মেঝে জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে ক্ষয়ে গিয়ে, হাঁটতে গেলে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয়।

ট্যুর শেষ হলে ওসাকার দম্পতি মিস সাএকিকে অভিবাদন করে চলে গেলেন। ওসাকাতে কানসাই[†] তানকা চর্চার একটা গোষ্ঠীর ওরা সদস্য। মহিলাটির ব্যাপারটা যাই হোক, ভদ্রলোকটি ঠিক কেমন কবিতা লেখেন ? হুঁ হাঁ করে সাড়া দেওয়া আর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তো আর কবিতা লেখা যায় না। ওটা তো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করতে হয়। কিংবা হয়তো কেবল কবিতা লিখতে গিয়েই কোনও সূত্রে পেয়ে লালন করা কিছু কিছু জিনিস বেরিয়ে আসে।

আমি রীডিংরুমে ফিরে বইয়ের পরের অংশটুকু পড়তে থাকি। বিকেল হতে কয়েকজন লোক রীডিংরুমে এসে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ জনই খুব পড়াশোনা করা বুড়ো লোকেদের মতো চশমা পরা। চশমা পরলেই বুড়োদের সবারই মুখগুলো একইরকম

[†] জাপানের মূল দ্বীপ হোনশু-র পশ্চিম অংশটাকে কানসাই অঞ্চল বলে, পূবের অংশটা কানতোও। ওসাকা কানসাইতে, আর তোওকিও কানতোও অঞ্চলে।

আমার বই

দেখাচ্ছিল। তাতে করে সময় যেন খুবই ধীরে অতিক্রান্ত হচ্ছিল। লোকগুলো চুপচাপ পড়ার মধ্যে ডুবে গেল। কথাবার্তার বালাই নেই। ওদের মধ্যে একজন ডেস্কে বসে নোট নিচ্ছিলেন, অনেকেই একেবারে নীরব, বসার ভঙ্গীর পর্যন্ত পরিবর্তন হচ্ছে না। যে যার নিজের নিজের সীটে মহা উৎসাহে পড়ায় ডুবে আছেন। একেবারে আমার মতো করে।

পাঁচটা বাজতে আমি পড়া বন্ধ করে, বইটা র‍্যাকে জায়গামতো ফিরিয়ে দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরোই।

"সকালে ক'টায় খুলবে?" জিজ্ঞেস করি। "এগারোটায়। সোমবার করে লাইব্রেরি বন্ধ", ও বলে।

"কালও আসবে?"

"আপনাদের অসুবিধা না হলে।"

ওশিমা চোখ সরু করে আমার মুখের দিকে তাকালো।

"অবশ্যই কোনও অসুবিধা নেই। লাইব্রেরি তো বই পড়তে আসা লোকেদেরই জায়গা। আসাটাই তো বাঞ্ছনীয়। সে যাই হোক, তুমি অমন লাগেজ বয়ে বয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছো কেন? খুবই ভারি বলে মনে হয়, ভেতরে যেন কত কিছু ঠেসে ভরা হয়েছে। ক্রুগারের সোনার মোহর?"

আমি আবার লাল।

"যেতে দাও, যেতে দাও, থাক ওকথা। জানতেই হবে এমন কিছু নয় মোটেই", ওশিমা বলে। তারপর পেনসিলের ডগার রাবারটা দিয়ে কপালের ওপরদিকে ডানদিকটায় চাপ দিতে থাকে।

"আচ্ছা, আবার তাহলে কাল।"

"সায়োনারা", আমি বললাম।

ও হাত না তুলে পেনসিলটা শূন্যে তুলে প্রত্যাভিবাদন করলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে ট্রেনে গিয়েছিলাম সেই একই ট্রেনে চেপে আমি তাকামাৎসু স্টেশন অবধি ফিরলাম। স্টেশনের কাছেই শস্তা মতন দোকানে ঢুকে একেবারে সেট মেনু, চিকেন কারি আর ভেজিটেবল স্যালাড অর্ডার করলাম। এক্সট্রা ভাত নিলাম একবার, খাওয়ার পরে গরম দুধ। মাঝরাতে খিদে পেলে খাওয়ার জন্য কনভেনিয়েন্স স্টোর থেকে দুপ্যাকেট ওনিগিরি[†] কিনে, নতুন একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতলও কিনলাম। তারপর যে হোটেলে ফেরার কথা সেদিকে হাঁটতে থাকলাম। প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুতও নয়, প্রয়োজনের চেয়ে ধীরেও নয়। একেবারেই স্বাভাবিক ভাবে লোকে যেমন যায়, খুব বেশি লোকের চোখে যাতে না পড়ি এইভাবে হাঁটতে থাকি।

আকারে বেশ বড়ো, টিপিকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজনেস হোটেল। ফ্রন্ট ডেস্কে ঘর ভাড়া নেওয়া খদ্দেরদের রেজিস্ট্রারে ভুয়া নাম, ঠিকানা আর বয়েস লিখে একদিনের ঘরভাড়া অগ্রিম দিয়ে রাখলাম। টেনশন হচ্ছিল একটু। কিন্তু ওরা আমাকে একটুও সন্দেহের চোখে দেখেনি। কিংবা, "অ্যাই, পরিস্কার দেখা যাচ্ছে মিথ্যে বলছ। আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আসলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা পনেরো বছরের বাচ্চা ছেলে," বলে চেঁচিয়েও ওঠেনি। সবকিছু ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে অফিসের কাজের মতো করে গেল।

খটখট করে ভীতিজনক আওয়াজ করা লিফটে চেপে ছ'তলায় পৌঁছলাম। সরু একফালি লম্বাটে ঘর, বিছানাটা একেবারেই টানে না, শক্ত বালিশ, ডেস্কটা ছোট্ট, ছোট স্ক্রীণের টিভি, রোদে পর্দার রঙ জ্বলে গেছে। ফুরোর[††] জন্যও একটা খুব সরু জায়গা, কোনোক্রমে চেপেচুপে ঢোকা যায়। শ্যাম্পু, রিনসিং জেল, এসব কিছুই নেই। জানালা দিয়ে শুধু পাশের বিল্ডিং-এর দেওয়াল চোখে পড়ে। কিন্তু ছাদ আছে, কল দিয়ে গরমজল আসছে এতেই মনটা প্রীত হল। আমি ব্যাকপ্যাকটা মেঝেতে রেখে, চেয়ারে বসে পড়ে এই ঘরের মতো করে শরীরটাকে অভ্যস্ত করে নিলাম।

মনে হচ্ছে, আমি এখন স্বাধীন। চোখ বন্ধ করে আমি যে এখন স্বাধীন এই ব্যাপারটা নিয়ে খানিক ভাবলাম। কিন্তু স্বাধীন হওয়াটা

[†]কালোজিরে, কখনো সামান্য আচার দেওয়া ভাতের দলা, সেলোফেন কাগজে মোড়া।
[††]গরম জল দিয়ে ভর্তি করে তাতে গলা অবধি ডুবিয়ে বসে থাকার জন্য চৌবাচ্চা।।

~ www.amarboi.com ~

যে আসলে ঠিক কী, সেটা এখনও পর্যন্ত ভাল করে বুঝিনি। এখন অবধি যা জানি, সেটা হল যে আমি এখন একা। একা একা একটা অচেনা জায়গায় এসে আছি। কম্পাস, ম্যাপ, সব হারিয়ে ফেলা একাকী ভূ-পর্যটকের মতো। সেটাই কি তাহলে স্বাধীন হওয়ার অর্থ নাকি? সেটুকুও এমনকি ভাল করে জানা নেই। আমি এসব নিয়ে ভাবা বন্ধ করলাম।

দীর্ঘ সময় বাথটাবে শরীর ডুবিয়ে, তারপর বেসিনে ভাল করে দাঁত মাজলাম। বিছানায় শুয়ে পড়ে আবারও একটু বই পড়লাম। পড়তে পড়তে ক্লান্তি এলে টিভি অন করে নিউজ চ্যানেল দেখলাম। তবে আজ এক দিনের মধ্যে আমার ক্ষেত্রে যা যা ঘটলো তার তুলনায় এসব নেহাতই মামুলি খবর। অল্প বাদেই টিভি অফ করে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঘড়ির কাঁটা রাত দশটার ঘরে ঘুরছে। কিন্তু ঠিকমতো ঘুম আসছে না। নতুন জায়গায় নতুন একটা দিন। দিনটা আবার আমার পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার জন্মদিনও বটে। এর অধিকাংশটাই আমি কাটালাম এক রহস্যময় এবং চমকপ্রদ বললে ভুল বলা হবে না, এরকম লাইব্রেরিতে। বেশ কয়েকজন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। সাকুরা। তারপর ওশিমা, মিস সাএকি। এবং সৌভাগ্যক্রমে এরা কেউই আমার দুশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটানোর মতো লোক নন। হয়তো এটা একটা শুভ লক্ষণ।

এরপর নোগাতার বাড়িতে যার এখন থাকার কথা, বাবার কথা মনে হল। এই যে হঠাৎ করে আমায় আর পাওয়া যাচ্ছে না, এই ব্যাপারে ওঁর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কে জানে? আমার চেহারা যে আর দেখতে হচ্ছে না এতে নিশ্চিন্ত হলেন কিনা। দিশেহারা হয়ে পড়লেন কিনা। কিংবা হয়তো সচরাচর যা হয়, কোনোরকম আবেগকে আমলই দিলেন না। হ্যাঁ, আমি যে নেই, এতে খুব একটা মনোযোগ দেবেন বলে মনে হয় না। হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়াতে ব্যাকপ্যাকটা খুলে বাবার মোবাইল ফোনটা বের করে আনলাম। ব্যাটারি ভরে, পরীক্ষা করে দেখতে টোকিওর বাড়ির নম্বর টিপে দেখলাম। রিং যে হচ্ছে অবিলম্বে সেই শব্দ পাওয়া গেল। সাতশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব, অথচ একদম যেন পাশের ঘরে ফোন বেজে ওঠার মতো পরিষ্কার আওয়াজ। এত অপ্রত্যাশিতরকম পরিষ্কার যে আমায় চমকে দিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুবার রিং হতেই কেটে দিলাম। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড এমন জোরে জোরে ধক্‌ধক্‌ করতে লাগলো যে কিছুতেই আর স্বাভাবিক হয় না। ফোনটা তাহলে চালু আছে। অর্থাৎ বাবা এখনও এই নাম্বারটা ক্যানসেল করাননি। নতুবা ডেস্কের ড্রয়ারে যে ফোনটা আর নেই সেটা এখনও টের পাননি হয়তো। ফোন ব্যাক্‌প্যাকের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে, বেডসাইড ল্যাম্প সুইচ অফ করে, চোখ বুজলাম। আজ আর কোনো স্বপ্ন দেখবো না। বলতে কি, বহুদিন যাবৎই আর স্বপ্ন দেখিনা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬

"কোন্নিচিবা"†, সেই বয়স্ক লোকটি বলে উঠলেন।

বেড়ালটা মুখটা একটু তুলে নিচু স্বরে বেশ নিরুৎসাহী ভাবে প্রত্যাভিবাদন করলো। বুড়ো মত একটা বড়োসড়ো কালো হুলোবেড়াল।

"আবহাওয়াটা বেশ ভালো না?"

"হ্যাঁ", বেড়াল বললো।

"একটাও মেঘ নেই।"

"...আপাতত, সেরকমই।"

"থাকবে না এরকম, আবহাওয়াটা?"

"সন্ধ্যের দিকে আর থাকবে না মনে হচ্ছে। সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে", মোড়ামুড়ি দিয়ে একটা পা টানটান করতে করতে বেড়ালটা বলল। তারপর চোখটা সরু করে আরেকবার লোকটার মুখের দিকে নিবিড় ভাবে চেয়ে রইলো। লোকটিও হাসিহাসি মুখে বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে আছেন তখন।

বেড়ালটা অল্পক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তারপরেই সেসব ঝেড়ে ফেলে, বলে উঠলো, "হুমম্, দাদা তাহলে... কথাবার্তা চালাতে পারেন।"

"হ্যাঁ", সামান্য কুণ্ঠিত ভাবে প্রৌঢ় বলেন। তারপরেই, যেন সম্মান দেখাতে, ত্যানা হয়ে আসা সূতির কাপড়ের মাউন্টেনিয়ারিং টুপিটা মাথা থেকে খুলে ফেললেন। "সবসময়ই, সব ধরণের

† দিনের বেলা যে কোনো সময় প্রথম দেখা হলে অভিবাদনের রীতি।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেড়ালমশাইয়ের সঙ্গেই যে কথাবার্তা চালাতে পারি, এমনটা ঠিক নয় বটে, কিছু কিছু জিনিস ঠিকঠাক মতো চললে, কোনোক্রমে এই ধরণের বাৎচিত চালিয়ে যেতে পারি।"

"হুমম্", বেড়াল সংক্ষেপে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

"আচ্ছা, এখানে একটু বসলে কি কিছু মনে করবেন? নাকাতা হেঁটে হেঁটে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা।"

কালোবেড়াল ধীরে গতরটা একটু নাড়িয়ে, লম্বা জুলফি কয়েকবার ঝাঁকিয়ে, চোয়াল খুলে যেতে পারে এরকম বড় হাঁ করে হাই তুললো। "না, কেউ কিছু মনে করবে না। বলতে কী, মনে করুক, না করুক, পছন্দমতো জায়গায় খুশি মতো বসাই যায়। এই নিয়ে কেউ কোনও অভিযোগ করবে না।"

"ধন্যবাদ", বলে সেই প্রবীণ বেড়ালের কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। "উপায় নেই, তাই সেই সকাল ৬'টার পর থেকে কেবল হেঁটেই চলেছি।"

"ইয়ে, তাহলে, দাদার... নামই হল নাকাতা, তাই তো?"

"হ্যাঁ, ঠিকই। নাকাতাই আমার নাম। বেড়ালমশাইয়ের নামটা?"

"নাম ভুলে গেছি", কালো বেড়াল বলে। "কখনো যে ছিল না এমন নয়, কিন্তু মাঝে একেবারেই আর দরকার হয়নি বলে ভুলে গেছি।"

"ঠিকই, প্রয়োজন না পড়লে ভুলে যাওয়ারই কথা। নাকাতারও সেই মত।" লোকটি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেন। "তাহলে কি, বেড়ালমশাই কোথাওকার কোনো ফ্যামিলিতে পালিত হননি?"

"অনেক আগে একটা ফ্যামিলিতে পুষতো ঠিকই, এখন আর তা নয়। কাছাকাছির কয়েকটা বাড়ি থেকে মাঝেমাঝে খেতে পাই বটে..., পোষা নই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাকাতা সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে, কিছুক্ষণ চুপ থেকে, তারপর বললেন, "তাহলে বেড়ালমশাইকে শ্রী ওওৎসুকা নামে ডাকতে পারি কি?"

"ওওৎসুকা?", বেড়াল একটু অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। "কেন? এটা কেন? আমি ওওৎসুকা কেন?"

"না, মোটেই তেমন মানে কিছু নেই। এই মুহূর্তে এটাই নাকাতার মনে এল কিনা। নাম না থাকলে মনে রাখা মুশকিল, তাই একটা লাগসই নাম দিলাম আর কি। নাম থাকলে সুবিধেজনক। যেমন, সেক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অমুক বছর অমুক মাসের এত তারিখে নি-চোমে এলাকায় একটা ফাঁকা জমিতে কালোবেড়াল শ্রী ওওৎসুকার সঙ্গে দেখা হয়ে কথাবার্তা হল, এরকম একটা কথা পরিষ্কার ভাবে নাকাতার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি কম মানুষও সহজবোধ্য ভাবে গুছিয়ে বলতে পারে। কথাটা মনে রাখাও সহজ।"

"হুমম্", কালো বেড়াল বলে। "ভাল বোঝা গেল না। বেড়ালদের পক্ষে তেমন দরকারি কিছু না। গন্ধ কিংবা গড়ন ধরণের নেহাতই অস্তিত্ব আছে এমন জিনিসই গ্রাহ্য করা ভাল। তাতে করে কোনো বিশেষ ধরণের নির্ভরতার আর বালাই থাকে না।"

"হ্যাঁ, সে এমনকি নাকাতাও বোঝে। কিন্তু ওওৎসুকাবাবু, মানুষ ঠিক ওরকম নয়। নানান জিনিস মনে রাখার জন্য, তারিখ কিংবা নাম, ব্যাপারগুলো যেভাবেই হোক বেশ দরকারি হয়ে উঠেছে।"

বেড়াল নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের একটা আওয়াজ করল। "মুশকিলের ব্যাপার সব।"

"এক্কেবারে যা বলেছেন। মনে না রাখলেই নয় এমন জিনিস এত অজস্র যে খুবই মুশকিলের ব্যাপার। রাজ্যপালের নাম মনে রাখতে হবে, বাসেরও নম্বর মনে রাখতে হবে। তবে, সে না হয় কোনোভাবে করা যাবে, বেড়ালমশাইকে ওওৎসুকাবাবু বলে ডাকলে আপত্তি আছে? অসন্তুষ্ট হবেন না তো?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সন্তুষ্টির কথা জিজ্ঞেস করলে, তেমন সন্তুষ্ট হওয়ার তো কিছু নেই..., আবার অসন্তুষ্ট হওয়ার মতোও বিশেষ কিছু নেই। সুতরাং আলাদা করে আপত্তি কিছু নেই, ওওৎসুকাবাবুতে। ঐ নামেই ডাকতে চাইলে ডাকতে পারেন। কী জানেন, ঠিক আমার ব্যাপার বলে মনে হবে না আর কী।"

"খুব খুশি হলাম আপনার কথায়। অনেক অনেক ধন্যবাদ, ওওৎসুকাবাবু।"

"মানুষ হলেও, আপনার কিন্তু কথাবার্তার ধরণটা একটু যেন অন্যরকম", ওওৎসুকাবাবু বলল।

"হ্যাঁ, সকলের থেকেই তাই শুনি। তবে, নাকাতা কিন্তু শুধু এভাবেই কথাবার্তা চালাতে পারে। সাধারণ ভাবে কথা বলতে গেলেও এরকমই হয়। বুদ্ধিশুদ্ধি কম তো। একেবারে গোড়া থেকেই যে কম ছিল তা ঠিক নয়, ছোটবেলায় একটা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, সেই থেকে মাথাটা নিরেস হয়ে গেছে। লিখতে টিখতেও পারি না, বইটই কিংবা খবরের কাগজও পড়তে পারি না।"

"আমিও লিখতে পারিনা, যদিও সেটা খুব গর্ব করে বলার মতো নয়", বলে বেড়াল ডানপায়ের থাবাটা কয়েকবার চেটে নিল। "তবে বুদ্ধিশুদ্ধি গড়পড়তা যেমন হয় তেমনই, তাই তেমন অসুবিধে কিছু নেই।"

"হ্যাঁ, বেড়ালমশাইয়ের জগৎটা একেবারেই সেরকম", নাকাতা বলেন। "তবে কী, মানুষের জগতে লিখতে না পারলে মাথাটা নিরেস। বই, খবরের কাগজ, এইসব পড়তে না পারলে মাথাটা নিরেস। সেরকমই সাব্যস্ত হয়ে আছে। এই তো, নাকাতার যে বাবা, যিনি কিনা মারাও গেছেন, ইউনিভার্সিটির নামকরা শিক্ষক ছিলেন। ওঁর বিষয় ছিল, ফাই-নান্স-তৎ-তো। এছাড়াও, নাকাতার যে দুই ভাই, দুজনেরই মাথা খুব ভাল। একজন ই-তোও-চুউ বলে একজায়গায় ডি-পার্ট-মেন-টাল-হেড, আর অন্যজন আব-ভোন-তো-রিন-শিল-পো-বা-নিজ-যো-মন-তকে চাকরি করে। দুজনেই বড় বাড়িতে থাকে, ঈল্ মাছ খায়। কেবল নাকাতারই বুদ্ধিশুদ্ধি কম, মাথাটা নিরেস।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু, এভাবে বেড়ালের সঙ্গে কথা তো বলতে পারছেন, সেটা কিছু নয় ?"

"তা ঠিক", নাকাতা বলেন।

"যে কেউ তো আর বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ঠিক কিনা?"

"তা বটে।"

"তাহলে আর মাথাটা নিরেস তো বলা যায় না।"

"হ্যাঁ, না, মানে আর কী, এধরণের কথা নাকাতা ভাল বুঝতে পারেনা। কিন্তু, সেই ছোটবেলা থেকে সবাই আদ্যন্ত বুদ্ধি কম, বুদ্ধি কম বলে আসছে বলে নাকাতা সত্যিই বুদ্ধি কম বলেই ভাবে। স্টেশনের নামও পড়তে পারে না, টিকিট কেটে ট্রেণেও চড়তে পারে না। সিটি বাসে প্রো-তি-বোন্-ধি পাস দেখাতে পারলে চড়া যায় অবশ্য।"

"হুম্", কোনোরকম আবেগ ছাড়াই ওওৎসুকাবাবু বলে।

"লিখতে পড়তে না জানলে, কাজও খুঁজে নেওয়া যায় না।"

"আপনার তাহলে চলে কী করে?"

"ভা-তা পাই।"

"ভা-তা?"

"রাজ্যপাল দেন। নোগাতার শো-এই-সোও অ্যাপার্টমেন্টের একটা ছোট ঘরে থাকি। দিনে তিনবার ভাত খাই।"

"বেশ ভাল ভাবেই তো থাকেন মনে হচ্ছে... আমার তো তাই মনে হয়।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, খারাপ নয় মোটেই", নাকাতা বললেন। "ঝড়বৃষ্টিতে পড়তে হয় না, স্বাধীনতারও অভাব নেই। মাঝেমধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কোনো বেড়ালমশাইকে খুঁজে দেওয়ার অনুরোধ আসে। তাতে করে কিছু পারিশ্রমিক পাই। সেটা অবশ্য রাজ্যপালের থেকে গোপন রাখি। তাই কারুকে আর বলবেন না। ওভাবে এক্সট্রা পয়সা এলে ভা-তা কমিয়ে দেবে কি না কে জানে। পারিশ্রমিক বলছি বটে, খুব বেশি কিছু কিন্তু নয়, তবে আপনাদের আশির্বাদে ক্কচিৎ কখনো ঈল্ মাছও খাওয়া হয়। ঈল্ মাছ নাকাতার খুব প্রিয়।"

"আরে, আমারও খুব প্রিয়। অনেক আগে একবার মাত্র খেয়েছিলাম, এখন আর, কেমন স্বাদ ছিল মনেও করতে পারছি না।"

"হ্যাঁ, ঈল্ একটা বেশ ভাল জিনিস। অন্য খাবারের থেকে একটু আলাদাই। পৃথিবীতে সব খাবারেরই বিকল্প আছে, কিন্তু ঈলের বিকল্প কোথাও আছে বলে নাকাতার অন্তত জানার মধ্যে নেই।"

সেই ফাঁকা জমির সামনের বড়রাস্তা দিয়ে একটি অল্পবয়স্ক ছেলে যাচ্ছিল বিরাট এক ল্যাব্রাডর কুকুর নিয়ে। কুকুরটার গলায় একটা লাল ব্যান্ডানা জড়ানো। কুকুরটা আড়চোখে একঝলক ওওৎসুকাবাবুকে দেখামাত্র ওখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ফাঁকা জমিতে বসে দুজনে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে, কুকুরটা আর ছেলেটা চলে যাওয়ার।

"বেড়াল খোঁজেন বলে যে বলছেন, সেটা কী ব্যাপার?" বেড়াল ওওৎসুকাবাবু জানতে চায়।

"হ্যাঁ, হারিয়ে যাওয়া বেড়াল খোঁজা। বেড়ালমশাইদের সঙ্গে এরকম অল্পস্বল্প কথা বলতে পারি বলে এদিক ওদিক ঘুরে খ-ব-র যোগাড় করি আর এইভাবে হারিয়ে যাওয়া বেড়ালের খোঁজ ঠিক বের করে ফেলি। এই করে রটে গেছে যে নাকাতার বেড়াল খুঁজে বের করার ভাল এলেম আছে, আর তাতে এখান থেকে ওখান থেকে হারিয়ে যাওয়া বেড়ালমশাইকে খুঁজে বের করে দেওয়ার অনুরোধ আসে। আজকাল তো বেড়াল খুঁজতে বেরোই না, এমন দিন খুব কমই হয়। দূরে যাওয়া ব্যাপারটা নাকাতার সবচেয়ে খারাপ লাগে বলে নাকানো-কু[1] এলাকার মধ্যেই শুধু খুঁজবো বলে ঠিক করেছি। না

[1] নাকানো-ওয়ার্ড

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করলে শেষে উলটে নাকাতাই হারিয়ে যাবে।"

"তাহলে এখনও বেড়াল খুঁজতেই বেরিয়েছেন, তাই না?"
"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এখন খুঁজছি একটি একবছর বয়েসের তিনরঙা বেড়ালকে, নাম হচ্ছে *গোমা*। এই তার ফটোও আছে", নাকাতা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে রঙীন ছবি বের করে ওওৎসুকাবাবুকে দেখাল।

"এই যে সেই বেড়ালমশাই। চায়ের রঙের ফ্লী-কলার পরানো।"

ওওৎসুকাবাবু গলা বাড়িয়ে সেই ফটো দেখল। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল।

"উহুঁ, এটাকে তো দেখিনি। এই এলাকার বেড়াল হলে, মোটামুটি সবগুলোকেই আমি চিনি, কিন্তু এটাকে চিনিনা। দেখিওনি... শুনিওনি।"

"তাই বুঝি?"

"আপনি কি তাহলে অনেকদিন ধরে খুঁজছেন এই বেড়ালটাকে?"

"উমম্, আজকে নিয়ে... এক, দুই, তিন হলে তৃতীয়দিন হল।"

ওওৎসুকাবাবু কিছুক্ষণের জন্য ভাবিত হয়ে পড়ল। তারপর বলল,"আপনিও জানেন হয়তো, বেড়ালরা হল গিয়ে, খুবই প্রথা মেনে চলা প্রাণী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে ঠিকঠাক নিয়ম মেনে চলে, বড় কিছু না ঘটলে, খুব বেশি পরিবর্তন পছন্দ করে না। বড় কিছু বলতে, সেক্স হতে পারে, কিংবা কোনো দুর্ঘটনা, সাধারণত এর মধ্যে কোনো একটা।"

"হ্যাঁ, নাকাতাও সেরকমই ভাবছে।"

"সেক্স হলে, কিছু সময় পরে, একটু ঠান্ডা হলেই ফিরে আসবে। আপনি সেক্স ব্যাপারটা বোঝেন তো?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। অভিজ্ঞতা নেই নিজের, তবে মোটামুটি ব্যাপারটা ধরতে পারি। পুরুষাঙ্গের ব্যাপার।"

"ঠিকই ধরেছেন, পুরুষাঙ্গের ব্যাপার", ওওৎসুকাবাবু মুখটা খুব সিরিয়াস করে সায় দিল। "কিন্তু যদি অ্যাকসিডেন্ট ঘটে থাকে কোনো, তাহলে অবশ্য ফিরে আসা মুশকিল।"

"হ্যাঁ, তাই তো।"

"এছাড়াও সেক্সের তাড়নায় দূরে কোথাও যদি ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়ে থাকে, সেই পরিস্থিতিতে ফিরে আসার রাস্তা চিনে নিতে পারবে কি না সন্দেহ।"

"সত্যি বলতে কী, একবার নাকানো-কু'র বাইরে চলে গিয়ে, নাকাতাও রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল।"

"আমারও বেশ ক'বার এরকম হয়েছে। অবশ্য সে অনেক আগে অল্পবয়েসের সময়", স্মৃতিচারণ করার ঢঙে চোখ সরু করে ওওৎসুকাবাবু বলল। "একবার রাস্তা চিনতে না পারলেই প্যানিক হতে থাকে। চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। কোনটা যে কী তাই গুলিয়ে যায়, চিনতে পারা যায় না। খুব বাজে ব্যাপার। সেক্স জিনিসটাই না, বেশ ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু তখন আর ওটা ছাড়া অন্য কিছুতে মনই দেওয়া যায় না। পরে কী হবে, সেসব কিছুই ভেবে ওঠা যায় না। এই হচ্ছে... সেক্স। এইজন্যই, ইয়ে, কী বলছিলাম যেন, পাওয়া যাচ্ছে না বেড়ালটার নাম যেন কী?"

"গোমা-র কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই গোমার ব্যাপারটায়, আমি খুঁজে বের করায় খানিকটা সাহায্য করতে চাই। কোনো বাড়িতে আদরে পোষা তিনরঙা বেড়াল, একবছর মাত্র বয়েস, পৃথিবীর কোনো খবরই রাখে না, লড়াই টড়াইও করতে পারবে না, নিজে নিজে ভাতের যোগাড়ও করতে পারবে না। আহা রে! আর তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ভাবতেই খারাপ লাগছে। অন্যান্য জায়গায় গিয়ে খুঁজতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বলছেন? তাহলে, আপনি যেমন বলছেন সেভাবেই অন্যান্য এলাকাতেই গিয়ে খুঁজে দেখব তো। ওওৎসুকাবাবুর দিবানিদ্রার জায়গায় এসে বিরক্ত করার জন্য খুবই দুঃখিত। মাঝে কখনো আবারও এসে হাজির হয়ে যাব বলেই মনে হয়, এর মধ্যে যদি গোমার দেখা পান, অবশ্যই নাকাতাকে জানাবেন। বলাটা অশোভন হচ্ছে হয়তো, যতদূর পারি সামর্থ্য মত পারিশ্রমিকও দেব।"

"আচ্ছা বেশ, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে বেশ ভালই লাগল। আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত তাহলে... এই কথাই রইল। আবহাওয়া ভাল থাকলে এইসময়টায় আমাকে এই ফাঁকা জায়গাটাতে অনেকদিনই পাওয়া যায়। বৃষ্টিবাদলা হলে, ঐ যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে জিনজা[1], ওখানে থাকি।"

"হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ। নাকাতাও ওওৎসুকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করে খুবই আনন্দিত হয়েছে। বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারি বলে বলি বটে, যে কারুর সঙ্গে তো আর এরকম অনর্গল কথা বলার মত মিল হয় না। মাঝখানে আমি কিছু বলতে গেলেই সাবধান হয়ে গিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে কোথাও একটা চলে যায় এমন বেড়ালমশাইও আছেন। আমি হয়তো নেহাতই সম্ভাষণ করেছিলাম মাত্র।"

"তা হতে পারে। কেননা, মানুষের মধ্যেও যেমন নানারকম মানুষ আছে, সেরকমই বেড়ালের মধ্যেও নানারকম আছে।"

"ঠিকই। প্রকৃতপক্ষে নাকাতারও এটাই মনে হয়। পৃথিবীতে নানারকম মানুষও আছে, আবার নানারকম বেড়ালমশাইও আছেন।"

ওওৎসুকাবাবু মেরুদন্ড টানটান করে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। সূর্য তখন ঐ ফাঁকা জায়গাটায় বছরশেষের সোনালি আলো ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টির একটা মৃদু লক্ষণ তাতেও ভাসছে। ওওৎসুকাবাবু সেটা ধরতে পারছিলেন।

[1]শিনতোও ধর্মের উপাসনাস্থল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আচ্ছা, আপনি বললেন না, যে ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় পড়ে বুদ্ধিশুদ্ধি কমে গেছে? হ্যাঁ, সেরকমই তো বললেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। সেরকমই বলেছিলাম। নাকাতার বয়েস যখন ন'বছর, তখন দুর্ঘটনায় পড়েছিল।"

"কী ধরণের দুর্ঘটনা ছিল সেটা?"

"সেটা... কোনোভাবেই ঠিক মনে করতে পারি না। বলতে শুনেছি, এক অজ্ঞাত কারণে সানস্ট্রোকের মতো হয়ে, তিন সপ্তাহের মধ্যেও নাকি নাকাতার জ্ঞান ফেরেনি। পুরো সময়টা হাসপাতালের বেডে ড্রিপ দেওয়া হচ্ছিল আর আমি ঘুমিয়েছিলাম। শেষটায় জ্ঞান যখন ফিরে এল, দেখা গেল যে সেই অবধি যা কিছু ঘটেছে সবই এক্কেবারে ভুলে গিয়েছি। বাবার মুখ ভুলে গিয়েছি, মা-র মুখও ভুলে গিয়েছি, লেখা পড়তে পারছি না, গুণতেও পারছি না, যে বাড়িতে থাকতাম সেটার কোথায় কী, এমনকি নিজের নাম পর্যন্ত, সবই ভুলে গেছি। চৌবাচ্চার কল খুলে গিয়েছে যেন, মাথার ভেতর যা কিছু ছিল বেরিয়ে গিয়ে এক্কেবারে ধুয়েমুছে সাফসুতরো। দুর্ঘটনাটা ঘটার আগে, শুনেছি নাকাতা ছিল খুব ভাল রেজাল্ট করা বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু ঐ সময় হঠাৎ করেই লুটিয়ে পড়ে, তারপর যখন হুঁশ ফিরে চোখ খুলল, বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে কমে। আমার মা, মারা গেছেন অনেক দিন হল, এতে খুব কেঁদেছিলেন। নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি কমে গেছে, এতে মায়ের না কেঁদে উপায় কী। বাবা কাঁদেননি বটে, কিন্তু সবসময় খুব খিটখিটে হয়ে থাকতেন।"

"কিন্তু তার বিনিময়ে বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন।"

"তা পারলাম।"

"হুমম্।"

"তার ওপর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গিয়ে কখনো অসুখবিসুখও করেনি, দাঁতে পোকাও হয়নি, চশমাও পরি না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“আমার কিন্তু দেখে যেটুকু মনে হচ্ছে, তাতে আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি মোটেই কম নয়।”

“তাই নাকি,” ঘাড় ঘুরিয়ে নাকাতা বললেন। “কিন্তু, ওওৎসুকাবাবু, নাকাতার কিন্তু অনেকদিন হল ষাট পেরিয়ে গেছে। ষাট হয়ে গেলেই লোকের অনেক কিছু সয়ে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি যে কম সেটা সয়ে যায়, সবার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয়না, সেটাও সয়ে যায়। ট্রেনে না চেপেও দিব্যি বেঁচে থাকা যায়। বাবা মারা গেছেন, আর মারধোর খাওয়ার প্রশ্ন নেই। মা-ও মারা গেছেন, কান্নাকাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ করে, তোমার ভাই বুদ্ধিশুদ্ধি মোটেই কম নয় বললে বরং নাকাতার মুশকিলই হবে হয়তো। বুদ্ধিশুদ্ধি কম নয় বলে হয়তো রাজ্যপালের থেকে ভা-তা আর পাব না, স্পেশাল পাস দেখিয়ে আর হয়তো সিটি বাসে চড়তেও পাব না। ধরুন যদি, রাজ্যপাল ডেকে ধমকে বলেন যে তোমার তো মোটেই বুদ্ধিশুদ্ধি কম নয়, উত্তরে কিছুই বলার নেই। এইসব কারণেই, নাকাতার এভাবেই বুদ্ধিশুদ্ধি কম হয়ে থাকাটাই ভাল বলে মনে হচ্ছে।”

“আরে, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, সেটা হল, আপনার সমস্যাটা যেখানে, সেটা মোটেই আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি কমের ব্যাপার নয়।” ওওৎসুকাবাবু মুখটা সিরিয়াস করে বলল।

“ওহ, তাই বুঝি?”

“আপনার সমস্যার জায়গাটা হল, বুঝলেন তো, এটা নেহাতই আমার ধারণা যদিও, আপনার... ছায়াটা একটু যেন ফিকে মতো। প্রথম দেখে থেকেই আমার মনে হচ্ছিল কথাটা, মাটিতে যে ছায়াটা পড়ে সেটা একটু ফিকে, গাঢ়ত্ব সাধারণ লোকের ছায়ার প্রায় অর্দ্ধেক।”

“ওহ্!”

“আমি, এর আগেও একবার এরকম একজন লোক দেখেছিলাম।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাকাতা মুখটা অল্প হাঁ করে ওওৎসুকাবাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

"আগেও দেখেছেন বলতে, নাকাতারই মতো আরো একজনকে দেখেছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো আপনি এসে আমার সঙ্গে কথা বলাতেও তেমন আশ্চর্য হইনি।"

"মোটামুটি কবেকার কথা এটা?"

"অনেক আগে, তখনও আমার বয়েস বেশ কমই। তবে, মুখ, নাম-ধাম, স্থান, কাল কিছুই মনে করতে পারছি না। এই যেটা এক্ষুণি বললাম, বেড়ালেরা ঐ ধরণের জিনিস দিয়ে মনে রাখে না বলেই।"

"ওহ্!"

"তো, সেই লোকটার ছায়াটাও, কোথায় যেন অর্দ্ধেক ছেড়ে দিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছিল। একইরকম ফিকে।"

"ওহ্!"

"তাই বলছি, কোথাকার কোন হারিয়ে যাওয়া বেড়াল খুঁজে না বেড়িয়ে, নিজের ছায়ার বাকি আদ্ধেকটা সিরিয়াসলি খুঁজলেই বরং ভাল হবে বলে মনে হয়।"

হাতে ধরা মাউন্টেনিয়ারের টুপিটার ধারগুলো বারবারই টানাটানি করতে থাকে নাকাতা। "সত্যি বলতে কী, সেকথা নাকাতারও খানিকটা খানিকটা মনে হয়েছিল। ছায়াটা যে ফিকে। অন্য লোকে খেয়াল করে না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি।"

"সেটাই তো ভাল", বেড়াল বলে।

"কিন্তু, একটু আগেও যে কথাটা বললাম, নাকাতার বয়েস হয়েছে, আর কিছুদিন বাদেই মারা যাবে। মা-ও আগেই মারা গেছেন, বাবাও আগেই মারা গেছেন। বুদ্ধিশুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, লিখতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পারুক বা না পারুক, ছায়াটা ঠিকঠাক হোক বা না হোক, সকলেই সময় হয়ে এলে, একসময় মারা যায়। মরে যাব, পুড়িয়ে ফেলবে। ছাই হয়ে কারাসুয়ামা বলে একটা জায়গায় কোনো কবরে ঢুকে যাব। কারাসুয়ামা হল গিয়ে সেতাগায়া-কু'তে। কারাসুয়ামার কবরে একবার ঢুকে গেলে তো, আর হয়তো কিছু ভাবতেই পারবো না। ভাবতে না পারলে তো আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। অতএব, নাকাতা সম্ভবত এভাবেই যথেষ্ট ভাল আছে, কী বলেন ? তার ওপর, নাকাতা পারতপক্ষে, যতদিন বেঁচে আছে, তার মধ্যে আর নাকানো-কু ছেড়ে বাইরে বেরোতে চায় না। মরে যাওয়ার পরে যে কারাসুয়ামায় যেতেই হবে, সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু করার নেই।"

"কী ভাববেন না ভাববেন, সেটা অবশ্য আপনার যেমন মর্জি", ওওৎসুকাবাবু বলল। তারপর আবার কিছুক্ষণ থাবা চাটল। "তবে কিনা, ছায়ার ব্যাপারটাও একটু ভেবে রাখলেই সম্ভবত ভাল হত। ছায়াটার মধ্যেও আত্মাভিমান জিনিসটা খর্ব হয়ে আছে হয়তো। আমি ছায়া হলে পরে, এরকম আদ্ধেক হয়ে থাকাটা আমার পছন্দ হত না।"

"ওহ", নাকাতা বললেন। "তাই বুঝি। তা হবে। এরকমটা তো কখনও ভাবিইনি। বাড়ি ফিরে অবকাশ মত ভেবে দেখব।"

"ভেবে দেখলেই কিন্তু ভাল করবেন।"

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কিছু বলে না। তারপর নাকাতা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে, ট্রাউজারে লেগে থাকা ঘাস খুব মন দিয়ে পরিস্কার করলেন। সেই অন্তিম দশার পর্বতারোহীর টুপিটা আরেকবার মাথায় পরলেন। পরাটা ঠিকমত হচ্ছিল না, কয়েকবারই ঠিকমত হওয়ার জন্য এদিক সেদিক করে, শেষে বরাবর যেমন পরেন, ঠিক সেই একই কোণে হেলিয়ে নিলেন ধারগুলো। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন।

"আন্তরিক ধন্যবাদ। ওওৎসুকাবাবুর মতামত প্রকৃতই আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়েছে। কোনোরকম অসুখবিসুখ ছাড়াই সুস্থ দেহে কাটান।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আপনিও তা-ই করুন।"

নাকাতা চলেই যেতেই, ওওৎসুকাবাবু আবার ঘাসের মধ্যে টানটান হয়ে শুয়ে, চোখ বন্ধ করল। মেঘ ঘনিয়ে বৃষ্টি শুরু হতে তখনও কিছু সময় বাকি আছে। অবিলম্বে কোনওরকম ভাবনা ব্যতিরেকেই অনতিদীর্ঘ একটি ঘুমের মধ্যে নিমজ্জিত হল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭

৭:১৫-তে লবির কাছেই একটা ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্ট সারলাম, টোস্ট, হট-মিল্ক, হ্যাম, এগ। বিজনেস হোটেলে ব্রেকফাস্টের দামও চার্জের মধ্যে ধরা ছিল, যে যাই বলুক, খাবারের পরিমানটা আমার কাছে বেশ কমই ঠেকল। চোখের পলকে কোথায় নেমে গিয়ে, প্রায় কিছু খাইনি বলেই মনে হতে থাকল। কিছু না ভেবেই আমি চারপাশে তাকাতে থাকি, কিন্তু টোস্ট আরও দু একটা আসবে বলে কোনোই ইঙ্গিত নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার ভেতর থেকে।

"এছাড়া আর উপায়ান্তরও তো নেই", কারাসু নামে অল্পবয়েসি ছেলেটা বলে। দেখি, টেবিলের উল্টোদিকেই চেয়ারে বসে আছে ও।

"যে খাবারগুলো পছন্দ শুধুমাত্র সেগুলোই মুখে রোচে এরকম বাধ্যবাধকতা তোমার আর নেই দেখছি। অবশ্য এখন তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ছেলে। এই সত্যটা এখন মাথার ভেতরে ঢুকিয়ে নিতেই হবে। এযাবৎ সর্বদাই তুমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে, বেশ পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছ। কিন্তু এখন থেকে তা আর চলবে না। যেটুকু যা মিলবে সেটুকু দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে। খাবারের পরিমাণ অনুসারে পেট বড় ছোট হওয়ার গল্প নিশ্চয়ই কোথাও কখনো শুনেছ। এবার হয়তো তুমি সেটা সত্যিই হয় কিনা সরাসরি যাচাই করে দেখতে পারবে। তদ্দিনে পেটও ছোট হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে। বলছি বটে এত কিছু, কিন্তু সহ্য হবে কিনা ভাবছি।"

"আরে না না, সহ্য হয়ে যাবে", আমি বললাম।

"হতেই হবে!" অল্পবয়েসি ছেলে কারাসু বলে। "নইলে আর তুমি জগতের সবচেয়ে টাফ পনেরো বছরের তরুণ কেন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"যাকগে, খালি প্লেটের দিকে তাকিয়ে অন্তহীন বসে থাকা ছেড়ে শিগগির এর পরে যেটা করার সেটাতে চলে যাও।"

যথা আজ্ঞা আমি উঠে দাঁড়িয়ে, এর পরে যেটা করার সেটাতে চলে গেলাম।

হোটেলের ফ্রন্ট-ডেস্কে গিয়ে কথাবার্তা বলে দেখতে হবে থাকতে গেলে কী শর্ত ইত্যাদি। আমি টোকিওতে একটা প্রাইভেট হাইস্কুলের ছাত্র, গ্র্যাজুয়েশন রিপোর্ট তৈরি করতে এখানে এসেছি (আমি যে স্কুলটাতে পড়তাম তার হাইস্কুল সেকশনে সত্যিই এরকম একটা সিস্টেম ছিল), ঐ বিশেষ বিষয়টার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র খুঁজতে কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগারে যাতায়াত করতে হচ্ছে। খুঁটিয়ে পড়ে দেখার মতো এত জিনিস বেরুল যা আগে ভাবিনি, কোনোমতেই অন্তত এক সপ্তাহ তাকামাৎসুতে থেকে না গেলেই নয়। কিন্তু বাজেটে কুলোচ্ছে না। তাই, আগে যেরকম ঠিক হয়েছিল, সেই কেবল তিনদিনের পরিবর্তে ঠিক যতদিন আরো আছি, ঐ ওয়াইএমসিএ-র মাধ্যমে পাওয়া শস্তা রেটে থাকতে দেবেন কি? প্রত্যেকদিনের ভাড়া আগের দিনই দিয়ে দেব, কোনওভাবে বিরক্তও করব না, সেটাও কথা দিচ্ছি।

যেন সমস্যায় পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়া ভাল ঘরের অল্পবয়েসি ছেলে, এইরকম একটা অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে তুলে ওখানকার ফ্রন্ট-ডেস্কের অল্পবয়েসি মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে, যে পরিস্থিতিতে পড়তে চলেছি সেটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমার চুলও রঙ করা নয়, কানও বেঁধানো নয়। পরনে র‍্যাল্‌ফ লোরেনের পরিচ্ছন্ন সাদা পোলো-শার্ট, র‍্যাল্‌ফ লোরেনেরই ঘিয়ে রঙের চিনো প্যান্টস আর টপসাইডারের নতুন স্নিকার। দাঁত ঝকঝকে সাদা, গা থেকে সাবান, শ্যাম্পুর সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। নিখুঁত সৌজন্যমূলক ভাষা। চাইলে আমি বয়োঃজ্যেষ্ঠদের কাছে খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার মতো ইমপ্রেশন তৈরি করতে পারি।

মেয়েটা আমার কাহিনী চুপ করে শুনে, ঠোঁটটা সামান্য কুঁচকে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাথা সামনে ঝোঁকায়। মেয়েটির গড়ন ছোটখাটো, সাদা ব্লাউজের ওপরে গ্রীন ব্লেজার-কোটের ইউনিফর্ম পরা। চোখে সামান্য ঘুম লেগে আছে বলে মনে হলেও, বেশ সুষ্ঠুভাবে সকালের ডিউটি সামলাচ্ছে। বয়েস হয়তো আমার দিদিরই সমান হবে।

পরিস্থিতিটা মোটামুটি বুঝতে পারলাম, আমি এই নিয়ে কিছু বলতে পারি না, ঘরের চার্জ নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখছি, মনে হয় লাঞ্চের আগেই কী হল তা জানা যাবে, মেয়েটি বেশ বিজনেস লাইক ভঙ্গিতে বলল (যদিও আমাকে যে পছন্দ করছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল)। তারপর আমার নাম আর ঘরের নম্বর জিজ্ঞেস করে নোট করে রাখলো। এই ধরণের প্রস্তাব বিনিময়ে কতদূর কী হবে, আমার জানা নেই। একেবারে বিপরীত ফলও হয়ে পারে—যেমন ধরা যাক, আমাকে স্টুডেন্ট আইডি দেখাতে বলে বসতে পারে। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারে (বোর্ডারদের নাম ধাম ইত্যাদির রেজিস্টারে অবশ্যই হাবিজাবি ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছি)। তবে, সেসব ঝুঁকি থাকলেও চেষ্টা করে দেখার একটা মূল্য আছে বলেই মনে হয়। হাতে যখন পয়সাকড়ি খুবই সীমিত।

হোটেলের লবিতে রাখা টাউন-পেজ থেকে সবাই যেতে পারে এরকম জিমনাসিয়ামের ফোন নাম্বার বের করলাম। সেখানে ওয়ার্ক-আউট রুমে কী কী যন্ত্র রাখা আছে তার খোঁজখবর নিলাম। আমার যেগুলো দরকার, সেইসব যন্ত্র মোটামুটি সবই আছে। চার্জ ৬০০ ইয়েন। জায়গাটা কোথায় জিজ্ঞেস করে স্টেশন থেকে কীভাবে যাব জেনে নিলাম, তারপর শিষ্টতাসূচক অভিবাদন করে ফোন রেখে দিলাম।

ঘরে ফিরে ব্যাকপ্যাক কাঁধে চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লাগেজ ঘরেও রেখে যেতে পারতাম। পয়সাকড়ি লকারে জমা রেখে যেতে পারতাম। হয়তো সেটাই নিরাপদ হত। কিন্তু সম্ভব হলে সবসময় নিজের কাছে রাখাই আমার পছন্দ। এখন ওগুলো আমার শরীরেরই একটা অংশ হয়ে পড়েছে।

স্টেশনের সামনের টার্মিনাস থেকে বাসে চড়ে জিমনাসিয়ামে গেলাম। টেনশন তো হচ্ছেই। মুখের অভিব্যক্তি যে আশঙ্কায় আড়ষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়ে রয়েছে তা টের পেলাম। আমার মতো বয়েসের একজন, আর পাঁচটা কর্মব্যস্ত দিনের মতোই একটা দিনে, এই দুপুরবেলা, একা একা এসে যে জিমে ঢুকলাম, কারুর খটকা লাগতেই পারে। যত যাই হোক, অচেনা শহর, লোকজনের মানসিকতা ঠিক কেমন এখনও ধরতে পারিনি। তবে কেউই আমাকে বিশেষ খেয়াল করছে না। বরং বলা যায়, আমিই যেন মায়াবলে স্বচ্ছ হয়ে গেছি। ঢোকার মুখে কোনো কথা না বলে পেমেন্ট করে, নিঃশব্দে লকারের চাবিটা নিয়ে নিলাম। লকার রুমে পোশাক পালটে জিমে পরার মত শর্টস আর হালকা টি-শার্ট পরে নিলাম। স্ট্রেচ করে মাসলগুলোকে শিথিল করতে করতে খানিকটা ধাতস্থ হলাম। আমি এখন 'আমি' নামক আধারটির মধ্যে অবস্থান করছি। 'আমি' নামক অস্তিত্বটির খোলসটা টুক করে দিব্যি এর একটার ওপরে চাপিয়ে নিয়ে লক করে দিচ্ছি। এই বেশ চলছে। আমি আমার জায়গাতেই আছি।

সার্কিট ট্রেনিং শুরু করে দিলাম। মিনিডিস্ক ওয়কম্যানে 'প্রিন্স' শুনতে শুনতে পুরো একঘন্টা ধরে ক্রমানুসারে সাতটা মেশিনের প্রক্রিয়া সারলাম। স্থানীয় পাবলিক জিমনাসিয়াম বলে ভেবেছিলাম পুরনো মেশিন হবে হয়তো, কিন্তু আসলে ঝাঁ চকচকে নতুন মেশিন সব। একেবারে নতুন স্টীলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। শুরুতে অল্প ভার চাপিয়ে গোড়ার রাউন্ডটা করে নিয়ে তারপর ভার অনেকটা বাড়িয়ে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডটা করলাম। একেবারে সবটাই লিস্ট ধরে নয়, আমার শরীরের পক্ষে যুতসই ওজন আর ক'বার করতে হবে সেসব মাথায় গেঁথে রয়েছে। অল্পসময়েই সারা শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে মাঝেমাঝেই জলের যোগান না দিলেই নয়। ওয়াটার কুলারের জল খেয়ে, বার বারই কিনে আনা লেবু একটু করে চুষে নিচ্ছিলাম।

যত রাউন্ড করার কথা, তার সব সাঙ্গ হলে পর হট-শাওয়ার নিলাম একটা, সঙ্গে আনা সাবান দিয়ে গাত্রমার্জনা হল, চুলও শ্যাম্পু করে নিলাম। সামনের চামড়াটা সবে গুটিয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গটি যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে রাখলাম। বগল, অন্ডকোষ, পায়ুদ্বার সবই গভীর মনোযোগ সহকারে পরিষ্কার করলাম। একবার ওজনটা দেখে নিয়ে, আয়নার সামনে উদোম হয়ে দাঁড়িয়ে মাসলগুলো পুষ্ট আছে কিনা দেখে নিলাম। ঘামে ভিজে যাওয়া জিম করার শর্টস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর টি-শার্ট ওয়াশিং মেশিনে জলে ওয়াশ করে, ভাল করে নিংড়ে নিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে নিলাম।

জিমনাসিয়াম থেকে বেরিয়ে, বাসে চেপে আবার স্টেশনে ফিরে এলাম, স্টেশনের সামনের সেই আগের দিনের উদোনের দোকানে ঢুকলাম। খাওয়া হল গরমা-গরম উদোন। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে খেতে খেতে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম। কত যে লোক স্টেশন চত্বরে যাওয়া আসা করছে। সকলেই নিজের নিজের পছন্দ মত পোষাক পরে, মালপত্র নিয়ে, অচঞ্চল পায়ে যাচ্ছে আসছে, হয়তো বা যার যার নিজের মনোবাঞ্ছা নিয়ে কোনোদিকে চলেছে। আমি সেইসব লোকেদের দিকে অপলকে চেয়ে আছি। একসময় হঠাৎ করেই আমার একশো বছর পরের কথা মনে হল।

এখন থেকে একশো বছর পরে, এখানে যারা আছে তারা সবাই (আমিও তার মধ্যে আছি) পৃথিবীর বুক থেকে মিলিয়ে যাবে, ধুলো কিংবা ছাই হয়ে যাবার কথা। এটা ভাবলেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে। ওখানে যা কিছু ঘটছে কিংবা আছে সবই কেমন যেন পলকের বিভ্রম বলে মনে প্রতিভাত হয়। দেখে মনে হয় যেন হাওয়া দিলেই এদিক ওদিক উড়ে যাবে। আমি নিজের দুটো হাতই সামনে ছড়িয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। আমিই বা আদৌ কোমর বেঁধে এতসব করতে যাচ্ছি কেন? এরকম মরীয়াভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনই বা কেন?

তবে একসময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকা বন্ধ করলাম। একশো বছর পরে কী হবে সেই ভাবনাতেও যতি টানলাম। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই বরং ভাবা যাক। লাইব্রেরিতে পড়ার মতো বই রয়েছে, জিমে ওয়র্ক-আউট করার মত মেশিন আছে। এইসব করনীয় জিনিসের কথাও না ভাবলে চলবে কেন। "ভাবতেই হবে", তরুণ কারাসু বলে ওঠে। "এই জন্যেই না তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে টাফ পনেরো বছরের তরুণ।"

আগের দিনের মতোই স্টেশনের দোকান থেকে লাঞ্চবক্স কিনে নিলাম, নিয়ে ট্রেনে চাপলাম। কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগারে গিয়ে পৌঁছোলাম [illegible] এগারোটায়। কাউন্টারে যথারীতি ওশিমা বসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আছে। গলা পর্যন্ত বোতাম আটকানো ব্লু-রেয়নের শার্ট, সাদা জীনসের সঙ্গে সাদা টেনিস শ্যু, এই বেশে ডেস্কের দিকে মুখ করে এক ইয়া মোটা বই পড়ছে। সেই আগের (সম্ভবত) লম্বা হলুদ পেনসিলটি পাশে রাখা আছে। সামনের চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে। আমি ঢুকতেই মুখ তুলে হেসে আমার মালপত্র জমা করে নিল।

"স্কুলে তাহলে এখনও ফিরে যাওনি দেখছি।"

"এখনই যাব না স্কুলে ফিরে", আমি অকপটে বললাম।

"লাইব্রেরিও বিকল্প হিসেবে খারাপ নয়", ওশিমা বলে। ঘুরে পেছনের ঘড়িতে সময়টা দেখে নেয়। তারপর আবার বইয়ের পাতায় ফিরে যায়।

রীডিংরুমে গিয়ে বার্টন এডিশনের 'সহস্র এক আরব্যরজনী' খুলে বাকিটুকু পড়তে থাকি। সবসময়ই যেটা হয়, একবার বসে বইয়ের পাতা ওল্টাতে শুরু করলেই আর মাঝখানে বন্ধ করতে পারি না। বার্টন এডিশনের 'সহস্র এক আরব্যরজনী'-তে অনেক আগে লাইব্রেরিতে পড়া শিশু-সংস্করণের গল্পগুলোই আছে ঠিকই, কিন্তু এখানে অনেক দীর্ঘ, আর খুঁটিনাটি এপিসোডও অনেক বেশি রয়েছে বলে একেবারে একই বলে বলা যাবে না। পুরোটাই বেশ চিত্তাকর্ষক। নানা গোলমেলে, হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ও যৌনতায় ভরা সব কাহিনী, আজগুবি গল্পও বহু আছে। কিন্তু সেসবই (ঠিক সেই ম্যাজিক ল্যাম্পের ভেতরের ভুতের মতই) স্বাভাবিক যুক্তিতে বাঁধা পড়ে না এমনই স্বাধীন প্রাণশক্তিতে ভরপুর যে আমার মন একেবারে অধিকার করে বসলো, আর ছাড়ানো যায় না। স্টেশন চত্বরে ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য বিশেষত্বহীন মানুষজনের চেয়ে বরং হাজার বছরেরও বেশি আগে লেখা আজগুবি সব বানানো গল্পই অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিল। কেন এমন হয় কে জানে। আমার কাছে খুবই আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়।

১টা বাজতে আবারও গিয়ে গ্রীনজোনে বসে সঙ্গে আনা লাঞ্চ খেলাম। সবে আদ্ধেক খেয়েছি, এমন সময় ওশিমা এসে বলল যে আমার ফোন এসেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ফোন?" কিছু ভাবার আগেই আমার বাক্যি হরে যায়। "ফোন?"

"যদি তামুরা কাফকা তোমারই নাম হয়ে থাকে আর কী।"

আমি লাল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর বাড়িয়ে দেওয়া কর্ডলেস ফোনটা হাতে নিলাম।

হোটেলের ফ্রন্ট-ডেস্কের মেয়েটির থেকে আসা ফোন। আমি সত্যিই কোওমুরা পাঠাগারে এসে কিছুর সন্ধান করছি কিনা যাচাই করে নিতে চাইছে হয়তো। গলা শুনে মনে হল, আমি যে মিথ্যে বলছি না তা বুঝতে পেরে যেন নিশ্চিন্ত হল। একটু আগে আপনার ব্যাপারে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হল। আগে কখনও এরকম করার নজির নেই যদিও, অল্পবয়েসী ও তার ওপর এই পরিস্থিতি দেখে এখন থেকে আগামী কিছুদিন ওয়াইএমসিএ-র মাধ্যমে অফার করা রেটেই থাকার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে ম্যানেজার বললেন। এখন তেমন ব্যস্ততার সীজন নয় বলেই এটুকু সুবিধে করে দেওয়াই যায়। খুবই যে নামকরা লাইব্রেরি, ওখানে সময় নিয়ে ভাল করে খোঁজাখুঁজি সেরে নেওয়াই যে ভাল সেটা ম্যানেজারও বলছিলেন, বলে মেয়েটা বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি ধন্যবাদ জানালাম। মিথ্যে বলছি কিনা সেই ব্যাপারে মনে যে একটুও ব্যথা পাইনি এমন নয়, তবু করার তো কিছু নেই। বেঁচে থাকার জন্য কত কিছুই যে করতে হয়। ফোন বন্ধ করে ওশিমার হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

"এখানে তো হাইস্কুলের ছেলে বলতে তুমিই, তোমার কথাই হয়তো বলছে, বলে ভাবলাম" ও বলল। "তবে, বলে রেখেছি যে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বই পড়ে যাচ্ছে। আর কথাটা তো সত্যি, তাই না?"

"ধন্যবাদ", আমি বলি।

"তামুরা কাফকা?"

"হ্যাঁ, আমার নাম।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"অদ্ভুত নাম তো!"

"কিন্তু ওটাই আমার নাম", আমি জোর দিয়ে বলি।

"তুমি নিশ্চয়ই ফ্রান্‌জ কাফকার লেখা বেশ কিছু পড়েছ, ঠিক কি না?"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "*দ্য ক্যাসল,* আর *দ্য ট্রায়াল* আর *মেটামরফোসিস,* এছাড়া একটা অদ্ভুত গল্প যাতে একটা শাস্তি দেওয়ার যন্ত্রের কথা আছে।"

"*ইন দ্য পেনাল কলোনি*", ওশিমা বলে। "আমার খুব প্রিয় গল্প। পৃথিবীতে অনেক লেখকই আছেন, কিন্তু কাফকা ছাড়া আর অন্য কেউ ঐ গল্প লিখতে পারতেন না।"

"আমারও, ছোটগল্পের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে প্রিয়।"

"সত্যি?"

আমি সায় জানাই।

"কোন দিক থেকে?"

আমি ভাবতে থাকি সেটা নিয়ে। কিন্তু ভেবে উঠতে সময় লাগে। "কাফকা, আমরা যে পরিস্থিতিটায় রয়েছি সেটা বিশদে বলার পরিবর্তে বরং ঐ জটিল যন্ত্রটার একটা যথার্থ যান্ত্রিক বিবরণ দিচ্ছেন। এককথায় এইই...", আমি আবারও খানিক ভাবতে থাকি। "এককথায়, এভাবেই উনি, আমরা যেভাবে আছি সেই পরিস্থিতিটা যে কারুর থেকে আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে পেরেছেন। পরিস্থিতি সম্বন্ধে না বলে বরং যন্ত্রটার বিষয়ে খুঁটিয়ে বলে।"

"বুঝতে পারছি", ওশিমা বলে। তারপর আমার কাঁধে হাত রাখে। বোঝাই যায় এতে একটা আন্তরিক ভাল লাগার বার্তা আছে।

"ঠিকই, ফ্রান্‌জ কাফকা নিজেও হয়তো তোমার এই দৃষ্টিকোণটাকে মান্যতা দিতেন বলেই মনে হয়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে ও আবার বিল্ডিং-এর ভেতর ফিরে যায়। আমি আবার আগের মতোই গ্রীনজোনে বসে একা একা লাঞ্চের বাকিটুকু খেয়ে নিয়ে মিনারেল ওয়াটার খাই আর বাগানে আসা ছোট পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। গতকাল যে পাখিগুলোকে দেখেছিলাম সেগুলোই হয়তো। সারা আকাশ একইরকম পাতলা মেঘে ঢেকে আছে, কোথাও নীল চোখে পড়ে না।

কাফকার উপন্যাস নিয়ে আমার উত্তর ওকে সন্তুষ্ট করেছে বলেই মনে হয়। অল্পবিস্তর। তবে আমি প্রকৃতই যেটা বলতে চাই সেটা ঠিক পৌঁছনোর কথা নয়। কাফকার উপন্যাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ তত্ত্ব ঠিক দিতে চাইনি। একটা খুব সুনির্দিষ্ট জিনিস সম্বন্ধে খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে চেয়েছিলাম। শাস্তি দেওয়ার সেই জটিল যন্ত্র, যার উদ্দেশ্য জানা অসম্ভব, এই বাস্তবের আমি-র আশেপাশেই সত্যিই ছিল। উপমা কিংবা রূপক নয়। কিন্তু সেকথা হয়তো, শুধু ওশিমা কেন, কারুকেই কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ওঠা যাবে না বলেই মনে হয়।

রীডিংরুমে ফিরে এসে, সোফায় বসে, আবারও বার্টন এডিশনের *সহস্র এক আরব্যরজনী*-র জগতে ফিরে গেলাম। চারপাশের বাস্তব জগতটা সিনেমার পর্দায় ছবি যেভাবে ফেড-আউট হয়ে যায়, সেইভাবে একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। আমি নিজেকে সব কিছু থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বইয়ের পাতার মধ্যে যে জগতটা, তার ভেতরে ঢুকে গেলাম। এই অনুভূতিটা আমার অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে প্রিয়।

পাঁচটা বাজতে, লাইব্রেরি থেকে বেরুনোর সময়ও ওশিমা কাউন্টারের সামনে সেই একই বই পড়ছে। অন্য সময়ের মতোই শার্টে একটা ভাঁজ পর্যন্ত নেই। অন্য সময়ের মতোই মুখের ওপর সামনের চুল কয়েকগাছা এসে পড়েছে। ওর পিছনের দেওয়ালে ইলেকট্রিক ঘড়িটায় কোনও শব্দ না করে মসৃণ ভাবে কাঁটাগুলো সামনে এগিয়ে চলেছে। ওশিমার চারপাশে সবকিছু খুব নিঃশব্দে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। এমন কোনো কাজই থাকতে পারে বলে মনে হয় না যেটা ওকে ঘাম ঝরিয়ে, হেঁচকি তুলে করতে হতে পারে। বই থেকে মুখ তুলে ও আমাকে ব্যাক্‌প্যাকটা এগিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেয়। ওটা তুলতে গিয়ে মুখটা যেভাবে বিকৃত হল, দেখে মনে হবে যেন বেশ ভারী কিছু।

"তুমি শহরের ভেতর থেকে এই অবধি ট্রেনে করে আসো?"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"রোজই আসবে বলে ঠিক করে থাকলে, এটা সঙ্গে রাখা ভাল।" বলে A4-এর অর্দ্ধেক সাইজের একটা কাগজ আমার দিকে হাতে করে বাড়িয়ে দেয়। তাকামাৎসু স্টেশন আর কোওমুরা পাঠাগারের যে স্টেশন এদের মধ্যে যে রেল-লাইন তার টাইম-টেবিলের কপি। "মোটামুটি টেবিলের সময় অনুযায়ী যাতায়াত করে।"

"ধন্যবাদ", বলে আমি ওটা ওর থেকে নিই।

"দ্যাখো হে শ্রীমান তামুরা কাফকা, জানি না তুমি কোথা থেকে এসে ঠিক কী করছ, তবে, চিরকাল তো আর হোটেলে থেকে কাটিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, তাই না," খুব সাবধানে শব্দচয়ন করে বলে। তারপর বাঁহাতের আঙুল দিয়ে পেনসিলটার সীসের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করতে থাকে। অত খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করেই বলে দেওয়া যায় সীসটা নিখুঁত রকম তীক্ষ্ণ।

আমি চুপ করে থাকি।

"খুব বেশি অন্য কথা বলতে চাই না। শুধু তোমার সঙ্গে ওদের কথাবার্তা যা হল, সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি মাত্র। তোমার মতো বয়েসের একটা বাচ্চা ছেলের পক্ষে অচেনা জায়গায় একা একা কাটানো তো সহজ ব্যাপার নয়, সেই কারণেই।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"এখান থেকে আবার অন্য কোনো জায়গায় যাবে নাকি? নাকি এখানেই পুরোটা থেকে যাবে বলে ভাবছ?"

"এখনও ঠিক জানি না, কিছুদিন সম্ভবত এখানেই থাকব। যাওয়ার মত অন্য জায়গাও তেমন নেই", আমি অকপটে বলে দিই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওশিমার কাছে অনেকটাই খোলাখুলি বলে ফেলা যায় বলে মনে হয়েছিল। ও সবার আগে আমার মনোভাবটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে বলে মনে হয়। ভারী ভারী উপদেশও দেবে না, আবার সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগে একটা কোনো মতামত চাপিয়ে দিতেও চাইবে না। কিন্তু এখনই কারুর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলে ফেলতে চাইছিলাম না। অচেনা লোকের কাছে কিছু বলে ফেলা, মনের কথা বলে দেওয়া, এগুলোতে আসলে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই।

"এখনকার মত একাই থাকতে পারবে, তাই তো?" ওশিমা বলে।

আমি ছোট করে মাথা ঝোঁকাই।

"ভাগ্য তোমার সহায় হোক", ও এবার বলে।

ছোটখাটো ব্যাপার বাদ দিলে, এরপরের সাতদিন আমি মোটামুটি একইভাবে কাটালাম। সাড়ে ছ'টায় রেডিও ক্লকের সহায়তায় ঘুম থেকে উঠে, হোটেলের ডাইনিং হলে নামমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছি। হোটেলের ফ্রন্ট-ডেস্কের চেস্টনাট রঙের চুলের সকালের শিফটের মেয়েটি থাকলে হাত তুলে অভিবাদন করেছি। মেয়েটিও মাথা সামান্য নেড়ে মৃদু হেসে প্রত্যাভিবাদন করেছেন। ওর মধ্যে আমার প্রতি বেশ যেন বন্ধুত্বের ভাব দেখা দিয়েছে। আমার মধ্যেও ওর প্রতি একটা বন্ধুত্বের ভাব তৈরি হয়েছে। একেকবার মনে হয়েছে, হতেও তো পারে যে মেয়েটি আমার দিদি।

ঘরেই অল্পস্বল্প স্ট্রেচিং করে নিয়ে, সময় হলে জিমে গিয়ে সার্কিট-ট্রেনিং করেছি। একই ওয়েট নিয়ে, একই সংখ্যক বার। তার চেয়ে একটু কমও না, একটু বেশিও না। শাওয়ারে স্নান সেরে নিয়ে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিষ্কার করায় মন দিয়েছি। ওজন নিয়ে, কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা দেখে নিয়েছি। দুপুরের আগেই ট্রেনে করে কোওমুরা পাঠাগারে পৌঁছে গেছি। ব্যাকপ্যাক জমা দেওয়ার সময় আর ফেরত নেওয়ার সময় ওশিমার সঙ্গে অল্পস্বল্প কথাবার্তা বলেছি। গ্রীনজোনে গিয়ে লাঞ্চ সেরে, বই পড়ে (বার্টন এডিশনের 'সহস্র এক আরব্যরজনী' শেষ করে নাৎসুমে সোসেকির রচনাসমগ্র শুরু করেছি। কিছুটা পড়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাকি ছিল বলে), বিকেল পাঁচটায় লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েছি। দিনের বেলা অধিকাংশ সময়টাই জিম আর লাইব্রেরিতে কাটানোয়, যতক্ষণ ওখানে থেকেছি, কেউই আমাকে তেমন খেয়াল করেনি। স্কুল পালানো ছেলেরা কখনো প্রথমেই ঐসব জায়গায় যায় না বলেই। রাতের খাবার স্টেশনের সামনের রেস্তোরাঁ থেকে নিয়ে নিয়েছি। ঠিকই করেছিলাম যে যতটা সম্ভব বেশি করে শাকসব্জিই খাব। কখনো কখনো তরিতরকারির দোকান থেকে ফল কিনে, বাবার পড়ার ঘর থেকে আনা ছুরিটা দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেয়েছি। শসা, সেলেরি এইসব কিনে হোটেলের বাথরুমে ধুয়ে নিয়ে, মেয়োনিজ লাগিয়ে তাতে কামড় বসিয়েছি। কাছেপিঠের কোনো কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে দুধের প্যাকেট কিনে সিরিয়াল মিশিয়ে খেয়েছি।

হোটেলে ফেরার পর, ডেস্কে বসে ডায়েরি লিখে, ওয়াকম্যানে রেডিওহেড শুনে, আবার একটু বই পড়ে, এগারোটার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কখনো কখনো শোয়ার আগে মাস্টারবেশন করেছি। ফ্রন্ট-ডেস্কের মেয়েটির কথা কল্পনা করে, ঐ সময়টার জন্য ও যে আমার দিদিও হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা মাথা থেকে সাময়িকভাবে তাড়িয়ে দিয়ে করতে হয়েছে। টিভিও তেমন দেখিনি, খবরের কাগজও পড়িনি।

আমার এই নিয়মনিষ্ঠ, কেন্দ্রাভিগ ও সহজ জীবনে ছেদ পড়ল (একসময় না একসময় ছেদ পড়তেই হত যদিও) আটদিনের দিন রাত্তিরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবিভাগের গোয়েন্দা (MIS) রিপোর্ট
তাং: ১২ই মে, ১৯৪৬
বিষয়: রাইস-ব্যোল পাহাড়ের ঘটনা, ১৯৪৪: রিপোর্ট
নথি নং: PTYX-722-8936745-42216-WWN

টোকিও ইম্পীরিয়াল ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির মনোরোগ বিশ্লেষণ বিভাগের অধ্যাপক ৎসুকায়ামা শিগেনোরির ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল মিত্রশক্তির সুপ্রীম কম্যান্ডারের জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের ভিতর তিনঘন্টা ধরে। ইন্টারভিউ চলাকালীন টেপ করা হয়েছে। এই টেপ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র সন্ধানের জন্য কোড হচ্ছে, PTYX-722–SQ–267 থেকে 291। (খেয়াল রাখবেন: 271 এবং 278 নং নথিগুলির কিন্তু সন্ধান নেই)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী লেফটেন্যান্ট রবার্ট ও'কোনরের বক্তব্য:

একজন বিশেষজ্ঞের মতোই, অধ্যাপক ৎসুকায়ামা খুবই ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব বজায় রাখেন। উনি মনোরোগ চিকিৎসা বিষয়ে জাপানের প্রতিনিধিত্ব করা একজন বিদ্বান ব্যক্তি, এযাবৎ বেশ কয়েকটি অসাধারণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। অনেক জাপানির সঙ্গেই ওঁর যেটা তফাৎ, কখনো অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন না। যেটা প্রকৃতই ঘটেছে আর যেটা অনুমান মাত্র তার মধ্যে পরিষ্কার প্রভেদ রাখেন। বিশ্বযুদ্ধের আগে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে গিয়ে প্রোফেসর হিসেবে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, তাই খুবই সাবলীল ভাবে ইংরিজি বলতে পারেন। বহু লোকই ওঁর ওপর বেশ ভরসা করে এবং ওঁকে পছন্দ করে বলে মনে হয়।

মিলিটারির থেকে নির্দেশ পেয়েই আমরা দেরি না করে সেইসব বাচ্চাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, ব্যক্তিগত ভাবে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি শুরু করে দিলাম। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝির কথা এটা। মিলিটারির আমাদেরকে প্রয়োজন পড়লো কিংবা কোনো নির্দেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এলো, সচরাচর একেবারেই এরকম ঘটতো না। জানাই ছিল যে ওদের নিজেদেরই যথেষ্ট বড় মেডিকাল ইউনিট আছে এবং মূলত গোপনীয়তার কথা মাথায় রেখে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা পরিকাঠামো বজায় রাখত বলেই অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই নিজেদের মধ্যেই পারস্পরিক সহায়তায় কাজ চালিয়ে নিত। কোনো বিশেষ বিষয়ের গবেষক বা চিকিৎসকের বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োজনের কথা বাদ দিলে, কোনো সিবিলিয়ান ডাক্তার অথবা গবেষকের থেকে কিছু প্রয়োজন ওদের পড়তো না।

সেই কারণেই, এই প্রস্তাব আসা মাত্র, স্বাভাবিক ভাবেই ভেবে নিয়েছিলাম যে নির্ঘাৎ কোনো বিশেষ পরিস্থিতি। মিলিটারির নির্দেশ অনুসারে কাজ করাটা, সত্যি বলতে কী, বিশেষ পছন্দ ছিল না। অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই ওরা মোটেই ঠিকঠাক চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে যা সেটাতে আগ্রহী হত না, হয় ওরা যা ভেবে নিয়েছে সেই অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত, অথবা স্রেফ যেটুকুতে কাজ চলে যাবে সেটুকুই ওদের প্রয়োজন। কোনো যুক্তি টুক্তি চলবে না এদের সঙ্গে। কিন্তু সেটা যুদ্ধের সময়, মিলিটারির বিরোধিতা করা যাবে না। যা বলবে, নীরবে করে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।

মার্কিনিদের বিমানহানার মধ্যেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে আমাদের গবেষণা একটু একটু করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কী ছাত্র, কী গবেষক, প্রায়শই তাদের সৈন্যদলে ডাক পড়তো, আর বিশ্ববিদ্যালয়ও এইভাবে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। মনোরোগ চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রদেরও প্রয়োজনে তলব হওয়ার থেকে রেহাই ছিল না। মিলিটারি নির্দেশ পেয়েই আমরা হাতের গবেষণার কাজ তখনকার মতো মাঝপথে থামিয়ে, সব ফেলে গিয়ে ট্রেনে চেপে চললাম ইয়ামানাশি জেলার *** শহরের দিকে। আমি, মনোরোগ চিকিৎসা বিভাগের আরেক সহকর্মী, আর আমাদের সঙ্গে একই গ্রুপে গবেষণা করছিল নিউরো-সার্জারি বিভাগের এক গবেষক চিকিৎসক, এই তিনজন। অতঃপর যা কিছু হবে সবই মিলিটারির গোপন ব্যাপার হিসেবে গণ্য করে মুখ থেকে কোনো কথা খসানো যাবে না, এই মর্মে জোরালো ভাবে সাবধান করে দেওয়া হল। তারপর সেই মাসের গোড়ার ঘটনা বিশদে আমাদের কাছে বিবৃত করা হল। পাহাড়ে ষোলোটি বাচ্চা জ্ঞান হারিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেলেছিল, তারমধ্যে পনের জন এরপর স্বাভাবিক ভাবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। সেই সময়ের সমস্ত স্মৃতি যে হারিয়ে গেছে সেই কথাও জানলাম। কিন্তু একটিমাত্র বাচ্চা ছেলে কিছুতেই জ্ঞান ফিরে পায়নি, ঐ অবস্থাতেই আর্মি হাসপাতালের বেডে ঘুমিয়ে রয়েছে, ইত্যাদি। ঘটনার অব্যবহিত পর থেকেই বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত মিলিটারির ডাক্তার চিকিৎসার দিক থেকে যাবতীয় ডেভেলপমেন্ট বিশদে বুঝিয়ে বললেন। মেজর ডঃ তোইয়ামা। তেমন আন্তরিক তো নয়ই, বরং কেবল নিজেকে বাঁচানোটাই উদ্দেশ্য এরকম আমলাসুলভ প্রকৃতির লোক মিলিটারির ডাক্তারদের মধ্যে বেশ বেশিই। তবে সৌভাগ্যক্রমে ইনি একাধারে যেমন খুব প্র্যাকটিকাল তেমনই ডাক্তার হিসেবেও অসাধারণ। আমরা বাইরের লোক, কিন্তু আমাদের সঙ্গেও গেরামভারি ভাব করার কিংবা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা একেবারেই ছিল না। বস্তুনিষ্ঠ ও বাহুল্যবর্জিত ভাবে, প্রয়োজনীয় মূল তথ্যগুলো কিছু বাদ না রেখে আমাদের জানিয়ে দিতেন। সমস্ত মেডিকাল রিপোর্টও দেখিয়েছিলেন। আর সবকিছুর থেকে তথ্য বিশ্লেষণেই ওঁর নজর ছিল বেশি। আমাদের ওঁকে বেশ পছন্দ হয়েছিল।

মিলিটারির ডাক্তারের দেওয়া কাগজপত্র দেখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব বলে যেটা মনে হল, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে, সেটা হল এই যে বাচ্চাদের ওপরে ব্যাপারটার কোনো ছাপই পড়েনি। কোনোরকম পরীক্ষা করেই, সেই ঘটনার অব্যবহিত পর থেকে এই এখন অবধি, কোনো শারীরিক অস্বাভাবিকত্ব, কী বাহ্যিক, কী আভ্যন্তরীণ, দেখতে পাওয়া যায়নি। বাচ্চারা সেই ঘটনার আগে যে অবস্থায় ছিল অবিকল সেই অবস্থায় বেশ সুস্থভাবে কাটাচ্ছিল। খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, কিছু জীবাণু আছে বটে শরীরে কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু নয়। মাথা ধরা কিংবা বমি বমি ভাব, অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, পেটখারাপ, ক্লান্তি, দুঃস্বপ্ন, এরকম কোনও উপসর্গ একেবারেই দেখা যায়নি।

কেবল বাচ্চাদের মাথা থেকে পাহাড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলার সেই দু'ঘন্টার স্মৃতি হারিয়ে গেছে। এটা সবার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এমনকি ওরা নিজেরা যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, সেই স্মৃতিও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নেই। ঐটুকু যেন পরিষ্কার ভাবে বাদ হয়ে গেছে। এটা কে "স্মৃতিভ্রংশ" না বলে বরং চেতনায় প্রবেশই করেনি গোছের কিছু বলেই গণ্য করা উচিত। একথাগুলো ঠিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় নয়, আপাতত বোঝাতে সুবিধের জন্য ব্যবহার করা, "স্মৃতিভ্রংশ" কিংবা "চেতনায় প্রবেশ না করা", এদুটোর মধ্যে বড় প্রভেদ আছে। সহজভাবে বুঝিয়ে বলতে গেলে, সার বেঁধে রেললাইনের ওপর দিয়ে চলে যে মালগাড়ি, সেটার কথাই কল্পনা করে দেখুন। তার মধ্যে একটা বগির ভেতরে যে মাল ছিল সেটা আর নেই। ভেতরের জিনিসটা আর নেই এরকম ফাঁকা মালগাড়ি হচ্ছে "স্মৃতিভ্রংশ"। আর, কেবল ভেতরের জিনিস নয়, মালগাড়িটাই বেবাক হাওয়া হয়ে গেলে সেটাকে বলা যায়, "চেতনায় প্রবেশই করেনি"।

আমরা আলোচনা করতে শুরু করলাম বাচ্চারা কোনোরকম বিষাক্ত গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়েছে কিনা, সেই সম্ভাবনা নিয়ে।

'এটা স্বাভাবিক ভাবেই বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠলো, এটার কারণেই মিলিটারি এই ঘটনাটার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়েছে, তবে পরিস্থিতির ঠিক ঐ পর্যায়ে, একটু বাস্তবতাবোধসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে, সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ বলে ভাবা ছাড়া গতি ছিল না। এই ব্যাপারটা মিলিটারি সিক্রেটের আওতাভুক্ত বলে, বাইরে ফাঁস হয়ে গেলে মুশকিল হবে...' এরকমই ডক্টর তোইয়ামা বললেন।

উনি যা বললেন, তা মোটের ওপর এই। 'আর্মি অবশ্যই বিষাক্ত গ্যাস কিংবা বায়োলজিকাল ওয়েপন ধরণের রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করতে গোপনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেসব তো মুখ্যত চিন মহাদেশে অবস্থিত কোনো হেডকোয়ার্টার্সের স্পেশাল ইউনিটের ভেতরে করা হচ্ছে। জাপানে, দেশের ভেতরে তো হচ্ছে না সেটা। গিজগিজ করছে এইটুকু একটা দেশে এত লোক, এর মধ্যে ওসব করা খুবই বিপজ্জনক হত। ঐ ধরণের অস্ত্র দেশের ভেতরে মজুত রাখা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আপনাদের কাছে খুলে বলা যাবে না, তবে, এখন অবধি ইয়ামানাশি জেলার মধ্যে যে নেই সেটুকু অন্ততঃ আশ্বস্ত করতে পারি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইয়ামানাশি জেলার মধ্যে যে এরকম কোনো বিশেষ অস্ত্র মজুত করা নেই যা থেকে বিষাক্ত গ্যাসের উৎপত্তি হতে পারে, সেটা মিলিটারির ডাক্তার আশ্বস্ত করলেন, তাই তো?

হ্যাঁ। উনি পরিষ্কার করেই সেটা বললেন। আমাদের তখন সেকথাই বিশ্বাস না করে উপায়ও নেই, আর বিশ্বাস করাই ভাল বলেই ধারণা পোষন করছিলাম। অতঃপর B29 থেকে মার্কিন সেনারা বিষাক্ত গ্যাস ফেলেছে, এমত ব্যাখ্যা বিষয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এর সম্ভাবনা বেশই কম। এমন যদি হয়ও যে ওরা ওরকম অস্ত্র তৈরি করে ফেলে সেটার প্রয়োগ করবে বলে স্থির করেছিলো, তাহলেও তো যেখানে কাজ হবে বেশি, সেই শহরাঞ্চলেই তো সবার আগে প্রয়োগ করবে। অত উঁচু থেকে ওরকম একটা পান্ডববর্জিত জায়গায়, পাহাড়ের মধ্যে একটা কি দুটো ফেললে, তাতে করে ঠিক কেমন ফল পাওয়া গেল, সাফল্য কিছু এলো কিনা সেসবও তো যাচাই করা যাবে না। যদি ধরেও নিই যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটু পাতলা হয়ে গিয়েছিল, তাহলেও বাচ্চারা খুব বেশি হলে দু'ঘন্টার জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তারপরে আর কিছুর লেশমাত্র নেই, এমনধারা বিষাক্ত গ্যাস লড়াইয়ে কোনও কাজেই আসবে না।

তার ওপরে, আমরা যেটুকু বুঝি তাতে করে, কৃত্রিম গ্যাসই হোক আর প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বিষাক্ত পরিবেশই হোক, শরীরে তার কোনোরকম ছাপ রেখে যায়নি এরকম গ্যাসের কথা শুরুতেই ভেবে ওঠা কঠিন। বিশেষ করে বড়োদের তুলনায় বাচ্চাদের শরীর যেখানে বেশি সংবেদনশীল, প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল, চোখ কিংবা শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে অবশ্যই কোনো না কোনো রকম আফ্‌টার-এফেক্ট থেকে যাওয়ারই কথা। খাদ্যে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনাও সেই একই কারণে বাতিল করে দেওয়া গেল। তাহলে এরপরে একমাত্র কোনো মানসিক সমস্যা বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা বলেই ভাবতে হয়। এখন এই ঘটনা যদি কোনো আভ্যন্তরীন কারণে ঘটে থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আর ইন্টারনাল কিংবা এক্সটারনাল মেডিসিনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সূত্র খোঁজা খুবই মুশকিল হবে। সেই লক্ষণ না চক্ষুগোচর হবে, না পরিমাপ করে সংখ্যায় প্রকাশ করা যাবে। এই পরিস্থিতিতে পৌঁছে শেষ অবধি আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাছেও পরিষ্কার হল মিলিটারির তরফ থেকে কেন আমাদের এতদূরে ডেকে আনা হয়েছে।

আমরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা বাচ্চাদের সবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললাম। নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যে টিচার আর চার্জে থাকা ডাক্তারের বয়ানও শুনলাম। মিলিটারির ডক্টর তোইয়ামাও তাতে যোগ দিলেন। কিন্তু সেই কথাবার্তা থেকে আমরা এমন কোনো তথ্য খুব একটা পেলাম না যেটা নতুন। মিলিটারির ডাক্তার যা কিছু বিশদে বলেছিলেন আবারও সেগুলোরই কেবল পুনরাবৃত্তি করলেন ওঁরা। বাচ্চারা তো সেই ঘটনার ব্যাপারে একটা কিছুও মনে করতে পারছিল না। ওরা দেখেছিল অনেক ওপরে চকচকে একটা প্লেনের মতো কী যেন। তারপর ওবান পাহাড়ে (রাইস ব্যোল পাহাড়ে) উঠে বনের মধ্যে মাশরুম সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলো। সেখানে ওরা সময়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপরে যেটা মনে করতে পারছে, সেটা হল, উদ্বিগ্ন টিচাররা আর পুলিশ পরিবৃত হয়ে ওরা নিজেরা মাটির ওপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে, এইটুকুই। শরীরের অবস্থা বিশেষ খারাপ কিছু নয়, তেমন ব্যথা-বেদনাও ছিল না। মানসিক ভাবেও খারাপ লাগছিল না। কেবল মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ খোলার সময় যেমন হয় সেরকম। এর বেশি কিছু নয়। প্রত্যেক বাচ্চাই যা বলছিল, একেবারে স্ট্যাম্প মেরে ছাপ ফেলার মত হুবহু একইরকম। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বড়ো হয়ে মনে ভেসে উঠল, খুব স্বাভাবিক ভাবেই, সেটা হল গণ-সম্মোহন। জ্ঞান হারানো অবস্থায় বাচ্চাদের মধ্যে যেসব উপসর্গ টিচার এবং স্কুলের ডাক্তার একেবারে সেই স্পটেই লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে সেটাকে গণ-সম্মোহন বলে সাব্যস্ত করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। চোখের মণির সুনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া, শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, শরীরে তাপমাত্রা এসবের সামান্য হ্রাস, স্মৃতিহীনতা। আপাতত তো মিলে যাচ্ছে সবকথাই। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যে শিক্ষিকা তিনি জ্ঞান হারাননি, সেটার কারণ, যা থেকে এই গণ-সম্মোহন হয়েছে, কোনো কারণে তা প্রাপ্তবয়স্কদের ওপরে কাজ করেনি বলেই ভেবে উঠতে পারছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এটি যে ঠিক কী, সেটা আমরা এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। নেহাতই একটা কথা সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে বলে রাখতে পারি, গণ-সম্মোহনের জন্য দুটো জিনিস একান্ত দরকারি। এক তো হচ্ছে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সমসত্ত্বতা অর্থাৎ হোমোজিনিটি এবং যে পরিবেশে আছে সেটার পরিস্থিতির বেশ কিছুটা অভিন্নতা। আরেকটা হল ট্রিগার করা। একেবারে সরাসরি ভাবে এই ট্রিগার সকলে একই সঙ্গে অনুভব না করলে হবে না। এই ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই বাচ্চারা পাহাড়ে প্রবেশ করার আগে যে প্লেনের মতো একটা জিনিস দেখেছিল তার ঝলক হয়তো। সবার একই সঙ্গে চোখে পড়েছিল। তার বেশ কয়েক মিনিট পরে জ্ঞান হারানো শুরু হয়েছিল। অবশ্যই এটাও আমাদের অনুমান মাত্র, খুব নির্দিষ্ট করে এ ছাড়া আর অন্য কিছুর হদিস করে উঠতে পারছি না বটে, ট্রিগারের কাজ করেছিলো এরকম অন্য কোনো ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে। আমি, আদ্যন্তই "এটা নেহাতই একটা অনুমান" বলে সাবধানতা সহকারে, মিলিটারির ডাক্তার তোইয়ামার কাছে গণ-সম্মোহনের সম্ভাবনার কথাটা পাড়লাম। আমার দুজন সহকর্মীও তাতে মোটামুটি সায় দিল। ঘটনাক্রমে আমাদের গবেষণা সরাসরি এ বিষয়ে না হলেও, এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

"কথাটায় যুক্তি আছে বলেই তো শুনে মনে হচ্ছে", খানিক চিন্তা করে তারপর ডক্টর তোইয়ামা বললেন। "যদিও আমার স্পেশালাইজেশনের বাইরে, তবু, ভেবে দেখলে, সম্ভাব্যতার বিচারে এরকম হওয়ারই সবচেয়ে উচ্চ-সম্ভাবনা। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও বোঝা বাকি রয়ে গেছে। প্রশ্ন হল, সেই গণ-সম্মোহন কাটলো কীভাবে? ওখানেই একটা 'পালটা ট্রিগার' তো লাগবেই সেক্ষেত্রে।"

সে তো বলতে পারছি না, আমি অকপটে বলে ফেললাম। এই মুহূর্তে অবশ্যই শুধু অনুমানের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান বলে উঠতে পারব না। 'অনেকটা সময় কেটে গেলে একসময় আপনা থেকেই এর রেশ কেটে যায় এমনই সিস্টেম হয়তো', আমার এরকমই অনুমান। এক কথায়, আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা মূলতই বেশ শক্তিশালী। একবার বাহ্যিক অন্য কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সিস্টেমের বশে এলেও, একটা নির্দিষ্ট মাত্রার সময়ের পরে, সেটা বলা চলে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে দেয়, আর আমাদের আদত কার্যকরি প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ব্লক করে রাখা বাহ্যিক জিনিসটা—এইক্ষেত্রে এককথায় এই সম্মোহন বলে যে প্রক্রিয়াটা—সেটাকে কাটিয়ে দিতে, সেটাকে ডিপ্রোগ্রাম করতে একটা প্রোগ্রামের আপদকালীন প্রয়োগ করে বলেই মনে হয়।

এখানে সেসব ডকুমেন্টস নেই, তাই মনে করে একেবারে নিখুঁত সংখ্যা-টংখ্যা সহকারে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারব না বটে, কিন্তু এর সঙ্গে মিলে যায় এরকম ঘটনা এপর্যন্ত বিদেশে বেশ কয়েকটিই রিপোর্টেড হয়েছে, ডক্টর তোইয়ামাকে আমি এভাবেই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। সবগুলোই, চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এমন "রহস্যময় ঘটনা" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অনেক বাচ্চা একই সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে কয়েকঘন্টা পরে চোখ মেলেছিল। তারপরে আর সেই সময়ের কথা কিছুই স্মরণ করতে পারছে না। অতএব এবারের এই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বিরল, কিন্তু অভূতপূর্ব নয় মোটেই। ১৯৩০ নাগাদ ইংল্যান্ডের ডেভনশায়ার কাউন্টির এক ছোট্ট গ্রামের বাইরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। গ্রামের রাস্তা দিয়ে সার বেঁধে হেঁটে যাচ্ছিল তিরিশটি মিডল-স্কুলের ছাত্র, এভাবেই অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ করেই একে একে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই কয়েকঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে, একেবারে কিছুই যেন ঘটেনি এইভাবে আগের মতোই নিজেরা পায়ে হেঁটে স্কুল পর্যন্ত ফিরে এসেছিল। ডাক্তার অবিলম্বে তাদের সকলকে পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে একেবারে কোনওরকম অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাননি। কেউই মনে করতে পারেনি কিছু ঘটেছিল কিনা।

গত শতকের শেষ দিকটায়, অস্ট্রেলিয়াতেও একই রকমের ঘটনার কথা নথিভুক্ত করা আছে। অ্যাডিলেডের শহরতলিতে পনেরোজন মতো দশোর্দ্ধ বয়েসের কিশোরী, প্রাইভেট গার্লস স্কুলের পার্কের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারপর কিছু সময় পরে সকলেই জ্ঞান ফিরেও পায়। আবারও বাহ্যত কোনোরকম ক্ষত নেই, ব্যথা-বেদনাও লক্ষ্য করা যায়নি। অনেক আগের ব্যাপার ঠিকই, তবে, সক্কলে মোটামুটি একই সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মোটামুটি একই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে যাওয়া, সানস্ট্রোকের কোনরকম লক্ষণ দেখতে না পাওয়া, এগুলোই ধাঁধা হয়ে রয়ে গিয়েছে। আবহাওয়ার রিপোর্টও বলছে যে সেদিনটা এমন কিছু গরমও ছিল না। সম্ভাব্য অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না যখন, তখনকার মতো সানস্ট্রোক বলেই ধরে নেওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল হয়তো।

এই সব ঘটনার মধ্যে যে ব্যাপারটা কমন, সেটা হল, স্কুল থেকে খানিক দূরে কোথাও দলবেঁধে গিয়ে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ও মেয়ে সবাই একই সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে, তারপর মোটামুটি একই সঙ্গে জ্ঞান ফিরে পায়। পরে আর এর কোনও আফটার-এফেক্ট থেকে যায়নি। এগুলোই হচ্ছে সবগুলো অতীত উদাহরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, বাচ্চাদের মতোই জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উদাহরণও আছে, আবার জ্ঞান হারায়নি এমন উদাহরণেরও রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সেটা কেস-বাই-কেস।

এরকমই অন্য আরো উদাহরণও যে নেই তা নয়, তবে, অ্যাকাডেমিক চর্চায় নথি হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে এরকম রেকর্ড, বা আদৌ কোনো নথিপত্র আছে এরকম কেস হিসেবে এই দুটোই কেবল খাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু ইয়ামানাশি জেলায় ঘটা এবারের ঘটনার একটা চোখে পড়ার মত ব্যতিক্রমী দিক আছে। এই সম্মোহন কিংবা অজ্ঞান অবস্থা কাটলো না এরকম বাচ্চাও কিন্তু একজন রয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই এরকম একটি বাচ্চার অস্তিত্বই এই ঘটনার প্রকৃত সমাধানের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের মনে হল। আমরা ঘটনাস্থলের যাবতীয় অনুসন্ধান সেরে টোকিওতে ফিরে, যে মিলিটারি হাসপাতালে বাচ্চাটা ভর্তি হয়ে আছে তার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

এই ঘটনাটা যে মিলিটারির মনোযোগ আকর্ষণ করল, সেটা পুরোটাই এর পিছনে বিষাক্ত গ্যাস জাতীয় মারণাস্ত্রের একটা ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা আছে ভেবেই, তাই তো?

সেরকমই তো বুঝলাম। আরো সঠিক করে জানতে হলে, আমার চেয়ে ডক্টর তোইয়ামাকে জিজ্ঞাসা করলেই বরং সুবিধে হবে বলে মনে হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মেজর ডক্টর তোইয়ামা ১৯৪৫ সালের মার্চে টোকিও শহরে কর্মরত অবস্থায় বোমাবর্ষণে মারা গেছেন।

ওমা, তাই নাকি। খুবই দুঃখের কথা। এই যুদ্ধে বহু যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি।

কিন্তু মিলিটারি, এই ঘটনা তথাকথিত রাসায়নিক অস্ত্রের কারণে ঘটেনি, এরকম সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিল। প্রকৃত কারণ যদিও এখনো অন্ধকারে, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্করহিত কারণে বলেই মনে হয়। তাই তো?

হ্যাঁ, সেরকমই বুঝেছি। মিলিটারি তখন ঘটনার তদন্তে সমাপ্তি টানার পথে। মিলিটারি হাসপাতাল যে নাকাতা নামে সেই অচৈতন্য বাচ্চাটাকে ঐ অবস্থায়ই ভর্তি করে রেখেছে, সে একমাত্র ডাক্তারবাবু, মেজর তোইয়ামা, এই ঘটনায় ব্যক্তিগত ভাবে আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন, এবং সেই সময় হাসপাতালে ওঁর ইচ্ছার বেশ গুরুত্ব ছিল বলেই। এই কারণেই আমরাও প্রাত্যহিক মিলিটারি হাসপাতালে যাতায়াত করে কিংবা পালা করে থেকে, অচৈতন্য হয়ে বেডে শুয়ে থাকা বাচ্চাটির পরিস্থিতি নানা কোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম।

বাচ্চাটির শারীরবৃত্তীয় যাবতীয় ক্রিয়া ঐ অজ্ঞান অবস্থায় খুবই ত্রুটিহীন ভাবে সংঘটিত হচ্ছিল। ড্রিপ দিয়ে পুষ্টি যোগানো হচ্ছে শরীরে, একেবারে যথাবিহিত মূত্রত্যাগও হচ্ছে। রাত হলে, ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়ার পর চোখ বুঝে ঘুমিয়ে পড়ছে, সকাল হলে চোখ খুলে যাচ্ছে। এই ছেলেটি সত্যিই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু তা বাদে আর কোনো সমস্যা নেই, দিব্যি স্বাভাবিক সুস্থ জীবন কাটাচ্ছে বলেই দেখা গেল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কোমায় চলে গেছে, সেই অবস্থায় কিন্তু এমনকি স্বপ্নও দেখছে না। মানুষ স্বপ্ন দেখার সময় চোখের মণির নড়াচড়া কিংবা মুখের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়বেই যে এটা হল স্বপ্ন দেখার প্রতিক্রিয়া। স্বপ্ন দেখাকালীন সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে চেতনা কাজ করে আর সেই অনুযায়ী হৃৎস্পন্দনও বেড়ে যায়। কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ নাকাতা নামের বাচ্চাটির ক্ষেত্রে একেবারেই দেখতে পাওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যায়নি। হৃৎস্পন্দন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, শরীরের তাপমাত্রা, সবই সচরাচরের তুলনায় সামান্য কম দেখাচ্ছিল, আর এই সবই ছিল আশ্চর্যরকম স্থিতিশীল।

আশ্চর্য শোনাবে হয়তো, রক্তমাংসের শরীরটা দেখাচ্ছে যেন একটা আধারের মতো আপাতত ওখানে পড়ে রয়েছে, অনুপস্থিতির সময় জমা রাখা রয়েছে যেন, প্রাণশক্তির নানা দিককে একটু যেন স্তিমিত করে, টিঁকে থাকার মতো করে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কাজকর্মগুলো চালু রেখে, সেই সময় আসল লোকটি অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কিছু করছে। "স্থূল-শরীর ত্যাগী" কথাটা মাথায় এলো একবার। কথাটা আগে শুনেছেন? জাপানের পুরনো গল্পে খুব পাওয়া যেত। আত্মাটা রক্তমাংসের শরীর থেকে কিছুক্ষণের জন্য আলাদা হয়ে হাজার মাইল রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করে দূরে কোথাও গিয়ে, বড় কোনো কাজ সেরে, তারপর আবার মূল শরীরে ফিরে আসতো এমন লোক। "গেন-জি মোনোগাতারি" উপকথাতেও জীবন্ত ভুতের কথা আছে অনেক জায়গায়, তারই কাছাকাছি কিছু হয়তো। শুধু মৃত লোকের আত্মাই শরীর থেকে বেরিয়ে যায় না, বেঁচে থাকা লোকেরাও—সেরকম মনের ক্ষমতা থাকলে—সেই একই জিনিস করতে পারে। এছাড়াও, জাপানের মাটিতে আত্মা নিয়ে এরকম চিন্তা অনেক পুরনো আমল থেকেই শেকড় গেড়ে আছে বলেই মনে হয়, তাই না। কিন্তু এরকম কিছু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। অনুমানের ভিত্তিতে এরকম কিছুর কথা তোলা সুবিবেচনার কাজ নয়।

বলাই বাহুল্য, আমরা তখন বস্তুতপক্ষে যেটা চাইছি সেটা হল যে বাচ্চাটা আগে কোমা থেকে বেরিয়ে চোখ মেলে তাকাক। জ্ঞানটা ফিরে আসুক। সেই সম্মোহন কাটাতে একটা "পালটা ট্রিগার" প্রাণপণে হাতড়ে দেখছি। যা মনে আসছে সবই চেষ্টা করে দেখছি। বাবা-মাকে ডাকিয়ে এনে, তাদের দিয়ে চিৎকার করে নাম ধরে ডাকাচ্ছিলাম। এইসবই চলল বেশ ক'য়েকদিন। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। হিপনোটিজমে ব্যবহার করা হয় এরকম যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করে দেখা হল। নানারকম আভাস সৃষ্টি করে দেখা হল। মুখের সামনে নানাভাবে হাততালি দিয়ে দেখা হল। পরিচিত গানবাজনা শুনিয়ে দেখা গেল,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাঠ্য-বই থেকে কানের কাছে পড়ে শোনানো হল। পছন্দের খাবারের গন্ধ শোঁকানো হল। বাড়িতে যে বেড়ালটাকে পুষতো সেটাকে আনানো হল। বেড়ালটাকে বাচ্চাটা খুব ভালবাসত। যাই হোক, ওকে এই বাস্তব জগতে ডেকে ফেরত আনার সমস্ত উপায় খরচ করে ফেলা হল। কিন্তু ফল হল, আক্ষরিক ভাবেই, শূন্য। কিন্তু, আমরা এইসব চেষ্টা শুরু করার দু-সপ্তাহ পর, ততদিনে আমরা সর্বতোভাবেই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, হা-ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এইসময় হঠাৎ করেই বাচ্চাটা আবার জেগে ওঠে। আমরা কিছু একটা করেছিলাম আর সেটা সফলভাবে কাজ করে ও জেগে উঠেছিল, তা কিন্তু নয়। নেহাতই যেন পূর্ব-নির্ধারিত সময় উপস্থিত হতেই, কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই অকস্মাৎ চোখ মেলে জেগে উঠল।

অন্যান্য দিনের থেকে অন্যরকম কিছু কি সেদিন ঘটেছিল?

বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ঘটনা কিছুই তেমন ঘটেনি। নেহাতই অন্যান্য দিনের মতোই সব হচ্ছিল। সকাল দশটা নাগাদ নার্স এসে বাচ্চাটার রক্তের নমুনা নিয়ে গেল। তবে কিনা, তার ঠিক পরেই ওর কেমন হেঁচকি ওঠার মত হয়ে, খানিকটা রক্ত চাদরের ওপর ছিটকে পড়েছিল। তেমন বেশি পরিমাণে নয়, চাদর তক্ষুণি পালটে দেওয়া হল। অন্যদিনের চেয়ে আলাদা, বলতে গেলে এটুকুই। এর মোটামুটি তিরিশ মিনিট মতো পরে বাচ্চাটা চোখ খুলল। হঠাৎই বিছানার ওপর জেগে উঠে, শরীরের আড়মোড়া ভেঙে, চারপাশটা দেখে নিল। জ্ঞানই শুধু ফিরে পায়নি, চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী শারীরিক স্বাস্থ্য একেবারে নিখুঁত। কিন্তু অনতিবিলম্বেই পরিষ্কার বোঝা গেল যে মাথা থেকে যাবতীয় স্মৃতি চলে গেছে। নিজের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারছে না। না কোথায় থাকতো, না কোন স্কুলে পড়তো, না মা-বাবার মুখ, একটা কিচ্ছু মনে করতে পারছে না। হরফ পড়তে পারছে না। এটা যে জাপান, পৃথিবী, সেসব কিছুই জানে না। জাপানটা যে কী, পৃথিবীটাই বা কী, এমনকি তাও বুঝতে পারছে না। আক্ষরিক অর্থেই মাথার ভেতরটা একেবারে সাফসুতরো, সাদা কাগজের মত অবস্থা হয়ে, এই জগতে ফিরে এসেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

৯

জ্ঞান যখন ফিরল, আমি একটা ঘন বনের মধ্যে রয়েছি। ভিজে মাটির ওপরে কাঠের গুঁড়ির মতো পড়ে আছি। চারপাশ ঘন অন্ধকারে ঘেরা। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মাথাটা রাখা আছে গাছের ডালপালার ওপরে, কী যেন বিঁধছে। শ্বাস নিয়ে দেখলাম। রাতের উদ্ভিজ্জের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। মাটির গন্ধ। কুকুরের বিষ্ঠার গন্ধও মৃদুভাবে মিশে আছে এসবের সঙ্গে। গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। চাঁদও নেই, তারাও নেই, তবু আশ্চর্যজনক ভাবে আকাশটা উজ্জ্বল। আকাশ ঢেকে রাখা মেঘ যেন স্ক্রীনের মতো হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের আলো প্রতিফলিত করছে। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। সেটা কিছুটা কাছে এসে, তারপর দূরে চলে যাচ্ছে। কান সজাগ করে শুনলে, রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করা গাড়ির টায়ারের শব্দও মৃদু শোনা যায়। যেখানেই হোক, বড় শহরের এক কোণে কোথাও আমি আছি বলে মনে হয়। কোনও ভাবে আমি আত্মস্থ হয়ে নিজেকে গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। তারজন্য একটু এদিক ওদিক চলাফেরা করে নিজের ছড়িয়ে পড়া অংশগুলোকে একসঙ্গে জড়ো না করলেই নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জিগ্‌স পাজ্‌লের টুকরোগুলো, একটা একটা করে, নিবিষ্ট হয়ে চয়ন করার মত করে। ভেবে দেখলাম, এরকমটা এই প্রথম তো নয়। আগেও একেবারে এরকমই অনুভূতি হয়েছিল কোথাও। কবে যেন হয়েছিল? স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই ক্ষীণ সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। চোখ বুজে সময় নিতে থাকলাম।

সময় কেটে যেতে থাকলো। ব্যাক্‌প্যাকের কথা মনে পড়ে গিয়ে চমকে উঠলাম। একটা হালকা আতঙ্ক এসে ভর করল আমার ওপর। ব্যাক্‌প্যাকটা... ব্যাক্‌প্যাকটা এখন কোথায়? এই মুহূর্তে আমার যাবতীয় কিছু ওখানে রয়ে গেছে। ওটা হারালে চলবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু ওই অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও আঙুলের ডগায় সেই শক্তি নেই।

অতিকষ্টে বাঁহাতটা তুলে (বাঁহাতের কব্জিটা এত ভারী লাগছে কেন কে জানে?) রিস্টওয়াচটা মুখের সামনে নিয়ে এলাম। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম। ডিজিটাল ঘড়ির ডিসপ্লেতে সংখ্যায় দেখাছে 11:26, অর্থাৎ রাত এগারোটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট। মে মাসের আটাশ তারিখ। মাথার মধ্যেই ডায়েরির পাতা উল্টে দেখলাম। মে মাসের আটাশ তারিখ...। অসুবিধা নেই, এখনও আমি নির্দিষ্ট দিনটার মধ্যেই আছি। এমন নয় যে কয়েকদিন ধরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রয়েছি। খুব বেশি হলে, কয়েক ঘন্টার জন্য আমার চেতনার থেকে আমি নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। সম্ভবত ঘন্টা চারেক মত।

মে মাসের আটাশ তারিখ—আর পাঁচটা দিনের মতো করেই, দিন পালটে পালটে এসে পড়া একটা দিন। আলাদা করে বিশেষ কিছুই ঘটেনি। আমি সেদিনও যথারীতি জিমে গিয়ে, তারপর কোওমুরা পাঠাগারে গিয়েছিলাম। যন্ত্রের সাহায্যে যথারীতি ব্যায়াম সেরে, যথারীতি সোফায় বসে সোসেকির রচনাসমগ্র পড়েছি। তারপর সন্ধ্যেয় স্টেশনের সামনে খাওয়াদাওয়া সেরেছি। মাছ খাওয়ারই কথা ছিল। মাছের একটা মেনু। স্যালমন মাছের। দুবার ভাত নিলাম। মিসোশিরু[1], আর তারপর স্যালাডও খেলাম। তারপর... এরপরে কী হয়েছিল আর মনে করতে পারছি না।

বাঁ-কাঁধে একটা ব্যথা, তবে, তেমন তীব্র নয়। শারীরিক অনুভূতি ফিরে এলে, সেইমতো ব্যথার অনুভূতিও ফিরে আসে। কিছু একটার সঙ্গে জোরে ধাক্কা লাগার ব্যথা। শার্টের ওপর দিয়ে ঐ জায়গাটায় ডানহাতে হাত বুলিয়ে দেখলাম। ক্ষতও নেই কোনোরকম, ফুলেও নেই। কোথাও কোনো ট্র্যাফিক অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম নাকি? কিন্তু জামাকাপড় ছেঁড়েনি, ব্যথাও শুধু বাঁ-কাঁধের ভেতরের দিকে একটা জায়গায়। সম্ভবত নেহাতই একটু আঘাত পেয়েছি।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটু নড়েচড়ে, হাতের নাগালের মধ্যে কোনোক্রমে একটু খুঁজে দেখলাম। কিন্তু আমার হাত, উত্যক্ত পশুর হৃৎপিন্ডের মতোই মোচড়ানো গাছের ডালপালা বই আর

[1] মিসোশিরু হচ্ছে এক অতি উপাদেয় সয়াবীনের স্যুপ, খেলে ভোলা যায় না।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিছু স্পর্শ করলো না। ব্যাক্প্যাক কোথাও নেই। ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে দেখলাম। পার্সটা আছে। ভেতরে সামান্য কিছু ক্যাশ, হোটেলের কার্ড-কী আর টেলিফোন কার্ড আছে। এছাড়া কিছু খুচরো কয়েন, রুমাল, বলপেন। হাত দিয়ে খুঁজে যতটা ঠাহর করা যায় তাতে বোঝা গেল, কিছুই খোয়া যায়নি। আমার পরণে ঘিয়ে রঙের চিনো প্যান্টস, V-গলার সাদা টি-শার্ট, তার ওপরে ফুলহাতা চেক-শার্ট। আর নেভি-ব্লু রঙের টপসাইডার। টুপিটা নেই। নিউ ইয়র্ক ইয়াংকিজ লেখা বেসবল ক্যাপ। হোটেল থেকে বেরুনোর সময়ও পরে ছিলাম। এখন আর পরা নেই। কোথাও পড়ে গেছে অথবা রেখে এসেছি কিনা কে বলতে পারে। ঠিক আছে। যেকোনো জায়গায় কিনতে পাওয়া যায় ওসব জিনিস।

অল্প পরেই আমি ব্যাক্প্যাকটার হদিস করতে পারলাম। ওটা পাইন গাছের গুঁড়ির ওপর রাখা আছে। কেন যে আমি ওরকম একটা জায়গায় বোঝা নামিয়ে রেখে, তারপর একেবারে বনের মধ্যে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম, কে জানে। এই জায়গাটা মোটামুটি কোথায়? স্মৃতি যেন হিম হয়ে জমে গেছে। তবে, যাহোক করে ফিরে যে পাওয়া যাচ্ছে, এটাই বড় কথা। ব্যাক্প্যাকের পকেট থেকে পকেট-টর্চটা বের করে, চট করে একবার ব্যাক্প্যাকের ভেতরটা দেখে নিলাম। কিছুই খোয়া যায়নি মনে হচ্ছে। যে প্যাকেটটার মধ্যে ক্যাশ রাখা আছে, সেটাও ঠিকই আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমি।

ব্যাক্প্যাক কাঁধে ফেলে, ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে এসে একটু ফাঁকা একটা জায়গায় এসে পড়লাম। সেখানে একটা সরু প্যাসেজ। পকেট-টর্চ জ্বেলে সেই পথ অনুসরণ করে গেলে একটু পরেই আলো দেখা গেল। একটা জিনজার[১] উঠোনের মত। জিনজার মূল মন্দিরের পেছনে ছোট একটা বন, তার ভেতরে আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলেম।

বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে এই জিনজা। উঠোনে উঁচু পোস্টে মার্কারি ল্যাম্প একটা, মূল মন্দিরের ভেতরে, প্রণামী বাক্সে, বিধিমত উপাস্য ছবিতে, একধরণের হিম আলো ফেলেছে। আমার ছায়াটা বিচিত্র ভাবে নুড়ি পাথরের ওপর দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছে।

[১]শিনতো ধর্মের উপাসনাস্থল হল জিনজা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বুলেটিন বোর্ডে জিনজার নাম দেখতে পেয়ে নামটা মনে করে রাখলাম। আশেপাশে লোকজনের ছায়ামাত্র নেই। একটু হাঁটতেই দেখি একটা বাথরুম, ঢুকলাম তাতে। বেশ ঝকঝকে তকতকে বাথরুম। ব্যাক্‌প্যাকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে, কলের জলে মুখ ধুলাম। তারপর বেসিনের সামনে একটা ঝাপসা আয়নায় আমারই মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালাম। কিছুটা প্রত্যাশিতই ছিল যদিও, মুখের অবস্থা সত্যিই সাংঘাতিক। ফ্যাকাসে গাল বসে গেছে, ঘাড়ের পেছনে ময়লা লেগে আছে। চুল এলোমেলো, উস্কোখুস্কো। চোখে পড়লো, সাদা টি-শার্টের বুকের কাছটায় কালো মত কী যেন লেগে আছে। জিনিসটা অনেকটা ডানা মেলা বড় প্রজাপতির আদলের। প্রথমে ওটাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যাচ্ছে না। হাত দিয়ে ছোঁয়ায় কেমন অদ্ভুতভাবে আরো সেঁটে গেল। মনটা শান্ত করতে, আমি ইচ্ছে করেই বেশ সময় নিয়ে চেক-কাটা শার্টটা খুলে, টি-শার্টটা মাথা গলিয়ে খুললাম। তারপরে দপ্‌দপ্‌ করা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের আলোর নিচে এনে দেখি কালচে লাল রক্তের দাগ। রক্তটা টাটকাই, তখনো শুকোয়নি। পরিমাণেও অনেকটা। মুখটা কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলাম, গন্ধ নেই। টি-শার্টের ওপরে চাপানো চেকশার্টেও রক্তের ছিটে আছে, কিন্তু তা পরিমানে তেমন বেশি নয়, আর রঙটা গাঢ় নীল বলে রক্তের দাগ তেমন চোখে পড়ছে না। কিন্তু সাদা টি-শার্টের লাগা রক্ত ভালোরকম স্পষ্ট।

বেসিনে ধুয়ে ফেললাম। রক্ত জলের সঙ্গে মিশে, সাদা চিনেমাটির বেসিনটা গাঢ় লাল হয়ে গেল। কিন্তু যত জোরেই ঘষে ঘষে ধুই না কেন, একবার রক্তের দাগ লাগলে সে দাগ আর যায় না। টি-শার্টটা কাছেই একটা ময়লা ফেলার ড্রামে ফেলে দিতে গিয়েও, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে শেষ অবধি আর ফেললাম না। ফেলেই দেব, কিন্তু অন্য কোথাও ফেলাই ভাল। শার্টটা ভালমত পাকিয়ে, ধোয়া জামাকাপড় ভরে রাখার প্লাস্টিক প্যাকেটে ঢুকিয়ে ব্যাক্‌প্যাকের একেবারে ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম। চুলটা জলে ভিজিয়ে সেট করে নিলাম। টয়লেট ব্যাগ থেকে সাবান বের করে, তাই দিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম। হাত তখনও অল্প কাঁপছে। তবু সময় নিয়ে যত্ন করে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে পর্যন্ত ধুলাম। নোখের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভেতরে অবধি রক্ত সেঁধিয়ে গেছে। শার্ট খুলে, খালি গায়ে বুকে লেগে থাকা রক্তের দাগ ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললাম। তারপর চেকশার্ট পরে, গলা অবধি বোতাম আটকে, ট্রাউজারে গুঁজে নিলাম। যাতে লোকের নজরে পড়ে না যাই, তারজন্য চেহারাটা একটু ভদ্র সভ্য করে নেওয়া দরকার।

কিন্তু আমার ভয় করছিল। দাঁতে দাঁতে লেগে আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে অবিরাম। থামানোর চেষ্টা করেও থামাতে পারছিলাম না। দুহাত টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। দুটো হাতই একটু কাঁপছিল। নিজের হাত বলেই মনে হচ্ছিল না। স্বাধীন একজোড়া আলাদা প্রাণীর মতো দেখাচ্ছিল। আর হাতের তালু ভীষণ জ্বালাজ্বালা করছে, গরম লোহার রড জোরে চেপে ধরার পর যেমন হয়।

বেসিনের ধারটায় দুহাতে শরীরের ভর রেখে আয়নায় মুখটা জোরে চেপে ধরলাম। কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু কেঁদে ফেললে, এসে উদ্ধার করার মতো কেউ নেই। কেউ একজন—

আরে, এই এত রক্ত কোত্থেকে লাগিয়ে এলে তুমি? করছিলে কী? কিন্তু কোনো কিছুই মনে করতে পারছ না। তোমার নিজের শরীরে তো কোনোরকম ক্ষত চোখে পড়ছে না। বাঁ-কাঁধের ব্যথাটা বাদ দিলে তেমন ব্যথাও তো নেই। তার মানেই, ঐ লেগে থাকা রক্ত তোমার নিজের শরীরের নয়। ওটা অন্য কোনো মানুষের শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্ত। সে যাই হোক, এখানে অনির্দিষ্টকাল থেকে যাওয়া তোমার চলবে না। এরকম একটা জায়গায় রক্তমাখা অবস্থায় পুলিশী টহলের সামনে পড়ে গেলেই এক্কেবারে হয়েছে। কিন্তু এখনই সোজা হোটেলে ফিরবে কিনা সেটাও ভেবে দেখার আছে। বলা তো যায় না, কেউ হয়তো বসে আছে তুমি ফিরবে বলে। সাবধানের মার নেই। বলা যায় না, তুমি সম্ভবত অজানিতে কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ। তুমিই অপরাধী, এমন সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই এমনও বলা যায় না।

সৌভাগ্যক্রমে, মালপত্র সব সঙ্গেই আছে। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে, যেখানেই যাও, যাবতীয় সম্পত্তি ঠেসে ঢুকিয়ে ভারী ব্যাক্‌প্যাকটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিয়ে হাঁটতে থাকতে এতদিন। কাজে দিয়েছেই বলতে হবে। ঠিকই করছিলে তুমি। তাই তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ভয়েরও কিছু নেই। এর পরেরটুকুও কোনোভাবে ভালমতোই উৎরে যাওয়ার কথা। যতই হোক, তুমি হলে জগতের সবচেয়ে টাফ পনেরো বছরের ছেলে। আত্মবিশ্বাস আছে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে, জরুরি কথাগুলো মাথায় ঝালিয়ে নাও। তাহলেই নিশ্চিত ভালভাবে সামলে নেবে। তবে কিনা, যথেষ্ট সাবধানে না চললে হবে না। কোথাও কারো একটা রক্তপাত হয়েছে। সত্যিকারের রক্ত। আর, অনেক রক্ত। এইসময় কেউ একজন খুব মন দিয়ে তোমার গতায়াতের হদিস রাখছে কি না কে জানে।

এসো, কাজে লেগে পড়ো। করণীয় একটাই। গন্তব্যস্থলও একটাই। সেটা কোথায় তা তো তোমার জানা থাকার কথা।

গভীর ভাবে শ্বাস নিলাম বুক ভরে। ব্যাক্‌প্যাক কাঁধে ফেলে বাথরুম থেকে বেরোলাম। নুড়ি পাথর মাড়িয়ে মার্কারি ল্যাম্পের আলোয় হাঁটতে থাকলাম। হাঁটতে হাঁটতে মগজটা ভালরকম খাটিয়ে নিতে হবে। সুইচ টিপে, ক্র্যাঙ্ক ঘুরিয়ে, চিন্তা-ভাবনাগুলোকে চালু করে দিতে হবে। কিন্তু ঠিকমতো সেটা হচ্ছে না। ইঞ্জিন চালু করার পক্ষে ব্যাটারির পাওয়ার একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। একটু উষ্ণ আর নির্ঝঞ্ঝাট একটা জায়গা দরকার। পালিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা না করে তুললে হবে না। কিন্তু যাবটা কোথায়? জায়গা বলতে মাথায় আসছে লাইব্রেরি অবধি। কোওমুরা পাঠাগার। কিন্তু আগামিকাল সকাল এগারোটা না বাজলে তো লাইব্রেরি খুলবে না, কিন্তু সেই অবধি দীর্ঘ সময় কোথাও একটা কাটিয়ে দিতে হবে।

কোওমুরা পাঠাগার ছাড়া আর একটাই জায়গার কথা আমি ভাবতে পারি। লোকের চোখে পড়ব না এরকম একটা জায়গায় বসে ব্যাক্‌প্যাকের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। তারপর ওটা আদৌ চালু আছে কিনা যাচাই করে দেখলাম। পার্স থেকে সাকুরার ফোন নম্বর লেখা চিরকুটটা বের করে, সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নম্বরটা টিপলাম। আঙুল এখনো স্টেডি হয়নি। বেশ কয়েকবার ঠিকঠাক করতে না পেরে শেষপর্যন্ত সেই দীর্ঘ নম্বর পুরোটা টিপে উঠতে পারলাম। ভাগ্য সহায়, ফোনটা অনুপস্থিতিকালীন রেকর্ড করা বার্তা দিচ্ছে না। বারোবার কল হওয়ার পর মেয়েটাকে ফোনে পাওয়া গেল। আমি নাম বললাম।

"তামুরা কাফকা!" একটু যেন অপ্রসন্ন গলায় বলল। "এখন ক'টা বাজে বলে তোমার ধারণা? কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, আমাকে।"

"বুঝতেই পারছি যে এটা ঠিক হচ্ছে না", আমি বলি। নিজের কণ্ঠস্বর যে ভয়ানক আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে সেটা নিজেই বুঝতে পারি। "কিন্তু কী করবো ভেবে পেলাম না যে। খুব মুশকিলে পড়ে, সাকুরা-সান ছাড়া পরামর্শ করার মতো আর কারুকে পেলাম না।"

ফোনের অপর প্রান্তে নৈঃশব্দ খানিকক্ষণ বজায় রইল। ও সম্ভবত আমার গলার আওয়াজ থেকে ব্যাপারটার গুরুত্ব মাপার চেষ্টা করছিল।

"কোনো সিরিয়াস ব্যাপার?"

"সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না যদিও, তবে, সম্ভবত সেরকমই। শুধুই এবারের মত কোনোভাবে উদ্ধার করতে হবে। যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার যাতে অসুবিধে না হয়।"

ও একটু ভাবল। হতভম্ব হয়ে গেছে এমন নয়, কেবল ভেবে নিচ্ছে কিছু। "এখন তাহলে তুমি আছো কোথায়?"

আমি জিনজার নামটা বললাম। ও জানেনা ওটার কথা।

"তাকামাৎসু শহরের মধ্যে তো ওটা?"

"নিশ্চিত নই, তবে, সেরকমই মনে হচ্ছে।"

"আরে! নিজে কোথায় আছো সেটাও জান না?" বিস্মিত গলায় বলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে অনেক কথা।"

বড় করে শ্বাস ফেলল। "কাছাকাছি কোথাও থেকে ট্যাক্সি ধরে, *** মহল্লার নি-চো-মে পাড়ার কোণে যে লসনের স্টোর আছে, সেই অবধি এসো। লসন কোমবিনি[1]। বড় সাইনবোর্ড আছে, বের করতে সময় লাগবে না। ট্যাক্সিতে চাপার মতো পয়সা আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আছে," আমি বললাম।

"তবে ঠিক আছে," ও বলে। তারপর ফোন কেটে দিল।

আমি জিনজার গেট দিয়ে বেরিয়ে, বড়রাস্তায় এসে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। আমি ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইলাম *** মহল্লার নি-চো-মে পাড়ার যে কোণে লসন আছে, সেটা চেনে কিনা। ড্রাইভার সে জায়গা ভালই চেনে। খুব দূরে কি? না, তেমন দূর কিছু নয়। এক হাজার ইয়েনও লাগবে না সম্ভবত।

লসনের সামনে এসে ট্যাক্সি থামিয়ে, আনস্টেডি হাতে পয়সা মিটিয়ে দিলাম। তারপর কাঁধে ব্যাক্‌প্যাক চাপিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকলাম। যতক্ষণ লাগবে বলে ভাবা গিয়েছিল তার চেয়ে আগে পৌঁছে যাওয়ায় মেয়েটা এখনো এসে পৌঁছায়নি। ছোট কাগজের প্যাকেটে দুধ কিনে ইলেকট্রনিক রেঞ্জে গরম করে নিয়ে অনেকটা সময় ধরে ধীরে ধীরে খেলাম। ঈষদুষ্ণ দুধ গলা দিয়ে পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। এই অনুভূতিটা যেন মনটাকে, একটু হলেও, শান্ত করল। যখন দোকানে ঢুকেছিলাম, যে কর্মচারীরা নজর রাখছিল কেউ কিছু তুলে নেয় কিনা, তারা একপলক ব্যাক্‌প্যাকটার দিকে তাকিয়েছিল, একটু পরেই আর কেউ খেয়ালই রাখেনি। র‍্যাকে সার দিয়ে রাখা ম্যাগাজিন থেকে যেন বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছি এরকম ভাণ করে কাঁচের প্রতিবিম্বে নিজের চেহারা দেখে নিলাম। চুল এখনো এলোমেলো হয়ে থাকলেও চেকশার্টে লাগা রক্তের দাগ খুব একটা চোখে পড়ছে না। চোখে পড়ার মতো বলতে হয়তো শার্টটা যে ময়লা সেটুকুই। আর তাহলে রইলো শুধু কোনোভাবে শরীরের কাঁপুনিটা থামানো।

[1] কোমবিনি হচ্ছে 'কনভিনিয়েন্স স্টোর' কথাটারই সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দশ মিনিটে সাকুরা এসে পড়লো। ঘড়িতে সময় ১টার কাছাকাছি। প্লেইন ছাইরঙা সোয়েটশার্ট আর রঙ ফিকে হয়ে আসা ব্লু-জীনস পরা। চুলগুলো টেনে পিছনে গিঁট দিয়ে নিউ-ব্যালান্সের নেভি-ব্লু রঙের টুপি পরা। ওর মুখটা দেখে অবশেষে আমার দাঁতে দাঁতে আওয়াজটা থামলো। ও কাছে এসে, কুকুরের দাঁতের পাটি যেমন করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সেরকম চোখে আমার মুখটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায় এরকম অস্ফুট গলায় কী যেন বলে উঠলো। তারপর আমার পাছায় দুবার হালকা করে চাপড় মেরে বলল, “বাড়ি চল”।

ওর বাড়ি লসন থেকে দুটো ব্লক মতো দূরত্বের হাঁটা পথ। দোতলা ছোটখাটো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। ও সিঁড়ি দিয়ে উঠে, পকেট থেকে চাবি বের করে সবুজ রঙের একটা প্যানেল টাইপের দরজা খুলল। দুটো ঘর, ছোট্ট রান্নাঘর আর বাথরুম। দেওয়াল পুরু নয়, মেঝেতে বেশ ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয়, সারাদিনে প্রাকৃতিক আলো বলতে সম্ভবতঃ একমাত্র কড়া পশ্চিমের রোদ। কোনও ঘরে ফ্লাশ টেনে জল বয়ে যাওয়ার শব্দ হল, অন্য একটা ঘরে দেরাজের পাল্লা ঠোকাঠুকির আওয়াজ। কিন্তু অন্ততপক্ষে রক্তমাংসের মানুষেরা জীবন কাটায় ওখানে। সিঙ্কে ডাঁই করা ডিশ, খালি প্লাস্টিকের বোতল, খানিক পড়া ম্যাগাজিন, বহু আগে ফোটা টবের টিউলিপ, ফ্রিজের গায়ে টেপ দিয়ে সাঁটা কেনাকাটার ফর্দ, চেয়ারে হেলান দেওয়ার জায়গায় রাখা মোজা, টেবিলের ওপরে মেলে রাখা খবরের কাগজের টেলিভিশন প্রোগ্রামের পাতা, অ্যাশট্রে আর ভার্জিনিয়া স্লিমসের সরু লম্বা প্যাকেট, কয়েকটা পোড়া সিগারেট। এরকম একটা দৃশ্য আশ্চর্যভাবে মনটাকে বেশ নির্ভার করে দিল।

“এটা আমার বন্ধুর ঘর”, মেয়েটা জানালো। “আগে এই মেয়েটার সঙ্গে আমি টোকিওর বিউটি পার্লারে একসঙ্গে কাজ করতাম, পরিস্থিতির কারণে গতবছর তাকামাৎসুতে পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এসেছে। কিন্তু একমাসের জন্য ইন্ডিয়ার দিকে বেড়াতে যেতে চায় বলে সেই সময়টা বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য আমাকে থাকতে অনুরোধ করলো। এরপর এমন হল যে ওর কাজটাও সেইসময় আমিই করব ঠিক হয়েছে। পার্লারেরই কাজ। মাঝেমধ্যে টোকিও থেকে দূরে গিয়ে মেজাজ-মর্জি একটু পালটে আসাও মন্দ নয় বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে হল, ঠিক কিনা। নিউ এজ টাইপের মেয়ে, যাচ্ছেও আবার ইন্ডিয়াতে, সত্যিই একমাসে ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ।"

আমাকে খাবার টেবিলে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসাল মেয়েটা। ফ্রিজ থেকে বের করে পেপসিকোলার ক্যান এনে দিল। গ্লাস নেই। আমি সচরাচর কোলা খাই না। বড্ড বেশি মিষ্টি, দাঁতের পক্ষেও ভাল নয়। কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে বলে পুরোটা খেয়ে ফেললাম।

"খিদে পেয়েছে? কাপ-নুডলস ছাড়া কিছু নেই যদিও, ওতে যদি হয়।"

খিদে পায়নি, আমি বলি।

"তোমার মুখচোখের অবস্থা কিন্তু ভয়াবহ, সেটা জান?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।

"এবার বল, হয়েছেটা কী?"

"সে তো আমিও জানি না।"

"কী হয়েছে, সে তুমি নিজেই জান না। নিজে এখন কোথায় সেটাও খুব ভালো জানা নেই। বুঝিয়ে বলতে গেলে সে বিশাল কাহিনী হয়ে যাবে" কেবল পরিস্থিতিটুকু নির্দিষ্ট করে নিতে নিজের মনে বলে। "সে যাই হোক না কেন, খুব মুশকিলে পড়েছ, তাই তো?"

"খুবই মুশকিলে পড়েছি", আমি বললাম। সত্যি যে খুব মুশকিলে পড়েছি সেটা কারুকে বলতে পারলেই ভাল হয় বলেই মনে হল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। আর সেই সময়টা ও ভুরু কুঁচকে আদ্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তাহলে, তাকামাৎসুতে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, ঠিক কিনা? আসলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ, তাই না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করি।

"তোমার বয়েসে আমিও একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তাই, একরকম বুঝতেই পারছি তোমার মনের অবস্থা। সেইজন্যই চলে আসার সময় তোমাকে আমার মোবাইল নম্বর দিয়ে এসেছিলাম। কোনো কাজে লাগতে পারে হয়তো, ভেবে।"

"ধন্যবাদ", আমি বলি।

"আমার বাড়ি যদিও চিবা জেলার ইচিকাওয়াতে, বাবা-মা'র সঙ্গে কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিল না, স্কুলে যেতেও ভাল লাগত না, শেষে বাবা-মা'র থেকে টাকাপয়সা হাতিয়ে অনেক দূরে চলে গেলাম। ষোলো বছর বয়েসের সময়। আবাশিরির কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। তারপর খামারের পশুচারণক্ষেত্র একটা চোখে পড়ে গিয়ে সেখানে কাজ চাইলাম। যেকোনো কিছুই করতে রাজি, মন দিয়ে করব। ছাদে একজায়গায় শুতে পেলেই হবে, আর শুধু চাট্টি ভাত, তাহলেই আর মাইনে লাগবে না। ওরা খুব সহৃদয়তা দেখাল, চা খেতে বলল, মালিকের স্ত্রী একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন, আমি বাধ্যের মতো অপেক্ষা করছি, আর টহলে বেরুনো গাড়িতে পুলিশ এসে সোজা বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিল। এরকম যে হয়, ওরা সে ব্যাপারে অবহিতই ছিল, এখন বুঝতে পারি। তখন আমি বেশ ভাল করেই টের পেলাম যে যেরকমই হোক, কাজ চেয়ে প্রত্যাখ্যাত না হতে হলে একটা কোনো কিছুতে দক্ষতা থাকতেই হবে। আমি তখন হাইস্কুল ছেড়ে দিয়ে, নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতার প্রশিক্ষণ পেতে সেমমোন-গাক্কোতে[1] ভর্তি হলাম। বিউটিশিয়ান হয়ে গেলাম।"

ঠোঁট ডান বাঁ দুপাশেই সমান বিস্তৃত করে হাসল ও।

"এটাই বেশ একটা সুস্থ চিন্তাধারা না, কী মনে হচ্ছে?"

আমি স্বীকার করি যে চিন্তাধারাটা ভাল।

"এবার তাহলে, প্রথম থেকে ব্যাপারটা ধীরেসুস্থে খোলসা করে বলবে তো?" মেয়েটা বলে। তারপর ভার্জিনিয়া স্লিমসের প্যাকেট

[1] মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের পাট শেষ হলে, কোনো একটি বিশেষ ধরণের পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের পেশাদারি দক্ষতা প্রদান করা হয় এইধরণের শিক্ষাকেন্দ্রে।

~ www.amarboi.com ~

থেকে একটা সিগারেট বের করে, দেশলাই দিয়ে সেটা ধরায়। "আজ রাতে আর কিছুতেই ঠিক মতো ঘুম আসবে বলে মনে হয় না, তাই তোমার কাহিনীটাই হয়ে যাক।"

আমি প্রথম থেকে বিশদে বলতে থাকি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ইস্তক যা কিছু। তবে, অবশ্যই ভবিষ্যতের পূর্বাভাসের কথাটা উহ্য রেখে, ওটা যাকে তাকে বলার মতো ব্যাপার নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০

“তাহলে, এই নাকাতা যদি আপনাকে কাওয়ামুরাবাবু বলে ডাকে, তাতে আপত্তি নেই, তাই তো?” নাকাতা গাঢ় বাদামি রঙের ডোরাকাটা বেড়ালটাকে আরেকবার একই প্রশ্ন করল। ধীরেসুস্থে শব্দচয়ন করে, কেটে কেটে, যতটা পারা যায় শুনতে যাতে সুবিধে হয় এরকম গলা করে বলল।

এই বেড়ালটা জানিয়েছে যে তার নিজের ধারণা, কাছাকাছি কোথাও গোমাকে (সেই এক বছরের, তিনরঙা, মাদী) দেখা গেছে। যদিও বেড়ালটার—নাকাতার দিক থেকে দেখলে আর কি—কথাবার্তার ধরণটা বেশ একটু অদ্ভুত। আবার বেড়ালটার কাছেও, নাকাতা যা বলছে সেটা যেন আরেক দুর্বোধ্য ব্যাপার। এর ফলে, মাঝেমাঝেই একে অপরের কথা ধরতে না পেরে, আলাপের কোনও অর্থই হচ্ছিল না।

“অসুবিধে তেমন নেই, তবে মাথাটা উঁচু।”

“আজ্ঞে, যা বলছেন সেটা না নাকাতা ভাল বুঝতে পারছে না। অপরাধ নেবেন না, নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম।”

“শেষ অবধি ব্যাপারটা ম্যাকারেলই।”

“আপনি ম্যাকারেল খেতে চাইছেন, এরকম ব্যাপার কি?”

“উহুঁ, সামনের হাত বাঁধা।”

শুরু থেকেই বেড়ালদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান একেবারে ত্রুটিহীনভাবে করার প্রত্যাশা নাকাতার ছিল না। যত যাই হোক, বেড়াল আর মানুষের মধ্যে কথা তো। অত সহজে মনের ভাব পরস্পরের কাছে মসৃণভাবে পৌঁছে যাবে, সে হবার নয়। প্রথমত, কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নাকাতার নিজের যেটুকু তাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেড়ালের সঙ্গেই হোক, মানুষের সঙ্গেই হোক—কিঞ্চিত সমস্যা হয়। গত সপ্তাহে ওওৎসুকাবাবুর সঙ্গে যে অনায়াসে অনর্গল কথা বলে যেতে পেরেছিল সেটাই বরং ছিল ব্যতিক্রম। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সামান্য ও সহজ একটু বার্তাও আদানপ্রদান করতে নাকাল হয়ে পড়ল, এরকম প্রায়ই হয়। তেমন ঝঞ্ঝাটে পড়ে, জোরালো হাওয়া বইছে এমন দিনে খালের দুপাড়ে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচানোর মতোই পরিস্থিতিও কখনও কখনও হয়েছে। এবারও একেবারে সেরকমই পরিস্থিতি।

বেড়ালদেরও প্রকারভেদ আছে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে, বিশেষ করে ঘন বাদামি রঙের ডোরাকাটা বেড়ালদের সঙ্গে কথাবার্তায়, ওয়েভ-লেংথটা ঠিক মেলে না বেশির ভাগ সময়েই। কালো বেড়ালদের সঙ্গে মোটামুটি ভালভাবেই চালিয়ে যাওয়া যায়। শ্যামদেশীয় বেড়ালের সঙ্গে হলেই সবচেয়ে ভাল হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এরকম শ্যামদেশীয় রাস্তার বেড়ালের দেখা অত হরবখত পাওয়া যায় না। শ্যামদেশীয় বেড়াল সাধারণত বাড়ির ভেতরে খুব যত্ন করে পোষা হয়। আর রাস্তার বেড়াল, কেন যেন, বেশিই ঘন বাদামি রঙের ডোরাকাটা বেড়াল।

তাহলেও, এই কাওয়ামুরা-বাবুর কথা যেন নাকাতার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। উচ্চারণ দুর্বোধ্য, একটার পর একটা কথারও অর্থ ধরা যায় না। দুটো কথার মধ্যে সম্পর্কও বের করা যায় না। বাক্যের চেয়ে হেঁয়ালির মতোই শোনায়। কিন্তু অটল ধৈর্য্য জিনিসটা নাকাতার স্বভাবগত, সময় থাকলে এই জিনিসটিই অফুরান। বার বার ঘুরে ফিরে একই কথা বলে বলে, অপরকে দিয়েও বারবারই ঘুরে ফিরে একই কথা বলাত। ওদের রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার মধ্যে ছোট একটা বাচ্চাদের পার্কে বেঞ্চের ওপর বসে দুজনে সে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে কথাবার্তা বলত, কিন্তু কথা অধিকাংশ সময়েই সেই একই জায়গায় ঘোরাফেরা করত।

"'কাওয়ামুরা-বাবু' বলতে কিন্তু কেবল ডাকার জন্য দেওয়া নাম। এর কোনো বিশেষ অর্থ নেই। নাকাতা বেড়ালমশাইদের একেকজনকে আলাদা করে চিনে রাখার জন্য, মনে রাখার জন্য, নাম জিনিসটা অতিরিক্ত জুড়ে দেয়। এতে কাওয়ামুরা-বাবু কখনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো মুশকিলে পড়বেন না। কেবল কাওয়ামুরা-বাবু বলে ডাকতে অনুমতি চাই।"

এতে কাওয়ামুরা-বাবু অর্থহীন কী যেন অভিযোগের সুরে বারবারই বলতে থাকছিল, কিন্তু সে আর থামার সম্ভাবনা নেই দেখে নাকাতা হাল ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে চলে গেল। এবার নাকাতা গোমার ফোটো আরো একবার কাওয়ামুরা-বাবুকে দেখাল।

"এই হচ্ছে গোমা, কাওয়ামুরা-বাবু। নাকাতা এই বেড়ালমশাইকে খুঁজছে। এক বছর বয়েসের তিনরঙা বেড়াল। নোগাতার সান-চো-মে পাড়ার মিঃ কোইজুমির বাড়ির পোষা বেড়াল, কিন্তু কিছুদিন হল কোথায় গিয়েছে জানা যাচ্ছে না। ওঁর স্ত্রী জানালা খুলতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছে। তাই, আরো একবার জিজ্ঞেস করছি, কাওয়ামুরা-বাবু এই বেড়ালটিকে দেখেছেন, তাই না?"

কাওয়ামুরা-বাবু সেই ছবি আরও একবার ভাল করে দেখে সায় দিলেন।

"স্কামুরা, ম্যাকারেল হলে বাঁধা। বাঁধা হলে খুঁজবো।"

"আজ্ঞে মাফ করবেন, একটু আগে বললাম না, নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম, তাই কাওয়ামুরা-বাবু যা বলছেন ভাল বুঝতে পারছে না। আরেকবার ফের বলবেন একটু?"

"স্কামুরা, ম্যাকারেল হলে, সঙ্গেসঙ্গেই। হাতড়ালে বাঁধা।"

"ম্যাকারেল মানে, ম্যাকারেল মাছ তো?"

"একইসঙ্গে যদিও ম্যাকারেল, বাঁধা কিন্তু স্কামুরা।"

নাকাতা কদমছাঁট দেওয়া পাকাচুল মেশানো মাথায় হাতের তালু ঘষতে ঘষতে, বেশ চিন্তায় পড়ল। কী করে যে এরকম ধন্দে ফেলা গোলকধাঁধার মত বাক্যালাপের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু নানা ভাবে মাথা খাটিয়েও কোনো উপায়ই খুঁজে বের করতে পারল না। সচরাচর যেমন হয়, যুক্তিপূর্ণ ভাবে গুছিয়ে চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারে নাকাতা তেমন পটু নয়। সেই সময়টায় কাওয়ামুরা-বাবু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এসবের মধ্যে না জড়িয়ে, পেছনের পা'টা তুলে গালের নিচে একটা অংশে ভাল করে চুলকে নিচ্ছিল।

এমন সময় পেছন থেকে মৃদু হাসির মতো কী যেন শোনা গেল। নাকাতা পেছনে ঘুরে তাকাতেই দেখে পাশের বাড়ির নিচু ব্লক-বিভাজক পাঁচিলের ওপর বসে সুন্দরী ছিপছিপে এক শ্যামদেশীয় বেড়াল চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে।

"মাফ করবেন, আপনার নাম বললেন, নাকাতা-সান, তাই তো?" সেই শ্যামদেশীয় বেড়াল বেশ পরিশীলিত গলায় বলল।

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, আমার নাম নাকাতা। কোন্নিচিবা[†]!"

"কোন্নিচিবা!" শ্যামদেশীয় বেড়াল বলে।

"হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যক্রমে সকাল থেকে মেঘ করে রয়েছে বটে, কিছুতেই এই অবস্থায় বৃষ্টি হবে বলে দেখে মনে হচ্ছে না," নাকাতা এবার বলে।

"না হলেই ভালো, তাই না।"

এই শ্যামদেশীয় বেড়ালটি ক্রমে মাঝবয়েসের কোঠায় পৌঁছে যাচ্ছে এরকম মাদী বেড়াল। বেশ গুমোর দেখিয়ে ল্যাজটা পেছনে খাড়া করা, গলায় বকলস লাগানো, যেটাতে নামও লেখা আছে। দেখতে ভালই, শরীরে এতটুকু মেদ জমেনি।

"আমাকে মিমি বলে ডাকবেন। *লা বোহেম*-এর মিমি। গান ও আছে এই নিয়ে। 'আমার নাম মিমি' বলে।"

"আচ্ছা", নাকাতা বলে।

"এই নামে পুচ্চিনির অপেরা আছে। আমাকে যিনি পোষেন, তাঁর আবার অপেরা খুব পছন্দ কিনা", বলে মিমি বেশ সৌহার্দ্যসূচক অমায়িক হাসি হাসল। "গেয়ে শোনালে ভাল হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গাইতে তেমন ভাল পারি না বলে..."

[†] দিনের যে কোনো সময়ে অভিবাদন করতে বলা হয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি ভাল লাগলো, মিমি-দেবী।"

"আমারও, নাকাতা-সান।"

"কাছাকাছিই থাকেন নাকি?"

"হ্যাঁ, ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন দোতলা বাড়িটা, ঐ বাড়িরই পোষা। তানাবে-দের বাড়ি। ঐ দেখুন, ঐ যে গেটে দাঁড় করানো আছে একটা ক্রীম কালারের BMW 530 গাড়ি।"

"আচ্ছা", নাকাতা বলল। BMW কথাটার কী অর্থ, নাকাতার ভাল জানা নেই, কিন্তু ক্রীম কালারের গাড়ি ধরণের কিছু একটা চোখে পড়ল। সম্ভবত ওটাই BMW বলে জিনিসটা।

"বুঝলেন তো, নাকাতা-সান", মিমি বলে। "আমি, একেবারেই স্বাধীন ও অবারিত গতি, বেশ স্বতন্ত্র স্বভাবের বেড়াল বলেই, অন্যের ব্যাপারে মাত্রাছাড়া অতিরিক্ত নাক গলানো পছন্দ করিনা। কিন্তু এই ছোকরা, ঐ যে-- যাকে আপনি কাওয়ামুরা বলে ডাকছিলেন— সত্যি বলতে কী, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নেই। বেচারার কপাল খারাপ, যখন ছোট ছিল, এই অঞ্চলেরই একটা ছেলে সাইকেলে চেপে আসছিল আর সাইকেলটা ওকে ধাক্কা মারে। ছিটকে গিয়ে কংক্রীটের কোণাটায় সজোরে গিয়ে লাগে মাথাটা। সেই থেকেই কথা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। তাই অমন অটল ধৈর্য্য নিয়ে কথা বলেও নাকাতা-বাবুর তেমন কাজ হবে বলে মনে হয় না। কিছুক্ষণ ধরেই ওখান থেকে দেখছিলাম, একটু চোখে পড়ার মতো ব্যাপার তো, কিছু একটা না করলেই নয়, ভাবতে ভাবতেই আর না বলে থাকতে পারিনি আর কী।"

"আরে, না না, এ নিয়ে একদমই ভাববেন না। মিমিদেবীর উপদেশ আমি কৃতজ্ঞচিত্তেই গ্রহণ করেছি। কাওয়ামুরা-বাবুর মতোই নাকাতারও বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই বলে, সকলেরই সাহায্য না পেলে ঠিকমতো বেঁচে থাকাই সম্ভব হবে না। এই কারণেই রাজ্যপালের থেকে প্রতিমাসে ভা-তা পেয়ে থাকি। মিমিদেবীর মূল্যবান মতামতও অবশ্যই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ব্যাপারটা হল যে আপনি বেড়াল খুঁজছেন, তাই তো।" মিমি বলে। "আড়ি পেতে শুনিনি কিন্তু, কিছুক্ষণ যাবৎ দিবানিদ্রায় ঝিম মেরে ছিলাম তো, নেহাতই কিভাবে যেন কানে এসেছে বটে এইসব কথা, গোমার কথাই তো বললেন, তাই না।"

"হ্যাঁ, ওর কথাই হচ্ছিল।"

"অর্থাৎ, এই কাওয়ামুরা, গোমাকে দেখতে পেয়েছে কি না, তাই তো?"

"হ্যাঁ, একটু আগে সেরকমই বলছিলেন। কেবল, তার পরেরটুকু যে আদৌ কী বললেন, সেকথা এই নাকাতার মাথায় মোটেই ঢোকেনি বলে একটু মুশকিলেই পড়েছি।"

"আচ্ছা, নাকাতা-সান, আপনার আপত্তি না থাকলে, আমি যদি মাঝখানে থেকে ওর সঙ্গে কথাবার্তা চালাই, তাহলে কেমন হয় ? আমার তো মনে হয়, বেড়ালে বেড়ালে কথা এগোয়ও সহজে, আর, এই ছোকরার বিদঘুটে কথা বলার ধরণের সঙ্গে আমি খানিকটা পরিচিতও বটে। তাই, ওর থেকে কথা বের করে, সেটা সংক্ষেপে নাকাতা-সানকে বলে দিই যদি, তবে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা যদি দয়া করে করে দেন, তাহলে তো নাকাতা সত্যিই এই ফ্যাসাদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।"

শ্যামদেশীয় বেড়াল সামান্য মাথা হেলিয়ে ব্যালেতে নাচার মতো করে ব্লকের পাঁচিলের থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এল। তারপর কালোরঙের লেজটা পতাকা উত্তোলনের লাঠির মতো একেবারে উর্দ্ধপানে খাড়া রেখে ধীর পায়ে হেঁটে এসে কাওয়ামুরা-বাবুর পাশে বসলো। কাওয়ামুরা-বাবু তক্ষুণি মুখটা এগিয়ে নিয়ে মিমির পেছনে একটু গন্ধ শুঁকলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্যামদেশীয় বেড়াল থাবা বাড়িয়ে গালে এক ঘা দিতেই কেমন গুটিয়ে গেল। একটুও সময় না দিয়ে আরো একবার মিমি ওর নাকে থাবা মারলো।

"একটি শব্দ না করে ভাল করে শোনো আমার কথা। বুদ্ধির ঢেঁকি। অকালকুষ্মান্ড, তাও পচা!" শাসনের গলায় মিমি ধমক দিয়ে বলে কাওয়ামুরা-বাবুকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"এই ছোকরাকে, প্রথমেই ভালরকম ধাতানি না দিয়ে নিলে চলে না, জানেন তো", নাকাতার দিকে ঘুরে মিমি নিজের সমর্থনে বলে। "না হলে, কোনো সিরিয়াসনেসই থাকবে না, আরও বেশি করে আবোলতাবোল বলতে থাকবে। এরকম হয়ে পড়ার পেছনে ওর তেমন দোষ নেই, ভেবে আমার খারাপই লাগে, কিন্তু কিছু করার নেই।"

"হ্যাঁ", না বুঝেই সায় দেয় নাকাতা।

তারপর শুরু হল দুই বেড়ালের মধ্যে কথার আদানপ্রদান, বাক্যালাপ যেমনই দ্রুত হচ্ছিল তেমনই নিম্নস্বরে, ঠিক যে কী বলা হচ্ছে নাকাতা শুনে ভাল বুঝে উঠতে পারল না। মিমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কীসব প্রশ্ন করছিল আর কাওয়ামুরা-বাবু নিরীহ গলায় সসংকোচে উত্তর করছিল। উত্তর দিতে একটু দেরি হলেই এসে পড়ছিল নির্দয় থাপ্পড়। যেটাই করে, বুঝেসুঝে ঠিকমতো করে এই শ্যামদেশীয় বেড়ালটি। পরিশীলিত, শিক্ষিত। এযাবৎ কতই তো বেড়ালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু, গাড়ির মডেল জানা আছে, অপেরাও শোনে এমন বেড়াল এই প্রথম। নাকাতা মুগ্ধ হয়ে সেই কার্যকরী ও চটপটে কাজের ধারা দেখতে লাগল।

কথা মোটামুটি পেট থেকে বের করতে পেরে মিমি এবার কাওয়ামুরাবাবুকে ভাগিয়ে দিতে, "হয়েছে, এবার ওদিকে যাও।" গোছের কী বলল। কাওয়ামুরাবাবুও মনমরা হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেলেন। মিমি এবার আহ্লাদীর মতো করে গিয়ে নাকাতার কোলে চেপে বসল।

"ব্যাপারটা মোটামুটি একরকম বোঝা গেছে।" মিমি বলে।

"হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" নাকাতা বলল।

"এই ছোকরা... কাওয়ামুরা, তিনরঙা গোমাকে, একটু এগোলেই একটা যে ঘাসজমি, সেখানে কয়েকবারই দেখেছে বলেই মনে হয়। ওখানে পরে বাড়ি উঠবে, এখন ফাঁকাই পড়ে আছে জমিটা। কোনো এক অটোমোবাইল কোম্পানির যন্ত্রাংশ মজুত রাখার গুদাম রিয়েল এসটেট কোম্পানি কিনে নিয়েছে, ওখানে খুব হাইক্লাস উঁচু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাড়ি উঠবে বলে প্ল্যান বানিয়ে জমি খালি করে নেওয়া হয়েছে। জোরালো গণ আন্দোলন হয়েছে এর বিরুদ্ধে, আইনি জটিলতা আছে বলে কনস্ট্রাকশন শুরু হতে পারছে না আপাতত। এইটেই এখন চালু প্রসঙ্গ। জমিটাতে এই ভাবেই ঘন হয়ে বড় বড় ঘাস গজিয়ে, সচরাচর আর মানুষের প্রবেশ ঘটে না ওদিকটায়, এই অঞ্চলের বেওয়ারিশ রাস্তার বেড়ালদের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা হয়ে উঠেছে। আমার যোগাযোগের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়, তার ওপর ডাঁশের পাল্লায় পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে, তাই আর ওদিকটায় খুব একটা যাই না। বুঝতেই পারছেন, ডাঁশের মতো ঝঞ্ঝাট একবার এসে ধরলে আর ছাড়ানো যায় না। খারাপ অভ্যাসের মতো।"

"হ্যাঁ", নাকাতা উত্তর দেয়।

"আপনার কাছের ঐ ছবিটার মতোই, ফ্লি-কলার পরানো বাচ্চা একটা সুন্দর তিনরঙা বেড়াল, যেন খুবই নিরীহ, গোবেচারা। ঠিক মতো কথাও ফোটেনি বলে মনে হয়। ফিরে যাওয়ার রাস্তা চেনে না, দুনিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞ, কোথাকার এক কাহিল হয়ে পড়া বেড়াল, সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।"

"মোটামুটি কবেকার কথা এটা?"

"সর্বশেষ দেখা গেছে তিন কি চারদিন মতো আগে। যতই হোক, বুদ্ধিশুদ্ধি তো নেই, ঠিকঠাক দিন তারিখ পর্যন্ত খেয়াল রাখতে পারে না। তবে, বৃষ্টি পড়েছিল, আলো ঝলমলে দিন ছিল, এসব বলছিল বলে মনে হয় যে সম্ভবত সোমবারের কথা বলছে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, রোববার বেশ ভাল বৃষ্টি হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, কি বার ছিল তা জানি না, কিন্তু ঐ সময় বৃষ্টি হয়েছিল বলেই নাকাতার মনে আছে। তো, তার পরে আর দেখা যাচ্ছে না, তাই তো?"

"হ্যাঁ, সেবারই সর্বশেষ দেখা গেছে। আশেপাশের বেড়ালরাও তার পরে আর ঐ তিনরঙা বেড়ালটাকে দেখেনি বলেই মনে হয়। বেফালতু, উটকো বেড়াল হলেও, ভাল করে খেয়াল করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেখেছিলাম বলেই, মোটের ওপর ভুল হচ্ছে না বলেই মনে হয়।"

"সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আপনার কাছে।"

"না না। এ আর এমন কী, অথচ দরকারি কাজ একটা। আমিও সচরাচর, পাড়ার কোনো অপদার্থ বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, ঠিকমতো বিষয়টা না এগুলে বেশ বিরক্ত হয়ে পড়ি। তাই সময়ে সময়ে এরকম মানুষের সঙ্গে, যিনি যুক্তি বোঝেন, অবসর মতো কথা বলতে পেলে জগৎটাই অনেক বিস্তৃত হয়ে যায়।"

"ও", নাকাতা বলে। "আচ্ছা, নাকাতা একটা জিনিস এখনও বুঝতে পারছেনা, কাওয়ামুরা-বাবু যে বারবারই ম্যাকারেলের কথা বলছিলেন, সেটা কি সত্যিই ম্যাকারেল মাছের কথা বলছিলেন?"

মিমি সামনের বাঁ পা'টা সোজা তুলে গোলাপি রঙের থাবাটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

"আরে, ছোকরার শব্দভান্ডারে বেশি কিছু নেই যে—"

"শব্-দো-ভান-ডারে?"

"ছোকরা বেশি শব্দ জানে না বলেই", মিমি ভদ্রভাবে শুধরে নিয়ে বলে। "ভাল খেতে খাবার যা কিছু, ওর কাছে ম্যাকারেল হয়ে যায়। এই ছোকরা ম্যাকারেলকেই জগতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চস্তরের খাবার বলে ভাবে। সী ব্রিম, কি হ্যালিবাট কিংবা ইয়োলো-টেইল, এইসবও যে আছে সে ও নিজেই জানে না যে।"

নাকাতা গলা খাকরে নেয়। "সত্যি বলতে কী, ম্যাকারেল নাকাতারও খুবই প্রিয়। অবশ্য, ঈল্‌ও খুব প্রিয়।"

"আমারও ঈল্ খুব প্রিয়। তবে রোজ রোজ খাওয়ার মতো নয়।"

"একেবারেই তাই। রোজ রোজ খাওয়ার মত নয়।"

এরপর দুজনেই ঈল্ নিয়ে নিজের নিজের ভাবনায় মগ্ন হয়ে রইল। দুজনের মাঝখান দিয়ে তখন বয়ে যাচ্ছিল ঈল্ নিয়ে গভীর চিন্তার এক কালপ্রবাহ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তাই, ও যেটা বলতে চাইছিল", মিমি অপ্রত্যাশিত ভাবেই যেন সেই চিন্তা থেকে সরে এসে আগের প্রসঙ্গ বজায় রাখল।

"ঐ ফাঁকা জায়গায় আশেপাশের বেড়ালেরা জড়ো হতে শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই বেড়াল ধরতে পারে এরকম একটা বদ লোক ওখানে আসা যাওয়া করতে লাগলো। ঐ লোকটাই গোমাকে হয়তো নিয়ে গেছে বলে অন্য বেড়ালেরা অনুমান করছে। লোকটা ভাল ভাল খাবার দিয়ে বেড়ালদের ধরে বড় থলেয় ভরে ফেলে। ঐ ধরতে আসা লোকটা খুব দক্ষ আর চালাক। পেটে খিদে আছে, দুনিয়াটা সম্বন্ধে ধারণা কম, এরকম বেড়ালেরা সহজেই ওর ফাঁদে ধরা পড়ে যায়। এমনকি আশেপাশের যেসব রাস্তার বেড়াল খুব সাবধান ধরণের, সব টের পায়, তাদেরও বেশ ক'টাকে লোকটা নিয়ে চলে গেছে বলে জানা গেছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। থলেয় ভরে ফেলার মতো অপছন্দের ব্যাপার বেড়ালদের কাছে আর হয় না।"

"ওহ", বলে নাকাতা আবার হাতের তালু দিয়ে পাকাচুলের মাথায় হাত বোলাতে লাগল। "বেড়ালমশাইদের ধরে তারপর কী করে?"

"সেটা অবশ্য আমিও জানি না। আগে, বেড়াল ধরে সেই দিয়ে শামিসেন[1] বানানো হত বলে শুনেছি, কিন্তু এখন তো শামিসেন জিনিসটাই আর বাদ্যযন্ত্র হিসেবে অত পপুলার নেই, আর আজকাল প্লাস্টিক ব্যবহার হয় সেই জায়গায়, বলে শুনেছি। এছাড়া আর, পৃথিবীর কোথাও কোথাও এখনও বেড়াল খায় এরকম লোক আছে বলে শোনা যায় বটে, সৌভাগ্যের কথা, জাপানে বেড়ালকে আহার্য্য করার চল নেই। তাই এই দুটো সম্ভাবনা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি বলে মনে হয়। এছাড়া যে কথাটা মাথায় আসে, বলছি আর কি, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক বেড়াল ব্যবহার করে এরকম লোকজনও আছে। বেড়াল কাজে লাগে এরকম নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা জগতে হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে এরকম বেড়াল আমার বন্ধুদের মধ্যেই আছে। এগুলো না, বেশ ভয়ানক সব গল্প, একবার সেকথা শুরু হলে অনেক কথা এসে যাবে, তাই এখন থাক, কেমন ? আবার, সংখ্যায় তেমন বেশি না হলেও, শুধু শুধুই বেড়ালদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় এমন অদ্ভুত লোকও আছে।

[1] শামিসেন একধরণের তারের বাদ্যযন্ত্র।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এমন হতে পারে, বেড়াল ধরে এনে কাঁচি দিয়ে তার ল্যাজটা কেটে দিল।"

"ও", নাকাতা বলে, "কাঁচি দিয়ে ল্যাজ কেটে সেটা দিয়ে কী করে?"

"কিছুই করে না। নেহাতই বেড়ালকে ব্যথা দিয়ে উত্যক্ত করতে চায়। এসব করে মনটা খুশি হয়। এই ধরণের বিকৃতমনা লোকজন জগতে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

নাকাতা এসব নিয়ে খানিক ভাবে, তবে বেড়ালের ল্যাজ কাঁচি দিয়ে কেটে কেন মজা পায়, সেটা অবশ্য কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

"তাহলে তো, বলা যায় না, এরকম বিকৃতমনের লোকই এসে গোমাকে নিয়ে গেছে কি না কে বলতে পারে", নাকাতা জানার চেষ্টা করে দেখে।

মিমি তার সাদা, লম্বা দাড়ি অনেকটা নেড়ে না জানার মুখভঙ্গি করল।

"হ্যাঁ। সেরকম কিছু ভাবতে চাইছি না, কল্পনাও করতে চাইছি না ওরকম কিছু, কিন্তু সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। দেখুন নাকাতা-বাবু, সেই তুলনায় আমি হয়তো তেমন দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে নেই, এরমধ্যেই, কিছু না হলেও বেশ কয়েকবারই কল্পনাকেও অতিক্রম করে যাওয়া নৃশংসতা দেখে আসছি। বেড়ালরা কেবল সারাদিন রোদে অলসভাবে কাটায়, কাজও খুব কিছু নেই, নেহাতই আরামপ্রিয় জীব বলে অনেকেই মনে করে। বেড়ালের জীবন অতখানি নিরুপদ্রব মোটেই নয়। বেড়ালরা দুর্বল, সহজেই আহত হয়, খুবই নিরীহ জীব। কচ্ছপের মতো খোলও নেই, পাখির মতো ডানাও নেই। ইঁদুরের মতো মাটির নিচেও চলে যেতে পারে না, আবার গিরগিটির মতো রঙ পালটাতে পারার ব্যাপারও নেই। কত অসংখ্য বেড়াল যে রোজ রোজ আহত হয়ে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সমাজের লোকেরা জানেই না। আমি নেহাতই কপালজোরে তানাবে-দের অমন আন্তরিক হৃদয়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফ্যামিলিতে ঢুকতে পেয়েছি, বাচ্চারাও আমাকে খুব আদর করে, তাই আপনাদের আশীর্বাদে এই ধরণের অভাব অভিযোগ ছাড়াই দিন কাটাচ্ছি বটে, কিন্তু হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও সামান্য ধকল আছে। তাই, একেবারে রাস্তার বেড়ালমশাইদের মতো হয়ে গেলে, বেঁচে থাকার ধকল আরো অনেক বেড়ে যাবে বলেই মনে করি।"

"মিমি-দেবীর খুব বুদ্ধি", সেই শ্যামদেশীয় বেড়ালের বাগ্মীতার নমুনায় মুগ্ধ হয়ে গিয়ে নাকাতা বলে।

"না, না", মিমি চোখ কুঁচকে, খানিকটা যেন কুণ্ঠিত ভাবেই বলল। "বাড়িতে অলসভাবে গা এলিয়ে কেবল টিভি দেখে দেখে এই অবস্থা হয়েছে। কেবলমাত্র হাবিজাবি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে ঝঞ্ঝাটই হয়েছে। নাকাতা-বাবু কি টেলিভিশন দেখেন?"

না, নাকাতা টেলিভিশন দেখে না। টেলিভিশনে সব্বাই এত তাড়াতাড়ি কথা বলে যে নাকাতা সবটা ঠিক মতো শুনে বুঝে উঠতে পারে না। নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলে কিছু লেখা থাকলে পড়ে উঠতে পারে না, আর পড়তে না পারলে তো টিভিও ভাল করে বোঝা যায় না। ক্বচিৎ কখনো রেডিও শুনি বটে, কিন্তু সেখানেও কথা এত দ্রুত যে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বরং এভাবে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, আকাশের নিচে বেড়ালমশাইদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পেলে নাকাতার বেশ ভাল লাগে।"

"সে তো বটেই, সে তো বটেই", মিমি বলে।

"হ্যাঁ", নাকাতা বলে।

"এখন বেচারা গোমা নিরাপদে থাকলেই হয়", মিমি এবার বলে।

"মিমিদেবী, আমি ভাবছি ঐ ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে খানিক নজর করে দেখি।"

"ছোকরা যা বলল, তাতে, লোকটা বেশ লম্বা, বিচিত্র একটা লম্বা মত টুপি পরে, পায়ে চামড়ার লং-বুট। আর খুব দ্রুত পায়ে হাঁটে। খুবই অদ্ভুত চেহারার লোক, তাই দেখলেই চেনা যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঐ ফাঁকা জায়গাটায় যেসব বেড়াল জড়ো হয়, তারা লোকটার চেহারা দেখলেই, চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় এমন আনকোরা বেড়াল হলে...।"

নাকাতা এই খবরটা একেবারে পুরোটা ঠিকঠাক মাথায় ভরে নিল। ভুললে চলবে না এরকম জরুরি দেরাজের মধ্যে বেশ ভাল করে বন্ধ করে রাখলো। লোকটা লম্বা, অদ্ভুত একটা লম্বা টুপি পরে, চামড়ার লং-বুট পায়ে।

"এখন এগুলো কাজে লাগলে হয়।" মিমি বলল।

"আপনাকে প্রকৃতই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিমিদেবী এভাবে দয়া করে মুখ না খুললে, নাকাতা আর ম্যাকারেলের থেকে এগোতে না পেরে ওখানেই আটকে থাকত বলেই মনে হয়। আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

"আমার মনে হয়", ভুরু সামান্য কুঁচকে মিমি বলল, অভিব্যক্তিতে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। "লোকটা বিপজ্জনক। খুবই বিপজ্জনক। সম্ভবত নাকাতা-সানের কল্পনারও অতীত বিপজ্জনক মানুষ। আমি হলে ঐ ফাঁকা জমির ধারেকাছেই ঘেঁষতাম না। তবে কিনা, নাকাতা-সান তো মানুষ, আর এটা আপনার কাজও বটে, উপায়ান্তর নেই। কিন্তু খুব সাবধানে, বুঝলেন তো।"

"ধন্যবাদ। যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করব।"

"নাকাতা-সান, এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর পৃথিবী। নিষ্ঠুরতা থেকে কেউ পালিয়ে রেহাই পাবে না। এই কথাটা দয়া করে কিছুতেই ভুলবেন না। যত সাবধানই হোন, জানবেন যথেষ্ট হয়নি। কথাটা বেড়ালের জন্যেও খাটে, মানুষের জন্যেও খাটে।"

"হ্যাঁ। একথা আমি ভাল করেই মনে রাখবো", নাকাতা বলে।

কিন্তু জগতের কোন জায়গায় যে কী ধরণের নিষ্ঠুরতা সে তো নাকাতা ভাল বোঝেও না। কারণ, নাকাতা বোঝে না এরকম ব্যাপার জগতে এত আছে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মোটামুটি সবকিছুই ঐ না বোঝার মধ্যেই রয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিমির থেকে বিদায় নিয়ে নাকাতা, যে ফাঁকা জমিটার কথা বলে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হল। ছোট খেলার মাঠের মতো পরিসরের একটা ফাঁকা জমি। উঁচু করে প্লাইউডের বেড়া দিয়ে ঘেরা, সাইনবোর্ড রয়েছে "কনস্ট্রাকশন সাইট, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবেন না" লেখা (যদিও নাকাতার সেটা পড়তে পারার কথা নয়), ঢোকার মুখে ভারি শেকল লাগানো রয়েছে ঠিকই, ঘুরে উল্টোদিকে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সহজেই ঢুকে পড়া গেল। কেউ একটা অকারণে বেড়ার একটা অংশ ভেঙ্গে ঢুকেছিল বলে মনে হয়।

সার সার গুদামঘর সব সরিয়ে নিলেও জমি সমান করা হয়নি, সেই অবস্থায়ই সবুজ ঘাস গজিয়েছে। অতসীফুলের গাছ বাচ্চাদের শরীরের উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। কয়েকটা প্রজাপতি চঞ্চল হয়ে তার ওপরে নাচানাচি করছে। বৃষ্টি পড়ে শক্ত হয়ে গিয়ে মাটির স্তূপ জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মতো মাথা তুলে রয়েছে। বেড়ালদের পছন্দ হওয়ার মতোই জায়গা। সহজে মানুষ এসে ঢুকবে না, নানারকম ছোট প্রাণীর বসতি, গা ঢাকা দিয়েও স্বাধীন।

ফাঁকা জমিতে কাওয়ামুরা-বাবুর দেখা পাওয়া গেল না। মাত্র দুটো শীর্ণকায় বেড়াল, তাদের রোমের রঙও বদখত, দেখতে পাওয়া গেল, নাকাতা ওদের অমায়িক ভাবে "কোন্নিচিবা" বলে সম্ভাষণ করা সত্ত্বেও অত্যন্ত শীতল দৃষ্টি পলকের জন্য সেদিকে ফিরিয়েই কোনও উত্তর পর্যন্ত না করে ঘাসঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল তারা। ব্যস, ওইটুকুই। বিকৃতবুদ্ধির মানুষের কাছে ধরা পড়ে, কাঁচি দিয়ে ল্যাজটা কাটা পড়ুক, এটা কেউই চায় না। ল্যাজই নেই, তবু নাকাতাই কি তেমন চায় এরকম কারুর সঙ্গে মোলাকাত হোক? একেবারে অহেতুক সাবধান হয়ে যায়নি ওরা।

নাকাতা একটু উঁচু হয়ে থাকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে, চারদিকে চট করে চোখ বুলিয়ে নিল। কেউ কোত্থাও নেই। সাদা প্রজাপতিরা, যেন কী খুঁজছে এইভাবে ঘাসের ওপরে এদিকে ওদিক কেবলই উড়ে বেড়াচ্ছে। নাকাতা একটা সুবিধামত জায়গায় বসে কাঁধে ঝোলানো ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে দুটো বীন-জ্যামের বানরুটি বের করে, সর্বদাই যেটা করে থাকে, বরং দুপুরের খাওয়াটাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেরে নিল। তারপর সঙ্গের থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরম ফোটানো চায়ে চোখ কুঁচকে শান্তভাবে চুমুক দিল। দুপুর গড়িয়ে একটা শান্ত বিকেল যেমনটি হয়। কোথাও কোনো বিরোধ নেই, সবটাই শান্তি, এমন একটি অবসর। এরকম একটা জায়গায়, বেড়ালদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করার ফন্দি আঁটছে এমন কেউ ঘাপটি মেরে আছে ভাবতেই নাকাতা আর ভালো করে চা'টা খেয়ে উঠতে পারলো না। মুখের মধ্যে বীন-জ্যামের বানরুটি চিবোতে চিবোতে সে মাথার কদমছাঁট পাকাচুলে হাতের তালু বোলাতে থাকলো। কারুর চোখে পড়লে ভাবতো যে নাকাতা হয়তো এভাবেই বোঝাতে চাইছে "নাকাতার তো মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম", তবে দুর্ভাগ্যবশত কেউ ছিল না। তাই নিজেই নিজের মুখোমুখি হয়ে ক'বার সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল মাত্র। তারপর নিঃশব্দে বীন-জ্যামের বান-রুটি খেতে থাকলো। বীন-জ্যামের বান-রুটি খাওয়া শেষ হলে সেলোফেনের মোড়কটা ছোট করে ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিল। থার্মোফ্লাস্কের ঢাকনা আঁট করে আটকে, সেটাও ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল। পুরো আকাশ মেঘে ঢাকা, কিন্তু রঙের বিন্যাস দেখে সূর্য যে ঠিক মাথার ওপরে সেটা বুঝতে পারল।

লোকটা লম্বা, মাথায় বিচিত্র লম্বা টুপি, পায়ে চামড়ার লং-বুট।

নাকাতা লোকটার চেহারাটা মাথার মধ্যে এঁকে নেওয়া মনস্থ করল। কিন্তু বিচিত্র লম্বা টুপি জিনিসটা ঠিক কেমন জিনিস, চামড়ার লং-বুটই বা কেমন জিনিস, তা নাকাতার কল্পনাতেই এলো না। জন্মে দেখেনি ওসব জিনিস। মিমির থেকে শোনা গেছে যে কাওয়ামুরা-বাবু বলেছিল, সত্যি সত্যি দেখলে বলতে পারবে। সেক্ষেত্রে সত্যি সত্যি দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই বলে নাকাতার মনে হল। যে যাই বলুক, এটাই সবচেয়ে খাঁটি কথা। জমি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, নাকাতা ঘাসঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসি করল। দীর্ঘ সময় নিয়ে অনর্গল প্রবাহ। এরপর সেই ফাঁকা জমির একেবারে কোণের দিকে, যতটা পারা যায় লোকের চোখে না পড়ে এরকম একটা জায়গায় ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসে, সেই অদ্ভুত লোকটার আবির্ভাবের অপেক্ষায় বিকেলটা কাটিয়ে দেবে স্থির করল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অপেক্ষা করতে থাকা অবশ্য খুব একঘেঁয়ে কাজ। লোকটা এরপর আবার কবে আসবে সেটা অনুমানও করতে পারছে না। আগামীকালও হতে পারে, একসপ্তাহ পরেও হতে পারে। কিংবা হয়তো আর দ্বিতীয়বার এখানে তার পদার্পণই ঘটলো না—এরকম সম্ভাবনার কথাও মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু নাকাতা উদ্দেশ্যহীন অপেক্ষা করাতেও অভ্যস্ত, কিচ্ছুটি না করে সময় কাটিয়ে দেওয়াতেও অভ্যস্ত। এসবে তার এতটুকু কষ্ট নেই।

সময় তার কাছে তেমন বড় সমস্যা কিছু নয়। এমনকি একটা ঘড়িও নেই নাকাতার। নাকাতার সময় একান্তই নাকাতার মত করে বয়ে যায়। সকাল হলে আলো ফোটে, সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকার হয়। অন্ধকার হলে ঐ মহল্লার পাবলিক স্নানাগারে যায়, সেখান থেকে ফিরে ঘুম পেয়ে পায়। স্নানাগার সপ্তাহের কোনো একটা দিন বন্ধ থাকে বটে, সেদিন তাহলে আর স্নান না করেই ফিরে আসে। খাওয়ার সময় হলে আপনা থেকেই খিদে পেয়ে যায়, ভা-তা আনার দিন এসে গেলে (দিনটা খুব কাছে এসে গেলে, সবসময়ই কেউ না কেউ দয়া করে সেটা খেয়াল করিয়ে দেয়) বোঝা যায় একমাস কেটে গেল। ভা-তা পেলে, তার পরের দিন চুল কাটার জন্য ঐ অঞ্চলের চুলকাটার সেলুনে চলে যায়। গ্রীষ্মকাল এলে ঐ ওয়ার্ডের লোকেরা ওকে ঈল্ মাছ খাওয়ায়, বছরের শুরুতে দেয় চালের পিঠে। নাকাতা শারীরিক উদ্যম ত্যাগ করে, মাথার সুইচ অফ্ করে দিয়ে, অস্তিত্বকে একরকম ঘুরে ঘুরে আসা টেলিগ্রামের মতো করে তুলেছে। ওর কাছে এটা নেহাতই স্বাভাবিক একটা জীবনযাত্রা, সেই ছোটবেলা থেকে কোনোরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই দৈনন্দিন কর্মসূচী। অচিরেই সে চেতনার গন্ডীর মধ্যে যতটুকু সবুজ, তাতে প্রজাপতির মতোই এদিক ওদিক বিচরণ শুরু করে দিল। সবুজের ওপারে অন্ধকার গভীর খাদ বিস্তৃত হয়ে আছে। কখনো কখনো সেই সবুজ থেকে চোখ সরিয়ে দৃষ্টি উড়ে চলে যায় সেই খাদের ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই অন্ধকারে বা গভীরতায় নাকাতার ভয়ের উদ্রেক হত না। ভয় পেতে হবেই বা কেন? ওটার তলদেশে, দৃষ্টি যায় না এমন নিরালোক জগতটা, তার গুরুভার নৈঃশব্দ ও ধোঁয়াশা, সেই কবে থেকে ওর পুরনো সহচর, আর এখন তো ওর নিজস্ব সত্তারই একটা অংশও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাকাতা ওটাকে বেশ বুঝতে পারে। ঐ জগতটায় লিখিত হরফও নেই, বার কিংবা তারিখও নেই, রাজ্যপালও নেই, অপেরাও নেই, BMW-ও নেই। কাঁচিও নেই, লম্বা দৈর্ঘের টুপিও নেই। আবার, তার সঙ্গেই, ঈল্ মাছও নেই, বীন-জ্যাম বানরুটিও নেই। ওখানে সবই আছে, কিন্তু পূর্ণরূপে, আংশিক কিছু নেই। অংশ বলে কিছু নেই বলেই একটাকে আরেকটার বিকল্প করার দরকার হয় না। কোনো কিছুকে একটার থেকে বিযুক্ত করে অন্যটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার দরকার হয় না। কোনো খটোমটো কথা কিংবা শব্দ ভাবতে হয় না, সবকিছুর মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিলেই হয়। আর সবকিছু ছাপিয়ে, এটার জন্যেই নাকাতা কৃতার্থ।

মাঝেমাঝে সে ঘুমিয়ে পড়ছিল। কিন্তু সেই ঘুমন্ত অবস্থায়ও, তার পঞ্চেন্দ্রিয় ক্ষান্তিহীন ভাবে সেই ফাঁকা জায়গাটার ওপর তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখছিল। ওখানে কিছু ঘটলে, কেউ ওখানে এসে হাজির হলে, সে ঠিক চোখ খুলে কাজে নেমে পড়ত। আকাশ কার্পেটের মতো সর্বত্র সমানভাবে ছাইরঙা মেঘে ঢেকে আছে। কিন্তু বৃষ্টি হবে বলে আপাতত মনে হচ্ছিল না। বেড়ালরা সবাই তা জানতো, নাকাতাও জানত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১১

যতক্ষণে আমার কথা শেষ হল, ততক্ষণে রাত আরও অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সাকুরা রান্নাঘরের টেবিলে গালে হাত দিয়ে বসে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলো। আমার বয়েস মাত্র পনেরো, জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ি, বাবার থেকে পয়সা চুরি করে নাকানোর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। তাকামাৎসু শহরে এসে একটা হোটেলে উঠেছি, দিনের বেলাটা একটা লাইব্রেরিতে বই পড়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখি একটা শিন্তো উপাসনাস্থলে রক্তমাখা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। এইসব কথা। অবশ্যই বলা হয়নি এমন কথাও অনেক আছে। সত্যি বলতে কী, জরুরি কথাগুলো অত সহজে মুখে আসতে চায় না।

"অর্থাৎ কিনা, তোমার মা শুধু তোমার দিদিকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাই তো? তোমার বাবা, সবে চার বছরের তুমি, এদেরকে ফেলে রেখে।"

আমি পার্সের ভেতর থেকে সমুদ্রতটের সেই ফোটোটা বের করে ওকে দেখাই। "এই হচ্ছে আমার দিদি।"

সাকুরা ছবিটা খানিকক্ষণ নজর করে দেখে। তারপর কিছু না বলে আমাকে ফিরিয়ে দেয়।

"তার পরে আর কখনো দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি" আমি বলি। মায়ে সঙ্গেও দেখা হয়নি। একেবারেই কোনও যোগাযোগ নেই, কোথায় যে আছেন, তা-ও জানিনা। দেখতে কেমন ছিল মুখটা, সেটাও মনে পড়ে না। একখানা ফোটোও রেখে যাননি। গন্ধটা মনে আছে। এমনকি, ছোঁয়াও যেন মনে করতে পারি, কিন্তু কিছুতেই মুখটা মনে পড়ে না।"

"হুমম্", ও বলল। তারপর হাতের তালুতে চিবুকটা ভর দেওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবস্থাতেই আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। "এ তো খুবই কঠিন পরিস্থিতি, তাই না?"

"হয়তো।"

নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

"আর তাই, বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা বিশেষ সুবিধের হল না তোমার, তাই না?" একটু পরে আমার কাছে জানতে চাইল ও।

সম্পর্কটা বিশেষ সুবিধের হল না? এ কথায় ঠিক কী উত্তর দেওয়া উচিত? আমি কিছু না বলে কেবল ঘাড় নাড়লাম।

"তাই তো হওয়ার কথা, সম্পর্কটা ঠিকঠাক থাকলে তো বাড়ি ছাড়ার কথাও নয়", সাকুরা বলে। "তারপর তুমি কোনোভাবে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে, আজ হঠাৎ করে, হয় জ্ঞান হারালে কিংবা স্মৃতি হারিয়ে বসলে।"

"হ্যাঁ"।

"এ পর্যন্ত, এরকম কখনও হয়েছে?"

"কখনো সখনো হয়েছে", আমি সত্যি কথাই বলে দিলাম। "মাথায় রাগ চড়ে গিয়ে, মনে হত ঠিক যেন একটা ফিউজ উড়ে গেল। কেউ যেন মাথার ভেতরে একটা সুইচ টিপে দেওয়ায়, কিছু ভাবার বদলে শরীরটাই কিছু একটা করতে যেত। তখন যে আমি, সে এই আমি নই।"

"আত্মসংযম হারিয়ে, হিংসাত্মক কিছু করে বসতে?"

"সেরকমও ঘটেছে কয়েকবার", আমি মেনে নিয়ে বলি।

"কারুকে আহত করেছো নাকি?"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "মাত্র দু'বার অবশ্য। তবে আঘাত তেমন [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ও এটা নিয়ে একটু ভাবে।

"এবারের ঘটনাও কি তাহলে সেই একই জিনিস বলে মনে করছ?"

আমি ঘাড় নাড়ি। " এতটা ভয়ানক এইবারই প্রথম। এবারেরটায়... কেন, কী পরিস্থিতিতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম, সেগুলোও একেবারেই অজানা, অজ্ঞান অবস্থায় কী যে করেছি তা-ও তো ঠিক মনে করতে পারছি না। স্মৃতি পুরোটাই হারিয়ে গেছে। এর আগে এতটা ভয়ানক ব্যাপার কখনও হয়নি।"

আমার রুক্স্যাক থেকে বের হওয়া টি-শার্টটা ও দেখল। ধুয়েও ওঠেনি, রয়ে গেছে, এরকম রক্তের দাগটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল।

"তাহলে—খাচ্ছিলে যে সেটাই তোমার সর্বশেষ স্মৃতি, তাই তো? সন্ধ্যেবেলা স্টেশনের কাছের রেস্তোরাঁতে?"

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"তার পরের কথা আর জানা নেই। জ্ঞান ফেরার পর দেখলে ঐ জিনজা-র পেছনে ঘন গাছগাছালির ভেতর পড়ে আছ। ঘন্টা চারেক কেটে গেছে ওইভাবে। শার্ট রক্তে মাখামাখি, বাঁ কাঁধে একটা ব্যথা, খুব জোরালো নয়।"

আমি আরেকবার মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলাম। ও কোত্থেকে একটা শহরের ম্যাপ এনে টেবিলের ওপর পেতে স্টেশন থেকে জিনজা-র দূরত্বটা যাচাই করে নিচ্ছিল।

"খুব দূর নয় যদিও, তবে হেঁটে গেলে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে এমনও নয়। অদ্দূর কেন যে গিয়েছিলে, কে জানে? স্টেশন থেকে তোমার হোটেলে যেতে তো বরং উল্টোদিকে যেতে হয়। আগে কখনো ঐ অঞ্চলে গেছ?"

"একবারও না।"

"শার্টটা একটু খুলে দেখ তো", ও এবার বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শার্ট খুলে শরীরের উর্দ্ধাংশ অনাবৃত হতেই, ও ঘুরে আমার পেছনে গিয়ে আমার বাঁ কাঁধটা জোরে চেপে ধরল। আঙুলের ডগা কাঁধে খিমচে ধরেছে, কিছু ভাবার আগেই আমার গলা দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। গায়ে বেশ শক্তি আছে।

"লাগছে?"

"খুব!" আমি বলি।

"কিছু একটাতে জোর ধাক্কা খেয়েছ। অথবা কিছু দিয়ে জোরে মেরেছিল কি?"

"একদমই মনে করতে পারছি না।"

"দুটোর মধ্যে যেটাই হয়ে থাকুক, হাড়ে কিছু হয়নি বলেই মনে হচ্ছে", ও বলল। তারপর যে যায়গাটায় ব্যথা বলে বললাম, তার আশেপাশে বারবারই আলাদা আলাদা নানাভাবে টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল। ওর আঙুলের ডগা, ব্যথার জায়গায় পড়ুক না পড়ুক, অদ্ভুত ভাল লাগছিল। আমি সেকথা বলাতে ও হাসল।

"আমার ম্যাসাজের হাত বেশ ভাল। তবেই না বিউটিশিয়ান হিসেবে করে খাচ্ছি। ভাল ম্যাসাজ জানলে, যেখানেই যাও কাজে আসবে।"

এরপরও কিছুক্ষণ ও আমার কাঁধে ম্যাসাজ করেই গেল। তারপরে বলল, "এটুকুতে, মনে হয় আর সমস্যা তেমন হবে না। একরাত ঘুমোলেই হয়তো ব্যথাটা চলে যাবে।"

ও এবার আমার খুলে রাখা শার্টটা নিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেটে পুরে জঞ্জালের ড্রামে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেকশার্টটা, একটু এ-দিক ও-দিক খুঁজে, বাথরুমের ওয়াশিং মেশিনে ভরে দিল। ওয়ার্ডরোবের ড্রয়ার খুলে, ভেতরটায় কী যেন খুঁজে, শেষে একটা সাদা টি-শার্ট ভেতর থেকে বের করে আমার হাতে দিল। একেবারে নতুন তখনও। মাউই দ্বীপের *হোয়েল.ওয়াচিং.ক্রুজ*-এর শার্ট। সমুদ্রে জলের ওপরে আলাদা করে বেরিয়ে থাকা একটা তিমিমাছের লেজের ছবি আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"এখানে যেক'টা আছে, তার মধ্যে এটাই সাইজে সবচেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছে। আমার নিজের নয় ঠিকই, সে নিয়ে তোমায় চিন্তিত হতে হবে না। কোনোভাবে কারুর থেকে পাওয়া উপহার হয়তো। পছন্দ না হলেও আপাতত পরে দ্যাখো।"

মাথা গলিয়ে দেখলাম। সাইজ একেবারে ঠিকঠাক।

"ইচ্ছে করলে এভাবেই পরে চলেও যেতে পার", ও বলে।

আমি ধন্যবাদ দিই।

"এতটা দীর্ঘ সময়ের স্মৃতি বেমালুম খুইয়ে ফেলাটা, তুমি বলছ, এর আগে আর হয়নি, তাই তো?" ও জিজ্ঞেস করে।

আমি সেকথায় মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। চোখ বন্ধ করে নতুন টি-শার্টের স্পর্শটা অনুভব করতে থাকি, গন্ধটা নিই।

"সাকুরা-সান, আমার না, ভীষণ ভয়ভয় করছে", অকপটে মনের কথা খুলে বলি ওকে। "এত ভয় করছে যে কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। স্মৃতি খুইয়ে বসা ঐ চার ঘন্টায় আমি কোথাও কারুকে জখম করেছি কি না কে জানে। নিজে যে কী করেছি একেবারেই মনে করতে পারছি না। কিন্তু কোনো ভাবে রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছি। যদি সত্যি সত্যি কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে থাকি, এমনকি সেই স্মৃতি হারিয়ে গেলেও, আইনের চোখে সেই দায় আমারই হওয়ার কথা। ঠিক কী না?"

"কিন্তু এ তো নাক থেকে বেরুনো রক্তও হতে পারে। অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খেয়ে কারুর নাক থেকে রক্ত বেরিয়েছিল, তুমি হয়তো নেহাতই সেটার শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলে। হতে পারে না? তোমার যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে সেটা অস্বাভাবিক নয়, তবু সকাল হওয়া পর্যন্ত, যতটা পারা যায়, খারাপ কিছু না ভাবার চেষ্টা কর। সকাল হলে খবরের কাগজে বেরোবে, টিভিও ওটাকে নিউজ করবে, এই অঞ্চলে বড় কোনো ঘটনা ঘটলে খারাপ লাগলেও জানতে পারি ঠিকই। তাছাড়া ধীরেসুস্থে ভাবাই বাঞ্ছনীয় নয় কি? রক্তপাত নানা কারণেই হতে পারে, যতটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গুরুতর ব্যাপার বলে দেখে মনে হচ্ছে, ততটা নয় এরকম তো কতই হয়। আমি যেহেতু মেয়ে, অতটা পরিমাণে রক্ত দেখা তো আমার প্রত্যেক মাসেই হয়, রীতিমতো অভ্যস্ত। বুঝতে পারছ তো কী বলতে চাইছি?"

আমি মাথা নাড়ি। মুখটা যে একটু লাল হয়ে গেছে তা অনুভব করতে পারি। ও একটা বড় কাপের ভেতরে নেসকাফে ঢেলে, সসপ্যানে জল ফোটাতে বসাল। জল ফুটে ওঠা অবধি সিগারেট টানতে লাগল। কয়েক টান দিয়েই, ওটা জলে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলল। মেন্থল মেশানো তামাকের গন্ধ বেরুচ্ছিল ওটা থেকে।

"আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আগ বাড়িয়ে করছি, তুমি কিছু মনে করবে না তো?"

বললাম যে মনে করব না। তোমার দিদি বোধহয় সৎ-মেয়ে বা পালিতা-কন্যা, তাই কি? মানে আর কী, তোমার জন্ম হওয়ার আগে, কোথাও থেকে পাওয়া শিশু কি?"

হ্যাঁ, তাই, আমি বলি। কারণটা আমার জানা নেই বটে, তবে আমার মা-বাবা কন্যা সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন। তারপর আমি জন্মাই, সম্ভবত অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

"ফলত, তুমি হলে বাবা ও মা-র প্রত্যক্ষ সন্তান, তাই না?"

"আমি যদ্দূর জানি", আমি বললাম।

"তা সত্ত্বেও তোমার মা বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময়, তোমাকে না নিয়ে, যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, সেই দিদিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন", সাকুরা তাতে বলল। "কিন্তু সাধারণতঃ, মেয়েরা সেটা করে না।"

আমি চুপ করে থাকি।

"এটা কেন হল?"

আমি মাথা ঝাঁকাই। জানা নেই বলে বলি। এ প্রশ্ন আমি নিজেকে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

না হোক, কত হাজার বার যে করেছি।

"তবে, তুমি নিশ্চয়ই এতে আহত বোধ করেছো। "

আমি আহত হয়েছি কি না? "ঠিক জানি না, তবে, যদি কখনো বিয়েও করি, আমি হয়তো বাচ্চা চাইব না বলে মনে হয়। আমার নিজের সন্তানের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হবে সেটা নিশ্চিত করে জানা নেই বলেই।"

ও বলে, "তোমার ব্যাপারটার মত প্রকৃতই এতটা জটিল ব্যাপার নয় যদিও, আমারও মা-বাবার সঙ্গে আদ্যন্ত বনিবনা হয়নি, আর সেকারণে প্রচুর ফালতু ব্যাপার এসে হাজির হয়েছিল। তাই তোমার মনোভাবটাও বুঝতে পারি। তবে কী, খুব তাড়াতাড়িতে নানারকম অনেক কিছু খুব স্পষ্ট করে ভেবে না নেওয়াই ভাল। জগতে 'নিশ্চিত ভাবে' বলে বোধহয় কিছু নেই।"

গ্যাস ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় একটা কাপ থেকে ধোঁয়া ওঠা নেসকাফেতে চুমুক দিচ্ছিল ও। কাপের গায়ে কার্টুনের মুমিন ফ্যামিলির ছবি। মুখে কিছু বলছিল না। আমিও কিছু বলিনি।

"কেউ নেই, একটু নির্ভরযোগ্য আত্মীয়স্বজন?" একটু পরে বলল।

নেই, বললাম সেকথা। বাবার নিজের মা-বাবা বহু আগে গত হয়েছেন, ভাই, বোন, কিংবা দাদা, দিদি, কাকা, পিসি এরকম কেউ নেই। অবশ্য সেকথাও সত্য কি না, আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলাই যায় যে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা একেবারেই নেই। মায়ের দিকের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে কোনো কথাই হয়নি কখনো। আমি তো মায়ের নাম পর্যন্ত জানি না। তাঁর কেমন আত্মীয়স্বজন আছে না আছে, জানার তো কথাই ওঠে না।

"তোমার কথা শুনতে শুনতে, তোমার বাবাকে তো একেবারে আস্ত একটি ভিনগ্রহের জীব বলে মনে হচ্ছে", সাকুরা এবার বলে। "অন্য কোনো গ্রহ থেকে একা একা এই পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছেন। মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীর কোনো নারীকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অপহরণ করে তোমার জন্ম দিয়েছেন। নিজের বংশবৃদ্ধির জন্য। মা সেকথা জানতে পেরে, ভয় পেয়ে কোথাও একটা পালিয়েছেন। যেন কোনো ভয়াল রহস্যময় সায়েন্স-ফিকশন সিনেমার মত।"

কী যে বলা উচিত, বুঝতে পারি না। আমি চুপ করেই থাকি।

"নেহাতই রসিকতা করছি", ও বলে। তারপর এটা যে রসিকতা, সেটা সাব্যস্ত করতে মুখের দুই প্রান্ত বিস্তৃত করে হাসল। "প্রয়োজন পড়লে, তোমার তাহলে এই বিশাল পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর নির্ভর করার মতো কেউ নেই।"

"সেরকমই হবে বলে মনে হচ্ছে।"

সিঙ্ক-এর কাছে ফিরে গিয়ে খানিকক্ষণ কফি খেতে থাকে।

"একটু না ঘুমালে তো আমার চলবে না", যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে, এইভাবে সাকুরা বলে। ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। "সাড়ে সাতটায় উঠব, তাই বেশি ঘুমানো হবে না যদিও, তাহলেও, একটু না ঘুমোলেই নয়। সারারাত না ঘুমিয়ে তারপর কাজ করা এক ভয়ানক ব্যাপার। তুমি কী করবে ভাবছো?"

স্লীপিং ব্যাগ এনেছি, সম্ভব হলে ঐ কোণটায় শুয়ে পড়ব, অসুবিধে যদি না হয়, আমি বললাম। তারপর রুক্‌স্যাক থেকে ছোট করে ভাঁজ করা স্লীপিং ব্যাগ বের করে, বিছিয়ে বড় করে নিলাম। ও প্রশংসার চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বলল, "বয়েজ স্কাউট বলে মনে হচ্ছে!"।

আলো নিভিয়ে, ও বিছানায় চাদরের নিচে ঢুকে গেল, আমি স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে চোখ বুজে ঘুমের চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুমোতে পারছি না। চোখের ভেতর থেকে সাদা টি-শার্টে লেগে থাকা রক্তের ছোপ কিছুতেই যাছে না। হাতের তালুতে ছ্যাঁকা লেগে যাওয়ার অনুভূতিটা রয়ে গেছে। চোখে খুলে স্থির দৃষ্টিতে ঘরের সীলিং-এর দিকে চেয়ে রইলাম। মেঝেতে কোথাও ক্যাঁচকোঁচ করে আওয়াজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হল। কোথাও জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আবার অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ হচ্ছে কোথাও। অনেক দূরেই কোথাও, তবে রাতে অন্ধকারের মধ্যে আশ্চর্য পরিষ্কার ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

"তুমি বোধহয় ঘুমোতে পারছ না, তাই না?" অন্ধকারের ওপার থেকে ও নিচু গলায় বলল।

বললাম যে ঘুমোতে পারছি না।

"আমিও ঠিকমতো ঘুমোতে পারছি না। কেন যে কফি খেতে গেলাম! অন্যমনস্ক ছিলাম তো।"

ও বিছানার মাথার কাছের আলোটা জ্বেলে, সময়টা দেখে নিয়ে, আবার আলোটা নিভিয়ে দিল।

"তুমি ভুল বুঝলে আবার বিপত্তি হবে", বলতে শুনলাম। "অসুবিধে না হলে এখানে এসো। একসঙ্গে শুয়ে থাকি। আমিও স্বস্তিতে শুতে পারছি না।"

আমি আমার স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে, ওর বিছানায় চাদরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। আমার পরণে বক্সার শর্টস আর টি-শার্ট। ও পরে আছে হালকা পিংক রঙের পাজামা সেটের ওপরের আর নিচে অংশটা।

"দ্যাখো, আমার কিন্তু টোকিওতে একজন নির্দিষ্ট বয়ফ্রেন্ড আছে। তেমন বলার মতো কেউ নয় অবশ্য, তবে আপাতত ও-ই আমার প্রেমিক। সেইজন্য অন্য কারো সঙ্গে সেক্স করব না। এরকম দেখালে কী হয়, এই ব্যাপারে আমি কিন্তু বেশ সিরিয়াস। প্রাচীনপন্থীও বলা যায়। একসময়, খুব বেশি না হলেও, বেশ বাঁধনছাড়া ছিলাম, কিন্তু এখন পালটে গেছি। এখন নীতি মেনে চলি। তাই বলছি, অন্যরকম কিছু ভেবো না, হ্যাঁ? যেন দিদি আর ভাই। বুঝলে?"

বললাম যে বুঝেছি।

ও হাত ঘুরিয়ে আমার কাঁধে রেখে, নিঃশব্দে আমাকে জড়িয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছে টেনে নিল। তারপর আমার গালে গাল ঠেকালো। মুখে বলল, "বেচারা!"।

বলার মতো কথা নয় যদিও, আমার পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে গেছে ততক্ষণে। খুবই শক্ত হয়ে। আর ওটার অবস্থানও তখন এমন যে ওর উরুতে অনিবার্যভাবে স্পর্শ করছে।

"শেষ অবধি তাহলে", ও বলল।

"আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই", আমি মাফ চেয়ে বলি। "কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতেই পারছি", ও এবার বলে। "মুশকিলে পড়ে গেছ যে সেটা ভালই বুঝতে পারছি। কিন্তু থামাতে পারছো না, তাই তো?"

আমি অন্ধকারেই মাথা নেড়ে সায় দিই।

কিছুক্ষণ কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে, তারপর একসময় আমার বক্সার শর্টসটা টেনে নামিয়ে পাথরের মতো শক্ত পুরুষাঙ্গটা বের করে আস্তে করে ধরে। ঠিক যেন কী একটা নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছে। ঠিক যেন ডাক্তারের নাড়ি টিপে ধরার মতো। ওর নরম হাতের তালুর স্পর্শ যেন একটা চিন্তা হয়ে আমার পেনিসটাকে ঘিরে রেখেছে বলে আমার মনে হচ্ছিল।

"এখন তোমার দিদির বয়েস কত?"

"একুশ বছর", আমি জানালাম। "আমার চেয়ে যেহেতু ৬ বছরের বড়ো"

ও এই নিয়ে কিছু একটা ভাবতে থাকে। "ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

"হয়তো", আমি বলি।

"হয়তো?", পেনিসটা চেপে ধরে থাকা ওর হাতটা যেন আরেকটু জোর দিয়ে ধরলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হয়তো মানে কী? দেখা করার তেমন ইচ্ছে নেই?"

"দেখা হলে কেমন কথা হওয়া উচিত আমাদের মধ্যে, আমার জানা নেই, আর সেও আমার সঙ্গে দেখা করতে তেমন আগ্রহী কি না কে জানে। মায়ের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। কেউই হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী নয়। কেউ কি আমার খোঁজ নেয়? আগেই বেরিয়ে চলে গেছে"। আমাকে ফেলে রেখে—সেটাও ভাবতে হয়।"

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কেবল পেনিসটা হাতে নিয়ে কখনো জোরে চেপে ধরে, কখনো একটু আলগা হয়। সেই অনুযায়ী আমার পেনিসটাও কখনও একটু ঝিমিয়ে পড়ে, আবার তারপর আরো বেশি করে গরম আর শক্ত হয়ে ওঠে।

"এটা, এখন বের করতে চাইছ তো?" ও জানতে চায়।

"হয়তো।" আমি বলি।

"হয়তো?"

"খুবই", আমি শুধরে নিয়ে বলি।

ও ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর ধীরে ধীরে হাত চালাতে শুরু করল। সে এক দারুন স্পর্শানুভূতি। কেবল সোজাসাপটা ওপরে নিচে ওঠানামা নয়। সারা শরীর জুড়ে একটা অনুভূতি। ওর আঙুলগুলো, যত্ন করে, বেশ সোহাগ ভরে আমার পেনিস আর অন্ডকোষের আশেপাশে ঘুরেঘুরে, বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমি চোখ বন্ধ করে, বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম।

"আমার শরীর ছোঁবে না কিন্তু। আর যখন বুঝবে বেরিয়ে আসছে, তখন বলবে, কেমন? চাদর ময়লা হলে সেই দাগ নিয়ে মহা মুশকিল হয়।"

হ্যাঁ।" আমি বলি।

"কী, আমি বেশ ভাল পারি না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বেশ ভাল।"

"একটু আগেই যেটা বললাম, জন্মে থেকেই আমার হাতের কাজ বেশ ভাল। তবে এটার কিন্তু সেক্সের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। কী বলা যায়, শরীরটা যাতে বেশ হালকা চটপটে হয়ে ওঠে, কেবল সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। আজকের দিনটাও ছিল লম্বা একটা দিন, তোমার মনটাও ছিল বেশ উৎকণ্ঠিত, এভাবে চললে ঠিক মতো ঘুমও আসতো বলে মনে হয় না, বুঝতে পারছো তো?"

"হ্যাঁ", আমি বলি। "তবে একটা অনুরোধ আছে।"

"উঁ?"

"তোমার নিরাবরণ শরীরটা কল্পনা করতে পারি?"

হাত চালানো বন্ধ করে ও আমার মুখের দিকে তাকাল। "এই অবস্থায় তুমি আমার নিরাবরণ শরীর কল্পনা করতে চাইছো?"

"হ্যাঁ, কিছুক্ষণ ধরেই কল্পনা করাটা থামাব বলে ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই থামাতে পারছি না।"

"থামাতে পারছ না?"

"টেলিভিশনের সুইচ অফ করতে না পারলে যেমন হয়।"

ও এমনভাবে হাসল যেন অদ্ভুত কিছু। "কিন্তু, ঠিক বুঝলাম না। ওভাবে চুপচাপ নিজের খুশি মত কল্পনা করে নেওয়া যায় না? একেবারে সবকিছুতে আমার অনুমতি লাগবে, তুমি কী কল্পনা করবে সেটা পর্যন্ত, আমি তো এসব জানতেই পারবো না কোনোভাবে।"

"কিন্তু আমার অস্বস্তি হবে। কল্পনা করা জিনিসটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, এখনকার মতো অনুমতি চেয়ে রাখাই ভাল মনে হয়েছিল। জানলে কি জানলে না সেটা বড় কথা নয়।"

"তুমি খুব ভদ্র, শিষ্ট ছেলে, তাই না?" প্রশংসার গলায় ও বলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সে কথা বললে, সত্যিই তো, একবার একটু অনুমতি নিয়ে রাখলে আর অস্বস্তির কিছু নেই। ঠিক আছে। আমাকে উদোম শরীরে কল্পনা করতেই পার যেমন খুশি। অনুমতি দিলাম।"

"ধন্যবাদ", আমি বললাম।

"আচ্ছা, তোমার কল্পনায় উদোম আমি কেমন? সুন্দর?"

"খুবই", আমি উত্তর দিলাম।

একসময় তলপেটের কাছে একটা শিথিল অনুভূতির উদ্ভব হল। ঘন কোনো তরলের মধ্যে যেন ভাসছি বলে মনে হল। সেটা বলতেই, ও বালিশের নিচে রাখা টিস্যু-পেপার হাত দিয়ে টেনে নিয়ে আমায় বীর্যপাত করিয়ে দিল।

একটু পরে রান্না ঘরে গিয়ে টিস্যুপেপারটা ফেলে দিয়ে ও হাত ধুয়ে নিল।

"ঝামেলায় ফেললাম", আমি মাফ চাওয়ার মতো করে বলি।

"তাতে কী হয়েছে" বিছানার চাদরের ভেতরে ফিরে এসে ও বলে। "নতুন করে বারবার মাফ চাইলে ভাল লাগে না। এগুলো তো নেহাতই শরীরেরই একটা অংশের ব্যাপার, এর জন্য এত অস্বস্তিবোধ করার কিছু নেই। সে যাই হোক, একটু ভাল লাগছে?"

"খুবই।"

"সেইটেই চাইছি", ও বলে। তারপর কী যেন একটু ভাবে, অল্প সময় ধরে। "নেহাতই মনে হল, তাই বলছি, আমি যদি সত্যিই তোমার দিদি হতাম, তাহলে ভালই হত, কী বল?"

"আমারও তাই মনে হয়", আমি বলি।

ও আমার চুলে আলতো করে আঙুল চালিয়ে দিল। "আমি এবার ঘুমোবো, তুমি তাই স্লীপিং ব্যাগে ফিরে যাও। আমি একা না হলে ঠিকমত ঘুমোতে পারি না। তার ওপর রাত ভোর হওয়ার আগে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত বারবার এরকম একটা শক্ত জিনিস খচখচ করে এসে ঠেলা দিতে থাকলে অসহ্য লাগবে।”

আমি নিজের স্লীপিং ব্যাগে ফিরে এসে চোখ বুজলাম। এবার এভাবেই ঘুম এসে যাবে ঠিকঠাক। খুব গভীর ঘুম। সম্ভবত বাড়ি থেকে বেরুনো ইস্তক সবচেয়ে গভীর ঘুম। নির্জন একটা বিশাল এলিভেটারে করে ধীরে ধীরে মাটির নিচে নেমে যাওয়ার মত অনুভূতি। একসময়, সমস্ত আলো নিভে গিয়ে, সব শব্দ মিলিয়ে যেতে থাকে।

চোখ খুলে দেখি ও কোথাও নেই। কাজে বেরিয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা ন'টা ছাড়িয়েছে। কাঁধের ব্যথাটা এতক্ষণে অনেকটাই চলে গেছে। সাকুরা যেমন বলেছিল। রান্নাঘরের টেবিলের ওপর ভাঁজ করা খবরের কাগজ রাখা আছে। আর ঘরের চাবি।

“টিভির ৭ টা-র নিউজও সবটা শুনেছি, খবরের কাগজেরও কোণে কোণে সবটা পড়েছি। কিন্তু এই অঞ্চলে রক্তপাত হওয়ার মতো ঘটনা একটিও ঘটেনি। ঐ রক্তটা নির্ঘাত তেমন কিছু নয়। ভালোই হলো বলো? রেফ্রিজারেটারের মধ্যে তেমন দারুণ খাবার কিছু নেই যদিও, পছন্দ মতো খেয়ে নিয়ো। আর যা কিছু, খুশি মতো ব্যবহার করতে পারো। কোথাও যাবার না হলে, খানিক ঘরেও থাকতে পার। বেরোতে হলে, চাবিটা ম্যাটের নিচে ঢুকিয়ে রেখে যেও”।

আমি ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে, এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে গেছে কিনা দেখে নিয়ে, কর্নফ্লেক্সে ঢেলে খেলাম। জল ফুটিয়ে নিয়ে টি-ব্যাগের দার্জিলিং চা খেলাম। দু'পিস টোস্ট করে নিয়ে, লো-ফ্যাট মার্জারিন মাখিয়ে খেলাম। তারপর খবরের কাগজ খুলে বিছিয়ে নিয়ে ‘সোসাইটি’-র পাতাটা পড়তে থাকলাম। সত্যিই এ অঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা একটাও ঘটেনি। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খবরের কাগজ ভাঁজ করে জায়গা মতো রেখে দিলাম। আপাতত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পুলিশের থেকে পালিয়ে বেড়ানোর দুশ্চিন্তা আর না করলেও চলে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবেই আর হোটেলের ঘরে ফিরে যাব না ঠিক করলাম। সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। যে চারঘন্টার হদিস নেই, সেই সময়ের মধ্যে কী ঘটেছিল তা এখনই জানার প্রয়োজন নেই।

হোটেলে ফোন করলাম। ফোনে অচেনা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল। অকস্মাৎ এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে ঘর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে ওঁকে বললাম। যতটা সম্ভব প্রাপ্তবয়স্কদের মত করে বললাম। ঘরের ভাড়া আগেই দেওয়া আছে, তাই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ঘরে কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রয়ে গেছে বটে, কিন্তু তেমন জরুরি কিছু নয়, তাই ওগুলোর ওখানেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে বললাম। ভদ্রলোক কম্পিউটারে চেক করে নিয়ে আশ্বস্ত করলেন যে হিসেব সেটল্ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। "ঠিক আছে, মিঃ তামুরা। আপনি তাহলে চেক-আউট করলেন", বলে ওদিক থেকে জানালেন। কার্ডের চাবি বলে ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন কেটে দিলাম।

এরপর শাওয়ারে স্নান করে নিলাম। বাথরুমে ওর অন্তর্বাস, মোজা, এইসব শুকোতে দেওয়া আছে। যথাসাধ্য সেদিকে যাতে চোখ না পড়ে যায় এইভাবে, অন্য সময়েও যেটা করি, বিবেচনা মত সময় নিয়ে গাত্রমার্জনা করলাম। গত রাতের ঘটনাও যথাসাধ্য মনে না আনবার চেষ্টা করছিলাম। দাঁত মেজে, নতুন অন্তর্বাস পরে নিলাম। স্লীপিং ব্যাগটা ভাঁজ করে ছোট করে নিয়ে রুক্স্যাকের মধ্যে ভরে নিলাম। জমিয়ে রাখা ময়লা পোশাকগুলো ওয়াশিং মেশিনে কেচে নিলাম। ড্রায়ার ছিল না বলে ধোয়ার পরে জল নিংড়ে নিয়ে ভাঁজ করে প্লাসটিকের প্যাকেটে ঢুকিয়ে, তারপর রুক্স্যাকে ভরে নিলাম। পয়সা ফেলে লন্ড্রী করা যায় এমন কয়েন-লন্ড্রী কোথাও পেলে সেখানে শুকিয়ে নিলেই হবে।

আমি সিঙ্কে ডাঁই করে জমিয়ে রাখা বাসন কোসন সব ধুয়ে, একটু শুকোতেই মুছে টুছে তাকে রেখে দিলাম। রেফ্রিজারেটারের ভেতরের সবকিছু গুছিয়ে রেখে, নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার দাবার ফেলে দিলাম। ভেতরের কীসব জিনিস থেকে যেন ভয়ানক গন্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেরুচ্ছে। ব্রকোলিতে ছাতা ধরে গেছে। শসাগুলো কেমন সীমের মতো দেখাচ্ছে। তোওফু-র এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে গেছে। ভেতরেরটুকু নতুন কনটেইনারে ভরে গড়িয়ে পড়া সস মুছে নিলাম। অ্যাশট্রের পোড়া সিগারেটের টুকরো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এলাম। এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা পুরনো খবরের কাগজগুলো একজায়গায় জড়ো করলাম। মেঝেয় ভ্যাকুয়াম ক্লীনার লাগালাম। মেয়েটার ম্যাসাজের দক্ষতা হয়তো ভালই। কিন্তু ঘরের কাজে দক্ষতা জিরো পাওয়ার মতো। মনে হল ওয়ার্ডরোবের ওপরে এলোমেলো করে রাখা ওর শার্টগুলো একধার থেকে ইস্তিরি করে, কিছু কেনাকাটা করে এনে আজ রাতের ডিনারটা তৈরি করে রাখি। যাতে একা একাই বেঁচে থাকতে পারি, সেইভাবে, বাড়িতে থাকার সময় থেকেই যতটা পারা যায় ঘরের কাজ নিজে নিজেই করে নিতাম, এই ধরণের কাজে তাই কোনো কষ্ট হয় হয় না। কিন্তু অদ্দূর করতে যাওয়া বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এই অবধি করে, রান্নাঘরের টেবিলের সামনে বসে, আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। তারপর ভাবলাম যে এখানেই তো আর থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদ্দিন এখানে থাকব, সেই পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে যাওয়া, কল্পনা করা, এইসব নিরন্তর চলতেই থাকবে, এতে কোনো ভুল নেই। বাথরুমে গিয়ে, ওর ঝুলিয়ে রাখা ছোট্ট কালো অন্তর্বাসের দিকে চোখ চলে যেতেই থাকবে। ওকে কল্পনা করার অনুমতি ওর থেকে চেয়ে রাখাও চলতেই থাকবে। এতে করে কিছুতেই, কাল রাতে ও যেটা করে দিল আমায়, সেটা আর ভোলার উপায় থাকবে না।

আমি সাকুরার জন্য একটা চিঠি রেখে যাব বলে টেলিফোনের পাশে রাখা মেমো-প্যাডে ভোঁতা হয়ে যাওয়া পেনসিলে লিখতে থাকি।

"ধন্যবাদ। খুব উপকার হলো আমার। মাঝরাতে ফোন করে ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এখানে আর সাকুরা-সান ছাড়া কে-ই বা ছিল কোনো অনুরোধ করার জন্য?"

এই অবধি লিখে, এবার একটু যতি দিয়ে আবার শুরু করব বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাবলাম। ঘরের ভেতরে চারদিকে একপাক চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম।

"এখানে যে আশ্রয় পেলাম এরজন্য ধন্যবাদ, কিছুদিন যে ইচ্ছে করলে থাকতেও পারি এটা বলার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তা করতে পারলে ভালই হত বলে মনে হয়। কিন্তু, সত্যি বলছি, সাকুরা-সানকে এর বেশি বিরক্ত করা যায় না। ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু এর নানা কারণ আছে। যেভাবেই হোক, নিজে নিজে সামলে উঠতে চাই। এর পরেও যদি কখনো বিপদে পড়ি, তখনকার জন্যেও একটু ভালবাসা অবশিষ্ট থাকলে খুব খুশি হই"।

এখানে আবার একটু থামি। আশেপাশে কেউ জোরালো আওয়াজে টিভি চালিয়ে দিয়েছে। গৃহবধূদের জন্য ওয়াইড-শো। অংশগ্রহণকারীরা সকলে চিৎকার করে একে অপরের বিরোধিতা করছে, বিজ্ঞাপনও কম যায় না, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আমি টেবিলের দিকে মুখ করে ভোঁতা পেনসিলটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিতে থাকি।

"তবে, সত্যি বলছি, আমি নিজেকে ঠিক, সাকুরা-সানের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করিনা। আমি একজন চমৎকার মানুষ হয়ে উঠব বলে মনস্থ করেছি ঠিকই, কোন কারণে, ঠিক হয়ে উঠতে পারছি না। পারলে, এবার যখন দেখা হবে, আরেকটু ঠিকঠাক হয়ে উঠতে চাইছি। তবে কতদূর কী হবে তা বলতে পারি না। কাল রাতের ব্যাপারটা দারুণ হয়েছিল। অনেক ধন্যবাদ"।

চিঠিটা কাপের নিচে রাখলাম। তারপর রুক্স্যাকটা নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলাম। যেরকম বলেছিল, সেই অনুযায়ী চাবিটা ম্যাটের নিচে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। সিঁড়ির মাঝামাঝি একজায়গায়, সাদা কালো ছোপ ছোপ একটা বেড়াল দিবানিদ্রা দিচ্ছে। লোক দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে হয়তো, আমি নামছি দেখেও উঠে দাঁড়ানোর কোনও লক্ষণই দেখাল না। পাশে বসে, হুলো বেড়ালটার গায়ে খানিক হাত বোলালাম। স্পর্শ করতেই নানা স্মৃতি জেগে ওঠে। চোখ কুঁচকে, বেড়ালটা গলা দিয়ে গুড়গুড় করে আওয়াজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে থাকে। আমি অনেকটা সময় ধরে, সিঁড়িতে পাশাপাশি বসে পরস্পরের ঘনিষ্ট বন্ধুত্বসূচক এই স্পর্শানুভূতি উপভোগ করলাম। তারপর একসময় ওকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে বাইরে।

আজ রাতে আর থাকার মতো কোনো জায়গা নেই। সূর্য ডোবার আগে, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারার মতো, মাথার ওপরে ছাতওলা একটা জায়গা খুঁজে বের করতেই হবে। তবে, যে করেই হোক ট্রেনে চেপে কোওমুরা লাইব্রেতে যাওয়া যাক। ওখানে গিয়ে তারপর কিছু একটা হয়তো হবে। তেমন কোনো ভিত্তি নেই, তবু কেন যেন ওরকমই মনে হচ্ছে।

এইভাবেই আমার নিয়তি ক্রমে ক্রমে এক বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১২

শোবা আমলের[১] ৪৭তম বছরের ১৯শে অক্টোবর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এভাবে হঠাৎ করে চিঠি লিখে হয়তো আপনাকে বিস্মিত করলাম। অপরাধ মাফ করে দেবেন। অনুমান করছি যে আমার নামটা হয়তো স্যারের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, আমি ইয়ামানাশি জেলার *** শহরের ছোট্ট প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। এটা বলাতে হয়তো নামটা মনে পড়তে পারে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগের বছরে ওখানে যে প্রাইমারির ছাত্রদের দলবেঁধে অচৈতন্য হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে, সেই বাচ্চাদের পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত প্র্যাক্টিকাল ট্রেনিং-এর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ছিলাম আমি। সেই ঘটনার অব্যবহিত পরেই, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা, যার মধ্যে আপনিও ছিলেন একজন, ব্যাপারটা তদন্ত করতে মিলিটারির তরফে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐ জায়গা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সেইসূত্রে কয়েকবারই সাক্ষাতে কথাবার্তা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এরপরে কোনো উপলক্ষ্যে খবরের কাগজে বা ম্যাগাজিনে স্যারের খ্যাতির কথা যতবার চোখে পড়েছে, ততবারই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার কর্মনিষ্ঠা, সেই সময় আপনার চেহারা, চটপটে কথাবার্তার কথা মনে পড়েছে। এছাড়াও, স্যারের লেখা বইও ক'খানা পড়েছি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিস্তারিত জ্ঞান সব সময়েই মুগ্ধ করেছে। এ জগতে মানুষের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব একাকিত্ব বইকি, কিন্তু এইসব স্মৃতির ভিত্তিতে আমরা একসূত্রে গাঁথা থাকি, একথা আপনি বারবারই আপনার বিশ্ববীক্ষা হিসেবে বলেছেন আর সেটা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে গিয়েছে। জীবনের পথে, আমার নিজের বহুবারই এই অনুভূতি হয়েছে বলে বলছি। আপনার আরো কর্মোদ্যম সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করছি।

[১] শোবা আমল (সম্রাট হিরোহিতোর আমল) হল ইংরিজি ১৯২৬ থেকে ১৯৮৯ সাল, তার ৪৭তম বছর তাহলে ১৯৭২-'৭৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি সেই থেকে আদ্যন্ত ওই ** শহরেরই প্রাইমারি স্কুলে স্কুল-শিক্ষিকার কাজ করে আসছিলাম, তবে, কয়েক বছর আগে অভাবনীয় ভাবে শরীর ভেঙে যায়, কোওফু জেনারেল হসপিটালে দীর্ঘদিন ভর্তি হয়ে থাকতে হয়েছিল। ঐ সময় আমি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নিই। মাত্র একবছরের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় চিকিৎসার পরিবর্তে, গিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পর্যায়ে ফিরে আসতে পারি। তারপরে রোগমুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে, সেই শহরেই প্রাইমারির ছাত্রদের একটা ছোট কোচিং সেন্টার চালাই। আগে যাদের পড়িয়েছি, তাদের ছেলেমেয়েরা এখন আমার কোচিং সেন্টারের ছাত্র হয়েছে। সাধারণ ভাবে বলা হয়, সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়, সত্যিই, মাস, দিন যে কী দ্রুত কেটে যায়!

যুদ্ধে স্বামীকে খোয়ালাম, বাবাকে খোয়ালাম, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে মাকেও খোয়ালাম। তাড়াহুড়োর বিবাহিত জীবনে সন্তান চাইতে না চাইতেই এই সব। তারপর থেকে তো এই দিগন্তবিস্তৃত একাকী জীবনই বয়ে নিয়ে চলেছি। খুব সৌভাগ্যময় জীবন বলে বলতে পারি না ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করে ক্লাসরুমে বহু শিশুকে গড়েপিটে তুলতে পেয়েছি, আপনাদের আশীর্বাদে নিজের মতো করে দিনগুলোকে পূর্ণতা দিয়ে কাটাতে পেরেছি। আমি সবসময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিক্ষকতার কাজে থিতু না হতে পারলে, হয়তো এই জীবন অসহনীয় হয়ে উঠতো, কে বলতে পারে।

এখন যে ধৃষ্টতার পরোয়া না করে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তার কারণ, শোবা উনিশ সালের শরতে, সেই যে পাহাড়ের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ার ঘটনাটা ঘটেছিল, কিছুতেই আমি সেটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না। সেই ঘটনার পরে এরমধ্যে আঠাশটি বছর কেটে গেছে। কিন্তু সেটা যেন আমার কাছে এই সেদিন ঘটেছে বলে মনে হয়—এতটাই স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় আমার নিজের কাছে। সেই স্মৃতি আজও রয়েছে এবং কখনো আমার কাছে খুব দূরের স্মৃতি বলে মনে হয়নি। কেমন যেন ছায়ার মতো আমার পাশেপাশে সর্বদাই থাকে। ওটার কারণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি, চিন্তাটা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে এসে হাজির হত। এমনকি বলা যেতে পারে, আমার জীবনটাই ধারাবাহিকভাবে ঐ ঘটনার থেকে যাওয়া রেশ সামলাতে সামলাতেই কেটে যাচ্ছে।

এক তো হচ্ছে, সেই ঘটনার কবলে যে বাচ্চারা পড়েছিল তাদের সঙ্গে যতবার কোথাও মুখোমুখি হই (ওদের মধ্যে অর্দ্ধেকই এখনও এই শহরেই আছে, অ্যাদ্দিনে বয়েস ত্রিশের কোঠায়, কি একটু বেশি), ঐ ঘটনার প্রভাবে ওদের অথবা আমার নিজের কী পরিণতি হয়েছে সেই প্রশ্ন নতুন করে নিজেকে না শুধিয়ে পারি না। শুধুমাত্র ঐ একটিই ঘটনায় যেহেতু, নিশ্চিত করেই কিছু একটা প্রভাব আমাদের শরীরে বা মনে পড়ার কথা। কোনো প্রভাবই পড়ল না, এটা হওয়ার নয় বলেই আমার বিশ্বাস। সেই প্রভাব নির্দিষ্ট করে ঠিক কেমন রূপ নিয়েছে, কত বড় ব্যাপার সেটা, এইসব ভাবলে, আমি আর কূলকিনারা করে উঠতে পারি না।

ঐ সময় ঐ ঘটনাটার কথা, স্যারও ভালই অবগত আছেন, মিলিটারির ইচ্ছানুসারে লোকের মধ্যে খুব একটা ছড়াতে দেওয়া হয়নি। আবার, যুদ্ধের পরে, অ্যামেরিকান অকুপেশন আর্মির ইচ্ছানুযায়ী, একই ভাবে গোপনীয়তার আড়ালে তদন্ত করা হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, অ্যামেরিকার মিলিটারিই হোক আর জাপানের মিলিটারিই হোক, কার্যকলাপে মূলত তেমন ফারাক কিছু নেই বলেই আমার মনে হয়। অ্যামেরিকান মিলিটারির দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকা এবং তাদের আরোপিত বাক্‌নিয়ন্ত্রণ যখন আর রইলো না, তখনো কিন্তু, বিশেষ করে খবরের কাগজে কিংবা ম্যাগাজিনে, সেই ঘটনা সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখা হল না। খানিকটা, বেশ কিছু বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে, আর কেউ যে ওতে প্রাণ হারায়নি সেই কারণেও বটে।

এইসব কারণে, এমনকি এরকম একটা ঘটনা যে ঘটেছিল, সমাজের অনেক লোক সেটুকুও জানে না। যতই হোক, শুনলে কান ঢাকতে ইচ্ছে করে এরকম নিষ্ঠুর কত অসংখ্য ঘটনাই তো যুদ্ধের মধ্যে ঘটেছে, লক্ষ লক্ষ লোক অমূল্য প্রাণ হারিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাহাড়ের মধ্যে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, এইটুকুতে লোকে হয়তো তেমন একটা আশ্চর্য হয় না। স্থানীয় লোকেদের মধ্যেও, ঐ ঘটনার কথা স্মরণে আছে এমন লোকের সংখ্যা মোটেও বেশি নয়। আর, যাদের স্মরণে আছে, তারাও দেখি খুব একটা এই নিয়ে কথা বলে না। একেই তো শহরটাই ছোট, স্থানীয় লোকেদের পক্ষেও খুব প্রিয় হওয়ার মত ঘটনা নয়, যতটা পারে এড়িয়ে যে চলতে চায়, সেটা সম্ভবত স্থানীয় লোকজনের সৎ মানসিকতারই প্রমাণ।

সবকিছুই প্রায় বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাচ্ছে। অত বড় যুদ্ধের কথা পর্যন্ত, যে মানুষেরা আর ফিরবে না তাঁদের জীবনের কথা, মৃত্যুর কথা, সবই সুদূর অতীতের ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবযাপন আমাদের মন অধিকার করে রাখছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নিভে যাওয়া পুরনো নক্ষত্রের মতো আমাদের গ্রাহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। রোজেরটা রোজ না ভাবলেই নয় এমন জিনিসই বড্ড বেশি হয়ে পড়েছে, নতুন করে শিখে রপ্ত হয়ে না থাকলেই নয়, এমন জিনিসও বড্ড বেশি হয়ে গেছে। নতুন ধরণ, নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি, নতুন শব্দ...। আবার, যত দীর্ঘ সময়ই কেটে যাক, মাঝখানে যা-ই ঘটুক, সত্যি সত্যি ভুলে যাওয়া কিছুতেই যায় না এমন জিনিসও আছে। অক্ষয় স্মৃতি বলেও কিছু আছে। ক্ষয়হীন পাথরের মতো নিজের মধ্যে যা রয়ে যায়। বনের মধ্যে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা আমার কাছে এক্কেবারে ঠিক সেই জিনিস।

এখন হয়তো অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। কী ফল হবে তা-ও জানি না। কিন্তু ঐ ঘটনা সম্বন্ধে, বেঁচে থাকতে থাকতে, যেভাবেই হোক স্যারকে একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখতে চাই।

একে তো সেই সময়টা ছিল যুদ্ধের মধ্যে, মানসিক ভাবেও জোরালো রকম বাধা ছিল, চট করে সহজে মুখে আনাও কঠিন ছিল। বিশেষ করে, স্যারের সঙ্গে যে সময়টায় দেখা হত, মিলিটারির সঙ্গে যুক্ত লোকেরাও সেখানে থাকতো একই সঙ্গে, আবহাওয়াটাই এমন থাকতো যে নিঃসংকোচে বলা হয়ে উঠতো না। তার ওপর, সেই সময় স্যারের কথা, স্যারের কাজকর্মের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কথা ঠিকমত না জেনে, অল্পবয়েসী একটা মেয়ে হিসেবে, অচেনা পুরুষের সামনে অতটা খোলাখুলি ভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার মুখে আনতে মন যে সায় দেয়নি, সেকথাও সত্যি। এই করেই, কিছু কথা আছে যা আমার বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। অন্যভাবে বললে, আমি নিজের সুবিধের জন্য একটা ফর্মাল পরিস্থিতিতে ঘটনার বিবরণের একটা অংশ ইচ্ছে করে একটু পালটে নিয়ে মনগড়া সাক্ষ্য দিয়েছি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, অ্যামেরিকান আর্মির সঙ্গে যুক্ত লোকেরা সমীক্ষা চালানোর সময়ও আমি সেই একই মর্মে সাক্ষ্য দিই পুনর্বার। ভয় পেয়ে গিয়ে, কিংবা শালীনতার খাতিরে, একই মিথ্যা ফের বলেছিলাম। এর ফলে, সেই বিচিত্র ঘটনার তদন্ত ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছিল এবং এর থেকে টানা উপসংহার যেন অল্পবিস্তর পাকিয়ে যাচ্ছিল। না, বরং বলব, নিঃসন্দেহে তাই ঘটেছিল। এই ব্যাপারে আমি খুবই লজ্জিত বোধ করছি এবং দীর্ঘদিন ধরে এটা বুকে যেন একটা ভার হয়ে চেপে আছে।

এই কারণেই, স্যারকে এরকম দীর্ঘ চিঠি লিখব বলে মনস্থ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ব্যস্ততার মধ্যে হয়তো রুষ্ট হবেন, কিংবা বিরক্ত। বিরক্ত হলে, নেহাতই এক বয়স্কা মহিলার অবান্তর কথা হিসেবে পড়ে তক্ষুণি ছুঁড়ে ফেলে দিতেই পারেন। আমি কেবল সেখানে সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল, সাধ্যমতো, একটি সৎ স্বীকারোক্তি হিসেবে লিখে ফেলে কোনো উপযুক্ত মানুষের হাতে সমর্পণ করতে চাইছি। অসুস্থতার পরে সেরে উঠেছি ঠিকই, শরীরের যা অবস্থা তাতে কবে আবার অসুখটা ফিরে আসে তার ঠিক নেই। এইদিকটা একটু বিবেচনায় রাখলে সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করব।

বাচ্চাদের নিয়ে যে পাহাড়ে গিয়েছিলাম, তার আগের রাতের কথা এটা, আমি আমার স্বামীকে স্বপ্নে দেখলাম। ভোরের একটু আগে। সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন আমার স্বামী, স্বপ্নের মধ্যে উনি এলেন। স্বপ্নের মধ্যে বেশ ভালরকম স্পষ্ট যৌনতা ছিল। কোনো কোনো সময়, স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে সীমারেখাটা নির্ধারণ করা যায় না এমন স্বপ্নও হয়, এ একেবারে সেরকম স্বপ্ন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা সবজি কাটার চপিং বোর্ডের মতো সমতল পাথরের ওপর কয়েকবারই মিলিত হলাম। পাহাড়ের একেবারে চূড়োর কাছে একটা পাথরে, হালকা ছাই রঙের পাথর। জায়গাটার পরিমাপ হবে, দুই জো[1] মতন। উপরিতল পিচ্ছিল, ভেজা ভেজা। আকাশ মেঘে ঢাকা, যে কোনো সময় জোরে বৃষ্টি আসতে পারে বলে মনে হচ্ছিল। বাতাস তেমন ছিল না। যেন সন্ধ্যা আসন্ন, পাখিরা বাসায় ফিরে কিচমিচ করছে। ওরকম আকাশের নিচে আমরা নির্বাক মিলিত হচ্ছিলাম। বিয়ের পরে পরেই যুদ্ধের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমার শরীর আকুল হয়ে স্বামীকে চাইছিল।

ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমনই শারীরিক সুখ পেয়েছিলাম। নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌণিক অবস্থানে মিলিত হয়ে, তার মধ্যে কতবারই না একেবারে চূড়ায় পৌঁছে গেছিলাম। ভেবে দেখলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এই জন্য বলছি যে, আমরা দুজনেই একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের বলে অত আকুল কামনায় খুব বেশি সম্ভোগের ঘটনা ঘটেনি, তাই অমন তীব্র ও চূড়ান্ত সুখানুভূতির অভিজ্ঞতাও একবারও ঘটেনি। তবে কিনা, স্বপ্নের মধ্যে আমরা স্বভাবগত সংযম সরিয়ে রেখে, পশুর মতো করে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিলাম।

চারপাশে অস্ফুট আলোর মধ্যে চোখ মেললাম, মানসিক অবস্থা তখন খুবই অদ্ভুত। শরীরটা আচ্ছন্ন ও ভারী, নিম্নাঙ্গের অভ্যন্তরে আমার স্বামীর পুরুষাঙ্গের উপস্থিতি তখনও অনুভব করছি। হৃদপিন্ডের গতি দ্রুত, শ্বাস সাবলীল নয়। আমার যোনিও সঙ্গমের পরে যেমন হয়, সেরকম আর্দ্র। স্বপ্নে নয়, সত্যিকারের সঙ্গমের পরে যেমন হয়, স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি। বলতে লজ্জা করছে খুবই, আমি ঐ অবস্থায়ই হস্তমৈথুন করলাম। তখন আমার যৌন আকাঙ্খার অনুভূতি এতই প্রবল যে কোনও ভাবে সেটা প্রশমনের জন্য করতে হল।

এরপরে আমি সাইকেলে চেপে স্কুলে চলে গেলাম, বাচ্চাদের নেতৃত্ব দিয়ে ও-বান ইয়ামা পাহাড়ের দিকে চললাম। পাহাড়ের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও আমি সেই যৌন সঙ্গমের রেশ উপভোগ করতে করতে যাচ্ছিলাম। চোখ বুজলেই আমি জরায়ুর

[1] 'জো' হল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের পরিমাপ, যা একেকটি মাদুরের। ঘরের মেঝের পুরোটা ঢাকতে ক'টা মাদুর লাগলো, ছ'টা কি আটটা, সেটাই মেঝের এরিয়া বলে বলা হয়।

~ www.amarboi.com ~

ভেতরে স্বামীর বীর্যপাত অনুভব করতে পারছিলাম। জরায়ুর দেওয়ালে স্বামীর স্খলিত বীর্য এসে লাগছে বোঝা যাচ্ছিল। এটা অনুভব করতে করতেই, আমি স্বামীর পিঠটা আঁকড়ে ধরলাম। যতটা করা সম্ভব, দু'পা ফাঁক করে গোড়ালি দিয়ে স্বামীর উরু জড়িয়ে ধরলাম। বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড়ে চড়তে চড়তে আমি যেন একপ্রকার অন্যমনস্ক অবস্থায়ই ছিলাম। টাটকা টাটকা সেই স্বপ্নের রেশের মধ্যেই ছিলামও বলা যায় হয়তো।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, বনের মধ্যে সবাই যখন মাশরুম কুড়োবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, হঠাৎ করেই আমার ঋতুক্ষরণ শুরু হয়ে গেল। ঠিক এই সময়ই হওয়ার ছিল না। মাত্র দশদিন আগে শেষ হয়েছে, আগাগোড়া আমার কিন্তু এই আবর্তনটা একদম ঠিকঠাক সময় মেনে হয়। হয়তো এই যৌনতায় ভরা স্বপ্ন দেখার প্রভাবেই আমার মধ্যে কোনো একটা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়ে উঠলো আর ঋতুক্ষরণটা শুরু হয়ে গেল। সে যাই হোক, হঠাৎ করেই হল বলে, আমার কাছে এর জন্য কোনো ব্যবস্থা করে রাখা ছিল না। তার ওপরে আবার পাহাড়ের মধ্যে।

আমি বাচ্চাদের কিছুক্ষণের জন্য বিরতির নির্দেশ দিলাম, বনের ভেতরের দিকটায় একা একা গিয়ে, কয়েকটা হাত মোছার কাপড়ের টুকরো দিয়ে একটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কিছু করলাম। নিঃসৃত রক্তের পরিমাণ খুব বেশি বলে আমি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। তবে, স্কুলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কোনোক্রমে সামলানো যাবে বলে ভেবেছিলাম। মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা, যুক্তিপূর্ণভাবে যে কিছু চিন্তা করব তাও হচ্ছে না। তখনও একটা অপরাধবোধের মত কী যেন মনের মধ্যে কাজ করছে। ওরকম খোলাখুলি স্বপ্ন দেখা নিয়ে, হস্তমৈথুন করা নিয়ে, বাচ্চাদের সামনে যৌন বিভ্রমের মধ্যে গা ভাসিয়ে দেওয়া নিয়ে। আমার স্বভাবে, এই ধরণের ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা খুবই জোরালো। বাচ্চাদের দিয়ে যথোপযুক্তভাবে মাশরুম সংগ্রহ করিয়ে, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ফলিত শিক্ষা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করে, পাহাড় থেকে নেমে যাব বলে ভাবলাম। স্কুলে ফিরে যেতে পারলে, তারপর কিছু একটা করা যাবে। আমি ওখানেই বসে পড়ে, বাচ্চারা যে জনে জনে মাশরুম সংগ্রহ করছে, সেটার ওপর নজর রাখলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাচ্চাদের মাথা গুনে গুনে, কেউ যাতে নজরের বাইরে চলে না যায়, সেটা খেয়াল রাখছিলাম।

কিন্তু, একটু পরে হঠাৎ করেই খেয়াল করে দেখি, একটা বাচ্চা ছেলে কিছু একটা হাতে নিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছে। নাকাতা নামে একটা বাচ্চা ছেলে। হ্যাঁ নাকাতাই। ঐ ঘটনার পরে জ্ঞান ফিরে না পেয়ে, দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা ছেলেটা। হাতে করে নিয়ে আসা জিনিসটা রক্তের ছোপ লাগা আমার হাত মোছার কাপড়ের টুকরো। আমি ঢোঁক গিললাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এইজন্য বলছি যে, আমি ওগুলো যথেষ্ট দূরে নিয়ে গিয়ে, যেখানে নিশ্চিত করেই বাচ্চারা যাবে না, আর গেলেও, নিশ্চিত করেই, ওদের চোখে পড়ার কথা নয় এমন লুকোনো জায়গায় ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। মেয়ে হিসেবে খুবই সংকোচবশত, একেবারেই চাইনি যে লোকের চোখে পড়ে যাক। কী করে যে ও ওটা খুঁজে পেল সেটা তো আমি আন্দাজই করতে পারছিলাম না।

ব্যাপারটা নজরে পড়তেই আমি ছেলেটাকে, নাকাতাকে, মারতে শুরু করেছিলাম। কাঁধের কাছটায় ধরে বারবার বারবার চড় মারছিলাম। চেঁচিয়ে কিছু একটা বলছিলাম হয়তো। আমার তখন মাথার ঠিক নেই, সব ওলট পালট হয়ে গেছে। স্পষ্টতই আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। নিশ্চয়ই গভীর লজ্জায়, একটা মানসিক শকের মধ্যে চলে গেছিলাম বলে মনে হয়। ওইভাবে বাচ্চাদের ওপর চিৎকার করা আগে একবারও ঘটেনি। কিন্তু সেই আমি তো তখন আমি নই।

খেয়াল হতেই বাচ্চারা সকলে একদৃষ্টে আমাকে দেখছিল। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে, কেউ বসে পড়ে, এইদিকে ফিরে দেখছিল। ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি, বকা খেতে খেতে মাটিতে পড়ে থাকা নাকাতা, আর আমার রক্তের ছোপ লাগা কাপড়ের টুকরো, সব ওদের চোখের সামনে তখন। কিছুক্ষণের জন্য আমরা ওখানে পাথরের মতো হয়ে পড়েছিলাম। কেউ নড়ছে চড়ছে না, মুখে কোনও কথা নেই। বাচ্চাদের মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই, ব্রোঞ্জের তৈরি মুখোশের মতো দেখাচ্ছিল। বনের মধ্যে গভীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল। শুধু পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছিল। সেই দৃশ্য আমি এখনও পরিষ্কার মনে করতে পারি।

কতটা সময় এভাবে কেটে গেছিল কে জানে। খুব বেশি সময় নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু আমার কাছে অনন্ত সময় বলে মনে হয়েছিল। আমাকে ধাওয়া করে পৃথিবীর শেষতম প্রান্তর পার করিয়ে দেওয়ার মতো সময়। ক্রমে একসময় আমি নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। চারপাশের দৃশ্য আবার তার রঙ ফিরে পেল। আমি সেই রক্তমাখা কাপড়ের টুকরো ফিরে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এসে, মাটিতে পড়ে থাকা নাকাতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তুললাম। তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে একেবারে আন্তরিক মাফ চাইলাম। বললাম, দিদিমণি খুব অন্যায় করেছে, তুমি তাকে মাফ করে দাও, মাফ চাইছে। ও নিজেও তখন একটা শকের মধ্যেই যেন ছিল। শূণ্য দৃষ্টিতে, আমার কথা কানে যাচ্ছিল বলেও মনে হচ্ছিল না। ওকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায়, অন্য ছাত্রছাত্রীদের দিকে ফিরে তাদের ফের মাশরুম কুড়োতে যেতে বললাম। তাতে বাচ্চারা আবারও, যেন কিছুই হয়নি এভাবে, ফের মাশরুম কুড়োনোর কাজে গেল। ওখানে যে তখন ঠিক কী হয়েছিল, বাচ্চারা বোধহয় সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি বলে মনে হয়। সবটাই খুবই অস্বাভাবিক, সবটাই খুবই আকস্মিক।

আমি নাকাতাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এভাবে এখানেই আমি মরে গেলে ভাল হয় বলে মনে হচ্ছিল। এভাবেই কোথাও একটা উধাও হয়ে যেতে পারলে ভাল হত বলে মনে হচ্ছিল। যেখানে একটা বিরাট ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে আর অনেক লোক কেবল মারা যাচ্ছে। কোনটা যে সত্যি, কোনটা সত্যি নয়, আমি ভেবে উঠতে পারছি না। চারপাশে যা দেখছি সেগুলো সত্যি কি না, চোখে যে রঙ দেখছি সেগুলো সত্যি কি না, কানে আসছে যে পাখির ডাক, সেটা সত্যি কি না...। বনের ভেতরে ঢুকে, একা একা, বিভ্রান্ত অবস্থায়, জরায়ু থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকল। ক্ষোভ, আশঙ্কা, লজ্জা আমাকে গ্রাস করে নিতে থাকল। আমি কাঁদতে থাকলাম। কোনো আওয়াজ না করে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এরপরই বাচ্চাদের দলবেঁধে অচৈতন্য হয়ে পড়া শুরু হল।

আমার মনে হয় আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন, এভাবে খোলাখুলি কথাগুলো মিলিটারির লোকেদের সামনে কিছুতেই বলা যেত না। ওটা ছিল যুদ্ধের সময়, সেযুগে আমাদের নীতি মেনে চলতে হত। সেই কারণে, আমার যে ঋতুক্ষরণ শুরু হয়েছিল, নাকাতা যে আমার রক্ত মাখা কাপড়ের টুকরো নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল, ওকে যে চড় মেরেছিলাম, এই অংশগুলো বাদ দিয়ে সবাইকে বলতে হয়েছিল। এখন যেটা ব্যক্ত করলাম, সেটার কারণে স্যারেদের সমীক্ষায়, গবেষণায় বড় রকমের কোনো বাধা সৃষ্টি করলাম কি না ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলাম। এবার এভাবে খোলাখুলি কোনোকিছু না লুকিয়ে বলতে পেরে, আমি নিজে অবশেষে স্বস্তি পেলাম।

ব্যাপারটা অদ্ভুত বললে অদ্ভুত। তবে, বাচ্চারা কেউ একক ভাবে সেই ঘটনা স্মরণে রাখেনি। যতই হোক, রক্তমাখা কাপড়ের টুকরো, কিংবা আমি যে নাকাতাকে চড় মেরেছিলাম এগুলো একেবারেই মনে নেই কারুরই। সেসব কথা সবারই স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। ঘটনার পরে পরেই, আমি সেটা ব্যক্তিগত ভাবে এক এক করে প্রত্যেকের থেকে পরোক্ষে যাচাই করে নিয়েছি। এমনও হতে পারে যে, হয়তো তখন থেকেই সম্মিলিতভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

নাকাতা সম্বন্ধে, ওদের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকা হিসেবে আমার যে ধারণা তৈরি হয়েছিল সেটা একটু আপনাকে লিখতে চাইছি। ওই ঘটনার পরে নাকাতার কী হয়েছিল আমিও জানতে পাইনি। ওকে যে টোকিওর মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানেও যে বেশ দীর্ঘকাল ও অজ্ঞান হয়েই ছিল, ঐ অবস্থায় হঠাৎ করেই যে জ্ঞান ফিরেও পেয়েছিল, সেকথাও, যুদ্ধের পরে আমার সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন যে মিলিটারি আধিকারিক, তাঁর থেকে শুনেছিলাম। কিন্তু এর চেয়ে আর বিশদে কিছু জানতে পাইনি। বড়জোর এটুকুই খবর ছিল বলে, আমার চেয়ে স্যারের হয়তো আরো খুঁটিয়ে জানা আছে বলেই অনুমান করছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যতদূর জানি, যে পাঁচটি বাচ্চাকে টোকিও থেকে সরিয়ে এনে ঐ ক্লাসে ভর্তি করানো হয়েছিল, নাকাতা ছিল তাদেরই একজন, তবে ওদের মধ্যে ওরই রেজাল্ট ছিল সবচেয়ে ভাল এবং ও-ই ছিল ওদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বাচ্চা। মুখশ্রী সুন্দর, চেহারা-চলনও বেশ চোখে পড়ার মতো। কিন্তু স্বভাবটা শান্ত আর একেবারেই সাতে পাঁচে থাকতো না। ক্লাসেও কখনও নিজে থেকে হাত তুলেছে এমনটা একেবারেই হয়নি। কিন্তু বলতে বললে একেবারে ঠিকঠাক উত্তর দিত এবং মতামত জিজ্ঞেস করলে যুক্তিপূর্ণ ভাবে মতামত পেশ করত। যে কোনো বিষয়েই, যা পড়ানো হত, তখুনি বুঝতে পারত। যে কোনো ক্লাসেই এরকম বাচ্চা এক আধজনই থাকে। এই ধরণের বাচ্চারা ছেড়ে দিলেও নিজে নিজেই পড়ে নিয়ে ওপরের দিকে আরো ভালো স্কুলে চান্স পেয়ে, সমাজেও উপযুক্ত স্থান করে নেয়। জন্মগত ভাবেই উচ্চ পারদর্শিতা হয় এদের।

ওদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে, ওর কিছু কিছু ব্যাপার আমি খেয়াল করেছিলাম। সেটা হল, কখনো কখনো ওর মধ্যে একটা উদাসীনতা দেখতে পেতাম। যত কঠিন একটা প্রবলেমই দেওয়া হোক, সেটা পারার পর আর পারার উল্লাসটা অধিকাংশ সময় দেখা যেত না। বড়রকম পরিশ্রম করতে গিয়ে হাঁফিয়েও পড়ত না, বারবার করে দেখতে হলেও কোনও অভিযোগ নেই। দীর্ঘশ্বাসও নেই, হাসাহাসিও নেই। ভাবখানা এরকম যে, এখনকার মত এটাই করতে হবে, তাই এটা করছি। সামনে যেটা পড়লা সেটা নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করা আর কী। কারখানায় কাজ করতে করতে কনভেয়ার বেল্টে যে যন্ত্রাংশটাই আসে, রেঞ্চ হাতে দাঁড়িয়ে, সেটাতেই একটা নির্দিষ্ট বল্টু একপাক ঘুরিয়ে দেওয়ার মতোই।

এটা পারিবারিক পরিবেশের সূত্রে ঘটা সমস্যা বলেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। টোকিওতে ছিলেন ওর বাবা-মা, আমার সঙ্গে অবশ্য কখনোই ওঁদের সাক্ষাত হয়নি, তাই সঠিক করে বলতে পারব না। তবে, আমি আমার শিক্ষয়িত্রী জীবনে কয়েকবারই এর নজির প্রত্যক্ষ করেছি। যোগ্যতা আছে এমন বাচ্চারা, যোগ্য পরিস্থিতিতে বড়দের সাহায্য নিয়ে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্ভাব্য লক্ষ্যপূরণ করে যেতেই থাকে। চোখের সামনের উপস্থিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সমস্যার একটা হাল করা বাদ দিলে, স্বাভাবিক ভাবেই বাচ্চাদের থেকে যে শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস আর সাফল্যের উত্তেজনা প্রত্যাশিত, সেটা ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলার ঘটনা অনেকই ঘটে। তেমন পরিবেশে কিছু কিছু বাচ্চা, একসময় মনটাকে শক্ত করে বন্ধ করে ফেলে, মনের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ চেপে রাখতে শেখে। ওভাবে বন্ধ করে ফেলা মনকে আবারও ফের ঠেলে খুলে ফেলতে দীর্ঘকালীন অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। বাচ্চাদের মন খুব নরম তো, যে কোনো তির্যক পথে ঘুরে যেতে পারে। একবার ওভাবে বেঁকে কঠিন হয়ে যাওয়া মন, কিছুতেই আগের পরিস্থিতিতে ফিরে আসে না। অনেকক্ষেত্রেই আর দ্বিতীয়বার ফেরে না। তবে, এসব কথা স্যারের বিষয়ের মধ্যেই পড়ে, আমার আর এতদিন পরে আলাদা করে বলার মতো কিছু নয়।

আরেকটা কথা, আমি কিন্তু এতে ভায়োলেন্সের ছায়া না দেখে পারিনি। বরং ওর অভিব্যক্তিতে, আচরণে, মুহূর্তের জন্য হলেও বিচ্যুতির ইঙ্গিত বারবারই টের পেয়েছি। সেসব দীর্ঘকাল ধরে একের পর এক ভায়োলেন্সের মুখোমুখি হয়ে আপনা থেকে ঘটে যাওয়া প্রতিক্রিয়া। সেই ভায়োলেন্সের মাত্রা কেমন ছিল, সে অবশ্য আমার জানার মতো নয়। ওর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল জোরালো, আমাদের নজর থেকে সুকৌশলে সেই বিচ্যুতি আড়ালে রাখতো। তবে কিছু একটা হলে, সামান্য পেশী প্রদর্শনও যে লুকিয়ে রাখতে পারতো তা নয়। কম হোক, বেশি হোক, পরিবারের মধ্যে ভায়োলেন্স নির্ঘাত ছিল, এটাই আমার অনুমান। বাচ্চাদের সঙ্গে প্রত্যেকদিন মিশতে পেলে এগুলো মোটামুটি বোঝা যায়।

গ্রামের দিকে প্রত্যেকটি পরিবার ভায়োলেন্সে ভরপুর। অভিভাবকরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। সকলেই কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করে। সকাল থেকে কাজ করে করে হা-ক্লান্ত হয়ে পড়লে, যেভাবে হোক মদ যোগাড় হবে, আর তখন রেগে গেলে মুখের আগে হাত চলতে থাকবে। এসবের মধ্যে কোনো লুকোছাপা নেই। বাচ্চারা, কমবেশি, মারধোর খেয়ে বেপরোয়া, উড়নচন্ডী হয়ে যায়, আর সেক্ষেত্রে প্রথমেই মনের কষ্টটা চলে যায়। কিন্তু নাকাতার বাবা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ওর মা-ও, ওঁর পাঠানো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চিঠি পড়ে যতটুকু বুঝেছি, খুবই যেন উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারিণী ছিলেন। এককথায়, শহরের এলিট ফ্যামিলিগুলোর একটা। সেখানেও যদি ভায়োলেন্স থেকে থাকে, সেটা সম্ভবত গ্রামের বাচ্চারা বাড়িতে দৈনন্দিন যে ধরণের ভায়োলেন্সের মুখোমুখি হয়, তার থেকে পৃথক, অনেক জটিল উপাদান আছে তার, আর সেটা অনেক অন্তর্মুখী চরিত্রের ভায়োলেন্স হওয়ার কথা। বাচ্চারা একান্তই নিজের মনের মধ্যে ডুবে না গেলে আর উপায় থাকে না, এটা এমনই ধরণের ভায়োলেন্স।

এই কারণেই, আমি তখন সেই পাহাড়ের মধ্যে, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েই হয়তো, ওর ওপরেই যে ভায়োলেন্স প্রয়োগ করে বসলাম, সেটা খুবই দুঃখের, আমি এতে গভীর ভাবে অনুতপ্ত হয়ে আছি। এটাই আজ অবধি আমার করা সবচেয়ে অনুচিত কাজটি। সামূহিক পুনর্বাসনের জন্য মাঝপথে বাধ্যতামূলকভাবে ওকে বাড়ি থেকে, বাবা মা-র থেকে সরিয়ে এনে, একটা নতুন পরিবেশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওটা একটা সুযোগ পেয়েছিল আমার কাছে একটু মনটা মেলে ধরার উপায় হিসেবে, আর তখনই ঘটলো এটা। যতটুকু পরিসর ওর মধ্যে তখনও উন্মুক্ত ছিল, সেটুকুকেও আমি মারাত্মক ভাবে জখম করে ফেললাম হয়তো। ভেবেছিলাম, সম্ভব হলে, সময় নিয়ে এই ভুলের জন্য যে ক্ষতি তা পূরণ করে দেব। কিন্তু তারপরে যা যা ঘটলো, তাতে আর সেটার বাস্তবে রূপ দিতে পারিনি। নাকাতা ঐভাবে জ্ঞান আর ফিরে না পেয়ে টোকিওর হাসপাতালে প্রেরিত হল, তার পরে আর একবারের জন্যও তার সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। সেই দুঃখ আমার বুকে রয়েই গেছে। চড় মারার সময় ওর সেই মুখ, এখনও আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি। সেখানে যে গভীর আতঙ্ক আর অসহায়তা দেখেছিলাম, স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিশদে, বড়ো করে পরপর অনেক কিছু লিখে ফেললাম, সবশেষে আরেকটা কথা একটু লিখতে আজ্ঞা করুন। আমার স্বামী যুদ্ধ শেষের অল্প আগে ফিলিপিনসে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন, সত্যি বলতে কী, আমি কিন্তু তাতে তেমন শক অনুভব করিনি। সেই সময় আমার যেটা হয়েছিল, সেটা কেবল একটা গভীর অসহায়তা বোধের বেশি কিছু নয়। হতাশাও নয়, রাগও নয়। আমি এমনকি একফোঁটা চোখের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জলও ফেলিনি। এর কারণ হয়তো, স্বামী যে কোথাও কোনো যুদ্ধক্ষত্রে তাঁর তাজা প্রাণ হারাতে পারেন, সেটা যে আগে থেকেই জানা ছিল। তার একবছর আগেই স্বামীর সঙ্গে তুমুল যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখে, ঋতুস্রাব শুরু হয়ে, হতভম্ব নাকাতাকে চড় মেরে, বাচ্চারা এক দুর্বোধ্য অচেতনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে থেকে এটা যে হতই, আগে থেকেই যেন ঠিক হয়ে ছিল, তা আমিও মেনেই নিয়েছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর খবর শোনার পর আমি সেটা ঠিক কিনা যাচাই করে নেওয়ার বেশি আর কিছু করিনি। তারপর থেকে আমার সত্ত্বার একটা অংশ সেই পাহাড়েই রয়ে গেছে। এর কারণ, ঐ ঘটনা আমার জীবনের আর প্রতিটি ঘটন অঘটনকে ছাপিয়ে গেছে।

পরিশেষে, স্যারের গবেষণা উত্তরোত্তর বৃহত্তর সাফল্য লাভ করুক, এই প্রার্থনা রাখছি। যেভাবেই হোক নিজের যত্ন নেবেন।

প্রণামান্তে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৩

দুপুর হয়ে গেলে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে খাওয়া দাওয়া সারছি, এই সময় ওশিমা এসে পাশে বসলো। সেদিন আমি ছাড়া আর কেউ রীডিংরুমে পড়তে আসেনি। রোজকার মতো ষ্টেশনের দোকান থেকে কিনে আনা সবচেয়ে কম দামের লাঞ্চ-বক্স থেকেই খাচ্ছি। আমরা খানিক কথাবার্তা বললাম। ওশিমা নিজের দুপুরের খাওয়ার জন্য আনা স্যান্ডুয়িচ অর্দ্ধেক আমায় খেতে অনুরোধ করলো। আজ তোমার জন্যই একটু বেশি করে বানিয়ে এনেছি, বলল।

"বললে হয়তো তোমার খারাপ লাগবে, কাছ থেকে মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় ঠিকমতো খাওয়া হয়নি।"

"পাকস্থলি ছোট করছি", আমি ব্যাখ্যা করি।

"নিজের ইচ্ছেয়?" ও গভীর কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"অর্থনৈতিক কারণেই হয়তো এটা করছ।"

আমি আবারও মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"তোমার এরকম উদ্দেশ্যের আমি অর্থ বুঝতে পারছি, তাহলেও, এখন বেড়ে ওঠার সময় তো, যখনই পারবে পর্যাপ্ত খেয়ে নেওয়াই ভাল, জান তো। নানা দিক থেকে যথেষ্ট পুষ্টির প্রয়োজন এই সময়টায়।"

ওর অফার করা স্যান্ডুইচ, দেখেই বেশ সুস্বাদু বলে মনে হয়েছিল। ধন্যবাদ জানিয়ে ওর থেকে নিয়ে খেলাম। নরম সাদা পাঁউরুটির মধ্যে স্মোকড স্যালমন, ক্রেসোন আর লেটুস ভরে দেওয়া আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুটির গায়ে হর্স-র‍্যাডিশ আর মাখন দিয়ে ড্রেসিং করা।

"ওশিমা-সান নিজেই বানিয়েছেন?"

"বানিয়ে দেওয়ার মতো আর কেউ নেই যে", ও বলে।

পটের ভেতর থেকে ব্ল্যাক কফি মাগ-এ ঢেলে খেল ও, আর আমি সঙ্গে আনা কাগজের দুধের প্যাক খুলে খেলাম।

"তুমি এখন এখানে এত মন দিয়ে কী পড়ছো?"

"এখন নাৎসুমে সোসেকি-র রচনাসমগ্র পড়ছি", আমি বললাম। "কিছু কিছু পড়া ছিল না বলে, এই সুযোগে সবটা পড়ে ফেলা যাক বলে ভাবলাম।"

"সোসেকির লেখা এত ভালে লাগে যে সব লেখা পড়ে ফেলতে চাইছ", ওশিমা বলে।

আমি মাথা ঝোঁকাই, সম্মতিসূচক।

ওশিমার হাতের কাপ থেকে সাদা ভাপ উঠছে। আকাশ মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তবে বৃষ্টি আপাতত হচ্ছে না।

"এখানে এসে থেকে কী কী পড়লে?"

"এখন পড়ছি, *পপিজ*, এর আগে পড়লাম, *দ্য মাইনার*।"

"ও, *দ্য মাইনার*, না?" ওশিমা যেন অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারছে, এই ভাবে বলল। "নিশ্চয়ই, সেই যে টোকিওর এক ছাত্র কী করে যেন খনিতে কাজ করতে গিয়ে খনি শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে নিদারুণ সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আবার বাইরের জগতে ফিরে এসেছিল, সেই কাহিনী, তাই না ? দ্বিতীয় ভল্যুমের উপন্যাস। অনেক আগে পড়েছি। বিষয়টা ঠিক সোসেকির বিষয়গুলোর মতো নয়, লেখার স্টাইলটাও বেশ এলোমেলো, মোটামুটিভাবে বলা যায়, এটা যেন সোসেকির সবচেয়ে অখ্যাত লেখার একটা... তোমার কোন জায়গাটা ভালো লাগলো?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি এই উপন্যাসটার ব্যাপারে তখন পর্যন্ত আবছা যা মনে হয়েছে, সেটাই কোনভাবে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু এই ধরণের কাজে কারাসু বলে ছেলেটার শরণাপন্ন হওয়া দরকার হয়ে পড়ে। সে যেন কোত্থেকে হাজির হয়ে, বিশাল ডানা মেলে, কিছু কথা আমার জন্য খুঁজে এনে দেয়। আমি বলে দিই।

"মুখ্য চরিত্রটি বড়লোকের ঘরের ছেলে, প্রেমঘটিত ব্যাপারে গন্ডগোল হয়ে, কেমন বিবাগী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক অপরিনামদর্শী লোকের সঙ্গে দেখা, সে জিজ্ঞেস করলো খনিতে কাজ করবে কিনা, শুনে ও কিছু না ভেবেচিন্তে তার সঙ্গে জুটে গেল। আশিও খনিতে কাজ পেল। মাটির নিচে অনেক গভীরে ঢুকে, সেখানে অকল্পনীয় সব অভিজ্ঞতা অর্জন করল। জগত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছেলে সমাজের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ঘুরে দেখে এল।"

দুধ খেতে খেতে, এরপরে কী বলব সে কথা ভাবতে থাকি। কারাসু বলে ছেলেটা আবার ফিরে আসা পর্যন্ত একটু সময় লাগবে। কিন্তু ওশিমা অটল ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছে।

"সে একেবারে বাঁচা-মরা হাতের মুঠোয়, এমন অভিজ্ঞতা। তারপর কোনোক্রমে ওখান থেকে বেরিয়ে আবার মাটির ওপরের আগের মতো জীবনে ফিরে এল। তবে, মুখ্য চরিত্রটি এহেন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় কিছু পেল কিনা, ওখানে এরপর ওর জীবনধারণ প্রণালী পালটে গেল কিনা, মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে কোনও গভীর ভাবনার উদ্রেক হল কিনা, আদর্শ সমাজ নিয়ে কোনও সংশয় তৈরি হল কিনা, এসব ব্যাপারে বিশেষ করে কিছু লেখা নেই। মানুষ হিসেবে আরও পরিণত হয়ে ওঠার মতো কোনও প্রভাবের কথাও তেমন নেই। বইটা পড়া শেষ করে কেমন অদ্ভুত একটা মনের অবস্থা হয়েছিল। এই উপন্যাসটা ঠিক কী বলতে চায়, কে জানে। তবে, কী বলব, এই যে, "কী বলতে চায় বোঝা যাচ্ছে না।" এই দিকটা আশ্চর্য ভাবে মনের মধ্যে রয়ে গেছে। ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারলাম না যদিও।"

"তুমি বলতে চাইছ, উপন্যাস হিসেবে 'দ্য মাইনার'-এর কাঠামোটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সানশিরো' ধরণের ইদানিং কালের শিক্ষামূলক উপন্যাসের চেয়ে একেবারে আলাদা, এরকমই কিছু, তাই তো?"

সায় জানাতে আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই। "হুঁ, একটু দুরূহ দিকগুলো ভাল বুঝতে পারিনা, তবে সম্ভবত সেরকমই। সানশিরো কাহিনীর মধ্যে একটু একটু করে বড় হতে থাকে। দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে, সেই নিয়ে ভালমত ভাবনাচিন্তা করে কোনক্রমে সামলে নেয়। তাই না? কিন্তু 'দ্য মাইনার'-এর মুখ্য চরিত্র একেবারেই আলাদা। সে কেবল চোখের সামনে যখন যেমন ঘটতে দেখে, সেগুলো সেভাবেই গ্রহণ করে। অবশ্যই তখনকার মতো তৈরি হওয়া ধারণা সেগুলো, খুব একটা যে ভেতর থেকে আন্তরিক ভাবে অনুভূত, এমন নয়। তার চেয়ে বরং নিজের ক্ষেত্রে ঘটা প্রেমের ব্যাপারগুলোতেই বিষন্নভাবে আটকে থাকে। তাছাড়া, সুরঙ্গে ঢোকার সময়, আর যে অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসে তার মধ্যে কোনোরকম তফাত এতটুকু চোখে পড়ে না। ওরও যে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল, কিংবা বেছে নেওয়ার উপায় ছিল সেইদিকটা অনুপস্থিত। বলতে কী, খুবই যেন নিরুদ্যম, হাল ছেড়ে দেওয়া ভূমিকা। আমার এটা মনে হচ্ছে বটে, মানুষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত সহজে কোনো ব্যাপারেই নিজের ক্ষমতায় বিচার করে উঠতে পারে না বলেই মনে হয়।"

"তুমি তাহলে নিজেকেই খানিকটা 'দ্য মাইনার'-এর মুখ্য চরিত্রের জায়গায় বসিয়ে দেখছো, তাই কি?"

আমি ঘাড় ঝাঁকাই। "সেরকম কিছু কিন্তু নয়। এরকম কিছু ভাবিওনি।"

"তবে, মানুষ কিন্তু কিছু একটার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বেঁচে থাকে" ওশিমা বলে। " তা না করে উপায় নেই। নিজের অজান্তেই তুমি সেটা করতে থাকবে। গ্যেটে বলেছেন, জগতের যাবতীয় কিছু আসলে মেটাফর, উপমা।"

আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখতে থাকি।

ওশিমা কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে নিয়ে বলে, "যাই হোক,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সোসেকির 'দ্য মাইনার' সম্বন্ধে তোমার অভিমত কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং। বিশেষ করে, প্রকৃতই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে এরকম একটা বাচ্চা ছেলের অভিমত হিসেবে শুনলে তো আরোই জোরালো ভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। আরেকবার পড়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।"

আমি ওশিমার তৈরি স্যান্ডুইচ গলাধঃকরণ করি। খাওয়া হয়ে যাওয়া দুধের কাগজের প্যাক দুমড়ে মুচড়ে বাতিল জিনিস ফেলার বিনের মধ্যে ফেলে দিই।

"ওশিমা-সান, আমি একটা মুশকিলে পড়েছি, অথচ আপনি ছাড়া পরামর্শ করার মত আর কেউ নেই", হাল ছেড়ে দিয়ে আমি এইভাবে কথাটা পেড়ে দেখি।

যেন বলার অনুমতি দিচ্ছে, এইভাবে সে দুহাত প্রসারিত করে।

"বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে যদিও, আমার আসলে আজ রাতে থাকার মতো কোনো জায়গা নেই। স্লীপিং ব্যাগ আছে। সুতরাং তোষক কিংবা বেড, এসব কিছুর দরকার নেই। এমনকি ছাদে হলেও অসুবিধা নেই। যে কোনো একটা জায়গা হলেই চলবে, এদিকে কোথাও মাথার ওপরে ছাত আছে এরকম কোনো জায়গা পাওয়া যাবে?"

"ভেবে বের করতে হবে, হোটেল কিংবা অতিথিশালা তোমার বিবেচনায় নেই, তাই তো?"

আমি ঘাড় ঝাঁকাই। "অর্থনৈতিক কারণ তো আছেই। এছাড়াও, পারতপক্ষে খুব বেশি লোকের চোখে যাতে না পড়ি সেটাও চাইছি।"

"বিশেষ করে বাচ্চাদের ব্যাপারের পুলিশ টুলিশের, তাই তো?"

"সম্ভবত।"

ওশিমা খানিক ভাবে। তারপর বলে, "তাহলে, এখানেও থাকা যেতে পারে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“এই লাইব্রেরিতে?”

“হ্যাঁ। ছাদও আছে, ফাঁকা ঘরও আছে। রাতের বেলা কেউ ব্যবহার করে না।”

“কিন্তু, সেটা কি করা যায়?”

“অবশ্যই একধরণের অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেওয়া দরকার হবে। তবে সেটা সম্ভব। বলা উচিত, অসম্ভব নয়। আমি কোনোরকম একটা কিছু করে দিতে পারব বলে মনে হয়।”

“কী ভাবে?”

“তুমি ভাল ভাল বই পড়, নিজের মাথায় ভাবনাচিন্তাও করতে পার। দেখে মনে হয় শরীর-স্বাস্থ্যও পোক্ত, মনের দিক থেকেও স্বাবলম্বী, পরিণত। জীবনযাত্রা এলোমেলো, অনিয়মিত নয়, ইচ্ছেমত পাকস্থলি অবধি ছোট করে নিতে পার। আমার অ্যাসিসটেন্ট হয়ে এই লাইব্রেরির খালি ঘরে যাতে ঘুমোতে পার সেই নিয়ে আমার উর্দ্ধতনের সঙ্গে কথা বলে দেখা যেতে পারে।”

“আমি ওশিমা-সানের অ্যাসিসটেন্ট হব?”

“অ্যাসিসটেন্ট হলেও, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিছু না করলেও চলবে। লাইব্রেরি খোলা বন্ধ করায় সাহায্য করার মতো কিছু আর কি। রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার রাখার মতো বাঁধা কাজ করার জন্য বিশেষ লোক নিয়ম করে আসে, কিন্তু কম্পিউটার চালানো সেই বিশেষজ্ঞদের পক্ষে মুশকিল। এছাড়া আর করার খুব কিছু নেই। তারপর পছন্দমত বই পড়লেও চলবে। মন্দ কী?” ওশিমা বলে।

“অবশ্যই মন্দ নয় যদিও—”, আমি বলি। ঠিক কী বলা যে সমীচীন, ভাল বুঝতেও পারি না। “তবে, উর্দ্ধতন যে এতে অনুমতি দেবেন, সে তো একেবারে ভাবাই যায় না। যত যাই হোক, আমার বয়েস মাত্র পনের বছর, কোথাকার কে জানা নেই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ছেলে একটা।”

“আমার বস্ আসলে, কী বলব...” ওশিমা বলতে শুরু করে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সচরাচর যা হয় না, থেমে গিয়ে, সঠিক শব্দ খুঁজতে থাকে। "ঠিক গড়পরতা লোকের মতো নন।"

"গড়পরতা লোকের মত নন?"

"একথায় তাই, সহজ করে বললে, আর পাঁচজনের মতো বাঁধাধরা গতে উনি চিন্তা করেন না।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই। কিন্তু, 'আর পাঁচজনের মতো বাঁধাধরা গতে উনি চিন্তা করেন না' বলতে ঠিক কী বোঝায়, আন্দাজও করে উঠতে পারি না।

"কোনো বিশেষ ধরণের মানুষ কি?"

ওশিমা কাঁধ ঝাঁকায়। "না, ঠিক তা নয়, বিশেষ ধরণের মানুষ বলতে হলে, বলতে হয়, আমি হচ্ছি একজন বিশেষ ধরণের মানুষ। এই মহিলা, কেবল সাবধানী বাস্তববুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়ার মত নন।"

আমি তখনও গড়পরতা নয় আর বিশেষ ধরণের লোকের মধ্যে প্রভেদটা ধরতে পারিনি। কিন্তু মনে হল যে এর বেশি প্রশ্ন আর না করাই ভাল। অন্ততপক্ষে এই মুহূর্তে।

সামান্য বিরতি দিয়ে ওশিমা বলে, "কিন্তু, ব্যাপার হল, আজ রাত থেকে হঠাৎ করে এখানে ঘুমোতে শুরু করাটা খানিকটা হয়তো বাড়াবাড়িই হবে। তাই এখনকার মত তোমাকে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাব ঠিক করেছি। কথাবার্তা বলে স্থির হওয়ার আগে পর্যন্ত, দুই কি তিন দিন লাগবে হয়তো, তুমি সেখানে থাকতেই পারো। অসুবিধা নেই তো এতে? এখান থেকে একটু দূরেই যদিও।"

"অসুবিধে কিছু নেই," আমি বলি।

"৫টায় লাইব্রেরি বন্ধ করব", ওশিমা বলে। "সব গুছিয়ে টুছিয়ে, সাড়ে ৫টায় এখান থেকে বেরুতে পারব হয়তো। তোমাকে আমার গাড়িতে চাপিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে এখন কেউ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেই, ছাদও এখনকার মত পাওয়া যাবে।”

“ধন্যবাদ!”

“ওখানে পৌঁছে ধন্যবাদ দেওয়াই ভাল। তুমি যেমনটা ভাবছ, তার সঙ্গে অনেক ফারাক হয়তো।”

রীডিং-রুমে ফিরে ‘পপিজ’টা আবার পড়তে শুরু করলাম। আমি আসলে খুব একটা দ্রুত পড়তে পারি না। সময় নিয়ে একলাইন একলাইন করে এগোনো টাইপ। বাক্যের সুষমাটা উপভোগ করার চেষ্টা করি। বাক্যটা পড়তে ভাল না লাগলে মাঝখানে পড়া থামিয়ে ফেলি। পাঁচটার একটু আগে উপন্যাসটা শেষ অবধি পড়ে শেষ করে, বইয়ের তাকে ফের রেখে দিয়ে, তারপর সোফায় বসে চোখ বুজে, গতরাতের ব্যাপারটা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে থাকি। সাকুরার কথা ভাবি। ওর ঘরটার কথা ভাবি। ও আমাকে যা করে দিল সেটা নিয়ে ভাবি। অনেক কিছুই পালটে গিয়ে, সামনে এগিয়ে চলেছে।

সাড়ে পাঁচটায় আমি কোওমুরা পাঠাগারের গেটের বাইরে ওশিমার বেরোনোর অপেক্ষায় থাকি। ও আমাকে নিয়ে ঘুরে পেছনের গাড়ি দাঁড় করানোর জায়গায় গিয়ে সবুজ স্পোর্টস-কারের হেলপারের সীটে আমাকে বসাল। মাৎসুদা-র রোডস্টার। হুড তুলে দেওয়া আছে। সেই স্মার্ট টু-সীটারের ট্রাঙ্কটা বড্ড ছোট বলে ওতে আমার রুকস্যাক ঢুকবে না, পেছনের র্যাকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেওয়া হল।

“অনেকটা রাস্তা ড্রাইভ করে যেতে হবে, মাঝখানে কোথাও থামিয়ে ভাত খেয়ে নেওয়া যাবে”, ওশিমা বলল। তারপর ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল।

“কতদূর যাব আমরা?”

“কোচি”, ও উত্তর দেয়। “গেছ কখনও?”

আমি কাঁধ ঝাঁকাই। “কতটা দূর?”

“দূর? গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সম্ভবত আড়াই ঘন্টা মত লাগবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাহাড় পেরিয়ে, দক্ষিণে নামতে হবে।"

"অতটা দূর গিয়ে আপনার অসুবিধে হবে না তো?"

"নাহ্, অসুবিধে কী? রাস্তা চলে গেছে এক্কেবারে সোজা, সূর্য ডোবেনি এখনও, ট্যাঙ্ক ভর্তি গ্যাসোলিন রয়েছে।"

আমরা সন্ধ্যে নাগাদ শহর ছেড়ে, তখনকার মত পশ্চিমমুখী হাই-স্পীড করিডরে গিয়ে ঢুকলাম। ও সুকৌশলে লেন পালটে পালটে অন্যান্য গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যেতে থাকলো। বাঁহাতের তালু দিয়ে চটপট গীয়ার চেঞ্জ করছিল। মসৃণভাবে শিফট-আপ, শিফট-ডাউন করছিল। প্রত্যেকবারই ইঞ্জিন চলার আওয়াজ সামান্য পালটে যাচ্ছিল। গীয়ার ফেলে গ্যাস পেডাল মেঝে অবধি পায়ে চেপে নামালে গতি মুহূর্তে ১৪০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

"বিশেষ ভাবে টিউন আপ করা আছে। স্পীড বাড়ালে ক্ষতি নেই। এই ব্যাপারে সাধারণ রোড-স্টারের থেকে আলাদা। তুমি গাড়ির ব্যাপারে উৎসাহী?"

আমি কাঁধ ঝাঁকাই। আমি গাড়ির কোনও কিছুই জানিনা।

"ওশিমা-সান গাড়ি ড্রাইভ করতে ভালবাসেন?"

"ডাক্তার বিপজ্জনক খেলাধুলো বারণ করে দিয়েছেন। তার বদলে আমি তাই গাড়ি চালাই। ওটার অভাব পুষিয়ে দিতে এটা।"

"শরীরে কোনো অসুবিধে আছে?"

"অসুখের নামটা তো বিশাল, সহজ করে বললে এক ধরণের হেমোফিলিয়া।" ওশিমা ভাবলেশহীন মুখে বলে। "হেমোফিলিয়া ব্যাপারটা জানো?"

"মোটামুটি", আমি বলি। বায়োলজি ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল। "একবার রক্ত বেরোতে শুরু করলে থামে না। জিনের কারণে, রক্ত আর জমাট বাঁধে না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ঠিক তাই। হেমোফিলিয়াও নানা ধরণের হয়, আমার যেটা, সে ব্যাটা তুলনায় বেশ বিরল ধরণের। তেমন সিরিয়াস ধরণের কিছু নয়, তবে এক্ষেত্রেও যতটা সম্ভব খেয়াল রাখতে হয় যাতে আঘাত টাঘাত না পাই। একবার রক্ত বেরুতে শুরু করলে তক্ষুণি হাসপাতালে না গিয়ে উপায় নেই। তার চেয়েও খারাপ হল, জগত জুড়ে হাসপাতালে স্টক করা রক্তে নানা রকম সমস্যার কথা শোনা যায় প্রায়ই। এইডস বাঁধিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জীবনের আমি একেবারেই পক্ষপাতি নই। এই কারণে আমি এই শহরে, আলাদা করে রক্তের ব্যাপারে একটা বিশেষ কানেকশন তৈরি করছি। এরজন্য বেড়ানো টেড়ানোও বন্ধ হয়ে গেছে। একটা সময় অন্তর নিয়ম করে হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির হাসপাতালে দেখাতে যাওয়া ছাড়া আর এশহরের বাইরে তেমন যাওয়াই হয় না। এমনিতে ঘোরাঘুরি, ব্যায়াম বা খেলাধুলো, এগুলো যে খুব পছন্দ তা বলা যায় না, কিন্তু আবার খুব খারাপ লাগে, তাও বলব না, কেবল রান্না নিয়ে একটু মুশকিল । ছুরি টুরি নিয়ে রান্নার করার কথা নয়, এটাই দুঃখের।"

"ড্রাইভিং তো বেশ বিপজ্জনক খেলা বলেই মনে হয়", আমি শুধিয়ে বসি।

"বিপদের ধরণটা অন্য। আমি গাড়ি চালাতে চালেতে যত পারি স্পীড তুলি। স্পীড তুলে তারপর অ্যাকসিডেণ্ট করলে, সেটা আঙুলের ডগায় যেন একটু কেটে গেল, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। খুব বেশি রক্তক্ষরণ হলে, বাঁচার জন্য যা দরকার তাতে হেমোফিলিয়ার রুগি আর সুস্থ মানুষের মধ্যে তেমন ফারাক নেই। একই। রক্ত জমাট বাঁধা না বাঁধার মতো জটিল ব্যাপার নিয়ে ভাবনা না ভেবে নিশ্চিন্তে মরা যায়।"

"ও, তাই বুঝি!"

ওশিমা হাসে। "তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অ্যাকসিডেন্ট হওয়া অত সহজ নয়। সেদিক থেকে আমি খুবই সাবধান, অযৌক্তিক কিছু করা আমার স্বভাবে নেই। গাড়িও একেবারে টপ কন্ডিশনে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তাছাড়াও মরার সময়, আমি একা একা চুপচাপ মরতে চাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কারুকে এরমধ্যে জড়িত করে মরে যাওয়াটা, ওশিমা-সানের জীবনের অপশনের মধ্যে নেই।"

"একদম তাই।"

আমরা পথিমধ্যে একটা সার্ভিস-এরিয়ার রেস্তোরাঁয় ঢুকে রাতের খাবার সংগ্রহ করলাম। আমি খেলাম চিকেন আর স্যালাড, ও খেল সীফুড-কারি আর স্যালাড। খালি পেট ভর্তি করার জন্য যেটুকু খাওয়া আর কি। ও হিসেব করে টাকা মিটিয়ে দিল। তারপর আবার গাড়িতে চড়ে বসা। চারপাশ ভালরকম অন্ধকার হয়ে আসছে। পা দিয়ে অ্যাকসেলে চাপ দিলেই স্পীডোমিটারের কাঁটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে।

"গানবাজনা শুনতে আপত্তি আছে?" ওশিমা জিজ্ঞেস করে।

অসুবিধে নেই, আমি জানাই।

ও সিডি-প্লেয়ারের প্লে-বাটন টেপে। ক্লাসিক পিয়ানোর সংগীত শুরু হয়ে যায়। আমি খানিক্ষণ কান পেতে শুনে তারপর মোটামুটি কানটা ওদিকেই রাখলাম। বেঠোফেনও নয়, শুম্যানও নয়। সময়ের দিক থেকে কাছাকাছিই কারো।

"শুবার্ট?" আমি জানতে চাইলাম।

"হ্যাঁ, শুবার্ট", ও উত্তর দেয়। তারপর ঘড়িতে ১০টা বেজে ১০ মিনিটের মতো অবস্থানে স্টিয়ারিং-এর ওপর দুই হাত রেখে একঝলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়। "শুবার্ট তোমার ভাল লাগে?"

আলাদা করে খুব ভাল লাগে এমন নয়, আমি জানাই।

প্রতিক্রিয়ায় ওশিমা সামনে মাথা ঝোঁকায়। "আমি গাড়ি চালাতে চালাতে প্রায়ই শুবার্টের পিয়ানো সোনাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে শুনি। কেন করি বলত?"

"বলতে পারছি না", আমি বলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কারণটা হল, ফ্রান্‌জ শুবার্টের পিয়ানো সোনাটা নিখুঁত ভাবে বাজানোটা পৃথিনীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা। আরও বিশেষ করে এই ডি-মেজরে সোনাটা সম্পর্কে বলতে হয় সেটা। এমন লাফ দিয়ে দিয়ে মোটেই সংলগ্ন নয় এমন সব অংশ বাজাতে হয়, যা খুবই কঠিন। এই কম্পোজিশনের কেবল একটা কি দুটো মুভমেন্ট পৃথক ভাবে তবু খানিকটা ঠিকমতো বাজাতে পারবে এমন পিয়ানিস্ট আছেন। কিন্তু চারটে মুভমেন্টই পরপর, পুরোটা একসঙ্গে মনে রেখে শুনে দেখো, আমার যতটুকু জানা আছে, বেশ সন্তোষজনক পরিবেশন একটাও নেই। আজ অবধি অনেক বিখ্যাত পিয়ানিস্টই এই কম্পোজিশনের চ্যালেঞ্জটা নিয়েছেন, কিন্তু দেখাই গেছে যে ত্রুটি রয়ে গেছে। এখন অবধি একটাও হয়নি যেটা শুনে বলা যায়, 'হ্যাঁ এরকমটা হলে'। কেন বল তো?"

"বলতে পারছি না", আমি বলি।

"কারণ, খোদ কম্পোজিশনটাই ত্রুটিহীন নয়। রোবের্তো শ্যুম্যান শুবার্টের পিয়ানোর উৎকর্ষের কদর করতেন, তা সত্ত্বেও এটা সম্বন্ধে বলেছিলেন 'স্বর্গীয় কিন্তু ক্লান্তিকর'"।

"কম্পোজিশনটাই যদি ত্রুটিহীন না হয়, তবে নামকরা পিয়ানিস্টরা এটা বাজানোর চ্যালেঞ্জ নিতে গেলেন কেন?"

"এটা একটা ভাল প্রশ্ন", ওশিমা বলে। তারপর একটু বিরতি দেয়। সেই সময়টুকু ভরে যায় পিয়ানোর সংগীতে। "আমিও সেটা ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে একটা কথা বলতে পারি। কথাটা হল, একধরণের ত্রুটিযুক্ত কম্পোজিশন, ত্রুটি সত্ত্বেও কোনো কারণে মানুষের মনকে জোরালো ভাবে আকর্ষণ করে—অন্ততপক্ষে একধরণের মানুষের মনকে জোরালো ভাবে আকর্ষণ করে। যেমন কিনা, তুমি সোসেকির 'দ্য মাইনার'-এর প্রতি আকৃষ্ট হ'চ্ছ। 'কোকোরো'† কিংবা 'সানশিরো'-র মতো পরিণত রচনায় যে আকর্ষণ ক্ষমতা নেই, সেটা এতে আছে বলে। তুমি এই সৃষ্টিটাকে খুঁজে বের করেছ। অন্যভাবে বলা যায়, ঐ সৃষ্টিটা তোমাকে খুঁজে বের করেছে। শুবার্টের ডি-মেজরে সোনাটাও একই জিনিস। ওতেও আছে সেই সুতোর টান, যা ওটা

† কোকোরো শব্দের অর্থ হৃদয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছাড়া চলে না এমন মনকে টান দেয়।"

"তাহলে", আমি বলি। "প্রথম প্রশ্নটায় ফিরে যাই, ওশিমা-সান শুবার্টের সোনাটা কেন শোনেন? বিশেষ করে গাড়ি চালানোর সময়?"

"শুবার্টের সোনাটা, বিশেষ করে ডি-মেজরে সোনাটা, ঠিক যেমন আছে তেমনটা অবলীলায় বাজিয়ে দিলে আর আর্ট হবে না। শ্যুম্যান যেটা ইঙ্গিত করছেন, প্যাস্টোরাল সং-এর মতো করে অতিদীর্ঘ হয়ে গেছে, আর টেকনিকালিও খুব সিম্পল। এটা ঠিক যেমন, ঠিক সেই ভাবে বাজিয়ে গেলে স্বাদহীন, প্রাণহীন অ্যান্টিক হয়ে দাঁড়াবে। এইজন্যই পিয়ানিস্টরা নিজের নিজের কারিকুরির নিদর্শন রাখলেন। এটা ওটা লাগালেন। যেমন ধর, দ্যাখো, কীভাবে জোর দিয়ে আর্টিকুলেশন করছে। রুবাতো লাগাচ্ছে। লয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। মেরিহারি জুড়ে দিচ্ছে। এগুলো করে আর ফাঁকগুলো থাকছে না। কিন্তু যথেষ্ট সাবধান না থাকলে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে জিনিসটার মাহাত্ম্যই নষ্ট হয়ে যাবে। আর শুবার্টের সৃষ্ট সংগীত থাকবে না। এই ডি মেজরে সোনাটা যাঁরা বাজিয়েছেন, সেই পিয়ানিস্টরা সব্বাই, বিনা ব্যতিক্রমে, এই দোটানার মধ্যে পড়ে বিপন্ন হয়েছেন"

এবার ও আবার সংগীতে অভিনিবেশ করে। সুরটা গুনগুন করে গাইতে থাকে। তারপর আবার কথা চালিয়ে যায়।

"আমি যে গাড়ি চালাতে চালাতে অধিকাংশ সময় শুবার্ট শুনি, সেটা এই কারণে যে, একটু আগেও যেটা বললাম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনো না কোনো অর্থে ত্রুটিপূর্ণ পারফর্ম্যান্স। উঁচু মানের অথচ ঘনসন্নিবিষ্ট ত্রুটি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জোরালো করে, অভিনিবেশ ও সাবধানতা বাড়িয়ে দেয়। একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ নিখুঁত সংগীত ত্রুটিহীন ভাবে বাজানো হলে, সেটা শুনতে শুনতে যদি গাড়ি চালাই, চোখ বুজে ঐ অবস্থাতেই মরে যাওয়ার ইচ্ছা হবে হয়তো। আমি তাই ডি-মেজরে সোনাটায় কান পেতে, তাতে লোকের পারদর্শিতার সীমাবদ্ধতাটা ধরার চেষ্টা করি। এক ধরণের নিখুঁতত্ব, অসংখ্য ত্রুটির সমাহার ছাড়া রূপ দেওয়া যায় না, এটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুধাবন করা যায়। আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে। কী বলছি বুঝতে পারছ?"

"খানিকটা।"

"কী বিচ্ছিরি ব্যাপার না ?" ওশিমা বলে। "এসব কথা উঠলেই, আমি কেমন স্বপ্নের মধ্যে চলে যাই।"

"তবে, ত্রুটিরও তো, রকমফের আছে, মাত্রাভেদ আছে, তাই না?"

"অবশ্যই।"

"তুলনামূলক অর্থেও বলতে পারেন, আজ পর্যন্ত যতজনের ডি মেজরে সোনাটা শুনেছেন, তার মধ্যে ওশিমা-সানের যেটা শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সেটা কার বাজানো?"

"খুব কঠিন প্রশ্ন", ও বলে।

কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ও ভাবে। গিয়ার ফেলে গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার লেনে সরে গিয়ে কোনো পরিবহন কোম্পানির বৃহদাকার রেফ্রিজারেটর ট্রাককে দ্রুত পাশ কাটিয়ে, গিয়ার তুলে আগের লেনে ফিরে আসে।

"তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইছি না মোটেই, সবুজ রোডস্টার না, যে গাড়িগুলো রাতের হাইস্পীড রাস্তায় চোখে পড়া সবচেয়ে কঠিন, তার একটা। বডিটাও নিচু, আর রঙটাও অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়। বিশেষ করে ট্রেইলারের ড্রাইভিং সীট থেকে দেখতে পাওয়া কঠিন। সতর্ক না থাকলে বেশ বিপজ্জনক। বিশেষ করে টানেলের ভেতর, বুঝলে তো। আসলে স্পোর্টস কারের বডির রঙ লাল হওয়া উচিত। ওটা বেশি চোখে পড়ে। ফেরারি যে অধিকাংশই লাল, সেটা এই কারণেই" ও বলে যায়। "কিন্তু সবুজ আমার পছন্দের রঙ। বিপজ্জনক হলেও সবুজই ভাল। সবুজ বনানির রঙ। আর লাল রক্তের রঙ।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকায়। তারপর আবার সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে সুরটা গুনগুন করতে থাকে।

“সাধারণ ভাবে বললে, পরিবেশনে সংহতি সবচেয়ে বেশি এসেছে সম্ভবত ব্রেনডেল আর অ্যাশকেন্‌জির ক্ষেত্রে। তবে, সত্যি বলতে কি, ওদের বাজানো আমার ব্যক্তিগত ভাবে খুব একটা পছন্দ হয়নি। বলব যে, হৃদয়কে তেমন ভাবে ছুঁতে পারেনি। শুবার্ট হচ্ছে, আমাকে বলতে বললে, প্রতিষ্ঠিত সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ করে লন্ডভন্ড করে দেওয়ার জন্য যে সংগীত। এটাই রোমান্টিসিজমের এসেন্স, এবং সেদিক দিয়ে শুবার্টের সংগীত হচ্ছে রোমান্টিসিজমের মূর্ত প্রতীক।”

আমি শুবার্টের সোনাটা শোনায় মন দিই।

“কীরকম, একঘেঁয়ে লাগছে না?” ও বলে।

“একদমই”, আমি অকপটে বলেই ফেলি।

“শুবার্ট হচ্ছে প্রশিক্ষণ আর চর্চার মাধ্যমে বোঝার জন্য যে সংগীত। আমারও প্রথম শুনতে গিয়ে একঘেঁয়ে লেগেছিল। তোমার বয়েসে এটাই স্বাভাবিক। তবে এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। জগতের নিয়মই হচ্ছে, যা চর্চা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ নয় তাতে লোকে অবিলম্বেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, নিরুৎসাহ হয় না এরকম জিনিস সচরাচর চর্চা ও পরিশ্রমসাপেক্ষই হয়। এখানেও তাই। আমার জীবনে একঘেঁয়েমিতে পীড়িত হওয়ার অবকাশ থাকলেও, নিরুৎসাহ হওয়ার অবকাশ নেই। সচরাচর লোকে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ করতে পারে না।”

“ওশিমা-সান যে একটু আগে নিজেকে বলছিলেন “বিশেষ ধরণের মানুষ”, সেটা কি হেমোফিলিয়ার কথা বলছিলেন?”

“সেটাও আছে”, ও বলে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। কিরকম যেন শয়তানি ভরা হাসি। “তবে, সেটাই শুধু নয়, অন্য কিছুও আছে।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শুবার্টের স্বর্গসুলভ দীর্ঘ সোনাটা শেষ হলে আমরা আর অন্য কোনও সংগীত শুনলাম না। স্বাভাবিক ভাবেই চুপ করে, নৈঃশব্দের সুতো টেনে টেনে যার যার এলোমেলো চিন্তায় ডুবে রইলাম। আমি পরপর আসতে থাকা সাইনপোস্ট দেখতে থাকলাম। জংশনে এসে দক্ষিণে মোড় ঘুরতেই রাস্তায় পড়ল পাহাড়, একটার পর একটা দীর্ঘ টানেল। ওশিমা উদ্বিগ্ন হয়ে গাড়ি পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় মন দিল। রাস্তায় অনেক ধীর গতির বড় গাড়ি, আমরা অজস্র গাড়িকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। বড় গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়, 'হিউ' করে বাতাসে শব্দ হচ্ছিল। ঠিক যেন কোনো আত্মা বেরিয়ে আসার আওয়াজ। আমি মাঝে মাঝে পেছন ফিরে আমার রুকস্যাকটা র্যাকে বাঁধা আছে কিনা দেখে নিচ্ছিলাম।

"আমরা এখন যেখানে যাব, পাহাড়ের একেবারে প্রত্যন্ত ভেতরে, সেটা থাকার জায়গা হিসেবে খুব একটা সুবিধের বলা যাবে না। ওখানে থাকাকালীন তোমার কারো সঙ্গে হয়তো দেখাসাক্ষাতও হবে না, রেডিও, টিভি, টেলিফোন, কিছুই নেই" ওশিমা জানায়। "অসুবিধে হবে না এরকম একটা জায়গায়?"

"না, অসুবিধে হবে না", আমি বলি।

"তুমি কি একা থাকতে অভ্যস্ত?" ওশিমা জিজ্ঞেস করে।

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই সায় দিতে।

"কিন্তু একাকিত্ব বলতেও নানারকম একাকিত্ব হয়, ওখানে সেটা কী ধরণের হবে, তুমি হয়তো আন্দাজই করতে পারছ না।"

"কী ধরণের?"

ওশিমা চশমার ব্রিজটা আঙুলের ডগা দিয়ে ঠেলে দেয়। "কিছুই বলতে পারছি না, সম্ভবত তোমার ওপর নির্ভর করবে সেটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে।"

হাইস্পীড করিডর থেকে নেমে আমরা সাধারণ জাতীয় সড়কে ঢুকলাম। হাইস্পীড করিডর থেকে বেরিয়ে একটু যেতেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাইওয়ের ধার ঘেঁষে একটা জনপদ মত, তাতে কনভিনিয়েন্স স্টোর আছে। ওশিমা গাড়ি থামিয়ে, একার পক্ষে বয়ে আনা যায় না এমন পরিমাণ বাজার বয়ে আনে। সবজি, ফল, বিস্কুট, দুধ, মিনারেল ওয়াটার, টিন ফুড, পাঁউরুটি, প্যাকেটের ইনস্ট্যান্ট ফুড, বেশির ভাগই এমন যা খুব একটা রাঁধতে হবে না, সহজেই খেয়ে নেওয়া যায়। আবারও দামটা ওই দিয়ে দেয়। আমি টাকা বের করতে যেতেই, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বারণ করে।

আমরা আবার গাড়িতে চড়ে বসে, রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে চলি। আমি হেল্পারের সীটে বসে ট্রাঙ্কে আঁটানো যায়নি যেসমস্ত খাদ্যবস্তুর প্যাকেট সেগুলো আগলে আছি। সেই জনপদ ছেড়ে আসতেই রাস্তা এক্কেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। মানুষজন, ঘরবাড়ি নেই, গাড়ি যাতায়াতও কমে এসেছে, রাস্তাও সরু হয়ে এসে যতটুকু চওড়া তাতে মুখোমুখি গাড়ি যাতায়াত করা মুশকিল। তবে ওশিমা আলো জোরালো করে দিয়ে, স্পীড খুব একটা না কমিয়েই সামনে ধেয়ে চলেছে। ব্রেক, অ্যাকসিলারেটারের ব্যবহার হচ্ছে ঘনঘন, গিয়ার সেকেন্ড আর থার্ডের মধ্যে আসছে যাচ্ছে। ওশিমার মুখ ভাবলেশহীন, কোনও অভিব্যক্তি নেই। ওর সমস্ত অভিনিবেশ গাড়ি চালানোয়। ঠোঁট দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখের দৃষ্টি সামনে অন্ধকারের মধ্যে কোনো একটা বিন্দুতে। ডানহাত স্টিয়ারিং-এর ওপর, বাঁহাত অনতিদীর্ঘ শিফট নবের ওপর।

ক্রমে রাস্তা একসময় বাঁদিকটা সমকোণে উঠে পর্বতশিরার মতো হয়ে গেল। পাহাড়ি জলস্রোত যেন নিচের দিকে বয়ে নেমে যাচ্ছে বলে মনে হল। উত্তরোত্তর রাস্তার বাঁকগুলো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে, রাস্তার উপরিতল স্থিতিশীলতার পক্ষের প্রতিকূল হয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির পেছনদিকটা উৎকট আওয়াজ করে পিছলে গেল ক'বার। তবে, আমি আর বিপদ নিয়ে দুর্ভাবনা করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে, এখানে একটা পথ-দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভবত ওর জীবনের অপশনের মধ্যে নেই।

রিস্ট-ওয়াচে দেখাচ্ছে যে ন'টা প্রায় বাজে। জানালা একটু ফাঁক করলেই হিমশীতল বাতাস ঢুকে আসছিল। আশেপাশের শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বদলে গেছে। আমরা পাহাড়ের মধ্যেই আরও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রত্যন্ত অভ্যন্তরে কোথাও যাচ্ছি। রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত পর্বতশিরা থেকে সরে এসে (এটা আমাকে কিঞ্চিত স্বস্তি দিল) বনের মধ্যে প্রবেশ করল। উঁচু উঁচু গাছ আমাদের চারপাশে রহস্যময়ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির আলো গাছ-গাছালির মোটা মোটা গুঁড়ি যেন চেটে দেখছে এইভাবে আলোকিত করে করে এগোচ্ছে। ফুটপাথ বলে আর রাস্তার ধারে তখন কিছু নেই, টায়ার ছোট ছোট পাথরে ঠোক্কর খেলে সেগুলো আবার ছিটকে এসে গাড়ির গায়ে লেগে খটখট করে আওয়াজ হচ্ছে। রুক্ষ অমসৃণ রাস্তার তালে তালে সাসপেনশন নাচতে ব্যস্ত। চাঁদ, তারা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণা কখনো কখনো গাড়ির সামনে কাঁচে এসে পড়ছে।

"এখানে কি প্রায়ই আসেন?" আমি জানতে চাই।

"আগে আসতাম। এখন তো কাজও আছে, এখন আর আগের মতো আসতে পারি না। আমার দাদা সার্ফার, কোচির সমুদ্রের ধারে থাকে। ওখানে ওর সার্ফ-শপ আছে, বোর্ড বানায় ও। কখনো কখনো ও এখানে থাকতে আসে। "তুমি সার্ফিং কর?"

করিনি কখনও, আমি বলি।

"দেখি, সুযোগ হলে, দাদার কাছে শিখতে পেলে ভালই হবে। খুব দক্ষ সার্ফার", ওশিমা বলে। "দেখলেই বুঝতে পারবে বলে মনে হয়, আমার থেকে একেবারেই অন্যরকম। বড়সড়, কম কথা বলে, নিরুত্তাপ মানুষ, রোদে পোড়া চেহারা, বীয়ার খেতে খুব ভালবাসে, শুবার্ট আর ওয়াগনারের মধ্যে কোনও তফাৎ করতে পারবে না শুনে। কিন্তু আমাদের দুজনের মেলে ভাল।"

সেই পাহাড়ি রাস্তায় আরো এগিয়ে, কয়েকবার গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে এসে, শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। ওশিমা গাড়ি থামিয়ে, ইঞ্জিন চালু রেখে বেরিয়ে এসে, তারের জাল লাগানো ধাতব গেটের মতো একটা জিনিসের তালা খুলে, ঠেলে গেট খুলল। তারপর গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে, আবার খানিক সেই পাক খাওয়া বিচ্ছিরি রাস্তায় এগোল। অবশেষে চোখে পড়ল একটু খোলামেলা একটা জায়গা, রাস্তা সেখানে এসে শেষ হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওশিমা গাড়ি থামিয়ে, সীটে বসেই বড় করে একবার শ্বাস ফেলে, দুহাত দিয়ে সামনের চুল পেছনে ঠেলে দিয়ে, তারপর চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল। পার্কিং ব্রেক টানল।

ইঞ্জিনটা থামতেই, ভারি নৈঃশব্দ নেমে এল। কুলিং-ফ্যানটা ঘুরছে, অতিরিক্ত ব্যবহারে গরম হয়ে যাওয়া ইঞ্জিন বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে, একটা গুঞ্জনের মতো আওয়াজ হচ্ছে। বনেট থেকে হালকা বাষ্প বেরোতে দেখা যাছে। কানে আসছে খুব কাছেই যেন ঝর্ণা বয়ে যাওয়ার আওয়াজ। মাথার ওপরে উঁচুতে কোথাও মাঝেমাঝে বাতাসের বয়ে যাওয়ার আভাস দিয়ে আওয়াজ হচ্ছে। আমি দরজা খুলে বাইরে নেমে এলাম। বাতাসে জায়গায় জায়গায় হিমেল স্পর্শ মিশে আছে। টি-শার্টের ওপরে পরা ইয়টিং জ্যাকেটের জিপারটা গলা অবধি টেনে দিলাম।

সামনেই দেখছি ছোট একটা বাড়ি। অনেকটা পাহাড়ি কুটিরের মত, অত অন্ধকারে খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে না। অরণ্যের পশ্চাদপটে কেবল ঘন কালো একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে। ওশিমা গাড়ির আলো জ্বালিয়ে রেখে, ছোট একটা পকেট টর্চ হাতে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে, পর্চের সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে, পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে, দেশলাই জ্বেলে সেই আগুনে ল্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করল। দরজার সামনে পর্চে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পটা ধরে আমার ডাক দিল। "আমাদের গৃহে স্বাগত জানাচ্ছি"। ওকে দেখাচ্ছিল যেন প্রাচীন কাহিনীর কোনো ছবির অংশের মত।

আমি পর্চের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। ওশিমা সীলিং থেকে নেমে আসা ল্যাম্পে আগুন দিল।

বাড়িতে বাক্সের মতো কেবল বড় একটা ঘর। কোণের দিকে ছোট একটা বেড। ডাইনিং টেবিল আছে, দুটো কাঠের তৈরি চেয়ার। পুরনো একটা সোফা। রোদে পুড়ে কার্পেটটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির অব্যবহার্য আসবাব, বেশ কিছু, যেখানে পেরেছে জড়ো করে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে। পুরু তক্তা একটার উপর একটা চাপিয়ে ব্লক ব্লক করে বুকশেলফ বানানো হয়েছে, সার দিয়ে অনেক বই রয়েছে তাতে। বইগুলোর মলাট জীর্ণ হয়ে এসেছে, ভালরকম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পড়া হয়েছে। জামাকাপড় রাখার জন্য পুরোনো ধাঁচের সিন্দুক। সাধারণ একটা রান্নার জায়গা। কাউন্টার আছে, ছোট একটা গ্যাস ওভেন, আর সিঙ্ক। কিন্তু কোনও জলের লাইন নেই। তার বদলে রাখা আছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা পাত্র, জল ধরে রাখার জন্য। প্যান, কেটলি, সব সার দিয়ে তাকে রাখা আছে। দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রাই-প্যান। ঘরের ঠিক মাঝখানে লোহার কালো কাঠ জ্বালানোর স্টোভ।

"দাদা প্রায় নিজের হাতেই এই কেবিনটা বানিয়েছে। এটা ছিল আসলে একটা কাঠুরিয়াদের ছাউনি, সেটারই বড় রকমের সংস্কারসাধন করেছে। উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে বেশ। আমি তখন তো ছোট, আঘাত টাঘাত বাঁচিয়ে যেটুকু পারি সেটুকু সাহায্য করেছি। গর্ব করে বলছি না, রীতিমত মৌলিকত্ব আছে জিনিসটার। একটু আগেই বলেছি, ইলেকট্রিসিটি পর্যন্ত নেই। জলের লাইন নেই। এমনকি টয়লেটও নেই। সভ্যতার উন্নত নিদর্শন হিসেবে কেবল প্রোপেন গ্যাসটুকু।"

ওশিমা কেটলিটা হাতে নিয়ে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ভেতরটা মোটামুটি ধুয়ে নিয়ে জল ফোটাতে বসাল।

"এই পাহাড়টা ছিল আমার ঠাকুর্দার সম্পত্তি। ঠাকুর্দা ছিলেন কোচির একজন বেশ সম্পন্ন লোক, অনেক জমি ছিল, বহু সম্পত্তি। বছর দশেক আগে উনি গত হয়েছেন, দাদা আর আমি উত্তরাধিকারসূত্রে এই পাহাড়ি বনটার মালিকানা পেয়েছি। প্রায় পুরো একটা পাহাড়। অন্যান্য আত্মীয়দের কারুরই এরকম একটা যায়গার প্রয়োজন নেই। দুর্গম পান্ডববর্জিত জায়গা, তার ওপরে সম্পত্তির দামও খুব একটা কিছু নয়। পাহাড়ি বন হিসেবে কাজে লাগাতে গেলে লোকলস্কর লাগিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তাতে অনেক খরচও।"

আমি জানালার পর্দা সরিয়ে তাকালাম। কিন্তু সামনে গভীর অন্ধকার দেওয়ালের মতো প্রসারিত হয়ে আছে।

"আমি যখন ঠিক তোমার বয়েসী", ওশিমা পটের মধ্যে ক্যামোমিল টী-ব্যাগ ডোবাতে ডোবাতে বলল। "অনেকবারই এখানে এসে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একা একা কাটিয়ে গেছি। সেই সময়ে কারো সঙ্গে দেখাও হয়নি, কারো সঙ্গে কথাও হয়নি। দাদা প্রায় জোর করেই এটা করাতো। আমার যে অসুখটা, ওটা থাকলে সাধারণত এরকম করতে বলে না। এরকম একটা জায়গায় একা একা থাকতে হলে, বিপদ হতে পারে। কিন্তু দাদার সেসব নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না।"

কাউন্টারে এসে ও জল ফুটে ওঠার অপেক্ষা করতে থাকল।

"দাদা আমাকে কঠোর হয়ে কিছু শেখানো বা ট্রেনিং দেওয়ার কথা ভেবে এটা করেনি। ওঁর বিশ্বাস ছিল যে আমার এটা করা দরকার। তবে, এতে ভালই হয়েছিল। এখানে কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা বলেই সাব্যস্ত হয়েছিল। অনেক বই পড়তে পেরেছিলাম, একা একা সময় নিয়ে অনেক কিছু ভাবতে পেরেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, সেই থেকেই আমি অধিকাংশ সময়েই স্কুলে যেতাম না। আমার যেমন স্কুল পছন্দ ছিল না, স্কুলেরও তেমন আমাকে পছন্দ হয়নি। কী বলব, আমি একটু অন্যদের থেকে পৃথক ছিলাম তো। জুনিয়র হাইস্কুল পর্যায়টা পর্যন্ত খানিকটা দাক্ষিণ্য দেখিয়েছিল, তারপর থেকে আমি একেবারে বিচ্ছিন্ন। তোমার অবস্থাটা এখন যেমন। বলেছি তোমায় কখনো?"

আমি মাথা নাড়ি। "এইজন্যই কি ওশিমা-সান আমার প্রতি এতটা সদয়?"

"সেটাও আছে", ও বলে। তারপর একটু সময় নেয়। "তবে, শুধু সেই কারণেই নয়।"

ওশিমা একটা চায়ের কাপ আমার দিকে এগিয়ে দেয়, নিজেও খায়। এতটা লম্বা জার্নির পরে গরম ক্যামোমিল চা উত্তেজিত স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করে।

ওশিমা ঘড়ির দিকে তাকায়। "আমাকে এবার উঠতে হবে, তাই মোটামুটি বুঝিয়ে দিই। কাছেই পরিষ্কার ঝর্ণা আছে, জল ওখান থেকে তুলে এনে ব্যবহার করলেই হবে। ওখান থেকেই বেরিয়ে আসছে বলে ওই জলই খেতে পার সরাসরি। ওই মিনারেল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওয়াটারের থেকে অনেক ভাল। পেছন দিকে জ্বালানি কাঠ জড়ো করা আছে, ঠান্ডা পড়লে স্টোভ ব্যবহার করাই ভাল। এখানে কিন্তু ঠান্ডা পড়ে। আমি কখনো কখনো আগস্ট মাসেও স্টোভ ধরিয়েছি। রান্নার স্টোভ হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ কিছু রান্নাও করতে পার। এছাড়া নানা কাজে দরকারে লাগার মতো যন্ত্রপাতি পেছনের টুলশেডে আছে, প্রয়োজন মত কোনটা লাগবে খুঁজে নিও। সিন্দুকের মধ্যে দাদার জামাকাপড় রাখা আছে, খুশিমত ব্যবহার করতে পার। নিজের জামাকাপড় কেউ পরেছে বলে বিচলিত হওয়ার মত খুঁতখুঁতে লোক সে নয়।"

ওশিমা দুহাত কোমরে রেখে, শেডের ভেতরটায় ঘুরে ঘুরে চোখ বোলায়।

"দেখলেই বোঝা যায়, কোনোরকম রোম্যান্টিক উদ্দেশ্যে তৈরি শেড এটা নয়। তবে নেহাতই থাকার জন্য, ভেবে দেখলে, তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আর, একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিই, বনের খুব ভেতরে না ঢোকাই ভাল। খুবই গভীর বন, রাস্তাও তেমন ভাল নেই। বনে ঢুকলে পরে সবসময় নজরের এককোণে এই শেডটা যেন থাকে, কেমন। তার চেয়েও ভেতরে ঢুকলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর একবার রাস্তা হারালে আগের জায়গায় ফিরে আসা কঠিন। আমারও একবার ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখান থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরত্বে অর্দ্ধেকদিন ঘুরে ঘুরে হেঁটে মরেছি। জাপান খুব ছোট্ট দেশ, ভাবছ হয়তো, বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু একবার পথ হারালে, তখন কিন্তু এই গভীর অরণ্য আর শেষ হবে না।"

ওর সাবধানবাণী আমি মাথায় ঢুকিয়ে নিলাম।

"এছাড়া, তেমন জরুরি পরিস্থিতি না হলে, পাহাড় থেকে নিচে নেমে যাওয়ার কথা না ভাবাই ভাল। লোকজনের বসতি এখান থেকে বড্ড দূর। এখানেই অপেক্ষে কোরো, আমিই আসব দেখা করতে। হয়তো দুই কি তিন দিনের মধ্যেই আসতে পারব বলে মনে হয়, সেই ক'দিনের মত খাবারের যোগাড় আছে। ভাল কথা, মোবাইল ফোন আছে সঙ্গে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আছে, আমি বললাম। আঙুল দিয়ে রুকস্যাকের দিকে দেখালাম।

ও স্মিত হাসল।

“ওটা ওখানেই রেখে দেওয়া ভাল। এখানে মোবাইল ব্যবহার করা যায় না। সিগনাল একেবারেই আসে না। এবং অবশ্যই রেডিও শোনাও যাবে না। এককথায়—তুমি এখন জগত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন। অনেক বই পড়ার কথা এখন।”

হঠাৎ করেই মনে পড়ে গিয়ে, আমি একটা প্র্যাকটিকাল প্রশ্ন করি। “টয়লেট তো নেই, প্রাতঃকৃত্য কোথায় গিয়ে সারবো?”

ওশিমা ওর দুই হাত অনেকটা প্রসারিত করে। “এই বিশাল গভীর অরণ্য এখন পুরোটা তোমার। টয়লেট কোথায় সারবে সেটা নিজে ঠিক করে নেওয়াই ভাল নয় কি?”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৪

নাকাতা টানা কয়েকদিন সেই বেড়া দিয়ে ঘেরা ফাঁকা জায়গাটায় যাতায়াত করল। একদিন শুধু সকাল থেকেই তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল, সেদিন বাড়ি বসে মামুলি কাঠের কাজ করল, অন্যান্য দিন সারাদিন ধরে সেই ফাঁকা জমিতে ঘাসঝোপের মধ্যে বসে, হারিয়ে যাওয়া তিনরঙা বেড়ালটার দেখা পাওয়া যায় কিনা, নতুবা অদ্ভুত টুপি পরা লোকটা এসে হাজির হয় কিনা, সেই অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

সূর্য অস্ত গেলে নাকাতা, যারা বেড়াল খোঁজার কাজটা দিয়েছে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে, সেদিনকার সন্ধানকার্যের খুঁটিনাটির একটা মৌখিক রিপোর্ট দিত—হারিয়ে যাওয়া বেড়ালটাকে খুঁজে বের করার জন্য, কী ধরণের সংবাদ পেয়ে, কোথায় কোথায় গিয়ে, কী কী করেছে। এই নিয়োগকারি তখন সেদিনের পুরস্কার হিসেবে প্রায় রোজই তিন হাজার ইয়েন করে দিয়েছে। সেটাই হল নাকাতার দর, একদিনের কাজের জন্য। কেউ যে দরটা বেঁধে দিয়েছিল, তা নয়, মুখেমুখেই বেড়াল খোঁজার ওস্তাদ নাকাতার খ্যাতি পুরো অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, আর একই সঙ্গে দিনে ৩০০০ ইয়েন দক্ষিণা কোথাও একটা কীভাবে যেন ফিক্সড হয়ে গিয়েছিল। তবে কিনা, শুধু টাকা নয়, অবশ্যই জিনিসও কিছু সঙ্গে। খাবার জিনিস হতে পারে, পরিধেয় হতে পারে। তারপর সত্যি সত্যি বেড়াল খুঁজে পেলে, সাফল্যের দক্ষিণা হিসেবে দশহাজার ইয়েন নাকাতার হাতে দিতে হয়।

সবসময়ই যে এরকম খোঁজার কাজ থাকে তো তো নয়, মাস গেলে তেমন বলার মত উপার্জন হত না মোটেই, নাগরিক পরিষেবার খরচ মা-বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকাপয়সা (মোটেই খুব বেশি কিছু নয়) আর সামান্য সঞ্চয় থেকে ভাইদের মধ্যে বড় জন দিয়ে দিত, তার ওপরেই ছিল ভার, আর পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জীবনধারণের জন্য ভাতা আসত। এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাতার টাকায় বিশেষ টানাটানি ছাড়াই নাকাতার ভরণপোষণ হয়ে যেত। তাই বেড়াল খুঁজে দিয়ে পাওয়া দক্ষিণায় একেবারে ইচ্ছেমত খরচ করার মতো টাকা হাতে থাকত, নিজের পক্ষে এটা বেশ সন্তোষজনক রকম বলেই নাকাতা গণ্য করত (প্রকৃতপক্ষে, মাঝেমাঝে ঈল্ মাছ খাওয়া ছাড়া এই টাকা খরচের অন্য উপায় সে বের করে উঠতে পারত না)। বেঁচে যাওয়া টাকা সে ঘরের মাদুরের নিচে লুকিয়ে রাখত। লিখতে পড়তে জানে না, তাই আর নাকাতার ব্যাংকে কি পোস্ট অফিসে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। ওসব জায়গায়, যাই করতে যাও না কেন, ফর্মে নাম, ঠিকানা লিখতে হবে।

নাকাতা যে বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারে, এটা তার একটা নিজস্ব গোপন ব্যাপার। বেড়ালের সঙ্গে কথাবার্তা যে চালিয়ে যেতে পারে, বেড়ালদের বাদ দিলে, এটা জানত শুধু নাকাতা নিজে। অন্য কারুকে এসব কথা বললে, ভাববে মাথাটা একেবারে বিগড়েছে। মাথাটা যে ভাল নয় সে তো অবশ্যই সর্বজনবিদিত, তবে কিনা, মাথাটা ভাল নয় আর মাথাটা বিগড়েছে, এদুটো আবার আলাদা আলাদা সমস্যা।

নাকাতা হয়তো রাস্তার ধারের কোথাওকার একটা বেড়ালের সঙ্গে বাতচিত করছে, লোক পাশে দিয়ে চলে যেত, কেউই দেখেও আলাদা করে খেয়ালই করত না। যেন মানুষের সঙ্গে কথা বলছে এইভাবে কোনো প্রাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুড়োমানুষ কিছু বলে যাচ্ছে, এ এমন কিছু বিরল দৃশ্য নয়। সকলে যখন বলাবলি করত, 'বেড়ালদের চালচলন, কী চিন্তা করে ওরা, সেসব নাকাতা-সান কী করে এত ভাল বুঝতে পারেন কে জানে, একেবারে যেন বেড়ালদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তাই না', নাকাতা তখন কিছু না বলে কেবল মৃদু মৃদু হাসত। নাকাতা দায়িত্বশীল, অত্যন্ত ভদ্র, সদা হাসিমুখ, এই কারণে পাড়ার বৌ ঝি-দের মধ্যে তার খুব সুখ্যাতি। চেহারাপত্রও যে খুবই ছিমছাম, সুন্দর, সেটা ছিল সুখ্যাতির কারনগুলোর মধ্যে একটা। এছাড়াও কারণ ছিল, গরীব হলেও নাকাতা খুব পছন্দ করত স্নান করতে, কাপড়জামা ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে, তার ওপর বেড়াল ধরে দেওয়ার কাজ যারা দিত তাদের থেকে দক্ষিণা হিসেবে নগদ টাকা ছাড়াও অব্যবহৃত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একেবারে ব্র্যান্ড-নিউ পোশাকও পেত বহু ক্ষেত্রে। জ্যাক নিকোলাস মার্ক লাগানো স্যালমন-পিংক একটা গলফার শার্টে হয়তো নাকাতাকে তেমন মানাতো না, কিন্তু সেই নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা ছিল না।

সে'বার কাজটা যিনি দিয়েছিলেন সেই কোইজুমি-সানের স্ত্রীর কাছে গিয়ে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, থেমে থেমে একেবারে বিশদে পরিস্থিতির রিপোর্ট দিল নাকাতা।

“গোমার ব্যাপারে বলছিলাম, শেষপর্যন্ত একটা খবর এসেছে। নাকামুরা-সান বলে একজন, নি-চো-মে এলাকায় যে বেড়ায় ঘেরা বড় একটা ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে কয়েকদিন আগে গোমার মতো এক তিনরঙা বেড়ালের দেখা পেয়েছিল বলে শুনলাম। এখান থেকে যেতে মাঝখানে শুধু দুটো বড় রাস্তা পড়ে, বয়েস, কোট, গলার বক্‌লসের রকম, সব গোমার মতই। নাকাতা ভাবছে, এখানকার একটা ফাঁকা জমিতে টানা নজর রেখে দেখা যাক তো। নাকাতা দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে আছে। না না, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। নাকাতার তো এমনিতে আর কোনও কাজ নেই, কেবল জোরে বৃষ্টি না পড়লেই হল, আর কোনও অসুবিধা নেই। কেবল আপনার যদি মনে হয়,‘আর নজর রাখার দরকার নেই’, সেটা তাহলে নাকাতাকে বলে দেবেন। সেক্ষেত্রে নাকাতা তক্ষুণি নজর রাখা বন্ধ করে দেবে।”

নাকামুরা-সান যে কোনও লোক নয়, ডোরাকাটা বেড়াল, সেটা উহ্য রাখল। এসব ফাঁস করে দিলে জটিলতা বেড়ে যায়।

কোইজুমি-সানের স্ত্রী নাকাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল। ছোট ছোট দুই মেয়ে, অত আদরের তিনরঙা বেড়ালটা হঠাৎ করেই কোথাও উধাও হয়ে গিয়ে থেকে ভয়ানক দমে রয়েছে। খুব একটা খেতেও চাইছে না। “বেড়াল, এভাবেই হুট করে উধাও হয়ে যায়”, বলে সেরে ফেলা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ ওনার স্ত্রীর ঘুরে ঘুরে বেড়াল খোঁজার মত অবসর নেই। মাত্র তিন হাজার ইয়েনে প্রত্যেকদিন যথাসাধ্য খুঁজে দেখার মতো লোক পেয়ে যাওয়া সত্যি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সৌভাগ্যের ব্যাপার। অদ্ভুত ধরণের বুড়ো, কথাবার্তাও কেমন যেন, তবে বেড়াল খোঁজার ব্যাপারে উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন, দেখে মনে হয় না খারাপ লোক। সত্যি কথা বলতে কী, এভাবে বলাটা ঠিক নয় হয়তো, লোক ঠকাবার ফন্দি করার মত বলে মনে হয় না। মহিলা খামে ভরা সেই দিনের ফী ওর হাতে দিয়ে, তখন তখন নামানো ফ্রাইড রাইস আর মিষ্টি আলুর তরকারি, একসঙ্গে টাপারওয়্যারে ভরে ওকে দিলেন। নাকাতা মাথা ঝুঁকিয়ে টাপারওয়্যারটা নিয়ে, গন্ধটা একঝলক নাকে নিয়ে তারপর ধন্যবাদ জানাল। "অনেক ধন্যবাদ, মিষ্টি আলু আমার পছন্দের জিনিস।"

"খেয়ে ভাল লাগলে হয়", কোইজুমি-সান বললেন।

ফাঁকা জমির ওপর নজর রাখতে রাখতে একসপ্তাহ কেটে গেল। এরমধ্যে নাকাতা ওখানে ওনেক বেড়াল দেখতে পেল। ঘন বাদামি, অর্থাৎ চায়ের রঙের ডোরাকাটা বেড়াল কাওয়ামুরা রোজ এসে নাকাতার পাশে হাজির হয়ে ঘনিষ্ট ভাবে কথাবার্তা বলত। নাকাতাও প্রত্যাভিবাদন করত। আবহাওয়া নিয়ে কথা বলত, শহরের পৌর কর্তৃপক্ষের থেকে পাওয়া ভাতার কথা বলত। কিন্তু কাওয়ামুরা যা বলত যথারীতি নাকাতা তার সবটা বুঝতো না।

"ফুটপাথে আটকে গেলে কাওয়ারার মুশকিল", কাওয়ামুরা বলে। মনে হল কোনোভাবে ও নাকাতাকে কিছু একটা জানাতে চাইছে। কিন্তু নাকাতা কিছুতেই পরিষ্কার বুঝতে পারছে না, কী সেটা। অর্থ বুঝতে পারছি না ভাল করে, অকপটে বলে নাকাতা।

কিঞ্চিত বিপন্ন মুখ করে, কাওয়ামুরা সেই একই কথা (হয়তো) ভাষাটা পালটে অন্যভাবে বলল। "কাওয়ারা চিৎকার করে বাঁধা যে।"

কিন্তু নাকাতা সেটা আরোই বুঝতে পারল না।

নাকাতার মনে হল, এখানে মিমি এলে ভাল হত তো। মিমি হলে কাওয়ামুরার গালে সপাটে এক থাপ্পড় মেরে কথাটাকে নির্ঘাত বোঝার পক্ষে সহজ করে তুলত। তারপর মোদ্দা কথাটা ঠিকমতো অর্থ করে বলে দিত। খুব বুদ্ধিমতি বেড়াল। কিন্তু মিমি ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে মাঠেঘাটে দেখা দেবে না। অন্য বেড়ালের থেকে তার গায়ে ডাঁশ চলে আসবে এটা তার ভয়ানক অপছন্দ।

নাকাতা এখন খানিক্ষণ কী কী বোঝা যাচ্ছে না তার হিসেবে করুক, কাওয়ামুরা স্মিত হেসে প্রস্থান করল। অন্য বেড়ালরা এক এক করে এসে এসে চেহারা দেখিয়ে গেল। প্রথমটায় তারা নাকাতাকে সাবধানে দূর থেকে প্রকৃতই বিরক্ত চোখে দেখছিল বটে, কিন্তু ও ওখানে ঠায় বসে থাকা ছাড়া কিছু করবে না বুঝে, যেন ঠিক করল যে এই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। নাকাতা চিরকালই বেড়ালদের সঙ্গে খুবই ভদ্রভাবে আলাপ শুরু করে এসেছে। অভিবাদন করে, নিজের নাম, পরিচয় বলে নিয়ে। কিন্তু অধিকাংশ বেড়াল ওকে অগ্রাহ্য করত, কোনো উত্তরই করতো না। যেন দেখেওনি, শুনতেও পায়নি। এখানে যেসব বেড়াল ছিল, তারা এরকম ভাণ করায় বিশেষরকম দক্ষ ছিল। নির্ঘাত এযাবৎ মানুষের হাতে এমন ভয়ানক কষ্ট পেতে হয়েছে যে তাতেই এরকম, নাকাতা ভেবে নিল। কোনোভাবেই তাই নাকাতা ওদের এই অসামাজিক আচরণে দোষ ধরে উঠতে পারল না। যত যা-ই হোক, সে নিজে বেড়ালদের সমাজে কোনোমতেই বহিরাগত ছাড়া কিছু নয়। ওদের থেকে কিছু দাবি করার মতো অবস্থানে সে নেই। তবে, ওদের মধ্যে কেবল একজন জোরালো রকম কৌতূহলী বেড়াল নাকাতাকে মামুলি অভিবাদন করে সাড়া দিল। "দাদা দেখছি কথা বলেন!" কানছেঁড়া সাদাকালো ছোপ ছোপ বেড়ালটা, একটু ইতস্তত করে, তারপর চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে। কথা বলার ধরণটা কেমন সোজাসাপটা বটে, কিন্তু স্বভাবটা মনে হয় খারাপ নয়।

"তা, একটু আধটু", নাকাতা বলে।

"একটু হলেও, সে তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, ঠিক কিনা?" ছোপ ছোপ বেড়ালটা বলে।

"আমার নাম নাকাতা", নাকাতা নিজের পরিচয় দেয়। "যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা?"

"ওসব কিছু নেই", ছোপ ছোপ বিনা ভণিতায় জানায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ও-ও-কা-ও-য়া সান নামটা কেমন? ওই নামে ডাকলে আপনার আপত্তি আছে?"

"যা খুশি, ভালবেসে ডাকলেই হল।"

"তাহলে তাই রইল, ওওকাওয়া-সান" নাকাতা বলল। "এই যে এভাবে দেখা হল, সেই উপলক্ষ্যে একটু সার্ডিনের শুঁটকি হয়ে যাবে নাকি?"

"বাহ! সার্ডিনের শুঁটকি তো আমাদের খুব প্রিয় জিনিস।"

নাকাতা ব্যাগের ভেতর থেকে সারান-র‍্যাপে মোড়া সার্ডিনের শুঁটকি বের করে, ওওকাওয়াকে দিল। নাকাতা সবসময় ব্যাগের ভেতর সার্ডিনের শুঁটকি রেডি রাখত। ওওকাওয়া প্রকৃতই তৃপ্তি সহকারে চমৎকার খেয়ে নিল। মুড়ো থেকে ল্যাজা সবটা চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। তারপর মুখটুখ পরিষ্কার করে নিল।

"কী বলব", ওওকাওয়া বলে। "খুবই বাধিত করলেন। অনুমতি করলে, কোথাও একটু চেটে দিতে পারি, দেব?"

"থাক, মুখে যে বললেন, নাকাতা খুবই খুশি হয়েছে, ঠিক এখনই না চেটে দিলেও হবে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইয়ে, আসল কথাটা বলি, ওওকাওয়া-সান, এই বেড়ালটির বাড়ির অনুরোধে নাকাতা একে খুঁজছে। তিনরঙা মাদী বেড়াল, নাম হচ্ছে, গোমা।"

নাকাতা ব্যাগের ভেতর থেকে গোমার রঙিন-ফোটো বের করে ওওকাওয়াকে দেখাল।

"এই বেড়ালটিকে এই ফাঁকা জায়গায় দেখা গেছে বলে একজায়গা থেকে আমি খবর পেয়েছি। তাই নাকাতা কয়েকদিন ধরেই এখানে বসে গোমার দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। ওওকাওয়া-সান কি বাই চানস কখনো গোমার দেখা পেয়েছেন?"

ওওকাওয়া সেই ছবি একঝলক দেখেই, তক্ষুণি মুখটা ভয়ানক কালো করে ফেলল। দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ল, ক'বার চোখ পিটপিট করে নিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ব্যাপার হচ্ছে, আপনার থেকে এভাবে সার্ডিনের শুঁটকি পেয়ে থেকে, খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি। মিথ্যে বলছি না। কিন্তু এই ব্যাপারে কথা বলতে পারছি না। বললেই ঝামেলা হবে।"

নাকাতা তো একথা শুনে অবাক। "বললেই ঝামেলা হবে?"

"খুব বিপজ্জনক, লোকটা। খতরনাক। খারাপ কথা বলব না, এই বেড়ালটার কথা একেবারে ভুলে যাওয়াই ভাল। আর আপনি, পারলে, এদিকে আর না ঘেঁষাই ভাল। এ আমার একেবারে অন্তর থেকে বলছি, সাবধান করতে। দুঃখিত যে কোনো কাজেই লাগতে পারছি না, এই সাবধানবাণী ঐ সার্ডিন শুঁটকির জন্য ধন্যবাদ জানাতে বলেই ভেবে নিন প্লীজ।"

নাকাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ব্যাগের ভেতর থেকে থার্মোফ্লাস্ক বের করে গরম হোজি-চা ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে খেল। বিপজ্জনক, ওওকাওয়া-সান যা বলল। কিন্তু এই জায়গাটার সঙ্গে জড়িত বিপদ যে কী হতে পারে, কিছুই মাথায় এল না। সে নিজে তো নেহাতই হারিয়ে যাওয়া তিনরঙা বেড়ালটাকে খুঁজছে। তার মধ্যে বিপদের কী আছে? কাওয়ামুরা-সান যে বিদঘুটে টুপি পরা 'বেড়াল ধরা লোক' একজনের কথা বলছিল, সেই কি বিপদ নাকি? কিন্তু নাকাতা তো মানুষ। বেড়াল নয়। মানুষেরও বেড়ালধরাকে ভয় পেতে হবে এর কোনও কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু জগতে এমন বহু জিনিস আছে যা নাকাতা কল্পনায়ও আনতে পারবে না, আর তাতে নাকাতার বুদ্ধির অগম্য কারণ পর্বতপ্রমাণ। তাই নাকাতাও আর ভাবল না। ব্রেনের ধারণক্ষমতা কম, যতটুকুই ভাবতে যাও, মাথায় কষ্ট হওয়া ছাড়া কিছু হয়না। নাকাতা যত্ন করে হোজি-চা খাওয়া শেষ করে, থার্মোফ্লাস্কের ঢাকনা এঁটে আবার ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলল।

সেই ঘাসজমিতে ওওকাওয়া চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ আর একটাও বেড়াল দেখা গেল না। প্রজাপতিরা শুধু শান্তভাবে ঘাসের ওপর ওড়াউড়ি করছিল। চড়ুইরা ঝাঁক বেঁধে এসে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে, তারপর আবার একসঙ্গে জড়ো হয়ে চলে গেল। কয়েকবারই ঘুমঘুম পেয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিল, প্রত্যেকবারই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চটকা ভেঙে চোখ খুলেও ফেলছিল। আকাশে সূর্যের অবস্থান থেকে সময়টা মোটামুটি বুঝতে পারছিল।

সন্ধের কাছে এসে কুকুরটা নাকাতার সামনে এসে আবির্ভূত হল। ঘাসঝোপের ফাঁক থেকে হঠাৎ করেই কুকুরটাকে দেখা গেল। ধীরপায়ে কোনো শব্দ না করে এসে দেখা দিল। বিশাল একটা কালো কুকুর। নাকাতা যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে চোখ তুলে দেখলে, কুকুরের চেয়েও বরং বাছুরের মতো দেখাচ্ছিল। পা'গুলো লম্বা, লোম ছোট, পেশিগুলো ইস্পাতের মতো, স্ফীত হয়ে রয়েছে। ছুরির ডগার মতো তীক্ষ্ণ ছুঁচলো কান, গলায় বকলস নেই। কোনটা কী কুকুর, নাকাতা ভাল জানে না। কিন্তু এটা যে হিংস্র—নিদেনপক্ষে প্রয়োজন পড়লেই হিংস্র হয়ে উঠবে—এরকম স্বভাবের কুকুর, তা একঝলক দেখেই বুঝে গেছিল। মিলিটারিতে যেসব কুকুর ব্যবহার হয়, সেরকম কুকুর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কিন্তু ভাবলেশহীন, মুখের ধারের মাংসপেশি কেমন ওপর দিকে তোলা, সাদা ধারালো শ্বদন্ত বেরিয়ে আছে। দাঁতে রক্তের লাল ছোপ। ভাল করে দেখলে, দেখা যায়, মুখের পাশে মাংসের কুচির মত লেগে আছে। টকটকে লাল জিভ, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের শিখার মত দেখাচ্ছে। কুকুরটার দুটো চোখই সোজা নাকাতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। অনেকটা সময় কুকুরটা কিচ্ছু না বলে এতটুকু নড়ল চড়ল না। নাকাতাও একই রকম নিশ্চুপ। নাকাতা কুকুরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। আলাপ চালিয়ে যেতে পারে এমন প্রাণী কেবল বেড়ালরা। কুকুরটার চোখ যেন জলাভূমির জলে তৈরি কাঁচের বল, ঠান্ডা, স্থির।

নাকাতা শব্দ না করে ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। নাকাতার তো ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। নিজে যে এখন বিপদের মুখোমুখি হয়েছে সেটা অবশ্যই বুঝতে পারছে। ওখানে উপস্থিত প্রাণীটি (কেন তা জানা নেই) যে বন্ধুসুলভ নয় এবং আক্রমণাত্মক তা মোটের উপর বুঝতে পারছে। কিন্তু এহেন বিপদ যে নাকাতার নিজেরই শরীরের ওপর সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়বে, সেরকম দেখাচ্ছে না। মৃত্যু ব্যাপারটা আসলে নাকাতার আন্দাজের বাইরে। আর যন্ত্রণা ব্যাপারটা যে কী, সেটা নাকাতার পক্ষে, যতক্ষণ না সত্যিসত্যি হয়, বোঝা কঠিন। সে বিমূর্ত ভাবে যন্ত্রণা ব্যাপারটা ধরতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এইসব কারণেই, নাকাতা সেই কুকুরের মুখোমুখি হয়েও বিশেষ আতঙ্কিত হল না। কেবল একটু মুশকিলে পড়ল মাত্র।

উঠে দাঁড়াও, কুকুরটা বলল।

নাকাতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে যায়। কুকুর কথা বলছে! যদিও সঠিক ভাবে বলতে হলে, কুকুরটা ঠিক কথা বলছিল না। মুখ নড়ছে না। মুখ কাজে না লাগিয়ে অন্য কোনো উপায়ে কেবল বার্তাটা পৌঁছে দিচ্ছে নাকাতার কাছে।

উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অনুসরণ কর, কুকুর আদেশ করল।

নির্দেশ অনুযায়ী নাকাতা মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কুকুরের সামনে মামুলি অভিবাদনও করবে বলে ভাবল, কিন্তু কী ভেবে আর করল না। আপাতত কথা বলা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এটা কাজে আসবে বলে মনে হল না। প্রথমত নাকাতার এই কুকুরটির সঙ্গে কথা বলতে তেমন ইচ্ছেই করছিল না। ওকে একটা নাম দেওয়ারও ইচ্ছে হল না। যত দীর্ঘ সময়ই কাটানো যাক, এই কুকুরটার সঙ্গে বন্ধুত্ব বোধহয় করে ওঠা যাবে না।

হঠাৎ করেই নাকাতার মনে হল হয়তো গভর্নরের সঙ্গে ব্যাপারটার একটা যোগ আছে। ও যে বেড়াল খুঁজে দিয়ে সেখান থেকে কিছু দক্ষিণা পাচ্ছে সেটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে, গভর্নর এবার ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এই কুকুরটাকে পাঠিয়েছেন হয়তো। গভর্নরের পক্ষে এরকম বিশাল মিলিটারির কুকুর পোষা আশ্চর্য নয়। কিন্তু এরকম হলে তো মুশকিল।

নাকাতা উঠে দাঁড়াতেই কুকুরটা ধীরপায়ে হাঁটতে শুরু করল। নাকাতা কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে তার পেছন পেছন চলল। কুকুরটার লেজটা ছোট্ট, লেজের একেবারে গোড়ার কাছাকাছিই অন্ডকোষ দুটো শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

কুকুরটা সেই ফাঁকা জমি পার হয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। নাকাতাও পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এল। একবারও পেছন ফিরে দেখেনি কুকুরটা। না ঘুরেও পায়ের শব্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

থেকে নাকাতা পেছনে আছে কিনা বুঝতে পারছিল হয়তো। নাকাতা কুকুরকে অনুসরণ করতে করতে পথ চলছিল। দোকান বাজার ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে, রাস্তায় হেঁটে যাওয়া মানুষজনের সংখ্যাও বাড়ছে। অধিকাংশই কেনাকাটা করতে বেরোনো স্থানীয় মহিলারা। কুকুর মুখটা তুলে, সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভয়াল ভাবে পদক্ষেপ করে চলল। সামনে থেকে আসা লোকজন সবাই সেই প্রকৃতই হিংস্রদর্শন দৈত্যাকৃতি কালো কুকুরটাকে দেখে তড়িঘড়ি পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। তার মধ্যে সাইকেলে চেপে উলটো দিকের ফুটপাথে চলে গেল, এমন লোকও ছিল।

এরকম একটা কুকুরের পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকায়, লোকেদের সকলেরই মনে হয়েছিল যে নাকাতা যেন নিজেকেও এড়িয়ে যেতে চাইছে। দড়ি টড়ি ছাড়াই নাকাতা এই বিশাল কুকুরটাকে হাঁটাতে নিয়ে বেরিয়েছে বলেই সবাই ভাবল হয়তো। বস্তুতঃ কেউ কেউ এমনও ছিল যারা তীব্র আপত্তির চোখে নাকাতার দিকে তাকাচ্ছিল। এটা নাকাতার পক্ষে দুঃখজনক। নাকাতা শখ করে এরকম করছে না, লোকজনকে বুঝিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল সেকথা। নেহাতই কুকুরটাই যে ওকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নাকাতা খুব দাপুটে লোক নয়, নাকাতা আসলে একজন দুর্বল মানুষ।

কুকুর নাকাতাকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে গেল। বেশ কয়েকটা ক্রসিং পার হয়ে, দোকান বাজার ছাড়িয়ে। ক্রসিংগুলোতে যাবতীয় সিগনাল অগ্রাহ্য করে গেল কুকুরটা। রাস্তা তেমন চওড়া নয়, গাড়িও খুব বেশি গতিতে যাচ্ছিল না, তাই লালবাতি সত্ত্বেও পার হয়ে গেলেও বিশেষ বিপদ ছিল না। কুকুর চোখে পড়তেই, যারা গাড়ি চালাচ্ছিল, সবাই অবিলম্বে ব্রেকে চাপ দিচ্ছিল। কুকুরও দাঁত খিঁচিয়ে, ড্রাইভারদের দিকে ভয়ানক চোখে তাকিয়ে, ফুটপাথ ধরে যাওয়ায় লাল আলোর নিষেধ থাকতেও প্রায় অগ্রাহ্য করেই ধীরেসুস্থে পার হচ্ছিল। উপায়ান্তর না দেখে নাকাতাও পেছন পেছনই চলল। কুকুরটা ভালোই জানতো সিগনালের অর্থ কী। শুধু সেটাকে গ্রাহ্য করছিল না। নাকাতা সেটা বুঝতে পারছিল। কুকুরটা যেন সবকিছু নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করতেই অভ্যস্ত।

নাকাতা বুঝতে পারছে না কোথা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুটা অবধি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মনে হচ্ছিল দেখে অভ্যস্ত চেনা জায়গা, নাকানো-কু, সেখানকার বসতি এলাকা। কিন্তু একটা কর্নার ঘুরতেই হঠাৎই আর চেনা লাগছে না। নাকাতার একটু অস্বস্তি হতে থাকল। এইভাবে চলে, হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার মতো ফেরার রাস্তা জানা না থাকলে, কী হবে তার পরিণতি! এই জায়গাটা হয়তো আর নাকানো-কু নয়। নাকাতা চারপাশে তাকিয়ে চেনা কোনো ল্যান্ডমার্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু সেরকম কিছু কোথাও চোখে পড়ল না। এই মহল্লা নাকাতা আগে কখনও দেখেনি।

কুকুরটা কোনো কিছুকে আমল না দিয়ে, অপরিবর্তিত পদক্ষেপে, একই ভঙ্গিতে হেঁটে চলল। মুখটা তুলে, কান খাড়া করে, অন্ডকোষ পেন্ডুলামের মত সামান্য দুলিয়ে, নাকাতা যাতে স্বাভাবিক গতিতে সঙ্গে আসতে পারে এরকম গতিতে।

"আচ্ছা, এই জায়গাটাও কি নাকানো-কু'তেই?" নাকাতা জিজ্ঞেস করে দেখে।

কুকুর কোনও উত্তর দেয়না। ফিরেও তাকায় না।

"আপনার সঙ্গে কি গভর্নরের কোনো যোগ আছে?"

যথারীতি কোনও উত্তর নেই।

"নাকাতা কেবল বেড়াল কোথায় তা খুঁজে দেয়। এখন খুঁজছি ছোট্ট একটা তিনরঙা বেড়াল। নাম হচ্ছে গোমা।"

নীরবতা।

নাকাতা হাল ছেড়ে দেয়। এই কুকুরকে কিছু বলেই লাভ নেই।

বসতি এলাকার শান্ত একটা ব্লক। সার সার বড় বাড়ি, লোকজনের আনাগোনা নেই। কুকুরটা এর মধ্যে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল। পুরনো স্টাইলের পাথরের পাঁচিল, দারুন একখানা দু'পাল্লার গেট যা আজকাল খুব কমই দেখা যায়। কেবল একটা পাল্লা খুলে রাখা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আছে, ওয়ান-ওয়ে যাতায়াতের জন্য। গাড়িবারান্দায় বড় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কুকুরটার মতোই মিশমিশে কালো, ঝকঝক করছে, কোনও একটা দাগ নেই কোথাও। ঢোকার দরজাও যথারীতি খোলাই আছে। একটুও ইতস্তত না করে, না থেমে, সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। নাকাতা তার পুরনো স্পোর্টস শ্যু খুলে, মেঝেতে উল্টোমুখে জড়ো করে রেখে, মাউন্টেনিয়ারইং টুপি খুলে ব্যাগে ভরে, ট্রাউজারে লেগে থাকা ঘাস ভাল করে তুলে ফেলে, কাঠের মেঝেতে পা রাখল। নাকাতা যতক্ষণ তার প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছিল, কুকুরটা ততক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল, তারপর চকচকে পালিশ করা মেঝের করিডর দিয়ে হেঁটে, ভেতর দিকে একটা ড্রয়িংরুম বা স্টাডির মত জায়গায় নাকাতাকে নিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, বাগানের দিকের জানালায় পুরু পর্দা টানা রয়েছে। আলোও জ্বালা নেই। ভেতরের দিকে একটা বড় ডেস্ক, পাশে কে যেন বসে আছে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে চোখ তখনও অভ্যস্ত হয়নি, কোনটা যে কী ভাল বোঝা যাচ্ছে না। মানুষের অবয়বের কালো সিল্যুয়েট, একটা বিশেষ পর্যায়ের ছবির মতো অন্ধকারে কেবল আবছা ফুটে উঠছে। নাকাতা ঢুকতেই সেই সিল্যুয়েট ধীরে কোণ পালটে ঘুরে বসল। ওখানে যে বসে আছে, সে যেন সুইভেল চেয়ারে ঘুরে এদিকে মুখ করে বসল। কুকুরটা থেমে, মেঝেয় বসে পড়ে, চোখ বন্ধ করল। যেন এখানেই ওর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

"কোন্নিচিবা", নাকাতা সেই অন্ধকার অবয়বকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল।

ওদিক থেকে শুধু নীরবতা।

"আমার নাম নাকাতা। বিরক্ত করলাম। অসদুদ্দেশ্য কিছু নেই."

কোনও উত্তর এল না।

"এই ইনি, কুকুর-সান, আমায় সঙ্গে আসতে বলায় এই পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলাম। এইজন্যই নিজে থেকে আপনার বাড়িতে এসে হাজির হলাম। দুঃখপ্রকাশ করছি। সম্ভব হলে এখনই ফিরে যেতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেন যদি...

"ওই সোফাটায় বসুন", লোকটা বলল। শান্ত কিন্তু সুরেলা কণ্ঠস্বর।

"হ্যাঁ, বসছি", নাকাতা বলে। তারপর ওখানে একজনের বসার মতো একটা সোফায় বসল। একেবারে পাশেই সেই কালো কুকুরটা স্ট্যাচুর মত নিথর বসে আছে, এতটুকু নড়াচড়া নেই।

"আপনিই কি গভর্নর?"

"সেরকমই" অন্যজন অন্ধকারের ভেতর থেকে বলল। "বুঝতে সুবিধে হলে, সেরকম ভাবলেও চলবে। পার্থক্য নেই।"

লোকটা শরীর সামনে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে চেন টেনে[1] ফ্লোর-ল্যাম্প জ্বালল। সাবেক ধরণের হলুদ রঙের স্তিমিত আলো, তবে, পুরো ঘরটা ঠাহর করে দেখার পক্ষে যথেষ্ট।

সিল্ক-হ্যাট পরা, দীর্ঘদেহী একটি লোক। চামড়ায় মোড়া সুইভেল চেয়ারে বসে, শরীরের সামনে পা দু'টো জড়ো করা। লম্বা ঝুলের টকটকে লাল রঙের আঁটোসাঁটো কোট পরা, তার নিচে কালো ভেস্ট, কালো লং-শু। ট্রাউজার্স, তুষারের মত ধবধবে সাদা, নিখুঁত ফিট করেছে। দেখতে একদম লম্বা অন্তর্বাসের মত লাগছে। একটা হাত তুলে টুপির কানাটায় নিয়ে রেখেছে। কোনো মহিলাকে অভিবাদন করার সময় যেমন হয়। একটা প্রান্ত গোল করে সোনায় বাঁধানো, এরকম কালো একটা স্টিক বাঁহাতে ধরা। টুপির ধরণটা দেখে, কী করে যেন কাওয়ামুরার থেকে শোনা 'বেড়ালধরা লোক'-টা বলে মনে হল।

চেহারায় পোশাকের মত অত বিশেষত্ব নেই। অল্পবয়েসীও নয়, আবার তেমন বয়েস হয়েছে বলেও মনে হয় না। হ্যান্ডসামও নয়, আবার কুৎসিতও নয়। ভুরুগুলো বেশ পুরু, গালে স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা ফুটে বেরুচ্ছে। মুখশ্রী আশ্চর্যরকম মসৃণ, দাড়ি গজায়নি। চোখ কুঞ্চিত, ঠোঁটে কেমন তাচ্ছিল্যের হাসি। এই মুখ চিনে রাখা কঠিন। চেহারার চেয়েও, বিশেষরকমের পোশাকটার দিকেই চোখ চলে যায়। অন্য পোশাক পরে এসে হাজির হলে, সম্ভবত চেনাই

[1] জাপানে বিছানায় বা বসা অবস্থায় চেয়ার থেকে চেন টেনে আলো জ্বালানো নেভানোর ব্যবস্থা থাকে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাবে না।

“আমার নাম নিশ্চয়ই জানা আছে, তাই তো?”

“না, জানিনা তো”, নাকাতা বলে।

লোকটা যেন একটু হতাশ হল।

“জানা নেই?”

“হ্যাঁ[1], সময় লাগছে, নাকাতার তো মাথাটা নিরেস।”

“এই চেহারাটা মনে পড়ছে না, তাই তো?” বলে লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, পাশে ঘুরে পা বাড়িয়ে হাঁটার ভঙ্গি করল। “এতেও?”

“হ্যাঁ। মাফ করবেন। যথারীতি মনে পড়ছে না।”

“তা যদি হয়, আপনি সম্ভবত হুইস্কি খাননি”, লোকটা বলে।

“হ্যাঁ, নাকাতা মদ খায় না। সিগারেটও খায় না। নাকাতা গরীব বলে শহরের থেকে ভাতা পায়, ওসব জিনিস খাওয়ার সামর্থ্য নেই।”

লোকটা আবার চেয়ারে বসে পড়ে, পা দু’টো জড়ো করে। ডেস্কের ওপর থেকে একটা গ্লাস নিয়ে, তার থেকে হুইস্কি খায় এক চুমুক। কারাং করে বরফের আওয়াজ হয়।

“আমার অবশ্য কোনও বাধা নেই। অসুবিধা নেই তো?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, নাকাতার কোনও অসুবিধা নেই। আপনি খুশিমত খান।”

“ধন্যবাদ”, লোকটা বলে। তারপর কী মনে করে নীরবে নাকাতাকে দেখতে থাকে।

“তাহলে, আপনি আমার নাম জানেন না?”

আমার বই

[1]জাপানি বাকরীতিতে, ‘জানা নেই?’ প্রশ্নের উত্তরে ‘জানা [redacted] বলতে হলে ‘হ্যাঁ’ বলার রীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ। দুঃখিত, আপনার নামটা জানি না।"

লোকটা কেবল সামান্য একটু ঠোঁট বাঁকালো। জলের উপরিতলে তরঙ্গের মত, মুখের তাচ্ছিল্যের হাসিটা একটু কুঞ্চিত হয়েই, মিলিয়ে গিয়ে, আবার ফুটে উঠল।

"যারা হুইস্কির কদর করে, এমন লোক হলে একঝলক দেখেই বুঝে যাবে, সে নাহয় ঠিক আছে। আমার নাম জনি ওয়াকার। জনি ওয়াকার। পৃথিবীর প্রায় সকলেই আমার নাম জানে। জাঁক করে বলছি না, সারা পৃথিবী জুড়েই বিখ্যাত। আইকনিক নাম বলেও বলতে পারেন। তাই বলে, সত্যিকারের জনি ওয়াকার নই। বিলেতের সেই মদ তৈরির কোম্পানির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আপাতত চেহারা আর নামটা অনুমতি ছাড়াই ধার করে ব্যবহার করছি মাত্র। কারন, যে যা-ই বলুক, চেহারা আর নাম তো দরকার।

ঘরে একটা নীরবতা নেমে এল। অন্যজন যে কী বলছে, নাকাতা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। শুধু বুঝলো যে লোকটার নাম জনি ওয়াকার।

"জনি ওয়াকার-সান কি বিদেশের লোক?"

জনি ওয়াকার মাথা ঝোঁকালো। "সেটা, যদি সেরকম ভাবলে বুঝতে সুবিধে হয়, তবে ভেবে নেওয়া যেতে পারে। দুটোর যে কোনওটা। তাছাড়া, দুটোই বটে।"

নাকাতা যথারীতি, ও যা বলছে, বুঝতে পারছিল না। সেদিক থেকে বেড়াল কাওয়ামুরার সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে পার্থক্য কিছু নেই।

"বিদেশিও বটে, আবার বিদেশি না-ও বটে। এটাই ব্যাপার তো?"

"সেটাই।"

এই সমস্যাটার নিয়ে আর খোঁজখবর করবে না বলেই নাকাতা ঠিক করল। "তাহলে জনি ওয়াকার-সানই কি এই কুকুর-সানকে দিয়ে নাকাতাকে সঙ্গে করে আনালেন?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সেরকমই", জনি ওয়াকার সংক্ষেপে বলে।

"তার মানে, জনি ওয়াকার-সানের কি নাকাতাকে কোনোভাবে দরকার?"

"বরং বলব, আপনার আমাকে দরকার হয়তো", জনি ওয়াকার বলে। আবার এক চুমুক অন দা রকস। "আমি যা বুঝছি, আপনি কয়েকদিন ধরে আদ্যন্ত সেই ফাঁকা জমিতে, আমার হাজির হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন।"

"হ্যাঁ। এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। নাকাতার মাথাটা নিরেস বলে অচিরেই সব ভুলে যায়। আপনি ঠিকই বলেছেন। নাকাতা জনি ওয়াকার-সানকে একটি বেড়ালের কথা জিজ্ঞেস করবে বলে ফাঁকা জমিতে অপেক্ষা করছিল।"

জনি ওয়াকার হাতে ধরা লাঠিটা দিয়ে লং-বুটের পাশটায় ঠুকলো। আস্তেই আঘাত করলো, তবু খটাশ করে একটা শুকনো আওয়াজ ঘর জুড়ে জোরালো ভাবে অনুরণিত হল। কুকুরটা কানটা সামান্য একটু নাড়ল।

"সূর্য ডুবতে চলেছে, ভাঁটা এসে যাবে, কথা আরেকটু এগিয়ে নেওয়া যাক", জনি ওয়াকার বলে। "আপনি তার মানে, তিনরঙা বেড়াল গোমার কথা আমার থেকে জানতে চান, তাই তো?"

"হ্যাঁ। ঠিক তাই। কোইজুমি-সানের স্ত্রী অনুরোধ করায় নাকাতা গত ১০ দিন যাবৎ তিনরঙা বেড়াল গোমার হদিস করার চেষ্টা করছে। জনি ওয়াকার-সান কি গোমার কথা কিছু জানেন?"

"সে বেড়ালের কথা বিলক্ষণ জানি!"

"কোথায় আছে এখন, সেটাও কি জানেন?"

"কোথায় আছে, সেও জানি।"

নাকাতা মুখ অল্প হাঁ করে জনি ওয়াকারের মুখের দিকে তাকালো। ওর সিল্ক হ্যাটটা একবার একটু নজর করে নিয়েই আবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মুখের দিকে তাকাল। জনি ওয়াকারের পাতলা ঠোঁট আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়নিবদ্ধ।

"কাছাকাছি মধ্যে কোনো জায়গায়?"

জনি ওয়াকার কয়েকবারই মাথা সামনে ঝোঁকালো। "আরে, খুবই কাছাকাছি।"

নাকাতা ঘরের মধ্যেই একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু সেখানে বেড়ালের দেখা পাওয়া গেল না। রাইটিং ডেস্ক আছে, লোকটা যাতে বসে আছে সেই সুইভেল চেয়ারটা আছে, নাকাতা যেটায় বসে সেই সোফাটা, আরো দুটো চেয়ার, ফ্লোর-স্ট্যান্ড, কফি-টেবল, এই মাত্র।

"তাহলে", নাকাতা বলে, "গোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কি?"

"সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে।"

"নাকাতার ওপর নির্ভর করছে?"

"হ্যাঁ, একেবারেই নাকাতার ওপর", বলে, জনি ওয়াকার একদিকের ভুরু অল্প ওপরে তুলল। "সংকল্পে অটল থাকলেই গোমাকে নিয়ে ফিরতে পারবেন। কোইজুমি-সানের স্ত্রী, মেয়েরা, সবাই খুব খুশি হবে। অন্যথায় একেবারেই নিয়ে ফিরতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে সবাই নিরাশ হবে। সবাইকে নিরাশ করতে চান না নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, নাকাতা সবাইকে নিরাশ করতে চায় না।"

"আমিও তাই। আমিও সবাইকে নিরাশ করতে চাই না। সেটাই স্বাভাবিক।"

"নাকাতা এখন তাহলে কী করবে?"

জনি ওয়াকার হাতের মধ্যে স্টিকটা ঘোরাতে থাকে।"আমি আপনার থেকে একটা জিনিস চাইছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সেটা কি নাকাতা পারবে?"

"না পারার মত হলে আমি লোককে সেটা করতে বলি না। কেননা, যা পারবে না তা করতে বললেও, সময় নষ্ট ছাড়া কিছু হয় না। আপনার কী মনে হয়?"

নাকাতা একটু ভাবে। "হয়তো তাই, বলেই নাকাতার মনে হয়।"

"সেক্ষেত্রে, আমি যেটা চাইব, সেটা নাকাতা-সানের পক্ষে সম্ভব।"

নাকাতা আবার ভাবে। "হ্যাঁ। সেরকমই হবে হয়তো।"

"প্রথমত, আমরা সবাই জানি—প্রত্যেকটি অনুমানের জন্যই, সেটা যে ভুল তা প্রমাণ করা প্রয়োজন হয়।"

"অ্যাঁ, ওহ্", নাকাতার প্রতিক্রিয়া।

"অনুমানের ক্ষেত্রে অপ্রমাণ না থাকলে বিজ্ঞানের আর অগ্রগতি হবে না", জনি ওয়াকার স্টিক দিয়ে নিজের লং-বুটের ধারে আঘাত করল। বেশ জোরে, যেন একটা চ্যালেঞ্জ। কুকুরটা আবার কান নাড়ল। "কিছুতেই হবে না।"

নাকাতার মুখ বন্ধ।

"আসল কথা বলি, আমি বহুদিন ধরেই আপনার মতো লোকের সন্ধানে ছিলাম", জনি ওয়াকার বলে। "কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সেদিন হঠাৎ করেই চোখে পড়ল যে আপনি বেড়ালের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন। তখন ভাবলাম, হ্যাঁ, ইনিই সেই লোক যার সন্ধানে আছি। তাতেই আপনাকে এতদূর আসার অনুরোধ করতে হল। আমি সত্যি দুঃখিত যে এভাবে ডেকে আনতে হল।"

"না, না, নাকাতার তো মূলত তেমন কাজ কিছু নেই", নাকাতা বলে।

"ব্যাপারটা হল, আমি আপনার সম্বন্ধে একটা অনুমান খাড়া করেছি", জনি ওয়াকার বলে। অবশ্যই, সেটা যে ভুল, সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অপ্রমাণও কয়েকটা বের করেছি। এটা একটা খেলার মত। মানুষের মাথা খাটানোর খেলা। কিন্তু সবরকম খেলাতেই হার-জিতের দরকার আছে। এইক্ষেত্রে, অনুমানটার সত্যাসত্য যাচাই করতেই হবে। বলছি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কী তো আপনি বুঝতে পারছেন না, তাই না?"

নাকাতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে।

জনি ওয়াকার স্টিকটা দিয়ে দু'বার লং-বুটে আঘাত করে। সেই সংকেতে কুকুরটা উঠে পড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

১৫

ওশিমা রোডস্টারে চড়ে, লাইট অন করল। অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিতেই নুড়ি পাথর ছিটকে উঠে গাড়ির নিচে এসে আঘাত করল। গাড়িটা একটু পিছিয়ে নিয়ে সামনে রাস্তামুখো হল। তারপর হাত তুলে আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাল। আমিও হাত তুললাম। টেইল-ল্যাম্পটা, অন্ধকার গ্রাস করে নিতেই, ক্রমে ইঞ্জিনের আওয়াজের দূরত্ব বেড়ে, শেষে একসময় সবটাই মিলিয়ে গিয়ে বনের নিস্তব্ধতা এসে ভরে দিল সবটা।

আমি কেবিনের ভেতর ঢুকে, ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিলাম। একা হয়ে যেতেই, ঠিক যেন এটারই অপেক্ষায় ছিল, এইভাবে নৈঃশব্দ এসে আমাকে ঘিরে ফেলল। রাতে এমন ঠান্ডা পড়েছে, মনেই হচ্ছে না যে এটা গ্রীষ্মের প্রথম দিক, কিন্তু স্টোভে আগুন জ্বালতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আজ রাতে নেহাতই স্লীপিং-ব্যাগের ভেতর সেঁধিয়ে যাব। যথেষ্ট ঘুম না হওয়ায় মাথার ভেতরটা ফাঁকা, অত দীর্ঘ সময় গাড়িতে আসার ফলে শরীরের পেশিতে এখানে ওখানে ব্যথা। চাবি ঘুরিয়ে ল্যাম্পের আগুন একটু ক্ষীণ করে নিলাম। ঘরের ভেতরটা আধো অন্ধকার হয়ে গেল, ঘরের কোণে অধিষ্ঠান করা আবছায়া আরো গাঢ়। পোশাক পালটানো আরেক ঝামেলা, ব্লু-জীনস আর ইয়ট-পার্কার শার্ট পরা অবস্থাতেই স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

চোখ বুজে ওইভাবেই ঘুমিয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু ঘুম ঠিকমত আসছে না। শরীর খুব চাইছে ঘুম, কিন্তু চেতনা শান্ত হয়ে জেগে আছে। মাঝেমাঝে রাতচরা পাখির তীক্ষ্ণ ডাকে নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে যাচ্ছিল। এছাড়াও নানা অনির্দিষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কিছুতে শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ। একটা কিছুর চাপে কাঠকুটোর গুঁড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ। কিছু একটার জোরালো শ্বাস ফেলার আওয়াজ। সবই কেবিনের খুব কাছে বলেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শোনাচ্ছে। কখনওবা পর্চের কাঠের মেঝেয় অশুভ ক্যাঁচকোচ। অদৃশ্য কীসব যেন—অন্ধকারের জীব কীসব যেন—একটা বাহিনী হয়ে আমায় ঘিরে রয়েছে বলে অনুভব করছিলাম।

যেন কেউ আমাকে দেখছে, এরকম অনুভূতি। সেই দৃষ্টিতে আমার গা শিরশির করছিল। হৃতপিন্ডের আওয়াজ, কানে আসার মতো। আমি চোখ অল্প খুলে, সেই স্লীপিং-ব্যাগের ভেতর থেকে, স্তিমিত ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত ঘরের মধ্যে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম, বারবারই দেখে নিচ্ছিলাম ঘরের মধ্যে কেউ আছে কি না। ঢোকার দরজায় মোটা ছিটকিনি, জানালার পুরু পর্দা পুরোটা টেনে দেওয়া। ঠিকই আছে, কেবিনের ভেতরে আমি একাই, ঘরের ভেতরে কেউ উঁকি দিয়ে দেখছে না।

তা সত্ত্বেও, "কেউ একটা আমাকে দেখছে" এই অনুভূতিটা যাচ্ছে না। মাঝেমাঝেই ভয়ানক দম আটকা ভাব, গলা শুকিয়ে যাছিল। জলতেষ্টা পাচ্ছিল। কিন্তু এখন এখানে জল খেলেই নির্ঘাত পেচ্ছাপ পেয়ে যাবে, এইরকম ভাবে রাতে বাইরে গিয়ে বাথরুম করার কোনও ইচ্ছে নেই। যেমন করে হোক, সকাল অবধি চেপে থাকি। স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে কুন্ডলি পাকিয়ে, অল্প ঘাড় ঝাঁকালাম।

"এমা, অহেতুক তুমি চুপটি করে অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছো! এক্কেবারে একটা ভিতু বাচ্চার মত। এই কি তোমার আসল রূপ নাকি?" যেন খুবই ক্ষুন্ন হয়েছে, এই ভাবে কারাসু বলে ছেলেটা বলে ওঠে। "আগাগোড়া তুমি নিজেকে টাফ বলে ভেবে এসেছ। কিন্তু আসলে সত্যিই তাই কিনা কে জানে। এই তো তুমি কেঁদে ফেললে বলে। এভাবে তো সকাল হতে হতে, তার আগেই তুমি হিসি করে ফেলবে, একেবারে অবধারিত।"

আমি ওর এই উপহাসে কান দিলাম না। জোর করে চোখ বুজে, নাকের নিচ অবধি স্লীপিং-ব্যাগের জিপারটা টেনে দিয়ে, সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিলাম। বাতাসে ভেসে আসা প্যাঁচার ডাক, দূরে কোথাও কিছু একটা ধুম করে মাটিতে পড়ার আওয়াজ, এসব শুনেও, ঘরের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করার আভাস পেলেও, চোখ খুলব না। আমার এখন পরীক্ষা নেওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হচ্ছে বলেই ভাবব। ওশিমাও একই বয়েসে এখানে কয়েকদিন একা কাটিয়ে গেছে। আমার এখন যেমন লাগছে, ওরও নিশ্চয়ই একইরকম ভয় করেছিল। এইজন্যই ওশিমা আমার দিকে ফিরে, "একাকিত্বেরও রকমফের আছে", বলে বলেছিল। মাঝরাত্তিরে আমার যে এখানে কেমন লাগবে, ওশিমা সম্ভবত সেটা জানত। এর আগে ওর নিজেরই সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি রয়ে গেছে বলেই। এভাবে ভাবতেই শরীরটা একটু চাপমুক্ত হল। অনেকটা সময় কেটে যেতে, ওখানে অতীতের ছায়া নির্দিষ্ট করে আবিষ্কার করা যাচ্ছিল। সেই ছায়ার সঙ্গে নিজেকেও যুক্ত করে নিতে পারছি। আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ছ'টা বেজে যেতে চোখ খুললাম। পাখির ডাক কাছেই বৃষ্টিপাতের মতো প্রাণবন্ত ভাবে বর্ষিত হচ্ছে। পাখিরা গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে ব্যস্ত ভাবে উড়ে গিয়ে, জোরালো গলায় এ ওকে ডাকাডাকি করছে। ওদের বার্তায় রাতের পাখিদের মত সংকেতময় গম্ভীর অনুরণন নেই।

আমি স্লীপিং-ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে, কেবিনের আশেপাশে গত রাতের অন্ধকার এককণাও যে অবশিষ্ট নেই, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিলাম। সবকিছু সদ্য নিষ্কাশিত সোনার মত ঝকঝক করছে। দেশলাই ঘষে গ্যাসের আগুন জ্বাললাম, মিনারেল ওয়াটার ফুটিয়ে ক্যামোমিল চা বানিয়ে খেলাম। খাবার দাবারের কাগজের প্যাকেট থেকে বিস্কিট বের করে, চিজ মাখিয়ে কয়েকটা খেলাম। তারপর সিঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া।

ইয়ট-পার্কারের ওপরে উইন্ডচিটার চড়িয়ে কেবিনের বাইরে এলাম। সূর্যকিরণ গাছগাছালির ফাঁক ভেদ করে পর্চের সামনের ফাঁকা জমিতে এসে পড়েছে। সর্বত্র আলোর স্তম্ভের মতো তৈরি হয়ে, সকালের কুয়াশা সদ্যোজাত ভুতের মত সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে। শ্বাস নিলে পরিষ্কার বাতাসে ফুসফুস চনমন করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওঠে। আমি পর্চের ধাপে বসে পড়ে, গাছগাছালির ফাঁকে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে, ওদের ডাকে কান পাতলাম। অনেক পাখিই জোড় বেঁধে আছে। পার্টনার কোথায় আছে সেটা ওরা নজর রেখে, ডাকাডাকি করছে।

ঝর্ণাটা কেবিনের কাছেই বনের মধ্যে। জায়গাটা, আওয়াজ থেকে অবিলম্বেই খুঁজে পাওয়া গেল। চারপাশ পাথর দিয়ে ঘিরে ধরে রাখার মতো করা আছে, সেখানে জল বাধা পেয়ে এক জটিল উপায়ে ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে, তারপর আবার গতি পেয়ে ফের নিচে বয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার সুন্দর জল। আঁজলা করে তুলে পান করলে মিষ্টি, ঠান্ডা। আমি সেই জলের মধ্যে দুটো হাত কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলাম।

ফ্রাইং-প্যান ব্যবহার করে হ্যাম-এগ বানিয়ে, ছাঁকনিতে রুটি টোস্ট করে খেলাম। হাতলওলা প্যানে দুধ ফুটিয়ে খেলাম। তারপর ঢোকার মুখের পর্চে চেয়ার নিয়ে গিয়ে, তাতে বসে, রেলিং-এ দু'পা তুলে দিয়ে, সকালবেলাটা বই পড়ব ঠিক করলাম। ওশিমার বুক-শেলফে, সংখ্যায় কয়েকশো বই ঠাসা রয়েছে। ফিকশন খুব অল্পই চোখে পড়ছে, তাও কেবল সর্বজনবিদিত ক্লাসিকসের মধ্যেই আবদ্ধ। বেশিরভাগই দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি—এইধরণের বই। স্কুলের শিক্ষা তেমন পায়নি বলে, ওশিমা সম্ভবত লেখাপড়া করে নিজের চেষ্টায় সাধারণ জ্ঞানের চর্চা করে নেবে মনস্থ করে, এখানে সেটা বাস্তবায়িত করেছিল। ঐসব বই যেসব বিষয় কাভার করছে তার পরিধি প্রকৃতই বিস্তৃত, সেদিক থেকে দেখলে অসংগতি কিছু ছিল না।

আমি ওখান থেকে অ্যাডলফ্ আইখ্ম্যানের বিচার নিয়ে লেখা একটা বই বেছে নিলাম। নাৎসি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আইখম্যানের নামটা আবছা মনে ছিল, বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। হঠাৎই দৃষ্টি আকর্ষণ করল বলে হাতে নিলাম আর কি। সেই মেটাল ফ্রেমের চশমা পরা, চুল পাতলা হয়ে আসা এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল যে কত অসাধারণ প্র্যাকটিকাল লোক ছিলেন সেই তথ্য আমি ওখানে জানতে পেলাম। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র ইনি নাৎসি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কর্তৃপক্ষের থেকে ইহুদিদের অন্তিম পরিণতি—তার জন্য জরুরি গণহত্যা—এই দায়িত্ব পেয়ে, সেটা কী উপায়ে সম্পন্ন করলে ভাল হয়, সেটা বিশদে ও স্পষ্ট করে খতিয়ে দেখেছিলেন। তারপর প্ল্যান করেছিলেন। কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটা ওনার চিন্তায় কখনো আসেনি। ওঁর মাথায় ছিল, অল্প সময়ে যথাসম্ভব কম খরচে কত ইহুদির অন্তিম পরিণতি ঘটিয়ে দেওয়া যায়, কেবল সেটুকুই। ওঁর হিসেব অনুসারে, ইয়োরোপ মহাদেশে অন্তিম প্রক্রিয়াটি চালানোর জন্য ইহুদিদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট এক কোটি দশ লক্ষ।

কতগুলো বগি জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে, একটা বগিতে ক'জন ইহুদিকে ভরা যাবে, এইসব। তারমধ্যে শতকরা ক'জন চালান করার সময়েই, স্বাভাবিক কারণেই মারা যাবে। কী করলে সবচেয়ে কমসংখ্যক লোক দিয়ে এই কাজটা সম্পন্ন করা যায়। সবচেয়ে ব্যয়সংকোচ করে কীভাবে মৃতদেহগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যায়---পোড়ানো হবে, না কবর দেওয়া হবে, না কি গালিয়ে ফেলা হবে। উনি ডেস্কে বসে নিষ্ঠা সহকারে হিসেব করেছিলেন। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে, মোটামুটি হিসেবমতোই কার্যকর করে দেখিয়েছিলেন। যদ্দিনে যুদ্ধ শেষ হয়, তদ্দিনে মোটামুটি ৬০ লক্ষ (ধার্য্য সংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু বেশি) ইহুদি ওঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রক্রিয়াটিতে সামিল হয়। কিন্তু, ওঁর কোনও অপরাধবোধ ছিল না। জেরুসালেমের আদালতকক্ষে বুলেটপ্রুফ কাঁচে ঘেরা অভিযুক্তের আসনে বসে, উনি নিজে যে কেন এরকম বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিচারের সম্মুখীন হয়ে, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টিধৌত হচ্ছেন, তার কোনও ব্যাখ্যাই উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দেখা গেল যেন আইখ্ম্যান সাহেব মাথা নাড়ছেন। উনি একজন প্রযুক্তিবিদ হিসেবে, প্রদত্ত কাজটিতে সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানটি পেশ করেছিলেন মাত্র। জগত জুড়ে সমস্ত সৎ, বিবেচনাশীল ব্যুরোক্র্যাটই যা করেন, ঠিক সেটাই কি উনি করেননি? তাহলে কেবল ওঁকেই কেন এভাবে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত হতে হচ্ছে?

শান্ত সকালে অরণ্যের মধ্যে পাখির ডাক শুনতে শুনতে, আমি সেই "প্র্যাকটিকাল" কাহিনীটি পড়লাম। বইয়ের পেছনের মলাটের ভেতরের দিকটায় ওশিমা পেনসিল দিয়ে, কী লিখে রেখেছে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জানি ওটা ওশিমারই হাতের লেখা। অক্ষরের বিশেষত্ব আছে।

"পুরোটাই কল্পনাশক্তির সমস্যা। আমাদের দায়িত্বশীলতার উন্মেষ হয় কল্পনাশক্তির মধ্য থেকে। ইয়েটস্ লিখছে: In dreams begin responsibilities—একেবারেই তাই। উলটে বলা যায়, কল্পনাশক্তি না থাকলে দায়িত্বশীলতার সম্ভবত উদ্ভবই হবে না। আইখম্যানের উদাহরণ সেটাই দেখিয়ে দিল।"

ওশিমা এই চেয়ারটায় বসে, হাতে ভাল করে ছুলে নেওয়া পেনসিল, বইয়ের মলাটের ভেতরের দিকে লিখে রাখছে, এই দৃশ্যটা আমি কল্পনা করলাম। 'স্বপ্নের ভেতরেই দায়িত্বশীলতার শুরু'। কথাটা আমার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমি বই বন্ধ করে, কোলের ওপর রাখলাম। তারপর নিজের দায়িত্বশীলতা নিয়ে ভাবতে বসলাম। না ভাবলে চলবে না। আমার সাদা শার্টে টাটকা রক্ত লেগে ছিল। আমি এই হাতে সেই রক্ত ধুয়ে ফেলেছি। এত রক্ত যে সিঙ্কটা টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল। সেই রক্তপাতের জন্য আমাকেই হয়তো দায় বহন করতে হবে। কল্পনা করলাম যে আমাকেও বিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। লোকে আমার নিন্দে করছে, আমাকেই দায়ী করছে। আমার মুখের দিকে রাগত ভাবে তাকিয়ে, আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। আমার মনে নেই, তাই আমি দায়ী নই, বলে আমি দাবি করছি। ওখানে সত্যি কী হয়েছিল, সে এমনকি আমিও জানি না। কিন্তু ওরা বলছে, "ওই স্বপ্ন আসলে কা'র? তোমারও ওই একই স্বপ্ন ছিল। তাই স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনার দায় তোমাকে বহন করতে হবে। কারণ, ওই স্বপ্ন তো, তোমারই অন্তরের অন্ধকার পথ ধরে এসে হাজির হয়েছে"।

হিটলারের দৈত্যাকৃতি বিকৃত স্বপ্নের মধ্যেও প্রবেশ না করে উপায় ছিল না, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আইখ্ম্যানের মতোই।

বই রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, পর্চে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া টানটান করলাম। বেশ দীর্ঘ সময় ধরে বই পড়েছি। শরীরটা একটু নাড়াচাড়া করা দরকার। দু'টো পলিথিনের ক্যান নিয়ে ঝর্ণা থেকে জল আনতে গেলাম। কেবিন অবধি বয়ে এনে একটা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জলের ট্যাংকে জলটা ঢাললাম। পাঁচ বার এরকম করায় জলের ট্যাংকটা মোটামুটি ভরে গেল। পেছনের শেড থেকে জ্বালানি কাঠ বয়ে এনে, স্টোভের ধারে জড়ো করে রাখলাম।

পর্চের এক কোণে কাচার পরে শুকোতে দেওয়ার জন্য, রঙ জ্বলে যাওয়া নাইলনের দড়ি টাঙানো আছে। আমি রুকস্যাক থেকে অর্দ্ধেক শুকনো কাচা জিনিস বের করে, মেলে, কুঁচকে যাওয়া জায়গাগুলো টানটান করে, শুকোতে দিলাম। রুকস্যাকের ভেতর থেকে জিনিসপত্র সব বের করে বিছানার ওপর সার দিয়ে রাখলাম, সকালের রোদ্দুর পড়ুক ওগুলোর ওপর। এরপর ডেস্কে বসে কয়েকদিনের ডায়েরি লিখে রাখলাম। সরু সাইনপেন দিয়ে, আমার দেহে যা ঘটেছিল তা ছোট ছোট অক্ষরে এক এক করে নোট করে রাখলাম। যদ্দিন অবধি পরিষ্কার মনে থাকবে, তার মধ্যেই একটু বিশদে লিখে রাখতে হবে। কারণ, কারুরই জানা নেই স্মৃতি ক'দিন ঠিকঠাক বজায় থাকে।

আমি স্মৃতির অনুসরণ করতে বসলাম। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, একসময় যে খেয়াল করলাম, জিনজার পেছনে বনের মধ্যে পড়ে আছি। চারপাশ ঘন অন্ধকার, শার্টে যে প্রচুর রক্ত লেগে আছে। ফোন করে সাকুরার ফ্ল্যাটে গিয়ে, সেখানে যে থাকতে পেলাম। ওর সঙ্গে যেসব কথা হল, ওখানে ও আমাকে যা 'করে দিয়েছিল'।

ও এমনভাবে হাসল যেন অদ্ভুত কিছু। "কিন্তু, ঠিক বুঝলাম না। ওভাবে চুপচাপ নিজের খুশি মত কল্পনা করে নেওয়া যায় না? একেবারে সবকিছুতে আমার অনুমতি লাগবে, তুমি কী কল্পনা করবে সেটা পর্যন্ত, আমি তো এসব জানতেই পারবো না কোনোভাবে।"

না, তা নয়। আমি কী কল্পনা করলাম, এই জগতের জন্য সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুপুরের পরে বনের মধ্যে ঢুকে দেখলাম। ওশিমার কথা মতোই, বনের গভীরে ঢুকে পড়াটা খুবই বিপজ্জনক। "বনে ঢুকলে পরে সবসময় নজরের এককোণে এই কেবিনটা যেন থাকে, কেমন!" ও সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ক'দিন হয়তো আমি এখানে একা একাই কাটাব। বিশাল প্রাচীরের মতো চারপাশ ঘিরে থাকা এই অরণ্য সম্বন্ধে, একেবারে কিচ্ছুটি না জানার চেয়ে, কিছুটা হলেও জেনে রাখা স্বস্তিকর হওয়ার কথা। সূর্যের আলোয় ভরা ফাঁকা জায়গাটা পেছনে ফেলে, হালকা অন্ধকারে সেই গাছপালার সমুদ্রের মধ্যে পা বাড়ালাম।

মোটামুটি একটা রাস্তা পাওয়া গেল। প্রায় প্রাকৃতিক ভূপৃষ্ঠেই গাছপালা ঠেলে সরিয়ে এগোনোর জন্য তৈরি করে নেওয়া রাস্তা। জায়গায় জায়গায় জমিতে হাত লাগিয়ে সমতল পাথরের খণ্ড দিয়ে পা ফেলে ফেলে যাওয়ার মত করে বিছানো আছে। ধ্বসে যেতে পারে এরকম জায়গায় মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পুঁতে, নিচের ঘাস ঘন হয়ে গজিয়ে রাস্তা বোঝা যাচ্ছে না এরকম যাতে না হয়, সেইভাবে সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে। ওশিমার দাদা হয়তো যতবার এখানে আসেন, প্রত্যেকবারই একটু একটু করে সময় নিয়ে ব্যবস্থা করেছেন। আমি সেই পথ ধরে সামনে এগিয়ে চললাম। চড়াই বেয়ে উঠে, সামান্য নামলাম। একটা বড় পাথরকে পাশ কাটিয়ে আবার ওঠা। পুরোটাই প্রায় চড়াইয়ের রাস্তা, তবে তেমন খাড়া নয়। রাস্তার দু'ধারেই উঁচু উঁচু গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একঘেঁয়ে কালচে রঙের গুঁড়ি, ইচ্ছেমত এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাওয়া মোটা মোটা ডাল। গাছের পাতা ঘন হয়ে মাথার ওপরটা ছেয়ে আছে। মাটির ওপরে, এমন ঘন হয়ে আগাছা, ফার্ন বেড়ে উঠেছে যে সামান্য যেটুকু আলো, তাও শুষে নিচ্ছে। যেখানে সূর্যের আলো একেবারেই পড়ে না, সেখানে শ্যাওলা এসে পাথরের গা নিঃশব্দে আবৃত করে রেখেছে। ঠিক যেন বেশ জোরালো ভাবে কথা শুরু করে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এভাবে পথটা এঁকেবেঁকে যেতে যেতে, যত এগোয় ততই সরু হয়ে আগাছা, ঘাস লতাপাতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মাটির ওপরের চিহ্নগুলোও উধাও হয়ে গিয়ে, সত্যিই রাস্তাটাই, না কি রাস্তার মতোই দেখতে কিছু, ধরতে পারা কঠিন। তারপরে একসময় সবুজ ফার্নের সমুদ্র এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে। এমন হতে পারে, হয়তো আরো এগিয়ে পথটা আবার চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এর পরের বার সুযোগ হলে যাচাই করে দেখাই ভাল বলে মনে হয়। সামনে আরো অনেকটা যেতে হলে আলাদা করে তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি আর পোশাক দরকার।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে, পেছনদিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু সেখানে এক অচেনা দৃশ্য। আমাকে উৎসাহিত করার মতো একটা কিছুও চোখে পড়ছে না। গাছের গুঁড়ি একটার গায়ে একটা লেগে থেকে, দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করছে। একেই বলে দুর্ভাগ্য। চারপাশে পাতলা অন্ধকার, ঘন সবুজের মধ্যে বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে। পাখির ডাকও কানে আসছে না। মুহূর্তে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল, যেন হিমেল বাতাসের ঝাপটা এসে লেগেছে। চিন্তার কিছু নেই—আমি নিজেই নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলি। রাস্তা ওখানে আছে। আমি যে পথ দিয়ে এসেছি ওখানে তা ঠিকই আছে। সেটা দেখতে পেলেই আবার আলোতে ফিরতে পারব। সেই পথ ধরে, গভীর সাবধানতার সঙ্গে, খেয়াল করে দেখে দেখে এক'পা এক'পা করে পা ফেলে, আসার সময়ের চেয়েও বেশি সময় নিয়ে আমি কেবিনের ফাঁকা জমিতে ফিরলাম। ফাঁকা জমি প্রথম গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আলোয় পরিপূর্ণ, পাখিরা স্বচ্ছ আওয়াজে চারপাশ অনুরণিত করতে করতে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওখানকার জিনিসপত্র, আমি ওখান থেকে ছেড়ে আসার সময় যেমন ছিল, একটুও পালটায়নি। সম্ভবত না পাল্টানোরই কথা। পর্চে, একটু আগেও যেটায় বসে ছিলাম, সেই চেয়ারটা আছে। তারও আগে, একটু আগে পর্যন্ত পড়ছিলাম যে বইটা, সেটা উলটে রাখা আছে।

কিন্তু, বনের ভেতরটা যে বিপদে পরিপূর্ণ, তার একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা হল। এটার কথা যেন না ভুলি, নিজেকেই ভাল করে শুনিয়ে রাখলাম। কারাসু যেটা বলেছিল, এই জগতটা, তুমি জাননা এমন জিনিসে পরিপূর্ণ। যেমন কিনা, উদ্ভিদ যে অত ভুতুড়ে হয়ে উঠতে পারে, এই সত্য আমার জানা ছিল না। এযাবৎ দেখা, ছোঁয়া উদ্ভিদ সবই ছিল শহরের উদ্ভিদ মাত্র, যত্ন করে কেয়ারি করা। কিন্তু এখানে যেগুলো রয়েছে—মানে আর কি, এখানে বেঁচে রয়েছে—সেগুলো একেবারেই ভিন্ন জিনিস। এদের শারীরিক শক্তি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রয়েছে, মানুষজনের মুখোমুখি হলে নির্গত হওয়ার মত শ্বাস রয়েছে, শিকারকে তাগ্ করার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। অতি প্রাচীন ব্ল্যাক-আর্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। অরণ্যের অভ্যন্তর গাছপালাদের রাজত্ব করার জায়গা—গভীর সমুদ্রের নিচে যেমন গভীর সমুদ্রের সামুদ্রিক প্রাণীরা রাজত্ব করে, সেরকম। প্রয়োজন মত এই অরণ্য আমাকে অবলীলায় দূরেও ঠেলে দিতে পারে, আবার গ্রাস করেও নিতে পারে। আমাকে সম্ভবত বনের এই গাছপালার প্রতি উপযুক্ত সম্ভ্রম ও সমীহ পোষন করতে হবে মনের মধ্যে।

কেবিনে ফিরে, রুকস্যাকের থেকে পাহাড়ে চড়ার জন্য কম্পাসটা বের করলাম। ঢাকনা খুলে, কাঁটাটা উত্তর দিকে দিকনির্দেশ করছে কিনা দেখে নিলাম। ছোট্ট কম্পাসটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। মুশকিলে পড়লে কাজে লাগতে পারে হয়তো। তারপর পর্চে বসে বনের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে, ওয়াকম্যানে মিউজিক শুনতে থাকলাম। 'ক্রীম' শুনে, তারপর ডিউক এলিংটন শুনলাম। এইসব পুরনো যুগের মিউজিক আমি লাইব্রেরির সিডি লাইব্রেরি থেকে রেকর্ড করে নিয়েছিলাম। 'ক্রস-রোড'টা বারবারই ফিরে ফিরে শুনলাম। সংগীত আমার উচাটন মনকে খানিকটা শান্ত করল। কিন্তু তেমন দীর্ঘ সময় ধরে শুনতে পারা গেল না। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, ব্যাটারি চার্জ করা যায় না। স্পেয়ার ব্যাটারি না থাকলে, এখানেই শেষ।

সন্ধের আগেটায় একটু ব্যায়াম করলাম। বুকডন, সিট-আপ, বৈঠক, হাতে ভর করে দাঁড়ানো, নানারকম স্ট্রেচিং—ছোট্ট জায়গা, যন্ত্রও নেই, কোনো ইনস্টলেশনও নেই। শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে তৈরি ওয়র্ক-আউট মেনু। কোনও জটিলতা নেই, একটু একঘেঁয়েমি আছে বটে, পরিশ্রম যথেষ্ট, নিষ্ঠা নিয়ে করলে সত্যিই ফলদায়ক। জিমের প্রশিক্ষকের থেকে আমি এগুলো শিখেছি। "একা কোথাও ব্যায়াম করার জন্য জগতে এই মেনুটাই একনম্বর", উনি বলে দিয়েছিলেন। "অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সলিটারি সেলের কয়েদিরা এটা উৎসাহ নিয়ে করে"। আমি একাগ্র হয়ে ওগুলো কয়েক সেট করলাম। সপসপে ঘামে ভিজে গেল শার্টটা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সাধারণ রকম রাতের খাওয়ার পরে পর্চে বেরিয়ে দেখি মাথার ওপরে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। আকাশ নক্ষত্রখচিত বলার চেয়েও, আকাশে মুঠো মুঠো তারা ছড়িয়ে দিয়েছে বলাই ভাল। এমনকি প্ল্যানেটারিয়ামেও এত তারা দেখিনি। কিছু তারা এত বড়, চোখে পড়ার মত জ্বলজ্বল করছে। আকুল হয়ে হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। অবশ্যই এক শ্বাসরোধকারী সুন্দর দৃশ্য।

তবে, কেবল সুন্দরই নয়। তারারা যেন বনের গাছপালার মতোই বেঁচে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে বলেই আমার মনে হল। আর ওরা আমাকে দেখছে। আমি এতদিন কী করে এসেছি, এরপর কী করব বলে ভাবছি, সব ওরা জানে। একোণ থেকে ওকোণ কোনও কিছুই ওদের চোখের নজর এড়াতে পারবে না। রাতের সেই উজ্জ্বল আকাশের নিচে, আরও একবার তীব্র ভয় এসে আমাকে আক্রমণ করল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুততর হল। এরকম ভয়ানক সংখ্যক তারারা নিচে আমার দিকে চেয়ে আছে, এহেন অবস্থায় কাটিয়ে এসেছি, অথচ আমি তাদের অস্তিত্বই এখন অবধি টের পাইনি। তারাদের নিয়ে, কীভাবে যেন, একবারও ঠিক কিছু ভাবিনি। উহুঁ, শুধু তারা নয়। এছাড়াও আরও কত কী জগতে রয়ে গেছে যা আমি খেয়ালই করিনি। এটা মনে হতেই, আমি এক উদ্ধারহীন অসহায়তা অনুভব করলাম। কোথাও গিয়েই সেই অসহায়তার হাত থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

আমি কেবিনের ভেতরে ঢুকে এসে, স্টোভের ভেতরে জ্বালানি কাঠ ঢুকিয়ে, খুব সাবধানে জড়ো করলাম। ড্রয়ারের ভেতরের পুরনো খবরের কাগজ পাকিয়ে দেশলাই দিয়ে তাতে আগুন ধরালাম। শিখাটা জ্বালানি কাঠে চালান হল কিনা সেটা দেখে নিলাম। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্যাম্পে গিয়ে কাঠকুটো দিয়ে 'বনফায়ার' তৈরি করা শিখেছিলাম। ক্যাম্প এক বিচ্ছিরি ব্যাপার, তবে, অন্তত পক্ষে কিছু একটা কাজে লাগল। চিমনির ড্যাম্পার পুরোটা খুলে দিয়ে বাইরের বাতাস ভেতরে ঢোকালাম। প্রথমে ঠিকমত হল না, তবে, শেষ অবধি একটা কাঠে আগুন ধরল। একটা থেকে অন্যগুলোতে ধরতে লাগল। স্টোভে ঢাকনা দিয়ে, চেয়ারটা তার সামনে রেখে, হাতের কাছে ল্যাম্পটা এনে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই আলোয় বইটা তারপর থেকে পড়তে শুরু করলাম। আগুন একটু একটু করে বেড়ে যাওয়ার পর তার উপরে জলভর্তি কেটলি রেখে, ফোটালাম। কেটলির ঢাকনাটা মাঝেমাঝে বেশ প্রীতিকর আওয়াজ করছিল।

আইখ্‌ম্যানের পরিকল্পনা মোটেই হুবহু রূপায়িত হয়েছিল এমন নয়। স্থানীয় পরিস্থিতিতে হিসেব মত সব এগোয়নি প্রতিক্ষেত্রে। সেসব ক্ষেত্রে আইখম্যান কিছুটা মানুষের মতোই হয়ে যেতেন। এককথায়, রেগে যেতেন। ডেস্কের ওপরে জন্ম দেওয়া ওঁর চমৎকার হিসেব নিকেশের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেওয়া নানা অনিশ্চয়তার উপাদানের এই সীমাহীন অশিষ্টতা ওঁর ঘৃণা জাগিয়ে তুলত। ট্রেন লেট হত। আমলাতান্ত্রিক নিয়মাবলীর ফাঁসে কাজ আটকে যেত। কম্যান্ডিং অফিসার পালটে গিয়ে উপযুক্ত বিকল্প পাওয়া যেত না। পুবের ফ্রন্টে বিপর্যয়ের পর ক্যাম্পের মিলিটারি গার্ডদের ফ্রন্টে স্থানান্তরিত করা হল। অত্যাধিক তুষারপাত হল। বিদ্যুৎ চলে যেত। গ্যাস অপ্রতুল হয়ে পড়ত। রেললাইনে বোমাবর্ষণ হত। আইখ্‌ম্যান সেই যুদ্ধটাকেই ঘৃণা করতে লাগলেন—ওটা তখন ওঁর পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটানো 'অনিশ্চয়তার উপাদান'।

আদালতকক্ষে এইসব খুঁটিনাটি বিশদে বলার সময় উনি ছিলেন নির্বিকার, অভিব্যক্তিতে কোনোরকম পরিবর্তনহীন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। ওঁর জীবনের প্রায় পুরোটাই হল এইসব প্র্যাকটিকাল খুঁটিনাটি দিয়ে তৈরি।

ঘড়িতে যখন ১০টা দেখাল, আমি বই পড়া থামিয়ে, দাঁত মেজে, মুখ ধুলাম। চিমনির ড্যাম্পার বন্ধ করে দিলাম, ঘুমোতে ঘুমোতে আগুন স্বাভাবিক ভাবেই নিভে যাবে। জ্বালানি কাঠের অবশিষ্ট আগুন থেকে ঘরে একটা কমলা রঙের আলো বেরুচ্ছে। ঘরের ভেতরটা বেশ উষ্ণ, সেই আরামে নার্ভাসনেসের আর ভয়ের অনেকটা উপশম হল। কেবল টি-শার্ট আর বক্সার-শর্টস পরে আমি স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়ে, গতরাতের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক ভাবে চোখ বন্ধ করলাম। একটু সাকুরার কথা ভাবলাম। "আমি যদি সত্যিই তোমার দিদি হতাম, তাহলে ভালই হত, কী বল?" ও বলেছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এর বেশি অন্যকিছু আর সাকুরা সম্বন্ধে ভাববো না ঠিক করেছি। চাই না যে ঘুমটা চলে যাক। স্টোভের মধ্যে জ্বালানি কাঠ ফেটে ফেটে যাচ্ছে। প্যাঁচার ডাক। তারপরে সব মিশে যাচ্ছে, আমাকে একটা স্বপ্নের মধ্যে টেনে নিল।

পরদিনও মোটামুটি একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হল। সকালে ছ'টা বাজতেই পাখির কলকাকলিতে চোখ মেললাম। জল ফুটিয়ে চা খেয়ে, ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেলাম। পর্চে বই পড়ে, ওয়াকম্যানে সংগীত শুনে, ঝর্ণায় জল আনতে গেলাম। বনের পথে আবার হাঁটলাম। এবার কম্পাসটা নিয়ে বেরোলাম। জায়গায় জায়গায় সেটায় চোখ ফেলে, কেবিনটা কোনদিকে মোটামুটি ধরতে পারছিলাম। তারপর যন্ত্রপাতির শেড থেকে খুঁজে পাওয়া বাটালি নিয়ে গিয়ে গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে চোখে পড়ার মত চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। ধন্দে ফেলে দেওয়ার মতো ছড়িয়ে যাওয়া লতাগুল্ম, আগাছা ছেঁটে পরিষ্কার করে রাস্তা চেনাটা সহজ করে রাখলাম।

অরণ্য গতকালের মতই গভীর ও অন্ধকার। মাথা তুলে দাঁড়ানো গাছেরা পুরু দেওয়াল হয়ে আমার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। কালচে রঙের কী একটা যেন trompe l'oeil-এর জন্তুর মত করে গাছপালার মধ্যে চেহারা আড়াল করে, আমার গতিবিধিতে নজর রাখছে। তবে, গতকালের মত গায়ে কাঁটা দেওয়া তীব্র ভয়ের অনুভূতি আর নেই। আমি নিজের নিয়ম নিজে তৈরি করে, সেটা সযত্নে পালন করে চলেছি। এভাবে চললে আর রাস্তা হারানোর কথা নয়। হয়তো।

গতকাল যে অবধি হেঁটে এসে থেমেছিলাম, সেই অবধি এসে সামনে আরো এগোলাম। সব ঢেকে দিয়ে রাস্তা লুকিয়ে ফেলা ফার্নের সমুদ্রে পা রাখলাম। খানিক এগোতেই, পায়ে চলা রাস্তার পরের অংশটুকু আবিষ্কার করলাম। তারপর আবারও গাছপালার দেওয়াল পরিবৃত হয়ে পড়লাম। ফেরার পথ যাতে চট করে খুঁজে পাওয়া যায়, সেইজন্য জায়গায় জায়গায় বাটালি দিয়ে গাছের কান্ডে দাগ কেটে রাখলাম। মাথার ওপরে গাছের ডালে কোথাও,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহিরাগতকে সাবধান করে দিতে একটা বড় পাখিডানা ঝাপটাল। কিন্তু সেদিকে চোখ তুলে এদিক ওদিক তাকিয়েও কোথাও কোনও পাখি দেখা গেল না। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গিয়ে তেষ্টা পেয়ে গেল, মাঝেমাঝেই ঢোঁক গিলতে হচ্ছে। গেলার সময় শব্দ হচ্ছে জোর।

খানিক এগিয়েই, গোলাকৃতি একটা ফাঁকা জায়গা। উঁচু উঁচু গাছ জায়গাটাকে ঘিরে আছে, ঠিক যেন একটা কুঁয়োর তলদেশ। খালি ডালের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো সোজা নেমে এসে স্পটলাইটের মত পায়ের নিচের জমি উজ্জ্বল আলোকিত করে তুলেছে। আমার ওই জায়গাগুলোকে কেমন যেন খুবই বিশেষ জায়গা বলে বোধ হচ্ছিল। আমি সেই আলোর মধ্যে বসে পড়ে সূর্যের অল্প উত্তাপ নিতে থাকলাম। পকেট থেকে চকলেট বার বের করে কামড় বসালাম, মুখের ভেতর মিষ্টি স্বাদটা ছড়িয়ে পড়াটা উপভোগ করলাম। সূর্যের কিরণ মানুষের পক্ষে কতটা জরুরি, বেশিরভাগ জিনিসই না জানলেও, এটুকু আমি জানি। সেই সম্পদ প্রতিটি সেকেন্ডে শরীর দিয়ে আস্বাদন করলাম। কাল রাতে, সেই অসংখ্য তারা দেখে হওয়া তীব্র ভয়ের অনুভূতি আর অসহায়তাবোধ আমার ভেতর থেকে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে সূর্য তার অবস্থান পাল্টাচ্ছে, আলোও হারিয়ে যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে, আসার রাস্তা ধরে কেবিনে ফিরলাম।

দুপুরের পরেই অন্ধকার মেঘে মাথার ওপরটা ঢেকে গেল। পরিমন্ডল রহস্যজনক রঙে রেঙে উঠছে। কোনো ফাঁক না রেখে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে, ছাদ আর জানালার কাঁচ থেকে করুণ আর্তনাদ উঠতে লাগল। আমি তক্ষুণি পোশাক ছেড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাবান দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলে, শরীর ধুতে থাকলাম। দারুণ অনুভূতি। আমি জোরে জোরে অর্থহীন কথা চেঁচিয়ে দেখলাম। বৃষ্টির শক্ত ফোঁটা নুড়ির মতো এসে সারা গায়ে লাগছে। সেই চনমনে ব্যথা যেন কোনো ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হচ্ছিল। ওগুলো আমার গালে এসে লাগছিল, চোখের পাতায় এসে লাগছিল, বুকে এসে লাগছিল,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেটে এসে লাগছিল, পুরুষাঙ্গে এসে লাগছিল, অন্ডকোষে এসে লাগছিল, পিঠে এসে লাগছিল, পায়ে এসে লাগছিল, পাছায় এসে লাগছিল। চোখ খুলে রাখা যাচ্ছিল না। সেই ব্যথা অভ্রান্তভাবে অন্তরঙ্গতাও বহন করছে। এই জগতে, নিজেতে আবদ্ধ না থেকে আমি যেন এক সমদর্শিতার আশ্রয় পাচ্ছিলাম। একথা ভাবতে ভাল লাগছিল। নিজেকে যেন হঠাৎ করেই মুক্ত বলে অনুভব করছিলাম। আমি দু'হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে, মুখ বড় করে হাঁ করে, নেমে আসা জল পান করলাম।

কেবিনে ফিরে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছলাম। বিছানায় বসে, নিজের পুরুষাঙ্গের দিকে তাকালাম। ওটি ঘিরে থাকা চামড়াটা সদ্য গুটিয়েছে, উজ্জ্বল বর্ণের, স্বাস্থ্যবান একটি পুরুষাঙ্গ। অগ্রভাগে বৃষ্টির আঘাতের ব্যথাটা মৃদু রয়ে গেছে। আমারই জিনিস হয়েও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার ইচ্ছার বশবর্তী হয়না, এমন বিচিত্র এক শারীরিক অঙ্গ। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আমার চিন্তার থেকে পৃথক কিছু, ও একা একা চিন্তা করছে বলে দেখে মনে হচ্ছিল।

ওশিমাও আমারই বয়েসে এখানে একা একা এসে ছিল, যথারীতি ওরও কি এরকম যৌন আকাঙ্ক্ষার সমস্যায় তাড়িত হতে হয়েছিল? সম্ভবত তাড়িত হওয়ারই কথা। বয়েসটা সেরকমই। তবে, ও নিজেই এ ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নিত, এ আমি কল্পনাই করতে পারি না। সেরকম কিছু করার পক্ষে ওশিমা বড়োই উদাসীন, নির্বিকার।

"আমি একজন বিশেষ ধরণের মানুষ", ওশিমা বলেছিল। এতে করে তখন ও কী বলতে চেয়েছিল, আমি জানি না। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতেই কথাটা ওর মাথায় এসেছিল, এমন যে নয়, তা আমি জানি। নেহাতই কোনও অর্থপূর্ণ কি ইঙ্গিতময় কথা যে নয়, তা-ও জানি।

হাত বাড়িয়ে হস্তমৈথুন করার কথা ভাবলাম। কিন্তু, কী মনে করে আর করলাম না। ঐভাবে প্রবল বর্ষণপীড়িত হওয়ার পরের রোমাঞ্চময় পবিত্র অনুভূতিটাকে, কিছুক্ষণ রেখে দিতে চাইছিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নতুন বক্সার-শর্টস পরে, কয়েকবার গভীর শ্বাস নিয়ে, এরপর বৈঠক দিতে শুরু করলাম। একশো বার ওঠ-বোস হয়ে গেলে, এরপর একশো বার সিট-আপ। আমি একটা একটা করে প্রত্যেকটি পেশির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে থাকি। একবারে টানা ব্যায়ামের পরে মাথাটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টিটা ধরে এল, মেঘ সরে গিয়ে সূর্য দেখা দিল, পাখিরা আবার ডাকাডাকি শুরু করল।

কিন্তু এই নিরুপদ্রব পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, সে তুমি জান। এটি নাছোড়বান্দা জন্তুর মত তোমাকে যতদূর দরকার পেছনে তাড়া করে আসবেই। গভীর বনের মধ্যে ওরা এসে হাজির হবে। ওরা টাফ, ওরা নাছোড়বান্দা, ওরা নির্দয়, ক্লান্তি কিংবা হাল ছেড়ে দেওয়া বলে কিছু জানে না। এখনকার মতো এখানে হস্তমৈথুন করা থেকে নিজেকে সংযত করলেও, ওটি শেষ অবধি স্বপ্নদোষ হয়ে এসে হাজির হওয়ার কথা। সেই স্বপ্নের মধ্যে তুমি, সত্যিকারের দিদি কি মাকে বলাৎকার করে বসবে হয়তো। সেটা তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। ওটি তোমার ক্ষমতার বাইরের ব্যাপার। কেবল পাবে।

তুমি কল্পনাশক্তিকে ভয় পাও। তার চেয়েও ভয় পাও স্বপ্নকে। স্বপ্নের মধ্যে উদ্ভব হতে পারে এমন দায়িত্বকে ভয় পাও। তবে, না ঘুমিয়ে তো উপায় নেই, আর ঘুমোলেই স্বপ্ন এসে হাজির হবে। চোখ খোলা অবস্থায় কল্পনাশক্তিকে ঠেলে থামানো যায়। কিন্তু স্বপ্নকে ঠেলে থামানো যায় না।

আমি বিছানার ওপর শুয়ে পড়ি, হেডফোনে 'প্রিন্স' শুনতে থাকি। সেই বিচিত্র বিরামহীন সংগীতে মনসংযোগ করি। একটাই ব্যাটারি, "লিটল-রেড-কোয়ায়েট" চলতে চলতে মাঝখানে শেষ হয়ে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংগীতও চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার মতো করে মিলিয়ে যায়। হেডফোন খুলে রাখতেই, শুনতে পাই নৈঃশব্দ্য।

নৈঃশব্দ্য কানের শোনার মতোই জিনিস। আমি সেটা জানি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬

কালো কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে, নাকাতাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। রান্নাঘরটা স্টাডি থেকে বেরিয়ে, অন্ধকার করিডর ধরে অল্প একটু হাঁটলেই। তেমন জানালা নেই, অন্ধকার। সবকিছু পরিষ্কার, গোছানো, তবে, কেমন যেন একটা অজৈব পরিবেশ, স্কুলের ল্যাবোরেটরির মতো দেখাচ্ছিল। কুকুরটা রেফ্রিজারেটারের দরজার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে, পেছনে ফিরে শীতল চোখে নাকাতার মুখের দিকে তাকাল।

বাঁদিকের পাল্লাটা খুলুন, কুকুরটা নিচু গলায় বলল। তবে, কুকুরটা যে সত্যি সত্যিই কথা বলছে না, সেটা নাকাতাও বুঝতে পারছিল। আসলে কথাটা বলছে জনি ওয়াকার। সে কুকুরটার মধ্যে দিয়ে নাকাতার সঙ্গে কথা বলছে। কুকুরটার চোখ দিয়ে নাকাতাকে দেখছে।

যেমন বলা হয়েছে, নাকাতা রেফ্রিজারেটারের বাঁদিকের অ্যাভোকাডো-গ্রীন রঙের পাল্লাটা খুলল। নাকাতার উচ্চতার চেয়েও রেফ্রিজারেটারটা উঁচু। পাল্লা খুলতেই, কাটাং করে একটা যান্ত্রিক শব্দ করে থার্মোস্ট্যাট সুইচ অন হয়ে গিয়ে, মোটর চলার শব্দ শুরু হয়ে গেল। ভেতর থেকে কুয়াশার মতো সাদা ধোঁয়া উপচে বেরিয়ে এল। বাঁদিকটা ফ্রীজার, তাপমাত্রা খুব নিচুতে সেট করা আছে বলে মনে হল।

ভেতরে গোল গোল ফলের মতো জিনিস সুন্দর সার দিয়ে রাখা আছে। সংখ্যায় গোটা কুড়ি হবে। এছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই। নাকাতা কোমর থেকে সামনে ঝুঁকে, ভালো করে নজর করে দেখল। সাদা ধোঁয়া অনেকটা বাইরে বেরিয়ে যেতে, সার দিয়ে রাখা জিনিসগুলো যে ফল নয় তা বোঝা গেল। ওগুলো বেড়ালের মাথা। ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও সাইজের বেড়ালের মাথা কেটে নিয়ে, ফলের দোকানে সার দিয়ে রাখা কমলার মতো করে, রেফ্রিজারেটারের তাকগুলোতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন থাকে সাজিয়ে রাখা আছে। প্রত্যেকটি বেড়ালেরই মুখটা সোজা এইদিকে মুখ করে হিমায়িত করে রাখা আছে। নাকাতার শ্বাসরোধ হয়ে এল।

ভালো করে দেখুন, কুকুরটা নির্দেশ দিল। *ওগুলোর মধ্যে গোমা আছে কিনা, আমি নিজেও দেখে নিচ্ছি।*

নাকাতাও নির্দেশ পালন করে, বেড়ালের মুখ একটা একটা করে তারপর দেখল। এটা করার সময় বিশেষ ভয় করেনি। নাকাতার মাথায় ছিল মুখ্যতঃ, নিরুদ্দেশ গোমাকে খুঁজে পাওয়া। নাকাতা খুঁটিয়ে সবগুলো বেড়ালের মুখ পরীক্ষা করে দেখে, নিশ্চিত হয়ে নিল যে সেখানে গোমা নেই। কোনও সন্দেহ নেই। তিনরঙা বেড়ালই নেই। শুধু মাথাটুকু হয়ে থাকা বেড়ালেরা, সকলেই অদ্ভুত অভিব্যক্তিশূন্য মুখ করে রয়েছে। মুখের ভাবে কষ্টের আভাস আছে এরকম একজনও নেই। নাকাতা এতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এদের মধ্যে অল্পই ক'জনের চোখ বন্ধ ছিল বটে, অধিকাংশই ভাবলেশহীন মুখে শূন্যে কোনো একটা বিন্দুর দিকে চেয়ে।

"গোমা তো এর মধ্যে নেই বলে মনে হচ্ছে", নাকাতা ওঠাপড়া নেই এরকম গলায় কুকুরটাকে বলল। তারপর গলা খাকারি দিয়ে রেফ্রিজারেটারের পাল্লা বন্ধ করল।

নিঃসন্দেহে।

"হ্যাঁ, এতে কোনও ভুল নেই।"।

কুকুর উঠে পড়ে, নাকাতাকে আবার স্টাডিতে ফেরত নিয়ে গেল। সেখানে জনি ওয়াকার সেই চামড়ায় মোড়া সুইভেল চেয়ারে, একই ভঙ্গিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। নাকাতা সেই ঘরে প্রবেশ করতে, সে স্যালুট করার মত করে সিল্ক হ্যাটের কানায় হাত ছুঁইয়ে, অমায়িক ভাবে হাসল। তারপর ঠাসঠাস করে দু'বার হাতে তালি দিল। কুকুরটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

"ওই বেড়ালগুলোর, সবগুলোর গলা আমি কেটেছি", জনি ওয়াকার এবার বলে। বলে হুইস্কির গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে একচুমুক খায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সংগ্রহ করে রাখছি"।

"জনি ওয়াকার-সান, আপনিই তাহলে সেই লোক যে ওই ফাঁকা জমিতে বেশ কয়েকটা বেড়াল ধরে, মেরে ফেলেছে?"

"ঠিকই ধরেছেন। ঠিক তাই। আমিই সেই বিখ্যাত বেড়াল নিধনকারী জনি ওয়াকার"।

"নাকাতা ভাল বুঝতে পারছে না বলে, একটা প্রশ্ন করতে পারে কি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই", জনি ওয়াকার বলে। বলে হুইস্কির গ্লাসটা শূন্যে তুলে ধরে। "যে কোনও প্রশ্নই করে বাধিত করুন। সেটার উত্তরও দেওয়া যাক। তবে, সময় বাঁচাতে, কথা যাতে সম্মুখবর্তী হয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তাই মাফ চেয়ে নিচ্ছি, প্রথমেই আপনি এটা জানতে চান তো যে আমাকে কেন বেড়াল মারতে হচ্ছে ? কেন ওদের মাথা সংগ্রহ করে রাখতে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সেটাই নাকাতা জানতে চায়"।

জনি ওয়াকার গ্লাসটা ডেস্কের ওপরে রেখে, সোজা নাকাতার মুখের দিকে তাকায়।

"মারাত্মক গোপন ব্যাপার, তাই সাধারণ লোককে জনে জনে বলা যাবে না, হ্যাঁ, নাকাতা-সান বলেই আজ আলাদা করে বলে দিচ্ছি। মুখ ফস্কে যাকে তাকে বলা যাবে না কিন্তু—আবার এটাও ঠিক, বললেই যে কেউ বিশ্বাস করে নেবে এমনটাও সম্ভবত নয়"।

একথা বলে জনি ওয়াকার খিক্‌খিক্ করে হাসল।

"বলি তাহলে, আমি যে এভাবে বেড়াল মারছি, সে কেবল মজা পাচ্ছি বলে মারছি, তা নয়। শুধুমাত্র মজা পাওয়ার জন্য অতগুলো বেড়াল মারার মতো অসুস্থ মানসিকতা আমার নয়। বলতে কি, আমি ততটা বেকার লোক নই। কেননা, এভাবে বেড়াল জড়ো করে মেরে ফেলতেও বেশ পরিশ্রম লাগে। আমি বেড়াল মারি, ওদের আত্মাগুলোকে একত্র করতে। ওই জড়ো করা বেড়ালের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আত্মা দিয়ে একটা বিশেষ রকমের বাঁশি বানাব। তারপর সেই বাঁশি বাজিয়ে, আরো বড় আত্মা সব জড়ো করব। সেই আরো বড় সব আত্মা একত্র করে, আরো বড় বাঁশি বানাব। সবশেষে, সম্ভব হলে একটা মহাজাগতিক বিশাল বাঁশি বানানোর কথা। কিন্তু সবার প্রথমে বেড়াল। বেড়ালের আত্মা জড়ো না করলে চলবে না। ওটা স্টার্টিং পয়েন্ট। সবকিছুতেই একটা কোনো সুনির্দিষ্ট অনুক্রম মেনে এগোতে হয়। এই অনুক্রমটিকে নিখুঁতভাবে পালন করাটা হচ্ছে, এককথায় এটাকে মর্যাদা দেওয়া। আত্মা নিয়ে কিছু করা তো, এরকমই হওয়া উচিত। আনারস কি তরমুজ নিয়ে কাজ করার চেয়ে এ আলাদা। ঠিক কিনা?"

"হ্যাঁ", নাকাতা উত্তরে বলল বটে, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা কী। বাঁশি? সোজা বাঁশি না আড়বাঁশি? আর তার আওয়াজই বা কেমন হবে? প্রথমত, বেড়ালের আত্মা জিনিসটাই বা কেমন জিনিস? এ তো নাকাতার বুদ্ধির নাগালের অনেক বাইরের সমস্যা। সে শুধু জানত, যেভাবেই হোক, তিনরঙা বেড়াল গোমাকে খুঁজে বের করে, সঙ্গে নিয়ে কোইজুমি-সানের ওখানে ফিরতে হবে।

"কিন্তু, আপনি যে করে হোক, গোমাকে নিয়ে ফিরতে চান", জনি ওয়াকার যেন নাকাতার মনের কথা পড়তে পেরে বলল।

"হ্যাঁ। ঠিক তাই। আমি গোমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইছি।"

"সেটা আপনার উদ্দেশ্য", জনি ওয়াকার বলে। "আমরা সবাই নিজের নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে বাঁচি। সেটাই স্বাভাবিক। সেটা যেরকম, আপনি তো বেড়ালের আত্মা জড়ো করে তৈরি বাঁশির আওয়াজ কখনও শোনেননি, তাই না?"

"হ্যাঁ। শুনিনি।"

"সেটাই স্বাভাবিক। ওটি কিন্তু কানে শোনার জিনিস নয়"।

"আওয়াজ শোনা যায় না এমন বাঁশি তো?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সেরকমই। তবে, আমি অবশ্যই শুনতে পাই। আমি শুনতে পাই না, এরকম কিছু হয়ই না। তবে, সাধারণ লোকের কানে পৌঁছোয় না। সেই বাঁশির শব্দ শুনতে পেয়েও, শুনতে যে পেয়েছে সেটা বুঝতে পারে না। কখনও শুনে থাকলেও, মনে করতে পারে না। অদ্ভুত এক বাঁশি। তবে, এমন হতে পারে, নাকাতা-সানের কানে হয়তো ধরা পড়ল। এখানে সত্যিই বাঁশিটা থাকলে পরীক্ষা করে দেখা যেত, দুর্ভাগ্যবশত, এখন নেই", জনি ওয়াকার বলল। তারপর, যেন মনে পড়ে গেছে এইভাবে, শূন্যে একটা আঙুল তুলল। "সত্যি কথা বলতে কী, নাকাতা-সান, ঠিক এক্ষুণি ভাবছিলাম যে এখন থেকে, বেড়ালদের মাথা একটু দেখেশুনে কাটব। ক্রমে ফসল তোলার সময় এসে গেছে কিনা ভাবছিলাম, বুঝলেন তো। সেই ফাঁকা জমিতে জড়ো হওয়া বেড়ালও, যা ধরার ধরা হয়ে গেছে, অন্যত্র স্থানান্তরে যাওয়ার সময় এসেছে। আপনি যাকে খুঁজছেন, সেই গোমাও এই ফসলের মধ্যেই পড়ছে। অবশ্যই মাথা কেটে ফেললে আর আপনি কোইজুমি-সানের কাছে গোমাকে নিয়ে ফিরতে পারবেন না। তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিকই", নাকাতা বলে। বেড়ালের কাটা মুন্ডু কোইজুমি-সানের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দু'টো বাচ্চা মেয়ে সে জিনিস দেখলে, চিরকালের মতো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেবে হয়তো।

"আমার ইচ্ছে গোমার গলাটা কাটি। আপনার তাতে প্রয়োজন নেই। পারস্পরিক উদ্দেশ্য, পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাত হচ্ছে। পৃথিবীতে যে এরকম কত হচ্ছে! তখন একটা রফা হয়। দেখুন, ব্যাপার হল, আপনি যদি 'একটা কাজ' করে দেন, আমি আপনার কাছে গোমাকে অক্ষত শরীরে, সুস্বাস্থ্যে প্রত্যর্পণ করব", নাকাতা মাথার ওপর হাত রেখে, হাতের তালু দিয়ে মাথার ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলাতে লাগল। কিছু একটা সিরিয়াসলি ভাবতে গেলে ওরকম করতে হয়।

"নাকাতাকে দিয়ে কি কাজটা হবে?"

"সেকথার তো এইমাত্র মীমাংসা হয়ে গেল বলে মনে হয়। কী?" তিক্ত হাসি সহকারে জনি ওয়াকার বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। ঠিকই", মনে পড়ে গিয়ে নাকাতা বলল। "ঠিকই। সেকথার তো এইমাত্র মীমাংসা হয়ে গেল। মাফ করবেন।"

"সময় বেশি নেই। কথা না বাড়িয়ে আসল কথা বলে ফেলা যাক। যে কাজটা আপনার আমাকে করে দিতে হবে, সেটি হল, আমায় হত্যা করতে হবে। আমার প্রাণটি নিতে হবে।"

নাকাতা, হাতটা মাথার ওপর রাখা অবস্থাতেই, অনেকক্ষণ জনি ওয়াকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"নাকাতার কি জনি ওয়াকার-সানকে মেরে ফেলতে হবে?"

"ঠিক তাই", জনি ওয়াকার বলে। "সত্যি বলছি, আমি না এভাবে বেঁচে থাকতে থাকতে ক্লান্ত, নাকাতা-সান। বহুদিন ধরে বেঁচে আছি। এত দীর্ঘকাল যে বয়েস অবধি ভুলে গেছি। আর এর পরে বাঁচার ইচ্ছেও নেই। বেড়াল মেরে মেরেও খানিকটা অবসন্ন। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি, তদ্দিন বেড়াল না মেরে উপায় নেই। সেগুলোর আত্মা একত্র না করে উপায় নেই। ক্রমানুসারে ১ থেকে ১০ অবধি গিয়ে, ১০-এ পৌঁছে আবার ১-এ ফিরি। এইটেরই অনন্তকাল পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া। একঘেঁয়েও বটে, ক্লান্তিকরও। এটা করে কিন্তু আমি কারুকে খুশিও করছি না। এটা যে খুব সম্মানের কাজ, তা-ও নয়। অথচ, এটাই ঠিক হয়ে আছে, তাই নিজে থেকে "হ্যাঁ, শেষ করে দিলাম", বলে শেষ করে দেওয়ারও উপায় নেই। আর নিজেকে নিজে মেরে ফেলার ক্ষমতাও নেই। সেটাও আবার নিয়ম। আত্মহত্যা করতে পারছি না। তাতে তো অনেক বাধানিষেধ। মরতে চাইলে, কেবলমাত্র কারুকে অনুরোধ করে খুন করাতে হবে। সেইজন্যই আমার আপনার হাতে মরা প্রয়োজন। আতঙ্ক, ঘৃণা, এসব নিয়ে ঠিকমত মরতে চাই। প্রথমে আপনি আমাকে ভয় পাবেন। তারপর ঘৃণা করবেন। তিরস্কার করে তারপর মারবেন।"

"কেন—", নাকাতা জিজ্ঞেস করে। "তারজন্য নাকাতা কেন? এযাবৎ মানুষ মারার কোনও অভিজ্ঞতা নাকাতার নেই। এরকম কিছুর জন্য নাকাতা খুব একটা যোগ্য নয়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সে আমি ভালোই জানি। আপনি কখনও মানুষ খুন করেননি, খুন করার কথা ভাবেনওনি। এই কাজের জন্য আপনি তেমন উপযুক্ত লোক নন। কিন্তু, জানেন তো, জগতে এইসব তত্ত্ব ঠিক খাটে না এমন জায়গাও আছে। উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, এসব কেউ ভেবেও দেখে না, এরকম পরিস্থিতিও হয়। সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। যুদ্ধ এর একটা উদাহরণ। যুদ্ধ কী, জানেন তো?"

"হ্যাঁ, যুদ্ধের কথা জানি। নাকাতার জন্মের সময় বড়ো একটা যুদ্ধ হচ্ছিল। শুনেছি সেকথা।"

"যুদ্ধ হলে মিলিটারিতে ডাক পড়ে। মিলিটারিতে ডাক পড়লে, বন্দুর ঘাড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের হত্যা করতে হয়। আপনার মানুষ মারতে ভাল লাগে কি খারাপ লাগে, কেউ তা বিবেচনা করে দেখবে না। ওটি করতেই হবে। তা না হলে উলটে আপনি নিহত হবেন।"

জনি ওয়াকার তর্জনির অগ্রভাগ নাকাতার বুকের দিকে তাগ করল। মুখ দিয়ে আওয়াজ করল, "গুড়ুম!"। "এটাই মানবজাতির ইতিহাসের সার কথা।"

নাকাতা জিজ্ঞেস করে, "গভর্নর কি নাকাতাকে মিলিটারিতে ডেকে, মানুষ মারো, বলে নির্দেশ দেবে?"

"হ্যাঁ, গভর্নর তাই নির্দেশ দেবে। মানুষ মারো বলে।"

নাকাতা এটা নিয়ে একটু ভেবে দেখে, তবে, ঠিকমতো গুছিয়ে চিন্তা করে উঠতে পারে না। কেন যে গভর্নর ওকে মানুষ মারার নির্দেশ দেবে কে জানে।

"এই কারণেই, আপনাকে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত এভাবে ভাবতে হবে। যে এটা হল একটা যুদ্ধ। আর আপনি একজন সৈনিক। এখন এখানেই মনস্থির করতে হবে। আমি বেড়ালগুলোকে মারব, না কি আপনি আমাকে মারবেন, দু'টোর মধ্যে কোনটা? আপনি এখন এখানে, বেছে নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। অবশ্যই আপনার চোখে হয়তো, এটা একটা যুক্তির দিক থেকে ভিত্তিহীন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চয়েস। কিন্তু, সেভাবে ভেবে দেখলে, এজগতের প্রায় সব চয়েসই কি যুক্তির দিক থেকে ভিত্তিহীন নয়?"

জনি ওয়াকার সিল্কহ্যাটে আলতো করে হাত ছোঁয়াল, টুপিটা ঠিকমতো মাথার ওপরে আছে কিনা দেখে নেওয়ার মতো করে।

"কেবল একটা কথা, আপনার সাহায্যই হবে—আপনার সহায়তা করতে কোনোরকম কাজে লাগতে পারে এটা—আমি নিজে কিন্তু মন থেকে মৃত্যুই কামনা করছি। আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে মেরে ফেলতে। প্রার্থনা করছি আপনার কাছে। ফলে, আপনার আমাকে মারতে কোনোরকম বিবেকের দংশন অনুভব করার দরকার নেই। কারণ হল, যেটাই হোক, আমি স্বেচ্ছায় সেটা করছি। তাই না? মরতে চায় না এমন লোককে অহেতুক মেরে ফেলা নয়। একে তো বরং সুকৃতিই বলা যায়, কী?"

নাকাতা কপালে যেখান থেকে চুল শুরু হয়েছে, তার আশেপাশে ফুটে ওঠা ঘামের বিন্দুগুলো হাত দিয়ে মুছে নিল। "কিন্তু নাকাতার পক্ষে এতটা করা সম্ভব নয়। মেরে ফেলতে বললেও, ঠিক কী করা উচিত আমি জানিনা।"

"তাই তো দেখছি", জনি ওয়াকার চিন্তিত ভাবে বলে। "বুঝতে পারছি। সেও অবশ্য অযৌক্তিক নয়। কী করা উচিত জানা নেই যখন। যতই হোক, এই প্রথমবার মানুষ মারা তো...। ঠিকই তো। বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছেন। ঠিক আছে। আমি একটা উপায় বলে দিচ্ছি। মানুষ মারার সময় একদম স্টেডি থাকতে হবে, কোনওরকম ইতস্তত করা চলবে না। দৈত্য হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অবিচল থেকে, ঝটপট কাজ সেরে ফেলা—এটাই মানুষ মারার দৃঢ়তা। মানুষ নয় যদিও, একটা চমৎকার নমুনা দেখাচ্ছি। এটার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।"

জনি ওয়াকার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, ডেস্কের উলটো দিক থেকে একটা বড়ো চামড়ার কেস তুলে নিল। নিজে যে চেয়ারটায় একটু আগে বসেছিল সেটার ওপর ব্যাগটা রেখে, খুশি খুশি ভাব করে শিস দিতে দিতে ডালাটা খুলে, ঠিক যেন ম্যাজিক দেখাতে চলেছে এইভাবে ভেতর থেকে বের করল একটা বেড়াল। আগে কখনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেখা যায়নি বেড়ালটাকে। ছাইরঙা ডোরাকাটা হুলো বেড়াল। সবে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া অল্পবয়েসি বেড়াল। বেড়ালটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু চোখটা খোলা। কোনোমতে চেতনাটুকু বজায় আছে। জনি ওয়াকার যথারীতি শিস দিতে দিতে, ধরে তোলা মাছ যেন লোককে দেখাচ্ছে, এভাবে দুহাত দিয়ে বেড়ালটাকে তুলে ধরল। ডিজনী ফিল্মসের "স্নো-হোয়াইট"-এ সাতজন বামন যে গাইছিল, 'হেইহো—', ও সেটাই শিস দিয়ে করছিল।

"এই ব্যাগের মধ্যে পাঁচটা বেড়াল আছে। সবগুলোই ওই ফাঁকা জমিতে ধরা বেড়াল। একেবারে টাটকা টাটকা ধরা বেড়াল। ফ্যাক্টরি থেকে ডিরেক্ট ডেলিভারি, টাটকা তুলে আনা। ওষুধ ইঞ্জেকশন করে শরীর চলচ্ছক্তিহীন করে দেওয়া হয়েছে। অ্যানাস্থেসিয়া করে অবশ নয়। ফলে ঘুমোচ্ছে না, ইন্দ্রিয়ানুভূতি আছে। ব্যথা পাবে যেমনটি পাবার। কিন্তু পেশিগুলো শিথিল হয়ে আছে বলে হাত পা নাড়তে পারছে না। ঘাড়ও ঘোরাতে পারবে না। রেগে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে দিলে মুশকিল, তাই এরকম করা হয়েছে। এবার আমি ছুরি দিয়ে এই বেড়ালগুলোর পেটটা চিরে, তারপর ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিন্ডগুলো বের করে এনে গলাটা কাটব। আপনার চোখের সামনেই করব। অনেক রক্ত বেরোবে। তীব্র যন্ত্রনা হবে। আপনারও হবে, পেটটা চিরে হৃদপিন্ডটা বের করে আনলে। বেড়ালদেরও একইরকম। ব্যথা পেতেই হবে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমিও রক্তমাংসের মানুষ, স্যাডিস্ট নই। কিন্তু উপায় নেই। যন্ত্রনা হতেই হবে। সেরকমই নিয়ম, ঠিক হয়ে আছে। আবারও সেই নিয়মের কথা। সত্যিই, এতকিছু নিয়ম আছে না, এ অঞ্চলে! যেমনই হোক।"

নাকাতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনি ওয়াকার চোখ টিপল।

"কিন্তু কাজ কাজই। করণীয়ও করণীয়। একটি একটি করে সম্পন্ন করতে করতে, সবশেষে গোমার গতি করা হবে। এখনও সামান্য একটু সময় আছে বলে আপনি এরমধ্যে মনস্থির করে নিতে পারেন। আমি বেড়ালগুলোকে মারব, না আপনি আমায় মারবেন, দুটোর মধ্যে কোনটা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জনি ওয়াকার সেই নেতিয়ে পড়া বেড়ালটাকে ডেস্কের ওপর রাখে। তারপর ডেস্কের একটু নিচে একটা ড্রয়ার টেনে খুলে, একটা বড়ো কালোরঙের পার্সেল দুহাতে আগলে ধরে বের করে আনে। তারপর খুব সাবধানে কাপড়টা ছাড়িয়ে, ভেতরের জিনিস ডেস্কের ওপর সাজিয়ে রাখে। ছোট একটা গোল করাত, নানা সাইজের অস্ত্রোপচারের ছুরি, বড় ছুরি। প্রত্যেকটাই, যেন সদ্য ধার দেওয়া হয়েছে, এরকম ঝকঝকে, আলো ঠিকরাচ্ছে। জনি ওয়াকার, একটা একটা করে সস্নেহে প্রত্যেকটার ধার পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে, ডেস্কের ওপর সাজিয়ে রাখছিল। এরপরে, অন্য একটা ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ধাতব প্লেট বের করে, সেগুলোও ডেস্কের ওপর সাজিয়ে রাখল। যেন প্রত্যেকটার নির্দিষ্ট জায়গা অনুযায়ী। ড্রয়ারের ভেতর থেকে কালো রঙের বড়ো একটা প্লাস্টিকের জঞ্জাল ফেলার থলেও বের করল। এই পুরো সময়টা ধরে ও "হেইহো—!" শিস দিয়ে করে গেল।

"সবকিছুরই, নাকাতা-সান, কোনটার পর কোনটা, ঠিক হয়ে থাকা দরকার", জনি ওয়াকার বলে। "এর পরে যেটা, সেটাকে খেয়াল না করে এগিয়ে গেলে চলবে না। মিস করে গেলেই, পায়ের নিচটা না দেখে লোকে প্রায়ই হোঁচট খাবে। আবার, কেবল পায়ের নিচের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে গেলেও চলে না। সামনেটা ভাল করে না দেখে এগোলে, কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। তাই, সামনেটাও একটু দেখতে দেখতে, যেটার পরে যেটা, সেই অনুযায়ী ঠিকমত সবটা করে যেতে হবে। এরকমটাই জরুরি। যেকোনো ব্যাপারেই।"

জনি ওয়াকার চোখটা কুঁচকে, বেড়ালটার মাথায় কিছুক্ষণ আদর করে হাত বোলাতে থাকল। তারপর তর্জনির ডগাটা, বেড়ালটার নরম পেটের ওপর উপরে নিচে আনল নিল। এবার ডানহাতে একটা ছুরি নিয়ে, কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই, কোনোরকম ইতস্তত না করে, বাচ্চা হুলোটার পেটটা সরলরেখা বরাবর চিরে ফেলল। চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। পেটটা লম্বালম্বি হাঁ হয়ে ফাঁক হয়ে গিয়ে, ভেতর থেকে লালরঙের নাড়িভুড়ি উপচে পড়ার মতো করে বেরিয়ে এল। বেড়ালটা মুখ ফাঁক করে আর্তনাদ করতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ তেমন বেরুলো না। জিভ তো অবশ। মুখটাও ঠিক মতো ফাঁক হচ্ছে না। কিন্তু ওর চোখ, কোনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সন্দেহের অবকাশই নেই, তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছিল। সেই যন্ত্রণা যে কতটা তীব্র সেটা নাকাতা কল্পনা করতে পারল। তারপর হঠাৎ করে যেন মনে পড়ে গিয়েছে, এভাবে রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। সেই রক্ত জনি ওয়াকারের হাত ভিজিয়ে, ওয়েস্ট কোটে ছিটকে গিয়ে লাগল। কিন্তু জনি ওয়াকার সেই রক্তের ব্যাপারে কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না। "হেইহো—!" শিস দিতে দিতে বেড়ালটার দেহের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে, একটা ছুরির সাহায্যে অত্যন্ত দক্ষতায় হৃৎপিন্ডটা কেটে বের করে আনল। ছোট্ট একটা হৃৎযন্ত্র। দেখা গেল, যেন তখনও ধুকপুক করছে। তখন সেই রক্তমাখা হৃদপিন্ডটা হাতের তালুতে স্থাপন করে ও নাকাতার দিকে নির্দেশ করল।

"দেখুন, এটা হৃৎপিন্ড। এখনও চালু আছে। দেখে নিন।"

কিছুক্ষণ নাকাতাকে ওটা দেখিয়ে নিয়ে, জনি ওয়াকার অবলীলায়, ওটিকে ওই অবস্থায় মুখের ভেতর চালান করে দিল। কচমচ করে মুখ চলতে লাগল। কোনও কথা না বলে অভিনিবেশ সহকারে সেটিকে আস্বাদন করতে করতে, সময় নিয়ে চিবোলো। সেই চোখে তখন, সদ্য তৈরি গরম কেক মুখে দিয়ে শিশুর যেমনটি হয়, সেরকম অবিমিশ্র উল্লাসের রঙ ধরেছে। তারপর ঠোঁটের আশেপাশে লেগে থাকা রক্তের ছিটে হাতের পেছনটা দিয়ে মুছে নিল। জিভের ডগা দিয়ে সংযতভাবে ঠোঁটও চেটে নিল।

নাকাতা, নির্বাক এই দৃশ্যটি অবলোকন করছিল। চোখ সরাতে পারছিল না। অনুভব করল যে ওর মাথার মধ্যে কী যেন নড়তে চড়তে শুরু করেছে। সদ্যনির্গত রক্তের গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। "হেইহো—!" শিস দিতে দিতে জনি ওয়াকার এবার বেড়ালের গলাটা করাত দিয়ে কেটে নিল। করাতের দাঁতগুলো কড়মড় আওয়াজ তুলে হাড় কাটল। সবটাই খুবই অভ্যস্ত হাতে। হাড় তেমন মোটা নয়, তাই সময়ও বেশি লাগল না। কিন্তু সেই শব্দের যেন কেমন অদ্ভুত একটা ওজন আছে। এবার ও বেড়ালের সেই কাটা মাথা সযত্নে একটা ধাতব প্লেটের ওপর রাখল। কোনো শিল্পসামগ্রী দেখে কদর করার মতো করে, একটু দূরে চলে গিয়ে চোখ সরু করে ওটাকে নিরীক্ষণ করল কিছুসময় ধরে। শিস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেওয়ায় সামান্য বিরতি দিয়ে, দাঁতের মধ্যে আটকে যাওয়া কিছু একটা নোখ দিয়ে খুঁটে বের করে, সেটা আবার মুখের মধ্যে পুরে, মন দিয়ে আস্বাদন করল। বেশ একটা তৃপ্তির আওয়াজ করে ঢোঁক গিলল। সবশেষে কালো প্লাস্টিকের ময়লা ফেলার থলেটার মুখ ফাঁক করে, গলা কাটা, হৃদপিন্ড বাদ দেওয়া বেড়ালের দেহটাকে অনায়াসে চালান করে দিল। যেন চামড়াটা ছাড়াবার আর দরকার নেই।

"একধাপ এগোলো", এই কথা বলে, জনি ওয়াকার রক্তমাখা দুই হাত নাকাতার দিকে বাড়িয়ে দিল। "একেবারে পরিশ্রম সার্থক, তা মনে করি না। হ্যাঁ, একেবারে জলজ্যান্ত একটা হৃৎপিন্ড খেতে পাওয়া যায়, মজুরি হিসেবে। কিন্তু প্রত্যেকবার এত রক্ত মাখামাখি হয়ে যেতে হয়। সে জিনিস কে চায়? 'আছড়ে পড়া ঢেউও, আমি হাত ডোবালে, লাল এক রঙ, বিশাল অতল মহাসাগরও মুহূর্তে রক্তবর্ণ ধারণ করবে', ম্যাকবেথের লাইন। ম্যাকবেথের মতো অতটা সিরিয়াস নয় ঠিকই, কিন্তু জামাকাপড়ের ক্লীনিং চার্জ যা পড়ে, সেটা চাট্টিখানি কথা নয়। যতই হোক, বিশেষ পোশাক তো। অস্ত্রোপচারের সময়ের পোশাক পরে, হাতে দস্তানা পরে নিলে সুবিধে হত, কিন্তু সেও চলবে না। এটাও, সেই যে বলেছি, নিয়ম।"

নাকাতা কিছু বলেনি। মাথার ভেতর কী একটা নড়েই চলেছে। রক্তের গন্ধ। কানে 'হেইহো—!' সুরটার প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

জনি ওয়াকার সেই বড় কেসটার থেকে পরের বেড়ালটাকে বের করল। সাদা একটা মাদী বেড়াল। খুব বাচ্চা নয়। ল্যাজের ডগাটা একটু বাঁকা। আগের মতোই জনি ওয়াকার ওর মাথায় কিছুক্ষণ হাত বোলাল। তারপর পেটে আঙুল দিয়ে কেটে ফেলার একটা রেখা টানল। গলা থেকে ল্যাজের গোড়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে একেবারে সোজা একটা কল্পিত রেখা টানল। এরপর হাতে ছুরি নিয়ে, একইভাবে একনিঃশ্বাসে কেটে ফেলল। এরপরও আগের মতোই সবটার পুনরাবৃত্তি হল। শব্দহীন আর্তনাদ। পুরো শরীরটা ছটফট করতে থাকা। নাড়িভুঁড়ি ঠেলে বেরুনো। তখনও ধুকপুক করে স্পন্দিত হচ্ছে এমন হৃদপিন্ড বের করে এনে, নাকাতার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দেখিয়ে, মুখের মধ্যে পুরে ফেলা। রয়ে সয়ে চিবোনো। তৃপ্তির হাসি। হাতের পেছন দিয়ে রক্তের ছিটে মুছে ফেলা। শিস দিয়ে "হাইহো—!"

নাকাতা চেয়ারের একেবারে ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়ে বসল। তারপর চোখ বুজে ফেলল। দুহাতে মাথা ঢাকা। কপালের দুটো কোণ আঙুলের ডগা দিয়ে খামচে ধরা। ওর ভেতরে যে কিছু একটা শুরু হয়েছে এতে কোনো ভুল নেই। নাকাতার নশ্বর শরীরটা যা যা দিয়ে যেভাবে তৈরি, একটা তুমুল তোলপাড় সেটার মধ্যে কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘনিয়ে তুলেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস কখন দ্রুত হয়ে পড়েছে, মাথাটা ঘিরে তীব্র যন্ত্রণা। আগে যতটা চোখে পড়ত, এখন তার বড়রকম পুনর্বিন্যাস হচ্ছে।

"নাকাতা-সান, নাকাতা-সান", বেশ খুশির গলায় জনি ওয়াকার বলে। "এটা নিতে পারছেন না, তাই তো? কেননা, এরপর আরো বেশি বেশি করে এরকম হতে হবে। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, তা তো নেহাত শুরুটুকু। চেয়ার এনে রাখা। এরপরে শিগগিরিই নাকাতা-সানের চেনাশোনা মুখেরা আসবে। চোখ একেবারে খুলে রেখে ভাল করে দেখতে হবে। এরপর থেকেই তো আসল মজা। কেননা, আমি অনেক ভেবেচিন্তে, প্ল্যান তৈরি করে সেই অনুযায়ী যে সব করছি, সেটা বুঝতে হবে।"

"হেইহো—!" শিস দিতে দিতে, ও পরের বেড়ালটাকে বের করে আনল। নাকাতা চুপ করে চেয়ারে বসে, চোখ খুলে বেড়ালটাকে দেখল। কাওয়ামুরা! কাওয়ামুরা স্থির চোখে নাকাতাকে দেখল। নাকাতাও সেই চোখের দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু কিছু ভাবতে পারছিল না। উঠে দাঁড়াতেও পারল না।

"পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই নিশ্চয়ই, তবু শিষ্টতা হিসেবে করিয়ে রাখাটা অবশ্যকর্তব্য", জনি ওয়াকার বলে। "হ্যাঁ, ইনি হলেন বেড়াল কাওয়ামুরা-সান। ইনি নাকাতা-সান। পরস্পর পরিচিত হয়ে রইলেন।"

নাটকীয়ভাবে হাতের কায়দায় সিল্কহ্যাটটা একটু তুলে ধরে নাকাতাকে অভিবাদন করল, তারপর কাওয়ামুরাকে অভিবাদন করল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"প্রথমে প্রথানুযায়ী অভিবাদন। কিন্তু অভিবাদনের পালা শেষ হলে পর, বিচ্ছেদ শুরু। হ্যালো, গুডবাই—ফুলের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়ার মতো, মানুষের জীবনটাই 'শুধু যাওয়া, আসা'", এই বলে জনি ওয়াকার আঙুল দিয়ে কাওয়ামুরার পেটের কাছে একটু আদর করে দিল। প্রকৃতই ভালবেসে সস্নেহ আদর। "থামাতে হলে এখনই, নাকাতা-সান। থামাতে হলে এই এখনই। সময় চলে যাচ্ছে, আর জনি ওয়াকারও ইতস্তত করে সময় নষ্ট করে না। উচ্চখ্যাতি-সম্পন্ন বেড়াল নিধনকারী জনি ওয়াকারের অভিধানে 'ইতস্তত' বলে কোনো শব্দ নেই।"

এরপর জনি ওয়াকার সুষ্ঠুভাবে, কোনওরকম ইতস্তত না করে, কাওয়ামুরার পেটটা কাটল। কাওয়ামুরার আর্তনাদ ঠিকমতই শোনা গেল। জিভটা হয়তো যথেষ্ট অবশ করা ছিল। কিংবা ওটা শুধু নাকাতার কানে ধরা পড়ল এমন বিশেষ আর্তনাদ হয়তো। রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার মতো তীব্র আর্তনাদ। নাকাতা চোখ বুজে ফেলে, দুহাতে মাথা ঢাকল। বুঝতেই পারল যে হাত থরথর করে কাঁপছে।

"চোখ বন্ধ করা চলবে না", জনি ওয়াকার স্পষ্ট গলায় বলল। "সেটাও নিয়মের মধ্যে পড়ে। চোখ বন্ধ করা যাবে না। চোখ বন্ধ করলেও, এর চেয়ে ভাল তো কিছু হবে না। চোখ বন্ধ করলেই কোনও কিছু অন্তর্হিত হয়ে যাবে, এমনও নয়। আর তারপর চোখ খুললে ব্যাপারস্যাপার আরো বেশি করে খারাপ লাগে। আমরা এমনই একটা জগতে বাস করি, নাকাতা-সান। চোখ স্পষ্ট করে খুলে রাখুন। চোখ বন্ধ করে ফেলা কাপুরুষের লক্ষণ। বাস্তব থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া কাপুরুষতা। আপনি চোখ বুজে, কান চেপে বন্ধ করে থাকলেও সময় পলে পলে বয়েই যাচ্ছে। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।"

বলাতে নাকাতা চোখ খুলল। চোখ যে খুলেছে, সেটা দেখে নিয়ে জনি ওয়াকার এবার কাওয়ামুরার হৃদপিন্ডটা খেয়ে দেখাল। আগের চেয়েও ধীরে, আরো যেন স্বাদু, এইভাবে খেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"কী নরম, কেমন গরম গরম, একদম ঠিক ঈল্ মাছের যকৃতের মত।" জনি ওয়াকার বলে। রক্তমাখা তর্জনিটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে, সেটা চুষে নিয়ে, বাইরে বের করে শূন্যে সোজা করে রাখে। "একবার এই স্বাদ মনে পড়লেই নেশা ধরে যায়। ভোলা যায় না। বিশেষ করে রক্তের এই চিটচিটে আঠালো ভাবটার কথা আর কী বলব!"

ছুরির গায়ে লেগে থাকা রক্তের ছিটে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে, তারপর যথারীতি খুশিতে শিস দিতে দিতে লোকটি কাওয়ামুরার মাথাটা গোল করাত দিয়ে কেটে ফেলল। ওটার সরু সরু দাঁত হাড়কে গুঁড়ো গুঁড়ো করে কাটলো। রক্ত চারপাশে ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়ল।

"আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। জনি ওয়াকার-সান। নাকাতার মনে হয় এর বেশি আর সহ্য হবে না।"

জনি ওয়াকার শিস দেওয়া থামাল। কাজটাতেও বিরতি দিয়ে হাত মাথার পাশে এনে কানের লতিটা খচমচ করে চুলকোতে লাগল।

"এ চলতে পারে না, তাই না, নাকাতা-সান? শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে, এ চলতে পারেনা। আমি দুঃখিত, এখানে 'ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি' বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। একটু আগেই বললাম না, এটা হচ্ছে যুদ্ধ। একবার শুরু হয়ে গেলে, যুদ্ধ মাঝপথে থামানো মুশকিল। তরবারি একবার খাপ থেকে বা'র হয়েছে, রক্তপাত হতেই হবে। এর কোনো তত্ত্বও নেই। যুক্তিও নেই। আবার, আমার খেয়ালখুশি মতও নয়। কেবল নিয়ম। ফলত, আর বেড়াল হত্যা না চাইলে, আপনার আমাকে হত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। উঠে দাঁড়িয়ে, একাগ্রতা এনে, মন শক্ত করে হত্যা। সেও আর দেরি না করে। করলেই ব্যস, এসবের পালা সাঙ্গ। পিরিয়ড।"

জনি ওয়াকার আবার শিস দিতে শুরু করে, কাওয়ামুরার মাথা কাটা সম্পন্ন করে, সেই মুন্ডহীন ধর ময়লা ফেলার থলেতে চটপট ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা ধাতব ট্রে-র ওপরে বেড়ালের মাথা তিনটে সার দিয়ে রাখা। যে পরিমাণ যন্ত্রণা ভোগ করার কথা, তার পরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো বেড়ালের মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। রেফ্রিজারেটারে সাজিয়ে রাখা বেড়ালগুলোর মুখের মতোই, প্রত্যেকটি বেড়ালের মুখই ভাবলেশহীন।

"পরেরটা শ্যামদেশীয় বেড়াল।"

এই কথা বলে জনি ওয়াকার ব্যাগের ভেতর থেকে একেবারে নেতিয়ে পড়া একটা বেড়াল বের করল। সেটা অবশ্যই মিমি।

"এবার এসেছে 'আমার নাম মিমি'। পুচ্চিনির অপেরা। সত্যিই একটা অভিজাত ককেট্রির বাতাবরণ এই বেড়ালটার ক্ষেত্রে অনুভব করা যায়। পুচ্চিনি কিন্তু আমারও প্রিয়। পুচ্চিনির সংগীতে, কী বলব, একটা শাশ্বত কালাতীত ব্যাপার অনুভব করা যায়। একটু পপুলার ধরণের ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কখনো পুরনো হয় না। আর্ট হিসেবে সে এক দারুণ কৃতিত্ব।"

জনি ওয়াকার "আমার নাম মিমি"-র একটা অংশ শিস দিয়ে করল।

"তবে কিনা, নাকাতা-সান, এই মিমিকে ধরতে ভয়ানক বেগ পেতে হয়েছে। বলতেই হবে, খুবই চটপটে, অত্যন্ত সাবধানী, চকিতে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নিতে পারে। সহজে বোকা বনে না। প্রকৃতই, সেয়ানাদের মধ্যেও সেয়ানা। কিন্তু উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন বিরল প্রতিভার বেড়ালমারা জনি ওয়াকার-সানের কৌশল ধরতে পারে এমন বেড়াল জগতে এখনও জন্মায়নি। জাঁক করে কিছু বলছি না কিন্তু। শুধুমাত্র, ধরা যখন মুশকিল, সেরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই কেবল আমার নামটা ওঠে। ...এই যখন হচ্ছে ব্যাপার, ভোয়লা! চেনেন তো, শ্যামদেশীয় বেড়াল মিমি। আমি আবার শ্যামদেশীয় বেড়াল খুব পছন্দ করি। আপনি হয়তো জানেন না, শ্যামদেশীয় বেড়ালের হৃৎপিন্ড হলে, অমন অমূল্য জিনিস আর নেই। স্বাদের মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। ট্রাফলসের মত। ঠিকই আছে, মিমি। উদ্বেগের কিছু নেই। তোমার গরম গরম, কিউট হৃৎপিন্ডটা এই জনি ওয়াকার-সান ভাল করে চেখে দেখবে। হুমম্, খুব ভয় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"জনি ওয়াকার-সান", পেটের একদম নিচ থেকে মোচড় দিয়ে বেরুনো গলায় নাকাতা বলে ওঠে। "আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, এ জিনিস এবার বন্ধ করুন। আর এরকম চলতে থাকলে, নাকাতা যেন কেমন হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। নাকাতা আর নাকাতা থাকবে না বলে মনে হচ্ছে।"

জনি ওয়াকার মিমিকে ডেস্কের ওপর শুইয়ে, যা করে থাকে, ওর পেটের ওপরে সোজাসুজি আঙুল চালাল।

"আপনি আর আপনি নন", শান্ত গলায় ও বলে। কথাটা বলতে যেন জিহ্বার তৃপ্তি হল। "সে তো খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, নাকাতা-সান। লোক আর লোক রইলো না, এরকম একটা ব্যাপার!"

জনি ওয়াকার ডেস্কের ওপর থেকে এখনও ব্যবহার করা হয়নি এরকম একটা ছুরি তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে তার ফলার ধারটা পরখ করে নিল। তারপর যেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য, হাতের পেছনে কুচ করে একটু কাটল। একটু বাদেই, সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। সেই রক্ত ওর হাতের পেছন থেকে ডেস্কের ওপর ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। রক্ত মিমির শরীরের ওপরেও পড়ল। জনি ওয়াকার খুক্‌খুক্ করে হাসল। "লোক আর লোক রইল না", আবারও বলল। "আপনি আপনি রইলেন না। সেটাই তো, নাকাতা-সান। কী দারুণ না? এটা কিন্তু একটা সিরিয়াস ব্যাপার। 'ওফফ্, আমার মনের ভেতরে এই অ্যাতো কাঁকড়াবিছে হেঁটে বেড়াচ্ছে!' এটাও সেই ম্যাকবেথের সংলাপ।"

নাকাতা নীরবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। কেউ তাকে নিরস্ত করতে পারত না, এমনকি সে নিজেও। দীর্ঘ পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসে, ডেস্কের ওপরে রাখা ছুরিগুলোর একটাকে স্থির প্রত্যয়ে ধরল। স্টেক-নাইফের মতো দেখতে একটা বড়ো ছুরি। নাকাতা ওটার কাঠের বাঁটটা মুঠো করে ধরল। ফলাটা জনি ওয়াকারের বুকে আমূল বসিয়ে দিল, কোনওরকম দ্বিধা না করে। কালো ওয়েস্ট কোটের ওপর দিয়ে একবার বসিয়ে দিয়ে, সেটা টেনে বের করে, অন্য এক জায়গায় সর্বশক্তি দিয়ে বসিয়ে দিল। কানে যেন কী একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। সেটা যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কীসের, প্রথমটায় নাকাতা ভাল বুঝতে পারেনি। কিন্তু সেটা ছিল জনি ওয়াকারের অট্টহাসি। বুকের গভীরে ছুরি বসানো, সেখান থেকে রক্তপাত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও জোরে হেসেই চলেছে। "বিনা দ্বিধায় ছুরি বসিয়ে দিল। কী চমৎকার!"

টলে পড়ে যেতে যেতেও জনি ওয়াকার হেসে যাচ্ছিল। হা হা হা হা হা হা হা, হেসেই যাচ্ছিল। অদ্ভুতভাবে, খুবই অদ্ভুতভাবে অট্টহাসি হেসে যাচ্ছিল। সেই হাসি তারপর গোঙানিতে পরিবর্তিত হয়ে, গলার ভেতর রক্তের গার্গলের মত আওয়াজ হচ্ছিল। ড্রেনের পাইপের মুখ খুলে যাওয়ার মত বগবগ করে আওয়াজ। সারা শরীরে তীব্র খিঁচুনি, হঠাৎই মুখ থেকে প্রবল বেগে বমি হয়ে বেরলো রক্ত। রক্ত আর কালো রঙের পিচ্ছিল দলা দলা কীসব বমি হয়ে বেরিয়ে এলো। একটু আগে সদ্য চিবুনো বেড়ালের হৃৎপিন্ড। সেই রক্ত ডেস্কের ওপর পড়ে, নাকাতার পরণের গলফ-উইয়্যারেও এসে লাগল। জনি ওয়াকার, নাকাতা দুজনেই রক্তে মাখামাখি। ডেস্কের ওপর শোয়ানো মিমিও রক্তে মাখামাখি।

যখন হুঁশ হল, জনি ওয়াকার নাকাতার পায়ের কাছে মরে পড়ে রয়েছে। পাশ ফিরে, বাচ্চারা ঠান্ডার মধ্যে রাতে কুন্ডলি পাকিয়ে যেভাবে শুয়ে থাকে, সেইরকম দেখাচ্ছে, নিঃসন্দেহে মৃত। বাঁহাতটা গলার কাছটা চেপে ধরেছে, ডানহাতটা সামনে সোজা বাড়ানো, যেন কিছু খুঁজছে। খিঁচুনিও নেই, হাসিও অবশ্যই মিলিয়ে গেছে। কিন্তু মুখে এখনো একটা শীতল হাসির আভাস ক্ষীণ রয়ে গেছে। কিছু একটা করে ওটা চিরকালের জন্য সেঁটে দেওয়া হয়েছে বলে দেখে মনে হচ্ছিল। কাঠের মেঝেতে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রক্ত জমা হয়েছে। পড়ে যাওয়ার সময় সিল্কহ্যাটটা খুলে পড়ে ঘরের কোণের দিকে গড়াচ্ছে। জনি ওয়াকারের মাথার পেছনের চুল পাতলা হয়ে গিয়ে টাক চোখে পড়ছিল। টুপিটা না থাকায়, ওকে একেবারে বার্দ্ধক্যে জীর্ণ দেখাচ্ছিল।

নাকাতা ছুরিটা হাত থেকে ছেড়ে দিল। ধাতব কিছু মেঝেতে আঘাত করার জোরালো শব্দ হল। দূরে কোথাও, বিশাল কোনো মেশিনের গিয়ার একঘর সামনে এগিয়ে যাওয়ার শব্দের মত। দীর্ঘ সময় নাকাতা মৃতদেহের পাশে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভেতর সবকিছু স্তব্ধ হয়ে আছে। শুধু রক্ত এখনও বয়ে বয়ে, জমতে থাকা রক্ত আরেকটু বিস্তৃত হচ্ছিল। এরপর ও হুঁশে ফিরে, ডেস্কের ওপর শোয়ানো মিমিকে ধরে তুলল। সেই নেতিয়ে পড়া উষ্ণ শরীরটা হাতের মধ্যে স্পর্শ করে অনুভব করতে পারল। বেড়ালটার শরীর রক্তে মাখামাখি হলেও, কোনও আঘাত সম্ভবত পায়নি। মিমি কিছু একটা বলতে চায়, এইভাবে নাকাতার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু ওষুধের ক্রিয়ায় মুখ ফাঁক করতে পারছে না।

তারপর কেসের ভেতর থেকে গোমাকে পেয়ে, নাকাতা ওকেও ধরে তুলল। কেবল ফোটোতে দেখা বেড়াল হলেও, যেন অনেক আগের থেকেই চেনা বেড়ালের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাওয়ার মতোই স্বাভাবিক টান অনুভব করল।

"গোমা-সোনা", নাকাতা বলে।

বেড়াল দু'টোকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে, নাকাতা সোফায় গিয়ে বসে পড়ল।

"চল, বাড়ি ফিরে যাই", নাকাতা বেড়ালদের বলল। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারল না। কোত্থেকে একটু আগের সেই কালো কুকুরটা এসে হাজির হয়ে, জনি ওয়াকারের মৃতদেহের পাশে গিয়ে বসল। কুকুরটা হয়তো সেই পুকুরের মতো হয়ে জমা রক্ত চেটে দেখেছিল। কিন্তু সত্যি কী হয়েছিল মনে করতে পারা যাচ্ছে না। মাথাটা কেমন ভারী ভারী লাগছে, ঝাপসা হয়ে গেছে সব। নাকাতা লম্বা শ্বাস ফেলে, চোখ বন্ধ করে। চেতনা ক্ষীণ হয়ে এসে, ওই অবস্থায়ই অচেতন অন্ধকারে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭

আজ কেবিনে কাটানোর তৃতীয় রাত। শান্ত দিনগুলোর সাথেও যেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠছি, গভীর রাতগুলোর সাথেও সেরকমই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। রাত্রিকে আর ভয়াবহ বলে বোধ হয়না। স্টোভের মধ্যে কাঠ গুঁজে দিয়ে সামনে বসে বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত বোধ করলে মাথাটাকে খালি করে দিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকি। বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও ক্লান্ত লাগেনা। কতরকমের ফুলকি,তার কতরকমের রং । সেগুলো জীবন্ত বস্তুর মত অবাধে নড়াচড়া করতে থাকে। জন্মিয়ে, যুক্ত হয়ে, বিভক্ত হয়ে, ধ্বংস হয়ে, বিলীন হয়ে যায়।

মেঘলা না হলে বাইরে বেরিয়ে, আকাশের দিকে চোখ তুলে চাই। আকাশের তারাগুলোও এখন আর আমার মধ্যে কোন অসহায়তাবোধ জাগায় না। ওদেরকে অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হয়। প্রতিটি তারা যেন আলাদা আলাদা ভাবে জ্বলে। বেশ কয়েকটাকে রীতিমত মনে রেখে, তাদের চিকমিক করাটা লক্ষ্য করি। তারাগুলো মাঝেমধ্যে খুব জোরাল ঝলক দেয়, যা দেখে মনে হয় যেন খুব গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করছে । উজ্জল সাদা চাঁদের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখলে প্রত্যেকটা পাথর যেন দেখতেপাওয়া যায়। এই সময়গুলোতে কোনরকম চিন্তাভাবনাই আমি করতে পারিনা। দম বন্ধ করে, স্থির হয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। মিনিডিস্ক ওয়াকম্যানের চার্জেবল ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেলেও, গান যে আর বাজছে না সেটা একবারও মনেও হয় না । চতুর্দিকে গানের বিকল্প ছড়িয়ে রয়েছে। পাখির কিচিরমিচির, বিভিন্ন রকম পোকার আওয়াজ, ছোট নদীর কলতান, বাতাসে গাছের পাতা কাঁপার শব্দ, কেবিনের ছাদের উপর দিয়ে কিছু একটা হেঁটে চলে যাওয়ার শব্দ, বৃষ্টি পড়া। এছাড়াও কখনো সখনো কানে এসে পৌঁছয় এমন এক শব্দ যার কোন ব্যাখ্যাও দেওয়া যাবে না, ভাষাতেও প্রকাশ করা যাবে না। পৃথিবী যে এতরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিশুদ্ধ সুন্দর প্রাকৃতিক আওয়াজে পরিপূর্ণ, এতদিন পর্যন্ত এই বিষয়টা আমি গ্রাহ্য না করেই ছিলাম। অর্থাৎ কিনা, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার দৃষ্টিগোচরও হয়নি, কর্ণগোচরও হয়নি। আমার এই অপরাধের খেসারৎ হিসাবে, বারান্দায় বসে, চোখ বন্ধ করে, নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত মুছে দিয়ে, সেখানকার প্রত্যেকটি আওয়াজকে এমনভাবে শোনার চেষ্টা করি যাতে একটা আওয়াজও যেন বাদ না যায়।

জঙ্গলের প্রতিও আমার প্রাথমিক ভয়টা এখন আর তেমন নেই। জঙ্গলের প্রতি এক অত্যন্ত স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জড়ানো নৈকট্য অনুভব করি। অবশ্যই জঙ্গলের মধ্যে আমার পা রাখার গণ্ডি, বলতে গেলে এই কেবিনের আশেপাশের রাস্তাটুকুই শুধু। রাস্তার থেকে নামতে পারিনা। নিয়ম ভঙ্গ না করলে কোন রকম বিপদের আশঙ্কা থাকেনা। জঙ্গল আমাকে নীরবে গ্রহণ করে। কখনো বা উপেক্ষা করে। কিন্তু শেষে সেখানকার সৌন্দর্য আর শান্তি দান করে। কিন্তু মনে হয়, একবার নিয়মের বাইরে গেলেই হয়তবা সেখানে লুকিয়ে থাকা নৈশব্দ্যের দানবগুলো তাদের নখ দিয়ে আমাকে খামচে ধরবে।

জঙ্গল ফুঁড়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা দিয়ে আমি বারবার হাঁটি। জঙ্গলের মধ্যেকার ছোট্ট গোল ফাঁকা জায়গাটাতে শুয়ে, সূর্য রশ্মিতে সমস্ত শরীরটা ভিজিয়ে নিই। চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ করে, সূর্যরশ্মিকে গ্রহণ করতে করতে, উঁচু গাছের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ শুনি। পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দ, কিম্বা ফার্নের পাতার শিরশিরানি শুনি। গাছপালার গভীর সুগন্ধ আমার সমস্ত শরীরকে ছেয়ে ফেলে। তখন আমার শরীরটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে মুক্ত হয়ে মাটির সামান্য উপরে উঠে যায়। আমি বাতাসের মধ্যে হাল্কা ভাবে ভাসতে থাকি। এই অবস্থাটা অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্যই থাকে। চোখ খুলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেই মিলিয়ে যায়। যে কারনেই হোক আমি শূন্যে ভেসে থাকতে পারি।

বেশ কয়েকবার জোরে বৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সবসময়ই কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে গেছে। আশেপাশের পাহাড়ের উপরের আবহাওয়াটা সহজেই পাল্টে যায়। বৃষ্টি পড়লেই আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উলঙ্গ হয়ে বাইরে বেরিয়ে, সাবান দিয়ে পুরো শরীরটাকে ধুয়ে ফেলি। পরিশ্রমে ঘাম ঝরতে থাকলে, সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে, বারান্দায় সেগুলোকে সূর্যস্নান করাই। প্রচুর চা খেয়ে, বারান্দার চেয়ারে বসে বইয়ের মধ্যে ডুবে যাই। সূর্য অস্ত গেলে স্টোভের সামনে বসে বই পড়ি। ইতিহাসের বই পড়ি, বিজ্ঞানের বই পড়ি, লোকগাথা অথবা মিথোলজি অথবা সমাজতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্বের বই পড়ি, সেক্সপিয়ার পড়ি। একটা বই প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ার থেকেও, প্রয়োজনীয় অংশটুকু সম্পূর্ণ বোঝা পর্যন্ত বারবার খুঁটিয়ে পড়াটাই আমার লক্ষ্য থাকে। এইভাবে পড়তে থাকলে, একের পর এক নানারকমের জ্ঞান শুষে নেওয়ার মতো একটা প্রতিক্রিয়া আমার শরীরের মধ্যে হয়। মনে হয়, সারাজীবন এখানে থাকলে পারলে কি ভালোই যে হতো। বইয়ের তাকে পড়ার বইও প্রচুর ছিল, খাবারও যথেষ্ট সঞ্চিত ছিল। কিন্তু এটা আমার যাত্রাপথের একটা ছোট্ট টুকরো ছাড়া আর কিছু যে নয়, সেটাও আমি বুঝি। হয়ত খুব শিগগিরিই এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে । এই জায়গাটা একটু বেশিই প্রকৃতির কাছাকাছি, অতিরিক্ত শান্ত, আর অতিরিক্ত ভাবেই পরিপূর্ণ। এখনকার আমিকে বোধহয় এতটা দেওয়াও যায় না। একটু যেন বেশিই তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে... হয়তবা ।

চতুর্থ দিনের দুপুর হবার আগেই ওশিমা এসে হাজির হল। গাড়ির আওয়াজ শোনা যায় নি। পিঠে ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে, রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে, বারান্দার রোদ্দুরে, চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলাম। ও কাছে এসে যাওয়া সত্ত্বেও পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি। কিছুটা মজা করার জন্যই হয়ত, খানিকটা পা টিপেই এসেছিল। ও চুপিচুপি বারান্দায় উঠে, হাত বাড়িয়ে আমার মাথাটা হালকা করে ছুঁয়ে দিল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শরীরটাকে ঢাকার জন্য তোয়ালে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হাতের কাছে তোয়ালে পেলাম না।

“অত ব্যস্ত না হলেও চলবে”, ওশিমা বলল। “আমিও এখানে যখন ছিলাম, তখন প্রায়ই উলঙ্গ হয়ে রোদ পুহিয়েছি। যেখানে বেশিরভাগ সময়ই রোদ থাকেনা, সেখানে রোদ এলে গায়ে রোদ লাগানটা খুবই আনন্দের, তাই না?”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওশিমার সামনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে, মনে হচ্ছিল দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার লোম, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ, সবই, সূর্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ওগুলোকে খুবই অসহায় আর অসুরক্ষিত দেখাচ্ছিল । এরকম সময় ঠিক কি করা উচিত, আমিও বুঝতে পারছিলামনা। তাড়াহুড়ো করে ঢাকাও দেওয়া যাচ্ছিল না। "কোন্নিচিবা। হেঁটে এলেন বুঝি", আমি বললাম ।

"এমন সুন্দর আবহাওয়া। হেঁটে না এলে পুরোটাই মাটি। গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, হেঁটে এলাম", ওশিমা বলল। তারপর রেলিঙের ওপর থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে আমাকে দিল। তাড়াতাড়ি তোয়ালেটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ওশিমা নিচু গলায় গান গাইতে গাইতে, জল-গরম বসিয়ে, ছোট ব্যাগটার ভেতর থেকে ময়দা, ডিম আর দুধের প্যাকেট বার করে, ফ্রাইং প্যান গরম করে, প্যান কেক বানাল। মাখন আর সস লাগাল। লেটুস, টমেটো আর পেঁয়াজ বার করল। সালাড তৈরি করার সময়, অত্যন্ত সাবধানতার সাথে, ধীরে ধীরে ও ছুরিটাকে ব্যবহার করল। এগুলো দিয়েই আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। "এই তিন দিন কেমন কাটল?" ছুরি দিয়ে প্যান কেক কাটতে কাটতে ওশিমা জিজ্ঞাসা করল। এখানে আমি কত আনন্দে কাটাচ্ছি সে কথা বললাম। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার কথাটা একটুও বললাম না। কেন জানি মনে হল, ওটা না বলাই ভাল।

"বাহ, খুব ভাল!" ওশিমা বলল। "তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু এরপর আমরা তো শহরে ফিরে যাব, তাই না?"

"হ্যাঁ, শহরে ফিরে যাব।"

আমরা ফেরার গোছগাছ করতে লাগলাম। দুজনে মিলে খুব বুদ্ধি করে, ঝটপট কেবিনের ভেতরটা গুছিয়ে ফেললাম। বাসনপত্র ধুয়ে পাল্লা দেওয়া তাকে ঢুকিয়ে রেখে, স্টোভটাকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করলাম। গ্যাসের ভাল্‌ভ বন্ধ করলাম। যেসব খাবার রেখে দিলেও নষ্ট হয়না, সেগুলো খাবার তাকে তুলে রেখে, যে খাবারগুলো নষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হতে পারে সেগুলো ফেলে দিলাম। ঝাঁটা দিয়ে মেঝে ঝাঁট দিয়ে, টেবিল চেয়ারের উপরের ধুলো ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে দিলাম। বাইরে গর্ত করে, আবর্জনা সব পুঁতে দিলাম। প্লাস্টিক প্যাকেট যা কিছু ছিল এক জায়গায় গুছিয়ে নিলাম, কারন ওগুলো এখানে না ফেলে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

ওশিমা কেবিনের দরজায় তালা দিল। আমি শেষবারের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে কেবিনটাকে একবার দেখলাম। একটু আগেই যেটা ভীষণভাবে বাস্তব ছিল, সেটা এখন কি করে জানি অলীক মনে হচ্ছে। মাত্র কয়েক পা হেঁটেছি, অথচ এরই মধ্যে সেখানকার সমস্ত কিছুই কেমন যেন তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। একটু আগে যে আমি সেখানে ছিলাম, তাকে পর্যন্ত কেমন অলীক মনে হচ্ছে। ওশিমা যেখানে গাড়ি রেখেছিল সেই পর্যন্ত পৌঁছতে তিরিশ মিনিট মতো সময় লাগবে। আমরা প্রায় কোনও কথা না বলে পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে নামতে লাগলাম। ওশিমা পুরো রাস্তাই প্রায় কোন একটা সুর গুনগুন করে গেলেন। আমি অসংলগ্ন চিন্তা করতে করতে চলতে লাগলাম।

চারিদিকের গাছপালার সাথে প্রায় মিশে যাওয়া ছোট্ট স্পোর্টস গাড়িটা চুপ করে ওশিমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। অচেনা লোক রাস্তা হারিয়ে (অথবা ইচ্ছে করে) যাতে ঢুকতে না পারে, সেভাবে গেটটা বন্ধ করে, ওশিমা একটা চেন গেটে দুবার পেঁচিয়ে, তালা লাগিয়ে দিল। আমার পিঠের ব্যাগটা, আগের মতোই, গাড়ির পেছনের তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। গাড়ির হুডটা ফেলে দেওয়াতে, গাড়িটা খোলা গাড়ি হয়ে গেল। "এবার তাহলে আমরা শহরে ফিরছি।" ও বলল।

আমি মাথা নাড়লাম।

"প্রকৃতির মধ্যে একা একা কাটানটা সত্যিই দারুন, কিন্তু সেখানে লম্বা সময় থাকাটা মোটেই সহজ নয়", ওশিমা বলল। সানগ্লাস পরে সীট-বেল্ট বাঁধল।

আমিও পাশের সীটে বসে বেল্ট লাগালাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তাত্ত্বিক দিক থেকে, পারিনা বলে কিছু যেমন নেই, তেমন আবার সত্যিই সেরকম লোকও অনেক আছে। কিন্তু স্বাভাবিক জিনিসও কোনো কোনো অর্থে অস্বাভাবিক, নিরুপদ্রবও যেমন কখনও কখনও উপদ্রব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠিকমত গ্রহণ করতে গেলে সেরকম প্রস্তুতি আর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সেই কারনেই, আপাতত আমরা শহরে ফিরে যাচ্ছি। সমাজ এবং মানুষজনের জীবনের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি।"

ওশিমা গাড়ির অ্যাকসিলারেটার পা দিয়ে চেপে ধরে, পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে নামতে শুরু করল। গাড়ি চালাবার মধ্যে কোনও রকমের কোনও তাড়া ছিল না। চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে, হাওয়ার কোমল স্পর্শ গায়ে মেখে নিচ্ছিল। হাওয়ায় ওর সামনের লম্বা চুলগুলো উড়িয়ে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। বেশ খানিকক্ষণ পর কাঁচা রাস্তাটা সরু হলেও বাঁধানো রাস্তায় এসে পড়ল। দুরের গ্রামগুলো পরিষ্কার চোখে পড়তে লাগল।

"অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে...", ওশিমা আগের প্রসঙ্গটা আবার টেনে নিয়ে বলল, "তোমার সাথে প্রথম দেখার সময় থেকেই ব্যাপারটা যেন অনুভব করছিলাম। তুমি কোন একটা কিছু প্রবল ভাবে চাইছ, আবার অন্য দিকে সেটাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করছ। তোমাকে দেখে তাই মনে হয়।"

"চাইছি বলতে, কি ধরনের জিনিষ..."

ওশিমা ঘাড় নাড়ল। ব্যাক মিররের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। "উমম্..., কেমন জিনিস হতে পারে । সেটা আমিও ঠিক জানিনা। নেহাতই একটা ধারণাকে, ধারনা হিসাবেই বলছিলাম।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"অভিজ্ঞতার কথা যদি বলতে হয়, মানুষ কোনকিছু যখন প্রবল ভাবে চায়, তখন কিছুতেই সেটা কাছে আসেনা। কিন্তু, যখন সে জিনিসটাকে এড়িয়ে যেতে থাকে, তখনই সেটা একেবারে সামনে এসে হাজির হয়। যদিও এটা খুবই [illegible] একটা ধারণা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ওশিমা-সান যেমনটা বলছেন, যদি এরকম সত্যিই হয় যে আমি কোন একটা কিছু চাইবার সাথে সাথে সেটাকে এড়িয়ে চলছি, তাহলে, চলতি ধারনাটা অনুযায়ী, আমার ক্ষেত্রে সেটা আসলে কি হতে পারে।"

"কঠিন প্রশ্ন", বলে, ওশিমা হাসল। একটু পরে বলল, "খুব জোর দিয়ে যদিও বলতে পারছি না, তবু তুমি জিজ্ঞাসা করছ বলেই বলছি, হয়ত বা সেই কিছু একটা চাইবার সময়, ঠিক কি চাইছ, তোমার কাছেও সেটা পরিষ্কার থাকে না।"

"কেমন যেন একটা আশঙ্কাজনক ভবিষ্যৎবাণীর মত অসংলগ্ন শোনাচ্ছে।"

"কাসান্দ্রা।"

"কাসান্দ্রা?" আমি বললাম।

"গ্রীসের বিয়োগান্তক নাটক, গ্রীক ট্র্যাজেডি। কাসান্দ্রা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন। ট্রয়ের রাজকন্যা ছিলেন। অ্যাপোলোর কাছ থেকে ভাগ্য জানার ক্ষমতা পেয়েছিলেন । তার পরিবর্তে অ্যাপোলো জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করতে গেলে, কাসান্দ্রা বাধা দেন। অ্যাপোলো তাতে ক্ষেপে গিয়ে কাসান্দ্রাকে অভিশাপ দেন। গ্রীসের দেবদেবীরা, ধর্মীয় ঠিক নয়, বরং অনেকটাই মিথ। মানুষদের মতই তাঁদের নানারকম মানসিক সমস্যা আছে। হঠাৎ রেগে যান, ব্যভিচারী হন, হিংসুটেও হন, ভুলো মনের হন", গাড়ির গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে লেমন ড্রপ লজেন্স বের করে মুখে দেয় ও। আমার দিকেও একটা এগিয়ে দিল। আমি লজেন্সটা নিয়ে মুখে পুরে দিলাম।

"কি ধরনের অভিশাপ ছিল?"

"কাসান্দ্রাকে যে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিলো?"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকালাম।

"কাসান্দ্রার ভবিষ্যৎবাণী সবসময় সত্য হবে, কিন্তু কেউ ওর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কথা বিশ্বাস করবে না। এটাই ছিল অ্যাপোলোর অভিশাপ। এছাড়াও, কাসান্দ্রার সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো হবে খুবই অশুভ... বিশ্বাসঘাতকতা, ভুল বিভ্রম, মৃত্যু, দেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এইসব। সেই কারনে, মানুষজন শুধু যে ওকে অবিশ্বাসই করত তা নয়, অত্যন্ত ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধার চোখে দেখত। যদি এখনও না পড়ে থাক, তাহলে ইউরিপিদিস কিম্বা ইস্কাইলাসের নাটক তোমার অবশ্যই পড়া উচিত। এগুলোতে আমাদের পরিণতিগুলো খুব স্পষ্ট করে আঁকা আছে। কোরাসগুলোর মধ্যে।"

"কোরাস?"

"গ্রীসের নাটকগুলোতে সবসময় গায়কদল থাকত। ওরা স্টেজের পেছনে দাঁড়িয়ে গলা মিলিয়ে, নাটকের পরিস্থিতির ধারাভাষ্য দিত, চরিত্রগুলোর গভীর চেতনাগুলোকে ব্যক্ত করত, কখনো আবার তাদেরকে যুক্তি, পরামর্শও দিত। বেশ সুবিধাজনক ছিল। আমার পেছনেও এরকম কেউ থাকলে মন্দ হতনা।"

"ওশিমাসানও কি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন?"

"আমার এধরনের কোনও শুভ কিংবা অশুভ ক্ষমতা নেই। আমার কথাগুলো অশুভ ভবিষ্যৎবাণীর মতো যদি শোনায়, তবে সেটা আমার সাধারন বুদ্ধি আর বাস্তববাদী চরিত্রের জন্য। আমি সাধারন বিবেচনা দিয়ে যুক্তিপ্রসূতভাবে বলি। সেইজন্যই, যাকে বলে, অশুভ ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনায়। আমাদের চারপাশের বাস্তবটা, আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতচেতনার সমষ্টি বই অন্য কিছু নয়। যে কোন দিনের খবরের কাগজ হলেই চলবে, কাগজটা খুলে ভাল খবর আর খারাপ খবরের মধ্যে তুলনা করে দেখলে যে কেউ সেটা বুঝতে পারবে।"

বাঁক এলেই ওশিমা গাড়ির গিয়ার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পালটাচ্ছে। শরীরে কোনরকম ঝাঁকুনি অনুভূত হচ্ছেনা। খুবই মসৃণ ভাবে গিয়ারটা বদলাচ্ছে। গাড়ির চাকার আওয়াজের পরিবর্তন ছাড়া কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু একটা ভাল খবর আছে", ওশিমা বলল। "তোমাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগারের একজন কর্মী হচ্ছ। তোমার মধ্যে সম্ভবত সেই যোগ্যতা আছে।"

আমি কিছু না ভেবে ওশিমার মুখের দিকে তাকালাম। "তার মানে, আমি কি কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগারে কাজ করবো?"

"আর একটু সঠিক ভাবে বলতে গেলে, তুমি ওই লাইব্রেরির একটা অংশ হয়ে যাবে। তুমি ওখানে থাকবে। লাইব্রেরি খোলার সময় হলে দরজা খুলে দেবে, বন্ধ করার সময় হলে দরজা বন্ধ করে দেবে। তোমার শরীরে শক্তিও আছে বলে মনে হয়, আর জীবনটাও একটু নিয়ম মাফিক চালাতে পারবে। তোমার পক্ষে খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয়না। আমি কিংবা সাএকি-সান দুজনেই একটু দুর্বল ধরনের বলে, তুমি এই কাজটা করে দিলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। এছাড়াও অবশ্য কিছু টুকিটাকি কাজ করে দিতে হবে। যেমন ধর, আমার জন্য একটু কফি বানিয়ে দেওয়া, সামান্য বাজার করে দেওয়া... তোমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছি । লাইব্রেরির সাথে লাগান ঘর, সঙ্গে স্নানের ঘরও আছে। মূলতঃ অতিথিদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু কেউই আসেন না বলে, একেবারেই ব্যবহার হয়না। তুমি ওখানেই থাকবে। এছাড়াও, সবচেয়ে ভাল হচ্ছে এটাই যে তুমি এখানে থাকলে অনেক বই পড়তে পারবে।"

"কেন যে...", বলতে শুরু করেও যেন সমস্ত কথা হারিয়ে গেল।

"কেন যে এসবের দরকার পড়ল, তাই তো?" আমার কথাটা ধরে নিয়ে ওশিমা বলল, "মোদ্দা কথাটা খুবই সহজ। আমি তোমাকে বুঝি, সাএকি-সান আমাকে বোঝেন। আমি তোমাকে দেখব, সাএকি-সান আমাকে দেখবেন । যদিও তুমি বাড়ি থেকে পালানো পনের বছরের কিশোর, কিন্তু কোন সমস্যা নেই। তাহলে, শেষমেশ কি মনে হচ্ছে... নিজের এই লাইব্রেরির অংশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে?"

আমি একটু ভাবলাম। তারপর বললাম "আমি, ছাদ আছে এরকম কোন একটা জায়গায় থাকতে চেয়েছিলাম। এটুকুই শুধু বলতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চাই। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু ভাবতে পারছি না। লাইব্রেরির একটা অংশ হয়ে যাওয়া মানে কি, আমি জানি না। কিন্তু, এখানে থাকতে দেওয়ার জন্য, আমি সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ। তাহলে আর ট্রেনে যাতায়াত করতে হবেনা।”

“তাহলে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল”, ওশিমা বলল। “এখন তাহলে তোমাকে লাইব্রেরিতেই নিয়ে যাচ্ছি। তারপর তুমি সেখানকার একটা অংশ হয়ে যাবে।”

আমরা জাতীয় সড়কে এসে পড়লাম, তারপর বেশ কয়েকটা শহর ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। আর্থিক ঋণের বিজ্ঞাপনের মস্ত বড় হোর্ডিং, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নানা কিছু দিয়ে সাজান পেট্রলপাম্প, কাঁচ লাগান খাবার জায়গা, পাশ্চাত্যের দেশের দুর্গের ধাঁচে তৈরি লাভ হোটেল, শুধুমাত্র দোকানের নামের বোর্ডটুকু অবশিষ্ট থেকে যাওয়া ভিডিও ক্যাসেট ধার দেওয়ার দেউলিয়া দোকান, বিরাট পার্কিং এরিয়া সমেত পাচিনকো, এইসব আমার চোখে পড়ছিল। ম্যাকডোনাল্ড, ফ্যামিলি মার্ট, লসন স্টোর্স, য়োশিনোইয়া...কোলাহল মুখর বাস্তবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। মস্ত ট্রাকগুলোর এয়ার ব্রেক, হর্ন, কালো ধোঁয়া। গতকাল পর্যন্ত আমার পাশে বন্ধুর মতো থাকা স্টোভের ফুলকি, ঝিকমিকে তারা, জঙ্গলের মধ্যের সেই শান্তি, কেমন করে যেন মিলিয়ে যেতে লাগল। ভাল করে মনেই যেন করতে পারছিলাম না ।

“সাএকি-সানের ব্যাপারে কতগুলো জিনিস তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই”, ওশিমা বলে। “সাএকি-সান ছোটবেলায় আমার মা’র সাথে একই ক্লাসে পড়তেন আর মা’র খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। মা’র কথা অনুযায়ী খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্কুলে নম্বরও খুব ভাল পেতেন, লিখতেন খুব ভাল, খেলাধুলাতেও খুব ভাল ছিলেন, উপরন্তু পিয়ানো বাজাতেন আসাধারন। যা কিছু করতেন, একেবারে বলা যায় এক নম্বর ছিলেন। এছাড়াও আবার সুন্দরীও ছিলেন। অবশ্য, এখনও সুন্দরী।”

আমি সামনে মাথা ঝোঁকালাম।

“ওনার, সেই প্রাইমারি স্কুলের সময় থেকে একজন প্রেমিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। কোওমুরা পরিবারের বড় ছেলে। দুজনেই একই বয়সের, আর দুজনেই সুন্দর ছিলেন। রোমিও আর জুলিয়েটের মতো। দুজনের কেমন দূরসম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। দুজনেরই বাড়ি একেবারে কাছাকাছি ছিল বলে, যা কিছু করতেন বা যেখানেই যেতেন, সবসময় একসাথে থাকতেন। স্বাভাবিক ভাবেই মনের টান তৈরি হয়ে গিয়েছিল বলে, বড় হওয়ার পর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হন। অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন... আমার মা এরকমটাই বলেছিলেন।"

গাড়ির সিগনালে অপেক্ষা করতে করতে, ওশিমা আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইল। সিগনালের বাতি সবুজ হতেই অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে, ট্যাঙ্কারের আগে বেরিয়ে গেল।

"লাইব্রেরিতে একবার তোমার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিলো, মনে আছে? আমি বলছিলাম যে মানুষ সবসময় নিজের একজন পরিপূরক খোঁজে।"

"সেই পুরুষ আর পুরুষ, মহিলা আর মহিলা, পুরুষ আর মহিলার কথা?"

"হ্যাঁ। অ্যারিস্টোফেনিসের কথা। আমরা জীবনের একটা বড় অংশ, নিজেদের পড়ে থাকা অর্দ্ধেক, মানে সেই পরিপূরকে খুঁজতে খুঁজতে কাটিয়ে দিই। কিন্তু সাএকি-সান আর ওঁর প্রেমিকের সেই খোঁজটার আর প্রয়োজন হয়নি। জন্মাবধি ওনারা নিজেদের পরিপূরককে খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন।"

"সৌভাগ্যবান ছিলেন।"

ওশিমা মাথা নাড়ল। প্রশ্নাতীত সৌভাগ্য। যদিও বা কেবল সেই পয়েন্ট পর্যন্ত।"

দাড়ি কাটার পর যেভাবে হাত বুলিয়ে দেখতে হয় ঠিকঠাক কাটা হয়েছে কিনা, সেই ভাবে ওশিমা নিজের গালে হাতের পাতাটা বুলিয়ে নিল। কিন্তু, ওশিমার গালে দাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। চীনামাটির পাত্রের মত মসৃণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ছেলেটা আঠারো বছর বয়স হওয়ার পর টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলো। নম্বরও বেশ ভাল ছিল, পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনারও ইচ্ছে ছিল। শহরেও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। মেয়েটি তার নিজের জায়গাতেই, বিশেষ বিষয় হিসাবে পিয়ানো নিয়ে ভর্তি হল। জায়গাটা একটু রক্ষণশীল এবং মেয়েটা বড়ও হয়েছিল রক্ষণশীল পরিবারে। একমাত্র সন্তান হওয়ায়, মা বাবা কখনো মেয়েটিকে টোকিয়োতে পাঠাবার কথা ভাবেনও নি। এভাবেই, জীবনে প্রথম, দুজনে আলাদা হয়ে, একে অন্যের থেকে দূরে সরে গেল। ঠিক যেন, ঈশ্বর কিছু একটা দিয়ে ওদের সম্পর্কটাকে কেটে, ওদেরকে আলাদা করে দিলে। দুজনে অবশ্য রোজই চিঠি লিখত। 'এইভাবে একবার অন্তত দূরে থাকাটাও খুব জরুরি' ছেলেটি লিখেছিল। 'দূরে থাকলে বোঝা যায় আমরা সত্যই একে অপরকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবি, একে অন্যের কাছে কতটা প্রয়োজনীয়,এগুলো পরখ করে দেখা যায়।' কিন্তু মেয়েটি এরকম কিছুই ভাবেনি। সে মনে করত, তাদের সম্পর্কটা এতটাই সত্য যে পরখ করে দেখার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। এটা কোটির সম্পর্কের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক, যা দৈবনির্দিষ্ট এবং শুরু থেকেই অবিচ্ছেদ্য। মেয়েটি এটাই জানত। কিন্তু ছেলেটি এটা জানত না। অথবা জানলেও গ্রাহ্য করেনি। সে জন্যই সে টোকিওতে চলে যেতে পেরেছিল। দুজনের সম্পর্ককে যাচাই করার জন্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার কথা সে কারনেই হয়ত ভেবেছিল। পুরুষরা অনেক সময়ই এধরনের চিন্তাভাবনা করে থাকে। তাই না?

উনিশ বছর বয়সে মেয়েটি কবিতা লিখেছিল। সেটিতে সুর দিয়ে, পিয়ানো বাজিয়ে গাইত। গানটায় মেলানকোলি, পবিত্রতা আর এক অকৃত্রিম সৌন্দর্য ছিল। কিন্তু গানের পদ ছিল তুলনামূলক ভাবে প্রতীকাত্মক, মননশীল, এবং দুদিক থেকেই, বলতে গেলে, বোঝা একটু কঠিন। এই বৈসাদৃশ্যটাই গানের মধ্যে একটা প্রাণ এনেছিল। বলাই বাহুল্য, গানটার কথা আর সুরের মধ্যে, মেয়েটির বিরহী হৃদয় ঘনীভূত হয়ে ছিল। মেয়েটি বারকয়েক লোকসমক্ষে এই গানখানা গেয়েছিল। একটু লাজুক স্বভাবের হলেও, গান গাইতে পছন্দ তো করতই, উপরন্তু ছাত্রজীবনে লোকসঙ্গীতের একটা ব্যান্ডও তৈরি করেছিল। সেইগান শুনে একজন ডেমো-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টেপ তৈরি করে, চেনাজানা এক রেকর্ডিং কোম্পানির ডিরেক্টরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডিরেক্টরের গান খুব পছন্দ হওয়ায়, মেয়েটিকে টোকিওর স্টুডিওতে ডেকে বিধিগত ভাবে রেকর্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন।

জীবনে প্রথম, মেয়েটি টোকিওতে গিয়ে, প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করল। রেকর্ডিং-এর মাঝে, সময় খুঁজে বার করে আগের মতোই ঘনিষ্ঠভাবে মিলতে লাগল। সম্ভবত চৌদ্দো বছর বয়স থেকেই ওদের নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক ছিল... মা সেটাই বলত। দুজনেই বয়সের তুলনায় যেন একটু বেশিই এগিয়ে ছিল। তারপর, এধরনের মানুষদের প্রায়ই যেটা হয়ে থাকে সেভাবেই, আর কখনই পুরোপুরি যেন বড় হয়ে উঠতে পারেনি। চিরটা কালই ওদের বয়স চৌদ্দো কি পনেরো-তেই রয়ে গিয়েছিল। দুজনে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, পরস্পরের অপরিহার্যতার স্বীকৃতি দিয়ে গেল। দুজনের মধ্যে কোনদিন কোনও তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হয়নি। আরে, এইরকম রূপকথার মতো লাভ-স্টোরি শুনিয়ে বিরক্ত করছিনা তো?"

আমি মাথা নাড়লাম। "পরের দিকে অবশ্যই, একটা বড় পরিবর্তন আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিক তাই", ওশিমা বলল। "সেখানেই এটারগল্প হয়ে ওঠা... বড় পরিবর্তন। ধারণাতীত পরিণতি। সুখ একই রকমের, কিন্তু বিপর্যয় বহু রকমের। টলস্টয় যেভাবে দেখেছিলেন, সেই অনুযায়ী। সুখ হচ্ছে অ্যালিগরি আর বিপর্যয়ই হচ্ছে গল্প। যাইহোক, সেই রেকর্ড প্রচুর বিক্রি হয়ে, হিট হয়। সেও যেমন তেমন হিট নয়, নাটকীয় হিট হয়েছিল। যাকে বলে, বিক্রির মতো বিক্রি, দশ লাখ, কুড়ি লাখ, যদিও সঠিক সংখ্যাটা ঠিক জানিনা। যতই হয়ে থাকুকনা কেন, সে সময়কার রেকর্ড সংখ্যা। রেকর্ডের জ্যাকেটে মেয়েটির ছবিও ছাপা হয়েছিল। স্টুডিওর গ্র্যান্ড পিয়ানোর সামনে বসে, এদিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে তোলা ছবি।

অন্য গান তৈরি করে ওঠা হয়নি বলে, রেকর্ডের একদিকে ওই গান, আর অন্যদিকে ওই গানেরই বাজনার সংস্করণ ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অর্কেস্ট্রা আর পিয়ানো ছিল। সেটারও পরিবেশনা খুব সুন্দর। ১৯৭০ সালের কিছু আগে বা পরের কথা। সেসময় রেডিওর সমস্ত স্টেশন থেকে এই গানটা বাজান হত। মা তাই বলত। আমি তখন জন্মাইনি বলে সবই শোনা কথা। শেষমেশ, গায়িকা হিসাবে জগতের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় ওই একটা গানের মাধ্যমেই। LP রেকর্ডও বের হয়নি। একটাই মাত্র গান নিয়ে আর দ্বিতীয় রেকর্ডও কখনও বার হয়নি।"

"আমি হয়তবা ওই গানটা শুনেছি।"

"তুমি খুব রেডিও শোন বুঝি?"

আমি মাথা নাড়লাম। আমি রেডিও একেবারেই প্রায় শুনি না।

"তাহলে মনে হয় তুমি শোন নি। কারন, রেডিওর অল ডে'জ স্পেশাল কালেকশনেও যখন থাকেনা, তখন শোনার সম্ভবনাও নেই। কিন্তু অপূর্ব গান। আমার কাছে একটা সিডি-তে এই গানটা আছে। আমি মাঝে মাঝে শুনি। অবশ্যই, সাএকি-সান যখন থাকেন না তখন। উনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শুধু এটাই নয়, অতীতের যেকোনো বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করা ভীষণভাবে অপছন্দ করেন।"

"গানের টাইটলটা কি?"

"'সমুদ্রতটে কাফকা'", ওশিমা বলল ।

"'সমুদ্রতটে কাফকা'?"

"হ্যাঁ, তাই। তামুরা কাফকা-কুন। এই নামটা আর তোমার নাম একই তো। অদ্ভুত যোগাযোগ, তাই না?"

"ওটা আমার আসল নাম নয়। তামুরাটা অবশ্য আমার আসল নাম।"

"কিন্তু তোমার নিজের পছন্দ করা নাম তো বটে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নাড়লাম। নামটা আমি পছন্দ করেছিলাম তো বটেই, অনেক আগে থেকেই ঠিকও করে রেখেছিলাম যে এই নামটাই, আমি আমার নতুন আমিকে দেব।

"সেটা নিঃসন্দেহে আরও তাৎপর্যপূর্ণ", ওশিমা বলল।

সাএকি-সানের প্রেমিক কুড়ি বছর বয়সে মারা যায়। 'সমুদ্রতটে কাফকা' যখন বিরাট হিট, ঠিক সেইসময়। ছেলেটির বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্ট্রাইকের কারনে অবরোধ চলছিল। সেখানে আটকে পড়া এক বন্ধুর কাছে যাওয়ার জন্য ছেলেটি ব্যারিকেডের ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনকে অধিকৃত করে রাখা ছাত্ররা, ছেলেটিকে বিরোধি দলের নেতা ভেবে ভুল করে ধরে নিয়ে গিয়ে (চেহারায় খুবই মিল ছিল), চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে, স্পাই ভেবে জেরা করতে শুরু করে। ওকে যে চিনতে ভুল করা হয়েছে, সে কথা বলতে যাওয়ায়, লোহার পাইপ আর বার দিয়ে মারা হয়। মার খেতে খেতে মাটিতে পড়ে গেলে, বুটের গোড়ালি দিয়ে মারতে থাকে। ভোর হওয়ার আগেই ছেলেটি মারা যায়। খুলির হাড়ে গর্ত হয়ে গিয়েছিল, পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল, ফুসফুস ফেটে গিয়েছিল। ওর মৃতদেহটা মড়া কুকুরের মত রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। দুই দিন পর, বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করায়, রায়ট পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অবরোধ তুলে দিয়ে, খুনের দায়ে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ছাত্ররা তাদের অপরাধ স্বীকার করে এবং বিষয়টা আদালতের বিচার্য হয়। মূলত খুনের অভিপ্রায় ছিল না, এই বলে এবং আঘাতজনিত মৃত্যুর কারন দেখিয়ে, দুজনকে স্বল্পকালীন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রত্যেকের কাছেই এটা ছিল একটা অর্থহীন মৃত্যু।

মেয়েটি আর দ্বিতীয়বার কখন গান গায়নি। নিজেকে ঘরের মধ্যে তালাবন্দি করে রেখেছিল, আর কারোর সাথে একটা কথাও বলেনি। ফোনও ধরে নি। ছেলেটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মুখ পর্যন্ত দেখায়নি। নিজের সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। এভাবে বেশ কয়েকমাস কাটার পর, মানুষজনের যখন খেয়াল পড়ল, তখন মেয়েটির উপস্থিতিই শহর থেকে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সাএকি-সান কোথায়ই বা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গেছেন, কিই বা করছেন কেউ জানত না। বাবা-মা'রাও এবিষয়ে একেবারে মুখ বন্ধ করে ছিলেন। হয়তবা ওনারাও জানতেন না সে কোথায় গেছে। সে যেন ধোঁয়ার মতো বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। অভিন্নহৃদয় বন্ধু, ওশিমা'র মা পর্যন্ত তার গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত ছিলেননা । এমনও অনেকে ছিল, যারা ভাবত, মেয়েটি ফুজি পাহাড়ের জঙ্গলে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে মানসিক রোগের হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। চেনা কারুর কোনও এক পরিচিত, এমন কেউ একজন বলেছিল যে, হঠাৎ টোকিওতে মেয়েটির সাথে তার নাকি দেখা হয়েছিল। সেই লোকটির কথা অনুযায়ী, মেয়েটি টোকিওতে কোন একটা লেখালেখির কাজ করত। বিয়ে হয়ে গিয়ে বাচ্চাও হয়েছে বলে অনেকে বলত। কিন্তু এর প্রতিটিই ছিল ভিত্তিহীন গুজব। দেখতে দেখতে, এভাবে কুড়িটা বছর কেটে যায়। একটা কথা কিন্তু বলাই যায় যে, সেসময় সাএকি-সান যেখানেই থেকে থাকুন, বা যাই করে থাকুন, কোন রকম অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়তবা ওনাকে হতে হয়নি। ওনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 'সমুদ্রতটে কাফকা'র রয়্যালটির টাকা আসত। আয়কর দেওয়ার পরও বেশ ভাল পরিমাণ অর্থই পড়ে থাকত। গানটা রেডিওতে সম্প্রচার হয়ে, পুরনো দিনের গানের সিডি-তে কম্পাইলড হয়ে থাকলে, বিরাট কিছু একটা পরিমাণ না হলেও, গানটা চালানোর জন্য প্রাপ্য টাকা আর রয়্যালটিটা আসত। দূরে কোথাও শান্ত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পেরেছিলেন। উপরন্তু ওনার নিজের পরিবার ছিল বিত্তশালী এবং উনি ছিলেন একমাত্র সন্তান।

কিন্তু পঁচিশ বছর পর হঠাৎ একদিন, সাএকি-সান তাকামাৎসুতে ফিরে আসেন। ফিরে আসার ব্যক্তিগত কারন ছিল, ওঁর মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (যদিও বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে মুখও দেখান নি)। অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে, যে বাড়িতে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন, সেটা বিক্রি করে দেন । তারপর তাকামাৎসু শহরে এক শান্ত এলাকায় ম্যানশন কিনে বসবাস করতে শুরু করেন। আর বাসা বদলের কোন চেষ্টাই করেননি। কিছুদিন পর কোওমুরা পরিবারের সাথে ওনার কিছু কথা হয় (কোওমুরা পরিবারের কর্তা তখন ছিলেন প্রয়াত বড় ছেলের থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তিন বছরের ছোট, পরিবারের মেজ ছেলে। তিনি এবং সাএকি-সান, শুধুমাত্র এই দুজনের মধ্যে কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই কথার বিষয়বস্তু কি ছিল, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা নেই), ফলাফল স্বরূপ, কোওমুরা লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ শুরু করেন ।

উনি এখনও সুন্দরী আর ছিপছিপে। 'সমুদ্রতটে কাফকা' রেকর্ডের জ্যাকেটের ছবির মতোই বুদ্ধিদীপ্ত পারিপাট্য, প্রায় একইভাবে ধরে রেখেছেন। শুধু সে ছবির নিষ্পাপ, স্বচ্ছ, স্মিত হাসিটা নেই। এখনও কদাচিৎ হাসেন। সে হাসি চার্মিং হলেও শুধুই সেই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওনার চারপাশে একটা অদৃশ্য উঁচু দেওয়াল আছে। যেটা ওঁর সেই স্মিত হাসিটাকে আড়াল করে রাখে । রোজ সকালে ফোক্সওয়াগন-গল্ফ চালিয়ে লাইব্রেরিতে এসে, আবার সেটাই চালিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

যদিও বা নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, পুরনো বন্ধুদের সাথে কিংবা আত্মীয়স্বজনের সাথে কোনরকম যোগাযোগ করেননি। অবশ্য, কখনো দেখা হয়ে গেলে অত্যন্ত নম্র ভাবেই কথা বলতেন। কিন্তু বিষয়বস্তু সবসময় খুবই সীমিত হত। অতীতের কোন ঘটনা নিয়ে কথা হলে (বিশেষতঃ সেই ঘটনায় ওঁর বিষয় যুক্ত থাকলে), তাড়াতাড়ি উনি, যা ওঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, বিষয়টাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেন। সবসময়ই অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী ভাবে কথা বলতেন, কিন্তু তার মধ্যে কোনরকম কৌতূহল অথবা বিস্ময় অনুরণিত হতনা। ওঁর নিজের মনটা—যদি ধরে নেওয়া যায় সেটা আছে—যেন অন্য কোথাও থাকত। বাস্তবিকপক্ষে ওনার কোন অভিমতের প্রয়োজন না হলে, ওনার নিজস্ব মতামতের প্রকাশ উনি প্রথমেই করতেন না। বেশিরভাগ সময়ই উনি নিজে বেশি কথা না বলে, বরঞ্চ অন্যকে কথা বলতে দিতেন এবং প্রত্যুত্তরে, যদিও খুবই উষ্ণ ভাবে, মাথা নাড়তেন অথবা সম্মতিসুচক কোন শব্দ মাত্র করতেন। ফলতঃ, অন্যজন হঠাৎ করেই একটা সময় থেকে অজ্ঞাত এক অস্বস্তি অনুভব করতে থাকত। মনে হতে থাকত, এভাবে কথা বলে, নিজে যেন ওনার শান্ত সময়টাকে নষ্ট করে ফেলছেন, নয়ত যেন ওনার সুন্দর সাজান পৃথিবীটাকে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই অনুভুতির বেশিরভাগটাই কিন্তু ছিল সত্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যদিও ফিরে এসেছিলেন, সবার কাছেই ওনার উপস্থিতিটা ছিল কতকটা প্রহেলিকাময়। অত্যন্ত মার্জিত স্টাইলের জন্য এই প্রহেলিকার মোড়কটা বজায় থাকত। ঠিক সেখানেই নিকটবর্তিতা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। নামেই মালিক যাঁরা ছিলেন, সেইকোওমুরা পরিবারের মানুষজনেরাই শুধুমাত্র ওঁর কাছে ছিলেন সমীহের,আর ওনারাই ছিলেন একমাত্র যারা বাজে কথা বলতেন না।

এরই মধ্যে, ওই লাইব্রেরিতে, ওনার সহায়ক হিসেবে, ওশিমার কাজ করার কথা ঠিক হোল। ওশিমা তখন স্কুলেও পড়ে না, কাজও করেনা, বাড়িতে একা একা প্রচুর বই পড়ে আর গান শোনে। ইন্টারনেটে চিঠি আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে ক'জনের সাথে পরিচয় হয়েছিল, তাদের বাদ দিলে বন্ধু বলতে প্রায় কেউই ছিলনা। হেমোফিলিয়ার কারণে, স্পেশাল হাসপাতালে যাওয়া, অকারনে মাজদা রোডস্টারে চড়ে ঘুরে বেড়ান, নির্দিষ্ট সময়ে হিরোশিমার হাসপাতালে যাওয়া, কোচি পাহাড়ের সেই ছোট্ট বাড়িটাতে গিয়ে থাকা ছাড়া শহরের বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও ছিলনা। তবুও তার জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ ছিলনা। ওশিমার মা হঠাৎ একদিন সাএকি-সানের সাথে ওশিমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ায়, একবার দেখাতেই কেন যেন ওশিমাকে সাএকি-সানের পছন্দ হয়ে যায়। ওশিমারও সাএকি-সানকে বেশ পছন্দ হয় আর লাইব্রেরিতে কাজ করার ইচ্ছে হয়। তখন একমাত্র ওশিমাই যেন সাএকি-সানের সাথে কথা বলার মানুষ হয়ে উঠল।

"ওশিমা-সানের কথা শুনে মনে হয় কোওমুরা লাইব্রেরিতে কাজ করার জন্যই যেন সাএকি-সান এখানে ফিরে এসেছিলেন", আমি বললাম।

"আমারও একই কথা মনে হয়। মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটা উপলক্ষ্যের বেশি কিছু নয়। অতীতের স্মৃতির ক্ষতে রাঙানো শহরে ফিরে আসার জন্য, উপযোগী সংকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই মনে হয়।"

"লাইব্রেরিটা কেন যে এত গুরুত্ব পেল!"

"প্রথমত বলতে হয় যে ছেলেটি ওখানে থাকত। ছেলেটি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাএকি-সানের মৃত প্রেমিক, এখন যে বাড়িটাতে লাইব্রেরি আছে, অর্থাৎ কিনা তখনকার কোওমুরা পরিবারের মহাফেজখানার মধ্যে, জীবনযাপন করত। উনি কোওমুরা পরিবারের বড় ছেলেও ছিলেন, হয়তবা সেই পরিবারেরই রক্তের কারণে বলে বলা উচিত, বই পড়তে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এছাড়াও, যদিও সেটাও কোওমুরা পরিবারেরই রক্তের ধারার একটা বৈশিষ্টই বলা যেতে পারে, একা থাকাটা তাঁর পছন্দ ছিল। সেজন্যই, মিডল স্কুলে ওঠার পরই, পরিবারের সবাই যে বাড়িতে থাকে, তার থেকে দূরে, প্রচুর বইপত্রে ভরা নিজের একটা আলাদা ঘর চাইলে, সেটা পেয়েও যান। বই প্রেমিক পরিবার হওয়ায় কারুরই বুঝতে অসুবিধে হয়নি। 'বুঝেছি, বই পরিবৃত হয়ে থাকতে চায় তো? সেতো ভাল কথা', এই ভেবে। সবার থেকে দূরে যখন সে থাকত, তখন কেউ তাকে বিরক্ত করতে যেত না। ফলে, এক নিরবচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে পারত। শুধু খাওয়ার সময় বাড়িতে ফিরে আসত। সাএকি-সান প্রতিদিন সেখানে আসতেন। দুজনে মিলে একসাথে পড়াশুনা করে, গান শুনে, অবিরাম গল্প করে যেত। তারপর সেখানে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে হয়তবা ঘুমোতেনও। ওই জায়গাটা দুজনের জন্য স্বর্গ হয়ে উঠেছিল।

ওশিমা স্টিয়ারিং-এর ওপর দুটো হাতই রেখে আমার মুখের দিকে তাকাল। "কাফকা-কুন†, এর পর থেকে তুমি সেখানেই থাকবে। ঠিক ওই ঘরটাতেই। লাইব্রেরি করার পর সেখানে অনেকের হাতের ছোঁয়া পড়ে থাকলেও, ঘর কিন্তু সেই একই।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"সাএকি-সানের জীবন মূলতঃ, ছেলেটি মারা যাওয়ার সময়ের সেই কুড়ি বছর বয়সেই থেমে আছে। না, সেসময় কুড়ি বছর না হয়ে আরও একটু কম ছিল বোধহয়। আমি অতটাও ঠিক জানিনা। তোমার কিন্তু না বুঝলে চলবে না। ওঁর আত্মার মধ্যে চাপা পড়ে যাওয়া ঘড়িটার কাঁটা, সেই সময়ের আগে পরে কোথাও একটা হঠাৎ করে আটকে গেছে। এটা ঠিকই যে বাইরের ঘড়িটা এগিয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে ওঁর উপর বাস্তবে প্রভাবওফেলে চলেছে। কিন্তু সাএকি-সানের কাছে সেই সময়ের কোনও অর্থ নেই।"

†স্নেহের পাত্র অল্পবয়েসি ছেলেকে নামের পরে 'কুন' বলার রীতি আছে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"অর্থ নেই?"

ওশিমা ঘাড় নাড়ল। "মানে, না থাকার মতই।"

"তার মানে সাএকি-সান সেই থেকেই থেমে থাকা সময়ের মধ্যেই বেঁচে আছেন?"

"সেরকমই। মানেটা যাই হোক না কেন, সাএকি-সানকে জীবন্ত মৃতদেহ বলা যাবে না। ওনাকে একটু জেনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তুমিও সেটা বুঝতে পারবে।"

ওশিমা হাতটা বাড়িয়ে আমার হাঁটুর ওপর রাখল। খুবই স্বাভাবিক ভাবে।

"তামুরা কাফকা-কুন, আমাদের জীবনে এমন কিছু পয়েন্ট আছে যার পর আর ফিরে আসা যায়না। তারপর, কেস অনুযায়ী, যদিও সেটা খুব কম, কিছু পয়েন্ট থাকে যেখান থেকে আর সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়না। সেরকম পয়েন্ট এলে, সেটা খারাপই হোক বা ভালই হোক, চুপচাপ সেটাকে গ্রহণ করে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার থাকে না। আমাদের সে ভাবেই বাঁচতে হয়।"

আমরা এক্সপ্রেস-ওয়েতে ঢুকলাম। তার আগে গাড়ি থামিয়ে, ওশিমা গাড়ির হুডটা তুলে দিয়েছিল। তারপর আবার শুবার্টের সোনাটা চালিয়ে দিল।

"আরেকটা বিষয় তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই", ওশিমা বলল। "সাএকি-সানের কোনও এক ধরনের মনের অসুখ আছে। অবশ্যই আমার তোমার সবারই আছে। কম কিংবা বেশি। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাএকি-সান সেই সাধারন অর্থটাকে পেরিয়ে গিয়ে, একেবারে নিজস্ব অসুখ আছে। হয়ত ওঁর আত্মা অন্য সবার থেকে আলাদা ভাবে কাজ করে। কিন্তু এটা বলছিনা যে উনি খুব ভয়ঙ্কর। দৈনন্দিন জীবনে সাএকি-সান অত্যন্ত পরিমিত। আমার পরিচিতদের মধ্যে সম্ভবত সব থেকে বেশি শালীন। গভীরতাও যেমন আছে তেমন বুদ্ধিদীপ্ত আর চার্মিং। ওঁর মধ্যে কিছু অদ্ভুত বিষয় থাকলেও আমি তোমাকে অনুরোধ করবো সেগুলোতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশেষ মনোযোগ না দিতে।"

"অদ্ভুত বিষয়?" কিছু না ভেবেই আমি প্রশ্ন করে ফেললাম।

ওশিমা ঘাড় নাড়ল। "আমার সাএকি-সানকে খুব পছন্দ। শ্রদ্ধা করি। ওঁর সম্বন্ধে তুমিও একই ধারণা পোষণ করবে বলেই আমি মনে করি।"

আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব এটা কখনই নয়। কিন্তু ওশিমা এর থেকে বেশি কিছুই বলল না। সময় হিসেব করে গিয়ার বদলে, অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে, টানেলের সামনে একটা লাইট-ভ্যানকে পেরিয়ে গেলেন ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮

যখন খেয়াল হল, তখন নাকাতা ঝোপের মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সে কোনরকমে হুঁশ ফিরিয়ে এনে, আস্তে আস্তে চোখ খুলল। তখন রাত। কোন তারা ছিলনা। চাঁদও ওঠেনি। তবুও আকাশে ঝাপসা আলো ছিল। গ্রীষ্মের ঘাসের জোড়াল গন্ধ। পোকামাকড়ের ডাকও শোনা যাচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল, এটা রোজ দেখা সেই ফাঁকা জমিটা। মুখে কিসের যেন একটা সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো স্পর্শ। খসখসে অথচ গরম কিছু। সে মুখটা একটু নাড়িয়ে দেখল, দুটো বেড়াল ছোট্ট জিভ দিয়ে দুই দিকের গাল নিবিষ্ট মনে চেটে যাচ্ছে। গোমা আর মিমি। সে শরীরটা একটু তুলে, হাত বাড়িয়ে দুটো বেড়ালেরই গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

"নাকাতা বোধহয় ঘুমোচ্ছিল, তাই না?" বেড়ালদুটোকে জিজ্ঞাসা করল।

দুটো বেড়ালই কিছু যেন নালিশ করল, এরকম ভাবে আওয়াজ করল। কিন্তু নাকাতা সেকথা ঠিক ধরতে পারলনা। ওরা যে কি বলছে, নাকাতা একটুও বুঝতে পারলনা। বেড়ালের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু মনে হলনা। "সুমিমাসেন[†], তোমরা কি বলছ, সেটা বোধহয় নাকাতা আর বুঝতে পারছে না।"

নাকাতা উঠে দাড়িয়ে চট করে নিজের শরীরের চারপাশটা দেখে নিয়ে, কোনরকম বিপর্যয় ঘটে গেছে কিনা ঠাহর করে নিল। ব্যথাও নেই। হাত পাও ঠিকঠাকই নড়ছে। চারপাশটা অন্ধকার হওয়ায়, ঠাহর করতে একটু সময় লাগলেও, হাতে কিংবা জামায় কোন রক্ত যে লেগে নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল। বাড়ি থেকে বেরবার সময় যে ভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই জামাটা গায়ে রয়েছে। কোনরকম এদিক ওদিক হয়নি। ফ্লাস্ক আর বেনতো (লাঞ্চবক্স) রাখা কাপড়ের ব্যাগটাও পাশে রাখা আছে। টুপিটাও প্যান্টের পকেটে ঢোকান রয়েছে। নাকাতা কারণ কিছুই বুঝতে

[†] মাফ করবেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পারলনা। কিছুক্ষন আগেই বড় একটা ছুরি হাতে তুলে নিয়ে 'বেড়াল খুনি' জনি ওয়াকারকে মেরে ফেলেছে। মিমি আর গোমার জীবন বাঁচানোর জন্য। সেকথা নাকাতার পরিষ্কার মনে আছে। হাতে এখনও সেই স্পর্শটা রয়ে গেছে। স্বপ্ন-টপ্ন কিছু নয়। ছুরিটা বিঁধিয়ে দেওয়ার সময় ছিটকে বেরিয়ে আসা রক্তে মাখমাখি হয়ে গিয়েছিল। জনি ওয়াকার মেঝের উপর উল্টে পড়ে, পুরোপুরি মরে গিয়েছিল। সেই পর্যন্ত মনে আছে। তারপর সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এরপর জ্ঞান ফিরতে, খালি জমিতে, ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল। কিভাবে এখানে ফিরে এল। রাস্তা না জানা সত্ত্বেও। আরও জটিল ব্যাপার যে জামায় একটুও রক্ত লেগে নেই। স্বপ্ন যে নয়, তার প্রমাণ, দুদিকে গোমা আর মিমি রয়েছে। কিন্তু তাদের কথা নাকাতার কাছে একেবারেই বোধগম্য নয়।

নাকাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাল করে কিছু চিন্তাও করতে পারছেনা। কিছু করার উপায় নেই। পরে আবার ভাবা যাবে। সে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে, দুহাতে বেড়াল দুটোকে কোলে তুলে নিয়ে, ফাঁকা জমি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেড়ার বাইরে বেরতেই, মিমি ওর শরীরটাকে কেমন পাকিয়ে নড়েচড়ে উঠল, যেন বোঝাতে চাইল যে ও নামতে চায়। নাকাতা ওকে নিচে নামিয়ে দিল।

"মিমিসান এখন নিজে নিজেই বাড়ি ফিরতে পারে। তাই না? কাছেই বলে।" নাকাতা বলল।

মিমি যেন ঠিক সেটাই বলতে চাইছিল, এমন একটা ভাব করে জোরে জোরে ল্যাজটা নাড়ল।

"ঠিক কি যে ঘটেছিল নাকাতা সেটা তো ভাল করে বুঝতে পারছেই না, মিমি-সানের সাথেও আর যে কেন কথা বলতে পারছেনা, সেটাও ঠিক বুঝতে পারছেনা। কিন্তু গোমা কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। ভাবছি, এরপর গোমাকে কোইজুমি-সানের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব। কোইজুমি-সানের পরিবারের সবাই গোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। মিমি-সান আমার অনেক উপকার করেছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মিমি একটু ডেকে, আর একবার ল্যাজ নেড়ে, দ্রুতপায়ে বাঁক ঘুরে মিলিয়ে গেল। ওর গায়েও রক্ত লেগে ছিলনা। সেটা, নাকাতা তার স্মৃতির মধ্যে আটকে রাখল।

গোমা ফিরে এসেছে দেখে কোইজুমি-সানের পরিবার খুব খুশি হল। তখন রাত্রি ১০টা বেজে গিয়েছিল, বাচ্চারা দাঁত মাজছিল। কোইজুমি দম্পতি হোজি চা খেতে খেতে 'নিউজ স্টেশন' দেখছিলেন। নাকাতাকে বেড়াল নিয়ে আসতে দেখে, খুব উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। পাজামা পরা বাচ্চারা, তিনরঙা বেড়াল দেখে, কেড়ে কোলে নিয়ে নিল। অবিলম্বে দুধ আর ক্যাট ফুড পেয়ে, নিবিষ্ট মনে গোমা সেগুলো খেতে লাগল।

"এত রাতে আপনাদের বিরক্ত করায় আমি খুবই লজ্জিত। আর একটু আগে আসতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু নাকাতার কাছে অন্য কোন উপায় ছিলনা।"

"না না, কোন অসুবিধে নেই। আপনি কোন চিন্তা করবেন না", কোইজুমি-সানের স্ত্রী বললেন।

"সময়টা কোন সমস্যাই নয়। এই বেড়ালটা আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেছে। খুঁজে দেওয়াতে খুবই ভাল হয়েছে। ভেতরে আসুন না। একসাথে চা খেয়ে যান", গৃহকর্তা বললেন।

"না না। নাকাতা এখুনি ফিরে যাবে। নাকাতা, এক্ষুনি গোমাকে কোইজুমি-সানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল শুধু।"

কোইজুমি-সানের স্ত্রী ভিতরে গিয়ে, খামের মধ্যে কিছু টাকা ভরে নিয়ে এলেন। কোইজুমি-সান সেটা নাকাতার হাতে তুলে দিলেন। "খুব সামান্যই, কিন্তু গোমাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য অল্প কিছু এতে আছে। যদি নেন।"

"অনেক ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয়ই নেব", নাকাতা খামটা নিয়ে মাথা নোয়াল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"কিন্তু, এই অন্ধকারের মধ্যে, আমরা কোথায় আছি, বেশ বুঝতে পেরেছেন তো?"

"হ্যাঁ, বললে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। নাকাতা মনে হয় খুব একটা ভাল বলতে পারেনা। নাকাতার মাথাটাও খুব একটা ভাল নয়। এছাড়া অনেকক্ষণ ধরে কিছু বোঝানোটা নাকাতার পক্ষে একেবারেই সুবিধের নয়।"

"সে ঠিক আছে। আসলে, কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব!" কোইজুমি-সানের স্ত্রী বললেন। "কিছু যদি মনে না করেন, রাতের ভাত একটু রয়ে গেছে, সেই সাথে বেগুন পোড়া আর ভিনিগারে ভিজানো শসা আছে। নাকাতাসানের যদি পছন্দ হয় তাহলে দিয়ে দেবো?"

"আপনি যখন বলছেন,তখন নেব। বেগুন পোড়া আর ভিনিগারে ভিজানো শসা নাকাতার খুব পছন্দ।"

নাকাতা, বেগুন পোড়া আর ভিনিগারে ভিজানো শসা ভরা ট্যাপার-ওয়্যার এবং টাকার খাম ব্যাগে পুরে, কোইজুমি-সানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। ষ্টেশনমুখো হয়ে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে, বাজারের কাছের পুলিশ বক্স পর্যন্ত গেলো। সেখানে একজন অল্পবয়সী পুলিশ টেবিলের সামনে বসে, কাগজপত্রের মধ্যে কিছু লিখছিল। মাথাটা খালি ছিল, টেবিলের ওপর টুপিটা রাখা ছিল। নাকাতা পুলিশ বক্সের কাঁচের দরজাটা টেনে সরিয়ে, ভিতরে ঢুকে বলল "কোম্বানওয়া[1]। একটু বিরক্ত করছি।"

"কোম্বানওয়া" পুলিশও বলল। কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে নাকাতাকে নিরীক্ষণ করলো। শান্ত, নিরীহ বৃদ্ধের মত দেখাল। ভাবল, হয়ত রাস্তা জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

নাকাতা দরজায় দাঁড়িয়েই টুপি খুলে, সেটাকে পকেটে ঢোকাল। তারপর উলটো দিকের পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল। রুমালটা ভাঁজ করে, আবার সেই পকেটেই ঢুকিয়ে দিল।

[1] শুভ সন্ধ্যা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"কিছু কাজ আছে?" পুলিশ জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ। নাকাতা একটু আগে একজনকে খুন করে ফেলেছে।"

পুলিশ, তার হাতে ধরে থাকা পেনটা কিছু না ভেবে টেবিলের উপরে ফেলে, মুখ হাঁ করে নাকাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল।

"একটু..., মানে..., ওখানে বস", বলে, পুলিশ অর্ধেক বিশ্বাস আর অর্ধেক অবিশ্বাসের সঙ্গে, টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। তারপর হাত বাড়িয়ে, পিস্তল আর বাটন আর হাতকড়া কোমরে রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে নিল।

"আচ্ছা।" বলে, নাকাতা সেখানে বসল। শিরদাঁড়া সোজা করে, হাঁটুর ওপর দুই হাত রেখে, সোজাসুজি পুলিশের মুখের দিকে তাকাল।

"তাহলে তুমি... মানুষ খুন করেছ?"

"হ্যাঁ। নাকাতা ছুরি মেরে মানুষ খুন করে ফেলেছে। এই একটু আগেই", নাকাতা পরিষ্কার করে বলল।

পুলিশ একটা খালি ফর্ম বের করে, দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ তুলে, সময়টা লিখে, ছুরি মেরে খুন বলে লিখল।

"সবচেয়ে আগে নাম আর ঠিকানা।"

"হ্যাঁ। আমার নাম নাকাতা সাতোরু। ঠিকানা..."

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। নাকাতা সাতোরু, কোন হরফে লেখ?"

"নাকাতা হরফের ব্যাপার বোঝে না। ক্ষমা করবেন, লিখতেও জানেনা, পড়তেও জানেনা।"

পুলিশ বিরক্ত মুখে তাকাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"একটুও লিখতে পড়তে পার না? নিজের নামটাও লিখতে পার না?"

"হ্যাঁ। নয় বছর বয়স পর্যন্ত নাকাতাও লিখতে পড়তে পারত। দুর্ঘটনা হয়েছিল, তারপর থেকেই একদম পারেনা। মাথাটাও ভোঁতা।"

পুলিশও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পেনটা নামিয়ে রাখল। "তাহলে তো লিখতেও পারব না। নিজের নামটাও কি করে লিখতে হয় জান না?"

"ক্ষমা করবেন।"

"বাড়িতে কেউ নেই? পরিবার?"

"নাকাতা একা। পরিবার নেই। কাজও করে না। গভর্নরের কাছ থেকে ভাতা পায় আর সেই দিয়ে জীবন চালায়।"

"এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমার এবার আস্তে আস্তে বাড়ি যাওয়াই ভাল। তারপর ভাল করে ঘুমাও। কাল আবার কিছু মনে পড়লে, একবার এখানে এস। তখন আবার নতুন করে শুনব।"

পুলিসের তখন ডিউটির পালাবদলের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। তার আগেই সে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলতে চায়। ডিউটি শেষ হলে সহকর্মীর সাথে কাছের মদের দোকানে যাওয়ার কথা হয়ে আছে। এই পাগল বুড়োর সাথে কথা বলার তার মোটেই সময় নেই। কিন্তু নাকাতা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"না, সব কিছু মনে থাকতে থাকতেই নাকাতা বলে রাখতে চায়। কাল হলে অনেক দরকারি কথা ভুলে যেতে পারে।

নাকাতা তখন ২ চো-ও-মে মহল্লার খালি জমিতে ছিল। কোইজুমি-সানের অনুরোধে, সেখানে গোমাকে খুঁজছিল। সেখানে হঠাৎ বড় কালো একটা কুকুর এসে, নাকাতাকে সাথে করে কোন একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই বাড়িটাতে বড় একটা গেট ছিল আর কালো গাড়ি ছিল। ঠিকানাটা জানিনা। আশপাশটাও ঠিক মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেই। কিন্তু, বোধহয় নাকানো-কু ছিল। সেখানে জনি ওয়াকার নামে কালো টুপি পরা একটা অদ্ভুত লোক ছিল। উঁচু কালো টুপি। রান্নাঘরের ফ্রিজের মধ্যে অনেকগুলো বেড়ালের মাথা পরপর সাজান ছিল। প্রায় ২০ টা মতো ছিল। সেই লোকটা বেড়াল জোগাড় করে, করাত দিয়ে তার মাথা কেটে, হার্টটা খায়। বেড়ালের আত্মা দিয়ে বিশেষ ধরনের বাঁশি বানায়। তারপর সেই বাঁশি ব্যবহার করে মানুষের আত্মা জোগাড় করে। জনি ওয়াকার, নাকাতার সামনে, ছুরি দিয়ে কাওয়ামুরাসানকে খুন করেছিল। আরও বেশ কয়েকটা বেড়ালকেও খুন করেছিল। ছুরি দিয়ে পেট চিরে দেয়। গোমা আর মিমিসানকেও মারতে যাচ্ছিল। তখন নাকাতা ছুরি দিয়ে জনি ওয়াকারকে খুন করে ফেলে।

জনি ওয়াকার নিজেই নাকাতাকে বলে ওকে মেরে ফেলতে। কিন্তু জনি ওয়াকারকে মারার কোনও ইচ্ছে নাকাতার ছিলনা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এর আগে নাকাতা কখন মানুষ মারেনি। নাকাতা শুধুমাত্র জনি ওয়াকারের বেড়াল মারাটা আটকাতে চেয়েছিল। কিন্তু তার শরীরটা সেই কথা শুনতে চায়নি। শরীরটা তার নিজের ইচ্ছেতে কাজ করল। নাকাতা, সেখানে যে ছুরিটা ছিল সেটা দিয়ে, একবার,দুবার, তিনবার, জনি ওয়াকারের বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। জনি ওয়াকার মেঝের উপর উল্টে পড়ে, রক্তে মাখামাখি হয়ে মরে গিয়েছিল। নাকাতাও তখন রক্তে মাখমাখি হয়ে গিয়েছিল। তারপর নাকাতা কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়ে, সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বলেই মনে হয়। চোখ খোলার পর, তখনও রাত ছিল, সেই ফাঁকা জমিটাতে পড়ে ছিল। গোমা আর মিমিসান তখন পাশেই ছিল। এটা কিছুক্ষন আগেকার কথা। তারপর নাকাতা প্রথমে কোইজুমি-সানের বাড়ি গিয়ে, গোমাকে পৌঁছে দিয়ে, কোইজুমি-সানের স্ত্রীর কাছ থেকে বেগুন পোড়া আর ভিনিগারে ভিজানো শসা নিয়ে, সোজা এখানে চলে এসেছে। গভর্নরকেও খবরটা না দিলে তো চলবে না বলেই মনে হল।”

পিঠ টানটান করে বসে, এক দমে কথা শেষ করে, নাকাতা বড় নিশ্বাস নিল। জীবনে প্রথম, একবারে এইরকম লম্বা কথা বলল। মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা লাগছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"এই বিষয়টা যেভাবেই হোক, দয়া করে গভর্নরকে জানাবেন।"

অল্প বয়সী পুলিশটা হতবাক হয়ে নাকাতার কথা শুনছিল। কিন্তু নাকাতা কি যে ঠিক বলছে, সে একেবারেই বুঝতে পারছিলনা। জনি ওয়াকার? গোমা?

"বুঝলাম। গভর্নরকে এই বিষয়টা জানিয়ে রাখব।" পুলিশ বলল।

"সাহায্য ভাতাটা কাটা না গেলে ভাল হয়।"

পুলিশ দুর্বোধ্য মুখ করে, কাগজে মেমো নেওয়ার ভান করল। "বেশ, সে ভাবেই লিখে রাখব। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার ভাতা যাতে না কাটা হয়, সেটাই আশা করছেন বলে। ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক পরিশ্রম করালাম। গভর্নরকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।"

"জানাব। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে, এবারে একটু বিশ্রাম নাও", এই বলে, সবশেষে পুলিশ তার একমাত্র চিন্তা ব্যক্ত করল। "আচ্ছা, তুমি বললে যে খুন করার পর রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু জামায় তো কিছুই লেগে নেই!"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। সত্যি বলতে কি নাকাতার কাছেও ব্যাপারটা একেবারেই অদ্ভুত ঠেকছে। বোঝার বাইরে। নিশ্চয়ই নাকাতারও রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু খেয়াল হওয়ার সময় থেকেই সেটা আর ছিলনা। অদ্ভুত!"

"অদ্ভুত তো!" পুলিশ তার সারাদিনের ক্লান্তি জড়ান গলায় বলল।

নাকাতা পুলিশ বক্সের দরজাটা ঠেলে খুলে বেরোতে গিয়েই, পা থামিয়ে, ফিরে বলল।

"আচ্ছা, কাল বিকেলে আপনি এই অঞ্চলেই থাকবেন কি?"

"থাকব", সতর্কতার সাথে পুলিশ বলল। "কাল বিকেলেও এখানে ডিউটি করব। সে কথা কেন?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"যদি আকাশ পরিষ্কারও থাকে, সাবধানতার জন্য ছাতা সঙ্গে করে নিয়ে আসাই ভাল হবে।"

পুলিশ মাথা নাড়ল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়ালের ঘড়িটা দেখল। এবার সহকর্মীর কাছ থেকে ফোনটা আসা উচিত। "ঠিক আছে, ছাতা নিয়ে আসব।"

"আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো, মাছ ঝরে পড়বে। অনেক মাছ। বোধহয় সার্ডিন মাছ। হয়ত বা মধ্যে কিছু হর্স ম্যাকারেলও মেশান থাকবে।"

"সার্ডিন আর হর্স ম্যাকারেল!" পুলিশ হাসতে হাসতে বলল। "তাহলে, ছাতাটা উল্টো করে, মাছগুলো ধরে, ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখলেই বোধহয় ভাল। তাই না!"

"ভিনিগারে ভিজানো ম্যাকারেল নাকাতারও খুব পছন্দ", গম্ভীর মুখে নাকাতা বলল। "কিন্তু কালকের ওই সময়টাতে নাকাতা হয়ত এখানে আসতে পারবেনা।"

পরদিন নাকানো-কু'র সেই জায়গায়, সত্যি সত্যি যখন আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারার মতো সার্ডিন আর ম্যাকারেল ঝরতে লাগল, সেই অল্প বয়সী পুলিশের মুখটা তখন একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কোনরকম পূর্বাভাস ছাড়াই, প্রায় দু'হাজার বা তারও বেশি মাছ, মেঘের মধ্যে থেকে হঠাৎ ঝরে পড়তে লাগল। বেশিরভাগ মাছ মাটিতে আছড়ে পড়ে থেঁতলে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝমধ্যে কিছু জীবন্ত মাছও থাকায়, বাজারের রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল মাছগুলো খুব তাজা, এমনকি তখনও সমুদ্রের গন্ধ ছড়াচ্ছিল। মাছগুলো মানুষের মাথায়, গাড়ির উপর, বাড়ির ছাদে আওয়াজ করে করে পড়ছিল ঠিকই, কিন্তু যেন অত ওপর থেকে পড়েনি, আর তাতে, সৌভাগ্যবশতঃ কেউই বিশেষ আহত হয়নি। প্রচুর পরিমাণের মাছ, শিলাবৃষ্টির মতো আকাশ থেকে ঝরে পড়ছিল। নিশ্চিত ভাবে অ্যাপোক্যালিপ্স্ সুলভ ঘটনা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এরপর, পুলিশ তদন্ত করেও দেখেছিল, কিন্তু মাছগুলো কোথা থেকে কিভাবে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। মাছের বাজার কিংবা মাছ সাপ্লাইয়ের জাহাজগুলো থেকে যে প্রচুর পরিমাণ মাছ কেনা হয়েছিল, এমন কথাও শোনা যায়নি। সেইসময় উপরের আকাশ দিয়ে প্লেন বা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছিল, এমনও নয়। টর্নেডোর খবরও ছিলনা, অথচ দুষ্টুমি করে কেউ এই কাণ্ড ঘটিয়েছে ভাবাটাও কঠিন। দুষ্টুমির পক্ষে এটা খুবই কষ্টসাধ্য। পুলিশের বক্তব্য, নাকানো-কু'র স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ঝরে পড়া মাছ সংগ্রহ করে, পরীক্ষা করে দেখেছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন বিষয় খুঁজে পায়নি। ওগুলো একেবারেই সাধারন সার্ডিন আর ম্যাকারেলের মতোই ছিল। দেখতেও রীতিমতো তাজা আর সুস্বাদু ছিল। কিন্তু পুলিশ গাড়ি আর মাইক নিয়ে বেরিয়ে প্রচার করতে লাগল: মাছ কোথা থেকে এসেছে জানা নেই আর এর মধ্যে বিপজ্জনক কিছু মিশে থাকার সম্ভবনা আছে বলে, আকাশ থেকে ঝরে পড়া মাছ কেউ যেন না খায়। টেলিভিশনের গাড়িগুলোও ভিড় করে এল। এটা টেলিভিশনের জন্য একেবারে উপযুক্ত ঘটনা। রিপোর্টাররা জড়ো হয়ে, এই সীমাহীন আশ্চর্যজনক ঘটনা সারা দেশে রাষ্ট্র করে দিল। তারা কথার মধ্যে মধ্যে রাস্তার উপর ঝরে পড়া মাছগুলো তুলে তুলে দেখাতে লাগল। আকাশ থেকে ঝরে পড়া সার্ডিন আর ম্যাকারেল মাছগুলো মাথায় এসে লাগা গৃহবধূর কমেন্টও সম্প্রচার করল। ম্যাকারেল মাছের পিঠের পাখনায় গৃহবধূটির গাল কেটে গিয়েছিল। "ভাগ্যিস সার্ডিন আর ম্যাকারেল মাছ পড়েছিল, টুনা মাছ হলে আরও খারাপ কিছু হতে পারত!" রুমাল দিয়ে গাল চাপতে চাপতে মহিলাটি বললেন। খুবই উচিত কথাই বলেছিলেন, কিন্তু সেটা শুনে টিভির দর্শকরা সবাই হাসল। এরই মধ্যে, ঝরে পড়া সার্ডিন আর ম্যাকারেল মাছ, ক্যামেরার সামনে ঝলসে খেয়ে দেখানোর মত পরাক্রমী রিপোর্টারও ছিল। "খুবই সুস্বাদু", বেশ গর্বের সাথে বলল। "তাজাও আর তেলও আছে। দাইকোনওরোশি[1] আর ভাত যে কেন নেই তাই ভাবছি।"

পুলিশ বুঝে উঠতে পারলনা কি করা উচিত। ওই অদ্ভুত বুড়োটা —নামটা কি যেন ছিল, মনে নে—ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে আজ বিকেলে আকাশ থেকে অনেক মাছ ঝরে পড়বে। সার্ডিন আর

[1] দাইকোনওরোশি – কুচিকুচি করে কাটা মুলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ম্যাকারেল। ঠিক যা বলেছিল...। কিন্তু সে নিজেই হেসে উড়িয়ে দিয়ে, নাম ঠিকানাটাও লিখে রাখেনি। এই ব্যাপারটা উপরওয়ালা কর্তাদের জানানো উচিত হবে কি? সেটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন এই খবরটা জানানোর কী মেরিট থাকতে পারে। কারোর যে বিরাট কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে এমনও নয়, আবার, এখন কেউ যে কোন অপরাধমূলক কাজ করছে, তারও কোন প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র আকাশ থেকে মাছ ঝরে পড়েছে।

অদ্ভুত বুড়োটা পুলিশ বক্সে এসে, আকাশ থেকে সার্ডিন আর ম্যাকারেল ঝরে পড়বে বলে যে ভবিষৎবাণীটা করেছিল, সেই বাজে গল্পটা কি উপরওয়ালা কর্তারা শুনলে সোজাসুজি বিশ্বাস করে নেবেন? মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে ভাববেন না তো? অথবা, গল্পের ডালপালা গজিয়ে পুলিশদের মধ্যে, হয়তবা, একটা হাস্যকর গল্প হয়ে উঠবে।

তার উপর আর একটা বিষয় হল, ওই বুড়োটা পুলিশ বক্সে এসে মানুষ খুনের মতো অপরাধ করেছিল বলে জানিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা আত্মসমর্পণ করেছিল। সেটা সে তখন নিজেই খুব একটা আমল দেয়নি। এই সত্যটা দৈনন্দিন ডাইরিতে নথিভুক্ত পর্যন্ত করেনি। সেটা স্পষ্টতই দায়িত্ব লঙ্ঘন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বুড়োর কথাগুলো এমন বোকাবোকা। যেকোনো পুলিশই, সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকলে, ওইরকম গল্পগুলো গুরুত্ব দিয়ে শুনত না। পুলিশ বক্সের রোজকার ডিউটিতে অদ্ভুত সমস্ত কাজের তাড়নায় ব্যস্ততা থাকেই, উপরন্তু অফিসের কাজও থাকে পাহাড় প্রমান। পৃথিবীর সমস্ত স্ক্রু-ঢিলে লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে, সবার যেন আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল এমন ভাব করে, পুলিশ বক্সের দরজা ঠেলে ঢুকে, মানে বোঝা যায়না এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকে। প্রত্যেকটা বিষয় নিয়মমাফিক করা যায় না।

কিন্তু আকাশ থেকে মাছ ঝরে পড়ার ভবিষ্যতবাণীটা (সেটাও যথেষ্ট'র বেশিই বোকাবোকা গল্প) সত্যিই ঘটে গেল বলে, ওই বুড়োটা কাকে যেন—বোধহয় জনি ওয়াকার বলেছিল—ছুরি দিয়ে খুন করার দুর্বোধ্য গল্পটাও তাহলে, পুরোপুরি বানানো গল্প বলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যায়না। তর্কের খাতিরেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে সেটা সত্যি ছিল, তাহলেও সাংঘাতিক ব্যাপার। কারন, "একটু আগেই খুন করেছি।" বলে আত্মসমর্পণ করতে আসা সত্ত্বেও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি রিপোর্ট পর্যন্ত করা হয়নি।

অবশেষে, ময়লা তোলার গাড়ি এসে, রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা মাছগুলো সরিয়ে নিল। অল্পবয়সী পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করল। গাড়ি যাতে ঢুকতে না পারে, সেই মতো বাজারের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিল। বাজারের রাস্তায় সার্ডিন আর ম্যাকারেলের আঁশ দলা পাকিয়ে আটকে ছিল বলে, যতই হৌস পাইপের জল দিয়ে ধুক না কেন, পুরোপুরি পরিষ্কার করতে পারল না। কিছুক্ষনের মধ্যে রাস্তা পিছল হয়ে যাওয়ায়, সাইকেলের চাকা পিছলিয়ে, বেশ কয়েকজন গৃহবধূ পড়েও গেলেন। সময় গড়িয়ে গেলেও, মাছের গন্ধটা সহজে গেল না। ফলত, আশেপাশের বেড়ালরা সারা রাত উত্তেজিত হয়ে রইল। হরেকরকম কাজের তাড়নায়, সেই অদ্ভুত বুড়োকে নিয়ে চিন্তা করার সময়ও পুলিশটির রইল না।

কিন্তু আকাশ থেকে মাছ ঝরে পড়ার পরের দিন, আশেপাশের আবাসন থেকে একজন পুরুষের ছুরিকাহত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার সময়, সেই অল্পবয়সী পুলিশের প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। খুন হওয়া মানুষটি একজন বিখ্যাত ভাস্কর, আর মৃতদেহ যে আবিষ্কার করেছে, সে হচ্ছে সেই পরিচারিকা যে প্রতি একদিন অন্তর দেখাশুনো করতে আসে। মৃতদেহটা কেন যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়, মেঝের উপর, রক্তের সমুদ্রের মধ্যে পড়ে ছিল। মৃত্যুর আনুমানিক সময় ছিল দুদিন আগের বিকেল, আর অস্ত্র ছিল রান্নাঘরের স্টেক কাটার ছুরি। পুলিশ ভাবল, বুড়োটা এখানে এসে যা কিছু বলেছিল, সব সত্যি। উফ্, সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার তখন হেড কোয়ার্টারে খবর দিয়ে, বুড়োটাকে পেট্রোল কার-এ চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। খুন করেছে বলে স্বীকারোক্তি যখন করেছিল, তখন উপরওয়ালা কর্তাদের হাতেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। মাথা খারাপ ছিল কিনা, সে বিচারের ভার ওনাদের উপরেই ছেড়ে দিলে ভাল হত। দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল। এরপর না জানার ভাণ করা ছাড়া কিছু করার নেই। সেই সঙ্কল্পই পুলিশটি করল।

নাকাতা ততক্ষণে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯

আজ সোমবার, লাইব্রেরি বন্ধ। এমনিতেই বেশিরভাগ সময় শুনসান থাকে, আর বন্ধ থাকলে, সেই দিনগুলোতে মনে হয় সময় বুঝি জায়গাটার কথা খেয়ালই করেনি। কিংবা বলা উচিত, জায়গাটা যেন দম চেপে রয়েছে, সময় যাতে এসে হোঁচট না খায় এখানে।

রীডিংরুম থেকে করিডর ধরে এগিয়ে, একটা 'শুধু কর্মীদের জন্য' বিজ্ঞপ্তি পেরলে, একটা সিঙ্কের মতো, যেখানে চা কিংবা কফি বানানো যায়, একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনও আছে। আর এর পরেই গেস্টরুমের দরজা। ওতে একটা মামুলি বাথরুম আর ওয়ার্ডরোবও আছে। সিংগল বেডের পাশে বেডসাইড টেবলে রীডিং ল্যাম্প আর অ্যালার্মক্লক্ ফিট করা। একটা লেখার জন্য ডেস্কও আছে, তার ওপরেও একটা ল্যাম্প। এছাড়া একসেট পুরোনো ধাঁচের চেয়ার, সাদা কাপড়ে মোড়া, অতিথি এলে বসতে দেবার জন্য। আর আছে জামাকাপড় রাখার জন্য ড্রয়ারওয়ালা একটা আলমারি। ছোট একটা রেফ্রিজারেটারের ওপর ক'টা ডিশ রাখা, সেগুলো সরিয়ে রাখার জন্য ছোট্ট একটা i"ক। একটু আধটু রান্না করতে চাইলে, বেরুলেই তো রান্নাঘর। বাথরুমে শাওয়ারের ব্যবস্থা আছে, সাবান, শ্যাম্পু, একটা হেয়ার-ড্রায়ার আর তোয়ালে। অল্প ক'দিন স্বচ্ছন্দে থাকার জন্য যা যা দরকার। পশ্চিমমুখো একটা জানালা দিয়ে বাগানের গাছপালা চোখে পড়ে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, সিডার গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে।

"বাড়ি যাওয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচতে আমি ক'বার এখানে থেকেছি", ওশিমা বলে। "কিন্তু আর কেউ এটা ব্যবহার করে না। যদ্দূর জানি, সাএকি-সান কখনোই এটা ব্যবহার করেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলতে চাইছি যে, তুমি থাকছো বলে অন্য কেউ থাকতে পাচ্ছে না, এমনটা মোটেই নয়।”

রুকস্যাকটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে আমি থাকার এই নতুন বন্দোবস্তের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই।

“একপ্রস্থ পরিষ্কার কাচা বিছানার চাদর আছে এবং তোমার চলে যাবে এরকম যথেষ্ট কিছু আছে ফ্রিজে। দুধ, কিছু ফলটল, সবজি, মাখন, হ্যাম, চীজ... পুরোদস্তুর খানাপিনার জন্য যথেষ্ট না হলেও, একটা স্যান্ডুইচ কিংবা স্যালাড বানিয়ে নেওয়ার জন্য ঠিকই আছে। এর বেশি কিছু চাইলে, টেক-অ্যাওয়ে থেকে কিনে এনো অথবা বাইরে খেয়ে নিয়ো। জামাকাপড় পরিষ্কার করতে হলে কিন্তু বাথরুমেই কেচে নিতে হবে। দেখি, আর কিছু ভুলে যাচ্ছি কিনা।”

“সাএকি-সান সাধারণতঃ কোথায় বসে কাজ করেন?”

ওশিমা ছাতের দিকে দেখায়। ট্যুর নেওয়ার সময় দোতলা যে ঘরটা দেখেছিলে, মনে আছে? ওঁকে সর্বদাই ওখানে পাওয়া যায়, লেখেন বসে। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য বেরোতে হলে, উনি নেমে এসে রিসেপশন ডেস্ক সামলান। তবে, একতলায় কোনও কাজে না এসে থাকলে, ওখানেই ওঁকে পাবে তুমি।

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

“আমি কাল দশটার আগেই এসে যাব তোমার কাজ বুঝিয়ে দিতে। ততক্ষণ ধীরেসুস্থে স্বচ্ছন্দ মত থাক।”

“এতসবের জন্য অনেক ধন্যবাদ”, আমি ওকে বলি।

“এ আর এমন কী”, ও উত্তরে বলে।

ও চলে যাওয়ার পর আমি রুকস্যাক থেকে জিনিসপত্র বের করে, আমার অল্প যেক'টা জামাকাপড়, ড্রয়ারে তুলে রাখি। শার্ট আর জ্যাকেট ঝুলিয়ে রাখি। ডেস্কের ওপর নোটবুক, পেন, সব সাজিয়ে রাখি। টয়লেট্রিগুলো বাথরুমে রেখে আসি আর সবশেষে রুকস্যাকটা ওয়ার্ডরোবে ভরে দিই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঘরটা সাজানোর জন্য তেমন কিছু নেই, কেবল একটা ছোট অয়েল পেইন্টিং, তাতে সমুদ্রতটে একটি অল্পবয়েসী ছেলে। বেশ বাস্তবানুগ ছবি। আমার খুব একটা খারাপ লাগল না—বিখ্যাত কারুর আঁকা কিনা, কে জানে। বছর বারোর একটা ছেলে, মাথায় রোদ থেকে বাঁচতে সোলার হ্যাট, একটা ছোট ডেকচেয়ারে বসে আছে। চেয়ারের একটা হাতলের ওপর কনুই দুটো, গালে হাত দিয়ে বসা। সামান্য যেন বিষন্ন, কিন্তু প্রশান্তিও আছে। কালো একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর ওর পাশে, যেন পাহারা দিচ্ছে। পশ্চাদপটে সমুদ্র আর কিছু অন্য লোকজন, কিন্তু তারা এত দূরে যে মুখ বোঝা যাচ্ছে না। একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, আর হাতের মুঠোর মত কয়েকটা মেঘ জলের ওপর ভাসমান। নিশ্চিত ভাবে গ্রীষ্মকালের দৃশ্য। ডেস্কে বসে বেশ কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম। একসময় মনে হল আমি যেন ঢেউ এসে আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, সমুদ্রের লবনাক্ত ঘ্রাণ আসছে নাকে।

এমন হতে পারে যে ছবির ছেলেটা হল এই ঘরে যে থাকত, সাএকি-সান যাকে ভালবাসত। ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল, অকারণে যাকে পিটিয়ে মারা হয়। নিশ্চিত করে জানার কোনো উপায় নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে সেই ছেলেটাই হবে। একে তো, দৃশ্যটা অনেকটাই, এদিকটায় যেরকম চোখে পড়ে। সে ক্ষেত্রে, প্রায় চল্লিশ বছর আগের ব্যাপার—আমার পক্ষে অনাদিকাল আগে। চল্লিশ বছরে আমি কেমন হয়ে যাব, সেটা ভাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের কিছু কল্পনা করার মতোই ব্যাপার।

পরদিন সকালে এসে ওশিমা দেখিয়ে দিল, লাইব্রেরি খোলার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে আমায় কী করতে হবে। ঘরে বাতাস ঢোকার জন্য ছিটকিনি খুলে জানালাগুলো উন্মুক্ত করে দিতে হবে, ভ্যাকুয়াম ক্লীনারটা চটপট একবার বুলিয়ে নিতে হবে, ডেস্কগুলোর ওপরটা মুছে রাখতে হবে, ফুলদানির ফুলগুলো পাল্টাতে হবে, লাইট জ্বেলে দিয়ে, কখনো কখনো বাগানে গিয়ে একটু জল ছিটিয়ে আসতে হবে যাতে ধুলো না ওড়ে, আর তারপর সময়মত, দরজাটা খুলতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হবে। বন্ধ হওয়ার সময় আবার একই প্রক্রিয়ার উল্টোটা—জানালা বন্ধ করা, ডেস্কগুলো আবার মোছা, আলো নিবিয়ে দেওয়া আর সামনের দরজা বন্ধ করা।

"এখানে চুরি করার মত কিছু কেউ খুব একটা পাবে না, তাই, দরজা বন্ধ করা নিয়ে দুশ্চিন্তার তেমন প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়", ওশিমা আমায় বলে, "কিন্তু সাএকি-সান এবং আমি কাজ যেমন তেমন করে করা পছন্দ করিনা। তাই করণীয়গুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করি। এটা আমাদের বাড়ি, তাই আমরা এটার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করি। আশা করি, তুমিও করবে।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

তারপর দেখাল রিসেপশন ডেস্কে কী করতে হয়, লাইব্রেরি ব্যবহার করতে যারা এসেছে তাদের কীভাবে সাহায্য করতে হয়।

"আপাতত তুমি পাশে বসে দেখতে থাক, আমি কী কী করি। কঠিন কিছুই না। যদি এমন কিছু হয় যা তুমি সামলাতে পারছ না, তাহলে ওপরে গিয়ে সাএকি-সানকে বোলো। উনি দেখবেন।"

এগারোটার একটু আগে সাএকি-সান এলেন। ওঁর ফোকসওয়াগন গল্‌ফ গাড়িটাতে আলাদা করে ধরতে পারার মত একটা গর্জন হয়, এসে হাজির হলেই আমি তক্ষুণি বুঝতে পারি যে উনি এলেন। গাড়ি পার্ক করে, পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে এসে উনি আমাদের দুজনকে অভিবাদন করলেন। "ওহায়ো†", উনি বললেন, আমরাও উত্তরে বললাম, "ওহায়ো গোজাইমাস†"। কথা ওটুকুই হল। সাএকি-সানের পরণে একটা ছোট হাতা নেভি-ব্লু ওয়ানপিস পোশাক, হাতে একটা সুতির কোট, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। গয়না বলে কিছু নেই, কোনও প্রসাধনের বালাই নেই। তবু, কী একটা আছে যাতে অন্যের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। একবার তাকিয়ে দেখলেন আমার দিকে, ওশিমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু বললেন না। আমার দিকে একটা মৃদু হাসি হেসে, দোতলায় ওঁর অফিসে উঠে গেলেন।

"চিন্তা কোরো না", ওশিমা আমায় ভরসা দেয়। "তুমি যে এখানে

†সুপ্রভাত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আছো এতে ওঁর কোনও আপত্তি নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা উনি বলেন না, এই যা।"

এগারোটায় আমি আর ওশিমা দরজা খুললাম, তবে কেউ তেমন এল না কিছুক্ষণ। বিরতির সময় ও দেখিয়ে দিল কী করে কম্পিউটারে বই খুঁজতে হয়। লাইব্রেরির PC, যেমনটা অন্যত্রও দেখেছি। তারপর দেখাল কী করে ক্যাটালগ কার্ড সাজাতে হয়। রোজ লাইব্রেরিতে সদ্য প্রকাশিত সব বই আসে, আর এ ব্যাপারে একটা কাজ হচ্ছে, হাতে করে এই নতুন বইগুলোর লিস্ট তৈরি করে রাখা।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুই মহিলা একসঙ্গে এলেন, একইরকম জীনস পরা। এঁদের মধ্যে একটু খাটো চেহারার যিনি, তাঁর চুল সাঁতারুদের মতো ছোট করে ছাঁটা, আর তুলনার যিনি লম্বা, তাঁর চুল টেনে পেছনে নিয়ে বাঁধা। দুজনেরই পায়ে জগিং শ্যু, একজনেরটা নাইকসের, অন্যজনেরটা অ্যাসিকসের। লম্বা যিনি, তাঁর বয়েস, দেখে মনে হয়, চল্লিশের কোঠায়, চোখে চশমা, পরনে চেকশার্ট, আর যাঁর উচ্চতা কম, তিনি বয়েসে প্রায় বছর দশেকের ছোট, সাদা ব্লাউজ পরে আছেন। দুজনেরই সঙ্গে ছোট রুকস্যাক, আর দুজনেরই মেঘে ছাওয়া আকাশের মত ম্লান মুখ। কথাবার্তা বিশেষ বললেন না। ওশিমা দুজনের থেকে রুকস্যাক নিয়ে ঢোকার মুখে জমা রাখল, খানিক অপ্রসন্ন মুখে ওঁরা হাতছাড়া করার আগে রুকস্যাক থেকে নোটবই, পেন বের করে নিলেন।

ওঁরা লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলেন, তাকগুলো এক এক করে দেখে নিলেন, খুব মন দিয়ে কার্ড ক্যাটালগগুলো উলটে উলটে দেখলেন, মাঝেমাঝে নোট নিচ্ছিলেন। কিছু পড়ছেনও না, বসছেনও না। লাইবেরি যারা ব্যবহার করে তাদের চেয়েও, কোনো কোম্পানির স্টক পরীক্ষা করে দেখা ট্যাক্স আপিসের পরিদর্শকদের সঙ্গে ওদের মিল বেশি। ওশিমা আর আমি কোনও আন্দাজই করতে পারছিলাম না ওঁরা ঠিক কারা, বা ওদের সম্ভাব্য উদ্দেশ্যই বা কী। আমার দিকে অর্থপূর্ণ চাহনিতে চেয়ে ও ঘাড় ঝাঁকাল। বাড়িয়ে বলছি না, আমার খুব একটা ভাল ঠেকছিল না ব্যাপারটা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুপুরে, ওশিমা লাঞ্চ করতে বাগানের দিকটায় যেতে, আমি এসে কাউন্টারে বসলাম ওর জায়গায়।

"মাফ করবেন, আমার একটা প্রশ্ন আছে", ওঁদের একজন এসে বলল। যিনি লম্বা। বলার ধরণটা কঠোর ও রুক্ষ, তাকের পেছন দিকে ফেলে রেখে ভুলে যাওয়া পাঁউরুটির মত।

"হ্যাঁ, বলুন কী ব্যাপার।"

ভ্রূ কুঁচকে এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন একটা কোণাকুণি হেলে যাওয়া ছবির ফ্রেম। "তুমি তো হাইস্কুলের ছাত্র, তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমি এখানে শিক্ষানবিশ", আমি জবাব দিই।

"তোমার ওপরে কেউ আছেন, যাঁর সঙ্গে একটু কথা বলা যায়?"

বাগানে গেলাম ওশিমাকে আনতে। মুখের ভেতরে নেওয়া খাবারটা নরম করে নিতে ও কফিতে একবার চমুক দিয়ে নিয়ে, কোলের ওপর পড়ে থাকা গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে, ভেতরে আসে।

"হ্যাঁ, আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?" ওশিমা অমায়িক ভাবে বলে।

"আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমরা সমীক্ষা করে দেখছি সারা দেশে জনসাধারণের জন্য সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা কী আছে, নারীদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, দেখছি ব্যবহার করার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকগুলো, কতখানি উন্মুক্ত, অন্যান্য আরো কিছু", উনি বলেন। "আমাদের এই গ্রুপটা সারাবছর ধরে খোঁজ নিয়ে দেখে, তারপর সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটা পাবলিক রিপোর্ট প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছে। এই প্রকল্পের সঙ্গে বহু মহিলাই জড়িত, আমরা দুজন এই অঞ্চলের জন্য ভারপ্রাপ্ত।"

"যদি কিছু মনে না করেন", ওশিমা বলে, "আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের নামটা একটু বলবেন?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহিলা চট করে একটা বিজনেস কার্ড বের করে ওর হাতে দেয়।

মুখের অভিব্যক্তিতে কোনও পরিবর্তন না এনে, ওশিমা মন দিয়ে ওটা পড়ে, তারপর কাউন্টারের ওপরে রেখে মুখ তুলে এমন উজ্জ্বল হাসি হেসে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়, যেটাতে লাল রক্তের যে কোনো মহিলার মুখমন্ডল রক্তিম হয়ে যেত।

এই মহিলাটির অবশ্য, আশ্চর্যজনক ভাবে, সেসব কিছুই হল না, ভুরুতে একটা ভাঁজও পড়ল না। "আমরা যা দেখলাম, তাতে দুর্ভাগ্যবশত, এই লাইব্রেরির এমন অনেক দিক আছে, যা সন্তোষজনক নয়।"

"নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলছেন", ওশিমা মন্তব্য করে।

"ঠিকই, নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে", মহিলা উত্তরে বলেন। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নেন। "যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, আমরা এটা আপনাদের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নজরে আনব এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব।"

"জাঁক করে বলার মত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বলে তো কিছু নেই, তবে, আমি সাগ্রহে শুনতে রাজি আপনাদের বক্তব্য।"

"দেখুন, প্রথমত মহিলাদের জন্য পৃথক কোনও টয়লেটের ব্যবস্থা আপনাদের লাইব্রেরিতে নেই। ঠিক কি না?"

"ঠিকই, এই লাইব্রেরিতে মহিলাদের জন্য পৃথক কোনও টয়লেট নেই। একটাই টয়লেট, পুরুষ, মহিলা উভয়ের জন্যই।"

"আপনারা যদিও প্রাইভেট একটি প্রতিষ্ঠান, কিন্তু যেহেতু জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দেন, আপনাদের কি মনে হয় না—নীতিগতভাবে অন্তত—যে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আপনাদের পৃথক ব্যবস্থা করে রাখা উচিত?"

"নীতিগতভাবে?" যেন নিশ্চিত হয়ে নেওয়ার জন্য, ওঁর কথারই পুনরাবৃত্তি করে ওশিমা বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ঠিক তাই। একই ব্যবস্থা উভয়কেই ব্যবহার করতে হলে নানা হ্যারাসমেন্টের সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, উভয়েরই ব্যবহার্য টয়লেট ব্যবহার করতে মহিলাদের অধিকাংশেরই অনীহা আছে। দৃশ্যতই পরিষ্কার যে আপনারা মহিলা ব্যবহারকারীদের নেগলেক্ট করছেন"

"নেগলেক্ট..." ওশিমা বলে, বলেই এমন একটা মুখ করে যেন ভুল করে কোনও তেতো জিনিস গিলে ফেলেছে। মনে হয়, শব্দটা ওর কানে ভাল শোনায়নি।

"ইচ্ছাকৃতভাবে নজর না করা।"

"ইচ্ছাকৃতভাবে নজর না করা", ও সেটাই আবার বলে। তারপর এই বিতিকিচ্ছিরি কথাটা নিয়ে একটু ভাবে।

"এ ব্যাপারে তাহলে আপনার বক্তব্য কী?" মহিলা জিজ্ঞেস করেন, অসন্তোষ কোনোক্রমে চেপে রেখে।

"দেখতেই পাচ্ছেন", ওশিমা বলে, "এটা একটা খুবই ছোট লাইব্রেরি। এবং দুর্ভাগ্যবশত এখানে আমাদের আলাদা টয়লেটের মতো অতটা জায়গাও নেই। স্বাভাবিক যে আলাদা ব্যবস্থা থাকলেই ভাল হত, তবে যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের কেউ কিন্তু কখনও এনিয়ে অভিযোগ করেননি। ভাল বা মন্দ যাই হোক, আমাদের এই লাইব্রেরি খুব বেশি লোক ব্যবহার করেন না। এই আলাদা টয়লেটের ব্যাপারটা নিয়ে যদি আরো এগোতে চান, তাহলে বরং সিয়্যাটলে বোয়িং-এর হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে 747-এ টয়লেটের কথাটা তুলুন। একটা 747 আমাদের লাইব্রেরির চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক বেশি লোকের ভিড় সেখানে। আমি যদ্দূর জানি, সব যাত্রীবাহী বিমানেই টয়লেট নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে।"

ভয়ংকর ভ্রূকুটি করে সেই দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা ওর দিকে তাকায়, চোয়াল ঝুলে গেছে, চশমা অনেকটা এগিয়ে এসেছে নাক বেয়ে। "আমরা এরোপ্লেন নিয়ে কাজ করছি না। 747-এর কথা এখানে ওঠে না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"জেটের ভেতর আর আমাদের লাইব্রেরিতে—নীতিগতভাবে—কি একই রকম সমস্যা তৈরি হবে না?"

"আমরা পাবলিক ফেসিলিটি পরীক্ষা করে দেখছি, এক এক করে। এখানে নীতি নিয়ে তর্ক করতে আসিনি।"

ওশিমার কমনীয় হাসিটি একবারের জন্যেও মিলিয়ে যায়নি এই কথাবার্তার মধ্যে। "ওহ, তাই নাকি, আমি তো নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা নীতি নিয়েই আলোচনা করছি।"

মহিলা বুঝলেন যে ফ্যাসাদে পড়েছেন। মুখটা একটু লাল হল, যদিও সেটা ওশিমার সেক্স অ্যাপীলের জন্য নয়। এবার উনি একটু অন্য পথ ধরলেন।"যতই হোক, জাম্বো জেট এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রঙ্গটা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"আচ্ছা বেশ। এরোপ্লেন আর চলবে না", ওশিমা আশ্বস্ত করে। "মাটিতে নামিয়ে আনি আলোচনাটা।"

মহিলা রোষকষায়িত নয়নে তাকালেন একবার ওর দিকে, তারপর শ্বাস নিয়ে, শুরু করলেন। "আরেকটা ব্যাপারও আমি তুলতে চাই, এখানে লেখকদের কেন পুরুষ আর মহিলায় আলাদা করে ভাগ করা রয়েছে?"

"ঠিকই। আমাদের আগে যাঁর ওপর ভার ছিল, তিনিই ক্যাটালগিং-এর কাজটা করেছেন, আর কোনো কারণে মহিলা আর পুরুষদের পৃথক করেছেন। আমরা আবার নতুন করে করব বলে ভাবছিলাম, তবে এখনো করে উঠতে পারিনি।"

"এটা নিয়ে অবশ্য আমরা কোনও আপত্তি তুলছি না", মহিলা বলেন।

ওশিমা ঘাড় হেলায়।

"কিন্তু, আপত্তিটা এখানেই যে সব বিভাগেই পুরুষদের নামগুলো মহিলাদের নামের আগে রয়েছে", উনি বলেন। "আমরা মনে করি, এতে লিঙ্গসাম্যের নীতি মানা হচ্ছে না, এবং সেটা খুবই অন্যায়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওশিমা ভদ্রমহিলার বিজনেস কার্ডটা আবার হাতে তুলে নেয়, আবার চোখ বুলিয়ে নেয় ওটার ওপর, তারপর কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখে। "সোগা-সান", ও বলতে শুরু করে। "স্কুলে নাম ডাকার সময় আপনার নাম তানাকা-সানের নামের আগে আসত, আর সেকিনে-সানের নামের পরে। আপনি কি কোনও অভিযোগ দায়ের করেছিলেন? আপত্তি করে, উলটো দিক থেকে ডাকতে অনুরোধ করেছিলেন? G কি রেগে যায় ইংরিজি বর্ণমালায় F-এর পরে আসতে হয় বলে? বইয়ের ৬৮ নম্বর পাতা কি আন্দোলন শুরু করে ৬৭-র পরে আসতে হল বলে?"

"সেটা কথা নয়", মহিলা রেগে গিয়ে বলেন। "আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছেন।"

শুনতে পেয়ে, তুলনায় খর্বাকৃতি মহিলা, যিনি এতক্ষণ একটা বইয়ের তাকের সামনে দাঁড়িয়ে নোট নিচ্ছিলেন, দৌড়ে এলেন।

"ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছেন", ওশিমা ফের বলে, যেন মহিলার কথাটাকে আন্ডারলাইন করছে।

"আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন?"

"একে বলে, রেড হেরিং", ওশিমা জবাব দেয়।

সোগা নামের মহিলা মুখটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, কোনও কথা বলতে পারছেন না।

"ইংরিজিতে একটা কথা আছে 'রেড হেরিং'। কিছু একটা, যা মনোযোগ আকর্ষণ করে, কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আমার যদিও জানা হয়নি কেন এই কথাটা বলা হয়।"

"হেরিংই হোক, ম্যাকারেলই হোক, বা অন্য কিছু, আপনি ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন।"

"আসলে কিন্তু আমি যেটা করছি সেটা হল, নতুন নতুন তুলনা টানছি", ওশিমা বলে। "অ্যারিস্টটলের মতে, এটাই কোনও বিতর্কে সবচেয়ে কার্যকরি পদ্ধতিগুলোর একটা। প্রাচীন এথেন্সের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাগরিকরা এই ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল খুব উপভোগ করত। যদিও, দুঃখের বিষয়, সেই সময়ে মেয়েদের ঠিক 'নাগরিক'-এর সংজ্ঞার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হত না।"

"আপনি কি আমাদের উপহাস করার চেষ্টা করছেন?"

ওশিমা মাথা ঝাঁকায়। "দেখুন, আমি যেটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হল, একটা মফস্বল শহরের ছোট্ট একটা লাইব্রেরিতে গিয়ে তদন্ত করা এবং সেখানকার টয়লেট আর কার্ড ক্যাটালগ নিয়ে অভিযোগ করার চেয়ে জাপানের মেয়েদের অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করার যে আরো অনেক কার্যকরি উপায় আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে আমাদের এই সামান্য লাইব্রেরিটিকে জনসাধারণের কাজে লাগার মত করে তুলতে পারি। যাঁরা বই ভালবাসেন তাঁদের জন্য আমরা জড়ো করেছি এক অসামান্য পুস্তক-সংগ্রহ। এবং জনসাধারণের সঙ্গে আমরা সাধ্যমত একটা মানবিক আচরণ বজায় রাখার চেষ্টা করি। হয়তো জানেন না, এই লাইব্রেরিতে ১৯১০ থেকে শোবা আমলের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাবতীয় কবিতা সম্পর্কিত বইপত্রের এমন এক সংগ্রহ আছে যা জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই, এমন অনেক কিছুই আছে যার আরো উন্নতিসাধন করা যায়, আবার আমরা কতটা করে উঠতে পারি তারও একটা সীমা আছে। তবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমরা আমাদের পক্ষে যদ্দূর করা যায়, সবটাই করছি। আমার মনে হয়, আমরা কী পারিনি না দেখে যদি মনোসংযোগ করা যায় আমরা যেটা ভালো পারছি সেটাতে, তবেই অধিকতর শ্রেয়। আপনাদেরও কি সেটাই ন্যায্য বলে মনে হয় না?"

লম্বা মহিলা তুলনায় খর্বাকৃতির দিকে তাকান, তিনিও আবার ফিরে মুখ তুলে ওঁর মুখের দিকে তাকান, এবং এই প্রথম মুখ খোলেন, "আপনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, অন্তঃসারশূন্য গালভরা কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন", সত্যিকারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উনি বলেন। "প্রকৃতপক্ষে, সহজ করে বলতে হলে বলতে হয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সহজ উপায় বেছে নিয়েছেন। ভদ্রভাবে বলতে গেলে, আপনি লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতার একটি শোচনীয়, ঐতিহাসিক নমুনা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"একটি শোচনীয়, ঐতিহাসিক নমুনা", ওশিমা কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, দৃশ্যতই মুগ্ধ। ওর উচ্চারণের ধরণে মনেই হল যে কথাটা ওর মনে ধরেছে।

"বা বলা যায়, আপনি একজন টিপিকাল, সেক্সিস্ট, পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ", লম্বা এবার তেতে ওঠেন, উষ্মা সংবরণ করতে না পেরে।

"একজন পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ", ওশিমা আরেকবার পুনরাবৃত্তি করে।

খর্বাকৃতি এতে কান না দিয়ে বলে চলেন। আপনি স্থিতাবস্থা ও পুরুষাঙ্গ-কেন্দ্রিক যুক্তি অবলম্বন করে পুরো ফিমেল-জেন্ডারটাকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বে নামিয়ে আনতে চাইছেন। তাদের প্রাপ্য অধিকারকে খর্ব করে তাদের বঞ্চিত করতে চাইছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও, অজানিতেই এটা করছেন, কিন্তু তাতে আপনার অপরাধ বাড়ে বই কমে না। আপনারা পুরুষদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করে চলেন আর এমন হয় যে অন্যদের কষ্ট আপনাদের ছুঁতেই পারে না, একবার চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করেন না, আপনাদের এই অন্ধত্বের ফলে মেয়েদের এবং সমাজের কতখানি অশুভ পরিণতি হয়। আমি বুঝতেই পারছি যে টয়লেট আর কার্ড ক্যাটালগ, এইগুলো নেহাতই খুঁটিনাটি, কিন্তু এই ছোট ছোট জিনিসগুলো দিয়ে শুরু না করলে, সমাজকে ঢেকে রেখেছে যে অন্ধত্বের আবরণ সেটাকে কখনোই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না। আমাদের কাজের নীতিই তাই।"

"সুস্থ মানসিকতার প্রত্যেকটি নারীই এটাই মনে করে", লম্বাজন জুড়ে দেন, মুখ ভাবলেশহীন।

"আমাকে যে যাতনার মুখোমুখি হতে হয়, তাতে অন্য কীভাবে আর একজন উদারমনা নারী নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে", ওশিমা বলে।

মহিলা দুজন হিমশৈলের নৈঃশব্দ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

"সোফোক্লেসের ইলেকট্রা। দারুণ একটা নাটক। একটা কথা বলে রাখি, জেন্ডার কথাটা কিন্তু মূলত ব্যবহার হয়েছিল ব্যাকরণের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেন্ডার বোঝাতে। শারীরিকভাবে লিঙ্গবৈষম্য বোঝাতে 'সেক্স' কথাটার ব্যবহারই বোধকরি আরও সঠিক। জেন্ডার কথাটার ব্যবহার এখানে সঠিক নয়। একটা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ জুড়ে দিই যদি এর সঙ্গে।"

জমাট নৈঃশব্দ্য।

"সবদিক থেকেই, আপনারা যেটা বলছেন সেটা ভিত্তিগতভাবেই বেঠিক", শান্তভাবে অথচ স্পষ্ট করে ওশিমা বলে। "আমি অবশ্যই একজন পিতৃতান্ত্রিক পুরুষের শোচনীয়, ঐতিহাসিক নমুনা নই।"

"তাহলে ব্যাখ্যা করুন, সোজা কথায়, আমরা যা বলেছি, তাতে ভুলটা কী?" খর্বকায়া অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠেন।

"প্রসঙ্গটাকে পাশ কাটিয়ে অথবা আপনি যে কতখানি পন্ডিত সেটা প্রদর্শন না করে", দীর্ঘাঙ্গিনী যোগ করেন।

"বেশ। সেটুকুই করি তাহলে—সহজ করে এবং সৎভাবে ব্যাখ্যা, কোনোরকম ভাবে পাশ না কাটিয়ে কিংবা মেধা প্রদর্শন না করে", ওশিমা বলে।

"অপেক্ষায় আছি", দীর্ঘাঙ্গিনী বলেন, আর খাটোজন তৎক্ষণাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে এতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

"প্রথম কথা, আমি পুরুষ নই", ওশিমা ঘোষণা করে।

প্রত্যেকে স্তব্ধ, একটা নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে থাকে। আমি ঢোঁক গিলে একঝলক ওশিমার দিকে তাকাই।

"আমি একজন নারী", ও বলে।

"অর্থহীন রসিকতা করবেন না", একটু থেমে শ্বাস নিয়ে খর্বকায়া বলেন। কারুর কিছু একটা না বললেই নয়, তাই বলা। খুব একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ ছিল না তাতে।

চিনোসের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে ওশিমা তার ভেতর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নেয় এবং মহিলার হাতে দেয়। কী লেখা আছে পড়ে ভুরুটা কুঁচকে উনি ওটা দীর্ঘকায়ার হাতে দেন। তিনিও পড়ে কয়েকমুহূর্ত ইতস্তত করে ওশিমাকে ওটা ফেরত দিয়ে দেন, মুখে একটা বিতৃষ্ণ ভাব।

"তুমিও দেখতে চাও?" এবার আমাকে জিজ্ঞেস করে ওশিমা। আমি মাথা ঝাঁকানোয় ও ফের ওয়ালেটের মধ্যে লাইসেন্সটা চালান করে দিয়ে ওয়ালেটটা প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়। এরপর কাউন্টারের ওপর দু'হাত রেখে বলে, "দেখতেই পাচ্ছেন, আইনত এবং বায়োলজিকালিও আমি একজন মহিলা। সেইজন্যই বলেছি যে আপনারা আমার সম্বন্ধে যা বলছিলেন তা ভিত্তিগতভাবেই বেঠিক। আপনারা যে বলছেন, 'টিপিকাল সেক্সিস্ট, পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ', সেটা হওয়া নেহাতই অসম্ভব আমার পক্ষে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু...", দীর্ঘকায়া বলতে শুরু করে থেমে যান। খর্বকায়া, ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক, ডানহাতের আঙুল দিয়ে ব্লাউজের কলারটা টানটান করতে থাকেন।

"আমার শরীর গঠনের দিক থেকে নারীর, কিন্তু আমার মানসিকতা পুরোপুরি পুরুষের", ওশিমা বলে চলে। "আবেগের দিক থেকে আমার জীবন পুরুষের। তাই, আপনাদের ধারণা অনুযায়ী 'ঐতিহাসিক নমুনা' কথাটা হয়তো ঠিক। আর কে বলতে পারে আমি অতি জঘন্য সেক্সিস্ট কি না। আমি কিন্তু লেসবিয়ান নই, যদিও পোশাক পরেছি এরকম। যৌনতায় আমার বেশি পছন্দ পুরুষদেরই। বলা উচিত, আমি নারী, কিন্তু সমকামি নই। আমি পায়ুকামি এবং যৌন আচরণে কখনো আমার যোনি ব্যবহার করিনি। আমার ক্লাইটোরিস সংবেদনশীল, কিন্তু আমার স্তন তা নয়। আমার মাসিক ঋতুস্রাবও হয় না। অতএব যৌনবৈষম্যের ঠিক কী ধরণের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে? আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন কেউ?"

যে তিনজন আমরা শুনছিলাম, একেবারে বিপর্যস্ত এবং কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। মহিলাদের একজন গলা খাকরে নিলেন আর তার বিকট আওয়াজ ঘরে অনুরণিত হতে থাকল। দেওয়ালের ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে জোরালো আওয়াজ করে যাচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"বলতে খারাপ লাগছে, আমি না লাঞ্চ করছিলাম", ওশিমা হেসে বলে। "টুনার স্পিন্যাচ র‍্যাপ খাচ্ছিলাম। অর্দ্ধেক খেতে না খেতে ডাক পড়ায় চলে এসেছি। বেশিক্ষণ ফেলে রাখলে এই অঞ্চলের বেড়ালগুলো এসে খেয়ে ফেলবে হয়তো। এখানে এত বেড়াল না। সমুদ্রের ধারে পাইনের বনে বেড়ালের বাচ্চা ফেলে দিয়ে যায় বহু লোক। আপনাদের আপত্তি না থাকলে, আমি ফিরে গিয়ে লাঞ্চটা সেরে নিতে পারি। অভদ্রতা হচ্ছে ঠিকই, তবে, আপনারা প্লীজ ধীরেসুস্থে স্বস্তিমত কাটান। এই লাইব্রেরি সব নাগরিকের জন্যই উন্মুক্ত। লাইব্রেরির নিয়ম মেনে, অন্য পাঠকদের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেভাবে আপনার সুবিধে মত ব্যবহার করুন। যা খুশি যেমন খুশি দেখুন। আপনাদের রিপোর্টে যেকোনো কিছুই লিখতে পারেন। যা-ই লিখুন, আমরা কিছু মনে করব না। আমরা আজ অবধি কারো কোনো সাহায্য ছাড়াই, নির্দেশ ছাড়াই, নিজেদের চিন্তা ভাবনা অনুসারে কাজ এগিয়ে নিয়ে এসেছি, এর পরেও সেটাই করে যেতে চাই।"

ওশিমা চলে যেতে, মহিলারা দু'জন নীরবে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, তারপর দুজনেই আমার মুখের দিকে চাইল। আমাকেই ওশিমার প্রেমিক ভাবছিল হয়তো। আমি কিছু না বলে ক্যাটালগ কার্ড গোছাতে লাগলাম। দুজনে বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে নিচু গলায় কিছু বলাবলি করছিল, করতে করতেই নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। দুজনেরই মুখ অত্যন্ত আড়ষ্ট। এমনকি আমি যখন ওদের ব্যাগগুলো এগিয়ে দিলাম, তখনও কৃতজ্ঞতাসূচক কিছু বলল না।

একটু পরে লাঞ্চ সেরে ওশিমা ফিরে এল ভেতরে। সবুজ টর্টিলার মধ্যে টুনা আর সবজি দিয়ে তৈরি, সাদা ক্রীম-সস দেওয়া দুটো স্পিন্যাচ i'াপ আমায় ধরিয়ে দিল। এগুলো দিয়ে লাঞ্চ করলাম। জল ফুটিয়ে টি-ব্যাগের আর্ল-গ্রে চা খেলাম তারপর।

"একটু আগে যা বললাম, সব কিন্তু সত্যি", আমি লাঞ্চ সেরে ফিরতেই ওশিমা আমায় বলল।

"এর আগে যে বলেছিলেন, আপনি একজন বিশেষ ধরণের মানুষ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

www.amarboi.com ~

সেটা তাহলে এই অর্থে", আমি বললাম।

"গর্ব করার জন্য বলছি না, আমি যে কক্ষণো কিছু বাড়িয়ে বলিনি, সেটা বুঝতে পারলে তো এবার?"

আমি নীরবে মাথা নাড়ি।

ওশিমা হাসে। "লিঙ্গভেদ করলে আমি অবশ্যই নারী। কিন্তু স্তন তেমন বড় হয়নি, ঋতুস্রাব হয়নি একবারও। আমার পুরুষাঙ্গও নেই, অন্ডকোষও নেই, গোঁফ-দাড়িও বেরোয়নি। কিছুই নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। সেটা যে কেমন লাগে, তা বোধহয় তুমি বুঝে উঠতে পারবে না।"

"হয়তো", আমি বলি।

"কখনো কখনো আমিও বুঝে উঠতে পারি না। আমি আদৌ কী তবে। আদপে কী?"

আমি ঘাড় ঝাঁকাই, "দেখুন ওশিমা-সান, সেকথা বললে, এমনকি আমি নিজেও যে কী ঠিক জানি না।"

"আইডেনটিটির সুপ্রাচীন ক্রাইসিস।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"কিন্তু তুমি তো অন্তত কোথাও থেকে একটা শুরু করতে পারো। আমার তা-ও নেই।"

"ওশিমা-সান যাই হোন না কেন, আমি ওশিমা-সানকে পছন্দ করি", আমি বলি। কারো সামনে এরকম কিছু মুখে বলে ওঠা, জন্মাবধি এই প্রথম। আমার মুখটা লাল হয়ে গেল।

"ধন্যবাদ", ওশিমা বলে। তারপর হালকা করে আমার কাঁধে হাত রাখে। "আমি সত্যিই অন্য সবার চেয়ে একটু আলাদা। কিন্তু মূলতঃ একইরকম মানুষ। তুমি যেন সেটুকু বুঝতে পারো। আমি ভুতুড়ে কিছু নই একেবারেই। সাধারণ মানুষ। অন্য সকলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মতোই অনুভূতি আছে, একইভাবে সব করি। কিন্তু ওই একটুখানি প্রভেদ, সময় সময় অতল খাদের মত বলে মনে হয়। ভেবে দেখলে, অবশ্যই এব্যাপারে কিছু করারও নেই", কাউন্টার থেকে একটা লম্বা তীক্ষ্ণ পেনসিল তুলে নিয়ে তাকিয়ে থাকে, দেখায় যেন ওটা শরীরেরই একটা দীর্ঘায়িত অংশ।

"এই ব্যাপারটা তোমার কাছে যত শীঘ্র সম্ভব সুযোগ পেলেই পরিষ্কার করে রাখব বলে ভেবে রেখেছিলাম। অন্য কারুর থেকে শোনার চেয়ে, সরাসরি আমিই নিজের মুখে বলে রাখতে চেয়েছিলাম। ফলে আজ এটা একটা ভাল সুযোগ করে দিল বলেই বলতে হবে। তবে খুব প্রীতিকর বলে বলতে পারছি না।"

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই।

"আমি এরকম বলে, আজ পর্যন্ত নানা জায়গায়, নানা ধরণের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে", ওশিমা বলে। বৈষম্যের শিকার হওয়া জিনিসটা যে কী, কতটা গভীর ভাবে লোককে আহত করে, সে বৈষম্যের শিকার হওয়া মানুষ ছাড়া বুঝবে না। যন্ত্রণা জিনিসটা একার ব্যাপার, তার পরেও ব্যক্তিগত একটা ক্ষতস্থানও থেকে যায়। ফলে সমদর্শিতা, ন্যায় বিচার চাওয়ার দিক থেকে, আমি কারুর চেয়ে কম যাই না। কেবল, আরো হতাশ করে সেইসব লোকেরা যাদের সেই কল্পনাশক্তিটা নেই। যাদের টি এস এলিয়ট বলেছেন, 'ফাঁপা লোকেরা'। সেই কল্পনাশক্তিহীন ফাঁপা জায়গাটা যখন লোক খড় দিয়ে ভরাট করে, জানেও না কী করছে, কেবল বাইরে দেখনদারি। তারপর সেই নির্বোধেরা যখন অর্থহীন কথা সাজিয়ে লোকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এককথায়, একটু আগের এই দুই মহিলা যেমন করে গেল।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও হাতের মধ্যে পেনসিলটা ঘোরাতে থাকে। "গে হোক, লেসবিয়ান হোক, স্ট্রেট হোক, ফেমিনিস্ট হোক, ফ্যাসিস্ট পিগ হোক, কম্যুনিস্ট হোক, হরেকৃষ্ণ হোক, আলাদা করে যেমনই হোক, যেই ব্যানার নিয়েই ঘুরুক না কেন, আমার কিছু আসে যায় না। সহ্য করতে পারিনা এই ফাঁপা মানুষগুলোকে। এরা সামনে এসে পড়লে আর সহ্য হয় না। সামলাতে না পেরে ইচ্ছার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিরুদ্ধেও অনেক কিছু বলে বসি। এই দুই মহিলার বেলায়ও—আমার উচিত ছিল গায়ে না মাখা, কিংবা সাএকি-সানকে ডেকে আনা। উনি হাসিমুখে ওদের সামলে নিতেন। কিন্তু আমি পারি না সেটা। এমন কিছু বলি, যা না বললেই হত, এমন কিছু করি, না করলেই হত। নিজেকে সামলাতে পারিনা। এটা আমার একটা দুর্বল দিক। কেন জান?"

"কারণ কল্পনাশক্তি নেই এরকম প্রত্যেককে সিরিয়াসলি নিতে গেলে তো শেষ করে ওঠা যাবে না", আমি বলি।

"ঠিক বলেছ", ওশিমা বলে। পেনসিলটার রাবারের প্রান্তটা দিয়ে কপালে ঠুকতে থাকে। "তবে, একটা জিনিস মনে রাখবে কাফকা, এরাই হচ্ছে সেই লোকেরা যারা সাএকি-সানের ছোটবেলার প্রেমিককে খুন করেছিল। কল্পনাশক্তিহীন সংকীর্ণমনা সব লোক। অসহিষ্ণুতা, বাস্তবতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন সব তত্ত্ব, অন্তঃসারশূন্য সব পরিভাষা, ধার করা আদর্শ, অনড় ব্যবস্থা। এই জিনিসগুলোকেই আমি ভয় পাই। ভয়ও পাই, ঘৃণাও করি। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, তা অবশ্যই জানতে হবে। একক মানুষের বিচারে ভুল বেরুলে সেটা শোধরানো যায়। ভুল স্বীকার করতে যতক্ষণ কেউ প্রস্তুত, পরিস্থিতি ফেরানোই যায়। কিন্তু অসহিষ্ণু, কল্পনাশক্তিহীন সংকীর্ণ মন হচ্ছে পরজীবীর মত যারা আশ্রয়টাকেই পালটে দেয়, নিজেরা পালটে যায় আর সেই ভাবে বাড়তে থাকে। এদের ওপর নির্ভর করা যায় না, আমি চাইও না ওরকম কেউ এখানে আসুক।"

পেনসিলের ডগা দিয়ে বইয়ের তাকগুলোর দিকে দেখায়। পুরো লাইব্রেরিটার কথাই বলতে চায় অবশ্য।

"এদেরকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু পারি না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২০

বড় রেফ্রিজারেটার ট্রাকের ড্রাইভার যখন নাকাতাকে তোওমেই হাইওয়ের ফুজিগাওয়া সার্ভিস এরিয়ার গাড়ি দাঁড় করানোর জায়গায় নামিয়ে দিল, ততক্ষণে রাত আটটা বেজে গেছে। নাকাতা তার ক্যানভাসের ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে হেল্পারের উঁচু সীট থেকে নেমে এল।

"এখানে পরের গাড়িটা খুঁজে নিলে ভাল হয়", ড্রাইভার জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল। "ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করলে একটা না একটা পেয়েই যাবেন।"

"ধন্যবাদ। নাকাতার খুব উপকার হল।"

"সাবধানে যাবেন", ড্রাইভার বলল। তারপর হাত নেড়ে চলে গেল।

ফু-জি-গা-ও-য়া, ড্রাইভার বলেছে। ফু-জি-গা-ও-য়া যে কোথায় নাকাতার একেবারেই জানা নেই। তবে ও নিজে টোকিও থেকে বেরিয়ে, একটু একটু করে যে পশ্চিম দিকে চলে আসছে সেটুকু বুঝতে পারছিল। কম্পাসও নেই, ম্যাপও দেখতে জানে না, তবু এটুকু কীকরে যেন বুঝতে পারছিল। এখান থেকে আবার পশ্চিমে যাওয়ার পরের গাড়িটাতে চড়তে পেলে ভাল হয়।

খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তাই নাকাতা রেস্তোরাঁতে রামেন খেয়ে নেবে বলে ঠিক করল। ব্যাগের ভেতরে ওনিগিরি আর চকোলেটে এখন হাত না দিয়ে, তেমন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুতি হিসেবে রেখে দেওয়াই শ্রেয় বলে তার মনে হয়েছিল। পড়তে পারে না বলে, সিস্‌টেমটা বুঝে উঠতে সময় লাগল। রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগে খাবারের কুপন কিনতে হবে। কুপন স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিনে বিক্রি হচ্ছে বলে, পড়তে না পারা নাকাতার অন্য কারুর একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

www.amarboi.com ~

সাহায্য দরকার। "চোখে ভাল দেখিনা তো, তাই", বলায়, এক মাঝবয়েসী মহিলা ওর হয়ে পয়সা ফেলে, বোতাম টিপে, বাকি পয়সাটা ওর হাতে দিল। লোক বুঝে, পড়তে যে পারে না সেটা যথাসাধ্য গোপন রাখাই যে ভাল, সেটা নাকাতা অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে। কারণ, একেক সময়, যেন ভুত দেখছে এইভাবে ওর দিকে তাকিয়েছে লোকে।

এরপর নাকাতা ক্যানভাসের ব্যাগ কাঁধে ফেলে, ছাতা হাতে, আশেপাশের ড্রাইভার গোছের লোকেদের বলে বলে দেখল। আমি একটু পশ্চিমমুখো যাব, কারুর গাড়িতে কি একটু চড়তে পাব, জিজ্ঞেস করে করে ঘুরলো। ওরা নাকাতার মুখ দেখে, চেহারা দেখে, তারপর মাথা নাড়ে। বুড়োমানুষ হিচ্‌হাইক করছে, এ তো সাধারণত হয়না, অস্বাভাবিক কিছুকে ওরা কী মনে করে এড়িয়ে চলে। কোম্পানি থেকে মানা করা আছে, হিচ্‌হাইকের লোক তুলবে না, বলে জানিয়ে দেয়। বিচ্ছিরি ব্যাপার!

মোটামুটি নাকানো-কু থেকে টোকিও হাইওয়েতে ওঠা অবধি অনেকটা সময় লেগে গেল। নাকাতার মোটেই খুব একটা নাকানো-কু'র বাইরে যাওয়া হয়নি, টোকিও হাইওয়ের প্রবেশপথটা কোথায় সেটাই জানা নেই। স্পেশাল পাস চলে এমন সিটিবাস দরকার মতো ব্যবহার করেছে, কিন্তু মেট্রো রেলে কিংবা ট্রেনে, যেখানে টিকিট লাগে, তাতে একা একা চড়া হয়নি।

পাল্টানোর মত পোশাক, টয়লেট্রি আর মামুলি কিছু খাবার দাবার ব্যাগে ভরে, মাদুরের নিচে লুকিয়ে রাখা টাকাপয়সা বেল্টের মধ্যে সাবধানে ভরে নিয়ে, মস্ত ছাতা হাতে, সকাল ১০টার আগেই অ্যাপার্টমেন্টের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সিটিবাসের ড্রাইভারকে, "তো-ও-মে-ই হাইওয়েতে কীভাবে যাওয়া যায়," জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু সে তাতে কেবল হাসল।

"এই বাস শুধু শিনজুকু স্টেশন অবধি যাবে। সিটিবাস হাইওয়েতে চলে না যে। হাইস্পীড বাসে চেপে যেতে হয় হাইওয়েতে।"

"তো-ও-মে-ই হাইওয়েতে চলে এরকম হাইস্পীড বাস কোত্থেকে ছা[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"টোকিও স্টেশন" ড্রাইভার বলে দেয়। "এই বাসে শিনজুকু পর্যন্ত গিয়ে, শিনজুকু স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে টোকিও স্টেশনে গিয়ে, সেখানে গিয়ে সীট রিজার্ভেশন টিকিট কেটে বাসে উঠবেন। তাহলে তোওমেই হাইওয়েতে যেতে পারবেন।"

ভাল বুঝতে না পারলেও, তখনকার মত নাকাতা সেই বাসে চেপে শিনজুকু স্টেশন অবধি গেল। কিন্তু সে তো এক বিশাল এলাকা। বহুলোক যাওয়া আসা করছে, ভালো করে রাস্তায় হাঁটাই যায় না। নানারকমের ট্রেন চলছে, কোথায় গেলে টোকিও যাওয়ার ট্রেনে চাপা যাবে, আন্দাজই করা যাচ্ছে না। আর পথনির্দেশের বোর্ড তো পড়তেই পারে না। কয়েকজনকে ডিরেকশন জিজ্ঞেস করে দেখল, কিন্তু তাদের কথা এত দ্রুত যে খুবই জটিল, কখনো শোনেনি এমন সব নামে ভর্তি, নাকাতার পক্ষে মনে রাখা দুষ্কর। এ তো বেড়াল কাওয়ামুরার সঙ্গে কথা বলার মতই ব্যাপার, নাকাতা মনে মনে ভাবল। পুলিশদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হওয়া বুড়ো ভেবে, তাদের হোমে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে পারে (এ পর্যন্ত একবারই মাত্র সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে)। স্টেশনের কাছে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে, বাতাস এতই খারাপ আর এতই কোলাহল যে ক্রমেই মেজাজ খারাপ হয়ে আসছিল। যেদিকে লোক চলাচল তবু খানিকটা কম সেদিকে গিয়ে দুটো উঁচু উঁচু বাড়ির মধ্যে ছোট্ট একটা পার্কের মত জায়গা দেখতে পেয়ে, সেখানে বেঞ্চের ওপর বসল।

সেখানে অনেকক্ষণ নাকাতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইল। মাঝেমাঝে নিজের মনে বিড়বিড় করে, ছোট করে ছাঁটা মাথায় হাতের তালু বুলিয়ে নিচ্ছিল। পার্কে একটাও বেড়াল নেই। কাকেরা এসে ডাস্টবিন ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। নাকাতা ক'বার ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে, সূর্যের অবস্থান থেকে মোটামুটি সময় আন্দাজ করল। আকাশ গাড়ির ধোঁয়ায় বিচিত্র রঙ ধারণ করে রয়েছে।

দুপুর হতেই কাছের বাড়িগুলোয় কাজ করে এমন লোকজনেরা বেরিয়ে পার্কে এসে লাঞ্চ সারল। নাকাতাও সঙ্গে নিয়ে আসা বীন-জ্যামের বান-রুটি খেয়ে, ফ্লাস্ক থেকে হোজি চা খেল। পাশের বেঞ্চে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একজোড়া অল্পবয়েসী মহিলা বসে আছে দেখে, নাকাতা ওদের উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে তো-ও-মে-ই হাইওয়েতে যাওয়া যায়। সেই দুজনও সিটিবাসের ড্রাইভার যা বলেছিল সেই একই কথা জানাল। চু-ও লাইন ধরে টোকিও স্টেশনে গিয়ে, সেখান থেকে তোওমেই হাইওয়ের বাসে চাপলেই হবে।

"সেরকমই চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু ঠিকমত পারলাম না," নাকাতা অকপটে বলে। "নাকাতা এর আগে নাকানো-কু'র বাইরে কখনও আসে নি তো। তাই ট্রেনেও ঠিকমত চড়তে পারে না। সিটিবাস ছাড়া চড়তে পারে না। পড়তে পারে না বলে টিকিটও কিনতে পারে না। সিটিবাসে এই অবধি এসেছে, কিন্তু আর এগোতে পারছে না।"

সেই দুজন একথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। পড়তে পারে না? কিন্তু দেখে তো প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে না। হাসিহাসি মুখ, চেহারাও ছিমছাম। এরকম সুন্দর আবহাওয়ার একটা দিনে মস্ত একটা ছাতা হাতে দেখলে সামান্য খটকা লাগে বটে, কিন্তু দেখে হোমলেস বলে মনে হয়না। দেখতেও খারাপ না, সবচেয়ে বড় হল, চাহনিটা পরিষ্কার।

"সত্যিই কখনও নাকানো-কু'র বাইরে আসেননি? কালো চুল মেয়েটি বলল।

"হ্যাঁ। কখনও বাইরে আসিনি। নাকাতা হারিয়ে গেলেও কেউ খুঁজে দেবে না কিনা।"

"পড়তেও পারেন না", যে মেয়েটার চুল চায়ের রঙে ছোপানো, সে বলল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারেই পড়তে পারি না। সংখ্যা অবশ্য খুব সাধারণ হলে মোটামুটি বুঝি, কিন্তু হিসেব করতে পারিনা।"

"তাহলে তো ট্রেনে চড়াও মুশকিল!"

"আজ্ঞে, খুবই মুশকিল, কারণ টিকিট কাটতে পারিনা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সময় থাকলে স্টেশন অবধি নিয়ে গিয়ে, ঠিক ট্রেনে উঠিয়ে দিতাম, কিন্তু একটু পরেই আমাদের অফিসে ফিরে যেতে হবে। স্টেশন অবধি যাওয়ার সময় নেই। মাফ করবেন।"

"না না, ওকথা বলবেন না। নাকাতা নিজেই কোনো ভাবে করে উঠবে।"

"আচ্ছা", কালো চুলের মেয়েটি বলল। "সেলসের তোগেগুচি, আজ এখন ইয়োকোহামা যাবে বলে বলছিল না?"

"হুঁ, বলছিল বটে। ওকে বলা যায় বলে মনে হয়। একটু মনমরা ধরণের, কিন্তু লোক খারাপ না", চায়ের মত বাদামি রঙের চুলের মেয়েটা বলল।

"বুঝলেন, কাকু, যদি হিচ্‌হাইকেই যেতে চান", কালো চুলের মেয়েটা বলে।

"হিচ্‌হাইক?"

"ওখানকার গাড়িকে অনুরোধ করে চড়তে পাওয়া। মোটামুটি লং-ডিস্ট্যান্সের ট্রাক অবশ্য। সাধারণ গাড়ি খুব একটা চড়তে দেয় না বলে।"

"লং-ডিসট্যান্সের ট্রাক বা সাধারণ গাড়ি, এসব কঠিন জিনিস নাকাতা ভাল জানে না।"

"যেতে চাইলে কিছু একটা হয়েই যাবে। আমিও অনেক আগে, ছাত্রাবস্থায় একবার গিয়েছিলাম। ট্রাক ড্রাইভাররা লোক ভাল হয়"

"কিন্তু কাকু, তোওমেই হাইওয়ে ধরে কদ্দূর যাবেন?" বাদামি চুলের মেয়ে জানতে চায়।

"জানা নেই।"

"জানা নেই?"

"জানা নেই। কিন্তু সেখানে গেলে বুঝতে পারব। এখনকার মত,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তো-ও-মে-ই হাইওয়ে ধরে পশ্চিম দিকে। তারপর, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। যেভাবেই হোক, নাকাতাকে পশ্চিম দিকে যেতেই হবে।"

মেয়ে দুটি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, কিন্তু নাকাতার বলার ধরণে একধরণের বিশেষ আবেদন ছিল। আর দুজনেরই নাকাতার প্রতি একটা প্রশ্রয়ের মনোভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ওরা লাঞ্চ সেরে, ফাঁকা বাক্স ডাস্টবিনে ফেলে, বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"আসুন কাকু, আমাদের সঙ্গে আসুন, কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেব", কালো চুলের মেয়েটা বলল।

নাকাতা ওদের পেছন পেছন কাছেই একটা বড় বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। অতবড় বাড়িতে ঢোকা, নাকাতার এই প্রথম। ওরা দুজন নাকাতাকে রিসেপশনের বেঞ্চিতে বসিয়ে, রিসেপশনের মহিলাটিকে দুয়েকটা কথা বলে নিয়ে, "কাকু এখানে একটু অপেক্ষা করুন, হ্যাঁ", বলে বলল। তারপর সার সার কয়েকটা লিফটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাতা পাকড়ে ধরে ব্যাগ নিয়ে বসে থাকা নাকাতার সামনে দিয়ে, লাঞ্চ-ব্রেকের পরে ফিরে আসা কর্মীরা একের পর এক চলে যাচ্ছিল। এই দৃশ্যও নাকাতার এযাবৎ দেখা ছিল না। সমস্ত লোকই যেন নিজেদের মধ্যে কী এক বোঝাপড়া করে নিয়ে খুব ফিটফাট পোশাক পরে এসেছে। টাই বেঁধে, হাই হিল চকচকে জুতো পরে। আর সকলেই দ্রুত পায়ে একই দিকে হেঁটে যাচ্ছে। এভাবে এত লোকজন এখানে জড়ো হয়ে সবাই মিলে কী করছে, নাকাতা কোনো আন্দাজই করতে পারে না।

তারপর একসময় দুজনে, সাদা শার্টের ওপর স্ট্রাইপড টাই বাঁধা ছিপছিপে চেহারার দীর্ঘদেহী একটি লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এল। আর নাকাতার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

"এই ইনি, তোগেগুচি নাম, এখুনি ইয়োকোহামা অবধি গাড়িতে যাবেন। আর নাকাতা-সানকে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন। তোওমেই হাইওয়ের কোওহোকু পার্কিং-এরিয়া বলে জায়গাটায় কাকুকে নামিয়ে দেবেন। সেখান থেকে আবার অন্য গাড়ি খুঁজে নিলেই হবে। কোনোভাবে পশ্চিমের দিকে যেতে চাই বলে ঘুরে ঘুরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করে, কেউ নিতে রাজি হলে, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, কোথাও থামার সময় তাকে একবার খাইয়ে দিলেই হবে। বুঝলেন?" বাদামি চুল বলল।

"সেরকম টাকাপয়সা আছে তো, কাকু?" কালো চুল খোঁজ নেয়।

"হ্যাঁ, সেই টাকা নাকাতার আছে।"

"তোগেগুচি-সান, নাকাতা-সান আমাদের পরিচিত লোক, তাই ওঁকে একটু দেখেশুনে।" বাদামি চুল বলে দেয়।

"সে আমাকেও যদি একটু দয়াদাক্ষিণ্য করে...", লোকটা ভালমানুষের মত বলে।

"সে নাহয় একদিন", কালো চুল বলে।

বিদায় নেওয়ার সময় মেয়ে দুটো নাকাতাকে, "কাকু, এটা বিদায়-উপহার। খিদে পেলে খাবেন, হ্যাঁ", বলে, কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে কেনা ওনিগিরির প্যাক আর চকোলেট দিল। নাকাতা বার বার কৃতজ্ঞতা জানাল।

"আন্তরিক ধন্যবাদ। এতটা যে দয়া করলেন আমার প্রতি, কীভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাব। ঈশ্বর আপনাদের দুজনের মঙ্গল করুন, নাকাতা সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করছে। "

"প্রার্থনায় যেন ফল হয়", বাদামি চুল বলে, কালো চুল খিলখিল করে হাসতে থাকে।

তোগেগুচি নামের সেই যুবক, নাকাতাকে হাই-এস গাড়ির হেল্পারের সীটে বসাল, শহর থেকে বেরোনোর হাইওয়ে ধরে গিয়ে তোওমেই হাইওয়েতে পড়ল। রাস্তায় জ্যাম, দুজনে তাই সেই সময় নানা গল্প জুড়ে দিল। তোগেগুচি লাজুক স্বভাবের বলে গোড়ায় বেশি কথা বলছিল না, কিন্তু নাকাতার সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর, ক্রমে একসময় কথাবার্তার অধিকাংশটাই একক সংলাপে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পর্যবসিত হল। তার অনেক কিছু বলার ছিল, নাকাতা এমন একজন যার সঙ্গে হয়তো আর দ্বিতীয়বার দেখা হবে না, মন খুলে অকপটে যেকোনো কিছুই বলে যেতে পারল। যাকে বিয়ে করবে বলে ভেবেছিল, সেই প্রেমিকার সঙ্গে কয়েকমাস আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়েটির যে অন্য প্রেমিক জুটে গিয়েছিল। অনেকদিন ধরেই চুপচাপ দুজনের সঙ্গেই চালিয়ে যাচ্ছিল। অফিসে উর্দ্ধতনের সঙ্গে কিছুতেই ঠিক বনিবনা হচ্ছে না বলে কাজটা এমনকি ছেড়ে দেবে বলেও যে ভাবছে। ও যখন জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ত, তখন বাবা-মা'র মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। মা অবিলম্বে আবার বিয়ে করেন, সেই লোকটি নেহাতই ফালতু ঠগবাজ লোক বলে বোঝা গেল। ফেরত দেবে বলে এক বন্ধু টাকা ধার নিয়েছিল, সে টাকা আর ফেরত আসার লক্ষণ নেই। অ্যাপার্টমেন্টে পাশের ঘরের ছাত্রটি মাঝরাত অবধি জোরে মিউজিক চালিয়ে শোনে, ফলে ও যে ঠিকমত ঘুমোতে পারে না।

নাকাতা ওর কথা আন্তরিক ভাবে কান পেতে শুনে, জায়গায় জায়গায় হুঁ হ্যাঁ করে, অল্পস্বল্প মতামত দিচ্ছিল। গাড়ি কোওহোকু পার্কিং এরিয়াতে যখন ঢুকছে, সেই যুবকের জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনা জেনে ফেলেছে। অনেক জায়গায়ই ভাল বুঝতে পারেনি, কিন্তু তোগেগুচি-সান যে ঠিকঠাক কর্মময় জীবন যাপন করতে চেয়েও নানা ট্রাবলের মধ্যে পা টেনে টেনে চলা এক বিষন্ন যুবক তার মোটামুটি একটা আউটলাইন সে পেয়ে গেছে।

"অনেক ধন্যবাদ, এই অবধি যে নিয়ে এলেন, নাকাতার খুব উপকার হয়েছে."

"হ্যাঁ, আমিও যে আপনার সঙ্গে এই অবধি এলাম, খুব ভালো লাগল নাকাতা-সান। এতে মনটাও ভাল হয়ে গেল। এভাবে মন খুলে কারো সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে ভাল লাগল। আজ অবধি কারুকে বলতে পারিনি। এতসব কথা মন দিয়ে শুনলেন আপনি, বিরক্ত হননি আশা করি।"

"না না, এ কী বলছেন! নাকাতারও তো-গে-গু-চি সানের সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। বিরক্তি টিরক্তি কিছুই হয়নি একেবারেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও নিয়ে চিন্তা করবেন না দয়া করে। তো-গে-গু-চি সানেরও এরপর ভালই হবে বলে মনে হয়। ”

যুবকটি পার্সের ভেতর থেকে একটা টেলিফোন কার্ড বের করে নাকাতার হাতে দেয়। “এটা দিচ্ছি। আমাদের কোম্পানির তৈরি টেলিফোন কার্ড। যাত্রা শেষের বিদায় উপহার দেওয়ার মত শুধু এটাই আছে, খারাপ লাগছে।”

“অনেক ধন্যবাদ”, বলে নাকাতা ওটা নিয়ে পার্সের মধ্যে যত্ন করে ভরে রাখে। নাকাতা কারুকে ফোন করে না, কার্ড ব্যবহার করতেও জানে না, তবু ফিরিয়ে না দেওয়াই ভাল বলে মনে হল। তখন বেলা তিনটে।

নাকাতাকে ফুজিগাওয়া অবধি ট্রাকে করে নিয়ে যাবে এমন ড্রাইভার খুঁজে বের করতে তারপর একটি ঘন্টা লাগল। সেই ড্রাইভার, টাটকা মাছ বয়ে নিয়ে যাওয়ার রেফ্রিজারেটার ট্রাকের ড্রাইভার। বয়েস মধ্য-চল্লিশের কোঠায়, বিশালকায়। হাত গাছের গুঁড়ির মত মোটা, ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে।

“মাছের গন্ধ কিন্তু, ঠিক আছে তো?” ড্রাইভার বলে।

“মাছ তো নাকাতার খুবই প্রিয়”, নাকাতা বলে তাতে।

ড্রাইভার হাসে। “আপনি দেখছি একটু ছিটগ্রস্ত।”

“হ্যাঁ। কখনো কখনো এরকমই বলে।”

“আমি আবার একটু ছিটগ্রস্ত মানুষ পছন্দ করি”, ড্রাইভার এবার বলে। “এই পৃথিবীতে স্বাভাবিক লোকের মতো মুখ করে, সঠিকভাবে বেঁচে থাকা লোকেরা বরং খুব একটা ভরসা করার মত হয়না।”

“তাই নাকি?”

“ঠিক তাই। আমার সেরকমই মত।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"নাকাতার মত বলে কিছু তেমন একটা নেই। তবে ঈল্ মাছ ভাল লাগে."

"সেটাও একটা মত। ঈল্ মাছ ভাল লাগে?"

"ঈল্ মাছ কি একটা মত?"

"হ্যাঁ, ঈল্ মাছ যে ভালো লাগে সেটা বলা একটা চমৎকার মত।"

ফুজিগাওয়া পর্যন্ত দুজনে এভাবেই চালিয়ে গেল। ড্রাইভারের নাম বলল হাগিতা-সান।

"আচ্ছা নাকাতা-সান, পৃথিবীটার এরপর কী অবস্থা হবে বলে মনে হয় আপনার?" ড্রাইভার জানতে চায়।

"কিছু মনে করবেন না, নাকাতার মাথাটা ভাল নয় কিনা, এই ধরণের ব্যাপার সবটা জানা নেই", নাকাতা জানায়।

"নিজের একটা মত থাকা, আর মাথাটা ভাল কিংবা মন্দ হওয়া তো আলাদা ব্যাপার।"

কিন্তু হা-গি-তা সান, মাথাটা ভাল না হলে, কিছু নিয়ে চিন্তাই তো করা যায় না।"

"কিন্তু আপনার ঈল্ মাছ ভালো লাগে, তাই তো?"

"হ্যাঁ, নাকাতার ঈল্ মাছ ভাল লাগে।"

"সেটাকেই একটা সম্পর্ক বলে বলা।"

"আচ্ছা।"

"নাকাতা-সানের ওয়য়াকো দোমবুরি[১] ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ, ওয়য়াকো দোমবুরিও নাকাতার ভাল লাগে।"

"সেটাও আবার একটা সম্পর্ক", ড্রাইভার বলে। "এভাবে সম্পর্ক

[১] ভাতের ওপর চিকেন আর ডিম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটা একটা করে একত্র করলে, তাতে আপনা থেকেই অর্থ জিনিসটা জন্ম নেয়। অজস্র সম্পর্ক জড়ো করতে পারলে অর্থও অনেক গভীর হয়। ঈলমাছ হোক, ওয়য়াকো দোমবুরি হোক, বেকড ফিশের পদ হোক, যাই হোক না কেন। বুঝলেন?"

"ভাল বুঝলাম না। খাবার দিয়ে সম্পর্ক হওয়ার ব্যাপারে কিছু বললেন কি?"

"খাবার বলে কথা নেই। ট্রেন হতে পারে, সম্রাট হতে পারেন, যে কোনো কিছুই হতে পারে।"

"নাকাতা ট্রেনে চড়ে না।"

"সে ঠিক আছে। তাই বলছি যে, আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা হল, অন্য যার কাছেই হোক, এভাবে বেঁচে থাকতে থাকতে, আশেপাশের যাবতীয় কিছুর মাঝখানে আপনা থেকেই যে একজন লোকের একটা অর্থ তৈরি হয়ে যায়। যেটা সবচেয়ে জরুরি, সেটা হল জিনিসটা স্বাভাবিক বলে বলা যায় কিনা। মাথাটা ভাল না খারাপ সেটা কিছু নয়। যেটাই হোক, নিজের চোখ দিয়ে সেটা দেখছে কি দেখছে না।"

"হাগিতা-সানের মাথাটা সরেস।"

হাগিতা-সান উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। "সেইজন্যেই তো, মাথাটা ঠিক আছে না খারাপ, সমস্যা তা নিয়ে নয়। আমার মাথাটা বিশেষ ভাল কিছু নয়। কেবল, আমার চিন্তাধারা নেহাতই আমার নিজের। এইজন্যেই সবার মেজাজটা খারাপ করিয়ে দিই। একটু বাদেই লোকে উল্টোপালটা বলছি বলে গাল দেয়। নিজের মগজ দিয়ে ভাবতে গেলেই, লোকের কাছে ধোঁয়াটে হয়ে যায়।"

"নাকাতা এখনও ভাল করে বোঝেনি ঠিকই, নাকাতার যে ঈল্ মাছ ভাল লাগে আর নাকাতার যে ওয়য়াকো দোমবুরি ভাল লাগে, এদু'টোর মধ্যে যে যোগ আছে, সেটাই কি?"

"বলতে পারেন, এককথায় সেটাই। নাকাতা-সান মানুষটা আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাকাতা-সান সম্পর্কিত যাবতীয় কিছুর মধ্যে যোগ তৈরি হয়। আবার একই সঙ্গে ঈলমাছ আর ওয়য়াকো দোমবুরির মধ্যেও যোগ আছে। এইধরণের যোগসূত্র স্থাপনে করাটা ক্রমেই যত ব্যাপক হবে, নাকাতা-সান আর পুঁজিবাদীর মধ্যে সম্পর্ক, নাকাতা-সান আর প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি ধরণের ব্যাপারও এতে স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হবে।"

"প্রো—"

"প্রোলেতারিয়েত", হাগিতা-সান স্টিয়ারিং থেকে বিশাল দুই হাত সরিয়ে সেগুলো নাকাতাকে দেখাল। নাকাতার কাছে সেদুটো বেসবলের গ্লাভসের মত দেখাল। "এইভাবে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কাজ করা মানুষেরাই প্রোলেতারিয়েত। তার উলটোদিকে, চেয়ারে বসে, গতর না খাটিয়ে, অপরকে এটা ওটা করতে বলে, আমার প্রায় একশোগুণ মাইনে পাওয়া লোকেরা হচ্ছে পুঁজিবাদী।"

"পুঁজিপতি বলে লোকেদের কথা জানি না। নাকাতা গরীব বলে অন্যরকম লোকেদের কথা ভাল জানে না। অন্যরকম লোক বলতে, নাকাতা জানে শুধু টোকিও শহরের গভর্নরের কথা। গভর্নর কি পুঁজিবাদী?"

"বলতে পারেন, সেরকমই। গভর্নর আসলে মোটামুটিভাবে পুঁজিপতিদের কুকুরের মত।"

"গভর্নর কুকুর নাকি?" নাকাতা, ওকে জনি ওয়াকারের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল যে কালো্রঙের বিশাল কুকুরটা, সেটার কথা স্মরণ করে, সেই ভয়ংকর চেহারা গভর্নরের ওপর আরোপ করল।

"ওরকম কুকুর ঝাঁকে ঝাঁকে অগুন্তি আছে, এই পৃথিবীতে। আজ্ঞাবাহী কুকুরই।"

"আ-জ্ঞা-বা-হী কুকুর?"

"দৌড়ে বেড়ানো ত্রাস।"

"পুঁজিবাদী বেড়াল হয় না?" নাকাতা শুধিয়ে দেখে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেই শুনে হাগিতা-সান ভয়ানক অট্টহাস্য করে উঠলো। "আপনি সত্যিই ছিটগ্রস্ত, নাকাতা-সান। আপনার মতো লোকেদের আমার ভীষণ পছন্দ। পুঁজিবাদী বেড়ালের কথা বললেন না? সত্যি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি।"

"আচ্ছা হা-গি-তা-সান।"

"হুঁ!"

"নাকাতা গরীব বলে, প্রত্যেক মাসে গভর্নরের থেকে ভা-তা পেয়ে আসছিল। এরকম কি হতে পারে যে সেটা বন্ধ হয়ে গেল?"

"প্রত্যেক মাসে কত করে পেতেন?"

নাকাতা প্রাপ্ত অর্থের পরিমান জানায়। হাগিতা-সান তাজ্জব হয়ে গিয়ে মাথা নাড়ে।

"আজকের দিনে এই টাকায় চালানো তো কঠিন!"

"তা ঠিক নয়। নাকাতা খুব বেশি খরচ করে না যে। তবে ভা-তা ছাড়াও, হারিয়ে যাওয়া বেড়াল খুঁজে দিয়ে তার দরুন কিছু টাকাপয়সা পেয়ে আসছিল।"

"হুমম্। পেশাদার বেড়াল সন্ধানকারী", হা-গি-তা-সান মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে। "আর পারলাম না। আপনি সত্যি ইউনিক!"

"সত্যি কথা বলতে কি, নাকাতা আসলে বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারে", নাকাতা সাহস করে বলেই ফেলে। "বেড়ালদের ভাষা নাকাতা বুঝতে পারে। তাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বেড়াল খুব ভাল হদিস করতে পারত।"

হা-গি-তা-সান সামনে মাথা ঝোঁকায়। "বুঝতে পারছি। আপনার পক্ষে সে মোটেই অসম্ভব নয়। আমি একদমই আশ্চর্য হইনি।"

"কিন্তু কিছুদিন আগে থেকে হঠাৎ করেই নাকাতা আর বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। কেন বলুন তো?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"পৃথিবীটা প্রত্যেকদিন বদলে যাচ্ছে, নাকাতা-সান। প্রত্যেকদিনই সময় হলে রাত কেটে গিয়ে ভোর হয়। কিন্তু সেটা আর আগের দিনের পৃথিবী নয়। সেদিনকার যিনি, তিনি আগের দিনের নাকাতা-সান নন। বুঝলেন কি?"

"হ্যাঁ।"

"সম্পর্কেরও রকমফের হয়। কে পুঁজিপতি, কেই বা প্রোলেতারিয়েত। কোনটা ডান, কোনটা বাম। তথ্য-বিপ্লব, স্টক-অপশন, ফ্লোটিং-অ্যাসেট, পেশাগত কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, বহুজাতিক সংস্থা—কোনটা খারাপ, কোনটা ভাল। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিভাজনরেখা কেবলই অন্তর্হিত হচ্ছে। আপনি যে আর বেড়ালদের ভাষা বুঝতে পারছেন না, সেটা এই কারণেও হতে পারে।"

"নাকাতা ডান আর বামের তফাতটুকু কোনোক্রমে বুঝতে পারে। মানে, এইদিকটা ডান, আর এই দিকটা বাম। ভুল হল?"

"ঠিকই আছে" হা-গি-তা-সান সায় জানিয়ে বলে। "এতেই হবে।"

দুজনে সবশেষে সার্ভিস এরিয়ার রেস্তোরাঁতে ঢুকে খাওয়াদাওয়া করল। হাগিতা দুজনের মতো অর্ডার করে, নিজেই দাম দিয়ে দিল। নাকাতা গাড়িতে চড়তে পাওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দাম দিতে গেলে, হা-গি-তা-সান মাথা নাড়ল।

"কিছুতেই না। আমি বড়লোক নই ঠিকই, কিন্তু টোকিওর গভর্নরের থেকে পাওয়া নামমাত্র টাকায় আপনি আমায় খাওয়াবেন, সেরকম করুন অবস্থা আমার হয়নি", সে বলল।

"ধন্যবাদ। এই ভোজের জন্যও কৃতজ্ঞ", বলে নাকাতা বদান্যতা স্বীকার করল।

ফুজিগাওয়া সার্ভিস এরিয়াতে একটি ঘন্টা ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করে ঘুরেও যথারীতি নাকাতা এমন ড্রাইভার পেল না যে ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা লিফ্‌ট দিতে পারে। কিন্তু তাতেও নাকাতা ধৈর্য্য হারাল না, বিশেষ দমলও না। ওর চেতনায় সময়ের গতি রয়েসয়ে, ধীর। কিংবা বেশিরভাগ সময় আদৌ কোনো গতিই থাকত না। মুড পাল্টাতে নাকাতা একটু অন্য কোথাও গিয়ে আশেপাশে এলোমেলো এদিক ওদিক হাঁটতে লাগল। আকাশে মেঘ নেই, চন্দ্রপৃষ্ঠ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নাকাতা ছাতার ডগা দিয়ে অ্যাসফল্টের ওপর ঠকঠক করে ঠুকতে ঠুকতে পার্কিং-লটে হাঁটছিল। সেখানে গুণে শেষ করা যায়না এত অজস্র বিশালাকার ট্রাক পশুর মত পাশাপাশি সার দিয়ে, যেন শরীরকে বিশ্রাম দিচ্ছিল। মানুষের উচ্চতার সমান টায়ার কুড়িখানা করে লাগানো, এরকম ট্রাকও ছিল। নাকাতা কিছুক্ষণ সেই দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল। এরকম বড়বড় ট্রাক, এভাবে মাঝরাত্তিরে, এত অসংখ্য রাস্তা ধরে যাতায়াত করে। এগুলোর খোলের ভেতর কীধরণের জিনিসপত্র ঠাসা আছে কে জানে। নাকাতা কল্পনা করে উঠতে পারে না। এইসব কনটেইনারের গায়ে যা লেখা আছে, একটা একটা করে পড়ে যেতে পারলে, ওতে কী আছে জানা যাবে হয়তো।

খানিক হাঁটার পর, পার্কিং-লটের একপ্রান্তে, যেখানে গাড়ির ছায়া আর অত ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়, চোখে পড়ল গোটা দশেক বাইক দাঁড় করানো আছে। তার কাছেই অল্পবয়েসি ছেলেরা জড়ো হয়ে সবাই একসঙ্গে কী নিয়ে চেঁচাচ্ছে। গোল হয়ে কিছু একটা ঘিরে রয়েছে। উৎসুক হয়ে পড়ে, ওখানে গিয়ে দেখবে বলে ঠিক করল নাকাতা। হয়তো আশ্চর্য কিছু দেখতে পেয়েছে ওরা।

কাছে গিয়ে হাজির হয়ে যা দেখল, বুঝল যে অল্পবয়েসী ছেলেরা গোল হয়ে, তার ঠিক মাঝখানে একজনকে লাথি মারছে। বেশিরভাগই খালিহাত, এদের মধ্যে একজনের হাতে রয়েছে চেন। পুলিশের ব্যাটনের মত দেখতে কালো রঙের লাঠি হাতে একজনও আছে। অনেকেরই চুল সোনালি অথবা বাদামি রঙে ছোপানো। বুক খোলা ছোটহাতা শার্ট, অথবা টি-শার্ট, কিংবা রানিং-শার্ট পরনে। এদের মধ্যে কাঁধে উল্কি আঁকা ছেলেও আছে। মাটিতে পড়ে ঘুঁষি, লাথি খাওয়া ছেলেটাও যথারীতি একই ধাঁচের অল্পবয়েসী আরেকটি ছেলে। নাকাতার ছাতার ডগা দিয়ে অ্যাসফল্টে খটাখট শব্দ তুলে কাছে এগিয়ে আসতেই, ছেলেদের মধ্যে ক'জন সামনে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চোখে তাকাল। কিন্তু লোকটা নিরীহ বুড়ো মানুষ বুঝতে পেরে, সব সতর্কতা ঝেড়ে ফেলল।

"কাউউ, যেহানে যাচ্ছেন, চলে যান", একজন বলে উঠল।

সেকথায় কান না দিয়ে নাকাতা আরো এগিয়ে এল। মাটিতে লুটিয়ে পড়া ছেলেটার মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে বলে মনে হল।

"রক্ত বেরোচ্ছে। এরপর মরে যাবে!" নাকাতা বলে ওঠে।

ছেলেগুলো পাত্তা না দিয়ে খানিক্ষণ চুপ করে থাকে।

"অ্যাই, কাউউ, তোমাকেও এরপর পিটিয়ে মারব নাকি?" চেনওয়ালা বলে ওঠে শেষে। "এখানে একটার জায়গায় দুটো খুন করতে বেশি কিছু লাগবে না।"

"অহেতুক লোককে খুন করা যায় না।" নাকাতা বললে।

"অহেতুক লোককে খুন করা যায় না", কেউ একজন অবিকল সেভাবে নকল করে বলায় সবাই হেসে উঠল।

"আমরা যে এটা করছি, আমাদের নিজেদের কাছে এর কারণ আছে। খুন করি বা না করি তোমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? ওই ফালতু ছাতাটা খুলে বৃষ্টি পড়তে শুরু করার আগেই চটপট ভাগো তো", অন্য একজন বলল।

মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেটা গড়িয়ে গড়িয়ে একটু এগোবার চেষ্টা করতেই, খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের একটা ছেলে ভারি বুট দিয়ে সজোরে ওর পাঁজরে লাথি মারল।

নাকাতা চোখ বন্ধ করে ফেলল। ওর শরীরের ভেতরে ধীরে ধীরে কী যেন একটা মাথাচাড়া দিচ্ছে এরকম অনুভূতি হল। ঠিক নিজে থেকে আহ্বান করার মত জিনিস সেটা নয়। হালকা বমি বমি ভাব। জনি ওয়াকারকে ছুরিকাঘাতে খুন করার স্মৃতিটা হঠাৎই মাথায় ফিরে আসছে। ছুরিটা বুকের মধ্যে আমূল বসিয়ে দেওয়ার সময়ের অনুভূতিটা এখনো ওর হাতে পরিষ্কার ভাবে রয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সম্পর্ক, নাকাতার মনে হল। হা-গি-তা-সান যে সম্পর্কের কথা বলেছিল, তারই একটা কিনা এটাও, কে জানে। ঈল্ মাছ = ছুরি = জনি ওয়াকার। ছেলেগুলোর গলার আওয়াজ কেমন বিকৃত হয়ে গিয়ে ঠিকমত আলাদা আলাদা করে ধরতে পারছে না। এরসঙ্গে হাইওয়ে থেকে আসা বিচ্ছিন্ন আওয়াজ মিশে, এক অদ্ভুত টোন তৈরি হচ্ছিল। হৃদপিন্ড কষে সংকুচিত হয়ে, রক্তকে শরীরের শেষপ্রান্ত অবধি ঠেলে দিচ্ছে। অন্ধকার ওকে গ্রাস করে নিচ্ছিল।

নাকাতা আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে ছাতাটা খুলে নিজের মাথার ওপর ধরল। তারপর সাবধানে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ছেলেগুলোর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হল। চারপাশ দেখে নিয়ে আরো কয়েক পা পেছোল। সেই দেখে ছেলেগুলো হেসে উঠল।

"দ্যাখ, কাকুটা মাইরি গোছানো লোক", একজন বলল। "আরে, সত্যিই ছাতা খুলেছে"। কিন্তু ওদের সেই হাসি বেশিক্ষণ বজায় রইল না। কারণ, আকাশ থেকে হঠাৎই, ভিজে ভিজে কীসব পড়তে শুরু করল। ওগুলো পায়ের নিচে মাটিতে পড়ে ছপছপ করে বিচিত্র শব্দ হচ্ছিল। ছেলেগুলো ঘিরে ধরা শিকারকে লাথি মারা থামিয়ে এক এক করে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখতে লাগল। আকাশে মেঘ নেই। অথচ সেই কীসব যেন আকাশের এক কোণ থেকে এক এক করে পড়েই যাচ্ছে। প্রথম দিকটায় একটা দুটো করে, ক্রমে সংখ্যায় বেড়ে, মুহূর্তে অঝোরে বৃষ্টির মত পড়তে থাকল। আকাশ থেকে পড়া ওগুলো দৈর্ঘে তিন সেন্টিমিটার মতো, কুচকুচে কালো। পার্কিং লটের আলোর নিচে, ওগুলো চকচকে কালো তুষারের মতো দেখাচ্ছিল। সেই অশুভ তুষারের মত জিনিস ছেলেগুলোর কাঁধে, হাতে, গলার পেছনে পড়ে, ওভাবেই সেঁটে রইল। ওরা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল বটে, ঠিকমত ছাড়াতে পারল না।

"জোঁক!" কে একজন বলল।

এটা একটা সিগনালের মত হয়ে গেল, সব্বাই কী যেন চিৎকার করতে করতে পার্কিং-লট পার হয়ে বাথরুমের দিকে দৌড়তে লাগল। প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছিল একটা ছোট গাড়ি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একজন মাঝপথে সেটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। গাড়িটা ধীরে আসছিল বলে গুরুতর আঘাত তেমন গুরুতর হল না। সোনালি চুলের সেই ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তারপর উঠে বনেটে হাতের তালু দিয়ে জোরে থাপ্পড় মেরে, ড্রাইভারের দিকে চেঁচিয়ে গাল পাড়ল। কিন্তু এর বেশি কিছু না করে, পা টেনে টেনে বাথরুমের দিকে দৌড় লাগাল।

জোঁকবৃষ্টি বেশ প্রবল ধারায় খানিকক্ষণ ঝরে, ক্রমে একটু একটু করে কমে, থেমে গেল। নাকাতা ছাতা বন্ধ করে, তার থেকে জোঁকগুলো ঝেড়ে ফেলে, মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেটার অবস্থা দেখতে এগিয়ে গেল। আশেপাশে জোঁক পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে নড়াচড়া করছিল, কিন্তু খুব কাছে অবধি এসে পড়েনি। পড়ে থাকা ছেলেটা যথারীতি জোঁকে ঢেকে গিয়েছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখা গেল, ছেলেটার ভুরুর কাছে ফেটে গিয়ে, সেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। দাঁতও ভেঙে গেছে বলে মনে হল। নাকাতা নিজের হাতে সামলাতে পারবে না। কারুকে না ডাকলে হবে না। নাকাতা হেঁটে রেস্তোরাঁয় ফিরে এসে, পার্কিং-লটের কোণের দিকে অল্পবয়েসী একটা ছেলে আহত হয়ে পড়ে আছে বলে ওখানকার কর্মীদের জানাল। "পুলিশ না ডাকলে, মরে যেতে পারে", বলে নাকাতা বলে।

তার একটু পরেই নাকাতা, কোবে অবধি চড়তে দেবে এরকম ট্রাক ড্রাইভার খুঁজে বের করতে পারল। ঘুমঘুম চোখের বছর পঁচিশেকের একজন লোক। চুল পনি-টেইল করা, কান বেঁধানো, চু-নিচি ড্রাগনের বেসবল-ক্যাপ পরা, একা একা সিগারেট খেতে খেতে সাপ্তাহিক কমিকস পড়ছিল। চক্‌রা-বক্‌রা ডিজাইনের আলোহা শার্ট পরে, পায়ে নাইকের বড় সাইজের জুতো। খুব বেশি লম্বা নয়। সিগারেট বিনা দ্বিধায় রামেন স্যুপের মধ্যে ফেলে দিল। নাকাতার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে, তারপর শিষ্টতার খাতিরে খুব কষ্ট করে সামনে মাথা ঝোঁকালো। "ঠিক আছে। গাড়িতে যেতে চান তো। অনেকটা আমার দাদুর মতো দেখতে। দেখতেও, কথা বলার ধরণেও...একটার সঙ্গে আরেকটার যোগ থাকে না...। শেষটায় পুরোপুরি ভিমরতি ধরে গিয়েছিল, কিছুদিন আগে মারা গেছেন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলতে পারেন, সকালের আগেই কোবেতে পৌঁছে যাব, ও বলল। ও যাচ্ছে কোবের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আসবাবপত্রের সাপ্লাই বয়ে নিয়ে। পার্কিং-লট থেকে গাড়ি বের করার সময় সেই ধাক্কা লাগার দুর্ঘটনা চোখে পড়ল। কয়েকটা টহলদারির গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল। লাল ইমার্জেন্সি লাইট ঘুরছে, পুলিশ আলো দুলিয়ে পার্কিং-লটে যাওয়া আসা করা গাড়িকে রাস্তা দেখাচ্ছিল। তেমন গুরুতর দুর্ঘটনা নয়। তবে বেশ করেকটা গাড়ি পরপর ধাক্কা মেরেছে একটা আরেকটাকে। ছোট ভ্যানের পাশের দিকটায় টোল খেয়ে গেছে, প্রাইভেট কারের টেইল-লাইট চুরমার। ড্রাইভাররা গাড়ির জানালা খুলে গলা বাড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। তারপর আবার কাঁচ উঠিয়ে দিচ্ছিল।

"আকাশ থেকে পাহাড়প্রমাণ জোঁক ঝরে পড়েছে বলে বলছে", ট্রাক ড্রাইভার নির্বিকার ভাবে বলে। সেগুলো গাড়ির টায়ারের নিচে পিষে গিয়ে, রাস্তা পিছল হয়ে গেছে, স্টিয়ারিং ঘোরালে পিছলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাই সাবধানে ধীরে ধীরে চালাতে বলল। এছাড়াও আবার এই অঞ্চলের হুজ্জুতিবাজ, বেপরোয়া বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ানো লোকের বড্ড আসা যাওয়া, মনে হয় কেউ আহত হয়েছে। জোঁক আর হুজ্জুতির দল, এরকম কম্বিনেশন হয়না সাধারণত। এতে করে পুলিশও ব্যস্ত।"

স্পীড নামিয়ে, খুব সাবধানে বেরুনোর মুখের দিকে ও এগিয়ে চলল। তাতেও ক'বার টায়ার স্লিপ করল। প্রত্যেকবারই ও স্টিয়ারিংটা সূক্ষ্ম অ্যাডজাস্ট করে আগের অভিমুখে ফিরে এল।

"দ্যাখো, কী পরিমাণ যে পড়েছে দেখতে পাচ্ছি", ও বলে। "ভীষণ পিছল হয়ে আছে, ধ্যাৎ। কিন্তু, বলতে পারেন, জোঁক জিনিসটা কেমন বিচ্ছিরি লাগে। আচ্ছা, কাকু, জোঁক গায়ে লেগে থাকার অভিজ্ঞতা আছে?"

"না, যদ্দূর মনে পড়ে, নাকাতার এরকম কোনো অভিজ্ঞতা নেই।"

"আমি বড় হয়েছি গিফু'র পাহাড়ে, আমার বহুবার এরকম হয়েছে। বনের মধ্যে হাঁটছি হয়তো, গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়তে থাকল। জল ভেঙে কোথাও গিয়ে দেখি, পায়ে লেগে আছে। আমি জোঁক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ব্যাপারটা কিন্তু ভালই জানি। একবার লেগে গেলে ছাড়ানো খুব মুশকিল। বড়োসড়ো একটাকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে চামড়াও উঠে আসবে সঙ্গে, ঘা হয়ে যাবে। তাই সবচেয়ে ভাল হল পুড়িয়ে ফেলা। কী যে বিচ্ছিরি, এমনভাবে রক্ত শুষে নিতে থাকে। রক্ত পুরো খাওয়া হয়ে গেলে কেমন নরম থলথলে হয়ে যায়, অ্যাঁক!"

"সে তো বটেই", নাকাতা বলে।

"কিন্তু সার্ভিস এরিয়ার পার্কিং-লটে তো আকাশ থেকে জোঁক পড়তে থাকার কথা নয়। এরকম বোকাবোকা কথা তো কখনো শুনিনি। জোঁক সম্বন্ধে তো কিছুই জানে না দেখছি এখানকার লোকেরা। ওরা কি জানে যে জোঁক কখনো আকাশ থেকে পড়ে না?"

নাকাতা চুপ করে থাকে।

"কয়েক বছর আগে অজস্র কেন্নো এসে কোত্থেকে হাজির হয়েছিল ইয়ামানাশি জেলায়। গাড়ি পিছলে যাচ্ছিল সবজায়গায়। এরকমই, রাস্তা পিছল, দুর্ঘটনা ঘটল কতগুলো। লাইনের ওপর সবজায়গায় জোঁক, ট্রেন চলতে পারছিল না। কিন্তু এমনকি কেন্নোও আকাশ থেকে পড়ে না। কোথাও থেকে মাটির ওপর বুকে হেঁটে চলে আসে। দেখতেই পাওয়া যায়।"

"অনেক আগে, আমি ইয়ামানাশিতে থাকতাম। যুদ্ধের সময় সেটা।"

"সে কী, কোন যুদ্ধ?" ড্রাইভার জানতে চায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২১

ভাস্কর তামুরা কোইচি নিহত

নিজেরই বাড়ির স্টাডিতে মেঝেয় রক্তের সমুদ্র

বিশ্ববিদিত ভাস্কর, তামুরা কোইচিকে (৫*) টোকিওর নাকানো-কু'র নোগাতায় নিজের বাড়ির স্টাডিতে, ৩০ তারিখ বিকেলে, বাড়ির ঠিকে কাজের পরিচারিকা মৃতাবস্থায় আবিষ্কার করে। তামুরা-সান নগ্নদেহে, মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, মেঝে রক্তাক্ত, সংঘর্ষের চিহ্ন আছে, হত্যা বলেই গণ্য করা হচ্ছে। মৃতদেহের পাশেই পড়ে থাকা, অপরাধে ব্যবহৃত ছুরিটি, রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশের ঘোষণা অনুযায়ী হত্যার সময়কাল ২৮ তারিখের সন্ধ্যে নাগাদ। ইদানিং তামুরা-সান একাই থাকতেন বলে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হতে প্রায় দু'দিন বিলম্ব হয়। মাংস কাটার ছুরির আঘাতে বুকের একাধিক স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ায় হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস থেকে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণে মোটামুটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাঁজরের হাড়ও কয়েকটি ভেঙেছে, অনুমান করা হচ্ছে যে জোরালোভাবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। আঙুলের ছাপ, জিনিসপত্র খোয়া যাওয়া, এসব নিয়ে এখনও পুলিশ কিছু জানায়নি। ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষদর্শীও নেই আপাতদৃষ্টিতে।

বাড়ির ভেতরের চেহারা লন্ডভন্ড নয়, কাছেই ছিল মূল্যবান সামগ্রী ও ওয়ালেট, তাতেও হাত দেয়নি, সেই কারণেই ব্যক্তিগত আক্রোশবশত এই অপরাধ বলেই মনে করা হচ্ছে। তামুরা-সানের বাড়িটি নাকানো-কু'র একটি শান্ত পাড়ায়, পাড়ার বাসিন্দারা অপরাধ ঘটাকালীন কোনোরকম আওয়াজ টের না পেয়ে, ঘটনার কথা জানতে পেয়ে বিস্ময় লুকোতে পারেননি। তামুরা-সান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রতিবেশিদের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ রাখতেন না, চুপচাপ একাই কাটাতেন, তাই আশেপাশের লোকেরা অস্বাভাবিক কিছু খেয়াল করেননি। বড়ছেলে (১৫) আর তামুরা-সান, এই দুজন থাকতেন সেই বাড়িতে, কিন্তু ঠিকে কাজের পরিচারিকার থেকে জানা গেছে যে দশদিন মত আগে থেকে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বড়ছেলে ঐ সময় থেকেই স্কুলেও আর যায়নি, পুলিশ হদিস করার চেষ্টা করছে সে বর্তমানে কোথায়।

বসতবাড়ি ছাড়াও মুসাশিনো শহরে তামুরা-সানের একটি অফিস-কাম-স্টুডিও আছে, সেখানকার কর্মী, ওঁর ব্যক্তিগত সচিব মহিলাটির কথা অনুযায়ী, নিহত হওয়ার আগের দিন অবধি উনি নিয়মিত ওঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনার দিন, প্রয়োজন পড়ায় বারবারই মহিলা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সারাদিনই অ্যানসারিং মেশিন চালু হয়ে যাচ্ছিল।

তামুরা-সান শোবা'র ২*তম বছরে, টোকিও মেট্রোপলিটান অঞ্চলে কোকুবুনজি শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। টোকিও শিল্পকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে, ছাত্রাবস্থা থেকেই বেশ কিছু স্বকীয়তাপূর্ণ কাজ প্রদর্শন করে, ভাস্কর্যের জগতে 'নিউ ওয়েভ' হিসেবে আলোচিত হয়েছিলেন। থীমটি ধারাবাহিক ভাবে মানুষের অবচেতনকে মূর্ত করে তুলছিল, গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করা এই মৌলিক ভাস্কর্যশৈলী বিশ্ব জুড়ে উচ্চ স্বীকৃতি পেয়েছিল। 'গোলকধাঁধা' নামে একটি ফর্মে ধৃত সৌন্দর্য ও প্রেরণাকে স্বাধীন স্বতস্ফূর্ত কল্পনাশক্তিতে অনুসন্ধান করে যাওয়া বড়মাপের "গোলকধাঁধা" সিরিজ, সৃষ্টি হিসেবে সাধারণ ভাবে খুবই সুবিদিত। ইদানিং *** ফাইন আর্টস কলেজের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দু'বছর আগে নিউ ইয়র্কের মডার্ন আর্ট গ্যালারির এক প্রদর্শনীতে—

*** ***

এই অবধি পড়ে আমি খবরের কাগজটা পড়া বন্ধ করলাম। কাগজের পাতায় বাড়ির গেটটার একটা ফোটো বেরিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাবার খুব অল্পবয়েসের মুখের একটা ফটোও দিয়েছে। পাতার ওপরে দুটোই খুব অশুভ কিছু বলে মনে হচ্ছে। আমি কাগজটা চারভাঁজ করে টেবলের ওপর রাখলাম। কোনো কথা না বলে বিছানার ওপরে বসা অবস্থায় আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ চেপে ধরে ছিলাম। কানের ভেতরে একটানা একটা ভোঁতা আওয়াজ পরিবর্তনহীন ফ্রিকোয়েনসিতে বেজেই যাচ্ছে। বার কতক মাথা ঝাঁকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আওয়াজটা তাড়াতে পারলাম না।

ঘরের ভেতরে আছি। ঘড়ির কাঁটা ৭টা ছাড়াচ্ছে। একটু আগেই ওশিমা আর আমি মিলে লাইব্রেরি বন্ধ করেছি। তার একটু আগে সাএকি-সান ফোকসওয়াগেন গলফের ইঞ্জিনের আওয়াজে চমকে দিয়ে ফেরার রাস্তা ধরেছেন। লাইব্রেরির ভেতরে এখন শুধু ওশিমা আর আমি। আর কানের মধ্যে সেই বিরক্তিকর আওয়াজটা হয়েই চলেছে।

"এটা গত পরশুর কাগজ। তুমি যখন পাহাড়ে ছিলে, সেইসময় খবরটা বেরিয়েছে। ওটা পড়ে, ওরকম একটা জায়গায় তামুরা কোইচি নাম হলে, তোমার বাবাই হয়তো, বলে মনে হয়েছিল। কারণ, একটু ভেবে দেখলেই, অনেকগুলো পরিস্থিতি একদম ঠিকঠাক মিলে যায়, তাই না? আসলে গতকালই দেখানো উচিত ছিল তোমাকে, তবে, আগে তুমি একটু ধাতস্থ হয়ে নিলে তারপর দেখানোই ভাল বলে মনে হয়েছিল।

আমি সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। তখনও চোখ চেপে রয়েছি। ওশিমা ডেস্কের সামনে সুইভেল চেয়ারে বসে, পা জড়ো করে, এদিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলছিল না।

"আমি খুন করিনি।"

"সে আমি জানি", ওশিমা বলে। "সেদিন তুমি সন্ধে অবধি এই লাইব্রেরিতে বই পড়ছিলে। তারপর টোকিওতে ফিরে বাবাকে খুন করে, তক্ষুণি আবার তাকামাৎসুতে ফিরে আসা, সময়ের হিসেবে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু আমার পক্ষে অতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, বাবা খুন হয়েছে ঠিক সেইদিনই যেদিন আমার শার্টে ঘন হয়ে রক্ত লেগে ছিল।

"কিন্তু পত্রিকায় যা লেখা আছে, তাতে পুলিশ তোমার হদিস করার চেষ্টা করছে। সম্ভবত ঘটনার খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"এখানে পুলিশের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে, তোমার যে অ্যালিবাই আছে সেটার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়ে রাখলে, লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে, পরিস্থিতিটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। অবশ্যই আমি তোমার হয়ে প্রমাণ দাখিল করব।"

"কিন্তু সেটা করলে, তক্ষুণি নিয়ে গিয়ে টোকিওতে ফিরিয়ে দেবে।"

"হয়তো তাই হবে। যত যাই হোক, তোমার এখন যা বয়েস, বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটুকু না পেলেই নয়। একা একা নিজের খুশি মত পছন্দের জায়গায় যাওয়ার উপায় তোমার নেই। নিয়ম অনুযায়ী তোমার এখনও অভিভাবক প্রয়োজন।"

আমি ঘাড় নাড়ি। "আমি কারুকেই কিছু বুঝিয়ে বলতে চাই না, টোকিওর বাড়িতেও ফিরতে চাই না, স্কুলেও ফিরতে চাই না।"

ওশিমা চুপ করে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"সেটা তোমার নিজেকেই ঠিক করতে হবে", বেশি সময় না নিয়ে শান্ত গলায় ও বলল। "নিজের অভিরুচি মত জীবন কাটানোর অধিকার তোমার আছে বলেই আমি মনে করি। পনের বছর বয়েস, না একান্ন বছর বয়েস, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একথা জগতের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্ভবত মেলে না। তার ওপরে যদি তুমি এখানে ওরকম 'আমি কারুকেই কিছু বুঝিয়ে বলতে চাই না, আমায় ছেড়ে দিন প্লীজ' গোছের রাস্তা বেছে নাও, তাহলে এরপরে পুরোটাই তোমাকে পুলিশ এবং সমাজের থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে, এবং সে খুব কঠিন জীবন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হওয়ার কথা। সবে তুমি পনের, সামনে বহুদিন পড়ে আছে। এনিয়ে তুমি চিন্তিত নও তো?"

আমি চুপ করে থাকি।

খবরের কাগজট টেনে নিয়ে ওশিমা আরেকবার খবরটার দিকে দৃষ্টি দেয়। "খবরে যা লিখেছে তাতে তো তুমি ছাড়া তোমার বাবার আর কেউ নেই দেখছি।"

"মা আর দিদি আছে। কিন্তু অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে ইস্তক, ওরা যে কোথায় জানা নেই। আর জানা থাকলেও, অন্ত্যেষ্টির সময় ওরা আসবে বলে মনে হয় না।"

"তাহলে, তুমি না থাকলে, তোমার বাবার মারা যাওয়ার পরের ব্যবস্থাপত্র কে করবে? অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি, তারপর সব অফিশিয়াল কাজকর্ম যেগুলো?"

"খবরে যেটা বেরিয়েছে, কাজের জায়গায় ওঁর সেক্রেটারির কাজ করেন যে মহিলা, উনিই অফিশিয়াল কাজগুলো সবটা চালান। পরিস্থিতি ওঁর জানা থাকায়, ওঁর ওপর ছেড়ে দিলেই কিছু একটা হবে। বাবার যা কিছু আছে, তার কোনো উত্তরাধিকার আমি চাই না, বাড়ি হোক, সম্পত্তি হোক, উপযুক্ত রকম কিছু একটা করলেই হবে।"

বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যেটা পাব, সেটা শুধু ওঁর জিন। আমি তাই মনে করি।

"আমার যেরকম ধারণা জন্মাচ্ছে, তা যদি সত্যি হয়", ওশিমা আমার থেকে জানতে চায়। "বাবা কারুর হাতে খুন হওয়া সত্ত্বেও, দেখে মনে হচ্ছে, তুমি তাতে তেমন শোকও পাওনি, দুঃখজনক কিছু বলেও মনে করছ না।"

"এটা দুঃখজনক ঠিকই। যতই হোক, রক্তের সম্পর্ক তো বাবার সঙ্গে। তবে, প্রকৃত মনোভাবের কথা বলতে হলে, দুঃখজনক এটাই যে আরো অনেক আগে মারা যাননি। যদিও জানি যে মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে এভাবে বলাটা নিষ্ঠুর, অমানবিক।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওশিমা মাথা নাড়ে। "ও নিয়ে ভেবো না। এরকম একটা সময়ে বলেই, নইলে তোমার অকপটে বলার অধিকার আছে বলেই আমি মনে করি।"

"তাহলে তো আমি..."

কণ্ঠস্বরে উপযুক্ত দৃঢ়তা আনতে পারছি না। মুখের কথা, গন্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না, কী এক শূন্যতা তাকে শুষে নিচ্ছে। ওশিমা চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসে।

আমি বলতে থাকি। "দেখুন, ওশিমা-সান, আমার চারপাশে একটার পর একটা নানারকম কিছু ঘটতে থাকে। তার কোনো কোনোটায় আমার হাত ছিল, কোনো কোনোটায় আবার একেবারেই হাত ছিল না। কিন্তু আমি এদুটোর মধ্যে আর প্রভেদ করতে পারছি না। এক কথায়, এমনকি যেগুলোতে আমার হাত ছিল বলে ভাবছি, আসলে আমি সে ব্যাপারে কিছু ঠিক করার অনেক আগে থেকেই সেগুলো ঘটবে বলে যেন ঠিক হয়ে ছিল বলে মনে হচ্ছে। কেউ একজন আগেই কোথাও যা ঠিক করে রেখেছিল, আমি কেবল সেটাই হুবহু অনুসরণ করে চলেছি বলেই যেন টের পাচ্ছি। নিজে যতই ভেবেচিন্তে, প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখি না কেন, সবই বিফল হয়। এমন কি, উলটে বরং কোনো না কোনো ভাবে নিজেই যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করছি দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার। যেন নিজেই নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি। আর এটা আমার পক্ষে বড় ভয়ানক হয়ে পড়ছে। ভয় পাচ্ছি বলাই হয়তো আরো সঠিক হবে। এটা মনে হলেই শরীর কিরকম যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।"

হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখে ওশিমা। সেই হাতের উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করে।

"ধর যদি এরকম হয়ও, আমি বলব, যদি তোমার সিদ্ধান্ত, তোমার প্রচেষ্টা একেবারে বিফলও হয়, সেটাই যদি তোমার নিয়তি হয়, তাহলেও তো আরও বেশি করে সেটা তুমিই, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। তুমি যে তুমি হিসেবেই সামনে এগিয়ে চলেছ, এতে তো কোনো ভুল নেই। এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার তো কিছু নেই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি চোখ তুলে ওশিমার মুখের দিকে তাকালাম। ওর বলার ধরণে আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মানুষকে চালিত করার।

"এভাবে ভাবছেন কেন?"

"কারণ, এর মধ্যে একটা আয়রনি রয়ে গেছে।"

"আয়রনি?"

উঁকি দেওয়ার মত করে ওশিমা আমার চোখের দিকে তাকায়। "বেশ, তবে শোনো তামুরা কাফকা-সান, তোমার এখন যেটা মনে হচ্ছে, সেটা বহু গ্রীক ট্র্যাজেডির মোটিফও বটে। মানুষ তার নিজের নিয়তি বেছে নেয় না, নিয়তিই মানুষকে বেছে নেয়। এটাই গ্রীক ট্র্যাজেডির ভিত্তিতে থাকা বিশ্ববীক্ষা। এখন, এই ট্র্যাজেডি—অ্যারিস্টটলস যেভাবে এটাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন—এর শিকার হওয়া ব্যক্তিটির দুর্বলতার কারণের চেয়েও, আয়রনি হল, বরং তার শক্তির কারণেই ঘটতে পাচ্ছে বেশি। বুঝতে পারছ, আমি যা বলছি? দুর্বলতার কারণে নয়, সদ্গুণের কারণেই, বড় ট্র্যাজেডি তার নিজের মধ্যে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সোফোক্লেসের 'রাজা ওইদিপাউস' এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ। রাজা ওইদিপাউসের ক্ষেত্রে, অকর্মণ্যতার কিংবা নির্বুদ্ধতার কারণে নয়, তাঁর বীরত্বের আর ন্যায়নিষ্ঠতার কারণেই নিশ্চিতভাবে নিজের ট্র্যাজেডি ডেকে আনলেন। এখানেই অনিবার্যভাবে আয়রনির জন্ম হয়।"

"কিন্তু কোনও পরিত্রাণ নেই।"

"পরিস্থিতি সাপেক্ষে", ওশিমা বলে, "পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, পরিত্রাণ নেই এমনও হয়। তবে কিনা, আয়রনি মানুষকে গভীরতা দান করে, বড় করে তোলে। এর চেয়েও বড় মাত্রার পরিত্রাণের প্রবেশদ্বার হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশ্বজনীন আশার আলোও দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্যেই গ্রীক ট্র্যাজেডি এখনও বহু লোক পড়ে, শিল্পকলার একটা মডেল হিসেবে টিঁকে রয়েছে। আবারও পুনরুক্তি করা হয়ে যাচ্ছে যদিও, জগতের সবকিছুই হচ্ছে মেটাফর। কেউই সত্যি সত্যি পিতাকে হত্যা করে, মা'র সঙ্গে সংগম করে না। তাই না? অর্থাৎ আমরা মেটাফর নামক উপায়টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভেতর দিয়ে আয়রনিটাকে নিচ্ছি। এইভাবে আমরা প্রসারিত হচ্ছি, গভীরতর হচ্ছি।"

আমি চুপ করে থাকি। আমি নিজের ভাবনায় আটকে আছি।

"তুমি যে তাকামাৎসুতে এসেছ, এটা জানে কে কে?" ওশিমা প্রশ্ন করে।

আমি নাথা নাড়ি। "আমি একাই ঠিক করে, একাই এসেছি। কারুকে বলিনি। কেউ জানে না বলেই মনে হয়।"

"তাহলে কিছুদিন লাইব্রেরির এই ঘরে লুকিয়ে থাক। রিসেপশনের কাজও কোরো না। পুলিশও তোমার গতিবিধি অনুসরণ করতে পারবে না। আর, সেরকম বুঝলে, আবার সেই কোচির পাহাড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলেই হবে।"

আমি ওশিমার মুখের দিকে তাকাই। তারপর বলি। "ওশিমা-সানের সঙ্গে দেখা না হলে, মনে হয় আর কোনো উপায় থাকত না। এই শহরে এক্কেবারে একা একা, বাঁচানোর কেউ তো নেই"

ওশিমা স্মিত হাসে। আমার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে, সেই হাতের দিকে চেয়ে থাকে।

"হ্যাঁ, কিন্তু তা তো নয়। যদি আমার সঙ্গে দেখা না-ও হত, তাহলেও তুমি অন্য কোনও রাস্তা ঠিক বা'র করতে। কীভাবে তা বলতে পারব না, আমার সেরকমই মনে হয়। কোনও ভাবে তোমার মত মানুষদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে এরকমই মনে হয়।"

এরপর উঠে দাঁড়িয়ে, ওশিমা ডেস্কের ওপরে রাখা অন্য একটা খবরের কাগজ নিয়ে আসে।

"এদিকে, এর আগের দিনের কাগজে এই খবরটা বেরিয়েছে। ছোট্ট খবর যদিও, খুবই ইন্টারেস্টিং বলে মনে আছে। ঘটনার আকস্মিক সমাপতনই বলতে হবে, এটাও তোমার বাড়ির কাছেই ঘটেছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার দিকে ও পত্রিকাটা বাড়িয়ে দেয়।

আকাশ থেকে মৎস্যবৃষ্টি

২০০০ সার্ডিন আর হর্স ম্যাকারেল, নাকানো কু'র বাজারে

২৯ তারিখ সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ, নাকানো-কু নোগাতা *চো-মে মহল্লায় কমবেশি ২০০০ সার্ডিন আর হর্স ম্যাকারেল আকাশ থেকে ঝরে পড়ে, বাসিন্দাদের হতবাক করে দিয়েছে। আশেপাশের দোকানপাটে কেনাকাটা করতে আসা দুই গৃহবধূ, ঝরে পড়া মাছ এসে লেগে মুখে সামান্য আঘাত পেয়েছেন, তবে এর বেশি ক্ষতি কিছু হয়নি। সেই সময় আকাশ ছিল পরিষ্কার, মেঘ বিশেষ ছিল না, বাতাসও জোরে বইছিল না বলেই জানা গেছে। ঝরে পড়া মাছের মধ্যে অনেকগুলিই ছিল জীবিত, রাস্তার ওপর লাফাচ্ছিল—

* * *

আমি সেই ছোট্ট খবরটা পড়ে, ওশিমাকে ফেরত দিলাম। পত্রিকার খবরে এই ঘটনার কারণ কিছু কিছু অনুমান করেছে বটে, কোনোটাই তেমন আমল দেওয়ার মতো নয়। পুলিশ চুরি কিংবা ফাজলামোর সম্ভাবনা নিয়ে তদন্ত করে দেখছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলছে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে মাছ বৃষ্টি হওয়ার মত কিছু একেবারেই ছিল না। কৃষি, বন ও মৎস্য মন্ত্রকের জনসংযোগ অধিকর্তা এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করছেন না।

"এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেছে বলে জানা যায়?" ওশিমা খোঁজ নেয়।

আমি মাথা নাড়ি। এর একেবারেই কোনো নজির নেই।

"তোমার বাবা খুন হওয়ার পরের দিনই, অকুস্থলের অদূরেই দু'হাজার সার্ডিন আর হর্স ম্যাকারেল আকাশ থেকে ঝরে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই আকস্মিক সমাপতন, কী মনে হয়?"

"সম্ভবত।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"এছাড়াও কাগজে, তোওমেই হাইওয়ের ফুজিকাওয়া সার্ভিস এরিয়াতে, ওই একই দিনে গভীর রাতে অজস্র জোঁক আকাশ থেকে ঝরে পড়ার খবর বেরিয়েছে। ঝরে পড়াটা আবদ্ধ ছিল একটা খুব নির্দিষ্ট ছোট জায়গা জুড়ে। এর ফলে কয়েকটি সংঘর্ষজনিত হালকা দুর্ঘটনা ঘটে। বেশ বড় বড় জোঁক। কেউই বলতে পারছে না কীভাবে এরকম বড় একঝাঁক জোঁক আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মত ঝরে পড়ল। জোরালো বাতাসও ছিল না, রাতের আকাশও ছিল পরিষ্কার। এরকম কিছু কি কখনো শোনা গেছে?"

আমি ঘাড় ঝাঁকাই।

বলে ওশিমা কাগজ একসঙ্গে করে ভাঁজ করে রাখে। "কেন যে এই সময়ে জগতে, অদ্ভুত সব, ব্যাখ্যা মেলে না এরকম ব্যাপার একের পর এক ঘটেই যাচ্ছে। অবশ্যই এগুলোর মধ্যে কোনো যোগ নেই হয়তো। নেহাতই কো-ইনসিডেন্স। তবু আমাকে, যে কারণেই হোক, ভাবিয়ে তুলেছে।

"এটাও হয়তো মেটাফর", আমি বলি।

"হতে পারে। কিন্তু হর্স ম্যাকারেল, সার্ডিন আর জোঁক আকাশ থেকে ঝরে পড়াটা ঠিক কীসের মেটাফর হতে পারে?"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। অনেকটা সময়, বলে বোঝানো যায় নি এমন সব জিনিস নিয়ে কথা সাজিয়ে দেখি।

"জানেন তো ওশিমা-সান, কয়েক বছর আগে থেকেই বাবা আমার কাছে ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিলেন।"

"ভবিষ্যৎবাণী?"

"এটা এখন অবধি কারুকে বলিনি। আমি অকপটে বললেও, ভেবেছিলাম কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না।"

কিছু না বলে চুপ করে থাকে ওশিমা। কিন্তু সেই নীরবতার ফলে আমি আরোই বলতে উন্মুখ হয়ে উঠলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বলতে শুরু করি। "ভবিষ্যৎবাণীর চেয়েও অভিশাপ বলাই ভাল হয়তো। বাবা বেশ ক'বারই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল। একেবারে প্রতিটি অক্ষর ছেনি বাটালি দিয়ে আমার চেতনায় খোদাই করে দিতে চেয়ে।"

আমি বড় করে শ্বাস নিয়ে নিই। এবার যেটা বলতে হবে সেগুলো আরেকবার মনে মনে যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে নিই। নিশ্চিত হয়ে নেওয়ার অবশ্য দরকারই নেই, মনের মধ্যে রয়েই গেছে। সদা বিরাজ করছে। কিন্তু জিনিসটার গুরুত্বটা আরেকবার পরিমাপ করে দেখতে হয়।

আমি বলতে থাকি। "তুই একদিন পিতৃহন্তা হবি, একদিন মায়ের সঙ্গে সংগম করবি।"

একথা একবার উচ্চারণ করা মাত্র, নতুন করে কথায় রূপ দেওয়া মাত্র, আমার মনের ভেতরে একটা বিরাট খোঁদল তৈরি হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি জন্ম নিল। সেই কল্পিত খোঁদলের মধ্যে আমার হৃৎপিন্ডটা একটা ধাতব ফাঁপা আওয়াজ করতে লাগল। মুখের অভিব্যক্তিতে কোনও পরিবর্তন না এনে ওশিমা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"তুমি একদিন নিজের হাতে পিতাকে হত্যা করে, একদিন মায়ের সঙ্গে সঙ্গম করবে—তোমার বাবা বলতেন তো?"

আমি একাধিকবার মাথা সামনে ঝোঁকাই।

"এ তো রাজা ওইদিপাউস যে ভবিষ্যৎবাণী পেয়েছিলেন, হুবহু সেটাই। তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই, তাই না?"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "কিন্তু ওটকুই শুধু নয়। সঙ্গে আরেকটা আছে। আমার এক দিদি আছে, আমার চেয়ে ছয় বছরের বড়ো। একদিন সেই দিদির সঙ্গেও সঙ্গম হবে বলে বাবা বলেছিলেন।"

"তোমাকে উদ্দেশ্য করেই তোমার বাবা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তাই না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ। কিন্তু তখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি, সংগম করা কথাটার অর্থই জানতাম না। ব্যাপারটা যে কী সেটা বুঝলাম কয়েকবছর বাদে গিয়ে।"

ওশিমা কিছুই বলল না।

"আমি শতচেষ্টাতেও এই পরিণতির থেকে রেহাই পাব না, বাবা বলেছিলেন। যথাসময়ে জেগে ওঠার জন্য এ একেবারে আমার জিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, যাই করি না কেন এর কোনো এদিক ওদিক হবে না। বাবাকে মেরে, মা ও দিদির সঙ্গে সংগম করব।"

ওশিমা তখনও দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে। ও আমার কথা একটা একটা করে খতিয়ে দেখে, কিছু একটা রাস্তা বের করবে বলে ভাবছে যেনবা।

তারপর বলে, "তোমার বাবা, তোমাকে উদ্দেশ্য করে এরকম ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণী আদৌ করতে গেলেন কেন?"

"সে আমার জানা নেই। এটুকু ছাড়া আর কিছু বলেননি যেহেতু", আমি ঘাড় ঝাঁকাই। "হয়তো বাবা, ওঁকে ছেড়ে চলে গেছে বলে মা আর দিদির ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। ওদের অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন হয়তো। উপস্থিত আমার মধ্যে দিয়ে।"

"এমনকি যদি এরকম করতে গিয়ে, তোমাকে আঘাত দিয়ে বসেন, তবুও!"

সামনে মাথা ঝোঁকাই। "বাবার কাছে আমি সম্ভবত ওঁর আরেকটি সৃষ্টির বেশি কিছু নই। মূর্তির মতোই। ভেঙেও যদি যায়, আঘাতও যদি পায়, সে বাবার মর্জি।"

"সত্যি যদি তাই হয়, খুবই বিকারগ্রস্ত মানসিকতা বলে আমার মনে হচ্ছে", ওশিমা বলে।

"জানেন তো, ওশিমা-সান, আমি যেখানে বড় হয়েছি সেখানকার যাবতীয় কিছুই বিকৃত। প্রতিটি জিনিসই ভয়ানক বিকৃত ছিল বলে, উলটে সোজা জিনিস যেন সেখানে বিকৃত দেখাত। অনেক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগেই এটা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমি ছোট ছিলাম, থাকার অন্য জায়গাও ছিল না।"

ওশিমা বলে,"তোমার বাবার সৃষ্টি এযাবত কয়েকবারই সাক্ষাত দেখেছি। প্রতিভাবান অসাধারণ ভাস্কর। মৌলিকতা ছিল, চ্যালেঞ্জিং, খুশি করতে বলছি না, খুবই শক্তিশালী। ওঁর সৃষ্ট জিনিস যে একেবারে খাঁটি জিনিস ছিল এতে কোনও ভুল নেই।"

"তা হবে হয়তো। তবে সেটা বের করে আনার পর যা পড়ে রইল, যে বিষ উনি চারপাশে ছড়াতেন, তাতে ধাক্কা না খেয়ে উপায় ছিল না। নিজের চারপাশের মানুষদের সব্বাইকে বাবা অপমান করতেন, আঘাত দিতেন। এটা করে তৃপ্তি পেতেন কিনা, আমি জানি না। এছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলেই মনে হয়। প্রথম থেকেই এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিলেন কি না কে জানে। তবে, যেটাই হোক না কেন, এই দিক থেকে বিশেষ কিছু একটার সঙ্গে ওঁর যোগ ছিল বলেই মনে হয়। বুঝতে পারছেন কি, আমি কী বলতে চাইছি?"

"বুঝতে পারছি বলেই মনে হচ্ছে", ওশিমা বলে। সেই 'কিছু একটা' সম্ভবত, শুভ আর অশুভের পরিষ্কার প্রভেদ অতিক্রম করে কিছু। ক্ষমতার উৎস বলা যেতে পারে হয়তো।"

"আর আমি সেই জিনের অর্দ্ধেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। মা যে আমাকে রেখে চলে গেল, সেও সেই কারণেই হয়তো। অশুভ উৎস থেকে জন্ম বলেই, অপমানিত, আহত হওয়ার জন্য পরিত্যাগ করল হয়তো।"

ওশিমা আঙুলের ডগা দিয়ে কপালের দুই কোণে হালকা ভাবে চেপে ধরে, কিছু একটা চিন্তা করতে লাগল। তারপর চোখ কুঁচকে আমার মুখের দিকে দেখল। "কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে উনি তোমার প্রকৃত পিতা নন। বায়োলজিকাল ফাদার বলে বলতে চাইছি।"

আমি মাথা নাড়ি। "কয়েক বছর আগে হাসপাতালে গিয়ে যাচাই করানো হয়েছে। বাবার সঙ্গে, দুজনে মিলে হাসপাতালে গিয়ে, রক্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিয়ে জিন চেক করানো হয়েছে। আমরা, একশো শতাংশ নির্ভুল ভাবে, পরস্পর বাবা ও ছেলে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট আমাকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল।"

"খুব সাবধানী লোক।"

"বাবা ওটা আমাকে জানিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি যে ওঁর জন্ম দেওয়া একটা সৃষ্টি। স্বাক্ষর করে রাখার মতোই।"

ওশিমার আঙুল তখনও কপাল চেপে ধরে আছে।

"কিন্তু তোমার বাবার ভবিষ্যৎবাণী তো আসলে ফললো না। কেননা তুমি তো তোমার বাবাকে খুন করনি। ওইসময় তুমি তাকামাৎসুতে ছিলে। অন্য কেউ টোকিওতে তোমার বাবাকে খুন করেছে। এটাই তো হয়েছে, তাই না?"

আমি কথা না বলে নিজের দুটো হাত টানটান করে, সেদিকে চেয়ে থাকি। রাতে গভীর অন্ধকারের মধ্যে, কালো অশুভ রক্তমাখা সেই দুটো হাত।

"সত্যি বলতে কী, আমার তেমন ভরসা নেই", আমি বলি।

ওশিমাকে আমি সবটা খুলে বললাম। সেই রাতে, লাইব্রেরি থেকে ফেরার সময় কয়েক ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে থেকে, জিনজার বনের মধ্যে চোখ খুলে যে দেখলাম আমার শার্টে ঘন হয়ে কারুর রক্ত লেগে আছে। সেই রক্ত যে জিনজার বাথরুমে ধুয়ে ফেলেছিলাম। বেশ কয়েকঘন্টা যে স্মৃতি একবারেই চলে গিয়েছিল। অনেকটা দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে, সেই রাতে সাকুরার ঘরে গিয়ে কাটানোর অংশটুকু বাদ দিলাম। ওশিমা মাঝেমাঝে প্রশ্ন করে, খুঁটিনাটি ঘটনাও যাচাই করে নিয়ে, মাথার ভেতরে সব পুরে রাখছিল। কিন্তু সেই নিয়ে কোনো মতামত উচ্চারণও করছিল না।

"সেই রক্ত আমি কোত্থেকে লাগিয়ে এসেছি, ওটা কা'র রক্ত, একেবারেই জানি না। কোনো ধারণাই করতে পারছি না!" আমি বললাম। "তবে কিনা, মেটাফর-টর নয়, আমি সম্ভবত এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাতে সত্যিই বাবাকে খুন করেছি। সেরকমই মনে হচ্ছে। আমি সত্যিই সেদিন টোকিওতে ফিরে যাইনি। ওশিমা-সান যে বললেন, তাকামাৎসুতেই ছিলাম, সেটাই সত্যি। কিন্তু 'স্বপ্নের মধ্যেই দায়িত্বের শুরু', ঠিক কিনা?"

"ইয়েটস্-এর কবিতায়", ওশিমা বলে।

আমি বলে যাই, "আমি হয়তো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বাবাকে হত্যা করেছি, স্বপ্নের বিশেষ একটা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে হয়তো বাবাকে খুন করতে চলে গিয়েছি!"

"এভাবে তুমি ভাবছ। তোমার কাছে হয়তো এক অর্থে এটা বাস্তবে হতে পারে। কিন্তু পুলিশের—অন্যদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার—তোমার এই কাব্যিক দায় নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয়। কোনও মানুষের পক্ষেই একই সময়ে দুটো ভিন্ন জায়গায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। সেটা আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করেছেন, আইনের চোখেও গ্রহণযোগ্য ধারণা নয়।"

"কিন্তু আমি এখানে বিজ্ঞান কিংবা আইনের কথা বলছি না।"

ওশিমা বলতে থাকে, "দ্যাখো, তামুরা-কুন, তুমি যা বলছো সেটা শেষ অবধি একটা তত্ত্ব বা গল্পের বেশি কিছু নয়। তাও আবার বেশ মাত্রাছাড়া সুররিয়ালিস্টিক কল্পিত তত্ত্ব। একেবারে সায়েন্স ফিক্শন উপন্যাসের প্লটের মত শোনায়।"

"নেহাতই কাল্পনিক তত্ত্ব ঠিকই। সে আমি জানি। সম্ভবত কেউই এরকম বোকাবোকা কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বিজ্ঞান মোটেই এগোবে না, কল্পিত তত্ত্বের মোকাবিলা করে সেটা যে মিথ্যা সেই প্রমাণ না দিতে পারলে—বাবা সর্বদাই বলতেন। কল্পিত তত্ত্ব তো মননের যুদ্ধক্ষেত্রও বটে, তাই না? মুখের লব্জই ছিল এটা। আর এখন অবধি একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মতো প্রমাণ আমি একটাও মনে করতে পারছি না।"

ওশিমা নীরব।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমিও আর বলার মত কিছু পাচ্ছি না।

"বলা যায়, তুমি যে সেই শিকোকু থেকে অ্যাদ্দূর পালিয়ে এসেছ, এটাই তার কারণ। বাবার অভিশাপের হাত থেকে পালানোটা", ওশিমা বলে।

মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই। তারপর ভাঁজ করা খবরের কাগজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাই। "কিন্তু যথারীতি পালাতে পারিনি বলেই মনে হচ্ছে।"

দূরত্বের ওপরে খুব একটা ভরসা না করাই ভাল বলে মনে হচ্ছে, তাই না, কারাসু বলে ছেলেটা বলে ওঠে।

"তোমার সত্যি একটা লুকোনোর জায়গা দরকার বলে মনে হচ্ছে" ওশিমা বলে। "এর বেশি কিছু, আমিও এখনই ভাল করে বলতে পারছি না।"

টের পেলাম যে ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। তক্ষুণি শরীর ছেড়ে দেওয়া বিচ্ছিরি ব্যাপার। পাশে বসে থাকা ওশিমার হাতে ভর দিলাম। ওশিমা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ওর স্ফীতিহীন বুকে মুখ গুঁজলাম।

"ওশিমা-সান, আমি এসব কিছুই করতে চাই না। বাবাকে খুন করার মত কিছু করতে চাই না। মা আর দিদির সঙ্গে সংগম করতে চাইনা।"

"অবশ্যই", ওশিমা বলে। তারপর আমার ছোট করে ছাঁটা চুলে চিরুণির মত করে আঙুল চালাতে থাকে। "অবশ্যই সেরকম কিছু হবে না।"

"এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও?"

"কিংবা মেটাফরের মধ্যেও", ওশিমা বলে। "অ্যালিগোরির মধ্যেও, অ্যানালজির মধ্যেও।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"অসুবিধে না হলে, তোমার সঙ্গে থেকে যেতেও পারি", একটু পরে ওশিমা বলে। "আমি ওই চেয়ারটায় ঘুমোতে পারি।"

কিন্তু আমি রাজি হই না। নিজে একা থাকাই ভাল মনে হয়, বলে বলি।

ওশিমা কপালে এসে পড়া সামনের চুল পেছনে ঠেলে দেয়। একটু ইতস্তত করে বলে, "আমি জানি আমি একজন সমকামি, যৌন প্রতিবন্ধী, গে স্ত্রীলোক, অদ্ভুত মানুষ, সেই কারণে যদি তোমার কোনো উদ্বেগ তৈরি হয়—"

"আরে, মোটেই তা নয়", আমি বলি। "তা নয়। আমি কেবল আজ রাতটা সুস্থির ভাবে ভেবে দেখতে চাই। এতকিছু একসঙ্গে ঘটে বসল বলে। আর কিছু না।"

ওশিমা মেমো লেখার কাগজে ফোন নম্বর লিখে দেয়। "রাতে কথা বলতে চাইলে, এখানে ফোন কোরো। আজ রাতে তো আর তেমন ঘুম আসবে না"। আমি বিদায় সম্ভাষণ করি।

সেই রাতে আমি ভুত দেখলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২২

যে ট্রাকটাতে নাকাতার চড়ে বসেছিল, সেটি কোবে শহরে যখন ঢুকল সকালে, তখন ৫টা বেজে গেছে, রাস্তাঘাট ভালোরকম আলোকিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মাল নামিয়ে রাখার গুদাম তখনও খোলেনি। দুজনে বন্দরের কাছেই চওড়া রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে। সেখানে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া মনস্থ করল। সেই তরুণ ঘুমোনোর জন্য পেছনের সীটে গিয়ে শুয়ে পড়ে, মনের সুখে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। মাঝেমাঝে ওর নাক ডাকার আওয়াজে নাকাতা চোখ খুলে ফেলছিল বটে, আবার তক্ষুনি সুখনিদ্রার মধ্যে ফেরত চলে যাচ্ছিল। ঘুম না হওয়া বলে ব্যাপারটা, যেসব অভিজ্ঞতা নাকাতার এযাবৎ হয়নি, তার একটা।

তরুণ উঠে পড়ে বিরাট করে হাই তুলল যখন, তখন ৮টা বাজতে কিছু বাকি।

"এই যে, কাকু, খিদে পেয়েছে?" ইলেক্ট্রিক শেভার দিয়ে পেছনের আয়নার সামনে দাড়ি কাটতে কাটতে তরুণ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, নাকাতারও অল্প খিদে খিদে পাচ্ছে।"

"তাহলে, কাছেই কোথাও সকালের খাবারটা খেতে যাওয়া যাক"

ফুজিগাওয়া থেকে রওনা দিয়ে কোবেতে পৌঁছোনো অবধি গাড়ির মধ্যে নাকাতা অধিকাংশ সময়টাই ঘুমোচ্ছিল। সেই তরুণও তখন বেশি কথা না বলে, রেডিওর মাঝরাতের প্রোগ্র্যাম শুনতে শুনতে গাড়ি চালাচ্ছিল। মাঝেমাঝে রেডিওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানও গাইছিল। সেসব গান একটাও নাকাতা কখনো শোনেনি। জাপানিতেই গান কিনা কে জানে, নাকাতা গানের কথাগুলো খুব একটা বুঝতে পারেনি। এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে দু'একটা শব্দ ধরতে পেরেছে মাত্র। নাকাতা ব্যাগের ভেতর থেকে আগের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিন শিনজুকুতে সেই দুই অল্পবয়েসি মহিলা কর্মীর থেকে পাওয়া চকোলেট আর প্যাক করা ওনিগিরি বের করে, সেটা সেই তরুণের সঙ্গে দু'জনে ভাগ করে খেল।

সেই তরুণ আবার ঘুম কাটানোর নামে অবিরাম সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে কোবে পৌঁছোতে পৌঁছোতে নাকাতার জামায় কাপড়ে সবটায় সিগারেটের গন্ধ সেঁধিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে নাকাতা ট্রাক থেকে নেমে এল।

"আরে, ওরকম ভারি জিনিস গাড়িতেই রেখে চলুন। কাছেই তো, খাওয়া হয়ে গেলেই আবার ফিরে আসব তো", তরুণ বলে।

"হ্যাঁ। আপনি যা বলবেন, কিন্তু এগুলো সঙ্গে না থাকলে নাকাতা স্বস্তি পায়না।"

"হুমম্", বলে তরুণ চোখ কোঁচকায়। "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাকে তো আর বইতে হচ্ছে না, আপনার যেমন সুবিধে।"

"অনেক ধন্যবাদ।"

"আমার নাম হোশিনো। চু-নিচি ড্রাগনের ম্যানেজার ছিল যে হোশিনো, সেভাবেই লেখা হয়[1]। পারিবারিক পদবি নয় আর কি"

"হ্যাঁ। হো-শি-নো-সান, তাই তো? ভালো থাকবেন। আমি নাকাতা।"

"সে তো জেনেই গেছি, আগেই", হোশিনো বলে।

যেন এই এলাকা তার নখদর্পণে, এই ভাবে সেই তরুণ বড় বড় পা ফেলে আগে আগে হেঁটে চলল গন্তব্যের দিকে। নাকাতাকে ওর পেছন পেছন আসতে গিয়ে অর্দ্ধেক রাস্তাই দৌড়তে হল। তারপর দু'জনে গিয়ে একটা গলিরাস্তায় ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকল। দোকানটাতে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত খেটে

[1]চৈনিক হরফে জাপানি নাম লেখার রেওয়াজ। একই উচ্চারণে কী হরফ ব্যবহার করা হল, তার ওপর নির্ভর করে অর্থ পাল্টাতে পারে।

খাওয়া কর্মীদেরই ভিড়। টাই পরা লোক একজনও চোখে পড়ল না। খদ্দেররা সবাই, ঠিক যেন জ্বালানি ভরে নিচ্ছে এরকম অত্যন্ত সিরিয়াস ভাব করে সকালের খাবার খেয়ে নিচ্ছিল। বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকির আওয়াজ, সঙ্গে ওয়েটারদের কণ্ঠস্বর, সঙ্গে NHK টিভির সংবাদ পাঠকের গলার আওয়াজ দোকানের ভেতর গমগম করছিল।

তরুণ দেওয়ালে সাঁটা মেন্যুর দিকে নির্দেশ করল। "কাকু, খুশিমতো কিছু একটা অর্ডার দিন তো। এই জায়গাটা সস্তার ওপরে ভাল।"

"হ্যাঁ", বলে নিয়ে, নাকাতা শুনতে শুনতেই দেওয়ালে মেন্যুর দিকে খানিক তাকাল বটে, পরক্ষণেই নিজে যে পড়তে পারে না সেটা ওর মনে পড়ে গেল।

"মাফ করবেন, হোশিনো-সান, নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি কম তো, কিছু লেখা থাকলেও পড়তে পারে না।"

"হুমম্" হোশিনো চিন্তিত মুখে বলে। "তাই নাকি? লেখা থাকলে পড়তে পারেন না? এরকম তো আজকাল দেখা যায় না খুব একটা। সে ঠিক আছে, আমি নেব গ্রিল্ড ফিশ আর ওমলেট, আপনার তাতে চলবে?"

"হ্যাঁ, গ্রিল্ড ফিশ, ওমলেট, দুটোই নাকাতার ভাল লাগে।"

"তাহলে তো খুবই ভাল।"

"অবশ্য ঈল্ মাছও ভাল লাগে।"

"উমম্। ঈল্ অবশ্য আমারও ভাল লাগে। কিন্তু সকাল থেকেই ঈল দিয়ে শুরু করা ঠিক না"

"হ্যাঁ। তার ওপরে, কাল রাতেও হাগিতা-সান বলে ভদ্রলোক ঈল্ মাছ খাইয়েছিলেন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তাহলে তো ঠিকই আছে", সেই তরুণ বলে। তারপর দোকানের কর্মচারীকে হাঁক পেড়ে বলে, "গ্রিল্ড ফিশ আর ওমলেট, দু'প্লেট। একটায় বেশি ভাত!"

"গ্রিল্ড ফিশ আর ওমলেট, দু'প্লেট। একটায় বেশি ভাত!" ওদিক থেকেও চেঁচিয়ে আরেকবার বলা হল।

"আচ্ছা, পড়তে পারেন না বলে মুশকিলে পড়েন নিশ্চয়ই?" তরুণ নাকাতার থেকে জানতে চায়।

"হ্যাঁ, পড়তে না পারলে, মাঝেমাঝে খুব মুশকিলে পড়তে হয়। টোকিও শহরের নাকানো-কু থেকে বাইরে না বেরোলে মুশকিল তেমন নেই, কিন্তু এই এখনকার মত নাকানো-কু'র বাইরে এসে পড়লে, নাকাতার খুব মুশকিল হয়।"

"সেই তো। আর কোবে তো নাকানো-কু থেকে অনেকটা দূরে!"

"হ্যাঁ। উত্তর-দক্ষিণও বুঝতে পারি না। শুধু ডান আর বাম বুঝতে পারি। এতে রাস্তা হারিয়ে ফেলি, টিকিট কাটতেও পারি না।"

"কিন্তু সেই নিয়েও দিব্যি এই অবধি এসে পড়েছেন তো!"

"হ্যাঁ। নাকাতা নানা জায়গায় নানাজনের থেকে সদাশয় সহায়তা পেয়েছে। হোশিনো-সানও তাঁদের একজন। আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।"

"পড়তে না পারলে তো খুব মুশকিল। আমার দাদুর কথাই ধরুন না কেন, ভিমরতিতে ধরে মাথাটা সত্যি গেছিল, কিন্তু পড়তে পারত।"

"হ্যাঁ, নাকাতারই বিশেষ করে মাথাটা নিরেস।"

"বাড়ির সবাই কি এরকম?"

"না, তা নয়। বড়োভাই ই-তো-ও-চু বলে এক জায়গায় ডি-পার্ট-মেন-টাল-হেড। ছোটজন, আভ্য-ন্ত-রীণ বা-ণিজ্য-মন-ত্রকের সরকারি আপিসে চাকরি করে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"অ্যাঁ!" ভাবিত হয়ে পড়ে সেই তরুণ তখন বলে, "দারুণ মাথা তো। তাহলে শুধু কাকুই একটু ছিটেল।"

"হ্যাঁ। শুধু নাকাতাই মাঝে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে, মাথাটা আর ভাল নেই। তাই ভায়েরা—ভাইঝিদের কিংবা ভাইপোদের বিরক্ত কোরো না, লোকের সামনে বেশি এসো না, বলে সবসময় সাবধান করে দেয় আমাকে।"

"সে তো, আপনার মতো উদাসীন মুখ করে থাকলে, সাধারন লোকের সেটা তেমন পছন্দ হবে না বলে।"

"কঠিন জিনিস নাকাতা ভালো বোঝে না, কিন্তু কোনভাবে নাকানো-কু'র ভেতরে যতদিন কাটিয়ে দিতে পেরেছে, রাস্তা টাস্তা না হারিয়েই থেকে গিয়েছিল। গভর্নরেরও সাহায্য পেয়েছে, বেড়ালদের সঙ্গেও ঠিকমত মিশতে পেরেছে। মাসে একবার চুল কেটে, মাঝেমাঝে ঈল্ মাছও খেতে পেরেছে। কিন্তু জনি ওয়াকার-সান এসে হাজির হতেই, নাকাতার আর নাকানো-কু'তে থাকা হল না।"

"জনি ওয়াকার?"

"হ্যাঁ, লং-বুট পরা, কালোরঙের লম্বাটে টুপি মাথায় একটা লোক। ওয়েইস্ট কোট পরা, হাতে স্টিক। বেড়াল জড়ো করে আত্মাটা বের করে আনে।"

"সে না হয় হল", হোশিনো বলে। "গল্প বেশি লম্বা হলে আমিও বেকায়দায় পড়ি। এতে করে কোনোভাবে, এটা সেটা হয়ে আপনি নাকানো-কু থেকে বেরিয়ে এলেন।"

"হ্যাঁ। নাকাতা নাকানো-কু থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।"

"তো, এখন আপনি কোথায় যাবেন?"

"সেটা নাকাতা এখনও ভাল জানে না। কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম যে এখান থেকে আবার ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে। কাছেই কোথাও আছে সেই বড়ো ব্রিজ।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তবে কি শিকোকুতে যাওয়ার কথা বলছেন?"

"মাফ করবেন, হোশিনো-সান, নাকাতা ভূগোল ভাল জানে না। ব্রিজ পেরোলে কি শিকোকু?"

"হ্যাঁ, শিকোকু। এই অঞ্চলে বড়ো ব্রিজ বলতে, শিকোকু যাওয়ার ব্রিজ। তিনটে আছে, একটা কোবে থেকে আওয়াজিশিমা পেরিয়ে তোকুশিমা অবধি যাওয়ার ব্রিজ। আরেকটা কুরোশিকির নিচের দিক থেকে সাকাইদে পেরোবার ব্রিজ। এছাড়া ওনোমিচি আর ইমাবারিকে যুক্ত করেছে এরকম একটা ব্রিজও আছে। একটা থাকলেই ওটা দিয়ে সময় মত চলে যাওয়া যেত, কিন্তু রাজনীতিকরা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তেই তিন তিনটে তৈরি হয়ে গেছে।"

তরুণ কাপ থেকে একটু জল টেবিলের সিন্থেটিক উপরিতলে ঢেলে, আঙুল দিয়ে একটা মোটামুটি জাপানের ম্যাপ আঁকল। তারপর শিকোকু আর হোনশু-র মধ্যে তিনটে ব্রিজ টানলো।

"এগুলো কি খুব বড়ো ব্রিজ?"

"ওরে বাবা, খুবই বড়ো।"

"ও তাই? নাকাতা এগুলোর কোনটা পার হয়ে দেখবে সেটাই ভাবছি। সম্ভবত এর মধ্যে যেটা কাছে, সেই ব্রিজটাই হবে বলে মনে হয়। পরেরটুকু গিয়ে ভাবা যাবে'খন।"

"তার মানে, যেখানে যাবেন সেখানে নাকাতা-সানের চেনা পরিচিত কেউ আছে, এমন নয়।"

"হ্যাঁ। নাকাতার চেনা পরিচিত বলে বলা যায় এরকম একেবারেই কেউ নেই।"

"কেবল ব্রিজ পেরিয়ে শিকোকুতে গিয়ে, সেখানে কোথাও একটা গিয়ে দেখতে হবে, এই তো?"

"হ্যাঁ, সেরকমই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সেক্ষেত্রে, সেই কোথাও একটা যে কোথায় সেটাও জানা নেই।"

"হ্যাঁ। নাকাতার পুরোটা জানা নেই। মনে হয় ওখানে গিয়ে পড়লে বুঝতে পারব হয়ত।"

"সেরেছে রে!", হোশিনো বলে ওঠে। এলোমেলো চুল ঠিক করে নিয়ে, পনি-টেইলটা এখনো আছে কিনা দেখে নিয়ে, আবার চু-নিচি ড্র্যাগনস টুপিটা পরে নেয়।

একসময় গ্রিল্‌ড ফিশের প্লেট নিয়ে আসায়, দুজনে নিঃশব্দে খেতে থাকে।

"ওহ্, ওমলেটটা দারুণ খেতে তো!" হোশিনো বলে ওঠে।

"হ্যাঁ। খেতে খুব ভাল। নাকানো-কু'তে নাকাতা সবসময় যে ওমলেট খেত, তার থেকে অনেক অন্যরকম।"

"এটা কানসাই অঞ্চলের ওমলেট। টোকিওর ওরকম বসার গদীর মতো দেখতে স্বাদহীন জিনিস নয়, আলাদা ব্যাপার।"

দুজনে এরপর চুপচাপ ওমলেট খেয়ে, নুন দিয়ে গ্রিল করা হর্স ম্যাকারেল খেয়ে, অয়েস্টারের মিসোশিরু (সয়াবিন থেকে তৈরি তোওফুর স্যুপ) খেয়ে, শালগমের আচার খেয়ে, পালংশাকের একটা পদ খেয়ে, নোরি (সামুদ্রিক উদ্ভিদ শুকিয়ে তৈরি) খেয়ে, তার সঙ্গে গরম ভাত একটি দানাও না রেখে উদরসাৎ করল। নাকাতা প্রত্যেক গ্রাস গুনে গুনে ৩২ বার করে চিবোলো বলে, পুরোটা খেয়ে উঠতে অনেকটা সময় লাগল।

"নাকাতা-সান, পেট ভরেছে?"

"হ্যাঁ। নাকাতার পেট ভরেছে। হোশিনো-সানের কেমন হল?"

"আমার পেট একেবারে ভর্তি, পাক্কা। একই সঙ্গে, এরকম সুস্বাদু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর পেট পুরে সকালের খাবার পেলে, মেজাজ এক্কেবারে খুশ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ। মন খুব ভাল হয়ে যাবে।"

"ইয়ে, প্রাতঃকৃত্য করতে হবে না?"

"হ্যাঁ, সেটাই, নাকাতার একটু একটু করে পেয়ে যাচ্ছে।"

"তাহলে করে আসতে পারেন। ওখানে ল্যাট্রিন আছে।"

"হো-শি-নো-সানের দরকার নেই?"

"আমি পরে ধীরেসুস্থে করব তাই এখন রওনা দেব।"

"আচ্ছা, ধন্যবাদ, তাহলে নাকাতা পায়খানা করে আসছে।"

"আরে, শুনুন, এত জোরে, সকলে শুনতে পায় এভাবে আর বলবেন না, অন্যান্য লোকেরা এখনও খাচ্ছে যে!"

"অপরাধ নেবেন না, নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই তো।"

"আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করে আসুন।"

"এরপর, দাঁতও কি একটু মেজে আসব?"

"আসুন, দাঁত মেজে আসুন। এখনও সময় আছে, খুশিমত করে নিন। কিন্তু, নাকাতা-সান, ছাতাটাতাগুলো রেখে গেলে ভাল হয় না? কেবল একটু পায়খানায় যাচ্ছেন তো।"

"হ্যাঁ, ছাতা রেখে আসছি।"

নাকাতা যখন ল্যাট্রিন থেকে ফিরে এল, হোশিনো তখন খাবারের বিল চুকিয়ে দিচ্ছে।

"হো-শি-নো-সান, নাকাতার কাছে যথেষ্ট পয়সা আছে, সকালের খাবারের জন্য নাকাতাই দাম দেবে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই তরুণ মাথা ঝাঁকায়। "আরে, ঠিক আছে, সামান্য জিনিসের জন্য। আমার দাদুর কাছে অনেক টাকা ধার হয়ে আছে। অনেক আগে, যখন বখে গেছিলাম।"

"হ্যাঁ। কিন্তু নাকাতা তো হো-শি-নো-সানের দাদু নয়।"

"সে তো একান্তই আমার সমস্যা, আপনি ভাববেন না ওই নিয়ে। আর কথা বাড়াবেন না।"

নাকাতা একটু ভেবে, সেই তরুণের দাক্ষিণ্য মেনে নিল। "অনেক ধন্যবাদ। খুব ভাল খাওয়া হল।"

"সাধারণ রেস্তোরাঁর ম্যাকারেল আর ওমলেট। এত বিনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু হয়নি।"

"কিন্তু হো-শি-নো-সান, ভেবে দেখলাম, নাকাতা অন্য সব্বার থেকে সাহায্য পেয়ে পেয়ে, নাকানো-কু থেকে বেরিয়ে ইস্তক, টাকা জিনিসটা প্রায় খরচই করেনি।"

"সে তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়", হোশিনো ভাবিত হয়ে বলে। "সহজে এরকম করে ওঠা যায় না।"

নাকাতা রেস্তোরাঁর লোককে অনুরোধ করে, সঙ্গে আনা ছোট্ট থার্মোফ্লাস্কে গরম চা ঢালিয়ে নিল। তারপরে সাবধানে সেই ফ্লাস্ক ব্যাগের ভেতর ভরে নিল।

ট্রাক যেখানে থামিয়ে রাখা ছিল সেই অবধি দু'জনে হেঁটে ফিরে এল।

"আচ্ছা, তাহলে এখন শুধু শিকোকু যাওয়ার ব্যাপার।"

"হ্যাঁ", নাকাতা বলে।

"আপনি শিকোকুতে যেতে চাইছেন কী করতে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সেটা নাকাতারও ভাল জানা নেই।"

"নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও নেই, কোথায় যাচ্ছেন তারও ঠিক নেই। অথচ যে করে হোক যেতে হবে।"

"হ্যাঁ। নাকাতা বড়ো একটা ব্রিজের ওধারে যাবে।"

"ব্রিজ পার হলেই, অনেক কিছুই আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু যতক্ষণ না সত্যি করে ব্রিজটা পার হচ্ছে, নাকাতার কিছুই জানা নেই।"

"হুমম্", সেই তরুণ বলে। "ব্রিজ পার হওয়াটা খুব জরুরি।"

"হ্যাঁ। ব্রিজ পার হওয়াটাই খুব জরুরি।"

"মুশকিল হল তো", হোশিনো মাথা চুলকায়।

তরুণ ট্রাক চালিয়ে, বয়ে আনা আসবাব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের গুদামে খালাস করতে চলে যায়। ততক্ষণ নাকাতা পোর্টের কাছেই ছোট একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসে সময়টা কাটিয়ে দেয়।

"কাকু, এখান থেকে নড়বেন না, কেমন?" তরুণ বলে রাখে। "ওইখানে বাথরুম, জল খাওয়ার জায়গাও আছে। সুতরাং দরকার মিটে যাবে। দূরে গেলে রাস্তা হারিয়ে ফেলবেন, একবার রাস্তা হারালে আর মূল জায়গায় ফিরে আসা যায় না।"

"হ্যাঁ। এটা যেহেতু নাকানো-কু নয়।"

"ঠিক তাই। এই জায়গাটা আর নাকানো-কু নয়। এখানেই বসে থাকুন, নড়বেন না এখান থেকে।"

"হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। নাকাতা এখান থেকে নড়বে না।"

"হ্যাঁ। আমি মাল সাপ্লাই দেওয়া সেরে আবার ফিরে আসব তো।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যেমন বলা হল, নাকাতা আর বেঞ্চি থেকে একপা'ও নড়ল না। বাথরুমেও গেল না। এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে সময় কাটিয়ে দেওয়া, নাকাতার পক্ষে কষ্টকর কিছু নয়। বলতে কী, সেটা ওর সবচেয়ে বড় ক্ষমতাগুলোর একটা।

বেঞ্চিতে বসে সমুদ্র চোখে পড়ে, অনেকদিন পরে সমুদ্র দেখা হচ্ছে। ছোটবেলায় কয়েকবারই বাড়ির সবার সঙ্গে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাওয়া হয়েছিল। সুইমিং কস্টিউম পরে ইয়োকোহামাতে জলক্রীড়াও করে এসেছে। ঝিনুক, শঙ্খ কুড়োতেও গেছে। কিন্তু সেইসব স্মৃতি ওকে খুবই অন্যমনস্ক করে তুলল। অন্য কোনো জগতে ঘটা ঘটনা বলে মনে হতে লাগল। তার পরে আর সমুদ্র দেখার কোনো স্মৃতি নেই।

ইয়ামানাশি জেলার পাহাড়ে সেই বিচিত্র ঘটনার পরে নাকাতা টোকিওর স্কুলে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসা, শারীরিক ক্ষমতা ফিরে আসা, এসবের যাবতীয় স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিল, সঙ্গে পড়ার কিংবা লেখার ক্ষমতা কিছুতেই আর ফিরল না। পাঠ্য বইও পড়তে পারত না, পরীক্ষাও দিতে পারত না। যা কিছু শিখেছিল সব নিঃশেষে খুইয়েছিল, বিমূর্ত কিছু ভাবার ক্ষমতাও বড়রকমের হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। তাতেও কোনোরকমে পাশটুকু করিয়ে দেওয়া হত। ক্লাসে যা পড়ানো হত, খুব একটা বুঝতে পারত না, বুঝতে না পারলেও ক্লাসের এক কোণে চুপ করে বসে থাকত কেবল। টিচার যেটা যেভাবে করতে বলতেন সেটা সেভাবে করত। কারুকে বিরক্ত করত না। ফলে টিচার অধিকাংশ সময়ই ওর উপস্থিতি ভুলেই থাকতে পারতেন। বলা যেতে পারে, 'অতিথি' কিন্তু 'বোঝা' নয়।

ও যে সেই অদ্ভুত 'দুর্ঘটনা'র কবলে পড়ার আগে পর্যন্ত অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল সেটা কিছুদিনের মধ্যেই সবাই ভুলে গেল। স্কুলের যাবতীয় উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান নাকাতাকে বাদ দিয়েই হত। বন্ধুও ছিল না। কিন্তু তাতে নাকাতা ক্ষুন্ন হত না। বরং কেউ ওকে ঘাঁটাচ্ছে না বলে, নিজের আলাদা জগতে খুশিমত মগ্ন হয়ে থাকতে পারত। স্কুলে যে কাজগুলোয় ও মগ্ন হয়ে যেতে পারত, সেগুলো ছিল, ওখানকার পোষা ছোট জীবজন্তুর (খরগোশ কিংবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছাগল) যত্ন নেওয়া, বাগানে ফুলের যত্ন নেওয়া, ক্লাসরুম পরিষ্কার রাখা, এইসব। মুখে হাসিটি লেগেই আছে, ক্লান্তিহীন ভাবে এইসব কাজে ডুবে থাকত।

শুধু স্কুলেই নয়, বাড়িতেও ওর কথা লোকের খেয়ালই থাকত না। বড় ছেলে পড়তে পর্যন্ত পারে না, পড়াশুনা ঠিকমত চালিয়ে যেতে পারবে না বুঝতে পেরে, শিক্ষায় উৎসাহী বাবা-মা ভাইয়েদের ওপর দৃষ্টি দিলেন, যারা স্বাভাবিক। নাকাতাকে খুব একটা খেয়ালই করতেন না। ওয়ার্ডের জুনিয়র হাইস্কুলে ওঠা সম্ভব নয় দেখে, প্রাইমারির পরেই নাগানোতে আত্মীয়ের বাড়িতে ওকে রেখে আসা হল। মা'র বাপের বাড়িতে। সেখানে কৃষিকাজ প্রশিক্ষণের স্কুলে ওকে দেওয়া হল। পড়তে পারেনা বলে ক্লাসের পড়ায় হিমশিম খেত, কিন্তু কৃষিপ্রশিক্ষণের হাতে কলমে কাজটুকু ওর পছন্দ হয়েছিল। স্কুলের ভেতর নির্যাতন ব্যাপারটা অত অসহ্য না হলে হয়ত নাকাতা ওভাবে কৃষির লাইনেই যেত। কিন্তু সহপাঠীরা কথায় কথায়, এই শহর থেকে আসা অচেনা ছেলেকে মারধোর করত। একবার এমন ভয়ানক ভাবে জখম হল (একদিকের কানের লতি থেঁতলে গিয়েছিল) যে দাদু দিদিমা ঠিক করল আর স্কুলে পাঠাবে না। অতএব বাড়িতেই কাজে সাহায্য করে সে বড়ো হতে লাগল। লোকের কথা মন দিয়ে শোনা বাধ্য ছেলে ছিল বলে দাদু দিদিমা খুব ভালবাসতেন।

এই সময়ই বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারা জিনিসটা ঘটে। বাড়িতে কয়েকটা বেড়াল পোষা হত, ওরা নাকাতার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে অল্পই কথা আদানপ্রদান হত, কিন্তু নাকাতা বিদেশি ভাষা শেখার মতো করেই দৃঢ় অধ্যবসায়ের সঙ্গে আরো সড়গড় হয়ে, একসময় বেশ দীর্ঘ বাক্যালাপে দক্ষ হয়ে উঠল। অবকাশ থাকলেই বাগানে গিয়ে বসে বেড়ালদের সঙ্গে গল্পগুজব করত। বেড়ালরা ওকে প্রকৃতি ও জগত সম্বন্ধে নানা কিছু শিখিয়েছিল। এটা সত্যি যে পৃথিবীটা কীরকম, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অধিকাংশটাই বেড়ালদের থেকেই শেখা।

পনের বছর বয়েস হতে, ও কাছেই আসবাব প্রস্তুতকারক সংস্থায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজে যোগ দেবে বলে ঠিক হল। ঠিক ফ্যাক্টরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলতে যা বোঝায় তা নয়, ছোট কাঠের জিনিস তৈরির দোকান যেন বা। লোকশিল্পে যে ধরণের আসবাব তৈরি হতে পারে, চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক এইসব তৈরি করে টোকিওয় চালান দেয়। কাঠের কাজ নাকাতার বেশ ভাল লাগল। উর্দ্ধতন তত্ত্বাবধায়ক ওকে বেশ পছন্দ করে ফেললেন, কারণ নাকাতা হাতের কাজে দক্ষ, খুঁটিনাটি দিকও অগ্রাহ্য করে না, মন দিয়ে খেয়াল রাখে, বেশি কথা বলে না আর যেটা কক্ষনো করে না, সেটা হল কোনওরকম অভিযোগ। ডিজাইন থেকে জিনিসটা ধরতে পারা, মাপজোকের হিসেব, এসব তার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এই কাজগুলো ছাড়া অন্য সব কাজ সে দিব্যি ভালোই পারে। বিভিন্ন পর্যায়ে একের পর এক কী করতে হবে সেটা ধরতে পারলেই সেটা সে ক্লান্তিহীন ভাবে নিরন্তর করে যেতে পারে। দু'বছর শিক্ষানবীশ থাকার পর ওখানে তার চাকরি পাকা হল।

যতদিন সে ওই কাজে ছিল ততদিনে তার বয়েস ৫০ ছাড়িয়েছে, এরমধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়নি, অসুস্থ হয়ে পড়ে ছুটি নেয়নি। ধূমপান করার কিংবা মদ্যপানের নেশা ছিল না, শুতে যেতে রাত করত না, অমিতাহারের প্রবণতা ছিল না। কখনো টিভি দেখেনি, কেবল সকালে শরীরচর্চার উপলক্ষ্যে রেডিও শোনা হত। দিনের পর দিন অবিরাম আসবাব তৈরি করে যাচ্ছিল। একসময় দাদু দিদিমা মারা গেলেন, তারপর বাবা-মা'ও গত হলেন। সবারই পছন্দের লোক ছিল নাকাতা, যদিও সে অর্থে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ ছিল না। সেটাই সম্ভবতঃ স্বাভাবিক। লোকে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও, দশ মিনিটের মধ্যেই আর প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যেত না।

কিন্তু নাকাতার কখনো একাকিত্ব বা অতৃপ্তির বোধ হয়নি। যৌন বাসনা অনুভব করেনি কখনো, কারো সঙ্গও কামনা করেনি তেমন। ও যে ঠিক অন্যদের মত নয় সেটা ধরতেই পেরেছিল। অন্য কারো নজরে না এলেও, ও খেয়াল করেছিল যে ওর ছায়াটা যেন একটু ফিকে, অন্যদের ছায়ার চেয়ে। একমাত্র বেড়ালরাই ওকে ঠিকমত বুঝতো। অবকাশের দিনে পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে বেড়ালদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দিনটা কাটিয়ে দিত। আশ্চর্যের ব্যাপার, বেড়ালদের সঙ্গে কথা বলার সময় কিন্তু বিষয়বস্তুর অভাব হত না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই আসবাব প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক যখন মারা গেলেন, নাকাতার বয়েস তখন ৫২। কিছুদিনের মধ্যেই সেই কাঠের কারখানা বন্ধ করে দিতে হল। এরকম অনুজ্জ্বল, বিমর্ষ, সাবেক ধাঁচের আসবাব আর আজকাল চলে না। কারিগরদের বয়েস হচ্ছিল অথচ নবীনেরা কেউ আর এসব কাজে আকৃষ্ট হয় না। দোকানটাও শুরুতে ছিল একটা ফাঁকা জমির মাঝখানে, এখন তাকে ঘিরে নতুন নতুন সব বসতবাড়ি উঠেছে, অভিযোগ আসছিল কারখানার আওয়াজ নিয়ে, কাঠের বর্জ্য চিলতে পুড়িয়ে ফেলার ধোঁয়া নিয়ে। মালিকের ছেলে কাজ করত শহরে এক অ্যাকাউন্টিং ফার্মে, এই ব্যবসা আর চালিয়ে যেতে সে উৎসাহী হল না। তাই বাবা মারা যেতেই সে এটিকে বিক্রি করে দিল এক স্থাবর সম্পত্তির কারবারিকে। সেও অবিলম্বে সেই কারখানার সমাধি ঘটিয়ে, জমি সমান করে, প্রোমোটারকে বেচে দিল। ছ'তলা বাড়ি উঠে গেল সেই প্লটে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার দিনই যাবতীয় অ্যাপার্টমেন্ট ক্রেতা পেয়ে গেল।

নাকাতার আর কাজ নেই। সংস্থার কিছু ঋণ ছিল, সেগুলো শোধ করতে গিয়ে অবসরের পর সামান্যই টাকা হাতে এল নাকাতার। এরপরে আর কোনও কাজ তার জোটেনি। নিরক্ষর, পঞ্চাশের ওপর বয়েস, যোগ্যতা বলতে পুরোনো ধাঁচের আসবাব বানাতে পারা যার কোনও বাজার নেই, এরকম লোককে কে কাজ দেবে?

৩৭ বছর টানা কাজ করে গেছে ফ্যাক্টরিতে, একদিনও ছুটি না নিয়ে, ফলে স্থানীয় পোস্ট-অফিসে তার কিছু টাকা জমেছিল। নিজের তেমন কিছুই খরচ ছিল না, তাই নতুন করে কাজ না পেলেও যে টাকা জমেছে তাতে বুড়ো বয়েসে স্বচ্ছন্দেই চলে যাওয়ার কথা ছিল নাকাতার। কিন্তু ও তো লিখতে পড়তে পারে না, তাই এক তুতোভাই, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী, ওর হয়ে অ্যাকাউন্টটা দেখাশুনা করত। এমনিতে মনটা ভাল, কিন্তু বুদ্ধি খুব গভীর ছিল না লোকটিরও। এক অতি অসৎ দালালের পাল্লায় পড়ে বদ পরামর্শে ও পীড়াপীড়িতে স্কি-ট্র্যাকের কাছে রিসর্ট ম্যানসনে টাকা লগ্নি করে ফেলে বড়রকম ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়েছিল। মোটামুটি একই সময়ে নাকাতারও কাজ চলে গেল, আর পাওনাদারদের ভয়েই হয়তো সেই ভাই তার পরিবারসুদ্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কেউ জানে না তারা কোথায়, এমনকি বেঁচে আছে কিনা।

পরিচিত একজনের সঙ্গে পোস্ট অফিসে গিয়ে নাকাতা দেখে, তার অ্যাকাউন্টে কেবল কয়েক মান[†] ইয়েনের বেশি পড়ে নেই। অবসরকালীন থোক টাকা যেটা পেয়েছিল, সেটাও এর অল্প কিছুদিন আগে জমা করেছিল, এবং এখন হাওয়া। অর্থাৎ হতভাগ্য নাকাতার কাজটাও গেল আর সেইসঙ্গেই হয়ে পড়ল কপর্দকশূন্য। আত্মীয়রা ওর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, কিন্তু কমবেশি ক্ষতি তো প্রত্যেকেরই হয়েছে এই তুতোভাইটির দয়ায়, কারুর থেকে টাকা ধার নিয়ে আর ফেরৎ দেয় নি, কেউ হয়তো গ্যারান্টার দাঁড়িয়েছিল। নাকাতার জন্য কেউ তেমন কিছু করে উঠতে পারল না।

শেষ অবধি নাকাতার দুই ভাইয়ের মধ্যে বড়োজন তখনকার মত ওর দায়িত্ব নিল। চাকরিসূত্রে বা অন্য কারণে একা থাকে এমন লোকেদের জন্য সেই ভাইয়ের নাকানোতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ছিল, যেটা তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সেখানে একটা ছোট একঘরের অ্যাপার্টমেন্টে সে নাকাতাকে থাকতে দিল। বাবা-মা নাকাতার জন্য যে পয়সাকড়ি রেখে গিয়েছিল (খুব বেশি নয়), সেগুলোর দেখাশোনার ভার সে নিল। এছাড়া টোকিওর নাগরিক পুরসভার থেকে দেওয়া মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটা ভাতার ব্যবস্থা সে নাকাতার জন্য করিয়ে দিল। ভাইয়ের 'দায়িত্ব' হিসেবে এটুকু পালিত হল। দৈনন্দিন কাজকর্ম সে নিজে নিজে একাই করে ফেলতে পারত, ঘরভাড়া আর জীবনধারণের অন্যান্য খরচ দিয়ে দিলে, অন্যের সাহায্য ছাড়াই সে চালিয়ে নিতে পারত।

দুই ভাইয়ের কারুর সঙ্গেই তেমন যোগাযোগ ছিল না। টোকিওতে ফিরে আসার পর ওরা দু'একবার দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু সেই শেষ। ওদের থেকে ৩০ বছরেরও বেশি দূরে দূরে থেকেছে, জীবনযাত্রাও পৃথক পরিবেশে। ভায়েদের তেমন বিশেষ টান ওর প্রতি ছিল না, আর তাছাড়াও নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে তারা তখন ব্যস্ত, মানসিক প্রতিবন্ধী ভাইয়ের জন্য আর তাদের আলাদা করে সময় হয়নি।

[†]১ মান ইয়েন হল ১০,০০০ ইয়েন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে নিরুত্তাপ ব্যবহারেও নাকাতার দমে যাওয়ার কিছু ছিল না। একা থেকে অভ্যস্ত নাকাতা বরং কেউ আগ বাড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হতে এলেই অস্বস্তিতে পড়ত। সেই তুতোভাই যে ওর টাকাগুলো নষ্ট করল, এতেও নাকাতার এতটুকু রাগ হয়নি। এটুকু বুঝেছিল যে যেটা ঘটেছে সেটা ভাল কিছু নয়, কিন্তু দমে যায়নি। রিসর্ট ম্যানসন সম্বন্ধে তার কোনোই ধারণা নেই, 'লগ্নি' করাই বা কী, 'ঋণ' নেওয়াই বা কেমন জিনিস, সে বোঝে না। তার জগতে পরিভাষার সংখ্যা খুবই সীমিত।

৫০০০ ইয়েন পর্যন্ত যেকোনো টাকার পরিমান সে ধারণায় আনতে পারে। তার ওপরে, ১০ মান কিংবা ১০০ মান কি ১০০০ মান, সব তার কাছে সমান। অনেক টাকা বই কিছু নয়। টাকা জমেছিল বটে, কিন্তু ও তো দেখেনি সেগুলো। ওরা বলেছিল, "এই এত আছে আপনার অ্যাকাউন্টে", বলে একটা সংখ্যা বলেছিল, কিন্তু সেটার তেমন পরিষ্কার অর্থ কিছু হয়না ওর কাছে। ফলে, যখন টাকাটা খোয়া গেল, ওর কখনো মনে হয়নি সত্যিকারের কিছু খোয়া গেছে বলে।

এভাবেই নাকাতা এক পরিতৃপ্ত জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল ভাইয়ের দেওয়া ছোট অ্যাপার্টমেন্টে, মাসে মাসে ভাতা পেয়ে, সিটি বাসের স্পেশাল পাস কাজে লাগিয়ে, কাছেই পার্কে গিয়ে বেড়ালদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। নাকানোর একাংশে সে তার নতুন জগত পেয়ে গেল। বেড়ালদের মতোই, কুকুরদের মতোই, সেও তার চৌহদ্দি নির্দিষ্ট করে নিল, একটা সীমারেখা, যার ওপারে বিশেষ পরিস্থিতি ভিন্ন সে কখনও যাবে না। ওটুকুর মধ্যে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সে নিরাপদ ও তৃপ্ত। কোনো কিছুতে রাগও হবে না, অসন্তুষ্টিও ঘটবে না। একাকিত্ব বোধ এসে ভর করবে না, ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠা, অথবা জীবনের অসুবিধের দিকগুলো নিয়ে, মুশকিলের দিকগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তাও নেই। দিন আসে, দিন যায়, দশ বছরেরও বেশ সময় ধরে, এই ছিল তার জীবন। আলস্য ভরে উপভোগ করছিল সবকিছু।

যতদিন না জনি ওয়াকার এসে উদয় হল।

নাকাতা বহুদিনই সমুদ্র দেখে না, নাগানো জেলায় কোনো সমুদ্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নেই, নাকানো-কু'তেও। এবার নাকাতা খেয়াল করে দেখলো যে বহুদিন ধরে সমুদ্রটা তার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। বলতে কি, এতগুলো বছর এটার কথা সে ভাবেইনি। এটা নিশ্চিত করতে নিজেই নিজের কাছে ক'বার মাথা ঝোঁকাল। টুপি খুলে হাতের তালু দিয়ে ছোট করে ছাঁটা চুলের মাথায় হাত বোলাল। তারপর আবার টুপিটা ঠিকমতো পরে নিয়ে সমুদ্র দেখতে লাগল। সমুদ্র সম্বন্ধে নাকাতার জ্ঞানের বহর হল, খুব বড়ো, এর মধ্যে মাছ থাকে, আর জলটা লবনাক্ত।

নাকাতা বেঞ্চিতে বসে, সমুদ্র থেকে বয়ে আসা বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে, শঙ্খচিলদের ওড়ার দৃশ্য দেখে, দূরে নোঙর করে রাখা জাহাজের দিকে তাকিয়ে ছিল। যতই দেখা যাক, ক্লান্তি আসে না। মাঝেমাঝে ধবধবে সাদা শঙ্খচিল পার্কে প্রথম গ্রীষ্মের সবুজ হয়ে গজানো ঘাসের ওপর নেমে আসছিল। রঙের সেই সাযুজ্য সত্যিই নয়নমনোহর। নাকাতা ঘাসের ওপর হাঁটতে থাকা একটা শঙ্খচিলকে উদ্দেশ্য করে পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু বলে দেখল, কিন্তু সেই শঙ্খচিল চোখ মেলে এক ঝলক ওর দিকে একটু তাকাল মাত্র, কোনো উত্তর করল না। বেড়াল চোখে পড়ছে না কোথাও। সেই পার্কে এসেছে এমন প্রাণী বলতে শঙ্খচিল আর চড়াই। থার্মোফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেতে খেতে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল, নাকাতা সযত্নে সঙ্গে রাখা ছাতাটা খুলল।

১২টার আগেই তরুণ হোশিনো ফিরে এল, ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে গিয়েছে। নাকাতা ছাতা গুটিয়ে, বেঞ্চে আদ্যন্ত একই ভঙ্গিতে বসে সমুদ্র দেখে যাচ্ছিল। মনে হয় ট্রাকটা কোথাও রেখে, সেই তরুণ ট্যাক্সিতে এসে হাজির হল।

"আরে, মাফ করবেন। খুব দেরি করে ফেললাম", তরুণ এসেই বলে। ওর কাঁধে ঝুলছে একটা বস্টন-ব্যাগ। "আরো অনেক তাড়াতাড়িই হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু নানারকম ঝঞ্ঝাট হয়ে... ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মাল সাপ্লাই দিতে গেলেই, সব জায়গায় একশোরকম বিরক্তিকর কথা বলার লোক কেউ একজন থাকবেই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

“নাকাতার কোনোই অসুবিধে হয়নি। এখানে বসে, কেবল সমুদ্রই দেখে যাচ্ছিলাম।”

“হুমম্”, তরুণ বলে। তারপর নাকাতা যেদিকে তাকিয়ে আছে সেই দিকে চোখ ফেলে। সেখানে খাঁড়ির নোংরা আবদ্ধ জল আর তেল ভেসে ওঠা সমুদ্র শুধু চোখে পড়ে।

“নাকাতা বহুদিন সমুদ্র দেখেনি।”

“ওমা, তাই?”

“শেষবার দেখেছি প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময়। সেবার নাকাতা এ-নো-শিমা বলে সমুদ্রের তীরে গিয়েছিল।”

“সে তো অনেক আগে।”

“তখন জাপান অন্য দেশের দখলে ছিল বলে, এ-নো-শিমার সমুদ্রের তীর ভরে ছিল অ্যামেরিকার মিলিটারিতে।”

“ধ্যুৎ, এটা সত্যি নয়।”

“হ্যাঁ। সত্যিই ছিল।”

“কী বলছেন!” সেই তরুণ বলে। “জাপান কখনো অ্যামেরিকার দখলে যেতেই পারে না।”

“কঠিন ব্যাপার নাকাতা বুঝতে পারে না। কিন্তু অ্যামেরিকার বড়ো বড়ো প্লেন ছিল। সেগুলো টোকিওতে অনেক বোম ফেলেছিল বড়ো বড়ো, আর তাই নাকাতা ইয়ামানাশি জেলায় চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল।”

“হুমম্, আচ্ছা বেশ। বেশি কথায় আমিও মুশকিলে পড়ি। তবে, এখন রওনা দিতেই হবে। যা ভেবে রেখেছিলাম তার চেয়ে দেরি হয়ে গেছে। এখন গড়িমসি করলে সন্ধে হয়ে যাবে।”

“আমরা কোথায় [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"শিকোকুতে। ব্রিজ পেরিয়ে যাব। এরপর শিকোকু যাবেন তো।"

"হ্যাঁ। কিন্তু হো-শি-নো-সানের কাজ—"

"সে ঠিক আছে। কাজের যাই হোক না, কিছু একটা করব ভাবলে, যা হোক কিছু হবে। এবার মন দিয়ে অনেকটা কাজ করলাম, একটু ক'দিন জিরিয়ে নেব বলেই ভাবছিলাম। আসলে আমি, এখন অবধি শিকোকু কখনো যাইনি। একবার দেখে এলে মন্দ হত না। তার ওপরে, কাকু পড়তে না পারলে টিকিট আমরা একসঙ্গে করলেই মজা হবে। আমি সঙ্গে জুটে গেলে কি বিরক্ত হবেন?"

"না না। নাকাতা একটুও বিরক্ত হবে না।"

"তাহলে সেরকমই ঠিক হয়ে রইল। বাসের সময়ও ভাল করে দেখে এসেছি। এবার একসঙ্গে শিকোকু যাওয়া যাক।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৩

সেই রাতে, আমি ভুত দেখলাম।

'ভুত' বলা ঠিক হচ্ছে কিনা, তা অবশ্য জানিনা। তবে, এটুকু অন্তত বলা যায় যে জীবিত কোনও প্রকৃত ব্যক্তি নন। এই বাস্তব পৃথিবীর কেউ নয়—একঝলক দেখলেই তা টের পাওয়া যায়।

কিছু একটা আশঙ্কা করে আমি দুচোখ খোলা রেখে, বাচ্চা মেয়েটাকে দেখলাম। সেই মাঝরাত্তিরে ঘরের ভেতরটা অদ্ভুতরকম উজ্জ্বল। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঢুকছে। শোয়ার আগে জানালার পর্দা টেনে দেওয়ার কথা, তবু এখন একেবারে পুরোটা খোলা। চাঁদের আলোর মধ্যে মেয়েটি স্পষ্ট অবয়বরেখার এক সিল্যুয়েট হয়ে, হাড়ের মত সাদা আলোয় ধৌত হচ্ছে।

ওর বয়েস আমার সমানই হবে, পনের কিংবা ষোলো। পনেরোই হবে। আমি একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করি। পনের বছর আর ষোলো বছর বয়েসের মধ্যে বড় ফারাক আছে। ছোটখাটো ছিপছিপে ফিগার, ভঙ্গীটা সুন্দর, অসহায় বলে মনে হবে না একেবারেই। চুলগুলো সোজা, ঘাড় অবধি লম্বা।

সামনের চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়ছে। চওড়া ঘেরের হালকা নীল রঙের ওয়ানপিস পরে আছে। সেটা খুব লম্বাও না, খাটোও না। জুতো বা মোজা, কিছুই পরে নেই। ওয়ানপিসের হাতার বোতাম ঠিকমত আটকানো। গোল বড় গলা, ঘাড়ের পেছনের আদলটা এত সুন্দর যে চোখ টানে। মেয়েটা ডেস্কে বসে, একহাতের ওপর চিবুকটা রেখে, দেওয়ালের একটা জায়গা দেখছিল। তারপর কী যেন ভাবছিল। তবে খুব কঠিন কোনো চিন্তা করছিল না বলেই মনে হয়। বলতে হয়, তেমন দূরের কিছু নয়, নিকট অতীতেরই কোনো উষ্ণ স্মৃতিতে ডুবে রয়েছে বলে দেখাচ্ছিল। মাঝেমাঝে খুবই মৃদু হাসির মত কিছু ফুটে উঠছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মুখে। কিন্তু চাঁদের আলোয় সেই ছায়ামূর্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি আমার এখান থেকে পড়ে ওঠা যাচ্ছিল না। আমি ঘুমের ভাণ করে রইলাম। ও ওখানে যাই করুক না কেন, আমি ব্যাঘাত ঘটাব না। শ্বাস চেপে চিন্তা ঝেড়ে ফেললাম।

মেয়েটি যে ‘ভুত’, তা আমি জানি। তবে, প্রথমত সে অসাধারণ সুন্দরী। শুধু যে দেখতেই সুন্দর, তা নয়, সবটা মিলিয়েই বাস্তব হওয়ার পক্ষে বড্ডই সুচারু। দেখে মনে হবে যেন অবিকলভাবে কারুর স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ। সেই নিখুঁত সৌন্দর্য আমার মধ্যে, কেমন যেন বিষাদ হেন অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। খুব স্বাভাবিক একটা অনুভূতি। স্বাভাবিক হলেও, সাধারণ কোনও পরিস্থিতিতে এরকম অনুভূতি হওয়ার নয়।

আমি বিছানায় সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে, শ্বাস বন্ধ করে শুয়ে আছি। ও ওদিকে ডেস্কে হাতের ওপর চিবুক রেখে সেই একই ভঙ্গীতে স্থির। মাঝেমাঝে হাতের মধ্যে চিবুকের অবস্থানটা একটু সরিয়ে, সেই অনুযায়ী মুখটা সামান্য এদিক ওদিক করে নিচ্ছে। ঘরের মধ্যে তখন নড়াচড়া বলতে ওটুকুই। চোখে পড়ল, জানালার ঠিক পাশেই ফুলে ছেয়ে ফেলা একটা গাছ চাঁদের আলোয় স্নান করে স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। বাতাস থেমে আছে। কোনো শব্দও কানে আসছে না। মনে হল যেন অজানিতে কখন মরে গেছি। মরে গিয়ে, মেয়েটার সঙ্গে একটা আগ্নেয়গিরির গহ্বরের গভীর হ্রদের নিচে তলিয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎই মেয়েটা হাত থেকে চিবুক সরিয়ে, হাতদু'টো কোলের ওপর রাখলো। স্কার্টের নীচে, দুটো ফর্সা ছোট হাঁটু পাশাপাশি। মেয়েটা এবার ঝট করে, কী যেন মনে পড়ে গিয়েছে, এই ভাবে দেওয়ালের থেকে চোখ সরিয়ে, ঘুরে এদিকে তাকাল। কপালে হাত এনে সামনের চুলগুলো ছুঁল। প্রকৃতই বাচ্চা মেয়ের মত সরু আঙুলগুলো, যেন কী একটা মনে করার চেষ্টা করছে এভাবে কিছুক্ষণ থেমে রইল। ও আমাকে দেখছে! হৃৎপিন্ডে জোরালো শব্দ হতে লাগলো আমার। কিন্তু, অদ্ভুত ব্যাপার, আমাকে কেউ দেখছে, এরকম বোধ হল না আমার। আমি নই, হয়তো আমার পেছনে কিছুর দিকে মেয়েটা তাকিয়ে আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা দু'জন যে আগ্নেয়গিরির গহ্বরের হ্রদে ডুবে যাচ্ছি, তার নিচে সব কিছু স্থির। আগ্নেয়গিরিটা বহুদিন হল মৃত বলে শোনা যায়। সেখানে নিঃসঙ্গতা নরম কাদার মতো স্তূপীকৃত হয়ে আছে। জলের স্তর ভেদ করে আসা মৃদু আলো, সুদূর স্মৃতির ক্ষীণ অবশেষের মত চারপাশ সাদা আলোয় আলোকিত করে রেখেছে। গভীর জলের তলদেশে জীবনের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। কতটা সময় ও আমাকে—কিংবা আমি যেখানে সেই জায়গাটাকে দেখছিল কে জানে। টের পেলাম যে সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলছি। সময় ওখানে মনের চাহিদা অনুসারে দীর্ঘায়িত হয়ে, স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। একসময় মেয়েটা কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খোলা নেই। কিন্তু মেয়েটা নিঃশব্দে তার মধ্য দিয়ে মিলিয়ে গেল।

তার পরেও আমি বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে রইলাম। চোখ অল্প ফাঁক করা, শরীরে কোনো নড়াচড়া নেই। মেয়েটা ফিরে আসতেও পারে। আমার সেরকমই মনে হল। প্রার্থনা করছি যেন ফিরে আসে। কিন্তু যতই অপেক্ষা করি না কেন, মেয়েটা ফিরে এল না। মুখ তুলে বালিশের কাছে অ্যালার্ম ক্লকের ফ্লুওরোসেন্ট কাঁটায় চোখ রাখলাম। ৩টে বেজে ২৫মিনিট। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে, মেয়েটা যেখানে বসেছিল সেই চেয়ারে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম। কোনো উষ্ণতা অনুভব করতে পারলাম না। ডেস্কের ওপরে খুঁজে দেখলাম। একগাছা চুলও কি পড়ে নেই? কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। চেয়ারটায় বসে ক'বার চিবুকে হাত ঘষে, লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ঘুম পাচ্ছে না। ঘর অন্ধকার করে দিয়ে বিছানার ভেতর ঢুকে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। সেই রহস্যময় মেয়ে, আমার মনকে অস্বাভাবিক রকম জোরালো ভাবে আকর্ষণ করছে, মন চলে যাচ্ছে ঐ দিকে। একদম প্রথমে আমি যেটা অনুভব করলাম, অন্য কিছুর সঙ্গেই কোনো মিল পাওয়া যাবে না এর, প্রবল শক্তিশালী কিছু একটা আমার মনের মধ্যেই জন্ম নিয়ে, সেখানেই শেকড় গেড়ে, পুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠছে, এরকম একটা অনুভূতি। পাঁজরের মধ্যে পুরে রাখা উত্তপ্ত হৃৎপিন্ডটা, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইচ্ছের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি না রেখেই সংকুচিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। প্রসারিত হচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে।

আরেকবার আলো জ্বেলে দিয়ে, বিছানায় জেগে বসে, ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম। বইও পড়তে পারছি না, গানও শুনতে পারছি না। কিছুই পারছি না। শুধু শরীরকে জাগিয়ে তুলে ভোরের অপেক্ষায় আছি। আকাশ ফর্সা হয়ে এলে, ক্রমে একটু ঘুম এল। ঘুমের মধ্যে আমি যেন কাঁদছিলাম। চোখ খুলে দেখি বালিশটা ঠান্ডা, ভিজে ভিজে। কিন্তু সেই অশ্রুপাত কীসের জন্য, তা জানা নেই।

৯টা বেজে যাওয়ার পর ওশিমা তার মাজদা রোডস্টারের আওয়াজ সহকারে এসে হাজির হতে, আমরা দু'জনে মিলে লাইব্রেরি খোলার আয়োজন করতে লাগলাম। সেটা হয়ে গেলে, আমি ওশিমার জন্য কফি বানালাম। ওশিমা বলে দিল কীভাবে বানাতে হবে। গ্রাইন্ডার দিয়ে কফি-বীনস গুঁড়ো করে, একটা স্পেশাল পট, যার ঢালার নলটা সরু, সেটায় ভাল করে গরমজল ফুটিয়ে নিয়ে, তাতে সামান্য ভিজতে দিয়ে, তারপর পেপার ফিলটারে অনেকটা সময় ধরে কফিটা ছেঁকে নিতে হবে। কফি তৈরি হলে, ওশিমা তাতে মাত্র একটুখানি, কিছু একটার চিহ্ন হিসেবে যেন, চিনি দিল। ক্রীম দিল না। এভাবেই সবচেয়ে সুস্বাদু করে নিয়ে কফি পান করতে হয় বলে ও দাবি করল। আমি আর্ল-গ্রে-র লাল চা বানিয়ে খেলাম। ওশিমা বেশ চকচকে চা-রঙের হাফ-হাতা শার্ট আর সাদা লিনেনের ট্রাউজার্স পরে আছে। পকেট থেকে একেবারে নতুন রুমাল বের করে আয়নাটা মুছেই, কী মনে করে থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

"দেখে মনে হচ্ছে তোমার যথেষ্ট ঘুম হয়নি", ও বলল।

"আমার একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে", আমি বলি।

"যেমনই হোক, বলে ফেল।"

"আমি 'সমুদ্রতটে কাফকা' শুনতে চাই। পাওয়া যাবে কি?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

" সিডি-তে হবে না?"

"সম্ভব হলে পুরোনো রেকর্ডই ভাল। পুরোনো দিনে যেমন শোনাত, তেমনটাই শুনতে চাই বলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রেকর্ড বাজিয়ে শোনার যন্ত্রও তো লাগবে।"

কপালে আঙুল ছুঁইয়ে ওশিমা চিন্তা করতে থাকে। "স্টোররুমে পুরোনো একটা স্টিরিও ছিল বলে মনে পড়ছে। চলবে কিনা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।"

গাড়ি রাখার জায়গার দিকে মুখ করা ছোট ঘরটাই স্টোররুম, অনেকটা উঁচুতে জানালার মত মাত্র একটা স্কাইলাইট ঘরটায়। সেখানে বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার হরেকরকম জিনিস এটা ওটা, এলোমেলো ভাবে মজুদ করা রয়েছে। আসবাবপত্র, খাবার জিনিস, ম্যাগাজিন, জামাকাপড়, ছবি... কিছু দামি জিনিস থাকলেও, বেশিরভাগই হাবিজাবি ছাড়া আর কিছু নয় (বরং সেগুলোই সংখ্যায় বেশি)। "একটা কখনো এই জায়গাটা পরিষ্কার না করালেই নয়, কিন্তু সেই ক্ষমতা আছে এমন লোক কোথায়?" ওশিমা দমে যাওয়া গলায় বলে।

কালপ্রবাহকে নিজের মধ্যে ধারণ করা সেই ঘরে আমরা সানসুইয়ের পুরোনো স্টাইলের স্টিরিও-কম্পোনেন্ট খুঁজে বের করলাম। যন্ত্রসভ্যতা যতদিনে বেশ গেড়ে বসেছে, তার সাম্প্রতিকতম পর্যায়টির আসার পরেও সম্ভবত পঁচিশটি বসন্ত যে পার হয়ে গেছে, এতে কোনও ভুল নেই। সাদা ধুলোর পাতলা আস্তরণ পড়ে গেছে। রিসিভার-অ্যামপ্লিফায়ার, অটোম্যাটিক রেকর্ড-প্লেয়ার, বুকশেলফ-স্পিকার—যন্ত্রটির সঙ্গে পুরোনো লং-প্লেয়িং রেকর্ডের কালেকশনও পাওয়া গেল। বীটল্‌স, রোলিং-স্টোনস, বীচ বয়েজ, সাইমন অ্যান্ড গারফাংকল, স্টিভি-ওয়ান্ডার... ১৯৬০-এর দশকে জনপ্রিয় হওয়া সব গানবাজনা। সব মিলিয়ে তিরিশটা মত। আমি রেকর্ডের ডিস্কগুলো জ্যাকেট থেকে বের করে দেখলাম। খুব সাবধানে যত্ন নিয়ে শোনা হয়েছে, কোথাও কোনো আঁচড়-টাচড় নেই। ছাতা পড়েনি।

স্টোররুমের ভেতরে গিটারও আছে। এখনও তার লাগানো আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আগে কখনো নাম শুনিনি এরকম সব পুরোনো ম্যাগাজিন ডাঁই করা রয়েছে—পুরোনো আমলের টেনিস র‍্যাকেট। জায়গাটা যেন একেবারে একটা নিকট অতীতের ধ্বংসাবশেষের মত দেখাচ্ছে।

"রেকর্ড, গিটার, টেনিস র‍্যাকেট, এগুলো সব ছিল সাএকি-সানের বয়ফ্রেন্ডের", ওশিমা বলে। "আগেও যেটা বলেছি, ও এই বাড়িতেই থাকত বলে, তখনকার ওর জিনিসপত্র সব জড়ো করে রাখা আছে বলে মনে হয়। স্টিরিওটা অবশ্য আরেকটু নতুন যুগের বলে মনে হচ্ছে।"

আমরা সেই স্টিরিও আর রেকর্ডের কালেকশন বয়ে ঘরে নিয়ে গেলাম। ধুলো ঝেড়ে, প্লাগ লাগিয়ে, প্লেয়ার আর অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে কানেকশন করে, সুইচ অন করলাম। অ্যামপ্লিফায়ারের পাইলট ল্যাম্প সবুজ হয়ে জ্বলে উঠে প্লেয়ার মসৃণভাবে ঘুরতে শুরু করল। ঘোরার গতিবেগ নির্দেশ করার স্ট্রোব অল্প কিছুক্ষণ এলোমেলো থেকে শেষে মনস্থির করে স্টেডি হয়ে গেল। কার্ট্রিজে তুলনামূলকভাবে ঠিকঠাক একটা পিন লাগানো আছে কিনা দেখে নিয়ে লাল প্লাস্টিকের ডিস্কে বীটল্‌সের 'সার্জেন্ট পেপারস লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড' টার্নটেবলে চাপালাম। সুপরিচিত গিটার ইনট্রো স্পিকার থেকে ভেসে এল। যা ভেবেছিলাম তার থেকে পরিষ্কার আওয়াজ।

"আমাদের দেশের শত সমস্যার মধ্যে, অন্ততপক্ষে এই শিল্পপ্রযুক্তির দিকটাকে সম্মান দেখানো উচিত", ওশিমা মুগ্ধভাবে বলল। "বেশ দীর্ঘসময় ধরে কোনো ব্যবহার হয়নি বলে আন্দাজ করছি, তবু দিব্যি ঠিকঠাক আওয়াজ বেরোচ্ছে"। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা 'সার্জেন্ট পেপারস লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড'-এ কান পাতলাম। এযাবৎ সিডি-তে শুনে আসা 'সার্জেন্ট পেপারস'-এর থেকে এটা আলাদা গান বলে মনে হল।

ওশিমা বলল, "এভাবে এই পুনরুজ্জীবিত যন্ত্রটি তো যোগাড় হল, কিন্তু 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র সিংগল-প্লে ডিস্ক খুঁজে বের করা একটু মুশকিলই হবে। অ্যাদ্দিনে বেশ দুর্মূল্য জিনিস হয়ে গেছে তো। বাড়িতে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। হয়তো ওঁর কাছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আছে। না থাকলেও, কার কাছে আছে বলতে পারবে হয়তো।"

সামনে মাথা ঝোঁকাই।

ওশিমা ছাত্রকে সাবধান করে দেওয়া মাস্টারমশাইয়ের মত করে, তর্জনি তুলে ধরে আমার সামনে। "তবে, একটা কথা, আগেও হয়তো বলেছি, ঐ গান সাএকি-সান এখানে থাকাকালীন কিছুতেই চালানো চলবে না। কিছুতেই না। বুঝতে পেরেছো?"

আমি আবারও মাথা ঝোঁকাই।

"ঠিক যেন 'কাসাব্লাঙ্কা' সিনেমাটার মত", ওশিমা বলে। তারপর 'অ্যাজ টাইম গোজ বাই' গানের মুখটা গুনগুন করে। "শুধু এই গানটাই চালিও না।"

"আচ্ছা, ওশিমা-সান, একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করছি", মনে পড়ে যাওয়ায় প্রশ্ন করলাম। "এখানে যাতায়াত করে এরকম কোনো পনেরো বছরের মেয়ে আছে?"

"এখানে! মানে, এই লাইব্রেরির কথা বলছ?"

মাথা ঝোঁকাই। মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে ওশিমা এই নিয়ে একটু ভাবল।

"আমি অন্তত যেটুকু জানি, তাতে বছর পনেরোর মেয়ে এ অঞ্চলে একজনও নেই", ও বলল। তারপর, ঠিক যেন জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিচ্ছে এইভাবে আমার মুখের দিকে একপলক দেখে নিল। "এরকম অদ্ভুত কথা আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"এরমধ্যে একবার যেন নজরে এল, তাই", আমি বলি।

"এরমধ্যে বলতে, কখন?"

"কাল রাতে।"

"গতকাল রাতে এ অঞ্চলে একটা বছর পনেরোর মেয়ে তোমার নজরে এসেছে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ।"

"কীরকম মেয়ে?"

আমি একটু লাল হয়ে গেলাম। "আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই। কাঁধ পর্যন্ত চুল, নীলরঙের ওয়ানপিস পরা।"

"সুন্দর দেখতে, মেয়েটা?"

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই।

"ওটা হয়তো তোমার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া ক্ষণিকের বিভ্রম", বলে ওশিমা চওড়া হাসি হাসল। "পৃথিবীতে নানারকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। তার ওপর এই ধরণের ব্যাপার তোমার মতো স্বাস্থ্যবান হেটেরোসেক্সুয়ালদের ক্ষেত্রে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই মনে হয়।"

পাহাড়ে ওশিমা যে আমাকে নগ্ন দেহে দেখে ফেলেছিল, সেকথা মনে পড়ে গিয়ে, মুখ আরো লাল হয়ে গেল।

মধ্যাহ্নের বিরতিতে ওশিমা চুপচাপ চৌকোণা খামে পোরা 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র সিংগল-প্লে ডিস্কটা আমার হাতে দিল।

"যা ভেবেছি তাই, মা'র কাছে ছিল। তার ওপর কী, একই জিনিস পাঁচখানা আছে। একেবারে, খুবই গোছানো লোক বলতে যা বোঝায়। কোনো কিছু ফেলে দিতে পারে না। বিরক্তিকর স্বভাব যদিও, এই ধরণের পরিস্থিতিতে খুব সুবিধে হয়। "

"ধন্যবাদ", কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলি।

ঘরে ফিরে রেকর্ডটা খাম থেকে বের করলাম। সম্ভবত একবারও ব্যবহার না করে কোথাও বন্ধ করে রাখা ছিল রেকর্ডটা, আশ্চর্যরকম নতুন! একেবারে প্রথমে আমি জ্যাকেটে ফোটোটা দেখলাম। ফোটোতে উনিশ বছরের সময়কার সাএকি-সানকে দেখা যাচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উনি রেকর্ডিং স্টুডিওতে পিয়ানোর সামনে বসে, ক্যামেরার লেন্সের দিকে চেয়ে। মিউজিক স্ট্যান্ডে গালে হাত দিয়ে, হালকাভাবে মাথাটা হেলিয়ে, একটু লাজুক, কিন্তু স্বাভাবিক স্মিত হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন। ঠোঁট ফাঁক না করে, খুশির চওড়া হাসি। ঠোঁটের কোণ অল্প কোঁচকানো, বেশ চার্মিং। এতটুকু প্রসাধন নেই। সামনের চুল যাতে কপালে এসে না পড়ে, প্লাস্টিকে ক্লিপ দিয়ে আটকানো। ডানদিকের কানের অর্দ্ধেক চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। ঝুলে খাটো, ঢিলেঢালা সাধারণ ওয়ানপিস, হালকা নীল রঙের। বাঁহাতের কব্জিতে সরু রুপোলি ব্রেসলেট। শরীরে ঐ একটিই অলঙ্কার। অনাবৃত পা, ভারি সুন্দর। পিয়ানোর চেয়ারের পায়ার কাছে খুলে রাখা আছে আভিজাত্যময় চটিজোড়া। ওঁকে যেন কিছুর একটা প্রতীকের মত দেখাচ্ছে। হয়তো কোনো একটা সময়ের, জায়গার প্রতীক। আবার কোনো এক ধরণের মানসিকতারও। হঠাৎ করেই একটা খুশির উপলক্ষ্য থেকে বেরিয়ে আসা স্পিরিটের মত দেখাচ্ছে। চির অমলিন, নাইভ এবং ইনোসেন্ট একটা মানসিকতা ওঁর চারপাশে বসন্তের পরাগের মত ফুটে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে। ফোটো'র মধ্যে সময় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। ১৯৬৯ সাল—আমি জন্মানোর অনেক আগের দৃশ্য। গতকাল রাতে ঘরে এসে হাজির হয়েছিল যে মেয়েটা, সে যে সাএকি-সান, আমি অবশ্যই সেটা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমি শুধু সেটা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলাম।

ফোটোর সাএকি-সান উনিশ বছর বয়েসে, পনের বছর বয়েসের চেয়ে চেহারায় সামান্য বড়ো হয়েছেন, পরিণতি এসেছে। মুখের আদলটা—নেহাত যদি তুলনা করতেই হয়—খানিকটা হয়তো তীক্ষ্ণ হয়েছে। সামান্য একটু উৎকন্ঠার ভাবটা যেন আর নেই। তবে, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, উনিশ বছরে আর পনের বছরে ফারাক তেমন নেই। ছবির স্মিত হাসি আর গতকাল রাতে দেখা স্মিত হাসি একইরকম, চিবুক হাতের ওপর রাখার ভঙ্গী, ঘাড় হেলানোর ভঙ্গী, সব একেবারে একই। এছাড়া, ঐ চেহারা, মুড, সবই পুরোপুরি এখনকার সাএকি-সান পেয়েছেন, যদিও সেটাই হওয়ারই কথা। আমি এখনকার সাএকি-সানের মুখের অভিব্যক্তি, হাবভাব, চলাফেরার মধ্যে, উনিশ বছরের সময়, পনের বছরের সময় ওগুলো কেমন ছিল তা হুবহু দেখতে পাচ্ছি। সেই ছিমছাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চেহারা, পরীর মত অলৌকিক, এখনও বজায় আছে। ফিগারও খুব একটা পাল্টায়নি। ভেবে ভাল লাগল।

তবে কিনা, রেকর্ডের জ্যাকেটে যে ফোটো, তাতে এখনকার মধ্যবয়েসি সাএকি-সানের থেকে যে জিনিসটা চলে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে, সেটা ধরা আছে। একধরণের উপচে পড়া প্রাণশক্তি। চোখে পড়ার মত দেখনদারি নেই তাতে। পাথরের ফাঁক দিয়ে অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসা স্রোতস্বিনীর পরিষ্কার জলের মত বর্ণহীন, স্বচ্ছ, যে কারুর হৃদয়ে যা সরাসরি পৌঁছে যায়, নির্ভেজাল স্বাভাবিক আবেদন। সেই প্রাণশক্তি, একটা আলাদা জ্যোতির মত হয়ে, পিয়ানোর সামনে বসা সাএকি-সানের সমস্ত দেহ থেকে উপচে পড়ছিল। ওঁর মুখে ফুটে ওঠা স্মিত হাসিতে চোখ পড়লেই সেই খুশি হওয়া মন যে মনোহর পথ অনুসরণ করে, তার আভাস পাওয়া যায়। জোনাকি অন্ধকারে আলোর রেখা এঁকে দিলে তার রেশ যেমন চোখের ভেতরে আটকে থাকে সেরকমই।

সেই জ্যাকেটের ফোটো হাতে নিয়ে আমি খানিক বিছানার ধারে বসে থাকি। কোনো কিছু না ভেবেই সময় বয়ে যেতে দিই। তারপর চোখ খুলে, জানালার কাছে গিয়ে বুক ভরে বাইরের বাতাসে শ্বাস নিই। বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ। পাইনের বন থেকে বয়ে আসা বাতাস। আমি গতকাল রাতে যা দেখেছিলাম, সেটা যে পের বছর বয়েসের সাএকি-সানের চেহারা এতে কোনো ভুল নেই। প্রকৃত সাএকি-সান অবশ্যই বেঁচে আছেন। পঞ্চাশোর্দ্ধ মহিলা হিসেবে এই বাস্তব পৃথিবীতে, বাস্তবের জীবন কাটাচ্ছেন। এই মুহূর্তেও ওঁর দোতলার ঘরে ডেস্কের সামনে কাজ করতে থাকার কথা। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই, সত্যিকারের ওনার সঙ্গে দেখা করা যায়। কথাবার্তাও বলা যায়। তা সত্ত্বেও আমি এখানে দেখলাম ওঁর ভুত। লোক একই সময়ে দু'জায়গায় থাকতে পারে না, ওশিমা বলেছিল। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটা ঘটা সম্ভব। আমার এতে বিশ্বাস জন্মেছে। মানুষ জীবিত অবস্থায়ই ভুত হয়ে যেতে পারে।

আর, যেটা তাৎপর্যপূর্ণ—সেই ভুত আমার মনকে আকর্ষণ করছে। বর্তমানে ওখানে রয়েছেন যে সাএকি-সান, তিনি নন, পনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বছরের যে সাএকি-সান এখন নেই, তার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হচ্ছে। তাও আবার প্রবলভাবে। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এত জোরে। বাস্তবে ঘটছে। ঐ মেয়েটার সম্ভবতঃ বাস্তবে অস্তিত্ব নেই বলে মনে হয়। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে জোরালো ভাবে যেটা ধড়াস ধড়াস করছে, সেটা আমার বাস্তবের হৃদযন্ত্র। সেই রাতে, আমার বুকে লেগে ছিল যে রক্ত, সেটা যেমন সত্যি ছিল, সেরকমই।

লাইব্রেরি বন্ধ করার সময় এগিয়ে আসতে, সাএকি-সান নেমে এলেন। সিঁড়ির গোল ঘেরা অংশটায় ওঁর জুতোর হিল প্রত্যেকবারই যে আওয়াজ তোলে, তাতে টের পাওয়া যায়। ওঁর মুখ চোখে পড়লেই আমার পেশি আড়ষ্ট হয়ে যায়, হৃদ্‌যন্ত্রের ধুকপুকুনি তক্ষুনি কান অবধি উঠে আসে। আমি সাএকি-সানের মধ্যে সেই ১৫ বছরের মেয়েটার চেহারা দেখতে পাই। মেয়েটা শীতঘুমে চলে যাওয়া ছোট প্রাণীর মত, সাএকি-সানের শরীরের মধ্যে ছোট্ট একটা ফাঁপা অংশে চুপিসারে ঘুমিয়ে আছে। আমি সেটা দেখতে পাই।

সাএকি-সান আমায় কিছু একটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আমি সেটার জবাব দিতে পারলাম না। প্রশ্নটার অর্থই ভাল করে ধরতে পারিনি। উনি যেটা বললেন, সেই কথাগুলো অবশ্যই আমার কানে ঢুকেছে। কানের পর্দায় স্পন্দন তুলে, মস্তিস্কে সেটা চালান করতে পেরে, কথায় রূপ দিল। কিন্তু কথাটা আর তার অর্থের মধ্যে যোগটা ধরতে পারিনি। আমি নার্ভাস হয়ে লাল হয়ে গিয়ে, অর্থ হয়না এমন কিছু কথা উচ্চারণ করলাম। পরিবর্তে ওশিমা ওঁর প্রশ্নের উত্তরটা দিল। আমি তাতে সায় দিয়ে সামনে মাথা ঝোঁকালাম। সাএকি-সান মৃদু হেসে, আমাকে আর ওশিমাকে বিদায়সম্ভাষণ করে ফিরে গেলেন। পার্কিং-লটে ওঁর ফোকসওয়াগেন-গলফের ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। ক্রমে দূর থেকে দূরে গিয়ে, একসময় মিলিয়ে গেল। ওশিমা থেকে যায়, আমাকে লাইব্রেরি বন্ধ করতে সাহায্য করতে।

"আচ্ছা, তুমি কি কারো প্রেমে পড়েছ?" ওশিমা বলে। "খুব অন্যমনস্ক থাকছ, দেখা যাচ্ছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উত্তরে কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে থাকি। তারপর আমি প্রশ্ন করি। "আচ্ছা, ওশিমা-সান, অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেস করছি হয়তো, মানুষ জীবিত অবস্থায় ভুত হয়ে গেছে, এরকম হয়?"

কাউন্টারের ওপরটা গোছাতে ব্যস্ত হাত থেমে যায়, ওশিমা আমার মুখের দিকে তাকায়।

"অত্যন্ত গভীররকম ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নটা সাহিত্যের দিক থেকে, অর্থাৎ উপমাত্মক অর্থে, মানুষের সত্ত্বা নিয়ে প্রশ্ন কি? না কি খুবই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত থেকে করা প্রশ্ন?"

"বোধহয় বাস্তব অর্থেই", আমি বলি।

"ভুত বাস্তবে আছে, এটা ধরে নিয়ে, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

ওশিমা চশমাটা খুলে, রুমাল দিয়ে মুছে, আবার পরে নিল।

"সেটাকে 'অতৃপ্ত আত্মা' বলা হয়। অন্য দেশের কথা জানি না, জাপানে এই জিনিসটি সাহিত্যকর্মে প্রায়ই এসে হাজির হয়। যেমন, 'গেনজি কথামালা'-র জগত অতৃপ্ত আত্মায় ভর্তি। হেইয়ান আমলে, নিদেনপক্ষে হেইয়ান আমলের লোকজনের মনোজগতে, লোকে কখনো কখনো জীবিতাবস্থায় আত্মা হয়ে দূরে দূরে চলে গিয়ে ইচ্ছাপূরণ করে নিতে পারত। পড়েছ, 'গেনজি কথামালা'?"

আমি মাথা নাড়ি।

"এই লাইব্রেরিতে কিছু আধুনিক অনুবাদ আছে ওটার, পড়ে দেখতে পার। যেমন, রাজকুমার গেনজি-র প্রেমিকা রোকুজো নো মিয়াসুদোকোরো, রাজকুমারের ধর্মপত্নী আওইনোউয়ে-র প্রতি প্রবল ঈর্ষাপীড়িত হয়ে, অশুভ আত্মা হয়ে মহিলার ওপর ভর করত। রাতের পর রাত আওইনোউয়ে-র শোওয়ার ঘরে চড়াও হয়ে, শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলল। আওইনোউয়ে-র গর্ভে ছিল গেনজি-র সন্তান, আর সেই খবর রোকুজোনোমিয়াসু-র ঘৃণার সুইচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন করে দিয়েছিল। রাজকুমার তো পুরোহিত ডাকিয়ে, পুজোপাঠ করিয়ে সেই অশুভ আত্মাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সেই আক্রোশ এতই জোরালো যে কোনোভাবেই তার মোকাবিলা করা ছিল অসম্ভব।

কিন্তু এই গল্পের সবচেয়ে গভীররকম ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা এখানেই যে রোকুজো-নো-মিয়াসুদোকোরো নিজে যে বেঁচে থাকতেই ভুত হয়ে যাচ্ছে এটা সে টের পাচ্ছে না। দুঃস্বপ্নে পীড়িত হয়ে চোখ খুললে, দীর্ঘ কালোচুলে ভুলে যাওয়া ধূপের গন্ধ মাখামাখি, সে এর কারণ বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ওটা ছিল আওই-নো-উয়ের জন্য করা পূজাপাঠে ব্যবহৃত ধূপের গন্ধ। এবার, সে নিজেই জানেনা কখন, সেই পরিসর অতিক্রম করে, অবচেতনার টানেলের ভেতর দিয়ে আওইনোউয়ের শোয়ার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে। 'গেনজি কথামালায়' এটা সবচেয়ে গা ছমছম করা থ্রিলিং দৃশ্যগুলোর একটা। রোকুজো-নো-মিয়াসুদোকোরো পরে, নিজের অজানিতে করে ফেলা কার্যকলাপের কথা জানতে পেরে নিজের কর্মফলের আশঙ্কায় মস্তক মুন্ডন করেন।

আমরা বলি উৎকট জগত, এককথায় আমাদের নিজেদেরই মনের অন্ধকারের ব্যাপার সেটা। উনবিংশ শতকে ফ্রয়েড ও ইয়ুং এসে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের অবচেতনে বিশ্লেষণের আলোকপাত ঘটানোর আগে, এই দুরকম অন্ধকারের আন্তঃসম্পর্ক লোকেরা আলাদা করে ভাবতে না পারার মতোই স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে ছিল। এমনকি একটা আরেকটার মেটাফরও ছিল না। আরো পিছিয়ে গেলে আন্তঃসম্পর্কও ছিল না। যতদিন না এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করল, জগতের একটা বড় অংশ আক্ষরিক অর্থেই গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল। তারপর সেই বাহ্যিক ভৌত অন্ধকার আর আভ্যন্তরীণ আত্মিক অন্ধকার, বিভাজনরেখা ব্যতিরেকে মিশে গিয়ে, একেবারে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে গেল—এইভাবে।"

ওশিমা দুহাতের পাতা দৃঢ়ভাবে একত্র করে।

"মুরাসাকি শিকিবু-র জীবিতাবস্থায়, জীবিত আত্মা জিনিসটা যেমন উৎকট ব্যাপার ছিল, সঙ্গে তেমনই বেশ স্বাভাবিকও ছিল, মনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিক থেকে। ঐ দু'রকমের অন্ধকারকে আলাদা আলাদা করে ভাবা, সেই সময়ের লোকেদের পক্ষে সম্ভবত অসম্ভব ছিল। কিন্তু আমরা এখন যে পৃথিবীতে আছি, সেটা আর সেরকম নেই। বহির্জগতের অন্ধকার পুরোপুরি দূর হলেও, অন্তরের অন্ধকার মোটামুটি সেভাবেই রয়ে গেছে। আমরা যেটাকে ইগো বা চেতনা বলে নাম দিয়েছি, হিমশৈলের মতোই, তার অধিকাংশটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে ডুবে আছে। এই বিচ্ছেদ, কখনো কখনো আমাদের মধ্যে গভীর স্ববিরোধ আর বিভ্রান্তির জন্ম দিয়ে বসে।"

"পাহাড়ে ওশিমা-সানের কেবিনের আশেপাশে সত্যিকারের অন্ধকার ছিল।"

"ঠিকই বলেছ, এখনও ওখানে সত্যিকারের অন্ধকার রয়ে গেছে। আমি মাঝেমাঝে শুধু অন্ধকার দেখার জন্য ওখানে যাই", ওশিমা বলে।

"মানুষ বেঁচে থাকতে ভুত হয়ে যাওয়ার উপায় কিংবা কারণ কি সবসময়েই এইরকম নেগেটিভ অনুভূতি?", আমি প্রশ্ন করি।

"এভাবে কেবল একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। কিন্তু আমার ভাসাভাসা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানে, আমি যতটুকু জানি তাতে, ওভাবে বেঁচে থাকতে ভুত হয়ে যাওয়াটা প্রায়শই পুরোটাই নেগেটিভ অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় বলেই মনে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ যেসব প্রবল অনুভূতি আঁকড়ে ধরে থাকে সেগুলো ব্যক্তিগত নেগেটিভ কিছু। আর বেঁচে থাকতে ভুত হয়ে যাওয়াটা, প্রবল অনুভূতিপ্রবণতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়। দুঃখের বিষয়, মানবজাতির শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিংবা তার যৌক্তিকতা বোঝার জন্য কেউ বেঁচে থাকতে ভুত হয়ে গেছে এমন উদাহরণ নেই।"

"আর, প্রেমের জন্য?"

ওশিমা চেয়ারে বসে পড়ে চিন্তায় ডুবে যায়।

"এ বড় কঠিন প্রশ্ন। আমি ঠিকমত উত্তর দিতে পারব না। কেবল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এটুকু বলতে পারি, তেমন কংক্রীট উদাহরণ কখনো চোখে পড়েনি। যেমন ধর, 'বৃষ্টি ও জ্যোৎস্না কথামালা'-র 'চন্দ্রমল্লিকার শপথ' গল্পটার কথা। পড়েছো?"

"উহুঁ", আমি বলি।

'বৃষ্টি ও জ্যোৎস্না' এদো আমলের শেষের দিকটায় উয়েদা আকিনারির লেখা। সেই যুগটা গৃহযুদ্ধের যুগ বলেই সাব্যস্ত হয়ে আছে। এই অর্থে উয়েদা আকিনারি খানিকটা, কী বলব, রেট্রো, নস্ট্যালজিয়াপ্রবণ মানুষ ছিলেন।

দুই সামুরাই পরস্পরের বন্ধু হয়ে, ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকারে পরস্পর আবদ্ধ হয়েছিল। সামুরাইদের কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কারণ, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানে জীবন পণ করা। ভবিষ্যতে একে অপরের জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত থাকা। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এমনই জিনিস।

দু'জন দূরে আলাদা আলাদা জায়গায় বাস করত, পৃথক প্রভুর হয়ে কাজ করত। এক সামুরাই কথা দিয়েছিল—চন্দ্রমল্লিকার ফুল যখন ফুটবে তখন যে করেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব। সেক্ষেত্রে, প্রস্তুত হয়ে তোমার অপেক্ষায় থাকব, অন্যজন কথা দিল। কিন্তু যে এসে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে সেই সামুরাই নিজের জমিদারির মধ্যে ট্রাবলে জড়িয়ে গিয়ে, আটকে পড়ে। বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। চিঠি পাঠানোর অনুমতিও মেলে না। ক্রমে গ্রীষ্ম চলে গেল, শরৎ ঘনিয়ে এল, চন্দ্রমল্লিকার ফুল ফোটার মরসুম এসে গেল। এই অবস্থায় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার শপথ পালন করতে পারছে না। সামুরাইদের কাছে শপথ পালন করাটা যেকোনও কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখাটা জীবনের চেয়েও দামি জিনিস। সেই সামুরাই তখন নিজের পেট কেটে আত্মা হয়ে হাজার মাইল দূরে ধেয়ে গিয়ে বন্ধুর বাড়িতে হাজির হল। তারপর চন্দ্রমল্লিকার সামনে বসে প্রাণভরে কথাবার্তা বলে, ওইভাবেই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মিলিয়ে গেল। খুব সুন্দর লেখা।"

"কিন্তু আত্মা হওয়ার জন্য মরতে তো হল।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তা বটে", ওশিমা বলে। "মানুষ বিশ্বাসের মর্যাদা, প্রেম কিংবা বন্ধুত্বের জন্য কিছুতেই জীবিতাবস্থায় ভুত হতে পারে না বলে মনে হচ্ছে। সেখানে মৃত্যুবরণ করা দরকার। বিশ্বাসের মর্যাদা, প্রেম কিংবা বন্ধুত্বের জন্য মানুষ প্রাণত্যাগ করে আত্মা হয়। জীবিতাবস্থায় ভুত হওয়া সম্ভব করতে পারে, আমি যেটুকু জানি তাতে, যেমনটা বললাম আর কী, কেবল অশুভ কামনা। নেগেটিভ আবেগ।"

আমি ভেবে দেখতে থাকি।

"তবে, তুমি যেটা বললে, পজিটিভ প্রেমের জন্য মানুষ জীয়ন্তে ভুত হওয়ার নিদর্শন আছে হয়তো। আমি খুব একটা বিশদে এটা নিয়ে বেশিদূর এগোইনি বলেই বলছি। হতেও পারে হয়তো", ওশিমা বলে। "ভালোবাসা এমন জিনিস, পৃথিবীটাকেই নতুন করে গড়ে দেয়, সেখানে যেকোনও কিছুই হওয়া সম্ভব।"

"আচ্ছা, ওশিমা-সান", আমি জানতে চাই। "আপনি কখনও প্রেমে পড়েছেন?"

বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে। "এই দ্যাখো, তুমি মানুষ সম্বন্ধে এই ভাবলে। আমি তারামাছও নই, গোলমরিচ গাছও নই। শরীরে রক্ত বইছে এমন মানুষ। প্রেম হয়েছিল বইকি।"

"সেই অর্থে বলিনি", আমি লাল হয়ে গিয়ে বলি।

"সে আমি বুঝতেই পেরেছি", ও বলে। তারপর অমায়িকভাবে মৃদু হাসে।

ওশিমা ফিরে গেলে পর আমি ঘরে ফিরে, স্টিরিও-সেটটার সুইচ অন করে দিয়ে, 'সমুদ্রতটে কাফকা' টার্নটেবলে চাপাই। ঘোরার স্পীড ৪৫ করে দিয়ে কার্টিজের পিনটা নামাই। তারপর গানের কথা লেখা লিরিক কার্ডটা পড়তে পড়তে গানটা শুনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সমুদ্রতটে কাফকা'

জগতের কিনারায় তুমি, কিনারায়
মৃত গহ্বরে আমি, এই আমি
আখরে তো ধরা নেই কথা, সেই কথা
দরজার ওধারে যে তারা।

টিকটিকি ঘুমিয়েছে জ্যোৎস্নার বুকে
ছোট ছোট মাছ ঝরে আকাশের থেকে
যোদ্ধারা বুক বেঁধে জড়ো
জানালার বাইরেই তারা।

(রিফ্রেইন)

সমুদ্রতটে বসে আছে, চেয়ারের পরে
সমুদ্রতটে কাফকা
পেন্ডুলামের কথা ভাবে, দোলনের কথা
জগৎটা দুলছে যে তাতে।
হৃদয়কে ঢাকাচাপা দিয়ে, ঢেকে রেখে
স্ফিংস আর যাবেই বা কোথা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছায়া শেষে ছুরি হয়ে গিয়ে

এফোঁড় ওফোঁড় করে তোমার সে স্বপ্নের কায়া।

প্রবেশের পাথরটা খোঁজে প্রাণপণ

ডুবন্ত মেয়েটার আঙুলের রেশ

তুলে নিয়ে নীল তার ঘাঘরার শেষ

দেখে সমুদ্রতটে কাফকা।

তিন তিন বার ফিরে ফিরে রেকর্ডটা শুনলাম। প্রথমেই মাথায় একটা সন্দেহের উদয় হল। এরকম লিরিকের একটা গান কী করে এক লক্ষেরও বেশি বিক্রি হওয়ার মত হিট হয়? এর কথাটা ঠিক দুর্বোধ্য বলে বলব না, খুবই প্রতীকাত্মক, সুররিয়ালিস্টিক দিকও আছে বেশ। অন্ততপক্ষে অনেক লোক যে অবিলম্বে গানটা তুলে নেবে আর তাদের মুখে মুখে ফিরবে এরকম নয়। কিন্তু বার বার শুনলে, লিরিকটা একটু একটু করে কেমন অন্তরঙ্গতার অনুরণন তুলে রেশ রেখে যায়। এর শব্দগুলো একটা একটা করে আমার মনে স্থান করে নিয়ে থেকে গেল। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। অর্থকে অতিক্রম করে ইমেজগুলো কাট-আউটের মত উঠে দাঁড়িয়ে থাকে, স্বতন্ত্রভাবে। একেবারে ঠিক যেমনটা হয় গভীর স্বপ্নের মধ্যে।

প্রথমত সুরটা চমৎকার। মনোরম সুরে এলোমেলো কিছু নেই। যদিও মোটেই মামুলি নয়। আর সাএকি-সানের কণ্ঠ, ওই সুরের সঙ্গে মানানসই ভাবে মিশে গেছে। পেশাদার গায়িকা হিসেবে দেখলে গলার ভল্যুম একটু কম, টেকনিক নিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু সেই গলা, বাগানে পা ফেলার পাথর ভিজিয়ে দেওয়া বসন্তের বৃষ্টির মত আমাদের চেতনাকে নরম করে ধুয়ে দেয়। শুরুতে উনি যন্ত্রানুষঙ্গ হিসেবে নিজে পিয়ানো বাজিয়ে গেয়ে, তারপর হয়তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোট ছোট কম্পোজিশনে স্ট্রিংস আর ওবো ভরাট করছিল। নির্ঘাত বাজেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এটার, সেই সময়ের পক্ষেও বড্ডই মামুলি অ্যারেঞ্জমেন্ট। তবে অতিরিক্ত কিছু জড়ো না করায়, বরং একটা বেশ ফ্রেশ এফেক্ট তৈরি হয়েছে।

এরপরে রিফ্রেইন অংশটায় দুটো আশ্চর্য কর্ড পাওয়া যাচ্ছে। যদিও অন্য কর্ডগুলো সবই বেশ সিম্পল এবং মর্মস্পর্শী, এই কর্ড দুটো দারুণ চমকে দেওয়ার মত অভিনব। প্যাটার্নটা এমনই, শোনামাত্র বুঝতে পারার মত নয়। প্রথমবার যখন শুনলাম, মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো অতিরঞ্জিত শোনাবে, এমনকি মনে হয়েছিল যেন আমাকে ঠকানো হল। এর অনুরণনে যে আকস্মিক অসঙ্গতি, আমার মনকে একটা ঝাঁকি দিয়ে অস্থির করে দিল। ঠিক যেন কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে কোথাও কোনও ফোঁকর দিয়ে একটা ঠান্ডা বাতাস বয়ে আসার মত। কিন্তু রিফ্রেইনটা শেষ হলেই, শুরুর সেই মনোরম সুর আবার এসে মূলের হারমনি ও অন্তরঙ্গতার জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ফাঁক ফোঁকর দিয়ে আর বাতাস ঢুকে আসে না। একসময় গান শেষ হয়ে, পিয়ানো শেষ একটা পর্দায় আঘাত করে, স্ট্রিংস শান্তভাবে সংগীতটা ধরে রেখে, ওবো সেটার রেশটা রেখে সুরটায় সমাপ্তি টানে।

ফের চালিয়ে শুনতে শুনতে, এই 'সমুদ্রতটে কাফকা' যে বহু লোকের হৃদয়হরণ করেছিল, তার একটা কারণ যেন, মোটামুটিভাবে হলেও, বুঝতে পারছিলাম। এতে আছে সহজাত প্রতিভা আর একটা আত্মভোলা ভাব, এই দুটোর অনাবিল ও শান্ত সমাহার। যা কিনা, 'বিস্ময়কর' কথাটা ব্যবহার করা যেতে পারে, এমনই নিখুঁত সমাহার। মফস্বল শহরে বাস করা একটা মেয়ে, দূরে কোথাও থাকা প্রেমিকের কথা ভেবে লিরিক লিখে, পিয়ানোয় বসে গান তৈরি করে, বাহুল্যবর্জিত ভাবে গেয়েছে। কারুকে শোনানোর জন্য নয়, কেবল নিজের জন্যই গান বেঁধেছে। নিজেরই মনটাকে আরেকটু উষ্ণতার ছোঁয়া দিতে। এই নিষ্পাপ সারল্যই লোকেদের নীরবে কিন্তু প্রকৃতই স্পর্শ করেছিল।

রেফ্রিজারেটারের ভেতরে যা ছিল তাই দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। তারপর আরেকবার 'সমুদ্রতটে কাফকা' টার্নটেবলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চাপালাম। চেয়ারে চোখ বুজে, ১৯ বছরের সাএকি-সান স্টুডিওতে পিয়ানো বাজাতে বাজাতে গানটা গাইছেন, দৃশ্যটা কল্পনায় আনলাম। ওঁর হৃদয়ের উষ্ণ আবেগ, প্রত্যাশার কথা ভাবতে থাকলাম। আর তারপর এক অর্থহীন হিংসাশ্রয়ী ঘটনায় সেই আবেগ, সেই প্রত্যাশার থেকে অকল্পনীয়ভাবে নিজেকে যে বিযুক্ত করতে হল, সেই নিয়ে।

রেকর্ড শেষ হয়ে, পিনটা উঠে জায়গায় ফিরে এল।

সাএকি-সান হয়তো এই ঘরেই 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র লিরিকটা লিখেছিলেন। রেকর্ডটা বারবারই শুনতে শুনতে আমার ক্রমেই এই বিশ্বাস যেন দৃঢ়তর হচ্ছিল। আর সমুদ্রতটে কাফকাই যে দেয়ালে ঝোলানো অয়েলপেন্টিং-এ ধরে রাখা ছেলেটা সেটাও। আমি চেয়ারে বসে, গতকাল রাতে মেয়েটা যেমন করেছিল, ঠিক সেইভাবে ডেস্কে হাতের ওপর চিবুক রেখে, একই কোণে দেওয়ালের দিকে চোখ ফেললাম। আমার দৃষ্টি গিয়ে ঠেকছে সেই অয়েলপেন্টিংটায়। মনে হয় কোনও ভুল হচ্ছে না। সাএকি-সান এই ঘরে বসে এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে, সেই কৈশোরের কথা কল্পনা করতে করতে 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র লিরিকটা লিখেছিলেন। সম্ভবত রাতের অন্ধকার সবচেয়ে যখন গভীর, সেই সময়ে।

দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে, খুব কাছ থেকে আরেকবার ছবিটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। ছেলেটার দৃষ্টি সুদূরে। সেই চোখ কানায় কানায় ভরে আছে এক রহস্যময় গভীরতায়। যে আকাশের দিকে চেয়ে আছে তার এক কোণে স্পষ্ট অবয়বের কয়েক খন্ড মেঘ দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় মেঘটাকে দেখতে গুঁড়ি মেরে বসা স্ফিংক্সের মতোই। স্ফিংক্স—আমি মনে করার চেষ্টা করি—যদি ভুল না হয়, এই স্ফিংক্সই ছিল যুবক ওইদিপাউসের কাছে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী। ওইদিপাউসকে দেওয়া হয়েছিল একটা ধাঁধা, সে সেটার সমাধান করেছিল। নিজে হেরে গেছে জানতে পেরে এই রাক্ষস, পাহাড়চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। ওইদিপাউস এই কীর্তির মাধ্যমে থেবাইয়ের সিংহাসনে আসীন হয়ে, সুন্দরী রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

এবার হল কাফকা নামটা—অনুমান করছি, ছবির মধ্যে ছেলেটার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে রহস্যময় বিচ্ছিন্নতা, কাফকার উপন্যাসের জগতের সঙ্গে সেটার যোগ আছে বলে হয়তো সাএকি-সানের মনে হয়েছিল। সেই কারণেই উনি ছেলেটাকে 'সমুদ্রতটে কাফকা' নাম দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্যহীন সমুদ্রতটে ঘুরে বেড়ানো একাকী একটি প্রাণ। হয়তো এটাই কাফকা শব্দটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

শুধু কাফকা নামটা কিংবা স্ফিংক্সের অংশটাতে নয়, লিরিকের কয়েকটা লাইনে, এমন কিছু আনা হয়েছে যা আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। 'ছোট ছোট মাছ ঝরে আকাশের থেকে' অংশটা, একেবারে হুবহু নাকানো কু-র দোকান বাজারের মহল্লায় সার্ডিন আর হর্স ম্যাকারেলের আকাশ থেকে ঝরে পড়ার ঘটনা। 'ছায়া শেষে ছুরি হয়ে গিয়ে/এফোঁড় ওফোঁড় করে তোমার সে স্বপ্নের কায়া' অংশটা যেন বাবা যে ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন সেই অর্থে লেখা। লিরিকটা লাইন ধরে ধরে লিখে নিয়ে, বারবার পড়লাম। বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো পেনসিল দিয়ে আন্ডারলাইন করলাম। কিন্তু শেষ বিচারে পুরোটা একত্রে এতই সাংকেতিক যে আমি ধন্দে পড়ে গেলাম।

'আখরে তো ধরা নেই কথা, সেই কথা / দরজার ওধারে যে তারা'
'প্রবেশের পাথরটা খোঁজে প্রাণপণ / ডুবন্ত মেয়েটার আঙুলের রেশ'
'যোদ্ধারা বুক বেঁধে জড়ো / জানালার বাইরেই তারা'

এইসব কথার কী যে অর্থ, কে জানে। আর যেগুলো মিলছে সেগুলো নেহাতই ইঙ্গিতে সমাপতন বই আর কিছুই নয় হয়তো। আমি জানালার কাছে গিয়ে বাইরের বাগানের দিকে তাকালাম। তরল অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। আমি রীডিংরুমের সোফায় বসে, তানিজানির অনুবাদে 'গেনজি কথামালা'টা খুলি। ১০টা বাজলে বিছানায় ঢুকে গিয়ে, বালিশের কাছের আলো নিভিয়ে, চোখ বন্ধ করি। তারপর পঞ্চদশী সাএকি-সানের এই ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

༺ দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য ༻

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রতটে কাফকা

২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় খন্ড

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪

কোবে থেকে ছেড়ে বাস যখন তোকুশিমা ষ্টেশনের সামনে এসে থামল, ঘড়ির কাঁটা ততক্ষণে রাত আটটা ছাড়িয়েছে।

“দেখুন, নাকাতা-সান, শিকোকু এসে গেছে!”

“হ্যাঁ। কী দারুণ ব্রিজ একখানা! এত বড় ব্রিজ নাকাতা এই প্রথম দেখল”, নাকাতা বলে ওঠে।

দুজনে বাস থেকে নেমে, ষ্টেশনের বেঞ্চিতে বসে, কিছুক্ষণ আর কিছু না করে চারপাশের দৃশ্য অবলোকন করতে থাকল।

“তাহলে, এরপরে কোথায় যাবেন, কী করবেন, কিছু বলা আছে আপনাকে”, সেই তরুণ জানতে চায়।

“না, আপাতত নাকাতার সেসব কিছু একেবারেই জানা নেই।”

“তবে তো মুশকিল হল।”

নাকাতা, যেন কী ভাবছে এইভাবে হাতের তালু দিয়ে অনেকক্ষণ নিজের মাথায় ঘষতে থাকে।

“হোশিনো-সান”, একসময় বলে।

“হ্যাঁ, বলুন!”

“অপরাধ নেবেন না, নাকাতার না ঘুম পাচ্ছে। খুব ঘুম পেয়েছে। এখানে এইভাবেই ঘুমিয়ে পড়বো বলে মনে হচ্ছে।”

“সামান্য একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ”, ঘাবড়ে গিয়ে সেই তরুণ বলে ওঠে। “এখানে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি মুশকিলে পড়ব। শিগগিরিই থাকার মতো একটা জায়গা খুঁজে নেব, একটু ধৈর্য ধরুন প্লীজ।”

“আচ্ছা। নাকাতা একটু ধৈর্য ধরে থেকে ঘুমোবে না বলেই ঠিক করেছে।”

“বাহ্! কিন্তু খা[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"খাওয়ার দরকার নেই। শুধু ঘুম পেয়েছে।"

হোশিনো নামে সেই তরুণ, ট্যুরিস্টদের খবরাখবর দেওয়ার ডেস্ক থেকে, সঙ্গে সকালের জলখাবার দেবে অথচ বেশি খরচ পড়বে না এরকম একটা অতিথিশালার খোঁজ বের করে, টেলিফোনে জেনে নেয় ঘর খালি আছে কি না। ষ্টেশন থেকে অতিথিশালা খানিকটা দূরে, তাই দুজনে ট্যাক্সি ধরে ওখানে গিয়ে পৌঁছল। তারপরে ঘরে ঢুকতেই তক্ষুণি পরিচারিকাকে বিছানা পেতে দিতে বলল। নাকাতা স্নানটান কিছুই না করে, পোশাক ছেড়ে বিছানায় উঠে চাদরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই গভীর প্রশান্তিতে নাক ডাকতে শুরু করল।

ঘুমোনোর আগে নাকাতা বলে নিয়েছে, "নাকাতা এখন বেশ অনেকক্ষণ ঘুমোবে সম্ভবত, চিন্তা করবেন না, কেবল ঘুমোচ্ছে, আর কিছু নয়।"।

"আরে, একদম ভাববেন না ও নিয়ে, যত খুশি ঘুমোন", সেই তরুণ তৎক্ষণাৎ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নাকাতাকে শোনানোর মতো করে গলা তুলে জানিয়ে দেয়।

হোশিনো নামে সেই তরুণ ধীরেসুস্থে স্নান সেরে, একাই এরপরে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আশেপাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটাহাঁটি করে শহরটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়ে, একটা সুশির দোকান চোখে পড়ে যেতে, সেটাতে ঢুকে পড়ল। এক বোতল বিয়ার খেয়ে নিয়ে তারপর খাওয়াদাওয়া সারল। খুব বেশি অ্যালকোহল সে নিতে পারে না, তাই মাঝারি মাপের এক বোতল বিয়ারেই তার মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠলো, গালে লাল আভা ধরলো। তারপর পাচিংকো† পার্লারে ঢুকে ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে ৩০০০ ইয়েন খরচ করল। এই পুরো সময়টা ও একটা চু-নিচি ড্রাগনস বেসবল-ক্যাপ†† পরে রইলো বলে বেশ কয়েকজনই কৌতূহল নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। তোকুশিমাতে চু-নিচি ড্রাগনস ক্যাপ পরে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোধহয় একমাত্র আমিই, সেই তরুণের তখন মনে হল।

অতিথিশালায় ফিরে দেখা গেল, সর্বশেষ যেভাবে অচৈতন্য অবস্থায় নাকাতাকে দেখা গিয়েছিল, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঘরে

† পিন ও বলের সমাহারে একরকম যান্ত্রিক খেলা যা জুয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

†† নাগোইয়া শহরের বেসবল দল চু-নিচি ড্রাগনস। এদের নামাঙ্কিত টুপি কিংবা শার্ট সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়।

~ www.amarboi.com ~

আলো জ্বলছিল, কিন্তু সেসব যে কোনোরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি, তা বোঝাই যাচ্ছিল। তরুণের মনে হল, লোকটা প্রকৃতই স্বস্তি পেয়েছে। সে তখন টুপি খুলে, আলোহা শার্ট, জীনস ছেড়ে, কেবল অন্তর্বাসটুকু পরে বিছানায় চাদরের নীচে ঢুকে পড়লো। তারপর আলো নিভিয়ে দিল। কিন্তু জায়গা বদলের জন্যই কিনা, মনটা উচাটন হয়ে আছে বলে একদমই ঘুম আসছিল না। এর চেয়ে বরং নৈতিকতার বালাই না রেখে একরাত কোনো মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে এলেই ভাল হত বলে ওর মনে হল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে প্রশান্ত ভাবে ঘুমন্ত নাকাতার ঐ ব্যতিক্রমহীন শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে শুনতে তার মনে হল, এই যে তার যৌন আকাঙ্খা কবলিত হওয়া, এটা যেন একটা খুবই বিদঘুটে কাজ হচ্ছে। পতিতালয়ে গেলে ভাল লাগত, এ ধরণের চিন্তার যে আদৌ উদয় হয়েছিল, এতেই সেই তরুণ লজ্জিত হয়ে পড়ল, যদিও এরকম লাগার কারণ সে নিজেও ভাল বুঝল না।

ঘুম আসছে না, এই অবস্থায় অন্ধকারে ঘরের ছাতের দিকে তাকিয়ে, এক অপরিচিত এবং একটু অদ্ভুত প্রবীণের সঙ্গে দুজনে মিলে তোকুশিমা শহরের এক শস্তার অতিথিশালায় যে সে রাত কাটাচ্ছে, নিজের এই অস্তিত্বে ধীরে ধীরে তার কেমন আস্থা নড়ে যাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে তার আজ রাতে টোকিও যাওয়ার ফিরতি মেইল চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকার কথা। এই সময় নাগাদ তার সম্ভবত নাগোয়ার আশেপাশে কোনও জায়গা দিয়ে যাওয়ার কথা। কাজ করতে তার মোটেই খারাপ লাগে না, তার ওপর টোকিওতে গিয়ে ফোন করলেই এসে দেখা করবে এমন মেয়ে বন্ধুও আছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মাল ডেলিভারি সেরে সে একরকম হঠাৎ করেই, কী মনে হয়ে, কোবেতে পরিচিত অন্য ড্রাইভারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, আজ রাতে টোকিও যাওয়ার ড্রাইভারের কাজ ওর হয়ে অন্য কেউ করে দেবে এমন ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অফিসে ফোন করে, একরকম জোর করেই তিন দিনের ছুটি আদায় করে, সেই যাত্রাপথেই নাকাতার সঙ্গে শিকোকু এসে পড়েছে। ছোট একটা ব্যাগের ভেতর, আপাতত শুধু পালটানোর মত পোশাক আর কিছু টয়লেটরি রয়েছে।

প্রথমটায় হোশিনো যে নাকাতার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিল, সে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেবল নাকাতার চেহারায়, কথা বলার ধরণের সঙ্গে তার প্রয়াত ঠাকুর্দার মিল পাওয়া যাচ্ছিল বলে। কিন্তু খানিক বাদেই, ঠাকুর্দার সঙ্গে মিলের ব্যাপারটা ক্রমশ গৌণ হয়ে গিয়ে, সেই তরুণ বরং নাকাতা মানুষটাকেই পছন্দ করতে শুরু করেছিলো। নাকাতার কথা বলার ধরণ সত্যিই একেবারে অদ্ভুত, আর যা বলে তা তো আরোই অদ্ভুত। কিন্তু সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপারের মধ্যেও মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার মত কী যেন আছে। হোশিনোর তখন মনে হয়েছিল যে এই নাকাতা-সান মানুষটা এরপর কোথায় যাবে, গিয়ে কী করবে, এসব তার জানতে ইচ্ছে করছে।

হোশিনোর জন্ম কৃষিজীবী পরিবারে। পাঁচ ভাই, ও তার মধ্যে তৃতীয়। জুনিয়র হাইস্কুলের ক্লাস টেন পর্যন্ত, তুলনায় ঠিকঠাক-ই ছিলো, কিন্তু তারপর টেকনিকাল হাইস্কুলে উঠে থেকে খারাপ বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গে পড়ে গিয়ে আজেবাজে কাজে জড়িয়ে পড়ে। কয়েকবার পুলিশের হাতে মারও খেয়েছে। কোনোরকমে পাশ করলো বটে, পাশ করে ভালো কোনো জায়গায় কাজ পেল না, নানা নারীঘটিত সমস্যাও ছিল, উপায়ান্তর না দেখে,সেলফ-ডিফেন্স বাহিনীতে ঢুকে গেল। সত্যি কথা বলতে কী, ও আসলে চালাতে চেয়েছিল ট্যাঙ্ক, কিন্তু তার জন্য যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষায় ধরাশায়ী হয়ে, যতদিন সেলফ ডিফেন্স বাহিনীতে ছিল মুখ্যত মালপত্র পরিবহনের বড় ট্রাক চালাত। তিন বছরের মাথায় সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের সেই কাজ ছেড়ে, পরিবহন পরিষেবা দেয় এমন কোম্পানির কাজ খুঁজে নিল। এরপর থেকে টানা ছ'বছর ধরে সে লং-ডিসট্যান্স ট্রাক চালিয়ে গেছে।

বড় ট্রাক চালানোর কাজটা ওর স্বভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাজ জিনিসটাই মূলত ওর বেশ পছন্দের, ট্রাকের মধ্যে উঁচু ড্রাইভারের সীটে বসে বড় স্টিয়ারিংটা হাতের মুঠোয় ধরতেই যেন নিজের দুর্গ আগলাচ্ছে বলে মনে হতে থাকত ওর। কাজ করতে অবশ্য অত ভাল লাগতো না। কাজের সময়ও ছিল অস্বাভাবিক। তবে কিনা, এর বদলে প্রতিদিন সকালে চাকচিক্যহীন দৈন্যদশার অফিসে গিয়ে কাজে যোগ দিয়ে, ওপরওয়ালার কড়া নজরের মধ্যে অতি সাধারণ কাজ করে যাওয়ার জীবন তার আরোই সহ্য হত না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম থেকেই তার স্বভাব ছিল মারকুটে। ছোটখাট পাতলা চেহারা বলে মারামারির তাকত তেমন নেই বলে মনে হলেও, আসলে গায়ে জোর আছে। তার ওপর, একবার ধৈর্য হারিয়ে ফেললে আর ও নিজেকে বশে রাখতে পারে না, চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতো হয়ে ওঠে, সত্যিকারের মারামারি লেগে গেলে সাধারণতঃ অন্যপক্ষ এতে দমে যায়। সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে থাকার সময়ও, ড্রাইভার হওয়ার পরেও, বহু বচসায় জড়িয়ে পড়েছে। অবশ্যই জিতও যেমন হয়েছে, হারও হয়েছে। কিন্তু, জিতুক কি হারুক, এর যে কোনো পরিণতি নেই, সেটার খেয়াল থাকত না। খুবই সম্প্রতি সেটা খেয়াল করতে শুরু করেছে। যাক গে, এখন অবধি যে বড় কোনও আঘাত পায়নি, সেটা ভেবে নিজেই এখন খানিক স্বস্তি পায়।

হাইস্কুলে পড়ার সময়, মনটা ছিল বিক্ষিপ্ত, রুক্ষ, পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে, জানাই ছিল যে ঠাকুর্দা এসে নিরস্ত করে নিয়ে যাবেন। থানায় এসে মাথা নিচু করে, ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতেন। ফেরার পথে সর্বদা খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে মুখরোচক খাবার খাওয়াতেন। তখনও কিন্তু উপদেশবাক্য মুখে আনতেন একটিও। মা-বাবা কখনও ওর জন্য কোথাও একবারও এভাবে যাতায়াত করেননি। গরীব বলে বাইরে খেতে যাওয়া প্রায় ঘটতোই না, আর বখে যাওয়া তৃতীয় সন্তানের জন্য আলাদা করে খুব একটা অতিরিক্ত কিছুর ব্যবস্থা তাদের আর করা হয়ে ওঠেনি। ঠাকুর্দা না থাকলে ওদের যে কী হত সেটা ও মাঝেমাঝে ভাবে। অন্তত পক্ষে ও যে বেঁচে আছে সেটাও একমাত্র ঠাকুর্দারই খেয়াল ছিল এবং সে ব্যাপারে আদৌ কোনও মাথাব্যথা ছিল।

অথচ, সেই সময় ও কিন্তু একবারের জন্যেও ঠাকুর্দার কাছে কোনওরকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। কী করে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সেটাই জানা ছিল না। আর, সব কিছুর আগে কেবল নিজেকে বাঁচানোর চিন্তাই মাথার ভেতরটাকে অধিকার করে রাখতো। সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর্দা ক্যান্সারে মারা যান। শেষ দিকটায় বার্ধক্যজনিত কারণে মাথা কাজ করত না, ওর মুখ দেখে চিনতে পারতেন না। ঠাকুর্দা মারা যাওয়া ইস্তক আর কখনো ও বাড়িতে ফিরে যায়নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকাল আটটায় তরুণ হোশিনো চোখ খুলে দেখে নাকাতা তখনও সেই একই ভঙ্গিতে অচৈতন্য অবস্থায়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রাবল্য, অবিচল রিদম্, সবই আগের রাতের মতই। সেই তরুণ তখন নিচে নেমে গিয়ে, অন্য অতিথিদের সঙ্গে একটা বড় হলঘরে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। সংক্ষিপ্ত ব্রেকফাস্ট, তার মধ্যে শুধু মিসোশিরু† আর ভাত যত খুশি নেওয়া যায়।

"আপনার সঙ্গী, উনি ব্রেকফাস্ট করবেন না", পরিচারিকা জানতে চাইল।

"এখনও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছেন। ব্রেকফাস্টের মনে হয় দরকার নেই। বলতে লজ্জা করছে, বিছানাটা আরো কিছুক্ষণ ওভাবে রাখা যাবে", ও বলে।

বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর, তখনও নাকাতা আগের মতোই ঘুমিয়ে যাচ্ছে দেখে সেই তরুণ তখন অতিথিশালায় থাকার মেয়াদ আরও একদিন বাড়িয়ে নেওয়া স্থির করল। তারপর বাইরে বেরিয়ে সোবার†† দোকানে ঢুকে ওয়াকোদোন††† খেল। খাওয়া শেষ হলে আশেপাশে খানিক হাঁটাহাঁটি করে, কফিশপে ঢুকে কফি খেয়ে, সিগারেট খেয়ে, ওখানে রাখা সাপ্তাহিক কার্টুনগুলো কয়েকটা পড়লো।

অতিথিশালায় ফিরল যখন, তখনও নাকাতা ঘুমোচ্ছে। ঘড়িতে সময় দুপুর দু'টোর কাছাকাছি। সেই তরুণ তখন একটু নাকাতার কপালে হাত রেখে দেখল। অস্বাভাবিক কিছু নেই। তেমন গরমও না, ঠান্ডাও না। ঘুমের মধ্যে শ্বাস আপাতত একইরকম শান্ত, নিয়মিত, গালের রঙে অন্যসময়ের মতোই স্বাস্থ্যের লালচে আভা ফুটে বেরুচ্ছে। শারীরিক অবস্থায় কোনোরকম ত্রুটির আভাস নজরে পড়ল না। কেবল শান্তভাবে অচৈতন্য। একবারও এপাশ ওপাশ করছে না।

"এভাবে এতক্ষণ ঘুমোনোর মধ্যে গন্ডগোল কিছু নেই তো? শরীরের পক্ষে খারাপ কিছু নয়তো", পরিস্থিতি দেখতে আসা পরিচারিকা একটু চিন্তিত ভাবে বলল।

"খুব পরিশ্রান্ত ছিলেন কিনা", হোশিনো বলল, "ঘুমোতে থাকলে ঘুমোক না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

† মিসোশিরু হল সয়াবীনের স্যুপ।

†† সোবা হল নুডলস।

~ www.amarboi.com ~

"আচ্ছা। তবে, এরকম অঘোরে কাউকে ঘুমোতে এই প্রথম দেখলাম কি না!"

রাতে খাওয়ার সময় এসে গেল, নাকাতা তখনও একই ভাবে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তরুণ বেরিয়ে গিয়ে কারি[১]-র দোকানে ঢুকে বীফ-কারির লার্জ প্লেট আর স্যালাড দিয়ে খাওয়া সেরে নিল। আগের দিনের পাচিংকো পার্লারে গিয়ে আবারও একঘন্টা মত খেলল। এবার ১০০০ ইয়েনও খরচ না করে মার্লবরো-কার্টন দু'দুটো পেয়ে গেল। সেই কার্টন-বক্স নিয়ে হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা। কী আশ্চর্য, নাকাতা তখনও ঘুমোচ্ছে!

সেই তরুণ তখন সময় হিসেবে করে দেখল। এভাবে নাকাতা চব্বিশ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ঘুমিয়ে চলেছে। বলে রেখেছিল বটে যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোবে, চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু বড্ডই বেশিক্ষণ হয়ে যাচ্ছে যে! ওর মনটা অসম্ভব দমে গেল, এতটা সচরাচর হয় না। এভাবে নাকাতা-সান যদি আর চোখ না-ই খোলে, তখন কী করা উচিত?

"কী মুশকিলে যে পড়া গেল", ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বলে।

কিন্তু পরদিন সকাল সাতটায় সে যখন চোখ মেললো, নাকাতা ততক্ষণে জেগে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

"আরে, দাদু, ঘুম ভাঙলো তাহলে", তরুণ স্বস্তিতে হাঁফ ছেড়ে বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, একটু আগে ঘুমটা ভাঙল। কতক্ষণ জানিনা, তবে, মনে হচ্ছে নাকাতা বেশ অনেকটা সময় ধরে ঘুমিয়েছে। যেন একজন্ম পরে ঘুম থেকে উঠলো।"

"বেশ মানে, জীবনটাই কেটে যাওয়ার মত যে! পরশু ন'টার পর থেকে টানা শুয়ে আছেন তো। একটানা, বিরামহীন চৌত্রিশ ঘন্টা মত শুয়ে ছিলেন। একেবারে স্নো-হোয়াইট তো!"

"হ্যাঁ। নাকাতার খিদে পেয়েছে।"

"হবেই তো। প্রায় দু'দিন কিচ্ছুটি খাওয়া হয়নি যে!"

দুজনে নিচে নেমে ডাইনিং-হলে বসে ব্রেকফাস্ট করল। নাকাতা যে পরিমাণ ভাত খেল, দেখে পরিচারিকা আশ্চর্য হয়ে গেল।

[১]ভারতীয় স্টাইলে ঝাল দিয়ে রান্না মাংসের ঝোল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ইনি ভাল ঘুমোতে পারেন বটে, আর জাগলে, দেখছি, ভাতও খেতে পারেন ভালই। দু'দিনের ভাত খেয়ে নিলেন যে", পরিচারিকাকে বলতে শোনা গেল।

"হ্যাঁ। ভালমত ভাত না খেলে নাকাতার চলে না।"

"সে তো ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ!"

"হ্যাঁ। নাকাতা অক্ষর টক্ষর পড়তে পারে না বটে, একটাও দাঁতে পোকা ধরেনি, চশমাও কখনও লাগেনি। কখনো ডাক্তারের কাছেও যেতে হয়নি। ঘাড়ে ব্যথাও হয় না, রোজ সকালে পায়খানাও ভালমতই হয়ে যায়।"

"আচ্ছা, এগুলো তো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার", পরিচারিকা নাকাতার কথা বিবেচনা করে বলে। "আপনি তাহলে আজ সারাদিন কী করছেন?"

"পশ্চিমদিকে মুখ করে যেতে থাকব", নাকাতা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে।

"ও আচ্ছা, পশ্চিম দিকে বুঝি", পরিচারিকা বলে, "এখান থেকে পশ্চিম মানে তো তাকামাৎসুর দিকে হল, তাই না?"

"নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি কম কিনা, ভূগোল ভালো জানা নেই।"

"যে করে হোক তাকামাৎসু অবধি গিয়ে দেখা যাক, দাদু", হোশিনো বলে ওঠে, "তার পরের কথা, আবার তখন ভাবলেও চলবে।"

"হ্যাঁ। যে করে হোক তাকামাৎসু অবধি গিয়ে দেখি। পরের কথা তখন ভাবব।"

"আপনারা তো দেখছি এক আশ্চর্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সচরাচর যেমন হয় তার তুলনায়", পরিচারিকা মন্তব্য করে।

"প্রকৃতপক্ষে তা-ই", সেই তরুণ বলে।

ঘরের ফেরার পরই নাকাতা টয়লেটে গিয়ে ঢোকে। ইতিমধ্যে হোশিনো ইউকাতা[১] চাপিয়ে মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে টেলিভিশনের খবর দেখতে থাকে। তেমন গুরুত্বপূর্ণ খবর কিছু ছিল না। নাকানোতে বিখ্যাত খোদাই-শিল্পীর ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর তদন্তে তেমন অগ্রগতি হয়নি। কোনও প্রত্যক্ষদর্শীও নেই, খোয়া

[১]সূতির ড্রেসিং গাউন, ঘরে ফিরে পরার পোশাক।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেছে এমন কিছু থেকেও কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনার কিছু আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া পনের বছরের পুত্রের হদিস পেতে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

"দ্যাখো ! মাত্র পনের বছরের নাকি", হোশিনো মনে মনে ভাবে।

কেন যে আজকালকার এরকম পনের বছরের নেহাত বাচ্চারা এমন নৃশংস অপরাধ ঘটাচ্ছে, কে জানে। পনেরো বছর বয়েসে ও কোথাও পার্ক করে রাখা বাইক চুরি করে বিনা অনুমতিতে চড়ে ঘুরে টুরে আসত। সুতরাং অন্যের ব্যাপারে কিছু না কিছু সমালোচনা করতেই হবে এমন দায় ওর নেই। অবশ্যই অন্যের বাইক ধার নেওয়ার থেকে নিজের বাবাকে ছুরি মেরে খুন করা একেবারেই পৃথক প্রসঙ্গ। সে কথা বললে, ও নিজে যে কোনোভাবে বাবাকে ছুরি মেরে খুন না করে থাকতে পেরেছে সেটাই বরং খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার কিনা কে বলতে পারে, বলে ওর মনে হল। এমন মারতো ধরে লোকটা!"

খবরও শেষ হল, আর নাকাতাও টয়লেট থেকে ফিরে এল।

"ইয়ে, হোশিনো-সান, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"কী ?"

"হোশিনো-সান, আপনার কি কোমরে কোনওরকম ব্যথা আছে?"

"উমম্, অনেকদিন ধরে গাড়ি চালাচ্ছি তো, তাই কোমরে একটু ব্যথা আছে। দীর্ঘ রাস্তা গাড়ি চালাতে হয়, এমন ড্রাইভারের কোমরে ব্যথা না থাকলে বাজে ড্রাইভার, ঘাড়ে ব্যথা নেই এমন বেসবল পিচার যেরকম হয়ই না", তরুণ উত্তর দেয়। "কিন্তু, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?"

"হোশিনো-সানের পিঠের দিকে তাকালে, কেমন ফুলে আছে বলে মনে হয়, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"হুমম্।" ।

"নাকাতা একটু হাত দিয়ে দেখতে পারে?"

"আরে, বিশেষ উপকার হয় তাহলে!"

উপুড় হয়ে থাকা সেই তরুণের পিঠের ওপর নাকাতা এবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘোড়ায় চড়ার মতো চড়ে বসে। দুটো হাতই হিপবোনের একটু ওপরে রেখে একেবারে স্থির। সেই তরুণ এরমধ্যে টেলিভিশনে প্রমোদ জগতের মুখরোচক কেচ্ছার ওয়াইড-শো দেখতে শুরু করেছে। এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছেন তেমন বিখ্যাত নয় এমন এক উদীয়মান ঔপন্যাসিকের সঙ্গে। এধরণের খবরে ওর খুব আগ্রহ নেই, কিন্তু দেখার মত অন্যকিছু নেই বলে, ও ওটাই দেখছিল। অভিনেত্রীর উপার্জন লেখকের চেয়ে দশগুণেরও বেশি। ঔপন্যাসিক বিশেষ তেমন হ্যান্ডসামও নয়, আলাদা করে খুব একটা বুদ্ধির ছাপও চেহারায় নেই। তরুণ মাথা নাড়ে।

"এই ভাবে পিঠে উঠে বসে কোন লাভ নেই। কিছু একটা ভুল ভাবছেন বলে মনে হয়।"

"হোশিনো-সান, আপনার পিঠের হাড় সরে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"জীবনের লম্বা সময়, সরে সরেই তো কাটিয়ে এসেছি। ওটুকু তো হতেই পারে", হাই তুলতে তুলতে সেই তরুণ বলল।

"এটা এই ভাবে ফেলে রেখে দিলে গন্ডগোল বেড়ে যেতে পারে।"

"তাই নাকি?"

"মাথায়ও ব্যথা করবে, হাগুও বন্ধ হয়ে যাবে, কোমরেও খিঁচ ধরা ব্যথা হবে।"

"উঁ...! তাহলে তো মুস্কিল।"

"একটু ব্যথা লাগতে পারে কিন্তু, অসুবিধে নেই ত?"

"কোন ব্যাপারই না।"

"সত্যি কথা বলতে কী, বেশ ভালোই ব্যথা লাগবে।"

"আরে কাকা, এই শর্মা জন্মে ইস্তক বাড়িতে, ইস্কুলে, মারপিটের সময়, দমাদম মার খেয়ে এসেছে। ঠিক গর্ব করে বলছি যে তা নয়, মার খাইনি এমন দিন বলতে গেলে আঙুলে গুনে বলা যায়। এখন আর ব্যথা, জ্বালা, চুলকুনি, কাতুকুতু, মিষ্টি, ঝাল এসব আর আছে নাকি। যা ইচ্ছে করুন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাকাতা চোখ ছোট করে, একাগ্র ভাবে, হোশিনোর কোমরের উপর ছোঁয়ানো নিজের বুড়ো আঙুল দুটোর অবস্থান গভীর সাবধানতার সাথে সুনিশ্চিত করলো । তারপর প্রথমে সেখানকার অবস্থাটা অনুভব করতে করতে, ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে লাগল। এরপর জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে, শীতের পাখীর মতো ছোট্ট আওয়াজ করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে, হাড় আর মাংসপেশীর মধ্যে আঙুলটা চেপে ধরল। তখন ছেলেটাকে আক্রমণ করা ব্যথাটা যেন অহেতুক অত হিংস্র হয়ে উঠল। মাথার মধ্যে বিরাট একটা বিদ্যুতের ঝলক সমস্ত চেতনাকে মুছে সাদা করে দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মন্দিরের উঁচু চূড়া থেকে এক ঝটকায় যেন নরকের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চিৎকার করার ক্ষমতা পর্যন্ত রইল না। মাত্রাছাড়া যন্ত্রনায় কোন কিছু ভেবে উঠতে পারল না। চিন্তাশক্তি যেন ছাই হয়ে উড়ে গেল, বোধশক্তিও যেন ব্যথার মধ্যে মিলেমিশে গেল। দেহকাঠামো ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হল। মৃত্যুও সম্ভবত এভাবে ধ্বসিয়ে দেয় না। চোখই খুলতে পারছিল না। বিহ্বল হয়ে তাতামির উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল। চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড এই অবস্থা চলল।

এরপর ছেলেটি একটু দম নিয়ে, টলমল শরীরটাকে কনুইয়ের উপর ভর করে কোনরকমে টেনে তুলল । তাতামিটা ঝড়ের আগের সমুদ্রের মতো এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত অলুক্ষুণে দোল খাচ্ছিল ।

"ব্যথা লাগল নাকি?"

ছেলেটা নিজে বেঁচে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিতে মাথাটা বেশ কয়েকবার ধীরে নাড়ল। "আরে, ব্যথা ঠিক নয়। ছাল ছাড়িয়ে, লোহার শলায় বিঁধিয়ে, হামানদিস্তায় ছ্যাঁচার পর, উপর দিয়ে একদল ক্ষ্যাপা ষাঁড় দৌড়ে গেলে যেমন লাগে, সেরকম লাগছিল। করেছিলেনটা কী, বলুন তো!"

"আপনার সরে যাওয়া হাড়গুলোকে তাদের নিজেদের খাঁজে বসিয়ে দিয়েছি। আর কোমর ব্যথাও হবে না, হাগুও ঠিকঠাক বেরুবে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্য, সেই প্রচণ্ড ব্যথাটা ভাঁটার জলের মতো সরে যাবার পর ছেলেটা লক্ষ্য করলো যে কোমরের কাছটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। শরীরের দুর্বল ভাবটাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে । ব্রহ্মতালুর কাছটাও কেমন যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাও কেমন সহজ হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল হল, প্রকৃতির ডাকও যেন আসছে ।

"হুঁ, শরীরের এখানে ওখানে সর্বত্রই কেমন হাল শুধরে গেছে বলে বোধ হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, পুরোটাই ছিল কোমরের হাড়ের সমস্যা", নাকাতা বলল।

"তবে, যাই হোক না কেন, ভালরকম ব্যথা পেয়েছি", হোশিনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

দুজনে তোকুশিমা স্টেশন থেকে জাপান রেলওয়েজ-র বিশেষ ট্রেনে চড়ে তাকামাৎসুর দিকে রওনা দিল। হোশিনো নিজের টাকা দিয়ে দুজনেরই ট্রেনের খরচ আর থাকার খরচটা মিটিয়ে দিল। নাকাতা নিজের খরচাটা নিজেই করবে বলে একবার বলেছিল ঠিকই, কিন্তু হোশিনো সেটা শোনার চেষ্টাও করল না।

"আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। পরে হিসেব করে নিলেই চলবে। পুরুষমানুষ টাকা পয়সা দেওয়া নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোটা আমি পছন্দ করি না।"

"হ্যাঁ, নাকাতাও টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনা বলে, সেটা হোশিনো-সানের উপরেই ছেড়ে দিল", নাকাতা বলল।

"কিন্তু, নাকাতা-সান, আপনার ফিংগার-প্রেশারের কৃপায় বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। কৃতজ্ঞতাবশত না হয় কিছু করতে দিলেন। বহুদিন পর এত ভাল লাগছে। নিজেকে নতুন মানুষ মনে হচ্ছে।"

"যাক, খুব ভাল হয়েছে। ফিংগার-প্রেশার বলতে যে ঠিক কি, নাকাতার কাছে সেটা খুব পরিষ্কার না হলেও, হাড়ের ব্যাপারটা যে কারনেই হোক খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আঙুলের চাপ, না কি সেইতাই চিকিৎসা, না কি সেই যে কাইরো-টাইরো কী একটা বলে, কি বলতে হয় সেটা আমিও ঠিক জানিনা। যেভাবেই হোক, আপনার তাতে বেশ প্রতিভা আছে বলে মনে হয়। ব্যবসা ট্যাবসা করলে ভালই লাভ হবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমার ড্রাইভার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে তো বিশাল সম্পত্তি করে ফেলতে পারবেন!"

"হোশিনো-সানের পিঠটা দেখেই বুঝেছিলাম পিঠের হাড়টা সরে গেছে। কোন একটা কিছু সরে গেছে দেখলেই নাকাতার ইচ্ছে হয় সেটাকে তার জায়গা মতো ফিরিয়ে দিতে। বহুদিন আসবাবপত্র তৈরি করার কাজ করেছি কিনা, তাই চোখের সামনে বাঁকা কিছু থাকলে সেটাকে সোজা করে না দিলে শান্তি হয় না। এটা নাকাতার বহু পুরনো একটা স্বভাব। কিন্তু হাড় সোজা করাটা এই প্রথম।"

"প্রতিভা নিশ্চয়ই এটাকেই বলে", তরুণ প্রশংসার সুরে বলল।

"এর আগে শুধু বেড়ালের সঙ্গেই কথা বলতে পারতাম।"

"অ্যাঁ!"

"কিন্তু ইদানিং বেড়ালের সঙ্গে আর কথা বলতে পারছিনা। সেটা হয়ত জনি ওয়াকার-সানের জন্য।"

"ও আচ্ছা।"

"জানেন নিশ্চয়ই, নাকাতার বুদ্ধিটা কম বলে দুরূহ জিনিষ বুঝতে পারে না। কিন্তু ইদানীং কিভাবে যেন দুরূহ সমস্ত ব্যাপার ঘটছে। যেমন কিনা, আকাশ থেকে মাছ আর জোঁক ঝরে পড়ছে।"

"হুম্"।

"হোশিনো-সানের কোমরটা ঠিক হয়ে যাওয়াতে নাকাতা খুব খুশি। হোশিনো-সানের ভাললাগাটাই নাকাতার ভাল লাগা।"

"আর আমিও খুব খুশি।"

"বাঃ!"

"বলছি কি, সেদিনের ফুজিগাওয়া সার্ভিস এরিয়া-র জোঁকের ব্যাপারটা কিন্তু..."

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, জোঁকের ব্যাপারটা নাকাতারও মনে আছে।"

"নাকাতা-সানের সঙ্গে ওটার কি কোনও সম্পর্ক আছে?"

কিছু ভেবে বলাটা নাকাতার পক্ষে খুবই বিরল ঘটনা হলেও, এবার কিন্তু নাকাতা একটু ভেবে নিল। "সেটা নাকাতাও ঠিক জানেনা। কিন্তু নাকাতা এইভাবে ছাতাটা খোলার সাথে সাথে অনেক জোঁক আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিল।"

"হুম্"।

"যাই বলুন না কেন, মানুষ মারাটা মোটেই ভাল কথা নয়", কথাটা বলে নাকাতা স্পষ্ট করে সামনে মাথাটা ঝোঁকায়।

"সেটা অবশ্য ঠিক। মানুষ মারাটা মোটেই ভাল কথা নয়", তরুণও স্বীকার করল।

"হ্যাঁ", নাকাতা আরও একবার প্রত্যয়ের সঙ্গে মাথা ঝোঁকাল।

তাকামাৎসু স্টেশনে দুজনে নামল। স্টেশনের সামনে উদোনের দোকানে ঢুকে, দুপুরের খাবারটা উদোন[1] দিয়ে সারল। উদোনের দোকানের জানলা দিয়ে বন্দরের বড় ক্রেন বেশ কয়েকটা দেখা যাচ্ছিল। ক্রেনের উপর অনেক সীগাল পাখি বসে ছিল। নাকাতা খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে, একটা একটা করে উদোন চেখে চেখে খেল।

"খুবই সুস্বাদু উদোন", নাকাতা বলে।

"তবে তো ভালই", হোশিনো বলে। "তাহলে কি মনে হয় নাকাতা-সান? জায়গাটা এই অঞ্চলে হলেই ভাল হয় কি?"

"হ্যাঁ। হোশিনো-সান, যে কারনেই হোক, এই জায়গাটাই যেন ঠিক লাগছে। নাকাতারও সেরকমই মনে হচ্ছে।"

"জায়গাটা ভালই। তাহলে এরপর কি করবেন?"

"প্রবেশপথের পাথরটা খুঁজব।"

"প্রবেশপথের পাথর?"

"হ্যাঁ"।

আমার বই

[1]চিবিয়ে ভাল লাগে এমন বেশ মোটা ও দীর্ঘ নুডল, বাটিতে স্যুপের সঙ্গে, কখনো কখনো গরমও পরিবেশন করা হয়।

"হুম্", তরুণ বলে, "নিশ্চয়ই কোন একটা লম্বা গল্প আছে, তাই না?"

নাকাতা বাটিটাকে কাত করে, উদোনের ঝোলের শেষ ফোঁটাটা পর্যন্ত চুমুক দিয়ে খেল। "হ্যাঁ। লম্বা গল্প আছে। কিন্তু এতটাই লম্বা যে, কোনটা যে কি, সেটা নাকাতাও ঠিক জানেনা। আসলে, হয়ত সেখানে গেলে বোঝা যাবে।"

"আগেও যেমনটা ঘটেছে, ওখানে গেলেই একমাত্র জানা যাবে।"

"হ্যাঁ ব্যাপারটা খানিকটা সেরকমই।"

"ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই তাহলে জানা যাবে না। এই তো?"

"হ্যাঁ। ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত নাকাতারও পুরো ব্যাপারটা জানা নেই।"

"বেশ ঠিক আছে। সত্যি বলতে কী লম্বা গল্প আমারও একেবারেই অপছন্দ। সে যাই হোক, প্রবেশপথের পাথরটা খুঁজে পেলেই তো হল।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

"তাহলে সেটা কোন অঞ্চলে আছে?"

"নাকাতার সে বিষয়ে কোনই ধারণা নেই।"

"জিজ্ঞেস করারই দরকার ছিল না", মাথা নাড়তে নাড়তে তরুণ বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৫

অল্প একটু ঘুমিয়ে চোখ খুলে ফেলছি, আবার অল্প ঘুমিয়ে পড়ছি, আবার চোখ খুলছি, এরই পুনরাবৃত্তি হল বেশ ক'বার। মেয়েটার আবির্ভাবের মুহূর্তটাকে ধরতে চাইছি। কিন্তু খেয়াল করতে না করতে মেয়েটা ততক্ষণে গতরাতের চেয়ারটার ওপরে। মাথার কাছের ঘড়ির, অন্ধকারে উজ্জ্বল কাঁটা সময় দেখাচ্ছে তিনটের একটু পরের। বিছানায় ঢুকে যাওয়ার আগে নিঃসন্দেহে টেনে দিয়ে শুয়েছিলাম যে পর্দা, যথারীতি, কখন যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতরাতের মতই। তবে চাঁদ ওঠেনি। ঐটুকুই যা তফাৎ। পুরু হয়ে মেঘ, বোধহয় অল্প বৃষ্টিও হচ্ছে। ঘরের ভেতর সবটা আগের রাতের চেয়ে অন্ধকার, দূর থেকে বাগানের আলো ক্ষীণ হয়ে বাগানের গাছপালার ভেতর দিয়ে গলে এসে পৌঁছচ্ছে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে চোখ অভ্যস্ত হতে সময় লাগে।

মেয়েটা ডেস্কের ওপর গালে হাত দিয়ে, দেওয়ালে ঝোলানো অয়েলপেন্টিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। পরনে গতরাতের পোষাকটাই। ঘর অন্ধকার বলে, ভাল করে তাকিয়েও মুখটা স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেদিক থেকে, শরীর ও মুখের আউটলাইন অদ্ভুত রকমের স্পষ্ট হয়ে গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে সেই মৃদু আলোয়। ও যে বাচ্চা বয়েসের সাএকি-সান, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

মেয়েটাকে কিছু একটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখাচ্ছে। আর নইলে দীর্ঘ সময় ধরে গভীর কোনো স্বপ্ন দেখছে হয়তো। যাই হোক না কেন, সেই মগ্ন অবস্থায় আমি যাতে ব্যাঘাত না ঘটাই, সেইভাবে নিঃশ্বাস সংবরণ করে রইলাম। এতটুকু নড়াচড়া করছি না। শুধু মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে চোখ ফেলে সময়টা দেখে নিচ্ছি। সময় ধীরে কিন্তু অপরিবর্তিত ও নিশ্চিত লয়ে বয়ে যাচ্ছে।

আগে থেকে কোনোরকম আভাস না দিয়ে একরকম হঠাৎ করেই আমার হৃৎপিন্ডটা প্রবলভাবে আওয়াজ করতে শুরু করল। যেন কেউ অবিরাম দরজায় করাঘাত করেই যাচ্ছে, এমন ধাতব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জোরালো আওয়াজ। একপ্রকার নাছোড়বান্দা সেই আওয়াজ ঐ শান্ত মধ্যনিশীথে ঘরের মধ্যে অবিকৃত ভাবে অনুরণিত হচ্ছিল। সেই আওয়াজে, অন্য কেউ নয়, খোদ আমিই চমকে গিয়ে, আরেকটু হলে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম।

মেয়েটার কালো সিল্যুয়েট যেন অল্প দুলছে। মুখটা তুলে অন্ধকারের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। আমার হৃদপিন্ডের আওয়াজ ওর কানে গিয়েছে। বনের মধ্যে পশুরা অচেনা শব্দে যেমন করে উৎকর্ণ হয়ে মনোনিবেশ করে, সেইভাবে মেয়েটা ঘাড়টা অল্প হেলিয়ে রয়েছে। তারপর ও আমার বিছানার দিকে মুখ ফেরাল। কিন্তু সেই চোখে আমি ধরা পড়ছি না। সেটা আমি বুঝতেই পারছি। ওর স্বপ্নের মধ্যে আমি নেই। আমি আর মেয়েটা, একটা অদৃশ্য বিভাজন রেখার মাধ্যমে দু'জনের আলাদা আলাদা জগতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি।

ক্রমে একসময় আমার হৃৎপিন্ডের সেই প্রবল ধুকপুকুনি, যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবেই দ্রুত প্রশমিত হয়ে গেল। শ্বাসপ্রশ্বাসও আগের মত স্বাভাবিক হয়ে এল। উৎকন্ঠাও দূর হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে এলাম। মেয়েটাও আর কান খাড়া করে রইল না। আবারও একবার 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র দিকে নজর ফেরাল। আগের মতই ডেস্কের ওপর গালে হাত দিয়ে, মনটা ফিরে গেছে সেই ছবিতে এক গ্রীষ্মের সেই ছেলেটার দিকে।

মিনিট কুড়ি সেখানে স্থির থেকে, সেই অপরূপ মেয়ে চলে গেল। গতরাতের মতই খালি পায়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, কোনও শব্দ না করে দরজার দিকে সরে গিয়ে, দরজা না খুলেই দরজার ওধারে মিলিয়ে গেল। আমি ওই অবস্থায় খানিক সময় যেতে দিয়ে, উঠে পড়ে বিছানা থেকে নেমে এলাম। আলো না জ্বালিয়ে, রাতের অন্ধকারের মধ্যেই, মেয়েটা একটু আগেও যে চেয়ারটায় বসে ছিল সেটায় গিয়ে বসলাম। ডেস্কের ওপর দু'হাত রেখে, ঘরে ওর রেখে যাওয়া স্মৃতির রেশটুকুর মধ্যে ডুবে গেলাম। চোখ বন্ধ করে, ওখানে মেয়েটার বুকের কাঁপনটুকু নিয়ে নিজের মধ্যে ভরে নিলাম। চোখ বন্ধই করে রইলাম।

সেই মেয়েটা আর আমি, অন্তত একটা জিনিস দু'জনের মধ্যেই আছে। সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া কারুকে ভালবাসি।

একটু বাদেই ঘুমের মধ্যে চলে গেলাম। কিন্তু ঘুমটা স্থায়ী হচ্ছিল না। শরীর গভীর ঘুম চাইছে, ওদিকে চেতনা ঘুমকে প্রতিরোধ করছে। আমি এ'দুটোর মধ্যে পেন্ডুলামের মত দোলায়মান। কিন্তু রাত কেটে ভোর হয়েছে কি হয়নি, পাখিদের মুখর তৎপরতা শুরু হয়ে গেল, সেই অছিলায় আমিও চোখ পুরোপুরি খুলে ফেললাম।

জীনস পরে, টি-শার্টের ওপর ফুলহাতা শার্ট চাপিয়ে বাইরে এলাম। সবে পাঁচটা বেজেছে, আশেপাশে বিশেষ লোক চলাচল নেই। পুরোনো দোকানপাট, বাড়ি-ঘরের ভেতর দিয়ে, সামুদ্রিক ঝড় আড়াল করার পাইন বনের ভেতর দিয়ে, বাঁধ পেরিয়ে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। ত্বকে বাতাস তেমন অনুভব করা যাচ্ছে না। একপরত ছাইরঙা মেঘ আকাশ ডেকে রেখেছে বটে, বৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা এই মুহূর্তে নেই। শান্ত সকাল। শব্দ নিরোধক হয়ে মেঘ যেন ধরাপৃষ্ঠের নানা আওয়াজ শুষে নিচ্ছে।

সমুদ্রতট ধরে পথচারীদের হাঁটার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, কল্পনা করলাম যে ছবির সেই ছেলেটা এই বালুকাবেলায় কোথাও একটা ক্যানভাসের চেয়ার নিয়ে এসে বসে ছিল হয়তো। কিন্তু সেটা ঠিক কোন জায়গাটায়, তা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। ছবিতে শুধু দেখাচ্ছে, বালির এই তটভূমি, সমুদ্রের ওপ্রান্তের দিগন্তরেখা আর আকাশ আর মেঘ। এছাড়া দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপ তো বেশ কয়েকটাই আছে, আর আমিও ছবির সেই দ্বীপের অবয়ব ঠিক মনে করতে পারছি না। সমুদ্রের দিকে মুখ করে সেই বালির তটে বসে পড়ে, আমি আঙুলের মাঝখানে সেই ছবির ফ্রেমটা সবকিছুর ভেতর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করলাম। কল্পনায় চেয়ারে বসা অবস্থায় ওই ছেলেটার একটা ছবি ওখানে স্থাপন করে দেখার চেষ্টা করলাম। বাতাসহীন সেই আকাশের এদিক থেকে ওদিকে উড়ে গেল একটা সাদা শঙ্খচিল, যেন উদ্দেশ্যহীন। ছোটছোট ঢেউ নিয়ম করে এসে আছড়ে পড়ে বালির তটে নরম রেখা এঁকে দিচ্ছে। তারপর ফিরে যাচ্ছে ছোট ছোট বুদবুদ ফেলে রেখে পেছনে।

টের পেলাম, ছবির সেই ছেলেটাকে হিংসে হচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তুমি ছবির সেই ছেলেটাকে হিংসে করছ", কারাসু বলে ছেলেটা আমার কানে ফিসফিস করে বলল।

কুড়ি বছর বয়েস হতে না হতে, ভুলবশত অন্য একজনের জায়গায় অহেতুক খুন হয়ে গেল—সেও মোটামুটি তিরিশ বছর আগের কথা —সেই হতভাগ্য বেচারাকে, তুমি ঈর্ষা করছ। এতটাই প্রবলভাবে যে বুকের ভেতরটা ভার হয়ে যাচ্ছে, দম আটকে আসছে। জন্মাবধি এই প্রথম কাউকে ঈর্ষা করার মনোভাব তোমাকে পেয়ে বসেছে। ঈর্ষা জিনিসটা যে কী সেটা তুমি এবার ধীরে ধীরে বুঝতে পারছ। তোমার ভেতরটা, শস্য কাটার পর মাঠে লাগানো আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে।

জন্মে থেকে, এই লোকটি কেন, কাউকেই ঈর্ষা করার কথা একবারও ভাবনি, অন্য কেউ হয়ে ওঠার কথাও ভাবনি। কিন্তু এখন তুমি, ছেলেটাকে মন থেকে ঈর্ষা করছ। সম্ভব হলে, সেই ছেলেটায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছ। এমনকি কুড়ি বছর বয়েসের সময় অত্যাচার করে, সেই অবস্থায় লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে মারা হবে তোমাকে, একথা আগে থেকেই জানা সত্ত্বেও দমার নও। তা-ই সই, তুমি সেই ছেলেটা হয়ে গিয়ে, পনের থেকে কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত রক্তমাংসের সাএকি-সানকে নিঃশর্তভাবে ভালবাসতে চাও, আর ওঁর থেকেও নিঃশর্ত ভালবাসা পেতে চাও। আশ আর মেটে না এইভাবে জড়িয়ে ধরে, বারবার সংগম করতে চাও। ওঁর শরীরের আনাচে কানাচে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চাও। তোমার ইচ্ছে যে ওঁর আঙুল তোমার শরীরের আনাচে কানাচে ছুঁয়ে যাক। তারপর মরে গিয়েও, কাহিনী হয়ে, ছবি হয়ে ওঁর মনের মধ্যে আঁকা হয়ে থাক। তারপর স্মৃতির ভেতর প্রতিরাতে ও তোমাকে আদর করুক।

এইভাবে, তুমি এক ভয়ানক বিচিত্র অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছ। এখন আর নেই, হারিয়ে গেছে এমন একটা মেয়ের চেহারার প্রেমে পড়েছ, আর, সেই কবে মারা গেছে এমন এক ছেলেকে ঈর্ষা করছ। সব জেনেও, সেই কল্পনাটাকেই এযাবৎ বাস্তবে ঘটা তোমার যাবতীয় আবেগের অনুভূতির চেয়েও অনেকটাই বেশি সত্য বলে মনে হচ্ছে, বেদনার বলে মনে হচ্ছে। আর সেখান থেকে বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসারও পথ নেই। বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়ার এমনকি সম্ভাবনাটুকুও নেই। তুমি সময়ের এক গোলোকধাঁধাঁর মধ্যে রাস্তা হারিয়ে বসেছ। অন্য সব কিছুর চেয়েও বড় সমস্যা হল, ওখান থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছেটাই তোমার মধ্যে একেবারেই নেই। ঠিক কি না ?

ওশিমা গতকালের চেয়েও দেরি করে এল। তার আগে আমি একতলা আর দোতলার মেঝেয় ক্লীনার চালিয়ে, ডেস্ক আর চেয়ার ভেজা কাপড়ে মুছে, জানালাগুলো খুলে দিয়ে মুছে, বাথরুম পরিষ্কার করে, ময়লা ফেলার ড্রাম খালি করে, ফুলদানির জল পালটে রেখেছি। ঘরের আলোগুলো জ্বেলে, রেফারেন্সের কম্পিউটার সুইচ অন করে দিলাম। এরপর শুধু গেট খুলে দেওয়া। ওশিমা এসে একটা একটা করে সব দেখে নিয়ে, সন্তুষ্ট ভাবে সামনে মাথা ঝোঁকাল।

"তুমি মনে রাখতে পার ভাল, কাজেও বেশ চটপটে!"

আমি জল ফুটিয়ে, ওশিমার জন্য কফি তৈরি করলাম। নিজে গতদিনের মতই আর্ল-গ্রে চা খেলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বেশ জোর বৃষ্টি। দূরে কোথাও বাজ পড়ার আওয়াজও পাওয়া গেল। এখনও দুপুর হয়নি, চারপাশ সন্ধ্যেবেলার মতো অন্ধকার।

"ওশিমা-সান, একটা জিনিস চাওয়ার আছে।"

"কী জিনিস?"

"ভাবছি 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র স্বরলিপিটা কোথাও পাওয়া যায় কিনা।"

ওশিমা একটু চিন্তা করে। "ইন্টারনেটে স্বরলিপি প্রকাশক সংস্থাগুলোর ক্যাটালগে পাওয়া গেলে, কিছু টাকা খরচ করলেই ডাউনলোড করা সম্ভব হয়তো। পরে খুঁজে দেখতে হবে।"

"ধন্যবাদ।"

ওশিমা কাউন্টারের ধারটায় বসে, কফির কাপে খুবই ছোট্ট একটা শুগার-কিউব ফেলে, চামচ দিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে গুলতে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

থাকে। "কেমন? ভাল লাগল গানটা?"

"খুবই।"

"আমারও গানটা বেশ ভাল লাগে। সুন্দর আর তার সঙ্গে বেশ স্বতন্ত্র ধরণের। সাদাসিধে অথচ গভীরতা আছে। কম্পোজার নিজে কীধরণের লোক সেটা সরাসরি অনুভব করা যায়।"

"লিরিকটা যদিও খুবই সিম্বলিক", আমি বলি।

"সময় ও সিম্বল এরা শাশ্বত জিনিস, আলাদা করার মতো জিনিস নয়। জলদস্যু আর বোতলে 'রাম্' যেমন।"

"আচ্ছা, সাএকি-সান ওই গানের কথাগুলোর অর্থ ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়?"

ওশিমা মুখটা তুলে দূরে বাজ পড়ার শব্দ কান পেতে শুনে, দূরত্বটা আন্দাজ করে নিয়ে, তারপর আমার মুখের দিকে তাকাল। আর মাথা ঝাঁকাল।

"নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। প্রতীকধর্মীতা আর অর্থময়তা যেহেতু দু'টো আলাদা ব্যাপার। উনি হয়তো অর্থ, যুক্তি, এইসবের বাহুল্যের মধ্যে না গিয়ে, ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে ওখানে ঠিক যে কথাগুলো থাকা উচিত সেগুলো পেয়ে গিয়েছিলেন। শূন্যে উড়তে থাকা প্রজাপতির ডানা অবলীলায় দু'আঙুলের মধ্যে ধরে ফেলার মতো করে, স্বপ্নের মধ্যে কথাগুলো পেয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পী তাঁরাই, যাঁরা বাহুল্য বর্জন করার যোগ্যতা ধরেন।"

"তাহলে বলছেন যে সাএকি-সান ওই গানের কথাগুলো অন্য কোথাও—যেমন ধরুন, স্বপ্নের মধ্যে—অন্য কোনও পরিসরে খুঁজে পেয়েছিলেন হয়তো?"

"বিরল মানের কবিতা তো অল্পবিস্তর এরকমই জিনিস। যদি ওই কথাগুলো পাঠকের মধ্যে সম্ভাবনাময় কোনো চ্যানেল না খুঁজে পায়, তবে সেটা কবিতার ভূমিকা পালন করছে না।"

"কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেরকমই, এমন কবিতাও তো কতই হয়", আমি বলি।

"ঠিকই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেইরকম কবিতাগুলো টানা পড়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। ওরকমই সিম্বলিক ভাষা ব্যবহার করলেই, তখনকার মত কবিতার মতই দেখায়।"

"তবে, 'সমুদ্রতটে কাফকা' কবিতাটা খুব নাড়া দিয়ে যায়।"

"আমারও তাই মনে হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার মাথার মধ্যে কবিতাটা আগে থেকেই সুরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে বলে, কেবল কবিতা হিসেবে আলাদা করে নিয়ে, সেখানে কেবল ভাষাগত আবেদন কতটুকু আছে, সেটা পুরোপুরি সঠিক ভাবে বিচার করে উঠতে পারিনা", ওশিমা বলে। তারপর মাথাটা অল্প নাড়ে। "যাই বলি না কেন, ঈশ্বর ওঁকে অঢেল এবং সহজাত প্রতিভা দিয়েছেন, সংগীতের বোধও যথেষ্ট। হঠাৎ করে সৌভাগ্যবশত মিলে যাওয়া সুযোগকে কাজে লাগানোর মত বাস্তববুদ্ধি চালিত উদ্যমও যথেষ্ট ছিল। ওই দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটে গিয়ে জীবন থেকে সরে না এলে, ওই প্রতিভা আরো অবাধে বিকশিত হওয়ার কথা ছিল। নানা দিক থেকেই এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা।"

"সেই প্রতিভাটা আদৌ গেল কোথায়", আমি প্রশ্ন করি।

ওশিমার আমার মুখের দিকে তাকায়। "তুমি জানতে চাইছ, প্রেমিক মারা যাওয়ার পরে সাএকি-সানের ভেতরের ওই প্রতিভা কোথায় গেল, তাই তো?"

আমি সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "যদি প্রতিভা জিনিসটা সহজাত এনার্জি হয়ে থাকে, তবে কি সেটা কোথাও একটা বেরোনোর রাস্তা খুঁজে নেবে না?"

"সে তো আমার জানা নেই", ওশিমা বলে। "প্রতিভার গন্তব্যস্থল আগে থেকে অনুমান করার মতো নয়। নেহাতই হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায় কেবল। কিংবা ভূগর্ভের জলের মতো মাটির নিচে গভীরে কথাও সেঁধিয়ে ওভাবেই প্রবাহিত হয়ে গেল কোথাও, এরকমও হয়।"

"এমন হতে পারে, সাএকি-সান তাঁর সেই ক্ষমতা, সংগীতে না করে, অন্য কিছুতে একাগ্র হয়ে প্রয়োগ করেছিলেন হয়তো," আমি বলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"অন্য কিছুতে", ওশিমা গভীর কৌতূহল সহকারে ভুরু কুঁচকে ফেলল, "যেমন?"

আমার কথা যোগায় না। "তা বলতে পারছি না। কেবল মনে হল আর কী। ধরা যাক, যা বাইরে দেখতে পাওয়া যায় না, এরকম কিছুতে।"

"বাইরে দেখতে পাওয়া যায় না এমন কিছু?"

"অর্থাৎ, অন্য লোকের চোখে ধরা পড়ে না, কেবল নিজের জন্য কোনো সাধনায়। ভেতরের কোনো প্রক্রিয়া বলে বলা যায় হয়তো।"

ওশিমা হাতটা কপালে এনে, কপালে এসে পড়া সামনের চুল পিছন দিকে পাঠিয়ে দেয়। সরু আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুলগুলো বেরিয়ে আসে। "খুব ইন্টারেস্টিং তো একথার অর্থ। সাএকি-সান অবশ্যই এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারপর আমাদের অজানা কোনো জায়গায়, তুমি যেমন বলছ, বাইরে দেখা যায় না এরকম কিছুর দিকে, প্রতিভাই হোক বা ক্ষমতা, সেটাকে চালিত করেছিলেন হয়তো। তবে কিনা পঁচিশটি বছর কোনোভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস না করলে, কোথায় গিয়ে কী করছিলেন তা জানার উপায় নেই।"

আমি একটু ইতস্তত করে, শেষে বলেই ফেললাম।

"ইয়ে, খুবই বোকাবোকা কথা একটা জিজ্ঞেস করব?"

"খুবই বোকাবোকা কথা?"

আমার মুখ লাল হয়ে গেল। "একেবারেই উটকো।"

"তাতে কী হয়েছে। উটকো বোকাবোকা কথা আমারও মোটেই তেমন খারাপ লাগে না।"

"আসলে ওশিমা-সান, এরকম একটা কথা কারুর সামনে মুখে আনব, এ আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

ওশিমা মাথাটা অল্প হেলাল।

"এরকম কি হতে পারে যে সাএকি-সান আমার মা", আমি বলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওশিমা মৌন হয়ে থাকে। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে, সময় নিয়ে কথা হাতড়াতে থাকে। আর ততক্ষণ আমি ঘড়ির আওয়াজে কান পেতে থাকি।

ও বলে, "তুমি যেটা বলতে চাইছ, তার সারাংশটুকু বলতে হলে, মোটের ওপর সাএকি-সান কুড়ি বছর বয়েসের সময় নিরাশ হয়ে তাকামাৎসু ছেড়ে চলে গিয়ে, কোথাও একটা গিয়ে একান্তে কাটাতে থাকেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তোমার বাবা শ্রী তামুরা কোইচির সঙ্গে পরিচয় হয়ে বিয়ে হয়ে যায়, এবং সৌভাগ্যক্রমে তোমার জন্ম দেন। তার চার বছর পরে, কোনোভাবে উদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে তোমাকে রেখে গৃহত্যাগ করেন। তার পরে অল্পকিছু সময়ের একটা মিসটিরিয়াস গ্যাপ, কিছুদিনের মধ্যেই আবার নিজের জায়গা শিকোকুতে ফিরে আসেন—এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"সম্ভাবনা যে নেই তা বলা যায় না। বলা যায়, আপাতত এই পর্যায়ে তোমার এই ধারণা উড়িয়ে দেওয়ারও কোনও তেমন ভিত্তি নেই। এত দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসে ওঁর জীবনটা রহস্যাবৃত। টোকিওতে কাটাচ্ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। আর উনি মোটামুটি তোমার বাবার সমবয়সী। তবে তাকামাৎসুতে যখন ফিরে এলেন তখন একাই এসেছিলেন। অবশ্যই, কন্যাসন্তান থাকলেও, অন্য কোথাও যে আলাদা হয়ে কাটাচ্ছিলেন এরকম সম্ভাবনাও আছে। ইয়ে, তোমার দিদির বয়েস যেন কত বললে?"

"একুশ বছর।"

"একেবারে আমারই বয়েসী", ওশিমা বলে, "তবে আমি বোধহয় তোমার দিদি নই। আমার দিব্যি বাবা-মা আছেন, দাদা আছে। সকলের সঙ্গেই রক্তের সম্পর্ক, তারাই আমার জন্য যথেষ্ট", আড়াআড়ি হাতদুটো জড়ো করে, ওশিমা খানিক আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

"এবার আমার তরফ থেকে আমি তোমার থেকে একটা জিনিস জানতে চাই", ওশিমা বলে, "তুমি কি এযাবৎ কখনও বংশপঞ্জি ঘেঁটে দেখেছ? সেটা করলেই তো মনে হয় সহজেই তোমার মায়ের নামও জানতে পারার কথা, বয়েসও জানতে পারার কথা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ঘেঁটে দেখেছি, অবশ্যই!"

"মায়ের নাম কী দেখাচ্ছে?"

"নাম নেই", আমি জানাই।

ওশিমা যেন অবাক হয়ে গেল এটা শুনে। "নাম নেই? বিশ্বাসই করা যায় না"

"ছিল না কিন্তু। সত্যিই। কেন যে নেই, আমিও জানি না। কিন্তু, যেভাবেই হোক, বংশপঞ্জিতে আমার মা নেই। দিদিও নেই। বংশপঞ্জির রেকর্ডে বাবার নাম আর আমার নাম শুধু নথিভুক্ত করা আছে। অর্থাৎ আইনত আমি জন্মপরিচয়হীন শিশু বলে বিবেচিত হব। সোজা কথায় অবৈধ সন্তান।"

"কিন্তু আসলে তোমার মা এবং দিদি ছিল ঠিকই।"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই, "চার বছর বয়েস অবধি সত্যিই আমার মা এবং দিদি ছিল। আমরা চার জন একটিই পরিবার হিসেবে একই বাড়িতে বাস করছিলাম। এ আমার পরিষ্কার মনে আছে। নেহাত কল্পনা নয় সেটা। আমার চার বছর বয়েস হতেই, দু'জন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।"

আমি পার্স থেকে সমুদ্রতীরে আমার আর দিদির, দুজনে মিলে খেলা করার ছবিটা বের করলাম। ওশিমা ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে, আমাকে ফেরত দিল।

"সমুদ্রতটে কাফকা", ওশিমা বলে।

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে, আমি সেই পুরনো ছবিটা আবার পার্সে রেখে দিলাম। বাতাস দিলেই, বৃষ্টি মাঝে মাঝে জানালার কাঁচে এসে লেগে আওয়াজ হচ্ছিল। ঘরের ছাতের আলো মেঝেতে আমার আর ওশিমার ছায়া ফেলেছে। ছায়া দুটো, এক উল্টোনো পৃথিবীতে অশুভ কোনো গোপনীয়তার মতো দেখাচ্ছিল।

"মা'র মুখটা তোমার মনে পড়ে না", ওশিমা জানতে চায়, "যেহেতু চারবছর বয়েস অবধি মা'র সঙ্গে কাটিয়েছ বললে, মুখটা কীরকম ছিল তা একটুও কি মনে নেই?"

আমি মাথা নাড়ি। "কিছুতেই মনে করতে পারি না। জানি না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কীভাবে, আমার স্মৃতিতে মায়ের মুখের কেবল একটা অংশ অন্ধকার ছায়ার মতো আঁকা হয়ে আছে।"

ওশিমা খানিক ভাবে এই নিয়ে।

"আচ্ছা, তুমি কি আরেকটু বিশদে বলতে পার, কীসের ভিত্তিতে তুমি অনুমান করছ যে হতেও পারে সাএকি-সান তোমার মা?"

"ছেড়ে দিন, ওশিমা-সান", আমি বলি, "থাক এই প্রসঙ্গটা। নির্ঘাত আমি একটু বেশিই ভাবছি এটা নিয়ে, বলে মনে হয়।"

"অসুবিধে কিছু নেই, তাই মাথার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেগুলো বলে দেখতে পার", ওশিমা বলে। "সত্যিই তুমি বেশি ভাবছো কিনা, সেটা তাহলে আমরা দুজনে মিলে বিচার করে দেখতে পারি।"

মেঝের ওপর ওশিমার ছায়াটা, ও সামান্য নড়াচড়া করলেই সেভাবে নড়ে উঠছে। মূল মানুষটার নড়াচড়ার চেয়ে সেটা যেন আরেকটু বর্দ্ধিত আকারে, দেখে মনে হয়।"

আমি বললাম, "আমার আর সাএকি-সানের মধ্যে এতরকম মিল আছে যা বিস্ময়জনক। যেকোনোটাই, পাজ্‌লের যে টুকরোটা অনুপস্থিত সেটার মতোই খাঁজে খাঁজে মিলে যায়। 'সমুদ্রতটে কাফকা' গানটা শুনতে শুনতে আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। দেখুন, প্রথমত আমি যেন কী এক নিয়তির টানে এই লাইব্রেরিতে এসে হাজির হলাম। নাকানো ওয়ার্ড থেকে তাকামাৎসু অবধি, প্রায় এক সরলরেখা বরাবর। ভেবে দেখলে এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার বইকি!"

"একেবারে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্লটের মত", ওশিমা বলে।

আমি বললাম, "আর আমি ওঁকে ভালবেসে ফেললাম"।

"সাএকি-সানকে?"

"হ্যাঁ। সম্ভবত সেরকমই বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"সম্ভবত?" বলে ওশিমা ভুরু কোঁচকায়। "ভালোবেসে ফেলেছো বলে বললে, সে কি 'সম্ভবত সাএকি-সানকে'? নাকি সাএকি-সানকে 'সম্ভবত ভালোবেসে ফেলেছ'?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি আবার লাল হয়ে গেলাম। "ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারছি না", আমি বললাম, "ভীষণরকম জট পাকিয়ে গিয়ে, অনেক কিছু আমিও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু তুমি সম্ভবত সাএকি-সানকে সম্ভবত ভালবেসে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ", আমি বলি্ "খুবই গভীরভাবে।"

"যদিও 'সম্ভবত', তবু খুবই গভীরভাবে।"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"পাশাপাশি, আবার এই সম্ভাবনাও রয়ে গেছে যে উনি হয়তো তোমার মা।"

আমি আরেকবার সায় জানাই।

"এখনও দাড়িও গজায়নি এমন একটি পনের বছরের ছেলে তুমি, সে তুলনায় একা একাই বড্ড বেশি নানারকম ভার বহন করে চলেছ", সাবধানে কফিতে একটা চুমুক দিয়ে, কাপটা ডিশে নামিয়ে রাখল ওশিমা। "সেটা যে করা যায় না এমন নয় মোটেই। কিন্তু সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বলে জিনিস আছে।"

আমি চুপ করে থাকি।

ওশিমা কপালে আঙুল দিয়ে, কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে থাকে। তারপরে দুহাতের সরু আঙুলগুলো বুকের সামনে জড়ো করে।

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র স্বরলিপিটা যোগার করে ফেলতে হবে। তারপরের কাজটা আমিই করব, তাই নিজের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভাল।"

লাঞ্চের সময় আমি ওশিমার জায়গায় কাউন্টারে বসলাম। বৃষ্টি অঝোরে পড়েই যাচ্ছে বলে, লাইব্রেরিতে লোকসমাগম অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। বিরতির পর ফিরে ওশিমা একটা বড় খামের মধ্যে ভরা স্বরলিপির কপি আমার হাতে সমর্পন করল। কম্পিউটার থেকে বের করা প্রিন্ট-আউট।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আপাতত কিছুই আটকাচ্ছে না দেখছি", ওশিমা বলল।

"ধন্যবাদ", আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

"অসুবিধে না থাকলে, দোতলায় একটু কফি নিয়ে যাবে? তুমি কিন্তু কফিটা বানাও চমৎকার।"

"নতুন করে কফি বানিয়ে, সেটা ট্রেতে চাপিয়ে দোতলায় সাএকি-সানের ওখানে নিয়ে গেলাম। চিনি ছাড়া, ক্রীম ছাড়া। অন্যান্য সময়ের মতই দরজা খুলে রাখা আছে। উনি ডেস্কের সামনে বসে লিখছেন। আমি কফিটা ডেস্কের ওপরে রাখতে, উনি মুখ তুলে একটু হাসলেন। তারপর ফাউন্টেন পেনে ক্যাপ আটকে কাগজের ওপর রাখলেন।

"কেমন, খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছো বলেই তো মনে হচ্ছে।"

"একটু একটু করে", আমি বলি।

"হাতে সময় আছে?"

হ্যাঁ, সময় আছে", আমি জানাই।

"তাহলে, ওখানে একটু বোসো", বলে সাএকি-সান ডেস্কের পাশে একটা কাঠের চেয়ারের দিকে নির্দেশ করলেন, "একটু কথাবার্তা বলি আমরা"।

আবার বাজ পড়তে শুরু করল। এখনও দূরেই, কিন্তু একটু একটু করে কাছে এগিয়ে আসছে বলেই মনে হচ্ছিল। আমি ওঁর কথামত চেয়ারে বসলাম।

"ভালো কথা, তোমার বয়েস কত? ষোলো?"

"আসলে পনের বছর। এই সবে পনের হয়েছে", আমি জবাব দিলাম।

"বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছো, না?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ি থেকে বেরিয়ে না এলেই নয় এরকম হওয়ার কোনো পরিষ্কার কারণ ছিল?"

আমি মাথা নাড়ি। আদৌ কী বলা উচিত কে জানে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাএকি-সান কাপটা হাতে নিয়ে, আমার উত্তরের অপেক্ষা করতে করতে কফিতে চুমুক দিলেন।

"মনে হয়েছিল, ওখানে থাকলে আর নিজেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারব না", আমি বললাম।

"ধ্বংস হয়ে যাওয়া", বলে সাএকি-সান চোখ কুঁচকে তাকালেন।

"হ্যাঁ", আমি বলি।

একটু চুপ করে থেকে উনি বললেন, "তোমার বয়েসের একটা ছেলে 'ধ্বংস হয়ে যাওয়া' জাতীয় ভাষা ব্যবহার করছে, এটা আমার সবদিক থেকেই খুব অদ্ভুত লাগছে যে। বলা যায় খুবই কৌতূহল হচ্ছে—আরো স্পষ্ট করে বললে, ব্যাপারটা ঠিক কী। তুমি যেটাকে 'ধ্বংস হয়ে যাওয়া' বলছ?"

আমি কথা খুঁজতে থাকি। প্রথমে কারাসু বলে ছেলেটাকে খুঁজি। কিন্তু সে কোথাও নেই। নিজেই খুঁজি। তাতে সময় লাগতে থাকে। কিন্তু সাএকি-সান শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বিদ্যুৎ চমকায়, তার খানিক পরেই দূরে বজ্রপাতের শব্দ কানে আসে।

"আমার মধ্যে একটা অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আসত, এই চেহারায় আর থাকতাম না, এই আর কি।"

গভীর কৌতূহল নিয়ে সাএকি-সান আমাকে দেখেন। "কিন্তু সময় বলে একটা জিনিস যতক্ষণ আছে, যে কেউই শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়, চেহারাটাই কেবল যে পালটায়, তা তো নয়। একসময় না একসময়।"।

"কখনো না কখনো হারিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু নিজেকে ফিরে পাওয়ার একটা জায়গা থাকাটাও জরুরী—"

"নিজেকে ফিরে পাওয়ার জায়গা?"

"ফিরে পাওয়ার মত একটা জায়গা যার কোনো মূল্য আছে।"

সাএকি-সান সরাসরি আমার মুখের দিকে শান্ত ভাবে চেয়ে থাকেন।

আমি লাল হয়ে যাই। কিন্তু মনে জোর এনে মুখ তুলে রাখি। সাএকি-সান নেভি-ব্লু রঙের হাফ-স্লীভ ওয়ানপিস পরে আছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওঁর মনে হয় একাধিক বিভিন্ন শেডের নীল ওয়ানপিস আছে। রূপোর সরু নেকলেস, আর কালো চামড়ার স্ট্র্যাপের ছোট রিস্ট-ওয়াচ, অলঙ্কার বলতে এই। আমি ওঁর মধ্যে পনের বছরের সেই মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। খুঁজে পেতে দেরি হল না। ওঁর হৃদয়ের গাছগাছালির মধ্যে 'trompe l'oeil' ছবির মত লুকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, গোপনে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু নজর করে দেখলে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। আমার হৃৎপিন্ডে আবার স্পষ্ট জোরালো আওয়াজ উঠতে থাকে। কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে হৃদয়ের দেওয়ালে একটা বড় পেরেক মেরে দিচ্ছে।

"বয়েস মাত্র পনের বছর হলে কী হয়, তুমি বেশ যুক্তি দিয়ে কথা বল তো!"

উত্তরে কী বলা উচিত বুঝতে পারছি না। চুপ করে থাকি।

"পনের বছর বয়েসে, আমার সবসময় মনে হত একটা অন্য কোনও জগতে চলে যাই", অল্প হেসে সাএকি-সান বললেন, "যেখানে কারুর হাত পৌঁছোয় না। সময়ও যেখানে স্থির।"

"কিন্তু এই পৃথিবীতে সেরকম কোনো জায়গা তো নেই!"

"সেটাই। সেইজন্যই তো আমি এইভাবে বেঁচে আছি। সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, মন কোথাও বসে না, বিরতিহীন সময় বয়ে যাচ্ছে যে পৃথিবীতে", সময়ের বয়ে যাওয়া বোঝাতে উনি কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ রাখলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "কিন্তু পনের বছর বয়েসে, পৃথিবীতে কোথাও একটা এরকম জায়গা নিশ্চয়ই আছে বলে ভাবতে পারতাম। এমনকি এরকম একটা পৃথক জগতে ঢোকার জন্য একটা প্রবেশপথ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলেও।"

"সাএকি-সান কি খুব একা ছিলেন? পনের বছর বয়েসের সময়?"

"এক অর্থে সেরকমই। একাই ছিলাম। একা একা ছিলাম না কিন্তু, তবু খুব একাকিত্ব ছিল। কারণ হল, বুঝতেই পারছিলাম যে এরচেয়ে বেশি সুখে আর থাকা সম্ভব নয়। এটুকুই পরিষ্কার বুঝতে পারতাম। তাই সেই অবস্থাটাতেই, সময়ের গতি থেমে গেছে এমন একটা জায়গায় ঢুকে পড়তে চাইছিলাম।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমি চাইছি, আমার যেন বয়েসটা একটু তাড়াতাড়ি বাড়ে।"

সাএকি-সান একটু দূরত্ব বজায় রেখে আমার অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করলেন। "তুমি অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি মনের জোরের অধিকারি এবং স্বাধীনচেতা। তোমার বয়েসে আমি নেহাতই বাস্তবের হাত থেকে পালানোর খোয়াবকে আঁকড়ে ধরে ছিলাম, কিন্তু তুমি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ। সেখানেই একটা বড় ফারাক রয়ে গেছে—"

আমার তেমন মনের জোরও নেই, স্বাধীনচেতাও নই। নেহাতই বাস্তব আমাকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে আর আমি বাধ্য হচ্ছি এগিয়ে যেতে। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না।

"তোমাকে যত দেখছি, কেবলি অনেক আগের পনের বছরের একটা ছেলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।"

"আমার সঙ্গে মিল আছে তার?" আমি জানতে চাই।

"তুমি আরেকটু লম্বা, আর শরীরের গঠনও আরেকটু পোক্ত। তবে মনে হচ্ছে মিল আছে। ও সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে না মিশে, সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে, বই পড়ে, গান শুনে কাটিয়ে দিত। একটু অস্বস্তিকর কথা বলার সময় তোমার মতই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ত। তুমিও অবশ্য খুব বই পড়।"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

সাএকি-সান ঘড়ির দিকে তাকান। "কফির জন্য ধন্যবাদ।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত হই। সাএকি-সান কালো একটা ফাউনটেন পেন হাতে নিয়ে, ধীরে ক্যাপটা ছাড়িয়ে, আবার লেখা শুরু করতে উদ্যত হলেন। জানালার বাইরে আবার বিদ্যুৎ চমকে ঘরটা মুহূর্তের জন্য এক অদ্ভুত রঙ ধারণ করল। অল্প পরেই বাজ পড়ার আওয়াজ এল। আগের চেয়ে সময়ের এই ফারাকটা কমে আসছে।

"জানো তো, তামুরা", আমাকে উদ্দেশ্য করে সাএকি-সান বলে উঠলেন।

আমি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘুরে দাঁড়ালাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল, অনেক আগে একবার, আমি বজ্রপাত নিয়ে একটা বই লিখেছিলাম।"

আমি চুপ করে আছি। বজ্রপাত নিয়ে বই?

"বজ্রপাত হয়েও বেঁচে যাওয়া লোকেদের খুঁজে বের করে, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম সারা দেশ ঘুরে। কয়েক বছর ধরে। বেশ কিছু ইন্টারভিউ করা গিয়েছিল, আর প্রত্যেকটাই বেশ ইন্টারেস্টিং কাহিনী। এক ছোট প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেছিল তো, খুব একটা বিক্রি হয়নি। কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি ওগুলো থেকে। আর, যার থেকে কোনো উপসংহার টানা যায় নি এমন বই কেউই তেমন পড়তে চায়নি। যদিও আমার মনে হয়েছিল যে উপসংহার টানতে না পারাটাই স্বাভাবিক।"

মাথার মধ্যে ছোট্ট একটা হাতুড়ি নিরন্তর কোনো একটা ড্রয়ারে আঘাত করেই যাচ্ছে। কিছুতেই একটুও থামছে না, আঘাত করেই যাচ্ছে। আমি কোনোভাবে মনে করার চেষ্টা করছি কী একটা জরুরি জিনিস। কিন্তু কী মনে করতে চাইছি সেটা নিজেই জানি না। সাএকি-সান আবার লেখায় মন দিলেন, আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

প্রবল বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হল এক ঘন্টা ধরে। এত প্রবল বজ্রপাত যে লাইব্রেরির যেখানে যত কাঁচ সব চূর্ণ হয়ে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছিল যতবার, ততবারই সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর স্টেইন্ড গ্লাস পুরোনো দিনের ভুতের মত দেখতে আলো সাদা দেওয়ালে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। কিন্তু দু'টোর আগেই বৃষ্টিটা ধরে গিয়ে, সবকিছু ধীরে ধীরে থিতু অবস্থায় পৌঁছেছে বলে যখন মনে হচ্ছে, হলুদ রঙের সূর্যের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। ওরকম নরম আলোর মধ্যে কেবল বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজ অব্যাহত রইল। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসায় আমি লাইব্রেরি বন্ধ করার তোড়জোড় শুরু করলাম। সাএকি-সান আমাকে আর ওশিমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। ওঁর ফোকস-ওয়াগেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। উনি ড্রাইভারের সীটে বসে চাবি ঘোরাচ্ছেন, এই চেহারাটা আমার মনে ভেসে উঠলো। এরপরের গোছগাছের কাজটা আমি একাই পারব বলে ওশিমাকে আশ্বস্ত করলাম। অপেরার আরিয়া গুনগুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

করতে করতে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ওশিমাও ফিরে গেল। ওর মাজদা রোডস্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এসে, ক্রমেই ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। এবার পুরো লাইব্রেরিটা আমার একার। অন্যান্য সময়ের চেয়েও গভীর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে সেখানে তখন।

ঘরে ফিরে এসে, ওশিমার এনে দেওয়া 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র স্বরলিপিটা দেখতে বসলাম। যেমনটা ভেবেছিলাম, অধিকাংশ কর্ডই খুব সিম্পল। আর তারপর ব্রিজের অংশটায় ভয়ানক জটিল কর্ড আছে দুটো। রীডিং রুমে গিয়ে, আপরাইট-পিয়ানোর সামনে বসে সেই আওয়াজটা বাজিয়ে দেখলাম। ফিংগারিংটা যে কী অবিশ্বাস্য কঠিন! বারবার প্র্যাকটিস করে, হাতের পেশিগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, কোনোমতে সেই আওয়াজটা যেন বেরুল। প্রথমটায় ওটাকে ভুল করে বেখাপ্পা কিছু ছাড়া অন্যরকম শোনাবে না। একবার ভাবলাম স্বরলিপিটা ভুল ছাপা হয়নি তো। কিংবা পিয়ানোর টিউনিংটা উল্টোপাল্টা হয়ে যায়নি তো। কিন্তু সেই দুটো অংশের একটার সঙ্গে আরেকটার অনুরণন বারবারই মন দিয়ে শুনে, 'সমুদ্রতটে কাফকা' গানটার মূল ভিত্তিটা মূলত এই দুটোর অনুরণনের মধ্যেই যে আছে সেটা ধরতে পারলাম। এই দুটো কর্ডের কারণেই 'সমুদ্রতটে কাফকা' একধরণের গভীরতা অর্জন করেছে যা মামুলি আর পাঁচটা পপ সং-এ পাওয়া যায় না। কিন্তু সাএকি-সান কী করে এরকম অসাধারণ কর্ড ভেবে উঠতে পারলেন তা কে জানে?

নিজের ঘরে ফিরে এসে ইলেক্ট্রিক কেটলিতে জল ফুটিয়ে নিয়ে, তাতে সবুজ-চা দিয়ে, খেলাম। তারপর স্টোররুম থেকে নিয়ে আসা রেকর্ড পরপর সাজিয়ে টার্ন-টেবিলে চাপালাম। বব ডিলানের 'ব্লন্ড অন ব্লন্ড', বীটলসের 'হোয়াইট অ্যালবাম', ওটিস রেডিং-এর 'ডক অব দা বে', স্ট্যান গেৎজ-এর 'গেৎজ/জিলবের্তু'। সবগুলোই ষাটের দশকের শেষার্দ্ধে জনপ্রিয় হওয়া গান। এই ঘরে সেই ছেলেটা—আর তার পাশে নিশ্চিত করে সাএকি-সানেরও থাকার কথা—এখনকার আমার মতো করেই এরপরের রেকর্ডগুলো টার্ন-টেবিলে চাপিয়ে, পিনটা নামিয়ে, স্পীকার থেকে বেরুনো আওয়াজ শুনছিল। সেই আওয়াজ, আমি সহ পুরো ঘরটাকেই এক ভিন্ন সময়ের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। সেই পৃথিবীতে যেখানে আমি তখনও জন্মাইনি। আমি সেইসব সংগীত শুনতে শুনতে, আজ দুপুরে দোতলার স্টাডিতে সাএকি-সানের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেসব কথাবার্তা বলেছিলাম, মাথার মধ্যে যতটা সম্ভব ঠিকঠাক সেগুলোরই আবার পুনরাবৃত্তি করিয়ে দেখলাম।

"কিন্তু পনের বছর বয়েসে, পৃথিবীতে কোথাও একটা এরকম জায়গা নিশ্চয়ই আছে বলে ভাবতে পারতাম। এমনকি এরকম একটা পৃথক জগতে ঢোকার জন্য একটা প্রবেশপথ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলেও"

আমি যেন ওঁর কণ্ঠস্বরও কানে শুনতে পাচ্ছিলাম। কী যেন আবারও মাথার ভেতর একটা দরজায় করাঘাত করতে শুরু করল। জোরালো ভাবে, ক্ষান্তিহীন।

"প্রবেশপথ"

গেৎজ/জিলবের্তু থেকে পিনটা উঠিয়ে নিলাম। তারপর 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র সিংগল-প্লে ডিস্কটা টেনে বের করে টার্ন-টেবিলে চাপালাম। পিন নামালাম জায়গামত। উনি গাইছেন।

প্রবেশের পাথরটা খোঁজে প্রাণপণ

ডুবন্ত মেয়েটার আঙুলের রেশ

তুলে নিয়ে নীল তার ঘাঘরার শেষ

দেখে সমুদ্রতটে কাফকা।

যে মেয়েটা এঘরে আসে, সে সম্ভবত প্রবেশপথের পাথরটা খুঁজে পেয়েছিল বলে মনে হয়। ও সেই পনের বছর বয়েসের সময় ভিন্ন জগতে চলে গিয়ে, রাত হলেই সেখান থেকে এই ঘরটায় চলে আসে। হালকা নীল ওয়ানপিসটা পরে, ও সমুদ্রতটের কাফকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর হঠাৎ করে কোনও সূত্র ছাড়াই আমার মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় যে বাবা বলতেন, ওঁর একবার বজ্রাহত হওয়ার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সরাসরি সেই গল্প শোনা হয়নি। কোথাকার একটা ম্যাগাজিনে ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল, সেখানেই কী করে চোখে পড়ে গিয়েছিল। তখনও চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন, গল্‌ফ কোর্সে ক্যাডির কাজ নিয়েছিলেন। জুলাই মাসের কোনো এক বিকেলে, যার হয়ে কাজ করছিলেন, তার পেছনে পেছনে কোর্সে ঘোরাঘুরির সময়, হঠাৎ করেই আকাশের রঙটা পালটে গিয়ে, বজ্রপাতসহ জোরালো বৃষ্টি এসে যায়। তারপর যে গাছের নিচে বৃষ্টির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন, পড়বি তো পড় সেটার ওপরেই বাজ পড়ে। অতবড় গাছটা মাঝখান থেকে একেবারে দু'ভাগ হয়ে পড়ে, সঙ্গের গলফারের প্রাণটা যায়, ঠিক তার আগেই কীভাবে যেন মনের মধ্যে কু গেয়ে ওঠায় বাবা গাছের নিচ থেকে লাফিয়ে সরে এসে প্রাণ বাঁচায়। সামান্য একটু পুড়ে যাওয়া, চুলগুলো জ্বলে যাওয়া, দিশেহারা হয়ে তৎক্ষণাৎ লাফ দিতে গিয়ে মুখটা পাথরে জোরে ধাক্কা খেয়ে বোধশক্তিহীন হয়ে পড়া ছাড়া তেমন কিছু হয়নি। একথাই লেখা ছিল। সেই সময়ের ক্ষতের দাগ কপালে অল্প রয়ে গিয়েছিল। এটাই আজ দুপুরে সাএকি-সানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, বাজ পড়ার আওয়াজ শুনতে শুনতে আমি মনে করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। ওই আঘাত থেকে সেরে ওঠার পর থেকেই বাবা ভাস্কর হয়ে ওঠার জন্য কাজকর্ম শুরু করে দেন।

সম্ভবত সায়েকি-সান যখন বজ্রাহত হওয়া মানুষদের নিয়ে বই লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন, তখনই বাবার সঙ্গে আলাপ হয়। সেই সম্ভাবনা আছে। যেহেতু বজ্রাহত হয়েও মৃত্যু ঠেকাতে পেরেছে এমন লোকের সংখ্যা জগতে তেমন বেশি বলে মনে হয় না।

রুদ্ধশ্বাসে আমি রাত এগিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকি। মেঘ অনেকটাই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, চাঁদের আলো এসে পড়েছে বাগানের গাছপালার ওপর। ঘটনার বড্ড বেশিই সমাপতন ঘটছে। নানা কিছু দ্রুত একটাই জায়গায় এসে মিলিত হতে শুরু করেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৬

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, এখনকার মত একটা থাকার জায়গা নিশ্চিত করতে না পারলে চলবে না। তরুণ হোশিনো তাকামাৎসু স্টেশনে ট্যুরিস্টদের খবরাখবর যোগানোর কাউন্টারে গিয়ে একটা উপযুক্ত ডর্মিটরি বুক করে এল। স্টেশন অবধি যে হেঁটেই যাওয়া যায়, সেটা এর একটা সুবিধের দিক, খুব একটা দূরছাই করার মতো ডর্মিটরিও নয়, হোশিনো বা নাকাতা কারুরই বিশেষ অপছন্দ হল না। লেপ তোষকের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুয়ে একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে, কোথাওই অসুবিধে হয় না। আগের ডর্মিটরির মতোই এখানে শুধু সকালের প্রাতঃরাশটা দেবে, রাতের খাবারটা দেবে না। কখন ঘুমিয়ে পড়বে ঠিক নেই বলে নাকাতার পক্ষে বরং এটাই সুবিধের।

ঘরে ঢুকে, সেই তরুণকে আরেকবার মেঝেতে মাদুরের ওপর উপুড় করে শুইয়ে তার ওপর চেপে বসে শিরদাঁড়ার পেছনে দু'হাতের বুড়ো আঙুল রাখল। তারপর হিপ-বোন থেকে শুরু করে শিরদাঁড়ার প্রতিটি জয়েন্ট ও পেশির অবস্থা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে গেল। এবার আর আঙুলের ডগা দিয়ে জোরে চাপ তেমন দিল না। কেবল হাড়গুলো কেমন হয়ে আছে সেটা দেখে নিল আর পেশির টেনশনটা কী অবস্থায় আছে সেটা যাচাই করে নিল শুধু।

"অ্যাঁ, সমস্যা আছে নাকি কিছু", তরুণ চিন্তিত ভাবে জানতে চায়। আবারও হঠাৎ করে ব্যথার সম্মুখীন হতে হবে কিনা, সেই আতঙ্কে।

"নাহ্, ঠিকই আছে বলে মনে হচ্ছে। এখনও অবস্থা খারাপ এমন জায়গা একটাও দেখতে পাওয়া গেল না। হাড়গুলো এখন বেশ ঠিকঠাক অবস্থায় ফিরে গেছে", নাকাতা বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তবে তো ভালই হল। সত্যি কথা বলতে কী, দু'বার করে আর ওরকম ভয়ানক কষ্ট পেতে চাইছি না", তরুণ বলে।

"হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না। তবে, আপনি বলেছিলেন কিনা যে ব্যথা সহ্য করতে পারেন, তাই নাকাতা প্রাণপণে যতটা পারা যায় জোরে চাপ দিয়েছিল।"

"সেটা অবশ্য বলেছিলাম সত্যিই। বলেছিলাম বটে, কিন্তু, কাকু, তাহলেও সব ব্যাপারেই মাত্রা বলে একটা জিনিস তো আছেই। জগতে কমন-সেন্স বলে একটা জিনিস আছে। কোমরটা সেরে গেছে বলে আর কোনোরকম অভিযোগ করা যায় না যদিও, ওফ্, ওই ব্যথাটা একেবারে স্পেশাল ছিল। জঘন্য। ভাবা যায় না কী ব্যথা! দেহটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠলাম কি না বলে মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ!"

"নাকাতা একবার তিন সপ্তাহ ধরে মৃত অবস্থায় ছিল।"

"হুম্", সেই তরুণ বলে। তারপর উপুড় হয়েই একচুমুক চা খেয়ে, কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে কিনে আনা কাকি† ফলের বীজ তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকল। "তাই নাকি, কাকু তিন সপ্তাহ ধরে মৃত ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তখন ছিলেন কোথায়?"

"সেটা নাকাতারও ভাল মনে নেই। অনেক দূরে কোথাও ছিলাম, অন্য কিছু করছিলাম বলে মনে হয়। কিন্তু মাথাটা ফাঁকাফাঁকা হয়ে গিয়ে, কিছুই আর মনে করতে পারি না। তারপর এখানে ফিরে এসে, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গিয়ে, পড়তে বা লিখতে একেবারেই পারি না।"

"পড়ার বা লেখার ক্ষমতা ওখানেই রেখে এসেছেন, তাই না? নির্ঘাত!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

† এই ফলটিকে ইংরিজিতে বলে পার্সিমন।

~ www.amarboi.com ~

"তা হতে পারে।"

ওই অবস্থায় দুজন কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বলে না। এটা যতই বিচিত্র ও উদ্ভট হোক না কেন, তখনকার মত এই বুড়ো যা বলছে সেটা সেভাবেই বিশ্বাস করে নেওয়া ভাল বলে তরুণ হোশিনোর মনে হয়েছিল। তবে, ওই 'একবার তিন সপ্তাহ ধরে মৃত অবস্থায় ছিল' ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি ভাবতে গিয়ে ঠোক্কর খেলেই, এক সমাধানহীন বিভ্রান্তির মধ্যে পা বাড়ানো হবে কি না এই উদ্বেগও মনের কোণে কাজ করছিল। অতএব প্রসঙ্গ পালটে, আরেকটু বাস্তব ঘেঁষা, প্রত্যক্ষ কোনও বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলাই স্থির করল সে।

"তাহলে, নাকাতা-সান, তাকামাৎসুতে পৌঁছে এরপর কী করবেন বলে ভাবছেন?"

"জানি না", নাকাতা বলল, "কী করা যেতে পারে, নাকাতাও ভাল জানে না।"

"আচ্ছা, আমাদের সেই 'প্রবেশপথের পাথর' বলে জিনিসটা খোঁজার কথা ছিল না?"

"হ্যাঁ। সেটাই। সেরকমই। ওটার কথা নাকাতা এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিল। পাথরটাকে খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু কোথায় গেলে যে পাথরটা খুঁজে পাওয়া যাবে, সেটা নাকাতার এখনও পুরোপুরি জানা নেই। এই জায়গাটাই ঝাপসা হয়ে আছে, খুব একটা পরিষ্কার নয়। মাথাটা আসলে তেমন ভাল নয় তো, এটুকু পর্যন্তই বেরিয়েছে, কী করা উচিত সেটা আর জানা নেই।"

"তাহলে তো মুশকিল।"

"হ্যাঁ। বেশ মুশকিল।"

"সেক্ষেত্রে, দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকের চেয়ে বসে থাকলে, তেমন ইন্টারেস্টিং কিছুই হবে না, ব্যাপারটাও এগোবে না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে যা বলেছেন।"

"তাহলে, আমি ভাবছি, আপাতত নানাজনকে জিজ্ঞেস করে করে বেড়ালে কেমন হয়। এই অঞ্চলে এরকম একটা পাথর আছে কি না—"

"হোশিনো-সান যখন এরকমটা করতে বলছেন, নাকাতাও সেটাই করে দেখতে চায়। নানাজনকে ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করব। কথাটা গর্ব করে বলার মতো নয় যদিও, নাকাতার মাথাটা ভাল নয় তো, এটা ওটা জিজ্ঞেস করে করে অভ্যস্ত।"

"হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করতে একবার লজ্জা, না করলে সারা জীবন, এ আমার দাদু খুব বলত।"

"একেবারেই তাই। মরে গেলে তখন জানা জিনিসও সবই হারিয়ে যায়, থাকে না।"

"আরে, অর্থটা ঠিক এটা নয়", মাথা চুলকোতে চুলকোতে সেই তরুণ বলে। "অবশ্য—অনেক ক্ষেত্রে কথাটা খাটে বটে। ওটা কেমন পাথর, কত বড়, কী আকারের, রঙই বা কেমন, কোন কাজে লাগে, মাথায় কোনও একটা ইমেজ নেই তার? এগুলো খানিকটা জানা না থাকলে, কারুকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাওয়াও তো মুশকিল। 'এই অঞ্চলে কি প্রবেশপথের পাথরটা আছে?' শুধু এটুকু বললে, কেউ বলতেও পারবে না, আমাদের মাথাটাই খারাপ বলেও ভাবতে পারে। তাই না?"

"হ্যাঁ। নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি কম বটে, মাথা-খারাপ নয়।"

"তাই তো দেখছি!"

"নাকাতা যেটা খুঁজছে, সেটা একটা বিশেষ পাথর। তেমন ভারি কিছু নয়। রঙ সাদা, কোনও গন্ধ নেই। কোন কাজে লাগে সেটা ভাল জানি না। এরকম গোল ওমোচিরা[1] মতো আকারের।"

দু'হাতের আঙুল দিয়ে নাকাতা একটা LP রেকর্ডের সাইজের বৃত্ত তৈরি করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

[1]একরকম খাবার জিনিস (রাইস কেক)

~ www.amarboi.com ~

"হুমম। সেরকমই যদি হয়, চোখের সামনে দেখলে বুঝতে পারবেন? এই যে, এটাই সেই পাথর বলে?"

"হ্যাঁ। একবার দেখলে চিনতে পারব।"

"পাথরটা কোত্থেকে এসেছে, এর ঐতিহ্য কী, জিনিসটার একটা ইতিহাস আছে কিনা। বিখ্যাত একটা জিনিস, বিশেষ দ্রষ্টব্যের মত করে জিনজা'তে সাজিয়ে রাখা আছে হয়তো।"

"সেসব তো নাকাতা ভাল জানে না, হয়তো সেরকমই—"

"বা হয়তো কোনো বাড়িতে আচারের বৈয়াম চাপা দিয়ে রাখতে ব্যবহার হচ্ছে!"

"না। তা হচ্ছে না।"

"কী করে জানলেন?"

"কারণ কারুকে দিয়েই ওটাকে সরানো যাবে না।"

"কিন্তু নাকাতা-সানকে দিয়ে সরানো যাবে?"

"হ্যাঁ। নাকাতাকে দিয়ে সম্ভবত সরানো যাবে—"

"সরালে কী হবে?"

যেটা সচরাচর হয় না, নাকাতা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, অথবা চিন্তাগ্রস্তের মতো মুখ করে রইল। ছোট করে ছাঁটা কাচাপাকা চুলের মাথায় বেগে হাতের তালু ঘষতে থাকল।

"সে ব্যাপারটা একেবারেই ভাল করে জানা নেই। নাকাতা এটুকু জানে যে কারুকে এবার কাজটা করতে হবে।"

সেই তরুণও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

"আর সেই কেউ হচ্ছেন নাকাতা-সান, তাই না? এখনকার মত।"

"হ্যাঁ। সেরকমই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সেই পাথরটা কেবল তাকামাৎসুতেই আছে, তাই তো", ও এবার জিজ্ঞেস করে।

"না, সেরকম কিছু নয়। জায়গাটা যেখানেই হোক, তাতে অসুবিধে নেই বলেই মনে হচ্ছে। কেবল ঘটনাচক্রে এখানে আছে। যদিও নাকানো ওয়ার্ডে হলে সবচেয়ে কাছে হত আর সুবিধেও হত।"

"কিন্তু, নাকাতা-সান, এরকম বিশেষ একটা পাথর নিজের ইচ্ছে মত সরিয়ে দিলে, কোনও বিপদ হবে না তো?"

"হ্যাঁ, হোশিনো-সান, সে যা বলেছেন, বেশ বিপজ্জনক।"

"সর্বনাশ করেছে", বলে, তরুণ হোশিনো ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে চু-নিচি ড্র্যাগনস-এর টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে, পেছনের ফুটোটা দিয়ে পনি-টেলটা বাইরে বের করে করে দিল, "এ যে দেখছি ইন্ডিয়ানা জোনসের সিনেমার মত হয়ে পড়ল!"

পরদিন সকালে, দু'জনে স্টেশনে ট্যুরিস্টদের খবরাখবর যোগানোর বুথে গিয়ে, তাকামাৎসু অথবা তার শহরতলিতে বিখ্যাত পাথর জাতীয় কিছু আছে কিনা জানতে চাইল।

"পাথর", কাউন্টারের অল্পবয়েসি মহিলাটি সামান্য ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে বলল। বিশেষ জ্ঞান দাবি করে এরকম একটা প্রশ্নের মুখে পড়ে মহিলা স্পষ্টতই হকচকিয়ে গেছে। মনোরম নিসর্গের অথবা ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জায়গা সম্বন্ধে খোঁজখবর দেওয়ার এককালীন কিছু প্রশিক্ষণ তাকে দেওয়া আছে মাত্র।

"পাথর বলতে, আদৌ কী ধরণের পাথরের কথা বলছেন?"

"কেবল একটা গোল পাথর, এই এরকম সাইজের", বলে তরুণ হোশিনো, নাকাতা যেমন দেখিয়েছিল সেই একইভাবে, দুই হাতে LP রেকর্ডের মতো একটা সাইজ তৈরি করল। "ওটাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'প্রবেশপথের পাথর' বলে বলা হয়।"

"প্রবেশপথের পাথর?"

"হ্যাঁ, ওই নামের একটা পাথর। মনে হয়, খানিকটা বিখ্যাতই।"

"প্রবেশপথ বলতে, কোথায় প্রবেশের পথ?"

"সেটা জানা থাকলে তো কোনো ঝামেলাই ছিল না!"

কাউন্টারের মহিলা খানিক ভাবল। হোশিনো ততক্ষণ শান্ত হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখশ্রী খারাপ না, কিন্তু দুটো চোখের মধ্যে ব্যবধানটা একটু বেশি। সেটার জন্য বেশ একটু সন্ত্রস্ত তৃণভোজী প্রাণীর মত দেখায় যেন বা। এখানে ওখানে ফোন করে প্রবেশপথের পাথর সম্বন্ধে জানা আছে এরকম লোক কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিল মহিলা। কিন্তু কাজে লাগতে পারে এমন খবর কিছু পেল না।

"মাফ করবেন, এই নামের কোনো পাথরের কথা কেউ শুনেছে বলে মনে হচ্ছে না", মহিলাটি বলল।

"একেবারেই না?"

মহিলা মাথা নাড়ে। "জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করবেন না, আপনারা বিশেষ করে ওই পাথরটা খুঁজতেই কি অনেক দূর থেকে এসে পড়েছেন?"

"হুঁ, বিশেষ করেই বলুন, যা-ই বলুন, আমি নাগোয়আ থেকে এসেছি। আর এই কাকু এসেছেন সেই টোকিওর নাকানো ওয়ার্ড থেকে"।

"হ্যাঁ, নাকাতা আসছে টোকিওর নাকানো ওয়ার্ড থেকে", নাকাতা বলে, "বিভিন্ন ট্রাকে চেপে, মাঝখানে ঈলমাছও খাওয়া হল। কোনও পয়সা খরচ না করে এই পর্যন্ত এসেছি।"

"ওহ", অল্পবয়েসি মহিলাটি বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে। পাথরটার কথা কারুরই জানা না থাকলে, কিছু তো করার নেই। দিদিই বা কী করবেন। তবে, নামটা যদি 'প্রবেশপথের পাথর' না-ও হয়, এই অঞ্চলে কি কোনও বিখ্যাত পাথর আছে? কোনো বিশেষ ঐতিহ্যের, কোনো লোকগাথার সঙ্গে জড়িত, পুণ্য শিলা ধরণের কিছু, যেরকমই হোক।"

কাউন্টারের অল্পবয়েসি মহিলা—মাঝখানে অনেকটা ফাঁক—এমন একজোড়া চোখ দিয়ে সেই তরুণের চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপি, পনিটেইলের চুল, সবুজ সানগ্লাস, কানে দুল, রেয়নের আলোহা শার্ট ভয়ে ভয়ে একটু নজর করে দেখে নিল।

"বলছি কী, কিছু যদি মনে না করেন, রাস্তার ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, একটা মিউনিসিপাল লাইব্রেরিতে গিয়ে নিজেরা একটু খোঁজ করে দেখবেন? পাথর টাথরের কথা আমি তেমন ভাল জানিনা কিনা।"

লাইব্রেরিতে গিয়েও তেমন ফল পাওয়া গেল না। মিউনিসিপাল লাইব্রেরিতে, তাকামাৎসু শহরের আশেপাশের পাথর সম্বন্ধে তেমন বিশদে বিশেষ কিছু লেখা আছে এমন বই নেই। রেফারেন্সের ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান বললেন, "কোথাও একটা পাথরের বিবরণ আছে সম্ভবত, তার ভেতরে কী আছে তা নিজেরা খুঁজে দেখুন", 'কাগাওয়া প্রিফেকচারের[1] লোকগাথা', 'শিকোকুর কোবো দাইশি-র আখ্যানমালা", 'তাকামাৎসুর ইতিহাস' এরকম সব বই পর্বতপ্রমাণ স্তূপ করে রাখা আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তরুণ হোশিনো সন্ধ্যে পর্যন্ত টানা পড়ে গেল সেইসব। নাকাতা পড়তে পারে না, ততক্ষণ 'জাপানের বিখ্যাত পাথর' বলে ফোটো-অ্যালবামের একটা একটা করে পাতা উলটে উলটে মহা উৎসাহে গিলে খাওয়ার মতো করে দেখল।

"নাকাতা মোটেই পড়তে পারে না বলে, লাইব্রেরিতে আসা এই প্রথম", নাকাতা বলল।

[1]প্রিফেকচার খানিকটা এখানকার জেলার মত আয়তনের অঞ্চল

"লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, পড়তে পারলেও, আমারও লাইব্রেরিতে এই প্রথম আসা", তরুণ হোশিনো তাতে বলে।

"এসে তো দেখছি, বেশ ভালই লাগছে!"

"সে তো ভাল কথা।"

"নাকানো ওয়ার্ডেও লাইব্রেরি আছে। ভাবছি এরপর থেকে মাঝেমাঝেই গিয়ে দেখব তো। বিনামূল্যে প্রবেশটাই সবচেয়ে ভাল। লিখতে পড়তে না জানলেও যে লাইব্রেরিতে ঢোকা যায়, নাকাতা জানত না।"

"আমার খুড়তুতো ভাই, জন্মে থেকে চোখে দেখে না, তবু প্রায়ই সিনেমা হলে যায়। কী যে পায়, আমার কোনও ধারণাই নেই।"

"তাই নাকি, নাকাতা চোখে দেখে, কিন্তু সিনেমা হল বলে জায়গাটায় এখনো যাওয়া হয়নি।"

"ওমা, তাই? ঠিক আছে এবার একদিন সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

দুজনে যে টেবিলে বসে ছিল, লাইব্রেরিয়ান সেখানে এসে সাবধান করে বলল অত জোরে লাইব্রেরিতে কথা না বলতে। এতে দুজনেই কথা বলা বন্ধ করে, নিজের নিজের পড়াশুনোয় মন দিল। 'জাপানের বিখ্যাত পাথর' পড়া হয়ে গেলে নাকাতা ওটা ফের তাকে রেখে দিয়ে, এবার 'জগতের বেড়াল' নিয়ে পড়ল।

তরুণ হোশিনো নানা অভিযোগ সহকারে গজগজ করতে করতে, সেই প্রর্বতপ্রমাণ বইগুলোয় কোনোক্রমে সংক্ষেপে চোখ বুলিয়ে নিল। দুর্ভাগ্যবশত পাথর সম্বন্ধে তেমন বেশি কিছু সেখানে লিপিবদ্ধ নেই। তাকামাৎসু দুর্গের পাথরের দেওয়াল নিয়ে কিছু লেখাপত্র আছে বটে, কিন্তু সেই দেওয়ালের পাথর নাকাতা সহজে হাতে করে ওঠাতে পারবে এমন আয়তনের নয়। এছাড়া কোবো দাইশি-র কিছু উপকথা আছে পাথর নিয়ে। উষর জমিতে কোবো দাইশি (বৌদ্ধ সাধকগুরু) একটা পাথর সরাতেই সেখান থেকে বগবগ করে জল বেরিয়ে এসে উর্বর ধান্যক্ষেত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলে কথিত আছে। কোনও এক কবিতায় 'শিশুমণির পাথর' বলে বিখ্যাত এক পাথর আছে বটে, কিন্তু সেটা এক মিটার লম্বা লিঙ্গের আকারের বলে নাকাতার 'প্রবেশপথের পাথর' হওয়া অসম্ভব।

হাল ছেড়ে দিয়ে সেই তরুণ আর নাকাতা লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে, কাছেই এক রেস্তোরাঁতে ঢুকে রাতের খাবার খেয়ে নিল। দুজনেই তেনদোন (ভাত আর মাছভাজা) খেল। সেই তরুণ তার ওপর একবাটি কাকে-উদোন (ঝোলের মধ্যে নুডলস) অর্ডার করে খেল।

"লাইব্রেরিটা বেশ মজার ব্যাপার", নাকাতা বলে, "পৃথিবীতে সত্যিই নানারকম দেখতে বেড়াল আছে। নাকাতা জানত না।"

"পাথরের ব্যাপারে খুব একটা কিছু পাওয়া গেল না যদিও, কিছু তো করার নেই, সবে তো শুরু করেছি মাত্র", সেই তরুণ বলে, "রাতটা আয়েশ করে ঘুমিয়ে নিই, কাল হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।"

পরদিনও সকালেই দু'জনে সেই একই লাইব্রেরিতে গেল। গতদিনের মতই তরুণ হোশিনো পাথর সম্পর্কিত কিছু থাকতে পারে এরকম বই বেছে নিয়ে ডেস্কে স্তূপীকৃত করে, আদ্যোপান্ত পড়ে চলল। এভাবে এত বই পড়া, জন্মাবধি এই প্রথম। এর ফলে শিকোকুর ইতিহাস তো খুঁটিয়ে জানা হলই, প্রাচীনকাল থেকে বহু পাথর যে ধর্মবিশ্বাসীর উপাস্য হয়ে উঠেছে তা-ও জানা হল। কিন্তু আসল যে প্রবেশপথের পাথর, সেটা নিয়ে কোনো তথ্যের হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু তারপর, যা হয় আর কি, অতিরিক্ত পড়ার ফলে বিকেলের দিকে ক্রমে মাথায় যন্ত্রণা হতে লাগল। দু'জনে তখন লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে, পার্কের লনের ওপর শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে মেঘেদের আনাগোনা দেখতে থাকল। তরুণ হোশিনো সিগারেট খেল, নাকাতা থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরম হোজি-চা খেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"আগামিকাল বজ্র-ঠাকুর নেমে আসবেন খুব করে", নাকাতা বলে।

"বাপরে! তাই বলে আপনি আবার ডেকে আনবেন না তো?"

"না, নাকাতা ডেকে আনবে না। নাকাতার সেই ক্ষমতা নেই। বজ্র-ঠাকুর নেহাতই নিজে থেকেই নেমে আসবেন।"

"তাও ভাল", সেই তরুণ বলে।

ডর্মিটরিতে ফিরে, গরমজলের চৌবাচ্চায় খানিক কাটিয়ে উঠে এসে নাকাতা বিনাবিলম্বে বেডিং-এর মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই তরুণ টেলিভিশনের আওয়াজটা কমিয়ে দিয়ে বেসবল চ্যানেল দেখতে থাকল বটে, জায়ান্টস দলটা বিপক্ষ-দল হিরোশিমার বিরুদ্ধে অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে জিতছে বলে মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়ে সুইচ অফ করে দিল। এদিকে ঘুমও পাচ্ছে না, গলাটা শুকনো লাগছে, ইচ্ছে হল বীয়ার খাওয়ার আর তাই বাইরে বেরোতে মনস্থ করল। একটা বীয়ার খাওয়ার জায়গা চোখে পড়ে গিয়ে, সেটায় ঢুকে ড্রাফ্‌ট বীয়ার অর্ডার করল, সঙ্গে নিল ওনিয়ন রিংস। কাছেই থাকা একটা মেয়েকে আস্তে করে ডাকবে কিনা একবার ভাবল, তারপর খুব যে একটা স্বস্তি সহকারে ডাকতে যাচ্ছে বলে নিজেরই মনে না হওয়ায় আর ডাকল না। কাল আবার সকাল থেকেই সেই পাথর খোঁজা চালিয়ে যেতে হবে।

বীয়ার খাওয়া শেষ হলে দোকান থেকে বেরিয়ে, চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপিটা মাথায় দিয়ে, এদিক ওদিক একটু হাঁটল। জায়গাটা তেমন ইন্টারেস্টিং কিছু নয়। কিন্তু একটা অচেনা নগরীতে একা একা যেকোনো দিকে হেঁটে বেড়াতে মন্দ লাগে না। হাঁটতে ওর এমনিতে ভালই লাগে। মুখের একপাশে একটা মার্লবরো গুঁজে, দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে, এক রাজপথ থেকে অন্যটায়, এ গলিতে সে গলিতে, সেই তরুণ পদচারণা করে গেল। যখন সিগারেট খাচ্ছে না, তখন শিস দিচ্ছে। যেমন আছে প্রাণচঞ্চল মহল্লা, তেমনই নির্জন জনমনুষ্যহীন এলাকাও। কিন্তু রাস্তা যেমনই হোক, ও তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে অপরিবর্তিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবীন বয়েস, স্বাধীন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ভয়ের তো কিছু নেই।

সার দিয়ে ছোট ছোট কারাওকে-বার কিংবা স্ন্যাক-বার (দেখেই মনে হয় ছ'মাস অন্তর নাম পালটে যায়), এরকম একটা সরু গলি থেকে বেরিয়ে এসে, বড়রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে এরকম একটা সামান্য অন্ধকার জায়গায় কে যেন পেছন থেকে ডাক দিল, "হোশিনো, অ্যাই হোশিনো!"

ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল লোকটা।

প্রথমটায় সেই তরুণের মনে হয়নি যে ওকেই ডাকছে। তাকামাৎসুতে ওকে চেনে এরকম কেউ থাকার কথা নয়। হয়তো অন্য কোনও হোশিনোকে ডেকে দাঁড়াতে বলছে। নামটা তত ঘনঘন শোনা না গেলেও, তেমন বিরল নামও কিছু নয়। তাই আর ফিরে না দেখে সোজা হেঁটে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু সেই ব্যক্তি, পেছনে ধাওয়া করার মত করে, নাছোড়বান্দা ভাবে ওকে পেছন থেকে ডেকেই চলল, "হোশিনো, অ্যাই হোশিনো!"

বাধ্য হয়ে তরুণ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরল। ধপধপে সাদা স্যুট পরা ছোটখাটো এক প্রবীণ দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার চুল সাদা, চশমা চোখে এক সজ্জন ব্যক্তি, গোঁফ এবং ছোট করে ছাঁটা দাড়ি এবং যথারীতি সাদা। সাদা শার্টের ওপর কালো স্ট্রিং-টাই বেঁধেছেন। মুখশ্রী জাপানিদের মতোই, কিন্তু সব মিলিয়ে অ্যামেরিকার দক্ষিণাংশের গ্রামাঞ্চলের ভদ্রলোক বলে মনে হবে। উচ্চতা ১৫০ সেন্টিমিটারের বেশি নয়, কিন্তু সবকিছুর অনুপাত এমন যে ছোটখাটো বলার চেয়েও, বরং ক্যালকুলেট করে মাপটা কমিয়ে মিনিয়েচার সাইজের মানুষের মতো দেখতে লাগে। যেন একটা ট্রে ধরে আছেন, এইভাবে দুটো হাতই পাশাপাশি সামনে বাড়িয়ে রেখেছেন।

"হোশিনো", প্রবীণ ওকে ডাকলেন। বেশ স্পষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। কথায় একটু টান আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তরুণ হোশিনো ফ্যালফ্যাল করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, "আজ্ঞে—!"

"ঠিকই ধরেছ, কর্নেল স্যান্ডার্স।"

"হ্যাঁ, অবিকল তাই তো", সেই তরুণ চমৎকৃত হয়ে বলে।

"অবিকল নয়, আমিই কর্নেল স্যান্ডার্স।"

"সেই ফ্রাইড চিকেনের!"

প্রবীণ ভারিক্কি চালে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় জানায়, "ঠিক তাই।"

"আরে, কিন্তু আপনি, আমার নাম জানলেন কী করে?"

"চু-নিচি ড্র্যাগনসের ফ্যানদের আমি সবসময় হোশিনো বলে ডাকি। যেমন কি না, জায়ান্টস বললেই নাগাশিমা, চু-নিচি বললেই হোশিনো।"

"তবে কিনা, কাকু, ঘটনাবশত সত্যিই আমার নাম হোশিনো।"

"সেটা অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলে গেল। আমার কিছু করার নেই!" নস্যাৎ করে দেওয়ার ভঙ্গিতে কর্নেল স্যান্ডার্স বলে।

"তা, আমার সঙ্গে কোনো দরকার?"

"ভাল মেয়ে আছে!"

"হুমম্", হোশিনো বলে। "বুঝলাম। কাকু তাহলে খদ্দের ধরছেন। তাই এরকম বেশ ধারণ করেছেন।"

"দ্যাখো হোশিনো, আবারও বলছি, আমি কোনও ছদ্মবেশ ধরিনি। আমি কর্নেল স্যান্ডার্স। সে ব্যাপারে যেন কোনও ভুল না হয়।"

"আরে, কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি সত্যিই কর্নেল স্যান্ডার্সই হবেন, তাকামাৎসুতে একটা গলিতে মেয়ের জন্য খদ্দের ধরছেন কেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনার মত বিখ্যাত মানুষ কেবল লাইসেন্স ফী থেকেই অজস্র টাকা কামিয়ে এতদিনে অ্যামেরিকার কোথাও একটা প্রাসাদোপম বাড়িতে পুলসাইডে আলস্যে সুখী অবসর যাপন করার কথা।"

"জগতে টাইট খাওয়া বলেও কিছু আছে।"

"ওহ্!"

"তুমি হয়তো বুঝবে, টাইট খাওয়া বলে ব্যাপারটা আছে বলেই, শেষে একসময় ত্রিমাত্রিক গহ্বর বলে একটা জিনিসের সৃষ্টি হয়। সবকিছুই একেবারে সরলরেখায় চাইলে সেট-স্কোয়্যার দিয়ে আঁকা পৃথিবীতে বাস করাই শ্রেয়।"

"আরে, কাকু, আপনারও তো কথাবার্তা দেখছি বিলকুল অদ্ভুত হয়ে গেছে", মুগ্ধভাবে সেই তরুণ বলে, "একেবারে খুবই দামি কথা। কিন্তু ইদানিং দেখছি অদ্ভুত সব কাকুদের সঙ্গেই মোলাকাত হওয়ার যোগ পড়েছে। বেশিদিন এভাবে চললে, একসময় পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণাই পালটে যাবে বলে মনে হয়!"

"সে যাই হোক না কেন, এবার বল হোশিনো, মেয়ে চাও, না চাও না।"

"তার মানে, ফ্যাশন হেলথ, অর্থাৎ ম্যাসাজ পার্লার?"

"ফ্যাশন হেলথ কী?"

"ওখানে আসল কম্মোটি করতে দেবে না, জিভ দিয়ে, হাত দিয়ে, এটা ওটা করে বীর্যপাত করিয়ে দেবে, কিন্তু ঢোকাঢুকি চলবে না।"

"ওসব নয়", কর্নেল স্যান্ডার্স বিরক্ত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন। "ওসব নয়, ওসব নয়। ও জিনিস নয়। শুধু মুখ দিয়ে হাত দিয়ে নয়, সবকিছু করতে দেবে। ঢোকাঢুকিও চলবে।"

"তাহলে কি সোপ?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সোপ মানে?"

"ওঃ, কাকু, লোকের সঙ্গে এসব তামাশা বুঝেশুনে করবেন। আমার সঙ্গে অন্য লোক আছে, কাল সকাল সকাল কাজ আছে। ফলে, এখন কোনও নিশি-ক্রীড়ার মধ্যে ফালতু ফালতু যাব না।"

"মেয়ে চাই না তাহলে?"

"আজ রাতে মেয়েও চাই না, ফ্রাইড চিকেনও চাই না। এখন ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ব।"

"অত সহজে ঘুম আসবে", কর্নেল স্যান্ডার্স অর্থপূর্ণ স্বরে বলে। "যা খুঁজছে তা ঠিকঠাক খুঁজে না পেলে, মানুষ ঠিকমত ঘুমোতে পারে না হোশিনো।"

হোশিনো হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

"যা খুঁজছে? কাকু জানলেন কী করে যে কিছু খুঁজছি?"

"মুখে পরিষ্কার লেখা আছে। হোশিনো একজন আদ্যন্ত সৎ মানুষ। সবকিছু পুরোটা মুখে ফুটে ওঠে। হোশিনোর মাথায় কী ঘুরছে সেটা, কেটে ফাঁক করা ম্যাকারেল মাছের পেটের মতই, যে দেখতে জানে সে সবটা দেখতে পায়।"

তরুণ হোশিনোর ডানহাতটা আপনা থেকেই উঠে গালটা চুলকোয়, তারপর সে হাতের তালুটা প্রসারিত করে সেদিকে দেখতে থাকে। কিন্তু সেখানে কিছু নেই। 'মুখে লেখা আছে'।

"এক্ষেত্রে", কর্নেল স্যান্ডার্স একটা আঙুল শূন্যে তুলে ধরে বলে, "হোশিনো যেটা খুঁজছে, সেটা কি একটা শক্ত, গোল মত জিনিস নয়?"

তরুণ হোশিনোর ভুরু কুঁচকে যায়। "আচ্ছা কাকু, আপনি আসলে কে? এতটা জানলেন কী করে?"

"এইজন্যই তো বলছিলাম, মুখেই লেখা আছে। এ এক্কেবারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুই বুঝতে পারছে না রে", কর্নেল স্যান্ডার্স আঙুল নাড়তে নাড়তে বলে। "এমনি এমনিই এতগুলো বছর ধরে এই কারবার চালাচ্ছি না। সে যাই হোক, সত্যিই কি মেয়ে লাগবে না?"

"দেখুন, আমরা একটা পাথর খুঁজছি। প্রবেশপথের পাথর বলে একটা পাথর।"

"হুঁ, প্রবেশপথের পাথর হলে, সেটার কথা আমার ভালই জানা আছে।"

"সত্যিই?"

"আমি মিথ্যে বলি না। রসিকতাও করি না। জন্মে থেকেই এই শর্মা সাদাসিধে স্বভাবের কাঠখোট্টা ধরণের লোক—এর কখনো অন্যথা হয়নি।"

"পাথরটা কোথায় আছে, সেটাও কি কাকুর জানা আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় আছে, সেও ভালমতই জানি।"

"ইয়ে, সেক্ষেত্রে, জায়গাটার কথা একটু জানতে পারি?"

কর্নেল স্যান্ডার্স চশমার কালো ফ্রেমটা আঙুল দিয়ে একটু ছুঁয়ে নিয়ে একবার গলা খাঁকরে নিলেন, "তাহলে, হোশিনো, সত্যিই মেয়ের দরকার নেই?"

"পাথরের ব্যাপারটা যদি বলে দেন, তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে", দ্বিধাগ্রস্তভাবে তরুণ হোশিনো বলে।

"ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই, কর্নেল স্যান্ডার্স গলি দিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। হোশিনো হতভম্ব ভাবে পেছনে পেছনে চলল।

"আরে, কাকু! কর্নেল!—আমার পার্সে এখন মাত্র ২৫০০০ ইয়েন আছে কিন্তু!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল স্যান্ডার্স জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলেন। "ওতেই যথেষ্ট। মেয়েটা দারুন হাসিখুশি, দেখতে সুন্দর, উনিশ বছর মাত্র বয়েস, হোশিনোর জন্য স্পেশাল গ্র্যান্ড সার্ভিস, মুখ দিয়ে, হাত দিয়ে, ঢুকিয়ে, যেভাবে খুশি। তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে এরপরে পাথরটার কথাও বলে দেব।"

"খেয়েছে রে!" হোশিনো বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৭

মেয়েটা যে এসে গেছে সেটা যখন খেয়াল হল, তখন ২টো বেজে ৪৭ মিনিট। মাথার কাছের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা মনে করার চেষ্টা করলাম। গতরাতের চেয়ে একটু আগেই। আজ রাতে আমি পুরোটা জেগে থেকে ওর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলাম। চোখের পলক ফেলার সময় ছাড়া একবারও চোখ বন্ধ করিনি। তা সত্ত্বেও মেয়েটার আবির্ভাবের সঠিক মুহূর্তটা ধরতে পারিনি। যখন খেয়াল হল, ও ততক্ষণে এসে গেছে। আমার চেতনায় যে জায়গাটুকুতে ফাঁক থেকে গিয়েছিল সেখানে যেন চট করে ঢুকে পড়ে হাজির হয়ে গেছে।

অন্যান্য সময়ের মতই ও হালকা নীল রঙের একটা ওয়ানপিস পরে আছে। তারপর ডেস্কের ওপর হাতে চিবুকের ভর রেখে 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র ছবির দিকে শান্তভাবে চেয়ে আছে, আর আমি রুদ্ধশ্বাসে নিথর হয়ে সেদিকে চেয়ে আছি। ছবি, মেয়েটা, আর আমি, এই তিনটে বিন্দু দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধ ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। মেয়েটার যেমন ছবিটার দিকে তাকিয়ে আশ আর মেটে না, তেমনই আমারও ওর দিকে তাকিয়ে আর আশ মেটে না। ত্রিভুজটা একেবারে স্থির, এতটুকু নড়চড় নেই। এমন সময় অকস্মাৎ একটা জিনিস ঘটল।

"সাএকি-সান", বলে নিজের অজান্তেই আমি ডেকে বসলাম। ওঁকে নাম ধরে ডাকার কথা ভাবিইনি। নেহাতই মনের ভেতরের আকুতিটা কণ্ঠস্বর হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মাত্র। তাও খুবই ক্ষীণস্বরে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর মেয়েটার কানে পৌঁছোল। আর তাতে নিশ্চল ত্রিভুজটার একটা কোণ ভেঙে গেল। গোপনে আমি সেটাই চাইছিলামও হতে পারে, চাইছিলাম না এমনও হতে পারে।

উনি এদিকে তাকালেন। খুব নির্দিষ্ট করে নজর করে যে দেখলেন, এমন নয়। ডেস্কের ওপর হাতে চিবুকের ভর রাখা অবস্থাতেই শুধু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শান্তভাবে মুখ ঘোরালেন। ঠিক যে কী সেটা ভাল করে বুঝতে না পারলেও, যেন বাতাসের মৃদু ঝাপটা অনুভব করলেন। বুঝতে পারছি না মেয়েটা আমাকে দেখতে পাচ্ছে কিনা। কিন্তু আমি চাই ওঁর চোখ আমার ওপর পড়ুক। আকুল হয়ে চাইছি, আমি যে বেঁচে আছি আর এখানেই রয়েছি, সেটা উনি যেন টের পান।

"সাএকি-সান", আমি আবারও ডাকি। ওঁর নামটা মুখে আনার জোরালো ইচ্ছেটা কিছুতেই দমন করতে পারছি না। গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে গিয়ে, অথবা সাবধান হয়ে গিয়ে হয়তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। তারপর হয়ত আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না। তা হলে আমি ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ব। না, ঠিক হতাশ বলা যায় না। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ব, চারপাশের দৃশ্য সবই অর্থ হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু তাও সই, ওঁর নাম মুখে না এনে আমি পারব না। আমি কিছু না ভাবতেই, বারবারই ওঁর নামটা, প্রায় আপনা থেকেই, আমার জিভে, ঠোঁটে, তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা এখন আর ছবির দিকে দেখছে না। আমাকে দেখছে। অন্ততপক্ষে ওর দৃষ্টিপথ আমি যেখানে, সেই দিকে ঘোরানো। এখান থেকে ওর অভিব্যক্তি পড়ে ওঠা যাচ্ছে না। মেঘেরা সঞ্চরমান, আর সেই অনুযায়ী চাঁদের আলোর আসা যাওয়া। বাতাস বইছে হয়তো, কিন্তু কানে সেই আওয়াজ এসে পৌঁছচ্ছে না।

"সাএকি-সান", আমি আরেকবার বললাম। কীসের তাগিদ যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আর হাতের ওপর চিবুকের ভর না রেখে, ডানহাতটা মুখের সামনে আনল। যেন বলতে চাইল, "কিছু বোলো না"। তবে, সত্যি করে সেটাই বলতে চাইল কি? এক্ষুণি গিয়ে কাছ থেকে সোজা ওর চোখের মণির দিকে তাকাতে পারলে ভাল হত বলে মনে হল। ভাবলাম, যদি গিয়ে পড়ে নেওয়া যেত ও এখন কী ভাবছে, কেমন অনুভূতি হচ্ছে ওর। ওই কয়েকটা ভঙ্গিতে আমাকে কী জানাতে চাইল, কী ইঙ্গিত দিল, এগুলো বুঝতে পারলে হত বলে মনে হল। কিন্তু সেই সবেরই অর্থ সেই রাত ৩টের কিছু আগের ঘন অন্ধকারে যেন বন্দী হয়ে রইল। হঠাৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেই কেমন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে বলে বোধ হওয়াতে আমি চোখ বুজে ফেললাম। বুকের ভেতর যেন বাতাসের একটা শক্ত দলা। ঠিক যেন জলভরা মেঘ সরাসরি গিলে ফেলেছি। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ খুলে, দেখি মেয়েটা মিলিয়ে গেছে। পেছনে পড়ে আছে নির্জন চেয়ারটা। ডেস্কের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়াটা সন্তর্পণে পার হয়ে গেল।

আমি বিছানা থেকে বেরিয়ে, জানালায় গিয়ে রাতের আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। তারপর প্রত্যাবর্তনহীন সময়ের কথা ভাবলাম। নদীর কথা ভেবে, তারপর জোয়ার ভাঁটা নিয়ে ভাবলাম। অরণ্যের কথা ভেবে, প্রস্রবণের কথা ভাবলাম। বৃষ্টির কথা ভেবে, বজ্রের কথা ভাবলাম। পাহাড়ের কথা ভাবলাম। ছায়া নিয়ে ভাবলাম। সবই আমার মধ্যে আছে।

পরদিন দুপুর গড়াতেই সাদা পোষাকে গোয়েন্দা এসে হাজির হল লাইব্রেরিতে। আমি নিজের ঘরে ছিলাম বলে সেকথা জানতাম না। গোয়েন্দা মিনিট কুড়ি ওশিমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তারপর ফিরে গিয়েছিল। ওশিমা পরে আমার ঘরে এসে সেই গল্প বলল।

"স্থানীয় পুলিশের গোয়েন্দা। তোমার কথা জানতে চাইছিল", ওশিমা ফ্রিজটা খুলে একটা পেরিয়ের-এর বোতল বের করে, সেটার ঢাকনাটা মুচড়ে খুলে, গ্লাসে ঢেলে একটু খেল।

"এখানকার কথা জানল কী করে?"

"তুমি হয়তো মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিলে। বাবার জিনিস।"

আমি স্মৃতি হাতড়ে দেখি। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। যে রাতে জিনজার বনের মধ্যে পড়ে ছিলাম আর শার্টে রক্ত লেগে গিয়েছিল, সেই রাতে মোবাইল ফোনে আমি সাকুরাকে ফোন করেছিলাম।

"মাত্র একবার", আমি বললাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সেই কলটার রেকর্ড থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে যে তুমি তাকামাৎসুতে এসেছ। সাধারণত এতটা খুঁটিনাটি পুলিশের থেকে জানা যায় না, কথায় কথায় বলে ফেলেছে। বলতে পার, লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলব ভাবলে খুব ভালমতই জমিয়ে তুলতে পারি। কথার সূত্রে বোঝা গেল, তুমি যে নম্বরে ফোন করেছিলে সেটা যে কা'র তা পরিষ্কার বোঝা যায়নি বলে তাকে সম্ভবত খোঁজাও যায়নি। হয়তো প্রি-পেইড মোবাইলের নম্বর ছিল। কিন্তু তাকামাৎসু শহরের অভ্যন্তরে যে অবশ্যই ছিলে, সেটা জানতে পেরে, স্থানীয় পুলিশ থাকার ব্যবস্থা আছে এমন প্রত্যেকটি জায়গায় হানা দিয়েছে। এভাবেই, এ শহরে ওয়াইএমসিএ-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এমন একটা বিজনেস হোটেলে তামুরা কাফকা নামের, এবং তোমার সঙ্গে মিল আছে এমন একটি ছেলে যে কিছুদিন কাটিয়েছিল, সেটা বের করতে পেরেছে। ২৮-শে মে, অর্থাৎ যেদিন তোমার বাবা কারুর হাতে খুন হয়েছিলেন, সেদিন পর্যন্ত।"

ফোন নাম্বার থেকে পুলিশ যে সাকুরার পরিচয়টা বের করতে পারেনি, সেটুকু অন্তত বাঁচোয়া। আমার দিক থেকে ওকে আর বেশি ঝামেলায় ফেলা উচিত হবে না।

"তোমার সম্বন্ধে যে আমাদের লাইব্রেরিতে খোঁজখবর করেছিল, হোটেলের ম্যানেজারের সেকথা মনে পড়েছিল। সত্যিই তুমি রোজ এখানে এসে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছ কিনা সেটা ফোন করে যাচাই করে নিয়েছিল। সেকথা মনে আছে তো?"

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই।

"সেই কারণেই পুলিশ এখানে এসে হাজির হয়েছিল।"

পেরিয়ারে একবার চুমুক দেয় ওশিমা। "আমি অবশ্য ওকে সত্যিটা বলিনি। বলেছি যে ২৮ তারিখ থেকে, এরপরে আর তোমাকে একবারও দেখা যায়নি। ওইদিন পর্যন্ত রোজকার মত এখানে যাতায়াত করছিল। ওইদিন থেকেই আর ওর চেহারা দেখা যায়নি।"

"পুলিশকে মিথ্যে বলাটা খুব বাজে ব্যাপার হবে", আমি বললাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু আমি মিথ্যে না বললে, তোমার খুব বাজে ব্যাপার হবে।"

"আমার কারণে ওশিমা-সানকে কোনও ঝামেলায় ফেলতে চাই না যে!"

চোখ কুঁচকে হাসে ওশিমা, "বুঝতে পারছ না। তুমি অলরেডি আমাকে এটায় জড়িয়ে ফেলেছ।"

"সেটা অবশ্য খুবই সত্যি—"

"অতএব ঝামেলায় ফেলা নিয়ে আলোচনা থাক। ওটি ইতিমধ্যে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। এখন আর ওসব নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ হবে না।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে নীরবে সায় দিই।

"সে যাই হোক, গোয়েন্দাপ্রবর তার ভিজিটিং কার্ডটি রেখে গেছেন। বলে গেছেন, তোমাকে আবার এখানে দেখা গেলে যেন তক্ষুণি ফোন করি।"

"আমি কি এই কেসের অভিযুক্ত হয়ে পড়লাম নাকি?"

ওশিমা ধীরে ধীরে ক'বার ঘাড় নাড়ে। "উহুঁ, তুমি অভিযুক্ত বলে মনে হয় না। কেবল, এতে কোনও ভুল নেই যে তুমি হচ্ছ তোমার বাবার খুনের মামলায় একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। আমি আগাগোড়া খবরের কাগজে এটায় কদ্দূর কী হচ্ছে অনুসরণ করে গেছি, তদন্ত যেন খুব একটা এগোচ্ছে না, পুলিশ খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। আঙুলের ছাপও পাওয়া যায়নি। কিছু খোয়াও যায়নি। কোনও প্রত্যক্ষদর্শীও নেই। সূত্র হিসেবে রইল একমাত্র তোমার মত কেউ। সুতরাং যেভাবেই হোক তোমাকে ওদের খুঁজে বের করতেই হবে। যতই হোক, তোমার বাবা একজন বিখ্যাত লোক, টেলিভিশন, সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা, এরা সবাই এটা নিয়ে পড়েছে ভীষণরকম। এই অবস্থায় পুলিশেরও তৎপর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"কিন্তু ওশিমা-সান সত্যি কথা বলেননি জানতে পেরে, সেই কারণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে আর নেহাত সাক্ষী বলে গণ্য না করলে, আমি সেদিনের ব্যাপারে অ্যালিবাইটা হারাব। আমিই হয়তো অপরাধী বনে যাব।"

ওশিমা আরেকবার মাথা ঝাঁকাল। "শ্রীমান তামুরা কাফকা, জাপানের পুলিশ অত বোকা নয়। ওদের কল্পনাশক্তি যে খুব প্রখর, তা হয়তো বলা যাবে না, তবে অপদার্থ মোটেই নয়। পুলিশ ইতিমধ্যে শিকোকু থেকে টোকিওর প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের নামের লিস্ট এক এক করে চেক করে রাখার কথা। তার ওপর, তুমি হয়তো জান না, এয়ারপোর্টের গেটে ভিডিও ক্যামেরা ফিট করে, যাত্রীদের আসা যাওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড করে রাখা হয়। তুমি যে ওইসময় টোকিওতে ফিরে যাওনি সেটা ওদের যাচাই করে রাখার কথা। জাপান দেশটাতে তথ্য জিনিসটার ব্যবহার অতটাই খুঁটিয়ে করা হয়ে থাকে। সুতরাং পুলিশও তোমাকে অপরাধী বলে ভাবছে না। তোমাকে যদি অপরাধী বলে মনে করত, তবে আর স্থানীয় গোয়েন্দা নয়, সরাসরি পুলিশের সদরদপ্তর থেকে গোয়েন্দা এসে হাজির হত। সত্যি যদি তা হত, তাহলে ওরা আরো সিরিয়াস হত, আর আমিও অত সহজে বলে দিয়ে পার পেয়ে যেতাম না। এখনকার মত ওরা তোমার মুখ থেকে ঘটনার সময়ের পরিস্থিতিটা কেবল জানতে চাইছে।"

ভেবে দেখলে, সত্যিই ওশিমা যা বলছে সেরকমই হওয়ার কথা।

"যাই হোক না কেন, এখন ক'দিন একটু লোকের সামনে না বেরনোই ভাল, বুঝলে তো", ও বলে। "এমনও তো হতে পারে, পুলিশের লোক হয়তো এই অঞ্চলে টহল দিতে দিতে চোখ খোলা রাখছে। ওদের কাছে তোমার ডুপ্লিকেট ছবি ছিল। জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রদের নামের লিস্ট থেকে কপি করা ফটো, আসলের সংগে মিল তেমন আছে বলে বলা যায় না। তুমি কেমন যেন— বেশ রাগী রাগী মুখ করে আছো সেখানে।"

ওটাই আমার রেখে আসা একমাত্র ছবি। ছবি উঠে যেতে পারে এরকম যাবতীয় সম্ভাবনা আমি এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু ক্লাসের ছবি তোলার সময় কোনওভাবেই পালানো সম্ভব ছিল না।

"পুলিশের লোকটা বলছিল যে তুমি নাকি স্কুলে যে ধরণের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছেলেরা ঝামেলা সৃষ্টি করে, সেরকম ছিলে। ক্লাসের ছেলেদের মারধোর করে, তিন তিনবার সাসপেন্ড হওয়ার শাস্তি পেয়েছিলে বলে বলছিল।"

"দুবার, তাও সাসপেন্ড হইনি, বাড়িতে আটকে রাখার শাস্তি", আমি বললাম। বড় করে শ্বাস নিয়ে, ধীরে ছাড়লাম, "কখনো হয়েছিল বটে এরকম, আমার।"

"নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতে না", ওশিমা বলে।

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"আর তারপর লোককে জখম করে দিতে, তাই তো?"

"সেটা করা উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু একেকসময় নিজের মধ্যেই অন্য কেউ যেন আছে বলে বোধ হত। তারপর যখন হুঁশ হত, দেখতাম কারুকে হয়তো জখম করে বসেছি।"

"কতটা", ওশিমা জানতে চায়।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। "তেমন জখম কিছু নয়। হাড় ভেঙে দেওয়া কিংবা দাঁত ভেঙে দেওয়ার মতো অতটা ভয়ানক কিছু নয়।"

ওশিমা বিছানায় বসে পা দু'টো জড়ো করে রেখেছে। হাত দিয়ে সামনের চুলগুলো পেছনে ঠেলে দেয়। নেভি-ব্লু রঙের চিনোজ প্যান্টস আর সাদা অ্যাডিডাসের জুতো। সঙ্গে কালো রঙের পোলো-শার্ট।

"কোনো না কোনো ভাবে কত অজস্র কিছু যে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছ, দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো পার হয়ে যাওয়াই ভাল", ও বলে।

'অজস্র কিছু, যেগুলো পার হয়ে যাওয়াই ভাল', আমি ভাবতে থাকি। তারপর মুখ তুলি। "ওশিমা-সানের ক্ষেত্রে, পার না হলেই নয় এরকম ব্যাপার কিছু নেই?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওশিমা দুহাত শূন্যে তুলে বলে, "পার হওয়াই বলো আর যাই বলো, আমার করণীয় হিসেবে রয়েছে কেবল একটাই ব্যাপার। আমার এই নশ্বর দেহটি, এই ক্রুটিতে ভরা আধারটির মধ্যে কোনোক্রমে দিনের পর দিন টিঁকে যাওয়া ছাড়া সেটি আর কিছু নয়। ব্যাপারটি, সহজ বললে সহজ, কঠিন বললে কঠিন। যেটাই হোক, সুচারুভাবে সেটা পেরে উঠলেও তেমন দারুণ কোনও সাফল্য হিসেবে দেখা হবে না। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে আপ্লুত হয়ে হাততালি দিয়েও উঠবে না।"

আমি ঠোঁটটা কামড়ে রাখি কিছুক্ষণ।

"সেই আধার থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবেন না?" আমি প্রশ্ন করি।

"মানে, আমি আমার এই নশ্বর দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা?"

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় জানাই।

"প্রতীকী অর্থে না কি সত্যি সত্যি?"

"যেটাই হোক", আমি বলি।

ওশিমা হাত দিয়ে সামনের চুলগুলোকে পেছনে পাঠিয়ে দিতেই থাকে। ফর্সা কপালটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, তার ভেতরে ভাবনার গিয়ার যে ফুলস্পীডে ঘুরে যাচ্ছে সেটা যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

"তুমি সেরকমটা করার কথা ভাবছ নাকি?" প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উলটে আমাকেই প্রশ্ন করে ওশিমা।

আমি একবার শ্বাস নিই।

"ওশিমা-সান, আপনাকে সত্যি কথাটা বলি, নিজের এই জলজ্যান্ত আধারটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। জন্মে থেকে একবারের জন্যও ভাল লাগেনি। বরং আগাগোড়া এটাকে ঘেন্না করে এসেছি। এই আমার মুখ, আমার দুই হাত, আমার রক্ত, আমার জিন—যে কোনো কারণেই হোক, বাবা-মা'র থেকে পাওয়া যাবতীয় কিছুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিশাপ বলেই গণ্য করে এসেছি। সম্ভব হলেই এসবের থেকে এক্কেবারে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়ার কথা ভেবেছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মতো।"

ওশিমা প্রথমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হাসে। "একটা চমৎকার ভাবে গড়ে ওঠা শরীর আছে তোমার। কোনও একজনের থেকে পেয়েছ, মুখটাও ভারি হ্যান্ডসাম। হ্যান্ডসাম বলাটা হয়তো একটু বেশিই ব্যক্তিগত বিচার হয়ে গেল, খারাপ কিছুতেই নয়। আমার অন্তত বেশ লাগে। বেশ চটপটে ভাব আছে। পুরুষাঙ্গটিও দারুণ। আমারও ওরকম একটা থাকলে ভাল হত বলে ভাবি। এরপর একসময়, বহু মেয়ের স্বপ্ন তৈরি হবে তোমাকে নিয়ে। এরকম একটা সত্যিকারের আধার নিয়ে আদৌ কেন যে অতৃপ্তি সে আমি বুঝতে পারছি না।"

আমি লাল হয়ে যাই।

ওশিমা বলে যায়, "বুঝতেই পারছি। অবশ্যই সমস্যা সেটা নয়। কিন্তু দ্যাখো, আমার নিজের এই দৃষ্টিগোচর আধারটি মোটেই আমার মনের মতো নয় সেটাতে সন্দেহ নেই। যেভাবেই ভাবি না কেন প্রকৃত কথাটা ফুটে ওঠে না, এমনই জিনিস। সুবিধে অসুবিধের দিক থেকে দেখলে, স্পষ্টতই বেশ অসুবিধেজনক। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আমি মনে মনে এভাবে ভাবি—বাইরের খোলসটা আর প্রকৃত সত্ত্বাটা যদি উলটে নিই—অর্থাৎ, বাইরের খোলসটাকে প্রকৃত সত্ত্বা হিসেবে ভেবে, প্রকৃত সত্ত্বাটাকে বাইরের খোলস মনে করি—তাহলে হয়তো আমাদের অস্তিত্বের যেটা অর্থ বলে মনে হয়, সেটা অনেকটা সহজে বোধগম্য হবে।"

আরো একবার আমার দুই হাতের দিকে তাকালাম। ওখানে যে অত রক্ত লেগে ছিল, সেই কথা ভাবলাম। সেই চটচটে হয়ে লেগে থাকার অনুভূতিটা পরিষ্কার মনে পড়ল। নিজের প্রকৃত সত্ত্বা আর বাইরের খোলস নিয়ে ভাবলাম। আমি বলে যে খোলসটা, সেটায় মুড়ে রাখা আমি বলে যে প্রকৃত সত্ত্বা, তার বিষয়ে। কিন্তু মাথার ভেতর কেবল সেই রক্তের অনুভূতিটাই ভেসে ভেসে উঠল।

"সাএকি-সানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন", আমি বলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কেমন বলতে?"

"অতিক্রম করতে হবে এরকম কিছু ওঁর ক্ষেত্রেও আছে কি?"

"সেটা তুমি সরাসরি সাএকি-সানকে জিজ্ঞেস করে দেখলেই পার", ওশিমা বলে।

দু'টোর সময় আমি ট্রেতে কফি নিয়ে সাএকি-সানের ওখানে গেলাম। সাএকি-সান দোতলার স্টাডিতে ডেস্কের সামনে বসে। দরজা খোলা। অন্যান্য সময়ের মতোই ডেস্কে লেখার কাগজ আর ফাউন্টেন পেন রাখা আছে। তবে ফাউন্টেন পেনের ক্যাপটা লাগানো। ডেস্কের ওপর দুহাত রেখে উনি শূন্যে চেয়ে আছেন। কিছু দেখছেন বলে মনে হল না। উনি যেদিকে তাকিয়ে, সেটা এক অস্তিত্বহীন জায়গা। একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওঁর পেছনে জানালাটা হাট করে খোলা, প্রথম গ্রীষ্মের বাতাসে সাদা লেস লাগানো পর্দাটা দুলছে। দৃশ্যটা যেন খুব সুন্দর করে আঁকা রূপকময় একটা ছবি, দেখার মত।

"ধন্যবাদ", আমি কফিটা ডেস্কের ওপর রাখতে, উনি বললেন।

"আপনাকে ক্লান্ত লাগছে।"

মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিলেন। "হ্যাঁ। আর ক্লান্ত হলেই অনেকটা বয়স্ক দেখায়।"

"তা নয়। অন্যান্য সময়ের মতোই চমৎকার দেখাচ্ছে সাএকি-সানকে", আমি অকপটেই বললাম।

সাএকি-সান হাসলেন। "মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, বয়েসের অনুপাতে তুমি বেশ ভাল জান।"

আমি লাল হয়ে যাই।

উনি চেয়ারের দিকে নির্দেশ করেন। আগের দিন যে চেয়ারটায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বসেছিলাম, সেটাই, এক্কেবারে একই জায়গায় রাখা। আমি ওটায় বসলাম।

"কিন্তু জানো তো, ক্লান্তিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমি। তবে, তুমি মনে হয় এখনো অভ্যস্ত হওনি।"

"মনে হয় অভ্যস্ত হইনি।"

"পনের বছর বয়েসে আমিও অবশ্যই অভ্যস্ত হইনি।"

কফির কাপের হ্যান্ডলটা ধরে উনি কফিতে চুমুক দিলেন।

"তামুরা-সান, জানালার বাইরে কী চোখে পড়ছে?"

আমি ওঁর পেছনের জানালার বাইরেটায় চোখ ফেলি। "গাছ, আকাশ এবং মেঘ দেখা যাচ্ছে। আর গাছের ডালে পাখি বসে আছে।"

"সচরাচর সব জায়গাতেই এরকম দৃশ্য দেখা যায়, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"যদি এরকম হয় যে কাল থেকে আর এটা দেখা যাবে না, তাহলে কি এটাই তোমার কাছে একটা বিশেষ কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য হয়ে পড়বে না?"

"সেরকম হবে বলেই তো মনে হয়।"

"এভাবে কখনো ভেবে দেখেছ কোনো কিছু নিয়ে?"

"দেখেছি।"

ওঁর মুখ দেখে, কেমন হকচকিয়ে গেছেন বলে মনে হল— "কিরকম পরিস্থিতিতে?"

"যখন প্রেমে পড়েছি", আমি বললাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাএকি-সান একটু স্মিত হাসি হাসলেন। হাসিটুকু কিছুক্ষণ ওঁর মুখে লেগে রইল। ছোট্ট গর্তের মধ্যে গ্রীষ্মের সকালে ছেটানো জলের যেটুকু তলানি রয়ে যায়, সেরকম দেখাল হাসিটা।

"তুমি প্রেমে পড়েছ", উনি বললেন।

"হ্যাঁ।"

"আর তাহলেই, সেই মেয়ের মুখ আর চেহারা তোমার কাছে প্রত্যেকদিনই বিশেষরকম, আর খুব কাঙ্ক্ষিত—"

"তা ঠিক। কখন হারিয়ে ফেলি ঠিক নেই।"

সাএকি-সান কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। মুখে আর সেই হাসিটা নেই।

"ধর, একটা পাখি যেন একটা সরু ডালে বসে আছে", সাএকি-সান বলেন। "বাতাসে ডালটা খুব দুলছে। আর সেই দোলনের সঙ্গে পাখিটার দৃষ্টিপথও অনেকটা করে দুলছে। সেরকমই না?"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"এই অবস্থায় পাখিটা কীভাবে নজর স্থিতিশীল রাখে বল দেখি?"

"আমি ঘাড় ঝাঁকাই। "জানি না!"।

"গাছের ডালের দোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ওঠানামা করায়। এরপর যেদিন জোরে হাওয়া দেবে, সেদিন পাখিদের ভাল করে লক্ষ্য করে দেখো। আমি প্রায়ই এই জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি। তোমার মনে হয় না, এরকম জীবন বেশ ক্লান্তিকর? যে ডালে বসে আছো তার দুলুনির সঙ্গে বারবার ঘাড় দুলিয়ে বেঁচে থাকার যে জীবন?"

"মনে করি।"

"কিন্তু পাখিদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। ওদের ক্ষেত্রে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। নিজেদের অজানিতেই করতে পারে। ফলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা যতটা ভাবি ততটা ক্লান্ত হয় না। কিন্তু আমি তো মানুষ, পরিস্থিতি বিশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।"

"সাএকি-সান কি কোথাও কোনো গাছের ডালে বসে আছেন?"

"সেরকম ভেবে নেওয়া যেতে পারে", উনি বলেন। "আর মাঝেমাঝে জোরে বাতাস দেয়।"

কাপটা ফের ডিশের ওপর রেখে দিয়ে, পেনের ক্যাপটা খুলে নিলেন। এবার আমাকে উঠতে হবে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

"সাএকি-সান। একটা কথা আপনার থেকে খুব জানতে ইচ্ছে করছে", আমি বলেই ফেলি।

"ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নিশ্চয়ই?"

"ব্যক্তিগত ব্যাপারই। আর অনুচিতও হয়তো।"

"কিন্তু খুব জরুরি প্রশ্ন, তাই না?"

"হ্যাঁ। আমার কাছে খুব জরুরি।"

উনি ফের কলমটা ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলেন। ওঁর চোখে কেমন একটা উদার ঝিলিক দেখা গেল, "ঠিক আছে। প্রশ্নটা করেই ফেল!"

"সাএকি-সানের কি সন্তান আছে?"

শ্বাস নিয়ে, অল্প সময় নিলেন। ওঁর মুখের অভিব্যক্তি ধীরে দূরে কোথাও যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। তারপর আবার ফিরে এল। ঠিক যেন একই রাস্তা ধরে একটা প্যারেড সামনে এগিয়ে গিয়ে, অল্প সময় পরে ফিরে এল।

"একথা জানতে চাইছ কেন?"

"ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই চাইছি। নেহাতই খেয়ালবশতঃ নয়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উনি মোটা মঁব্লাঁ পেনটা হাতে নিয়ে কালির পরিমাণটা দেখে নিলেন। কীরকম লেখা পড়ছে, কতটা মোটা হয়ে, সেও দেখলেন। তারপর পেনটা ডেস্কের ওপর আবার রেখে দিয়ে, মুখ তুলে চাইলেন।

"বুঝলে তো শ্রীমান তামুরা, কিছু মনে কোরো না, এই ব্যাপারে ইয়েস বা নো, কোনোটাই বলতে পারছি না। অন্ততপক্ষে, এখনকার মত। ক্লান্তও লাগছে, বাতাসও দিচ্ছে জোর।"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "মাফ করবেন, এরকম কথা জিজ্ঞেস করা হয়তো উচিত হয়নি, তাই না?"

"সে ঠিক আছে। বিশেষ অনুচিত কিছু করনি", সাএকি-সান প্রশ্রয়ের গলায় বললেন। "কফির জন্য ধন্যবাদ। তোমার তৈরি কফিটা খেতে বেশ লাগে।"

দরজার বাইরে গিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই। চলে যাই নিজের ঘরে, তারপর। বিছানায় গিয়ে বইয়ের পাতা খুলে বসি। কিন্তু লেখাগুলো মাথায় ঢুকতে চায় না। পরপর সারি দেওয়া অক্ষরগুলো কেবল চোখ দিয়ে অনুসরণ করে যাই। এলোমেলো সংখ্যার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে বিশেষ প্রভেদ কিছু নেই। বই রেখে, জানালার কাছে গিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকি। গাছের ডালে পাখি বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও বাতাস নেই। আমি যার প্রেমে পড়েছি, সে কি পনেরো বছরের মেয়ে যে সাএকি-সান, না কি ইদানিং পঞ্চাশ পার হয়ে যাওয়া সাএকি-সান, ক্রমেই আর বুঝতে পারছি না। এদের মধ্যে যে বিভাজন রেখাটা দুলছে, সেটা ক্ষীণ হয়ে গেছে, ছবি দুটো আর ঠিকমত একত্র করতে পারছি না। বিভ্রান্ত করে তুলছে এটা আমাকে। আমি চোখ বুজে, আমার মনের ভেতরের মূল অক্ষটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

কিন্তু, ওই যে। ঠিক সাএকি-সান যেরকমটা বলেছিলেন। সাএকি-সানের মুখশ্রী, চেহারা, আমার দৃষ্টিতে দিন কে দিন বিশেষরকম কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৮

কর্নেল স্যান্ডার্সের শরীরটা বয়েসের তুলনায় নির্ভার, হাঁটাচলা দ্রুত। ঠিক যেন একজন প্রশিক্ষণ পাওয়া জগার। তার ওপর মহল্লার গলিঘুঁজি সব যেন নখদর্পণে। শর্টকাট করার জন্য কখনো অন্ধকার সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে, শরীর কাৎ করে দুটো বাড়ির মধ্যে দিয়ে গলে যাচ্ছিলেন। লাফ দিয়ে ড্রেন পার হয়ে, ঘেরাটোপের ভেতর থেকে ডাকতে থাকা কুকুরকে ছোট করে ধমকে দিচ্ছিলেন। আঁটোসাঁটো সাদা স্যুটের পেছনটা, তড়িঘড়িতে কোথায় যাবে খুঁজতে থাকা ভূতের মতো নগরীর অলিগলি পলকে পার হয়ে যাচ্ছিল। সেই চেহারা যেন নজরের বাইরে চলে না যায় সেই ভাবে কোনওক্রমে হোশিনো ওর পেছন পেছন লেগে রইল। ততক্ষণে সে হাঁফাতে শুরু করেছে, বগল ঘেমে গেছে। ছেলেটা পেছনে ঠিকঠাক আছে কিনা কর্নেল স্যান্ডার্স একবার ফিরেও দেখেননি।

"আরে, কাকু, এখনও অনেক দূর নাকি", আর না পেরে হোশিনো পেছন থেকে হাঁক দিল।

"বলো কী, অল্পবয়েসি ছোকরা! এ তো কোনও হাঁটাই নয়", কর্নেল স্যান্ডার্স নির্বিকার ভাবে পেছনে না ফিরেই বললেন।

"কিন্তু, কাকু, আমি তো এখন খদ্দের। এত হাঁটালে তো আর সেক্সের চাহিদেটাই চলে যাবে!"

"একেবারে যাচ্ছেতাই করুণ অবস্থা দেখছি! যতই হোক, পুরুষমানুষ তো। এইটুকুতেই খুইয়ে ফেলার মতো নড়বড়ে চাহিদে হলে, বরং একেবারে প্রথম থেকেই না থাকা ভাল।"

"আহাহা", তরুণ বলে।

কর্নেল স্যান্ডার্স [illegible] থেকে বেরিয়ে এসে ট্র্যাফিক সিগনালকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভ্রূক্ষেপ না করে বড়রাস্তা পার হয়ে, আরো খানিকটা হাঁটলেন। তারপর ব্রিজ পার হয়ে, জিনজার ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বেশ বড় একটা জিনজা, কিন্তু তখন অনেক রাত, চত্বরে জনমনিষ্যি নেই। কর্নেল স্যান্ডার্স জিনজার অফিসের সামনের বেঞ্চিটা দেখিয়ে, ওখানে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বেঞ্চির পাশেই বড় একটা মার্কারি-ভেপার-ল্যাম্প। চারপাশ দিনের মতই উজ্জ্বল। নির্দেশমত সেই তরুণ বেঞ্চিতে বসতেই, কর্নেল স্যান্ডার্সও পাশে এসে বসে পড়লেন।

"আরে, কাকু, কোনওভাবেই এখানে কিছু করার কথা উঠছে না তো", অস্বস্তির গলায় তরুণ হোশিনো বলে।

"বোকার মত কথা বোলো না। মিয়াজিমার হরিণ নাকি, যে জিনজার চত্বরের মধ্যেই ঢোকাঢুকি করার কথা ভাববো! একেবারে যা খুশি বলবে নাকি, আমাকে কী ভাবছো", কর্নেল স্যান্ডার্স পকেট থেকে রূপোলি রঙের মোবাইল ফোন বের করে তিন ডিজিটের সংক্ষিপ্ত নম্বর টিপলেন।

"হ্যাঁ, আমি", অন্যদিক থেকে সাড়া পেতেই কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন। "সেই একই জায়গায়। জিনজাতে। পাশে হোশিনো বলে একটি ছেলে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাই। যেমন হয় আর কি। বুঝতে পারছি। তাই তাড়াতাড়ি চলে এসো।"

কর্নেল স্যান্ডার্স মোবাইলের সুইচ অফ করে, সাদা কোটের পকেটে চালান করে দিলেন।

"আপনি প্রতিবার এইভাবে জিনজাতে মেয়ে ডেকে আনান", তরুণ হোশিনো জানতে চায়।

"সেটা খারাপ?"

"না, আলাদা করে খারাপ কিছু নয়, তবে আরো উপযুক্ত জায়গাও তো আছে। আরেকটু স্বাভাবিক কোনো জায়গা—যেমন ধরুন, কোনো ক্যাফেতে কিংবা হোটেলের ঘরে, যেখানে সরাসরি দেখা করা যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"জিনজা যেহেতু একটা শান্ত জায়গা। বাতাসও পরিষ্কার।"

"সেটা ঠিকই। তবে, রাতের বেলা জিনজার অফিসের সামনে বেঞ্চে বসে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতে কেমন অস্বস্তি হয়। কেমন যেন সেই গল্পের শেয়ালের কাছে ধোঁকা খাচ্ছি বলে মনে হয়।"

"কীসব বলছ! শিকোকু নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করছ না তো? তাকামাৎসু হল গিয়ে জেলার সদর, রীতিমত নগরী বলে গণ্য হয়। এখানে শেয়াল বেরোবে?"

"শেয়ালের কথাটা রসিকতা করে বললাম বটে, তবে কিনা, কাকু তো এখন সার্ভিস-ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছেন, ভাবছিলাম যে আরেকটু পরিবেশ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে ভাল হত না কি? জাঁকজমকেরও তো খানিকটা দরকার। অবশ্য এ নিয়ে আমার মাথা না ঘামালেও চলবে সম্ভবত।"

"মাথা না ঘামালেও চলবে", অবিচলিত কণ্ঠে কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন। "আর ওই পাথরের ব্যাপারটা—"

"হ্যাঁ, বলুন, পাথরের ব্যাপারটা।"

"কিন্তু, আগে এই কাজটা সেরে ফেল। তারপর কথাবার্তা।"

"কাজটা ইম্পর্ট্যান্ট?"

কর্নেল স্যান্ডার্স বেশ ক'বার সামনে মাথা ঝোঁকালেন। তারপর অর্থপূর্ণভাবে দাড়িতে হাত বোলাতে থাকলেন। "ঢোকাঢুকিটা সবার আগে জরুরি। যাগযজ্ঞের মত ব্যাপার। আগে ঢোকাঢুকি। পাথর নিয়ে এর পরে কথা বলা যাবে। এই মেয়েটাকে তোমার পছন্দ হবেই, হোশিনো। ধরাছোঁয়ার মধ্যে দামে এটিই আমাদের নাম্বার ওয়ান মেয়ে। রসালো বুক, চামড়াটা মসৃণ, পেছনটা এরকম এরকম দোলে, আসল জায়গাটা ঠিক যেমন চাও, আস্ত একটা সেক্স-মেশিন। গাড়ির সঙ্গে তুলনা করলে, প্রথমত বিছানায় যেন ফোর-হুইল ড্রাইভ, ভোঁও করে চালিয়ে দিলেই টার্বো কামনা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঙুলের ভেতর ধরা উত্তাল শিফট-নব, একটা কর্নার, মেজাজে গিয়ার চেঞ্জ করে দাও, ওভারটেক করার লেন পাওয়া গেছে, ফুলস্পীডে চালিয়ে দাও, চালাও, হোশিনো একেবারে দারুনভাবে শেষ!"

"কাকু এক ইউনিক ক্যারেকটারের লোক", তরুণ হোশিনো তারিফ করে বলে।

"এভাবেই এই বিজনেসে পেট চালাচ্ছি।"

পনের মিনিট পরে মেয়েটির আগমন ঘটল। ঠিক কর্নেল স্যান্ডার্স যেমনটি বলেছিলেন, সুন্দরীর ফিগারটি অসাধারণ। আঁটোসাঁটো কালোরঙের মিনিড্রেস পরা, কালো হাইহিল পায়ে, কালো এনামেল করা ছোট্ট শোল্ডার-ব্যাগ কাঁধে ঝোলানো। মডেল হলেও দিব্যি মানিয়ে যাবে। পুষ্ট স্তন, বড় নেকলাইনের জন্য আংশিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

"কী, চলবে তো, হোশিনো", কর্নেল স্যান্ডার্স জানতে চান।

হোশিনো হতভম্ব মুখে, কথা না বলে মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় জানায়। কী যে বলা উচিত, মুখে কথা আসে না।

"অসাধারণ সেক্স-মেশিন এটি, হোশিনো। উরি বাবারি, কী ভালো যে লাগবে", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন। এই প্রথম আমুদে হাসি হাসলেন, সঙ্গে তরুণ হোশিনোর পশ্চাদ্দেশে চিমটি কেটে দিলেন।

মেয়েটি তরুণ হোশিনোকে সঙ্গে নিয়ে জিনজা থেকে বেরিয়ে, কাছেই একটা লাভ-হোটেলে গিয়ে ঢুকল। স্নানের চৌবাচ্চা ওফুরোয় গরমজল ভরে, প্রথমে নিজে অবলীলায় নগ্ন হয়ে নিয়ে, তারপর হোশিনোকে নগ্ন করল। চৌবাচ্চায় হোশিনোর শরীরটাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে, জিভ দিয়ে চেটে চেটে, তারপর শুরু হল এক এমন শিল্পময় ফেলাশিও, যা ও না আগে কখনো দেখেছে, না শুনেছে। কোনও কিছু ভাবার অবকাশই পেল না তরুণ হোশিনো,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তার বীর্যপাত হয়ে গেল।

"ইস, ভাবা যায় না, এই প্রথম এরকম হল", বাথটাবে অলসভাবে শরীর ডুবিয়ে দিতে দিতে হোশিনো বলে।

"তাই নাকি, এ তো সবে শুরু", মেয়েটা বলে, "এর চেয়েও অনেক অনেক চমৎকার সব ব্যাপার এখনও আছে।"

"এতেই বেশ লাগল কিন্তু!"

"কতটা?"

"ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়ে দেওয়ার মতই!"

"অতীত যখন অলক্ষ্যে ভবিষ্যৎকে গ্রাস করে চলেছে সেটাই আসলে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু আমরা অনুভব করি, সবই ততক্ষণে স্মৃতি।"

তরুণ মুখ তুলে, অর্দ্ধেক হাঁ করে, মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, "এটা, কী?"

"অঁরি বার্গসঁ", পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে ঠোঁট লাগিয়ে বীর্যের বাকিটুকু চেটে নিতে নিতে মেয়েটা বলে, "হুইফ হোহিওফ!"

"ভাল করে শুনতে পেলাম না।"

"'সামগ্রী ও স্মৃতি', পড়েন নি?"

"পড়িনি বলেই মনে হয়", তরুণ হোশিনো একটু ভেবে নিয়ে বলে। স্থলভাগের সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের স্পেশাল ভেহিকলের অপারেশন ম্যানুয়ালটা খুঁটিয়ে পড়াটুকু বাদ দিলে (আর লাইব্রেরিতে দু'দিন ধরে শিকোকুর ইতিহাস আর প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান করা বাদ দিলে), সাপ্তাহিক কমিকসের বাইরে আর বলার মত কিছু পড়ার তেমন স্মৃতি নেই।

"তুমি পড়েছো?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি সামনে মাথা ঝোঁকায়। "না পড়লে তো চলবে না। ইউনিভার্সিটিতে আমার বিষয় হল দর্শন। সামনেই পরীক্ষা।"

"বুঝেছি", হোশিনো মুগ্ধ হয়ে বলে, "এটা তোমার তাহলে পার্ট-টাইম কাজ"

"হ্যাঁ, ট্যুইশন ফী দিতে হবে যে!"

এরপর মেয়েটা সেই তরুণকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে, আঙুলের ডগা আর জিভ শরীরে মোলায়েম করে বুলিয়ে দিতে লাগলো। অবিলম্বেই এইভাবে আরেকবার বীর্যপাতও করিয়ে দিল। কার্নিভ্যালের মরসুম এগিয়ে আসা পিসার হেলানো টাওয়ারের মতো জিনিসটা ছিল একটু সামনে ঝোঁকা, দৃঢ় ও উত্থিত।

"দ্যাখো দ্যাখো, হোশিনো বাবাসোনার মধ্যে এখনও জোশ ছিল", মেয়েটা বলল। তারপর সিরিজের পরবর্তী প্রক্রিয়াটির তোড়জোড় শুরু করল। "কোনও বিশেষ ফর্মাইশ আছে? সেটা তাহলে করে দিতে পারি। মিঃ স্যান্ডার্স সেরকমই বলে দিয়েছেন। ভাল করে অনেকরকম সার্ভিস দিতে বলা আছে।"

"ফর্মাইশ করার মত কিছু মাথায় আসছে না, আরো কিছু দর্শনের কথা শোনাবে? কিছুই বুঝব না যদিও, কিন্তু তাহলে হয়তো বীর্যপাত একটু দেরি করে হবে। নইলে এভাবে চললে তো আবার শিগগিরিই হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

"তা বটে। একটু পুরনো ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে যদিও, হেগেল হলে চলবে?"

"সে নিয়ে ভাবার কিছু নেই। পছন্দসই কিছু হলেই হবে।"

"হেগেলই ভাল হবে। একটু পুরনো, ঝাক্কাস জিনিস, ওলডিজ, বাট গুডিজ।"

"হোক তাহলে!"

"আমিই সম্পর্কের উপাদান, আবার আমিই সম্পর্ক স্থাপন করি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ধ্যুৎ"।

"হেগেল 'আত্ম-চেতনা' কথাটার প্রবর্তন করেন। মানুষ যে কেবলমাত্র বস্তুর সঙ্গে নিজের প্রভেদ করে উঠতে পারে তাই নয়, মধ্যবর্তী বস্তু হিসেবে নিজেকে প্রোজেক্ট করে, কার্যত নিজেকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে বলে ভাবত। সেটাই আত্ম-চেতনা।"

"একেবারে কিছুই বুঝলাম না।"

"সেটাই হল এককথায়, আমি এখন তোমাকে যা করে দিচ্ছি, হোশিনো বাবুসোনা। আমার জন্য আমিই 'আত্ম', আর হোশিনো হল 'বস্তু'। হোশিনোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবশ্যই এর উলটো। হোশিনো হল 'আত্ম', আর আমি 'বস্তু'। এভাবেই আমরা পরস্পর 'আত্ম' আর 'বস্তু' পালটা পালটি করে নিয়ে এবং একসঙ্গে সেটা প্রজেক্ট করে, আত্ম-চেতনা প্রতিষ্ঠা করছি। কার্যত। যদি সহজ করে বলি"

"ভাল বুঝলাম না বটে, কেমন যেন বেশ চাঙ্গা বোধ করছি।"

"সেটাই পয়েন্ট", মেয়েটা বলে।

সব হয়েটয়ে যাওয়ার পর মেয়েটার থেকে বিদায় নিয়ে, একা একা জিনজাতে ফিরে দেখে, আগের মতই বেঞ্চিতে কর্নেল স্যান্ডার্স একইভাবে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন।

"আরে, কাকু, সেই থেকে টানা এখানে অপেক্ষা করছেন নাকি", হোশিনো জিজ্ঞেস করে।

কর্নেল স্যান্ডার্স বেশ ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়লেন, "ভাব করছ যেন কিছুই জান না। আমি এই এতক্ষণ ধরে যেন এমনি এমনিই এরকম একটা জায়গায় চুপচাপ অপেক্ষা করছি! আর কোনও কাজ নেই বলে দেখে মনে হচ্ছে? তুমি যখন কোথাও একটা বিছানায় ফূর্তিতে একেবারে ডুবে ছিলে, ততক্ষণ গলির ভেতরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবিরত কাজ করে যেতে হচ্ছিল, এমনই কপাল। একটু আগে খবর দিল যে হয়ে গেছে, পা চালিয়ে এখানে ফেরত এলাম তখন। কেমন, আমাদের সেক্স-মেশিন, একেবারে দারুণ না?”

“হ্যাঁ, বেশ ভাল। আমি খুশি। সেটাই বড় কথা। কার্যত তিনবার বীর্যপাত হল। শরীরের ওজন যেন দু'কিলো কমে গেছে, এমন হালকা লাগছে!”

“এর চেয়ে ভাল আর কী চাই? বলছিলাম সেই পাথরটার কথা।”

“হ্যাঁ, ওটা খুব জরুরি ব্যাপার একটা।”

“আসলে, পাথরটা এই জিনজার গাছগাছালির বনের মধ্যে আছে।”

“প্রবেশপথের পাথর যেটা!”

“ওটাই। প্রবেশপথের পাথরটাই। ”

“কাকু, এটা কোনওভাবেই বানিয়ে বলা কথার কথা নয় তো?”

কথাটা শুনে কর্নেল স্যান্ডার্স চোয়াল দৃঢ় করে মুখটা তুললেন। “কী আর বলব, নির্বোধের মত কথা বললে। এখন অবধি একটাও বাজে কথা বলেছি আমি? আবোলতাবোল কিছু মুখে এনেছি কি? বলেছিলাম চনমনে সেক্স-মেশিন, সত্যিই চনমনে সেক্স-মেশিনই ছিল কিনা? তার ওপর ফার্স্টক্লাস সার্ভিস, লজ্জা করে না, মাত্র ১৫০০০ ইয়েনে তিন তিন বার বীর্যপাত করিয়েছ, এর পরেও লোকটার কথায় অবিশ্বাস?”

“না না, মোটেই অবিশ্বাস করছি না। অত রেগে যাবেন না প্লীজ। নইলে ঘটনা এমন টকাটক এগিয়ে যেতে থাকল, যে একটু কেবল মাথা নেড়েছি। দেখুন না, এমনিই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, আর কোত্থেকে বিচিত্র রূপ ধরে কাকু এসে ডাক দিলেন, পাথরের কথা বাতলে দেবেন বলে, সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দারুণ একটা মেয়ের সঙ্গে সারারাত—”

“তিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে যাই হোক, তিনবার হল, তার ওপরে আবার তক্ষুণিই বললেন যে সেই খুঁজতে থাকা পাথরটা আছে, এতকিছুতে যে কেউই দিশেহারা হয়ে যাবে।"

"তবুও তো তুমি বুঝছ না। এটাই তো জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন", জিভ দিয়ে একটা আওয়াজ করে কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন, "জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন প্রাত্যহিকতার সীমারেখা পেরিয়ে যায়। ওটা ছাড়া জীবন কীসের? কেবল পর্যবেক্ষণের যুক্তি থেকে আত্মনিয়োগের যুক্তিতে উত্তীর্ন হতে হয় এর মাধ্যমে, এবং এ হেলাফেলার জিনিস নয়। যা বলছি, তা কিছু বোধগম্য হচ্ছে কি, ভাণসর্বস্ব বুদ্ধু রাঘববোয়াল?"

"আত্ম ও বস্তুর প্রোজেকশন পালটাপালটি—", নিরীহভাবে হোশিনো বলে।

"একদমই তাই। এটুকু বুঝতে পারলেই হবে। ওটাই পয়েন্ট। সঙ্গে এসো। সত্যি সত্যি ওই মহিমাময় পাথরের দর্শন করিয়ে দেব। খুব বড় সার্ভিস, হোশিনো বাবুসোনা!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৯

লাইব্রেরির পাবলিক টেলিফোন থেকে আমি সাকুরাকে ফোন করলাম। ভেবে দেখলে, সেই যে ওর অ্যাপার্টমেন্টের ঘরে থাকতে দিয়েছিল, তারপর থেকে আর একবারও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। সাধারণভাবে যে দু'এক লাইন লিখে রেখে এসেছিলাম, ওই অবধিই। সেকথা ভেবে একটু লজ্জাই করল। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েই সোজা লাইব্রেরিতে এসে, ওশিমার সঙ্গে ওর গাড়িতে ওদের কেবিনে এসে পড়েছিলাম। সেখানে পাহাড়ের ভেতর টেলিফোন যায় না, একা একা কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। তারপর তো লাইব্রেরিতে ফিরে, সেখানে থাকতে থাকতে লাইব্রেরিতে কাজ পেয়ে গেলাম। ওখানে সাএকি-সানের জীবিত আত্মা (ওরকমই কিছু একটা) দেখলাম প্রতি রাতে। এরপর সেই পনের বছরের মেয়েটার গভীর প্রেমে পড়ে গেলাম অপ্রতিরোধ্যভাবে। পরপর নানা ঘটনা ঘটল। কিন্তু সেসব বললে তো হবে না।

রাত ন'টায় ফোন করলাম। ছ'বার বাজার পর ও এসে ধরল।

"কোথায় কী করছিলে বলতো এতদিন ধরে?" কঠোরস্বরে সাকুরা বলে।

"তাকামাৎসুতেই আছি এখনও।"

কিছুক্ষণ ও কোনও কথা বলে না। ধৈর্য ধরে চুপ করে আছে। পেছনে টেলিভিশনের গানের প্রোগ্রামের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ফোনে।

"কোনওক্রমে বেঁচে আছি", আমি সঙ্গে যোগ করি।

আবারও সামান্য নীরবতা, এরপর হাল ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "কিন্তু ওভাবে আমার অনুপস্থিতিতে গটগট করে বেরিয়ে না গেলেই চলছিল না? তখনকার মত একটু চিন্তায় ছিলাম, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য দিনের চেয়ে ওই দিন তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিলাম। এমনকি একটু বেশি কেনাকাটাও করে এনেছিলাম।"

"হ্যাঁ। ভাল করিনি কাজটা, সত্যিই। তবে ওই সময় বেরিয়ে না গেলে চলছিল না। আমিও একটু দিশেহারাই ছিলাম, একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে চিন্তা করতে চাইছিলাম। কিন্তু সাকুরা-সানের সঙ্গে থেকে, কী বলব—ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না—"

"আরো জোরালো উত্তেজনা হত?"

"হুঁ, পাশে একজন মহিলা, এর আগে একবারও এরকম হয়নি কিনা।"

"সেটাই।"

"মেয়েদের গন্ধ, ওইসবই আর কী। এছাড়াও আরো কিছু কিছু—"

"অল্প বয়েসে যে কত মুশকিল!"

"তা হতে পারে", আমি বলি। সাকুরা-সান কি কাজেকম্মে ব্যস্ত?"

"হুঁ। খুবই ব্যস্ত। তবে কি, এখনকার মত কাজ করে টাকা জমিয়ে রাখার কথা ভাবছি বলেই আলাদা করে খারাপ কিছু লাগছে না।"

আমি একটু বিরতি দিয়ে তারপর বলি, "আসলে না, এখানকার পুলিশ আমার হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে।"

সাকুরা অল্প চুপ করে থেকে, তারপর গভীর উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করে, "সেই রক্তের ব্যাপারে কি?"

তখনকার মত মিথ্যে বলাই সাব্যস্ত করলাম, "না। সেটা না। রক্তের সঙ্গে এটার কোনও যোগ নেই, আমি অল্পবয়েসি ছেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাই খোঁজ চলছে। পেয়ে গেলে ওদের হেফাজতে টোকিওতে ফিরে যেতে হবে। এটুকুই। মনে হয়, সাকুরা-সানের সঙ্গেও পুলিশের তরফ থেকে যোগাযোগ করেছে হয়তো। যে রাতে ওখানে ছিলাম, আমার মোবাইল ফোন থেকে সাকুরা-সানের নম্বরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফোন করেছিলাম কিনা, ওই কোম্পানির রেকর্ড থেকে আমি যে তাকামাৎসুতে ছিলাম সেটা জানতে পেরেছে। সাকুরা-সানের ফোন নম্বরও সেই সঙ্গে।”

“তাই নাকি”, ও বলে, “তবে, এই নম্বরটা হলে চিন্তার কিছু নেই। প্রিপেইড তো, কার ফোন সেটা বের করতে পারবে না। আদতে এটা আমার বয়ফ্রেন্ডের, আমি ওর থেকে নিয়ে ব্যবহার করছিলাম বলে, আমার নাম, আর কোথায় আছি সেটা মেলাতে পারবে না। তাই চিন্তার কিছু নেই।”

“এটা ভাল হয়েছে”, আমি বলি। “আমার কারণে সাকুরা-সানকে এতটা ঝামেলায় যেন আর না ফেলি”

“এতটা করুণা আমার ওপর, চোখে জল এসে যাচ্ছে শুনে!”

“আমি কিন্তু সত্যিই তাই ভাবছি”, আমি বললাম।

“সে আমি জানি”, ক্লান্ত গলায় বলল, “তা বাড়ি থেকে পালানো বাচ্চা ছেলের এখন থাকা হচ্ছে কোথায়?”

“পরিচিত একজনের ওখানে থাকতে দিয়েছে।”

“তোমার তো এ শহরে পরিচিত কেউ থাকার কথা ছিল না।”

ওর প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারছি না। এই ক’দিনের মধ্যে যা যা ঘটলো, সেগুলো সংক্ষেপে গুছিয়ে বলা আদৌ উচিত হবে কিনা কে জানে।

“সে অনেক কথা”, আমি বললাম।

“তোমার দেখছি এরকম ‘অনেক কথা’ বেশ অনেকগুলোই আছে।”

“হুঁ, কেন যে এরকম, সেটা বলতে পারব না, তবে চিরকালই এরকম হয়ে আসছে।”

“প্রবণতাটাই এরকম নাকি?”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হয়তো তাই", আমি বলি, "কখনও সময় পেলে সবটা ধীরেসুস্তে বলব। কিছুই লুকোবার মত নেই। কেবল ফোনে ঠিকমত গুছিয়ে বলে উঠতে পারব না, এই যা।"

"বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই, তবে বিপজ্জনক কিছু নয় তো?"

"একেবারেই বিপজ্জনক কিছু নেই এর মধ্যে, সব ঠিক আছে।"

ও আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "তোমার এই স্বাবলম্বী স্বভাবটা আমি বুঝতে পারি, তবে কিনা, যতটা পারা যায় আইনকানুনের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলাই ভাল। করে কোনও লাভই নেই যেহেতু। বিলি দা কিডের মতো, বয়েস দশের কোঠা না পেরতেই দুঃখাবহ মৃত্যু যার পরিণতি।"

"বিলি দা কিড তো দশের কোঠায় বয়েসে মারা যায়নি", আমি শুধরে দিয়ে বলি, "একুশ জনকে মেরে, একুশ বছর বয়েসে মারা যায়।"

"ওফফ্", ও বলে ওঠে, "ওইই হল। কিছু দরকার তোমার?"

"কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখতে চাইছিলাম আর কি। অত উপকার করলে, অথচ আমি কিছুই না বলে বেরিয়ে চলে এলাম তো, তাই ইচ্ছে হল।"

"সে আমি বুঝতেই পেরেছি। এখন আর তাহলে ওসব নিয়ে ভেবো না।"

"তাছাড়া সাকুরা-সানের গলাটাও একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল", আমি বললাম।

"শুনে ভাল লাগছে বটে, কোনও উপকার হল আমার গলাটা শুনে?"

"কীভাবে বলি, বুঝে উঠতে পারছি না—হয়তো অদ্ভুতই শোনাবে, সাকুরা-সান আসলে একেবারে একটা বাস্তব জগতে বেঁচে থাকো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিনা, বাস্তব বাতাসে শ্বাস নাও, বাস্তব ভাষায় কথা বল। সাকুরা-সানের সঙ্গে কথা বলার সময়, তখনকার মত আমি নিজেও দিব্যি বাস্তব জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি বলে বোধ হয়। আমার কাছে জিনিসটার গুরুত্ব আছে।"

"তোমার আশপাশে অন্য যারা আছে, তারা সেরকম নয়?"

"হয়তো নয়।"

"বুঝতে পারছি না, তার মানে এখন কি তুমি বাস্তবের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জায়গায়, বাস্তবের থেকে বিচ্ছিন্ন লোকেদের সঙ্গে আছ বলে বলতে চাও?"

আমি এটা নিয়ে একটু ভাবলাম। "বলতে গেলে হয়তো সেরকমই বলতে হয়—"

"দ্যাখো, তামুরা", সাকুরা বলে, "এটা তোমার জীবনের ব্যাপার। তাই প্রত্যেকটি জিনিস আলাদা আলাদা করে আমার বলে দেওয়ার কথা নয় বলেই মনে করি। তবে, শুনে টুনে মনে হচ্ছে তোমার হয়তো ওখান থেকে বেরিয়ে আসাই ভাল। জানিনা জায়গাটা কেমন, তবে কোনো কারণে সেরকমই মনে হচ্ছে। নেহাতই আমার মন বলছে। দেরি না করে এখানেই তাই চলে এস। খুশি মতো থাকতে পারবে আমার এখানে।"

"আমার ওপর এতটা সদয় হওয়ার কারণ কী, সাকুরা-সান?"

"তুমি কি এতটাই বোকা, এটা না বোঝার মত?"

"কিন্তু, কেন?"

"কেননা তোমাকে আমার খুব পছন্দ, তার জন্যেই। আমিই সত্যিই খুব কৌতূহলী, কিন্তু যেকারুর জন্য এটা করব না। তোমাকে ভাল লাগে, পছন্দ করি, তাই এতটা করছি। কি বলব, ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারছি না, সত্যিই ছোট ভাইয়ের মতই ভালবাসি।"

ফোনের রিসিভারে মুখ দিয়ে চুপ করে থাকি মুহূর্তের জন্য ভেবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাই না কী করা উচিত। খানিকটা যেন ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। জন্মে থেকে এই আমার, একবারের জন্যও কারুর থেকে এরকম কথা শোনার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

"হ্যালো, হ্যালো", সাকুরা ওদিক থেকে বলে।

"আমি শুনছি", আমি বলি।

"শুনছ যখন, কিছু বলবে তো!"

আমি নিজেকে সামলে নিই। তারপর গভীর ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকি।

বলি, "হ্যাঁ, সাকুরা-সান, সেটা করতে পারলেই ভাল বলে মনে হচ্ছে। সত্যিই সেরকম ভাবছিলাম। একেবারে মন থেকেই। কিন্তু এখন তা পারব না। যেটা বললাম, আমি এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না। একজনের প্রেমে পড়েছি বলে।"

"তেমন একটা বাস্তব বলে বলা যায় না এরকম গোলমেলে কারুর প্রেমে পড়েছো তো?"

"তা হয়তো বলা যায়।"

সাকুরা ফোনের রিসিভারে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। একেবারে ভেতর থেকে উঠে আসা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

"আসলে, তোমার মত বয়েসের বাচ্চা ছেলে প্রেমে পড়লে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা অবাস্তব হয়ে পড়ার একটা প্রবণতা থাকে, তার ওপর অন্যজনও যদি বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবে তো খুবই মুশকিলের ব্যাপার। সেটা কি বোঝো?"

"বুঝি।"

"ঠিক কি না?"

"হু..."

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"কিছু হলেই, আবার আমায় ফোন কোরো। ঘড়িতে ক'টা বাজে বিশেষ করে দেখে নিয়ে করার দরকার নেই। কোনওরকম সংকোচ করবে না।"

"ধন্যবাদ।"

ফোন রেখে দিলাম। তারপর ঘরে ফিরে এসে, 'সমুদ্রতটে কাফকা' রেকর্ডটা প্লেয়ারে চাপিয়ে, পিন নামালাম। এবং যথারীতি আবার 'সেই জায়গায়' ফিরে যেতে হল। তারপর 'সেই সময়ে'।

মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুললাম। চারপাশ অন্ধকার। মাথার কাছের ঘড়ির উজ্জ্বল কাঁটায় সময় যা দেখাচ্ছে তাতে তিনটে বেজে গেছে। জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানালা দিয়ে ঢুকে আসা বাগানের আলোর স্তিমিত আভায় মেয়েটাকে চোখে পড়ল। অন্যান্য দিনের মতই মেয়েটা ডেস্কের সামনে বসে, সেই একই ভঙ্গিতে দেয়ালের ছবিটা দেখতে থাকল। ডেস্কের ওপর হাতে চিবুকের ভর রেখে, একেবারে স্থির। আমিও অন্যান্যবারের মতই বিছানায় শুয়ে রুদ্ধশ্বাসে, চোখ অল্প খোলা রেখে, সেই সিল্যুয়েটের দিকে চেয়ে আছি। জানালার বাইরে, সমুদ্রের বাতাস এসে জানালার পাশের ফুলে ভরা গাছটার ডাল নিঃশব্দে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম যে বাতাসে অন্যান্য দিনের চেয়ে আলাদা একটা কী যেন আছে। কী যেন একটা বেখাপ্পা জিনিস, সেই ব্যত্যয়হীন ভাবে নিখুঁত, সামঞ্জস্যময় ছোট্ট জগতটাতে সামান্য হলেও নিশ্চিত ভাবে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। সেই পাতলা অন্ধকারে আমি নজর তীক্ষ্ণ করে তাকালাম। ঠিক যে কোন জিনিসটা অন্যরকম কে জানে? ক্ষণিকের জন্য রাতের বাতাস জোরালো হয়ে উঠে, আমার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তস্রোত কেমন যেন কাদার মতো ঘন হয়ে উঠতে থাকে। ফুলে ভরা গাছটার ডালপালা কাঁচের জানালায় গা ছমছম করা এক গোলকধাঁধার ছবি তৈরি করেছে। টের পেতে দেরি হল না। ওখানে ওই সিল্যুয়েটটা সেই মেয়েটার সিল্যুয়েট নয়। খুব মিল আছে। প্রায় একই বলেও বলা যায়। কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একেবারে এক নয়। হুবহু প্রতিকৃতি করতে গিয়ে অল্প ত্রুটি থেকে যাওয়া দুটো ছবি একটা আরেকটার ওপর চাপালে যেমন হয়, জায়গায় জায়গায় খুঁটিনাটিতে একটু চ্যুতি থেকে যাচ্ছে। যেমন হয়তো, হেয়ারস্টাইলটা মিলছে না, স্যুটটা একটু অন্যরকম। অন্য সব কিছুর চেয়েও, ওই উপস্থিতিটাই যেন আলাদা। সেটুকু আমি বুঝতে পারছি। কিছু না ভেবেই আমি মাথা নাড়ি। ওখানে যে আছে সে সেই মেয়েটা নয়। কিছু একটা ঘটছে। বড় কিছু একটা ঘটে চলেছে। বিছানায় লেপের নিচে অজানিতে কখন আমি দু'হাত শক্ত করে মুঠো করে ফেলেছি। সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল অস্থির হয়ে ওঠা হৃৎপিন্ডের প্রকট আওয়াজ। খোদাই হওয়া শুরু হল এক ভিন্ন কালপ্রবাহের পরিসর।

সেই আওয়াজের সংকেতে, চেয়ারের ওপরে সেই সিল্যুয়েট নড়ে উঠলো। বড় নৌকো কূল ছেড়ে যাওয়ার সময় যেভাবে হালকে বাঁধনমুক্ত করে, সেভাবেই শরীরটা ধীরে নড়ে বসলো। হাতের থেকে চিবুক সরিয়ে, আমার দিকে মুখ ফেরাল। বুঝতেই পারলাম, এটা সাএকি-সান। আমার শ্বাসরোধ হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে না। ইনি, এই এখনকার সাএকি-সান! কিংবা বলা যায় বাস্তবের সাএকি-সান। অল্পক্ষণের মধ্যেই উনি আমাকে দেখতে থাকলেন। 'সমুদ্রতটে কাফকা' ছবিটা দেখতে থাকার মতো করে, শান্তভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় এক করে। আমার মাথায় এল সময়ের অক্ষরেখা নিয়ে একটা চিন্তা। হয়তো আমার অজানা কোথাও, সময়ের ব্যাপারে একটা ওলট-পালট ঘটে যাচ্ছে। এবং তাতে করে বাস্তব আর স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সাগরের জল আর নদীর জল মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার মত। এর অর্থ কী দাঁড়ায় ভাবতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কিন্তু কোনো দিশা খুঁজে পেলাম না।

এরপরেই উনি উঠে দাঁড়িয়ে, ধীরে এদিকে এগিয়ে এলেন। মেরুদন্ড টানটান রেখে হাঁটার সেই মনোরম ভঙ্গি। পায়ে জুতো নেই। খালি পা। উনি হাঁটতেই মেঝেয় অল্প ক্যাঁচকোচ আওয়াজ হল। উনি এসে বিছানার প্রান্তে শান্ত ভাবে বসে, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। পুষ্ট শরীরের অবশ্যই ভার আছে। সাদা সিল্কের ব্লাউজের সঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত ঘন নীল স্কার্ট। হাত বাড়িয়ে উনি আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চুল স্পর্শ করলেন। আঙুল দিয়ে আমার ছোট করে ছাঁটা চুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘষে দিতে থাকলেন। নিঃসন্দেহে সত্যিকারের হাতই। সত্যিকারের আঙুল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে আসা মৃদু আলোয়, এমনভাবে পোশাক ছাড়তে শুরু করলেন যেন খুবই স্বাভাবিক কিছু। তাড়াহুড়োও নেই, আবার কোনও ইতস্তত ভাবও নেই। খুবই সাবলীল ও স্বাভাবিক ভাবে ব্লাউজের বোতাম একটা একটা করে খুলে, স্কার্ট খুলে, অন্তর্বাস ছাড়লেন। পোশাকগুলো এক এক করে কোনও শব্দ না করে মেঝের ওপর পড়ছে। মোলায়েম বস্ত্রখন্ড কোনো শব্দ করছে না। উনি ঘুমন্ত। সেটা বুঝতে পারলাম। চোখটা খোলাই। কিন্তু সাএকি-সান 'ঘুমোচ্ছেন'। যা কিছু করছেন, সবটাই ঘুমের মধ্যে করছেন।

নিরাবরণ হয়ে উনি ছোট বিছানাটায় উঠে এলেন। ফর্সা হাতে আমার শরীরটা জড়িয়ে ধরলেন। আমার গলায় ওঁর উষ্ণ শ্বাস অনুভব করলাম। আমার উরুতে এসে লাগছে ওঁর যোনিসংলগ্ন রোম। সাএকি-সান হয়তো, বহুদিন আগে মৃত ওঁর প্রেমিকের কিশোরাবস্থা বলে আমাকে মনে করেছেন। আর এই ঘরে সেই আগে যা হয়েছিল, সেটাই ফের করতে চাইছেন। খুবই স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত ক্রিয়া হিসেবে, ঘুমন্ত অবস্থায়। স্বপ্নের মধ্যে।

আমি ভাবছি, সাএকি-সান যেন কোনোভাবে জেগে না যান। চোখ না খুলে ফেলেন। ভুল করে করছেন। ওনাকে জানিয়ে দিতেই হবে যে এতে একটা বড় ভুল বোঝাবুঝি আছে। এটা স্বপ্ন নয়। বাস্তবের জগত। কিন্তু সবকিছু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে চলেছে। আমার ক্ষমতা নেই সেই প্রবাহকে ঠেকানোর। আমি একেবারেই দিশেহারা, আর আমার নিজের অবস্থা হল, সময়ের সেই মোচড়ানো, অনির্দিষ্ট অভিমুখের গতি আমাকে তার মধ্যে গ্রাস করে নিচ্ছে।

তোমার নিজের অবস্থা হল, সময়ের সেই মোচড়ানো, অনির্দিষ্ট অভিমুখের গতি তোমাকে তার মধ্যে গ্রাস করে নিচ্ছে। ওই মহিলার স্বপ্ন তোমার চেতনাকে ঢেকে ফেলেছে, এক মুহূর্তও লাগেনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অন্তঃসত্তার গর্ভের ধারক-রসের মত করে, কোমলতা ও উত্তাপ দিয়ে ঢেকে ফেলছে। সাএকি-সান তোমার পরনের টি-শার্ট খুলে নিয়ে, বক্সার-শর্টস টেনে ছাড়িয়ে নিলেন। গলায় বার বার চুম্বন করে, তারপর একসময় হাত বাড়িয়ে তোমার পুরুষাঙ্গটা চেপে ধরলেন। ওটা তার আগেই চিনেমাটির মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমার অন্ডকোষ সযত্নে হাতের মধ্যে নিলেন। তারপর মুখে কিছু না বলে, তোমার আঙুল ওঁর যোনিদেশের রোমের নিচে নিয়ে গেলেন। যোনি তখন উষ্ণ আর আর্দ্র। উনি তোমার বুকে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। নিপল চুষতে থাকলেন। তোমার আঙুল ধীরে ধীরে ওঁর ভেতরে ঢুকে গেল।

তোমার এতে কোনও দায়িত্ব থাকলে, সেটার শুরু কোথা থেকে? চেতনার দৃষ্টি থেকে ধুলোর আবিল আবরণ মোচন করে তুমি ব্যাকুল হয়ে দেখার চেষ্টা করছ তোমার অবস্থিতি এখন ঠিক কোথায়। প্রবাহের অভিমুখটা যাচাই করে নিতে চাইছ। সময়ের প্রকৃত অক্ষটাকে ধরার চেষ্টা করছ। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যের বিভাজন রেখাটা খুঁজে পাচ্ছ না। ঘটনা আর সম্ভাবনার মধ্যে বিভাজন রেখাটা বের করতে পারছ না। তুমি শুধু এটুকু জান যে নিজে এখন একটা খুব অদ্ভুত জায়গায় রয়েছ। অদ্ভুত শুধু না, বিপজ্জনকও বটে। কীসের ভিত্তিতে ভবিষ্যত অনুমান করবে, তার নীতি কিংবা লজিক স্থির করতে পারছ না, ঘটনাপ্রবাহের স্রোতে আটকা পড়ে গেছ। কোনো নদীর তীরের শহর যেমন কূল ছাপানো বন্যায় ধুয়ে যায়। ওখানকার যাবতীয় পথনির্দেশ করা ফলক তখন জলের নিচে ডুবে আছে। চোখে পড়ে শুধু প্রত্যেকটি বাড়ির নামপরিচয়হীন ছাদগুলো।

অল্প পরেই সাএকি-সান তোমার চিৎ হয়ে থাকা শরীরের ওপর চড়ে বসলেন। তারপর পা দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে, পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া তোমার পুরুষাঙ্গ নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছে এখানে খাটছে না। উনিই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ছবি আঁকার মতো করে নিবিষ্ট ভাবে উনি কোমর সামনে পেছনে দোলাতে থাকলেন। ওঁর সোজা চুল তোমার কাঁধের ওপর উইলো গাছের শাখার মত নিঃশব্দে দুলছে। তুমি যেন একটু একটু করে নরম কাদার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছ। জগতের সব কিছু উষ্ণ, আর্দ্র আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অস্পষ্ট, তার মধ্যে কেবল তোমার পুরুষাঙ্গটাই একটা উজ্জ্বল, দৃঢ় অস্তিত্ব। চোখ বন্ধ করে তুমি তোমার নিজের স্বপ্ন দেখতে থাক। কালপ্রবাহ একেবারে অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। জোয়ারের জল কানায় কানায়, চাঁদ উঠেছে। অবিলম্বে তোমার বীর্যপাত হয়ে যায়। অবশ্যই সেটা তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারতে না। ওঁর অভ্যন্তরে কয়েকবারই প্রবল বীর্যপাত হল তোমার। নিজেকে সংকোচন করে উনি সাদরে তোমার বীর্য গ্রহণ করলেন। অথচ তখনও কিন্তু উনি ঘুমোচ্ছেন। চোখ খুলে ঘুমোচ্ছেন। উনি তখন অন্য জগতে। তোমার বীর্য উনি সেই অন্য জগতে প্রবেশ করিয়ে নিচ্ছেন।

অনেকটা সময় কেটে যায়। আমি নড়তে চড়তে পারছি না। একেবারে অবশ হয়ে ঘোরের মধ্যে পড়ে আছি। তবে সেটা প্রকৃতই জড়ত্ব না কি আমার তরফ থেকেই নড়াচড়ার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়েছে, আমি নিজে এই দু'টোর মধ্যে প্রভেদ করতে পারছি না। একটু পরে উনি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কিছুক্ষণ আমার পাশে শান্তভাবে শুয়ে রইলেন। তারপর উঠে পড়ে, অন্তর্বাস পরে, স্কার্টটা পরে নিয়ে, ব্লাউজের বোতাম লাগাতে থাকলেন। আদর করে হাত বাড়িয়ে আরেকবার আমার চুল স্পর্শ করলেন। এসবই ঘটে যাচ্ছিল নীরবে। ভেবে দেখলাম, এঘরে এসে থেকে উনি একবারও মুখ খোলেননি। আমার কানে এসেছে কেবল মেঝের মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, আর অবিরাম বাতাস বয়ে যাওয়ার আওয়াজ। এ ঘরের দীর্ঘনিঃশ্বাস আর কেঁপে ওঠা কাঁচের জানালা। এসবের কোরাস দিয়ে বেজে ওঠা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক।

ঘুমের মধ্যেই উনি মেঝে পেরিয়ে গিয়ে, ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দরজাটা নেহাতই অল্প একটু খুলে, সেই ফাঁক দিয়ে স্বপ্ন দেখা ছোট্ট মাছের মত উনি গলে বেরিয়ে গেলেন। কোনও শব্দ না করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি বিছানা থেকে ওঁর নিষ্ক্রান্ত হওয়া পর্যবেক্ষণ করলাম। আমি একইরকম চলচ্ছক্তিহীন হয়ে আছি। একটা আঙুল নাড়ানোরও ক্ষমতা নেই। ঠোঁট যেন কেউ সীল করে দিয়েছে, ভারী হয়ে বুজে আছে। সময়ের খোঁদলে ভাষা ঘুমিয়ে রয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শরীর নাড়তে পারছি না, শ্রবণশক্তিকে জাগ্রত রাখলাম তীক্ষ্ণভাবে। দেখা যাক গাড়ি পার্ক করার জায়গা থেকে সাএকি-সানের ফোকসওয়াগেন-গলফ গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে আসে কিনা। কিন্তু অনেকটা সময় কেটে যেতেও সেই আওয়াজ পাওয়া গেল না। রাতের মেঘ বাতাসে ভেসে এসে আবার চলে যাচ্ছে। ফুলে ভরা গাছটার ডালপালা একটা আধটা করে দুলছে, অন্ধকারে অজস্র ধাতব ফলা ঝকঝক করছে। ওখানকার ওই জানালা আমার মনের জানালা, ওখানকার ওই দরজা আমার মনের দরজা। সকাল অবধি ওই ভাবেই চোখ খুলে রাখলাম। আর নির্জন চেয়ারটার দিকে চেয়েই রইলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩০

নিচু ঝোপ পেরিয়ে জিনজার গাছগাছালির বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো দু'জন। কর্নেল স্যান্ডার্স কোটের পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বের করে পায়ের দিকে আলো ফেললেন। বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ রয়েছে। তেমন বড় বন কিছু নয়, কিন্তু তার গাছপালা খুব প্রাচীন, বিশাল বিশাল, ঘন সন্নিবদ্ধ ডালপালা মাথার ওপরটা অন্ধকার করে ঢেকে দিয়েছে। পায়ের কাছ থেকে জোরালো ঘাসের গন্ধ আসছে।

কর্নেল স্যান্ডার্স সোজা হয়ে সামনে হাঁটছিলেন বটে, আগের মত আর দ্রুত পদক্ষেপে নয়, ধীরেসুস্থে। টর্চ ফেলে পায়ের দিকে ভাল করে দেখে নিয়ে, গভীর মনোসংযোগ সহকারে এক'পা এক'পা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হোশিনো ওঁর পেছন পেছন।

"আরে, কাকু, এ তো বেশ অ্যাডভেঞ্চারের মত দেখছি", বলে হোশিনো কর্নেল স্যান্ডার্সের শ্বেতশুভ্র পৃষ্ঠদেশ উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে। "ভুত!"

"এক এক করে নেমে আসবে না। একটু চুপ করে থাকতে পার?" পেছনে না তাকিয়েই কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

হঠাৎই হোশিনোর মনে হল, নাকাতা এখন কী করছে কে জানে। হয়তো বিছানায় এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একবার ঘুমিয়ে পড়লে, যা-ই ঘটুক, চোখ খোলার লোক সে নয়। এমন লোকেদের জন্যই একেবারে অঘোরে নিদ্রা কথাটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অত দীর্ঘ সময় ঘুমোতে ঘুমোতে নাকাতা আদৌ কী ধরণের স্বপ্ন দেখে কে জানে। হোশিনোর কল্পনায় তা ধরা দিল না।

"এখনও অনেক দূর নাকি, কাকু?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"এখনো আরেকটু", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন।

"আচ্ছা, কাকু!" হোশিনো বলে।

"কী?"

"কাকু কি সত্যিই কর্নেল স্যান্ডার্স?"

কর্নেল স্যান্ডার্স গলা খাঁকরে নেন। "আসলে অন্য। আপাতত কর্নেল স্যান্ডার্সের রূপ ধরে আছি।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল", হোশিনো বলে। "তাহলে, কাকু আসলে কে?"

"নাম নেই।"

"নাম না থাকলে চলে, অসুবিধে হয় না?"

"কোনও অসুবিধেই হয় না। প্রথম থেকেই নামও নেই, অবয়বও নেই।"

"বাতকম্মের মত?"

"তা-ও বলা যায়। অবয়ব নেই যখন, যেকোন কিছুই হতে পারি!"

"ওহ্!"

"আপাতত, কর্নেল স্যান্ডার্স নামে, পুঁজিবাদী সমাজের আইকন বলা যায় এরকম একটা অবয়ব ধারণ করে আছি মাত্র। মিকি মাউস হলে আরো ভাল হত, কিন্তু ডিজনি কপিরাইট নিয়ে ভীষণ ঝামেলা করে। মামলা হলে ঝামেলা।"

"আর এই শর্মাও চায় না যে মিকি মাউস এসে তাকে মেয়ে জোগাড় করে দিক।"

"সেও তো বটে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"তার ওপর কর্নেল স্যান্ডার্স হিসেবে কাকুর ক্যারেকটারটাও বেশ মানানসই বলে মনে হচ্ছে।"

"ক্যারেকটার বলে কিছু, আমার ক্ষেত্রে নেই। সেন্টিমেন্ট বলেও কিছু নেই। বলে না—*এই যে দেখছ যেমনটি আমি, কথাও বলছি দিব্যি, দেবতাও নই, বুদ্ধও নই, লোকের মত মনের বালাই নেইকো তাই নির্বিকার।"*।

"এটা কী?"

"উয়েদা আকিনারির *'বৃষ্টি আর চাঁদের উপকথা'* থেকে একটা স্তবক। তোমার পড়ার কথা নয়।"

"স্বীকার করতে হচ্ছে যে পড়িনি।"

"এখনকার মত আমি মানুষের রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছি, দেবতাও নই, বুদ্ধও নই। আসলে কোনও আবেগানুভূতি নেই, তাই মনের ক্রিয়া মানুষের থেকে ভিন্ন। এই হচ্ছে ব্যাপার।"

"ওহ্", হোশিনো বলে। "ভাল বোঝা গেল না বটে, তবে এটা ঠিক যে কাকু মোটেই মানুষও নন, দেবতাও নন, বুদ্ধও নন।"

"আমি দেবতাও নই, বুদ্ধও নই, নেহাতই নির্বিকার। মানুষের ভালো আর মন্দের বিচার, আর পথ আমার জন্য তো নয়।"

"বুঝতেই পারছি না যে!"

"দেবতাও নই, বুদ্ধও নই বলে মানুষের কীসে ভাল, কীসে মন্দ সে বিচার করার প্রয়োজন আমার নেই। আবার, ভাল মন্দের ভিত্তি অনুসরণ করে ক্রিয়াশীল হওয়ারও প্রয়োজন নেই। এই হচ্ছে কথা।"

"অর্থাৎ কিনা, কাকু হচ্ছেন ভাল আর মন্দের অতীত এক অস্তিত্ব।"

"অতটা বলার দরকার নেই, হোশিনো বাবুসোনা। আলাদা করে ভাল মন্দের অতীত, এমন নই। কেবল সম্পর্কহীন। কোনটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

খারাপ, কোনটা ভালো এসব আমার জ্ঞানের মধ্যে পড়ে না। একটিই জিনিস আমার অভীষ্ট, সেটি হল, আমার আরব্ধ কাজটি সম্পন্ন করা। আমার ভূমিকাটি অত্যন্ত প্র্যাগমাটিকাল। বলা যায়, এক নিরপেক্ষ বস্তু।"

"কাজটি সম্পন্ন করার কথা বলছেন, সেটা কী?"

"কী হে, স্কুলে টুলে পড়নি?"

"বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়াতাম কেবল, হাইস্কুল অবধি পড়েছি, টেকনিকাল স্ট্রীমে।"

"সবকিছুই তার নিজস্ব ভূমিকা পালনের জন্য একটা ব্যবস্থাপনা। আমার কাজ হল একটা জগতের সঙ্গে আরেকটা জগতের পারস্পরিক সম্পর্কর ভার নেওয়া। জিনিসগুলো কোনটার পরে কোনটা তার সুচারু ভাবে অন্বয় সাধন করা। যাতে কারণের পরে কার্য সমাধা হয়, কজ-এর পরে এফেক্ট। একটার তাৎপর্যের সঙ্গে আরেকটার অর্থ গুলিয়ে না যায়। বর্তমানের আগে যাতে অতীত আসে। ভবিষ্যত যেন বর্তমানের পরে আসে। তবে, একটু আধটু আগে পরে হয়ে গেলে ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে একেবারে নিখুঁত, ত্রুটিহীন বলে কিছু হয় না, হোশিনো বাবুসোনা। কার্যকারিতার ব্যালান্সশীটও যদি নিখুঁত মিলে যেত, আমিও তবে আর এরকম বিরক্তি দেখাতাম না। এরকম দেখালে কী হবে, আমি বেশ একটু ঢিলেঢালা স্বভাবেরই লোক। ঢিলেঢালা জিনিসটাকে আরেকটু টেকনিকালি বললে, বলা যায়, 'তথ্য পারস্পরিকতা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনে সংক্ষেপ সাধন', বেশি বুঝিয়ে বলতে গেলে, সে অনেক কথা, হোশিনো বাবুসোনার পক্ষে কিছুতেই বোধগম্য হবে না, এটুকুতেই সারছি। আমি বলতে চাইছি, আমি মোটেই একেবারে সবকিছুতে খুঁতখুঁত করি না, ধৈর্য হারাই না। তবে ব্যালান্সশীট না মিললে তো মুশকিল। দায়িত্বপালনে গাফিলতি হয়ে যাবে সেটা।"

"বুঝে উঠতে পারছি না, এতটা বড় দায়িত্বের লোক হয়ে, কাকু আপনি তাকামাৎসুর গলিতে বেশ্যার দালালের কাজ করছেন কেন?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“আমি তো মানুষ নই। কতবার বলতে হবে সেকথা?”

“যা কিছুই হোন না কেন।”

“আমি যে বেশ্যার দালালি করছিলাম, সে কেবল হোশিনো বাবুসোনাকে এই অবধি নিয়ে আসব বলে। একটু শুধু হাত লাগাতে হবে। তাই ভাবলাম এইসব মজার কথা বলে একটু খুশি করিয়ে দিই। নেহাতই তো কয়েক মুহূর্তের ক্রিয়াকর্ম।”

“হাত লাগাতে হবে?”

“অসুবিধে নেই তো? বললাম না, আমার কোনও অবয়ব নেই। বিশুদ্ধ অর্থে মেটাফিজিকাল, চেতনায় ধারণ করার জিনিস। যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরাকার। বাস্তবে কোনো কিছু করতে গেলে, প্রকৃত শরীর একটা লাগেই।”

“তাহলে এখনকার মত, আমি একটা প্রকৃত শরীর?”

“ঠিক তাই”, কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন।

গাছপালায় অন্ধকার বনের মধ্যে পায়ে চলা রাস্তা ধরে একটু একটু করে এগিয়ে গেলে, মোটা একটা চিরহরিৎ ওক গাছের নিচে ছোট্ট একটা কুঠুরির মত পূজার মন্দির। জরাজীর্ণ আদ্যিকালের মন্দির। কেউ পূজাও দেয় না, ফুলটুল দিয়ে সাজায়ও না, পরিত্যক্ত, জীর্ণ, সর্বজনবিস্মৃত বলে দেখেই বোঝা যায়। কর্নেল স্যান্ডার্স টর্চের আলো ফেললেন সেই মন্দিরে।

“পাথর এর ভেতরে আছে। মন্দিরের দরজাটা খোল।”

“না না ছিঃ”, বলে হোশিনো মাথা নাড়ে, “জিনজার দরজা নিজে থেকে এরকম খুলে ফেলা যায় না। এসব করলে নির্ঘাত শাপ লাগবে। নাক খসে পড়বে, কান খসে পড়বে।”

“কোনো চিন্তা নেই। আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি। খুলে ফেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাপ টাপ কিছু লাগবে না। নাকও খসবে না, কানও খসবে না। গেঁয়ো জায়গার কোন আমলের ছেলে হে তুমি?"

"কাকু নিজে খুললেই ভাল হয় না? আমি এসবের মধ্যে নেই।"

"ভারি অবুঝ ছেলে তো তুমি! এক্ষুনি বললাম না, আমি সত্যিকারের কেউ নই। একটা বিমূর্ত ধারণার বেশি কিছু নই। নিজে নিজে কিছুই পারব না। সেইজন্যেই তো এত করে তোমাকে এই অবধি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। নামমাত্র চার্জে তিন তিন বার করিয়ে দিলাম।"

"সত্যি, ভালই লেগেছিল ঠিকই—কিন্তু কিছুতেই এটা করতে মন সরছে না। জিনজাতে গিয়ে কোনোভাবেই খারাপ কিছু করতে নেই—সেই ছোটবেলা থেকেই দাদু এমন কঠোর ভাবে বারণ করে দিয়েছিল—"

"দাদুর কথা ভুলে যাও। জটিল পরিস্থিতিতে গিফু জেলার গেঁয়ো সব নীতিকথা ফেঁদে বসা। নাও, সময় চলে যাচ্ছে।"

গজগজ করতে করতে ভয়ে ভয়ে হোশিনো তো মন্দিরের দরজাটা খুলল। কর্নেল স্যান্ডার্স টর্চ জ্বেলে ভেতরে আলো ফেললেন। সত্যি ভেতরে একটা পুরনো গোল পাথর রয়েছে। গোল ভাতের দলার আকারের একটা পাথর, ঠিক নাকাতা যেমন বলেছিল। একটা লং-প্লেয়িং রেকর্ডের সাইজের, সাদা, মসৃণ।

"এটাই সেই পাথর", হোশিনো জিজ্ঞেস করে।

"এটাই", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন, "বের করে আনো।"

"একটু দাঁড়ান, কাকু। এ তো চুরি করা হচ্ছে।"

"তাতে কী। এরকম পাথর একটা না থাকলেও কেউ খেয়াল করবে না, কিচ্ছু এসে যাবে না।"

"কিন্তু পাথরটা তো এখন ভগবানের জিনিস। ইচ্ছেমত নিয়ে চলে গেলে রেগে যাবেন নিশ্চয়ই!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কর্নেল স্যান্ডার্স দু'হাত ভাঁজ করে আড়াআড়ি জড়ো করে শান্তভাবে হোশিনোর মুখের দিকে তাকালেন, "ভগবান মানে?"

একথায় হোশিনো চিন্তায় পড়ল।

"ভগবান দেখতে কেমন, কী করে", কর্নেল স্যান্ডার্স আরেকটু যোগ করেন।

"সেসব আমি ভাল জানি না বটে, তবে ভগবান ভগবানই। সব জায়গায় আছেন, আমরা কী করছি সব দেখছেন, ভালমন্দের বিচার করছেন।"

"ঠিক যেন ফুটবলের রেফারি।"

"সেভাবেও বলা যায় হয়তো।"

"খানিকটা এরকম কি তাহলে, হাফপ্যান্ট পরে, মুখে বাঁশি নিয়ে, লসটাইম গুনছে?"

"কাকু তাহলে এটা নিয়েই পড়লেন", হোশিনো বলে।

"জাপানের ভগবান আর বিদেশের ভগবান কি পরস্পর আত্মীয়? না কি শত্রু?"

"সেসব কিছু জানি না।"

"দ্যাখো, হোশিনো বাবুসোনা, ভগবানের অস্তিত্ব শুধু মানুষের চেতনাতেই আছে। বিশেষ করে আমাদের জাপানের ক্ষেত্রে, ভাল হোক, মন্দ হোক, শেষ বিচারে ভগবান বলতে অবাধে নানারকমই হতে পারে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, যুদ্ধের আগে সম্রাট ছিলেন ভগবান, অকুপেশন আর্মির কম্যান্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থারের থেকে 'ভগবান হয়ে থাকা বন্ধ করুন' বলে নির্দেশ পেতেই, 'হ্যাঁ, এখন থেকে আমি সাধারণ মানুষ' বলে, ১৯৪৬ সাল থেকে সম্রাট আর ভগবান রইলেন না। জাপানে ভগবান হওয়ার নিয়মকানুন তাহলে এতটাই ঢিলেঢালা। শস্তার পাইপ মুখে সানগ্লাস পরা অ্যামেরিকার এক সৈনিকের নির্দেশটুকু পেতেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবকিছু পালটে গেল। এতটাই আল্ট্রা-পোস্টমডার্ন ব্যাপার। আছে ভাবলে আছে। নেই ভাবলে নেই। এ নিয়ে আলাদা করে ভাবার কিছু নেই।"

"ওহ্!"

"যেভাবেই হোক, পাথরটা বের করে আন তো। সব দায়িত্ব আমার। আমি দেবতাও নই, বুদ্ধও নই বটে, একটু আধটু কানেকশন যে নেই এমন নয়। আমি দেখব, হোশিনো বাবুসোনার যাতে শাপ না লাগে।"

"সত্যিই সেই দায়িত্ব নিচ্ছেন তো?"

"এর অন্যথা হবে না", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন।

তরুণ হোশিনো হাত বাড়িয়ে, ঠিক যেন ল্যান্ড-মাইন ধরছে এইভাবে আলতো করে পাথরটাকে তুলে আনল।

"বেশ ভারি কিন্তু!"

"পাথর ভারিই হয়। তোওফু[1] তো নয়!"

"না, পাথর হিসেবেও বেশ ভারি দেখছি", হোশিনো বলে। "তা, এখন এটাকে কী করব?"

"সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, বালিশের কাছে রাখতে পার। এর পরে আপনা থেকেই কিছু একটা হতে থাকবে।"

"ইয়ে, এটা নিয়েই ডর্মিটরিতে ফিরে যাব নাকি?"

"খুব ভারি হলে, ট্যাক্সি করে যেতে পার", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন।

"কিন্তু সেটা কি উচিত হবে, কিছু না বলে অদ্দূর নিয়ে যাওয়া?"

"দ্যাখো, হোশিনো, সমস্ত কিছুই সতত চলমান। কি পৃথিবী, কি সময়, কি ধারণা, কি ভালবাসা, কি জীবন, কি বিশ্বাস, কি ন্যায়, কি অন্যায়, যাবতীয় কিছুই তরলপ্রাণ এবং নবীকরণ হয়ে চলেছে।

[1]তোওফু, সয়াবীন থেকে তৈরি, পুডিং-এর মত ঘন, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার, তবে স্বাদহীন।

~ www.amarboi.com ~

একই জায়গায় একই রূপে অনন্তকাল থেমে থাকে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা হচ্ছে একটা বিশাল 'কালোবিড়াল'[†] এক্সপ্রেস হোম ডেলিভারি প্রক্রিয়া।"

"ওহ্!"

"পাথরটা এখনকার মত, সাময়িক, পাথর হয়ে ওখানে রয়েছে মাত্র। ওটার অপসারণে হোশিনো একটু হাত লাগিয়েছে বলে কিছুই এসে যাবে না।"

"কিন্তু, কাকু, পাথরটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? সেদিক থেকে তেমন একটা দারুণ কিছু বলে তো দেখে মনে হচ্ছে না!"

"সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শুধু পাথর হিসেবে ওটার কোনও বিশেষত্ব নেই। পরিস্থিতি সাপেক্ষে একটা কিছুর প্রয়োজন ছিল বলে, ওটা নেহাতই এই পাথরটা হয়ে গিয়েছে। রুশ লেখক আন্তন চেকভ খুব সুন্দর বলেছিলেন। *যদি কাহিনীতে একটা পিস্তলের কথা আসে, সেটা থেকে গুলি ছোঁড়া হবেই।* বুঝলে ব্যাপারটা?"

"বুঝলাম না তো—"

"বুঝবে না", কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন। "বুঝবে না বলেই ভেবেছিলাম যদিও, নেহাত ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম।"

"আপনি মহানুভব।"

"চেকভ যেটা বলতে চেয়েছিলেন। অনিবার্যতা জিনিসটা একটা স্বতন্ত্র ধারণা। ওটার গঠনতন্ত্রটা লজিক কিংবা নীতিকথা কিংবা অর্থবহতা থেকে আলাদা। শেষবিচারে ওটার যা ভূমিকা সেই অনুযায়ী ক্রিয়াটাই প্রকট হয়ে ওঠে ওতে। যে ভূমিকাটা অনিবার্য নয় সেটার অস্তিত্বই থাকার নয়। যে ভূমিকাটা অনিবার্য সেটারই অস্তিত্ব থাকার কথা। একে বলে ড্রামাটার্জি। লজিক কিংবা নৈতিকতা কিংবা অর্থবহতা নিজেরা ঠিক স্বতন্ত্র কিছু নয়, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে জন্ম নেয়। চেকভ ড্রামাটার্জি জিনিসটা বুঝতেন।"

[†]হোম ডেলিভারি সার্ভিস কোম্পানির নাম

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমি একেবারে কিছুই বুঝতে পারছি না। বড্ড কঠিন কথা সব।"

"তুমি যে পাথরটা ধরে আছ, সেটা চেকভের কথার ওই 'পিস্তল'টা। ওটা থেকে গুলি না চালিয়ে উপায় নেই। সেই অর্থেই এটা এত গুরুত্বপূর্ণ পাথর। বিশেষ একটা পাথর। তাবলে এর মধ্যে দৈব কিছু নেই। তাই হোশিনোকেও আর শাপ টাপ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।"

তরুণ হোশিনো ভুরু কপালে তুলে ফেলল, "এই পাথরটা পিস্তল?"

"কেবল রূপকাত্মক অর্থে। সত্যি করে গুলি বেরিয়ে আসবে না। নিশ্চিন্ত থাক।"

কর্নেল স্যান্ডার্স কোটের পকেট থেকে একখন্ড বড় থলে বের করে তরুণ হোশিনোর হাতে দিলেন, "এটার ভেতরে ভরে নিতে হবে পাথরটা। বুঝতেই পারছ,খুব একটা লোকের চোখে পড়ে যাক, সেটা চাইছি না।"

"দেখুন, সেই চুরিই হল কি না!"

"কী যে বল। শুনতে খুব খারাপ লাগে। চুরি টুরি নয়। একটা খুব মহৎ উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য ধার নিচ্ছি মাত্র।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝতে পারছি। ড্রামাটার্জি অনুসরণ করে পদার্থের অনিবার্য অপসারণ ঘটাচ্ছি কেবল—"

"ঠিক তাই", মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন। "একদমই ঠিক বুঝেছ।"

তরুণ হোশিনো নেভি-ব্লু রঙের থলেয় পোরা পাথরটা বয়ে বনের মধ্যে দিয়ে সেই পায়ে চলা পথ ধরে ফিরে এল। কর্নেল স্যান্ডার্স তরুণের পায়ের কাছে টর্চ থেকে আলো ফেলতে ফেলতে এলেন। দেখে যতটা মনে হয়, পাথরটা তার চেয়েও অনেক ভারি, যেতে যেতে কয়েকবারই মাঝপথে থেমে হাঁফ ছেড়ে নিতে হচ্ছিল। দু'জনে বন থেকে বেরিয়ে, যাতে কারুর চোখে না পড়ে যায়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেভাবে তড়িৎ পদে আলোকিত চত্বরটা পেরিয়ে, বড় রাস্তায় এসে পড়ল। একটা টাক্সি এসে যাওয়ায় কর্নেল স্যান্ডার্স হাত তুলে সেটাকে থামিয়ে, পাথর সমেত তরুণকে তাতে উঠিয়ে দিলেন।

"এটাকে তো বিছানায় বালিশের কাছে রেখে দিলেই হবে", তরুণ জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হবে। অহেতুক ওই নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই। পাথরটা ওখানে থাকাটাই জরুরি", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন।

"কাকুকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হয়। দেখিয়ে দিলেন কিনা, কোথায় পাথরটা আছে।"

কর্নেল স্যান্ডার্স একটা স্নেহের হাসি হাসলেন। "ধন্যবাদ টন্যবাদের দরকার নেই। যেটা করতেই হয় সেটাই করি। আমার আরব্ধ কাজ আমি করে যাচ্ছি। মেয়েটা কিন্তু দারুণ ছিল যাই বল, হোশিনো।"

"হ্যাঁ কাকু, দারুণ ছিল!"

"সবকিছুর চেয়েও ওটাই—"

"কিন্তু, একটা কথা। মেয়েটা তো সত্যিকারেরই ছিল, তাই না? শেয়াল টেয়াল, কিংবা বিমূর্ত কোনো ধারণা, সেই ধরণের গোলমেলে কিছু তো নয়?"

"শেয়ালও না, বিমূর্ত ধারণাও না, সত্যিকারের সেক্স-মেশিন। নির্ভেজাল কামনার ফোর-হুইল ড্রাইভ। বহুকষ্টে খুঁজে এনেছিলাম। দুশ্চিন্তা কোরো না।"

"এটা ভাল হল", তরুণ এবার বলে।

হোশিনো যখন নেভি-ব্লু থলের ভেতরে আনা পাথরটা নিয়ে নাকাতার বালিশের কাছে রাখল, তখন মাঝরাত, একটা বেজে গেছে। নিজের বালিশের কাছে রাখার চেয়ে নাকাতার বালিশের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছে রেখে দিলেই বরং শাপ লাগার সম্ভাবনা কম বলে ওর মনে হয়েছিল। যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, নাকাতা তখনও গাছের গুঁড়ির মতো পড়ে আছে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তরুণ এবার পাথরটাকে থলে থেকে বের করল। তারপর পোশাক পালটে, স্লীপিং-গাউন পরে, পাশেই পাতা বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। ছোট্ট করে স্বপ্ন দেখল যে ভগবান হাফপ্যান্ট পরে, অনাবৃত রোমশ পায়ে সারা মাঠ দৌড়ে দৌড়ে হুইসল্ বাজাচ্ছে।

পরদিন সকালে পাঁচটার আগেই চোখ খুলে, বালিশের কাছে সেই পাথরটা নাকাতার চোখে পড়ল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩১

একটা বাজতে আমি সদ্য তৈরি কফি নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম দোতলার স্টাডিতে। অন্যান্য সময়ের মতই দরজা খুলে রাখা আছে। সাএকি-সান জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে দেখছেন। একটা হাত জানালার ফ্রেমের ওপর রাখা। কী যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। অন্য হাতটা, হয়তো অন্যমনস্কভাবেই, ব্লাউজের বোতাম ছুঁয়ে কী যেন করছে। ডেস্কের ওপরে কলমও নেই, লেখার কাগজও নেই। আমি গিয়ে কফির কাপটা ডেস্কের ওপর রাখলাম। আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না।

আমাকে দেখেই, তক্ষুণি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সাএকি-সান জানালার থেকে সরে এসে, ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে কফিটাতে একবার চুমুক দিলেন। তারপর আগের দিনের সেই একই চেয়ারটায় আমাকে বসতে বললেন। আমি বসে পড়লাম ওটায়। ডেস্কের দু'পাশে আমরা দু'জন, আমি ওঁর কফি খাওয়া দেখি। গতরাতে যা ঘটে গেছে, তার কিছুও কি ওঁর মনে আছে? কিছুই বলা যায় না। দেখে মনে হচ্ছে, এমনও হতে পারে যে সবটাই ওঁর জ্ঞাতসারে হয়েছে, আবার একেবারে কিছুই জানেন না এমনও হতে পারে। ওঁর নিরাবরণ দেহের কথা মনে পড়ল। ওঁর শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতিও মনে পড়ল। কিন্তু সেটা সত্যিই সাএকি-সানেরই শরীর ছিল কিনা, এমনকি তারও ঠিক নেই। সেই সময় যদিও খুবই নিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল।

সাএকি-সান পরে আছেন ফিকে সবুজ রঙের চকচকে একটা ব্লাউজ, আর বেজ কালারের টাইট স্কার্ট। কলারের মধ্যে দিয়ে রূপোর সরু নেকলেস উঁকি দিচ্ছে। খুবই 'চিক'। ওঁর চিকণ দশটা আঙুল ডেস্কের ওপরে, সূক্ষ্ম কারুকার্যের মতো দৃষ্টিশোভন ভাবে জড়ো করে রাখা।

"কি গো, এই জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়ে গেছে", আমার কাছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জানতে চাইলেন উনি।

"তাকামাৎসুর কথা বলছেন", আমি তাতে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ।"

"বলতে পারছি না। এখনও অনেক কিছুই দেখা হয়নি কিনা এখানকার। ঘটনাক্রমে যা কখনো নজরে এসেছে, সেটুকুই দেখা হয়েছে। এই লাইব্রেরি, জিমন্যাসিয়াম, স্টেশন, হোটেল—এইসবই কেবল।"

"বোরিং বলে মনে হয় না?"

আমি মাথা নাড়লাম। "ভাল বলতে পারব না। কারণ, আমার ক্ষেত্রে, সত্যি কথা বলতে কি, বোর হওয়ার মত অবকাশই ছিল না, আর শহর তো মোটামুটি এরকমই দেখতে হয়—জায়গাটা কি বোরিং?"

অল্প ঘাড় ঝাঁকানোর মত ভঙ্গি করলেন, "অন্ততপক্ষে অল্পবয়েসে সেরকমই ভাবতাম। এখান থেকে বেরনোর কথা ভাবতাম। এখান থেকে বেরিয়ে এমন কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবতাম যেখানে বিশেষ বিশেষ সব জিনিস আছে, দারুণ ইন্টারেস্টিং লোকেরা থাকে।"

"দারুণ ইন্টারেস্টিং লোকেরা?"

সাএকি-সান অল্প মাথা নাড়লেন। বললেন, "বয়েস কম ছিল তো। অল্পবয়েসে প্রায় সব ব্যাপারেই এভাবেই ভাবে লোকে। তোমার ক্ষেত্রে কী হয়?"

"আমি সেভাবে কখনো ভাবিনি। অন্য কোথাও গেলে, অন্য কোনও ইন্টারেস্টিং জিনিস থাকবে, এভাবে ভাবিনি। কেবল, আমি অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছি।'ওই' জায়গাটায় আর থাকতে চাইনি, এই যা—"

"ওই জায়গায়?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“নাকানো ওয়ার্ডের নোগাতায়। জন্মে বড় হয়েছি যেখানে।”

জায়গাটার নাম কানে যেতেই ওঁর চোখের তারায় কী যেন একটা খেলে গেল বলে আভাস পেলাম। তবে, নিশ্চিত করে বলতে পারব না।

“ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, সেটা নিয়ে তেমন বিশেষ সমস্যা হয়নি, তাই তো”, সাএকি-সান বললেন।

“হ্যাঁ”, আমি বলি, “সেটা তেমন সমস্যা ছিল না। যেভাবেই হোক, ওখান থেকে না বেরোলেই নয় বলে ভেবেছিলাম। তাই বেরিয়ে এসেছি।”

ডেস্কের ওপরে রাখা নিজের দুই হাতের দিকে চেয়ে থাকেন উনি। বেশ নিবিষ্ট চাউনিতে। তারপরে শান্তভাবে বলেন।

“আমিও তোমার মতই একই কথা ভেবেছিলাম। কুড়ি বছর বয়েসে এখান থেকে চলে যাওয়ার সময়”, উনি বলেন, “এখান থেকে চলে যেতে না পারলে, আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয় মনে হয়েছিল। জোরালো ভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে আর দ্বিতীয়বার এই স্থান আমার চোখে পড়ুক, এ আমি চাই না। ফেরার কথা ভাবিইনি। কিন্তু নানা কিছু ঘটে গিয়ে, দেখতেই পাচ্ছ, এখানে ফেরা ছাড়া উপায় ছিল না। যেন আবার নতুন করে শুরু করা।”

সাএকি-সান পেছন দিকে ঘুরে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আকাশ ছেয়ে থাকা মেঘের রঙ এতটুকু পাল্টায়নি। হাওয়া নেই। দৃশ্যমান সবকিছুই, সিনেমার ফ্রেমের ব্যাকগ্রাউন্ডে আঁকা ছবির মতই এতটুকু নড়ছে না।

“মানুষের জীবনে নানারকম অভাবিত সব জিনিস ঘটে”, সাএকি-সান বলেন।

“আর তাই, আমিও আবার কখনো আগের জায়গায় ফিরে যাব হয়তো, তাই কী?”

“সেটা [illegible] জানা নেই। কারণ, একে তো এটা তোমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার, তাছাড়া অনেকটাই ভবিষ্যতের ব্যাপারও বটে। তবে, আমি মনে করি, জন্মস্থান আর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা, এদু'টো মানুষের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জন্মস্থান অবশ্য নিজে ঠিক করা যায় না। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা, খানিকটা হলেও, বেছে নেওয়া যায়।"

উনি মুখটা জানালার বাইরের দিকে করে শান্তভাবে কথা বলছিলেন। ঠিক যেন বাইরের কল্পিত কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। তারপর যেন মনে পড়ে গেছে এইভাবে আমার দিকে ফিরলেন।

"আচ্ছা, আমি কেন তোমার সঙ্গে এতসব মনের কথা বলে ফেলছি?"

"আমি এমন একজন, যার সঙ্গে এই জায়গার তেমন কোনও সম্পর্ক নেই, আর বয়েসেরও অনেকটা তফাৎ, তাই হয়তো", আমি বললাম।

"তাই না? তা হবে", উনি মেনে নিলেন।

তারপর একটু চুপ করে রইলেন। কুড়ি কি তিরিশ সেকেন্ড মত। সেই সমটায় আমরা হয়তো আলাদা আলাদা কথা ভাবছিলাম। উনি কফির কাপটা হাতে নিয়ে একবার চুমুক দিলেন।

আর অপেক্ষা না করে, আমি এবার মুখ খুললাম, "সাএকি-সান, মনে হয়, আমার দিক থেকেও কিছু কথা আপনাকে খুলে না বলে উপায় নেই।"

উনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর স্মিত হাসলেন। "অর্থাৎ, আমাদের নিজের নিজের গোপন কথা আমরা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করছি।"

"আমারটা তেমন গোপন কিছু নয়। অনুমান মাত্র।"

"অনুমান", উত্তরে সাএকি-সান জিজ্ঞেস করেন, "মন খুলে অনুমানের কথা?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

"ইন্টারেস্টিং তো!"

"যে কথাটা বলছিলাম", আমি বলি। "তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে, যে সাএকি-সান মৃত্যুর কথা ভেবে এই শহরে ফিরে এসেছিলেন?"

ওঁর ঠোঁটের কোণায়, উষালগ্নের শুভ্রবর্ণ চাঁদের মতো, স্মিত হাসিটি ফুটে উঠল, "হয়তো সেরকমই দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, বাস্তবে দৈনন্দিন জীবনযাপনের দিকে যদি তাকাও, তেমন কিছুই তফাৎ কিন্তু পাবে না—বাঁচার জন্যই হোক, আর মরার জন্যই হোক, যেটা করছি সেটা মোটামুটি একই।"

"সাএকি-সান কি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করেন?"

"কী জানি", উনি বলেন, "আমি নিজেও ঠিক জানি না।"

"আমার বাবা মৃত্যু চাইতেন।"

"বাবা মারা গেছেন?"

"অল্প কিছুদিন হল", আমি বলি, "খুবই অল্প কিছুদিন আগে।"

"কেন মৃত্যু চাইতেন তোমার বাবা?"

আমি বড় করে শ্বাস নিয়ে নিই। "কারণটা সবটা বুঝতে পারিনি। তবে এখন অনেকটা বোধগম্য হচ্ছে কারণটা। এখানে এসে পড়ে অবশেষে বুঝতে পারছি।"

"কীভাবে?"

"বাবা আপনাকে ভালবাসতেন বলেই মনে হয়। কিন্তু কোনওভাবেই আপনাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। প্রথমত, গোড়া থেকেই আপনাকে একেবারে প্রকৃতই নিজের করে পেতে পারেননি। সেটা উনি বুঝতেন। এই কারণেই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। তাও আবার নিজেরই ছেলে, আপনারও ছেলে, আমার হাতেই খুন হতে চেয়েছিলেন। তার সঙ্গে চেয়েছিলেন যে আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনার সঙ্গে এবং দিদির সঙ্গে সংগমে লিপ্ত হই। ওটাই ছিল ওঁর ভবিষ্যতবাণী এবং অভিশাপ। এটা উনি আমার শরীরে প্রোগ্রামের মত সেট করে দিয়েছিলেন।”

সাএকি-সান হাতে ধরা কফির কাপ প্লেটের ওপর রাখলেন। এর সঙ্গে যোগ রেখে সায় দেওয়ার মত করে একটা শব্দ হল। সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকালেন উনি। কিন্তু আমাকে দেখছিলেন না। কোনো এক শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

“আমি কি তোমার বাবাকে চিনি?”

আমি মাথা নাড়লাম, “বললাম তো, অনুমান মাত্র।”

ডেস্কে একটা হাতের ওপর আরেকটা হাত রাখলেন উনি। হাসিটা এখনো ঠোঁটের কোণে সামান্য লেগে আছে।

“এই অনুমানের মধ্যে, আমি তোমার মা, তাই তো?”

“হ্যাঁ”, আমি বলি, “আপনি আমার বাবার সঙ্গে সময় কাটিয়ে, আমার জন্ম দিয়ে, তারপর আমায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। যে গ্রীষ্মে আমার মাত্র চার বছর বয়েস।”

“এটা তোমার অনুমান!”

আমি সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

“তাই, কাল তুমি, আমার ছেলেমেয়ে আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে—”

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই।

“আর আমি বলেছিলাম যে এর উত্তর আমার কাছে নেই, ‘ইয়েস’ও নয়, ‘নো’ও নয়।”

“হ্যাঁ।”

“তাই অনুমান [illegible] হিসেবে কাজ করছে।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি আরেকবার মাথা সামনে ঝোঁকাই, "কাজ করছে।"

"তাহলে... বাবা মারা গেলেন কীভাবে?"

"কারুর হাতে খুন হয়েছেন।"

"তুমি তো আর করনি!"

"আমি করিনি খুন। কোনো সহায়তাও করিনি। বাস্তব ঘটনার দিক থেকে দেখলে, আমার অ্যালিবাই আছে।"

"কিন্তু তুমি নিজে তেমন নিশ্চিত নও?"

আমি মাথা নাড়ি। "আমি নিশ্চিত নই।"

সাএকি-সান আরেকবার কফির কাপটা হাতে নিয়ে, একবার অল্প একটু চুমুক দিলেন। কিন্তু কোনও স্বাদ পেলেন না।

"তোমাকে ওরকম অভিশাপ দিতে হচ্ছিল কেন, তোমার বাবার?"

"মনে হয়, নিজের ইচ্ছেটা আমাকে দিয়ে যেতে চাইছিলেন বলে", আমি বলি।

"মানে, আমাকে পাওয়ার ইচ্ছেটা?'

"হ্যাঁ", আমি বলি।

হাতের কফির কাপের ভেতরটা দেখে নিয়ে, তারপর আবার মুখটা তুললেন সাএকি-সান।

"আর তাই—তুমি আমাকে পেতে চাইছ?"

একবার মাত্র স্পষ্ট করে মাথা সামনে ঝোঁকালাম আমি। উনি চোখ বন্ধ করলেন। আমি সেই বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়েই রইলাম। সেই চোখের পাতার ভেতর দিয়ে আমি ওঁর দৃষ্টিতে যে অন্ধকার, সেটা দেখতে পাচ্ছিলাম। আশ্চর্য সব অবয়ব ফুটে উঠছিল সেখানে। ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। অল্প পরেই উনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধীরে চোখ খুললেন।

"সবই কি অনুমানের পথ ধরে?"

"অনুমানের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। আমি আপনাকে পেতে চাই, এবং সেটা এতদিনে অনুমান বা কল্পনার মধ্যে আর আবদ্ধ নেই।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক চাও?"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

চোখ ঝলসানো কিছু যেন নিরীক্ষণ করছেন এভাবে দু'টো চোখই কুঞ্চিত করে তাকান সাএকি-সান। "এযাবৎ কখনো মহিলাদের সঙ্গে যৌনসংসর্গের অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার?"

আমি আরেকবার মাথা সামনে ঝোঁকাই। 'গতকাল রাতে, আপনার সঙ্গেই' হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা মুখে আনতে পারলাম না। ওনার কিছুই যখন স্মরণে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত করলেন সাএকি-সান। "হয়তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ, তোমার বয়েস পনের বছর, আর আমি পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছি।"

"ব্যাপারটা ঠিক অতটা সরল নয়। আমরা ঠিক সেই ধরণের সময়ের হিসেবে কথা বলছি না। সাএকি-সানের পনের বছরের সময়টা আমি জানি। আমি সেই পনের বছরের সময়ের আপনার প্রেমে পড়ে গেছি। খুবই গভীরভাবে। তারপর তার ভেতর দিয়ে আপনার সঙ্গেও। সেই মেয়েটা এখনো আপনার মধ্যে রয়েছে। সর্বদাই আপনার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে পড়লেই সে নড়েচড়ে ওঠে। আমি সেটা দেখতে পাই।"

আরেকবার চোখ বুজে ফেলেন সাএকি-সান। দেখতে পেলাম সেই চোখের পাতা মৃদু কাঁপছে।

"আপনাকে ভালবাসি, এটা হেলাফেলার জিনিস মোটেই নয়। সাএকি-সানেরও সেটা জানার কথা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সাগরের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠার মত করে বড় করে একবার শ্বাস নিলেন। তারপর কথা হাতড়াতে থাকলেন। কিন্তু খুঁজে পেলেন না।

"তামুরা, কিছু মনে কোরো না, এখন যাও। আমি খানিক একা থাকতে চাই", উনি বললেন, "যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেও।"

সায় জানিয়ে, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, ঘর থেকে বেরোনোর উপক্রম করলাম। কিন্তু কিছু একটা আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরল। দরজার মুখে থেমে গিয়ে, পেছনে ঘুরে, ঘরের ভেতরে ওঁর কাছে গেলাম। ওঁর চুলে হাত দিলাম। আমার আঙুল চুলের ভেতর দিয়ে ওঁর ছোট্ট কানটা স্পর্শ করল। না করে উপায় ছিল না। যেন আশ্চর্য হয়ে গেছেন, এভাবে মুখ তুলে, অল্প ইতস্তত করে আমার হাতে হাত রাখলেন।

"তোমার অনুমান কিন্তু অনেক দূরের লক্ষ্যকে তাক করে ঢিল ছুঁড়ছে। সেটা বুঝতে পারছ তো?"

সামনে মাথা ঝোঁকালাম। "তা জানি, কিন্তু মেটাফরের মাধ্যমে সেই দূরত্ব অনেকটাই কমে আসে।"

"কিন্তু তুমি বা আমি কেউই মেটাফর নই।"

"অবশ্যই", আমি বলি, "কিন্তু মেটাফরের মাধ্যমে আমার আপনার মাঝখানের সবকিছু অনেকটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার সামান্য স্মিত হাসি হাসেন উনি। "আমার আজ অবধি শোনা সবকিছুর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বিচিত্র প্রেমসম্ভাষণ।"

"অনেক কিছুই খানিকটা খানিকটা করে বিচিত্র। তবে আমি মনে হয় সত্যিই লক্ষ্যের নিকটবর্তী হচ্ছি।"

"বাস্তবিকই রূপকার্থের সত্যের অভিমুখে? নাকি বাস্তবিক সত্যের অভিমুখে রূপকার্থে? কিংবা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাজ করে যাচ্ছে হয়তো বা।”

“সে যাই হোক না কেন, আমি আর এখনকার এই বিমর্ষতা সহ্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না”, আমি বলি।

“আমারও একইরকম লাগছে।”

“তাই আপনি এই শহরে ফিরে এসে, মরার উপক্রম করেছেন!”

উনি মাথা নাড়লেন। “আলাদা করে মৃত্যুর উপক্রম করছি না। আসলে, আমি এখানে, মৃত্যু আসার অপেক্ষায় রয়েছি মাত্র। স্টেশনের বেঞ্চে বসে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকার মত।”

“সেই ট্রেন কখন আসবে, সেটা কি জানা আছে?”

উনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, চোখের পাতায় আঙুলের ডগা ছোঁয়ালেন।

“দ্যাখো তামুরা, আমি এতদিনে জীবনের অনেকটাই ক্ষয় করে ফেলেছি। নিজেকেই ক্ষইয়ে ফেলেছি। যখন জীবন শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল, শেষ করিনি। অর্থহীন বুঝেও, শেষ করে দিতে পারিনি বলে। এর ফল হল, কেবল এই সময়টুকু কাটিয়ে দিতে, যুক্তিহীন জিনিস সব চালিয়ে গিয়েছি। সেইভাবেই নিজের ক্ষতি করেছি, নিজের ক্ষতি করে অন্যদেরও ক্ষতি করেছি। আর তাই, এখন তার ফলভোগ করছি। অভিশাপও বলা যায় হয়তো। একসময় আমি অনেক কিছুই নিখুঁত পেয়েছি। তার পর থেকে কেবলই নিজেকে প্রলুব্ধ করে গিয়েছি। সেটাই আমার অভিশাপ। যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন এই অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। তাই মৃত্যুতে আর কোনও ভয় নেই। আর তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, *সেই ক্ষণ আমার এখন মোটামুটি জানাই আছে*।

আমি আরেকবার ওঁর হাতটা ধরলাম। তুলাদন্ড দুলছে। আর সামান্য একটু বল প্রয়োগ করলেই যেকোনও দিকে হেলে যাবে। আমাকে ভাবতে হবে। একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। কিছু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটা পদক্ষেপ নিতেই হবে।

"সাএকি-সান, আমার সঙ্গে শোবেন না?"

"তোমার অনুমান অনুযায়ী আমি তোমার মা হওয়া সত্ত্বেও?"

"কোনো কিছুই আর স্বস্থানে থাকছে না এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে, সবকিছুই দ্ব্যর্থবোধক বলে মনে হচ্ছে আমার"

উনি এটা নিয়ে ভাবলেন। "কিন্তু, আমার কাছে ব্যাপারটা হয়তো তা নয়। সবকিছুই পর্যায়ক্রমিক না হয়ে, হয় জিরো পার্সেন্ট, নয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট, যেকোনো একটা।"

"এর মধ্যে কোনটা, সে আপনি জানেন?"

উনি সামনে মাথা ঝোঁকান, সায় জানাতে।

"সাএকি-সান, একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না?"

"কি?"

"ওই দুটো কর্ড আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?"

"দুটো কর্ড?"

"*সমুদ্রতটে কাফকা*-র ব্রিজ কর্ড"

উনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। "তোমার ভাল লেগেছে ওই কর্ড দু'টো?"

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই।

"ওই কর্ড দু'টো আমি, অনেক দূরে খুব পুরনো একটা ঘরে পেয়েছিলাম। তখন সেই ঘরের দরজা খোলা থাকত", শান্তভাবে উনি বললেন। "অনেক অনেক দূরের একটা ঘরে।" এর পরেই সাএকি-সান চোখ বন্ধ করে স্মৃতির মধ্যে ফিরে গেলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তামুরা, বেরোনোর সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেও", উনি বললেন। আমিও তাই করলাম।

লাইব্রেরি বন্ধ করার পর, ওশিমা আমাকে ওর গাড়িতে চাপিয়ে, একটু দূরে একটা জায়গায় একটা সীফুড-রেস্তোরাঁতে খেতে নিয়ে গেল। রেস্তোরাঁর বিরাট জানালা দিয়ে রাতের সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। সেখানকার প্রাণিদের কথা আমি ভাবতে থাকলাম।

"মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে, পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নেওয়াই বিধেয়", ও বলে, "পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তেমন নেই। এখন অবধি ততটা ভয়ে ভয়ে থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না। মনটাও একটু অন্য দিকে নেওয়া যায়।"

আমরা বেশ অনেকটা স্যালাড খেয়ে নিয়ে, পায়েয়া[1] অর্ডার করে দু'জনে ভাগ করে নিলাম।

"কখনো একবার স্পেনে যেতে হবে", ওশিমা বলে।

"স্পেনে কেন?"

"স্পেনের যুদ্ধে অংশ নেব।"

"স্পেনের যুদ্ধ তো অনেক আগেই হয়ে গেছে!"

"সে তো জানি। লোরকা মারা গিয়েছিলেন, হেমিংওয়ে বেঁচে যান", ওশিমা বলে। "কিন্তু আমারও স্পেনে গিয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে।"

"মেটাফরিকালি!"

"অবশ্যই", ভুরু কুঁচকে ও বলে। "শিকোকু থেকে খুব একটা বাইরে বেরোয় না, হেমোফিলিয়া থাকা, অনির্দিষ্ট লিঙ্গের একজন মানুষ কি আর সত্যিই স্পেন অবধি গিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে?"

পেরিয়ারে চুমুক দিতে দিতে আমরা পায়েয়া খাচ্ছিলাম।

[1]স্পেনের একরকম পোলাও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমার বাবার ব্যাপারটায় কোনো অগ্রগতি হয়েছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"বলার মতো অগ্রগতি কিছু নেই বলেই মনে হয়। অন্তত পক্ষে এযাবৎ খবরের কাগজে এই নিয়ে খবর কিছু দেয়নি। নেহাতই আর্টের কলমে দায়সারা মত শোকজ্ঞাপন বাদ দিলে। সম্ভবত তদন্তটা ঠেকে আছে কোথাও। দুঃখের বিষয়, জাপানের পুলিশের গ্রেপ্তারির হার আজকাল দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গড়পড়তা শেয়ারের দামের মতো করেই। এমনকি কোনোভাবেই হদিস না পাওয়া ছেলেকে খুঁজে বের করতেও পারছে না।"

"পনের বছরের বাচ্চা ছেলে।"

"পনের বছরের, হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠার প্রবণতা আছে, অবসেশন তাড়িত ঘরপালানো ছেলে।"

"আর আকাশ থেকে কীসব ঝরে পড়ার ঘটনার ব্যাপারে?"

ওশিমা মাথা নাড়ে। সেদিকে যেন খানিক বিরতি পড়েছে। ওগুলো ছাড়া আর বিচিত্র কিছু আকাশ থেকে ঝরে পড়েনি। গত পরশুর একেবারে জাপান-রত্ন খেতাব পাওয়ার মত ভয়ানক বজ্রপাতের কথা না ধরলে।"

"পরিস্থিতি থিতিয়ে পড়েছে?"

"তাও বলা যায়। কিংবা হয়তো আমরা আপাতত টাইফুনের চোখের মধ্যে অবস্থান করছি মাত্র।"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে একটা গেঁড়ি হাতে নিয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে তার শাঁসটা বের করে এনে খেলাম। খোলটা খোল রাখার পাত্রে রাখলাম।

"তুমি এখনও প্রেমে পড়ে আছ তো", ওশিমা জিজ্ঞেস করে।

মাথা সামনে ঝোঁকাই, "আর ওশিমা-সান?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমি কারুর প্রেমে পড়েছি কিনা জানতে চাইছ?"

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই।

"এর অর্থ কি এই যে তুমি সাহস করে আমার এই সমকামিতাদুষ্ট বিকৃত জীবনের ছোপ লাগা অসামাজিক রোমান্সের কথা জানতে চাইছ?"

আমি মাথা ঝোঁকাই, ও নিজেও মাথা ঝোঁকায় সামনে।

"আছে একজন পার্টনার", ওশিমা বলে। তারপর সিরিয়াস মুখ করে গেঁড়ি খেতে থাকে, "প্রেম এত প্রবল নয় যে একেবারে পুচ্চিনির অপেরা অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। কী বলব, একরকমের দ্বিধার মধ্যে আছি। কখনো সখনো দেখা হয়। তবে আমরা কিন্তু মূলত পরস্পরকে বেশ গভীর ভাবে বুঝতে পারি বলেই মনে হয়।"

"বুঝতে পারেন?"

"হেডেন, কমপোজ করার সময় একটা দারুণ পরচুলা পরে নিজেকে সজ্জিত করতেন। পাউডার টাউডার লাগিয়ে।"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে ওশিমার মুখের দিকে তাকাই, "হেডেন?"

"ওসব না করলে উনি ভাল করে কমপোজ করতে পারতেন না।"

"কেন?"

"কেন, তা জানি না। ওটা হেডেন আর পরচুলার নিজেদের মধ্যের ব্যাপার। অন্য লোকে বুঝতে পারবে না। হয়তো ব্যাখ্যাও দিতে পারবে না।"

আমি মাথা ঝোঁকাই সামনে।

"আচ্ছা, ওশিমা-সান, যখন একা থাকেন, তখন ওঁর কথা ভেবে মন খারাপ হয়?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই হয়", ও বলে, "একেক সময় হয়। বিশেষ করে, চাঁদ যখন নীলাভ হয়ে আকাশে দেখা দেয়, সেইসব তিথিতে। যখন পাখিদের দক্ষিণমুখো পাড়ি দেওয়ার সময় আসে। আরও যখন—"

"কেন 'অবশ্যই' হয়", আমি জানতে চাই।

"প্রেমে পড়ে সকলেই আসলে নিজের মধ্যের অপূর্ণতাটুকুর সন্ধান করে। আর তাই, যে কেউই প্রেমিক বা প্রেমিকার কথা ভাবলেই অল্পবিস্তর সেই বোধ থেকে মন খারাপ করে ফেলে। অনেকদিন আগে খুইয়ে ফেলা স্মৃতিভারাক্রান্ত ঘরে পদার্পণ করার মত অনুভূতি হয়। এটাই স্বাভাবিক। সেই অনুভূতি তুমি আবিস্কার করনি। তাই ওটির পেটেন্টের জন্য আবেদন না করাই ভাল।"

আমি কাঁটাচামচ রেখে দিয়ে মুখ তুলি।

"বহুদূরের পুরনো স্মৃতিভারাক্রান্ত ঘর?"

"ওরকমই", ওশিমা বলে। তারপর কাঁটাচামচ শূন্যে তুলে ধরে। "যদিও অবশ্য মেটাফরিকালি।"

রাত ন'টা বাজতেই সাএকি-সান আমার ঘরে এসে গেলেন। চেয়ারে বসে বই পড়ছিলাম, ফোকসওয়াগেনের ইঞ্জিনের শব্দ পার্কিং লট থেকে কানে আসতেই পড়া থামালাম। গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলাম। রাবার সোলের জুতোর আওয়াজ ধীরে পার্কিং লট পার হয়ে এল। অল্প পরেই দরজায় নক করার শব্দ। দরজা খুলতেই, সাএকি-সান সামনে দাঁড়িয়ে। আজ আর উনি ঘুমোচ্ছেন না। পিন স্ট্রাইপ সূতীর শার্ট আর পাতলা কাপড়ের ব্লু-জীনস, সাদা ডেক-শু্য। ওঁকে এই প্রথম ট্রাউজার্স পরতে দেখলাম।

"স্মৃতিভারাক্রান্ত ঘর", উনি বললেন। তারপর দেওয়ালে ঝোলান ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। "স্মৃতিভারাক্রান্ত ছবি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ছবিতে যে জায়াগাটা দেখা যাচ্ছে, সেটা কি আশেপাশেই কোথাও", আমি জানতে চাইলাম।

"এই ছবিটা ভাল লাগে?"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই, "কে এঁকেছিলেন?"

"সেবছর গ্রীষ্মে কোওমুরা পরিবারের অতিথিশালায় এসে কাটিয়ে গিয়েছিল এক অল্পবয়েসি আর্টিস্ট, তাঁরই আকা। তেমন বিখ্যাত চিত্রকর কিছু ছিলেন না। অন্ততপক্ষে সেই সময়ে। তাই নামটাও ভুলে গেছি। তবে, উনি লোক খুব ভাল ছিলেন, এই ছবিটাও বেশ ভাল এঁকেছিলেন বলে আমার মনে হয়। এখানে কিছু একটা খুব পাওয়ারফুল জিনিস আছে। উনি যখন এটা আঁকছিলেন, আমি পুরোটা পাশে বসে থেকে দেখেছি। দেখতে দেখতে খানিকটা কৌতুক করে করেই নানারকম ফর্মাইশ করেছি। আমাদের মধ্যে একটা বেশ হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার আর সেই ছবি আঁকিয়ের মধ্যে। অনেক আগে, এক গ্রীষ্মে। আমার বয়েস তখন বারো।"

"জায়গাটা মনে হচ্ছে কাছেই সমুদ্রতীরে?"

"এসো", উনি বলে ওঠেন। "চলো হেঁটে আসি। নিয়ে যাব ওখানে।"

ওঁর সঙ্গে সমুদ্রতীর অবধি হেঁটে গেলাম। পাইনবনের ভেতর দিয়ে গিয়ে বালুর তটে হাঁটতে থাকলাম। মেঘ সরে গিয়ে অর্দ্ধেক চাঁদ আলো ঢালছে ঢেউগুলোর ওপর। ছোট ছোট ঢেউ অস্পষ্ট ভাবে অল্প উঠেই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। বালুর তটে একজায়গায় উনি গিয়ে বসলেন। আমিও কাছেই বসলাম। বালুতে তখনও সামান্য উত্তাপ রয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে কোণ নির্দেশ করার মত করে বীচের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলেন।

"ওখানটা", উনি বলেন, "এই কোণ থেকে ওই জায়গাটা এঁকেছিল। একটা ডেকচেয়ার রেখে, তাতে একটা ছেলেকে বসিয়ে। এইখানেই কোথাও ইজেলটা সেট করে। আমার স্পষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে আছে। দ্বীপের অবস্থানটাও ছবির কম্পোজিশনের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।”

আমি ওঁর আঙুলের অভিমুখের দিকে তাকালাম। সত্যিই দ্বীপের অবস্থানটা মিলে যাচ্ছে। কিন্তু যা-ই দেখি না কেন, ছবিতে আঁকা জায়গাটার মত ঠিক দেখাচ্ছে না। সেটা বললাম।

“একেবারেই পালটে গেছে”, সাএকি-সান বললেন। “আসলে চল্লিশ বছরেরও আগের ব্যাপার তো। ভৌগোলিক চিত্র স্বাভাবিক ভাবেই পালটে যায়। ঢেউ এসে এসে, বাতাসে, টাইফুনে, নানান কারণে সমুদ্রের তীরের আকৃতিটা পালটে দেয়। বালি সরিয়ে দিয়ে, বালি বয়ে নিয়ে এসে—কিন্তু ভুল হচ্ছে না। এই জায়গাটাই। সেই সময়ের কথা আমি এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। তাছাড়া সেবছর গ্রীষ্মেই আমার প্রথম ঋতুস্রাব হয়।”

সাএকি-সানও, আমিও, দুজনেই কথা না বলে সামনের দৃশ্য দেখতে থাকি। মেঘ কেবলি তার আকৃতি বদলে ফেলায়, চাঁদের আলো এখানে ওখানে এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে পাইনবনের ভেতর থেকে বাতাস এসে এমন আওয়াজ তুলছে যেন বহু লোক ঝাঁটা দিয়ে মাটির ওপরটা ঝাড় দিচ্ছে। আমি হাত দিয়ে খানিকটা বালি তুলে নিয়ে, সেগুলো আঙুলের ফাঁক গলে ঝরে যেতে দিচ্ছিলাম। বালিগুলো মাটিতে পড়ে, চোখের আড়াল হয়ে যাওয়া সময়ের মতই, অন্য বালির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাচ্ছিল। বারবারই ফিরে ফিরে এটাই করে যাচ্ছিলাম।

“কী ভাবছ তুমি এখন”, আমার থেকে জানতে চাইলেন সাএকি-সান।

“স্পেনে যাওয়ার কথা”, আমি বললাম।

“স্পেনে গিয়ে কী করবে?”

“পায়েয়া খাব, দারুণ খেতে।”

“শুধু [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"স্পেনের যুদ্ধে অংশ নেব।"

"স্পেনের যুদ্ধ তো ষাট বছরেরও বেশি আগে শেষ হয়ে গেছে!"

"জানি", আমি বলি, "লোরকা মারা গিয়েছিলেন, হেমিংওয়ে বেঁচে যান।"

"কিন্তু অংশ নিতে ইচ্ছে করছে, তাই তো?"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই। "ব্রিজ ট্রিজ উড়িয়ে দেব...।"

"তারপর ইনগ্রিড বার্গম্যানের প্রেমে পড়বে।"

"যদিও আসলে তাকামাৎসুতেই থেকে গিয়ে, সাএকি-সানের প্রেমে পড়ে আছি।"

"ঠিক যুৎমত হচ্ছে না যে!"

আমি ওঁর কাঁধে হাত বোলাতে থাকি।

'*তুমি ওঁর কাঁধে হাত বোলাচ্ছ*'

উনি তোমার ওপর শরীরের ভর ছেড়ে দিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় কেটে যায়।

"এটা কি জান? অনেক অনেক আগে ঠিক এই জিনিসই আমি করেছিলাম, ঠিক একই জায়গায়?"

"জানি তো", তুমি বললে।

"কীভাবে জানলে", সাএকি-সান বলেন। তারপর তোমার মুখের দিকে তাকান।

"আমি তখন সেখানে ছিলাম বলে।"

"ওখানে থেকে ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছিলে, তাই তো?"

"ওখানে থেকে ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছিলাম।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"মেটাফরিকালি।"

"অবশ্যই!"

তুমি দু'হাতে ওঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে, ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে। অনুভব করলে, তোমার হাতের ভেতরে ওঁর শরীর থেকে বিদায় নিচ্ছে সমস্ত শক্তি।

"আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখছি", সাএকি-সান বলেন।

সকলেই স্বপ্ন দেখছে।

"তুমি কেন মরে গেলে?"

"না মরে উপায় ছিল না", তুমি বললে।

তুমি আর সাএকি-সান সেই বালির তট ধরে হেঁটে লাইব্রেরিতে ফিরে এলে। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে, কোনও কথা না বলে বিছানায় গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলে। গতরাতের মতো প্রায় একই জিনিস, একই ভাবে পুনরাবৃত্ত হল। তবে, কেবল দুটো ব্যাপারে ফারাক ছিল। সেক্স হয়ে যাওয়ার পর উনি কাঁদলেন। সেটা একটা বালিশে মুখ গুঁজে, অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কাঁদলেন। কী করা উচিত তুমি বুঝতে পারছিলে না। ওঁর উন্মুক্ত কাঁধে আলতো করে হাত রাখলে। কিছু একটা বলা দরকার বলে ভাবলে। কিন্তু কী বলা যায়, বুঝতে পারছিলে না। সময়ের সেই গর্তের মধ্যে ভাষা মরে যাচ্ছিল। অন্ধকার ভূগহ্বরের মধ্যে নিঃশব্দে জমা হচ্ছিল। সেটা একটা। তারপর উনি ফিরে যাওয়ার সময়, এবার ফোকসওয়াগেন গলফের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। এটা দ্বিতীয়টা। উনি ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে, থামিয়ে, কিছু একটা ভেবে অল্প বিরতি দিয়ে, আবার ইঞ্জিন চালু করে, পার্কিং লট থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ইঞ্জিন থামিয়ে তারপর আবার চালু করার মাঝখানের বিরতিটুকু তোমাকে ভয়ানক বিষাদগ্রস্ত করে তুলল। সময়ের ওই ফাঁকটুকু যেন সমুদ্র থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্পের মত তোমার মনের ভেতরে এসে ঢুকে পড়ল। দীর্ঘসময় ধরে সেই বিষাদ তোমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রইল। আর অনতিবিলম্বে তোমারই একটা অংশ হয়ে উঠল।

সাএকি-সান চলে যাওয়ার পরেও রয়ে গেল চোখের জলে ভেজা বালিশটা। হাত দিয়ে সেই সিক্ত জায়গাটা স্পর্শ করে তুমি জানালার বাইরে আকাশের ক্রমে ক্রমে ফিকে হয়ে আসা দেখতে থাকলে। কানে এল দূরে কোথাও কাক ডাকার আওয়াজ। ভূ-গোলক ধীরে আবর্তিত হয়েই চলেছে। আর সেইটকু বাদ দিলে, সকলেই স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে রয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩২

সকাল পাঁচটার আগেই চোখ খুলে, নাকাতার নজরে পড়ল, বালিশের কাছে একটা বড় পাথর রাখা আছে। পাশের বিছানায় হোশিনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মুখটা অর্দ্ধেক খোলা, চুল উসকো খুসকো। বালিশের কাছে চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপিটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেই তরুণের ঘুমন্ত মুখে, "কোনও মতেই চোখ আমি খুলছি না" এরকম একটা দৃঢ় সংকল্প যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওখানে যে পাথরটা রয়েছে, এতে নাকাতা আশ্চর্যও হল না, খুব একটা অদ্ভুত কিছু বলেও জ্ঞান করল না। ওর বোধবুদ্ধিতে বালিশের কাছে যে একটা পাথর রয়েছে সেটা তৎক্ষণাৎ কোনওরকম খটকা না রেখে সহজভাবেই গ্রহণ করল, 'কেন ওরকম একটা বস্তু ওখানে রয়েছে', তার ধার দিয়েও গেল না। সবকিছুর কার্যকারণ সম্পর্ক খতিয়ে দেখা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাকাতার ক্ষমতার অতীত।

বালিশের কাছে গ্যাঁট হয়ে বসে, অল্প সময়ের মধ্যেই সে সোৎসাহে পাথরটাকে দেখতে লাগল। তারপরেই হাত বাড়িয়ে, ঠিক যেন ঘুমন্ত একটা বড় বেড়ালকে স্পর্শ করতে যাচ্ছে এইভাবে আলতো করে পাথরটাকে ছুঁল। প্রথমে ভয়ে ভয়ে আঙুলের ডগাটুকু লাগিয়ে, বিপদের কিছু নেই বুঝতে পারতেই সাহসী হয়ে উঠে নিবিষ্ট ভাবে হাতের তালু দিয়ে ওটার ওপরে হাত বুলিয়ে নিল। পাথরের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে আগাগোড়া কী যেন ভেবে গেল। অথবা কিছু যেন ভাবছে এরকম একটা অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে তুলল। ম্যাপ খুঁটিয়ে দেখার মত করে ওর হাত, পাথরের সেই রুক্ষ স্পর্শ আগাপাশতলা স্মরণে রেখে, ওটার উঁচুনিচু অংশগুলো এক এক করে খুঁটিয়ে মনে করে রাখছিল। তারপর হঠাৎ করেই, যেন কী মনে পড়ে গেছে এইভাবে নিজের মাথায় হাত দিয়ে, ছোট করে ছাঁটা চুলে ঘসঘস করে হাত ঘষতে লাগল। ঠিক যেন, পাথরটা আর নিজের মাথার মধ্যে সম্ভাব্য একটা কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে দেখার চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপরেই একটা দীর্ঘশ্বাসের মত ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে, জানালা খুলে বাইরে মুখ বা'র করল। ঘরের জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির পেছনদিকটাই শুধু দেখা যায়। খুবই জরাজীর্ণ একটা বিল্ডিং। জরাজীর্ণ এক অট্টালিকার মধ্যে জরাজীর্ণ মানুষেরা জরাজীর্ণ সব কাজে লিপ্ত থেকে জরাজীর্ণ প্রাত্যহিকতা অতিবাহিত করছে। যে কোনও নগরীর পথেই এরকম প্রত্যন্তে অযত্নলালিত সৌধ রয়ে গেছে। চার্লস ডিকেন্স হলে হয়তো এইরকম একটা বাড়ি নিয়ে, দশ পাতা জুড়ে একটা ছবি এঁকে যেতে পারতেন। বিল্ডিংটার ওপরে ভাসমান মেঘ, অনেকদিন পরিষ্কার না করা ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের ধুলোর মত শক্ত হয়ে ঢেলা পাকিয়ে রয়েছে যেন। কিংবা তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ফলে জন্ম নেওয়া বহুমুখী সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন জমাট বেঁধে একটা কোনো আকৃতি পেয়ে, সেই অবস্থায় আকাশে ভেসে আছে। নির্ঘাত এক্ষুণি বৃষ্টি শুরু হবে। নাকাতার চোখে পড়ল একটা শুঁটকো মত কালো বেড়াল, দুটো বিল্ডিং-এর মাঝের সরু দেওয়ালের ওপর লেজ খাড়া করে টহল দিচ্ছে।

"আজ বজ্রমশাই আসবেন", বেড়ালকে উদ্দেশ্য করে নাকাতা বলে ওঠে। কিন্তু সেকথা যেন বেড়ালের কানে গেল না। ফিরেও তাকাল না, হাঁটাও থামল না, স্বমহিমায় হেঁটে গিয়ে বিল্ডিংয়ের এক কোণে কোথাও মিলিয়ে গেল।

বাথরুমে প্রয়োজন পড়ে এরকম সব জিনিসের ব্যাগটি নিয়ে করিডরের শেষে কমন বাথরুমে গিয়ে, এবার সে সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে, দাঁত মেজে, সেফটি রেজার দিয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল। প্রত্যেকটা কাজে খানিকটা করে সময় লাগল। অনেকটা সময় নিয়ে ভাল করে মুখটুখ ধুয়ে, অনেকটা সময় নিয়ে দাঁত মেজে, অনেকটা সময় নিয়ে ভাল করে দাড়ি কামাল। কাঁচি দিয়ে নাকের লোম ছেঁটে, ভুরু আঁচড়ে, কান পরিষ্কার করে নিল। এমনিতেই স্বভাবই হচ্ছে যেকোনও কাজেই একটু সময় লাগানো, আজ যেন একটু বিশেষরকমই ধীরেসুস্থে সব করল। সকালে অত তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নেওয়ার লোক সে তেমন নয়, ব্রেকফাস্ট তৈরি হতে হতে আরো খানিক সময় বাকি আছে। উপস্থিত হোশিনোর ঘুম ভাঙার সম্ভাবনাও নেই। নাকাতা কারুর কিছুতে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, আয়নার সামনে ধীরেসুস্থে প্রসাধন সারতে সারতে পরশু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

লাইব্রেরির বইতে দেখা নানারকম বেড়ালের মুখ স্মরণে আনতে থাকল। অক্ষরজ্ঞান নেই, তাই বেড়ালের প্রকারভেদগুলো জানা নেই। কিন্তু ওখানে যেসব বেড়ালের মুখ ছিল তার প্রত্যেকটা সে ভালই মনে করতে পারে।

"সত্যিই, জগতে কতরকমের যে বেড়ালমশাইরা আছে", কান খোঁচানোর কাঠি ব্যবহার করে কান পরিস্কার করতে করতে নাকাতা ভাবল। জন্মে থেকে এই প্রথম লাইব্রেরিতে যাওয়া হয়ে উঠল, সে যে কতকিছুই জানত না, সেটা নাকাতা মর্মে মর্মে টের পেল। সে জানে না এরকম কত কীই যে জগতে রয়ে গেছে, তার কোনও সীমা নেই। কিন্তু সীমাহীন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে নাকাতার মাথাটা সামান্য ধরেই গেল। একথা তো সকলেরই জানা যে সীমাহীনের কোনও সীমা নেই। সে তাই সীমাহীন নিয়ে ভাবনা মাঝপথে থামিয়ে, আরেকবার সেই বহু ছবি সম্বলিত 'জগতের বেড়াল' বইটাতে দেখা বেড়ালদের কথা ভাবতে বসল। এক এক করে ওইসব বেড়ালের প্রত্যেকটার সঙ্গে কথা বলতে পারলে বেশ হত বলে ওর মনে হল। জগতে নানারকম চিন্তাধারার ও নানারকম বাকরীতির অনেকরকম বেড়াল আছে নিশ্চয়ই। এছাড়া "বিদেশি বেড়ালেরা আবার যথারীতি বিদেশি ভাষায় কথা বলে কিনা", নিয়েও নাকাতা ভাবল। কিন্তু সেটাও আরেক কঠিন বিষয়, নাকাতার মাথা আবারও ব্যথা করতে শুরু করল।

প্রসাধন শেষ হলে, ও এবার ল্যাট্রিনে গিয়ে অন্যান্য দিনের মতই প্রাতঃকৃত্য সারল। এতে অতটা সময় লাগল না। টয়লেটে ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখার ব্যাগ নিয়ে নাকাতা এবার ঘরে ফিরে এল। ভঙ্গিতে আগের চেয়ে এতটুকুও পরিবর্তন ঘটতে না দিয়ে হোশিনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মেঝের ওপর ছেড়ে রাখা আলোহা শার্ট আর ব্লু-জীনস তুলে নিয়ে, প্রান্তগুলো একসঙ্গে করে, নাকাতা সেগুলো সুন্দর করে ভাঁজ করল। তারপর, সেগুলো সেই তরুণের বালিশের কাছে একটার ওপর আরেকটা রেখে, কয়েকটা আইডিয়া একত্র করে একটা শিরোনাম দেওয়ার মত করে, ওগুলোর ওপরে চু-নিচি ড্রাগনসের টুপিটা চাপিয়ে রাখল। তারপর শোয়ার সময়ের পরিধেয় 'ইউকাতা' ছেড়ে, অন্য সময়ের মতই ট্রাউজার্স ও শার্ট পরে নিল। দু'টো হাত জোরে জোরে ঘষে নিয়ে বড় করে গভীর শ্বাস নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আরেকবার পাথরটার সামনে বাবু হয়ে বসে, সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে ওটার গা'টা একটু স্পর্শ করে দেখল।

"আজ বজ্রমশাই এসে পড়বেন", বিশেষ কারুকে উদ্দেশ্য না করেই নাকাতা বলে। কিংবা সেই পাথরটাকেই উদ্দেশ্য করে বলে। তারপর কয়েকবার নিজেই মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় জানায়।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নাকাতা যখন কিছু শারীরিক কসরৎ সেরে নিচ্ছিল, তখন অবশেষে সেই তরুণ চোখ মেলল। রেডিও[†] নির্দেশিত ব্যায়ামের সুরটা নিচুস্বরে গুনগুন করতে করতে, তালে তালে নাকাতা শরীরচালনা করে যাচ্ছিল।

তরুণ হোশিনো চোখটা অল্প খুলে রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকাল। একটু আগে আটটা বেজে গেছে। তারপর সে ঘাড় ঘুরিয়ে নাকাতার বিছানায় বালিশের কাছে পাথরটা আছে কিনা দেখে নিল। অন্ধকারে যা দেখা গিয়েছিল, তার চেয়ে পাথরটা অনেকটাই বড় আর রুক্ষ দেখাল।

"নেহাতই স্বপ্ন ছিল না তাহলে", তরুণ বলে।

"কীসের কথা বলছেন", নাকাতা জানতে চায়।

"পাথরটার ব্যাপারে বলছি", তরুণ বলে। "পাথরটা দিব্যি ওখানে রয়েছে। নেহাতই স্বপ্ন ছিল না তাহলে"।

"পাথরটা আছে", রেডিওর ব্যায়াম চালিয়ে যেতে যেতে সংক্ষেপে নাকাতা বলে। কথাটা শোনাল যেন উনবিংশ শতকের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক জার্মান প্রস্তাবনার অনুরণনের মত।

"শুনুন, ওই পাথরটা 'কেন ওখানে আছে' সেই নিয়ে মস্ত এক গল্প আছে, কাকু"।

"হ্যাঁ। সেরকম বলেই নাকাতারও মনে হয়েছিল।"

[†]জাপানে সকালবেলা রেডিওর কোনও নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে, প্রবীণদের একত্রে সমবেতভাবে কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গসঞ্চালনের নির্দেশ দেওয়া হতে থাকে, আর সঙ্গে

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

"সে যাকগে", বলে সেই তরুণ বিছানায় উঠে বসে বড় করে শ্বাস ফেলল। "সে যাই হোক না কেন, পাথরটা তো আছে। এককথায় সেটাই"।

"পাথরটা আছে", নাকাতা বলে। "সেটাই আসল কথা"

হোশিনো এই নিয়ে কিছু বলবে কিনা ভাবল, কিন্তু টের পেল যে ভয়ানক খিদে পেয়ে গিয়েছে।

"আরে, কাকু, সে যা খুশি হোক, সকালের খাবারটা খেতে যাওয়া যাক।"

"হ্যাঁ। নাকাতারও পেট খালি।"

সকালের খাবার খাওয়ার পরে, ও-চা[†] খেতে খেতে সেই তরুণ নাকাতার থেকে জানতে চাইল, "এবার এই পাথরটা নিয়ে কী করব?"

"কী করা যায়?"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান", তরুণ হোশিনো মাথা নাড়তে নাড়তে বলে। "কাকু বলেছেন যে পাথরটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি যেভাবে পারি, গতকাল রাতের মধ্যে খুঁজে বের করেছি কিনা। এখন শেষমেষ সেটার 'কী করা যায়' আমাকেই জিজ্ঞেস করলে তো মুশকিল।"

"হ্যাঁ। হোশিনো-সান ঠিকই বলেছেন, তবে কিনা, সত্যি বলতে নাকাতা এখনও ভাল করে জানে না যে কী করা যেতে পারে।"

"সে তো মুশকিলের ব্যাপার তাহলে!"

"হ্যাঁ, মুশকিলই হয়েছে", নাকাতা বলল বটে, মুখের অভিব্যক্তি দেখে তেমন মুশকিল বলে মনে হল না।

"সেক্ষেত্রে, একটু সময় নিয়ে ভাবলে, ধীরে ধীরে জানা যাবে হয়তো, কী বলেন?"

[†] 'ও-চা' হল সবুজ চা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ। নাকাতাও সেটাই ভাবছে। কী করবে, সেটা ভাবতে নাকাতার যেহেতু অন্যের চেয়ে সময় লাগে বেশি।"

"কিন্তু, নাকাতা-সান—"

"বলুন হোশিনো-সান।"

"নামটা কে যে দিয়েছিল, সে তো জানা নেই, কিন্তু নামটা যেহেতু 'প্রবেশপথের পাথর', জিনিসটা নির্ঘাত সেই প্রাচীনকালে, কোথাওকার প্রবেশপথ ছিল হয়তো। কিংবা ওই নামে কোনওরকম প্রচলিত কিছু হতে পারে, অথবা কোনওরকম গৌরবের ইঙ্গিত আছে হয়তো কথাটায়।"

"হ্যাঁ। নাকাতারও মনে হয় যে সেরকমই কিছু হতে পারে।"

"কিন্তু কীসের প্রবেশপথ যদি না-ই জানা যায়, তাহলে?"

"হ্যাঁ। নাকাতাও এখনো ভাল করে জানে না। বেড়ালমশাইদের সঙ্গে অনেক সময়ই কথা বলেছি, কিন্তু পাথরমশাইদের সঙ্গে এখনও অবধি কথা বলা হয়নি যে!"

"পাথরের সঙ্গে কথা বলা সহজ নয় বলেই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। বেড়ালের সঙ্গে কথা বলার থেকে অনেকটাই আলাদা।"

"তবে, যত যা-ই হোক, এরকম একটা গুরুতর জিনিস জিনজার ছোট মন্দির থেকে নিজে নিজে নিয়ে এলে, সত্যিই কোনও শাপ যে লাগবে না, কে বলতে পারে! আমার ক্রমেই দুশ্চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে। এমনিতেই, নিয়ে চলে আসাটা পরে সামলানোও মুশকিলই হবে। কর্নেল স্যান্ডার্স যদিও বলছিলেন যে কোনও শাপ লাগবে না, সেও এমনই লোক যাকে একটুও ভরসা করার মত কিছু নেই।"

"কর্নেল স্যান্ডার্স?"

"ওই নামে এক আংকল আছেন। কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেনের দোকানের সামনে প্রায়ই যে সাইনবোর্ড থাকে, সেখানকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আংকল। সাদা স্যুট পরা, দাড়ি আছে, কেমন একটা চশমা পরা—দেখেননি?"

"কিছু মনে করবেন না, নাকাতা এসব ব্যাপারে কিছু জানে না।"

"সে কি, কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন জানেন না। আজকাল এরকম দেখা যায় না। যাকগে, যেতে দিন। তবে কিনা, সে আবার নিজেই একটা বিমূর্ত ধারণা। মানুষও না, দেবতাও না, বুদ্ধও না। বিমূর্ত ধারণা বলে কোনও চেহারা নেই। কিন্তু কিছু একটা বাইরের চেহারা তো লাগে, তাই ওই রূপই ধরেছেন।"

নাকাতা বিপন্ন মুখ করে মাথার কাঁচাপাকা মেশানো চুলে হাতের তালু ঘষতে থাকে। "ব্যাপারটা যে কী, নাকাতার ভাল জানা নেই।"

"সত্যি কথা বলতে কী, আমিই বলছি বটে, ব্যাপারটা যে ঠিক কী তা আমারও ভাল জানা নেই", সেই তরুণ বলে। "কিন্তু যে ভাবেই হোক, একটু ইউনিক ধরণের এই আংকল কোত্থেকে কীভাবে যেন এসে হাজির হয়ে, এইসবই এটা ওটা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে গেলেন। লম্বা কাহিনী ছোট করে একেবারে নির্যাসটুকু বলতে গেলে বলতে হয়, এটা ওটা হয়ে, সেই আংকলের কৃপায়, আমি ওই জায়গায় এই পাথরটা খুঁজে পেয়ে, বয়ে নিয়ে এসেছি এই অবধি। কারুর সহানুভূতি আদায় করতে বলছি না, বেশ খাটাখাটনির রাত গেছে। সম্ভব হলে পাথরটা নাকাতা-সানের হাতে দিয়ে, এর পরেরটুকু ওঁর হাতেই ছেড়ে দিতে চাইছি। সত্যি কথা এটাই।"

"হ্যাঁ, নাকাতা ঠিক করে ফেলেছে।"

"হুঁ", তরুণ হোশিনো বলে, "যাক, তাড়াতাড়িই হয়ে গেল।"

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলে।

"কী?"

"এরপর বজ্রমশাইরা অনেকে এসে পড়বেন। ওনাদের জন্য অপেক্ষা করব আমরা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে আবার কী, পাথরের ব্যাপারে বজ্র কাজে লাগবে নাকি?"

"খুব খুঁটিয়ে নাকাতারও জানা নেই এখন অবধি, একটু একটু করে সেরকমই মনে হচ্ছে যেন।"

"তাই সই, বজ্রই হোক না হয়—ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। বজ্রের অপেক্ষাই করি তাহলে। তারপর কী হয় দেখা যাক।"

ঘরে ফিরে এসে, হোশিনো উপুড় হয়ে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে, টেলিভিশনের সুইচ অন করে দিল। কোনও চ্যানেলেই গৃহবধূদের দেখার জন্য ভ্যারাইটি শো ছাড়া কিছু হচ্ছে না। ওগুলো দেখার খুব একটা ইচ্ছে হোশিনোর ছিল না, কিন্তু আর অন্য কীভাবে সময় কাটাবে তা ভেবে না পেয়ে, যা দেখাচ্ছে সেই নিয়ে এটা ওটা সমালোচনা করতে করতে দেখে যাচ্ছিল।

সেই সময়টায় নাকাতা পাথরটার সামনে বসে, ওটার দিকে চেয়ে, আঙুল বুলিয়ে দেখছিল। মাঝে মাঝে আপন মনে কী যেন বিড়বিড় করে বলছিল। কিন্তু কী যে বলছিল সেটা কিছুতেই সেই তরুণ শুনে বুঝে উঠতে পারছিল না। হয়তো পাথরের সঙ্গেই কথা বলছে। দুপুরের দিকটায় বজ্রেরা শেষ পর্যন্ত নির্ঘোষ শুরু করল।

বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে হোশিনো গিয়ে কাছেই কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে ব্যাগ ভর্তি করে মিষ্টি বানরুটি আর দুধ কিনে নিয়ে এল। দুপুরের খাওয়া ওই দিয়েই সারল দু'জনে। খাওয়ার সময় ডর্মিটরির পরিচারিকা ঘর পরিষ্কার করার জন্য এসে একবার মুখ দেখিয়েছিল বটে, তরুণ তাকে 'এভাবেই থাকুক' বলে বারণ করল।

"আপনারা কোথাও যাবেন না", পরিচারিকা জানতে চায়।

"না, যাব না কোথাও। কাজ আছে, এখানে থেকেই করতে হবে", তরুণ জবাবে জানাল।

"বজ্রমশাই আসবেন তো", নাকাতা বলে দেয়।

"বজ্রমশাই", সন্দিগ্ধ মুখ করে পরিচারিকা চলে যায়। যতটা পারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যায় এই ঘরটার ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়াই ভাল বলে ভাবল হয়তো।

অল্প পরেই দূরে বাজ পড়ার আওয়াজ হতেই, সেটাকে সংকেত বলে ধরে নিয়ে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। যেন ঢাকের ওপরে যেন কোনও বাচ্চা অলস পদাঘাত করছে, এরকমই কেমন যেন একটা বজ্রপাতের আওয়াজ। কিন্তু পরক্ষণেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির বিষন্ন গন্ধে পৃথিবী ছেয়ে গেল।

এদিকে বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছে, আর রেড ইন্ডিয়ান দুই বন্ধু যেন পালা করে পাইপ হস্তান্তর করছে, এভাবে দু'জনে মুখোমুখি বসে রইল সেই পাথরটাকে আগলে। নাকাতা যথারীতি বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলতে বলতে, পাথরটাতে হাত বোলাতে বোলাতে, নিজের মাথায় হাত ঘষে যাচ্ছিল। আর সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে তরুণ মার্লবরো সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল।

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলে।

"কী, বলুন?"

"কিছুক্ষণের জন্য আমার পাশে থাকবেন?"

"আছি তো। প্রথমত, কোথাও যেতে বললেও, এই বৃষ্টিতে বেরুতে পারব না।"

"অদ্ভুত কিছু ঘটে যেতেও পারে কিন্তু—"

"আমার মনের কথা বলতে যদি অনুমতি করেন", তরুণ বলে। "এযাবৎ তো অদ্ভুত কিছুই শুধু ঘটে চলেছে।"

"হোশিনো-সান—"

"কী, বলুন?"

"এমনিই ভাবছি, এই নাকাতা বলে মানুষটা আসলে কী ছিল?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হোশিনো ভাবিত হয়ে পড়ল। "এটা তো কঠিন প্রশ্ন, কাকু। হঠাৎ করে এরকম প্রশ্ন করে বসলে মুশকিলের ব্যাপার। সে বললে তো, হোশিনো বলে মানুষটা যে আসলে কী, আমার সেটাই ভাল জানা নেই। এহেন লোক, অন্যের কথা আর কী বলবে? বলতে লজ্জা হওয়া উচিত যদিও, ভাবাভাবির ব্যাপারে একেবারে খুবই আনাড়ি। তবে কিনা, আমার যেটা মনে হয় তা যদি বলি, নাকাতা-সান একজন সহজ সরল সৎ মানুষ। বেশ একটু বেখাপ্পা হলেও, ভরসার যোগ্য মানুষ। সেইজন্যই তো একেবারে শিকোকু অবধি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। আমার মাথাটা একদমই কাজ করে না ঠিকই, কিন্তু লোক চিনি না এমন নয়।"

"হোশিনো-সান—"

"কী, বলুন?"

"নাকাতার যে শুধু মাথাটাই নিরেস, এমন নয়, নাকাতা একদম ফাঁপা। সেটা এইমাত্র ভাল বুঝতে পারলাম। নাকাতা হচ্ছে, একটাও বই নেই এরকম লাইব্রেরির মত। আগে এরকম ছিল না। নাকাতার মধ্যেও বই ছিল। কিছুই মনে করতে পারছিল না এতদিন, এবার মনে পড়েছে। হ্যাঁ। একসময় আর সকলের মতই সাধারণ মানুষ ছিল নাকাতা। কিন্তু একবার কী একটা হয়েছিল, যার ফলে নাকাতা ফাঁপা একটা পাত্রের মত হয়ে পড়ে।"

"কিন্তু দেখুন, নাকাতা-সান। সেকথাই যদি বলেন, আমরা সকলেই কি অল্পবিস্তর ফাঁপা নই? খাই, হাগি, ফালতু কাজ করে নামমাত্র মাইনে পাই, মাঝে মাঝে সংগম করি, এছাড়া আর কীই বা করি। আর করার আছেই বা কী। তবে কিনা, এটাও বলতে হয়, এইভাবেই তো বেশ ইন্টারেস্টিং, মজার জীবন যাপনও করছি। কেন করছি জানি না যদিও—আমার দাদু প্রায়ই বলতেন। জগতে আমরা যেমন ভাবি সেভাবে কিছুই ঘটে না বলেই ইন্টারেস্টিংও। একথারও যুক্তি আছে। চু-নিচি ড্রাগনস যদি সব খেলায় জিতে যেত, কে আর বেসবল দেখতে যেত?"

"দাদুকে খুব ভালবাসেন হোশিনো-সান, তাই না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে, ভালবাসি তো বটেই। দাদু না থাকলে আমি যে কী হয়ে যেতাম জানি না। দাদু ছিল বলেই, যে করেই হোক সৎপথে থেকে বাঁচার ইচ্ছেটা তৈরি হয়েছিল। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, কীসের সঙ্গে যেন বাঁধা পড়ে আছি বলে মনে হত। তাতেই আমি বখা ছেলেদের দল থেকে বেরিয়ে এসে সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সে ঢুকলাম। কবে যেন তেমন একটা খারাপ কিছু করাও ছেড়ে দিলাম, নিজেই জানি না।"

"কিন্তু হোশিনো-সান, নাকাতার কেউই নেই। কিছুই নেই। বন্ধনও কিছু নেই। পড়তেও পারে না। ছায়া পর্যন্ত, সচরাচর যতটা হয়, তার আদ্ধেক।"

"প্রত্যেকেরই কিছু খামতির দিক আছে—"

"হোশিনো-সান—"

"কী, বলুন?"

"যদি ধরা যাক, নাকাতা সেই স্বাভাবিক নাকাতা হয়েই থাকত, তাহলে মনে হয়, নাকাতা একেবারে পুরোই অন্য একটা জীবন কাটিয়ে দিত। অন্য দুই ভাইয়ের মতই, হয়তো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে টড়ে, অফিস টফিসে চাকরি করে, বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিয়ে, বড় গাড়িতে চড়ে, ছুটির দিনে হয়তো গলফ খেলত। কিন্তু নাকাতা তো স্বাভাবিক নাকাতা রইল না, তাই এখনকার এই নাকাতার মত করে বেঁচে রইল। ফের নতুন করে শুরু করার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে আমি ভাল করেই জানি। তবু, এত অল্প সময়ের জন্য হলেও, নাকাতা কিন্তু স্বাভাবিক নাকাতা হতে চায় বলেই মনে হচ্ছে। সত্যি বলতে কী, নাকাতা এযাবৎ কখনও কিছু করতে চায় বলে ভেবেছে এমন হয়নি। আশেপাশের কেউ কিছু করতে বললে, সেটুকুই সে যথাসাধ্য করে এসেছে। হয়তো সেরকমই করার কথা, ভেবে নিয়ে যা করার করে গেছে। কিন্তু এখন আর তা নয়। পরিষ্কার স্বাভাবিক নাকাতাতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে নাকাতার। নিজস্ব চিন্তা, নিজস্ব ধারণা নিয়ে নাকাতা হয়ে উঠতে চায়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তরুণ হোশিনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "যদি সেটাই নাকাতা-সানের মনোবাঞ্ছা হয়, সেটাই হোক তাহলে। স্বাভাবিক নাকাতাতে ফিরে গেলেই হয়। তবে কিনা, স্বাভাবিক নাকাতা-সান হয়ে যাওয়া নাকাতা-সান যে কেমন নাকাতা-সান, সেটা যদিও আমি একটুও আন্দাজ করতে পারছি না।"

"হ্যাঁ, নাকাতাও আন্দাজ করতে পারছে না।"

"কিন্তু ভালয় ভালয় হয়ে গেলেই হয়। আমি যতটুকু পারি, প্রার্থণা করছি যাতে নাকাতা-সান স্বাভাবিক লোক হয়ে যেতে পারেন।"

"কিন্তু স্বাভাবিক নাকাতা অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আগে, নাকাতাকে নানা কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে।"

"যেমন?"

"যেমন, জনি ওয়াকার-সানের ব্যাপারটা।"

"জনি ওয়াকার", তরুণ বলে ওঠে, "কথাটা কাকু আগেও যেন বলেছিলেন। জনি ওয়াকার মানে সেই হুইস্কির জনি ওয়াকার কি?"

"হ্যাঁ। নাকাতা দেরি না করে পুলিশ পোস্টিং-এ গিয়ে, জনি ওয়াকার-সানের কথা বলেছিল। গভর্নরকে রিপোর্টই করা দরকার মনে করে। কিন্তু তেমন আমল পেলাম না। অগত্যা নিজের ক্ষমতায় একটা বিহিত করতে হবে। এই ধরণের সব সমস্যার একটা হিল্লে করে, তারপর সম্ভব হলে নাকাতা না হয় স্বাভাবিক নাকাতা হবে।"

"ব্যাপারটা ভাল বুঝলাম না যদিও—এক কথায়, সেসব করতে এই পাথরটা দরকার।"

"হ্যাঁ। সেরকমই। বাকি অর্দ্ধেক ছায়া ফিরিয়ে আনতে হবে নাকাতাকে।"

বজ্রপাতের শব্দ ততক্ষণে কানে তালা ধরিয়ে দেওয়ার উপক্রম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করেছে। নানা রেখায় আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চোখের পলকে, আর তা চাপা পড়ে যাচ্ছে ধেয়ে যাওয়া বজ্রনির্ঘোষে। বায়ুমন্ডল কেঁপে উঠে, আলগা হয়ে যাওয়া জানালার কাচ ঠকঠক করে ভয়ার্ত আওয়াজ করছে। কালো মেঘে আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়ে, ঘরের ভেতরটা একে অন্যের মুখের অভিব্যক্তি দেখতে না পারার মতো অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু ওরা দু'জন আলো জ্বালেনি। আগের মত একইভাবে ওরা পাথরটাকে আগলে মুখোমুখি বসে রয়েছে। দেখেই দম আটকে আসে এরকম বৃষ্টি জানালার বাইরে প্রবলভাবে অঝোরে হয়েই চলেছে। বিদ্যুৎ চমকালে একেকবার করে ঘরের ভেতরটা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনের কেউ কারুর কথা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল না।

"কিন্তু, নাকাতা-সানকে এই পাথরটা নিয়ে কিছু একটা করতে হবে কেন? আর নাকাতা-সানকেই তার জন্য লাগবে কেন", বজ্রপাতের আওয়াজ একটু বিরতি দিতেই তরুণ হোশিনো জিজ্ঞেস করে বসে।

"যেহেতু নাকাতা হচ্ছে এমন মানুষে যে একবার বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে এসেছে।"

"বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে এসেছে?"

"হ্যাঁ। নাকাতা একবার এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। জাপান তখন বড় একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সেই সময় কোনও ভাবে ঢাকনা খুলে নাকাতা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার কোনও ভাবে, এখানে ফিরে এসেছে। এই কারণেই নাকাতা আর স্বাভাবিক নাকাতা ছিল না। ছায়াও ছিল মাত্র আর্দ্ধেকটা। তার বিনিময়ে, এখন আর ভাল পারব না যদিও, বেড়ালমশাইদের সঙ্গেও কথা বলতে পারতাম। হয়তো আকাশ থেকে জিনিস ঝরাতে পারতাম।"

"এর মধ্যে সেই যে জোঁকের ব্যাপারটা ঘটল?"

"হ্যাঁ, সেটাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"যে কারুর পক্ষেই সেটা সম্ভব, এমন তো নয়!"

"হ্যাঁ। যে কারুর পক্ষেই সেটা সম্ভব, এমন নয়।"

"অনেক আগে নাকাতা-সান বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে এসেছিলেন বলে এটা করতে পারেন। সেই কারণেই স্বাভাবিক মানুষ নন।"

"হ্যাঁ, সেটাই। নাকাতা আর স্বাভাবিক নাকাতা রইল না। তার বিনিময়ে নাকাতা আর পড়তে পারে না। মেয়েদেরও ছোঁয়া হয়নি।"

"তাজ্জব ব্যাপার!"

"হোশিনো-সান—"

"কী, বলুন?"

"নাকাতার ভয় করছে। আগেও যেটা বলেছি, নাকাতা কিন্তু একদম ফাঁপা। ফাঁপা বলতে কী বলতে চাইছি, হোশিনো-সান বুঝতে পারছেন তো?"

তরুণ মাথা ঝাঁকায়। "সম্ভবত পারছি না বলেই মনে হয়!"

"ফাঁপা হল, একটা ফাঁকা বাড়ির মত। তালা দেওয়া নেই এমন একটা ফাঁকা বাড়ির মত। ঢুকতে চাইলে, যা কিছুই, যে কেউই খুশি মত সেখানে ঢুকে আসতে পারে। নাকাতার এতে ভয়ানক ভয় হয়। যেমন ধরুন, নাকাতা আকাশ থেকে জিনিস নামাতে পারে। কিন্তু এরপরে নাকাতা আকাশ থেকে কী নামিয়ে আনবে সেটা নাকাতারও মোটেই জানা নেই। যদি এমন হয় যে নেমে এল দশ হাজার ছুরি, কিংবা বড় একটা বোমা, অথবা বিষাক্ত গ্যাস যদি নেমে আসে, নাকাতা তখন কী করবে। নাকাতা সবার কাছে মাফ চেয়ে নিলেই তো হবে না।"

"হুঁ, সে তো ঠিকই। অত সহজ নয় যে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে", হোশিনোও একমত হল। "এমনকি জোঁকও বেশ ভয়ানক জিনিস যদিও, ওইসব আরো মারাত্মক জিনিস নেমে আসার কথা তো ভাবাই যায় না!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"জনি ওয়াকার-সান নাকাতার ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। নাকাতা করতে চায়নি এমন কাজ নাকাতাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। জনি ওয়াকার-সান নাকাতাকে ব্যবহার করেছিলেন। নাকাতা তার কথার অবাধ্য হতে পারেনি। তার কথা অমান্য করার শক্তি নাকাতার ছিল না। তার কারণ নাকাতার অন্তঃসার বলে কিছু ছিল না।"

"তাই আপনি স্বাভাবিক নাকাতায় ফিরতে চান। অন্তঃসার ঠিকঠাক আছে এমন নাকাতা-সানে।"

"হ্যাঁ, সেটাই। নাকাতার মাথাটা সত্যিই নিরেস, কেবলমাত্র আসবাব তৈরি করতে পারত বলে রোজই আসবাব তৈরি করে যেত। ডেস্ক, চেয়ার, দেরাজ এইসব তৈরি করতে নাকাতার ভালই লাগত। যেসব জিনিসের ধাঁচ আছে, সেগুলো তৈরি করাটাই ভাল। সেই কয়েকটা দশক ধরে, স্বাভাবিক নাকাতায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে চিন্তায়ই আসেনি। এছাড়াও, এসে একেবারে নাকাতার ভেতরে ঢুকে পড়ার মত লোকও আশেপাশে কেউ ছিল না। ভয় টয় কখনও পাইনি। কিন্তু এমন সময় এসে হাজির হলেন জনি ওয়াকার-সান। তারপর থেকে নাকাতার কেবলি ভয় করেছে।"

"তো, সেই জনি ওয়াকার-সান এসে নাকাতা-সানের ভেতরে ঢুকে পড়ে করলেনটা কী?"

হঠাৎ করে প্রবল শব্দে বাতাস খানখান হয়ে গেল। মনে হল কাছেই কোথাও বাজ পড়েছে। হোশিনোর কানের পর্দায় তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতি হল। নাকাতা ঘাড়টা অল্প হেলিয়ে, বাজ পড়ার আওয়াজে কান পেতে থেকে, যথারীতি পাথরটার ওপরে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল।

"যে রক্ত ঝরার ছিল না, তা ঝরেছে—"

"রক্ত ঝরেছে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেই রক্ত নাকাতার হাতে লাগেনি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তরুণ এটা নিয়ে কিছুক্ষণ একটু ভাবে। কিন্তু নাকাতার কথার অর্থ ধরতে পারে না।

"কিন্তু, যেভাবেই হোক, প্রবেশপথের এই পাথরটা যদি একবার খোলে, নানাকিছু গিয়ে, সব যেটা যেখানে থাকার সেখানে আপনা থেকেই ঠিকঠাক থিতু হয়ে বসবে, তাই না? জল যেমন উঁচু থেকে নিচুর দিকে বয়ে যায়, সেরকম—"

নাকাতা কিছুক্ষণের জন্য ভাবিত হয়ে পড়ে। কিংবা হয়তো ভাবিত মুখ করে থাকে। "অত সহজ হয়তো হবে না। নাকাতার যেটা করণীয়, সেটা হল, এই প্রবেশপথের পাথরটাকে খুঁজে বা'র করে, পথটা খুলে দেওয়া। সত্যি বলতে, তারপরে কী হবে সেটা নাকাতা ভাল জানে না।"

"কিন্তু কথা হল, পাথরটা ঠিক শিকোকুতেই থাকতে হল কেন?"

"পাথর সব জায়গাতেই আছে। শুধু শিকোকুতে আছে, এমনটা নয়। আর, পাথরই যে হতে হবে এমনও কোনও কথা নেই।"

"ঠিক বুঝলাম না। সব জায়গাতেই যদি থেকে থাকে, নাকানো ওয়ার্ডে হলেই ভাল ছিল না? সময়, পরিশ্রম দু'টোই বাঁচত।"

নাকাতা কিছুক্ষণ হাতের তালু দিয়ে মাথার ছোট ছোট চুলে হাত বুলাতে থাকে। "বলা মুশকিল। অনেকক্ষণ ধরেই পাথরমশাইর কথা শুনে চলেছি, কিন্তু শুনে তেমন ভাল করে বুঝতে পারছি না। তবে নাকাতার যেটা মনে হয়, নাকাতাকেও, হোশিনো-সানকেও, এই অবধি হয়তো আসতেই হতো। বড় ব্রিজটা পার হয়ে আসার দরকার ছিল। নাকানো ওয়ার্ড হলে, কাজটা ঠিকঠাক হত না বলে মনে হয়।"

"আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"হ্যাঁ। কী?"

"আচ্ছা, যদি এরকম হয় যে নাকাতা-সান প্রবেশপথের পাথরটা সরিয়ে খুলে দিলেন, তাহলে কি সেই সংকেতে দড়াম করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা দারুণ কিছু ঘটে যাবে? 'আলাদিন ও যাদুপ্রদীপ' গোছের কোনওরকম উদ্ভট ভূত এসে হাজির হবে, কিংবা ব্যাঙ রাজপুত্র তড়াক করে লাফিয়ে এসে আমাদের কষে চুমু খাবে, নয়তো মঙ্গলগ্রহের লোক এসে খেয়ে নেবে, এরকম কিছু একটা!"

"কিছু ঘটবে কিনা জানি না, ঘটবে না কিনাও জানা নেই। নাকাতাও আগে কখনো এরকম কিছু খুলে দেয়নি, তাই ভাল জানা নেই। না খুললে জানা যাবে না।"

"তাছাড়া জিনিসটা বিপজ্জনক কিছু কিনা, তাও বলা যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন—"

"বোঝো অবস্থা", তরুণ হোশিনো বলে। তারপর পকেট থেকে মার্লবরো বের করে, লাইটার দিয়ে ধরায়। "দাদু প্রায়ই বলতেন। 'ভাবনাচিন্তা না করেই, অচেনা লোকের সঙ্গে জুটে যাওয়া তোর একটা বিচ্ছিরি স্বভাব'—বলে বলতেন। নির্ঘাত সেই ছোটবেলা থেকেই এরকমই স্বভাব ছিল। কথায় বলে, 'তিন বছর বয়েসের স্বভাব একশো বছরেও'। সে যাকগে। কিছু করার নেই। শিকোকু অবধি বয়ে এসে, পাথর হাতে তুলে দেওয়া অবধি করেছি। এর একটা হিল্লে না করে এই অবস্থায় আলগোছে ফিরে তো যাওয়া যায় না। বিপদের আশঙ্কা আছে জেনেও একবার কপাল ঠুকে খুলেই দেখা যাক না কী ঘটে। দূর ভবিষ্যতে নাতি-নাতনিদের কাছে সেই গল্প করা যাবে হয়তো—"

"হ্যাঁ। এ ব্যাপারে হোশিনো-সানের কাছে একটা অনুরোধ আছে।"

"কী সেটা?"

"পাথরটা একটু তুলে ধরবেন?"

"সে করাই যাবে।"

"আসার সময়ের চেয়ে অনেক ভারি হয়ে গেছে।"

"যেমনই দেখাক, একেবারে আর্নল্ড শোয়ার্জেনিগারের মতো না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হলেও, গায়ে জোর আছে। সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে যখন ছিলাম, আমাদের ইউনিটের পাঞ্জা লড়ার প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছিলাম। তার ওপর আবার ক'দিন আগে নাকাতা-সান কোমরটা সারিয়ে দিয়েছেন।"

হোশিনো উঠে দাঁড়িয়ে, দু'হাতে পাথরটা ধরে, ওইভাবেই তুলতে গেল। কিন্তু একচুলও নড়াতে পারল না পাথরটাকে।

"হুম, বাপধন সত্যিই বেশ ভারি হয়ে গেছে", দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুণ বলে, "অথচ একটু আগেও আরামসে সোজা নিয়ে এসেছি। একেবারে যেন পেরেক টেরেক ঠুকে মেঝেতে আটকে দেওয়া হয়েছে।"

"হ্যাঁ। যতই হোক, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ তো, অত সহজে সরার মত নয়। সহজেই সরে গেলে মুশকিল আছে।"

"তাই হবে।"

এইসময় বেশ কয়েকটা আঁকাবাঁকা সাদা আলোর রেখা, একটার পর একটা, আকাশকে ছেদ করে চলে গেল। উপর্যুপরি বজ্রপাতের আওয়াজ ধরিত্রীর অভ্যন্তর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। তরুণ হোশিনোর মনে হল, ঠিক যেন কেউ নরকের ঢাকনাটা সরিয়ে নিল। সবশেষে খুব কাছে একটা বাজ পড়ে, তারপর একেবারে নৈঃশব্দ নেমে এল। দমবন্ধ হয়ে আসার মত ভারি নৈঃশব্দ। বাতাস আর্দ্রতার ভারে স্তব্ধ, কী যেন সন্দিগ্ধতার আর ষড়যন্ত্রের আভাস তাতে। চারপাশে বায়ুমন্ডলে নানা সাইজের অসংখ্য কান যেন আবির্ভূত হয়ে, চুপ করে দু'জনের উদ্বেগের কথা শুনতে চাইছে বলে মনে হচ্ছিল। দু'জনে সেই মধ্যদিনের আঁধারে আবৃত হয়ে, নির্বাক বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। অনতিবিলম্বে এক দমকা বাতাস এসে আবারও বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা জানালার কাঁচের ওপর আছড়ে ফেলে, আবারও বজ্রনির্ঘোষ শুরু হল বটে, কিন্তু আগের সেই প্রাবল্য তাতে আর তখন নেই। বজ্রবাহী মেঘের কেন্দ্রস্থল তখন শহর ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তরুণ হোশিনো ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দৃষ্টি

ফেলল। ঘরটা কেমন আশ্চর্য নিষ্প্রাণ, চারদিকের দেওয়াল কেমন আগের চেয়েও ভাবলেশহীন। ধরানো মার্লবরো সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নিজের আকৃতি অবিকৃত রেখে ছাই হয়ে গিয়েছে। তরুণ ঢোঁক গিলে নৈঃশব্দের ভার কান থেকে ঠেলে বা'র করে দিল।

"আরে, নাকাতা-সান!"

"কী হয়েছে, হোশিনো-সান?"

"কীরকম মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি!"

"হ্যাঁ। কিন্তু তাহলেও, অন্ততপক্ষে দু'জনেই একই স্বপ্ন তো দেখছি!"

"তা বটে", হোশিনো বলে। তারপর যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে এভাবে কানের লতি চুলকোতে থাকে। "তা বটে, নাভি খোঁটে, নাভির খোল, খোল মাখা ভামের ঝোল—বলে তবু বেশ ভরসা পাওয়া যায়!"

তরুণ আরেকবার পাথরটা সরানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে উঠে দাঁড়ায়। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে, থেমে, দুই হাতে সমস্ত শক্তি জড়ো করে। তারপর গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বের করে তারসঙ্গে পাথরটা তুলে ধরে। এবার পাথরটা মাত্র কয়েক ইঞ্চি নড়ে।

"সামান্য একটু নড়েছে", নাকাতা বলে।

"এতে বোঝা গেল যে পেরেক ঠুকে আটকানো নেই। কিন্তু একটু নড়লে তো চলবে না।"

"হ্যাঁ। নিখুঁতভাবে উলটে না দিলে তো হবে না—"

"প্যানকেক উলটে দেওয়ার মত করে?"

"সেভাবেই", মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় জানিয়ে নাকাতা বলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"প্যানকেক নাকাতার ভাল লাগে।"

"সে তো ভালই। নরকে প্যানকেক বলে একটা কথাও আছে। আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক। কোনওভাবে ব্যাটাকে চট করে একেবারে উলটে দেওয়া যায় কিনা।"

তরুণ হোশিনো চোখটা বন্ধ করে গভীর মনঃসংযোগ করল। সারাদেহের যাবতীয় শক্তি একত্র করে একটি বিন্দুতে সংহত করল একটা ঝটকা দেওয়ার জন্য। এই একবারই, ও ভাবল। যেভাবেই হোক এইবারেই যা হবার হতে হবে। এবারে না হলে, আর হবার নয়।

সে পাথরটায় জায়গামত হাত রেখে, গভীর মনঃসংযোগ সহকারে গ্রিপ শক্ত করে, শ্বাস স্বাভাবিক করল। সবশেষে একবার জোরালো ভাবে শ্বাস নিয়ে, বুকের একেবারে তলদেশ থেকে একেবারে সবটুকু নিংড়ে আওয়াজ বের করে একই সঙ্গে পাথরটাকে তুলে ফেলল। ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে ওটা শূন্যে উঠল। সেটুকুই সর্বোচ্চ। কিন্তু কোনওক্রমে সেই অবস্থায় ওটাকে ধরে রাখল। পাথরটাকে আগলে ধরে বড় করে শ্বাস ফেলতেই সারা শরীরটা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। সমস্ত হাড়, পেশি, স্নায়ু আর্তনাদ করে উঠল যেন। কিন্তু ওখানেই ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। আরেকবার বড় করে শ্বাস নিয়ে, একখানা রণহুঙ্কার ছাড়ল। যদিও সেই আওয়াজ নিজের কানে গিয়ে পৌঁছল না। কী যে বলল তাও নিজে জানে না। চোখ বন্ধ রেখে, সর্বোচ্চ শক্তিও অতিক্রম করা জোর কোথাও থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োগ করল। এমনিতে ওর মধ্যে অতটা শক্তি থাকার কথা নয়। মাথায় অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে এক্কেবারে সাদা হয়ে গেল সবকিছু। ফিউজ উড়ে যাওয়ার মত হয়ে, কিছু কিছু বোধ যেন একটার পর একটা লোপ পেয়ে গেল। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। কিছু ভাবতে পারছিল না। যথেষ্টও বাতাসও পাচ্ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তরুণ যেভাবে পারে পাথরটা এক হ্যাঁচকায় ওপরে তুলে, আবারও চেঁচিয়ে উঠে বিপরীত দিকে উলটে দিল। একটা পয়েন্টের পরে, পাথরটা চট করে বেসামাল ভাবে নিজেরই ভারে উলটে পড়ে গেল। দড়াম করে শব্দ হয়ে, ঘরটা ভালরকম কেঁপে উঠল। যেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিল্ডিংটাই কেঁপে উঠল।

এর প্রতিক্রিয়ায় তরুণ পেছনে উলটে পড়ল। মেঝেয় মাদুরের ওপর চিৎ হয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে লাগল। মাথার মধ্যে নরম কাদার মত কী যেন বনবন করে ঘূর্ণির মত পাক খাচ্ছে। এর পরে দ্বিতীয়বার এতটা ভারি কিছু আর তোলা হবে না বলেই তরুণের মনে হল (যদিও তখনকার মত তরুণ জানতই না যে এটা তার একটু বেশিরকম আশাবাদী অনুমান বলেই ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে)।

"হোশিনো-সান।"

"কী, বলুন?"

"আপনার কৃপায় প্রবেশপথ খুলে গিয়ে।"

"আরে, কাকু, নাকাতা-সান—"

"কী?"

তরুণ হোশিনো চিৎ অবস্থায় চোখ বন্ধ রেখে, আরেকবার জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিল। "এতেও না খুললে, আমার আর বলার কিছু ছিল না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

৩৩

ওশিমা আসার আগে, লাইব্রেরি খোলার ব্যবস্থা করছিলাম। লাইব্রেরির ভেতরে মেঝেয় ক্লীনার চালিয়ে, জানালার কাঁচ মুছে, টয়লেট পরিষ্কার করে, একটা একটা করে টেবিল আর চেয়ারের ধুলো ঝাড়লাম। চকচকে করে তোলার স্প্রে ব্যবহার করে সিঁড়ির রেলিং পালিশ করলাম। ল্যান্ডিং-এর স্টেইনড গ্লাসের ধুলো পরিস্কার করলাম সাবধানে যত্ন নিয়ে। বাগান ঝাঁট দিয়ে, রীডিংরুমের এয়ারকন্ডিশনার আর আর্কাইভ আর্দ্রতামুক্ত করার যন্ত্র সুইচ অন করে দিলাম। কফি করে, পেনসিলগুলো ছুলে রাখলাম। সকালের এই জনহীন লাইব্রেরির কী যেন একটা জিনিস আমার দারুণ লাগে। সমস্ত কথা, চিন্তা-ভাবনা, এই সবই যেন নিঃশব্দে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি যতটা পারি জায়গাটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে কোলাহলমুক্ত রাখতে চাই। কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে, আর্কাইভে সার দিয়ে রাখা নির্বাক বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। কোনো কোনোটার স্পাইনগুলো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি। সাড়ে দশটা বাজতেই, অন্যান্য দিনের মতই গাড়ি রাখার জায়গায় মাজদা রোডস্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে আসে, একটু যেন ঘুমঘুম মুখে ওশিমা এসে উপস্থিত হয়। লাইব্রেরি খোলার সময় হওয়ার আগে আমরা হালকা কথাবার্তা বলতে থাকি।

"অসুবিধে না থাকলে, এখন একটু বাইরে ঘুরে আসতে চাই", লাইব্রেরি খোলার পর ওশিমাকে আমি বললাম।

"কোথায় যাবে?"

"জিমে গিয়ে একটু হাত-পায়ের আড় ভাঙতে চাইছি। টানা খানিকক্ষণ ব্যায়ামও করতে চাইছিলাম।"

অবশ্যই কেবল সেটুকুই নয়। দুপুরের আগেটায় সাএকি-সান যখন কাজে আসবেন, পারতপক্ষে ওঁর মুখোমুখি হতে চাইছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুটা অবসর দিয়ে, মনটা শান্ত হলে, তবেই দেখা হওয়া ভাল।

ওশিমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, একবার শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, তারপর মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় জানাল। "কিন্তু সাবধানে, যতটা পার। আমি তো আর মা-মুর্গি নই, বেশি এটা ওটা বলে উত্যক্ত করতে চাই না। কিন্তু তোমার যা অবস্থা তাতে যতই সাবধান হও, আরও হওয়াই ভাল।"

"ঠিক আছে, সাবধানে থাকব", আমি বলি।

রুকস্যাকটা কাঁধে ফেলে ট্রেনে চড়ে বসলাম। তাকামাৎসুতে নেমে, তারপর একই বাস ধরে জিমে গেলাম। লকার রুমে পোশাক পালটে, ট্রেনিং-এর উপযোগী পোশাক পরে নিয়ে, মিনিডিস্ক ওয়াকম্যানে 'প্রিন্স' শুনতে শুনতে উপর্যুপরি 'সার্কিট' পরিক্রমা করতে থাকি। অনেকদিন হয়ে গেছে বলে, শরীরটা গোড়ায় কঁকিয়ে উঠল। কিন্তু কোনওক্রমে হজম করে নিলাম সেটা। কঁকিয়ে উঠে, চাপটা প্রত্যাখান করাটা শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমাকে যেটা করতে হবে—সেই প্রতিক্রিয়াটাকে প্রশমিত করে দমিয়ে রাখা। 'লিটল রেড কোয়ায়েট' শুনতে শুনতে, শ্বাস নিয়ে, থেমে, ছেড়ে দিলাম। শ্বাস নিয়ে, থেমে, ছেড়ে দেওয়া। এটাই নিয়ম করে বার বার করে গেলাম। পেশিগুলোতে ক্রমাগত যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু মাত্রাছাড়া নয়। ঘামে টি-শার্ট ভিজে ভারি হয়ে গেল। বারবারই ওয়াটার কুলারের কাছে গিয়ে তেষ্টা মেটাতে হচ্ছিল।

অন্যান্যবারের মতই ক্রমানুসারে যন্ত্র পালটাতে পালটাতে সাএকি-সানের কথা ভাবছিলাম। ওঁর সঙ্গে সেক্সের কথা ভাবছিলাম। ভেবেছিলাম কিছুই ভাবব না। কিন্তু সে অত সহজ নয়। মনটা পেশিতে নিবদ্ধ করলাম। রুটিনটার মধ্যেই নিজেকে মগ্ন রাখব। অভ্যস্ত যন্ত্র, অভ্যেস মত ভার, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। কানের মধ্যে প্রিন্স গাইছে, 'সেক্সি মাদারফাকার'। আমার পুরুষাঙ্গের ডগায় এখনো একটু ব্যথা আছে। হিসি করার সময় ব্যথা করছিল। পুরুষাঙ্গের মাথাটা লাল হয়ে আছে। পেনিসের সামনের চামড়াটা সবে গুটিয়েছে, এখনও যথেষ্ট বয়োঃপ্রাপ্ত হয়নি, বোঝাই যাচ্ছে। মাথার ভেতরটা, সেক্স নিয়ে গিজগিজ করা নানা অশান্ত চিন্তা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রিন্সের পিচ্ছিল কণ্ঠস্বর, নানা বই থেকে উদ্ধৃতি, এইসবে ফেটে পড়ছে।

শাওয়ারে ঢুকে ঘাম ধুয়ে ফেলে, নতুন অন্তর্বাস পরে নিয়ে আবার গিয়ে বাসে চেপে স্টেশনে ফিরলাম। খিদে পেয়েছিল বলে, স্টেশনের সামনেই একটা রেস্তোরাঁ চোখে পড়ে গিয়ে, সেটায় ঢুকে সাধারণ কিছু খেলাম। খেতে খেতেই খেয়াল করলাম যে তাকামাৎসুতে পৌঁছনোর পর প্রথম এই রেস্তোরাঁটাই চোখে পড়েছিল। সে কথায় মনে পড়ল, এখানে এসে থেকে আদৌ ক'দিন হল যেন? লাইব্রেরিতে থাকতে পাওয়ার পর থেকে মোটামুটি একসপ্তাহ কেটে গেল। শিকোকুতে আসার পর সম্ভবত, সব মিলিয়ে তিন সপ্তাহ মত হয়ে যাওয়ার কথা। রুকস্যাক থেকে ডায়েরি বা'র করে, আবার চোখ বোলালেই তক্ষুণি বোঝা যাবে ঠিকই, মনে মনে দিন তারিখের হিসেব ঠিকমত করতে পারছি না।

খাওয়া শেষ হলে, ও-চা খেতে খেতে স্টেশনে ব্যস্ত হয়ে আসা-যাওয়া করা লোকেদের দেখতে থাকলাম। সব্বারই কোথাও না কোথাও একটা গন্তব্য আছে। আমার ক্ষেত্রেও সেরকমই হলে, আমিও ওদেরই একজন হতে পারি। এবার কোনও একটা ট্রেনে চেপে অন্য কোনও দিকে চলে যেতে পারি বলে মনে হল। এখানকার যা কিছু সব ফেলে দিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে, কোনও অচেনা শহরে গিয়ে, আরেকবার শূন্য থেকে নতুন করে শুরু করতে পারি। খাতার মাঝখানে একটা পাতা খুলে বসার মতন। যেমন ধরা যাক, হিরোশিমাতে চলে যেতে পারি, ফুকুওকাতেও যাওয়া যায়। আমি কোনও কিছুর কাছেই বাঁধা পড়ে নেই। একশো ভাগ স্বাধীন। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আপাতত কাঁধের রুকস্যাকে ভরা আছে। পোশাক-আশাক, টয়লেটে ব্যবহার্য জিনিস, স্লীপিং ব্যাগ। বাবার স্টাডি থেকে নিয়ে আসা নগদ টাকায় এখনো খুব একটা হাতই দিইনি।

তবে কিনা, এটাও ভাল করেই জানি যে আমার এখন আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"তবে কিনা, তুমিও ভাল করেই জান যে এখন আর তোমার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই", কারাসু নামের ছেলেটা বলল।

সাএকি-সানকে জড়িয়ে ধরে, ওঁর ভেতরে তুমি বীর্যপাত করেছ। কয়েকবারই। প্রত্যেকবারই উনি সেটা গ্রহণও করেছেন। তোমার পুরুষাঙ্গে এখনো ব্যথা রয়ে গিয়েছে। ওটা এখনো ওঁর যোনির স্পর্শানুভূতি স্মরণ করতে পারে। সেটাও তোমার জন্য একটা জায়গা হতে পারে। এছাড়া তুমি লাইব্রেরিটার কথা ভাব। সকালের শান্ত তাকগুলোতে সার দিয়ে থাকা নির্বাক বইগুলোর কথা ভাব। ওশিমার কথা ভাব। তোমার ঘরটা, দেওয়ালে ঝোলানো 'সমুদ্রতটে কাফকা', সেই ছবি দেখতে আসা পনের বছরের মেয়েটা—তুমি মাথা নাড়ছ। এখান থেকে বেরোতে তুমি পারবে না। স্বাধীন নও মোটেই। কথা হল, সত্যিই কি তুমি স্বাধীন হতে চাও?

স্টেশন চত্বরে টহল দিতে থাকা পুলিশদের কয়েকবারই পাশ কাটিয়ে গেলাম। তারা অবশ্য আমার দিকে দৃকপাতও করল না। রুকস্যাক কাঁধে রোদে পোড়া অল্পবয়েসি ছোকরা সর্বত্রই দেখা যায়। আমিও তাদেরই একজন হয়ে গিয়ে, দৃশ্যপটের সঙ্গে মিশে মিলিয়ে যাওয়ার কথা। ভয় ভয় করার মত কিছু নেই। বেশ স্বচ্ছন্দ আচরণ করাই ভাল। সেটা করলে আর কেউই আমাকে নজর করে দেখবে না যেহেতু।

দুই বগির ছোট্ট ট্রেনে চেপে লাইব্রেরিতে ফিরে এলাম।

"ফেরা হোক", ওশিমা হেঁকে বলে। তারপর আমার রুকস্যাকটার দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়ে বলে, "দ্যাখো অবস্থা! তুমি কি সর্বদাই এরকম বিশাল একটা মোট ঘাড়ে বয়ে হেঁটে বেড়াও নাকি? এ তো ঠিক যেন, চার্লি ব্রাউনের কার্টুনে সবসময় কম্বল ঘাড়ে করে বেড়ানো ছেলেটার মত!"

জল ফুটিয়ে চা করে খেতে থাকি। ওশিমা অন্যান্য সময়ের মতই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটা চোখা করে কাটা লম্বা পেনসিল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। (ছোট হয়ে যাওয়া পেনসিলগুলোর কী হয়, কে জানে?)

"তোমার কাছে ওই রুকস্যাকটা স্বাধীনতার সিম্বলের মত একটা জিনিস হয়ে গেছে নির্ঘাত", ওশিমা বলে।

"হতে পারে", আমি বলি।

"স্বাধীনতা হস্তগত হওয়ার চেয়েও, স্বাধীনতার সিম্বল হস্তগত করে ঘুরতে, তৃপ্তি কিছু বেশিই হয়তো—"

"কখনো কখনো", আমি বলি।

"কখনো কখনো", ও কথাটার পুনরাবৃত্তি করে। "পৃথিবীর কোথাও যদি, 'সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর প্রতিযোগিতা' বলে কিছু থাকত, তুমি কিন্তু বিরাট ব্যবধানে জিতে যেতে।"

"সম্ভবত", আমি বলি।

"সম্ভবত", তাজ্জব বনে যাওয়ার মত করে ওশিমা বলে। "শ্রীমান তামুরা কাফকা, সম্ভবত জগতের অধিকাংশ লোক স্বাধীনতা তেমন চায় না। কেবল ভাবে যে স্বাধীনতা চাইছে। সবটাই বিভ্রম। যদি সত্যিই স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হত, অধিকাংশ লোকই ফ্যাসাদে পড়ে যেত। এটা মনে রাখতে পারলে ভাল হয়। লোকে আসলে পরাধীনতাই পছন্দ করে।"

"ওশিমা-সান নিজেও?"

"হ্যাঁ, আমিও পরাধীনতাই পছন্দ করি। অবশ্যই নেহাতই একটা লেভেল পর্যন্ত", ওশিমা বলে। "জাঁ জাক রুসো সভ্যতার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে যে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল তখনই, যখন মানুষ বেড়া দিতে শিখেছিল। অন্তর্দৃষ্টি যে ছিল, তা তো অবশ্যই বলতে হবে। সেই অনুসারে, সমস্ত সভ্যতাই বেড়া দিয়ে সীমায়িত করে দেওয়া পরাধীনতা থেকে উৎপন্ন। তবে কিনা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অ্যাবরিজিনালরা কেবল ব্যতিক্রম। ওরা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভাজনহীন সভ্যতা বজায় রেখেছিল। ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

একেবারে মূলতই স্বাধীন সত্ত্বা। যখন খুশি, পছন্দমত জায়গায় গিয়ে পছন্দমত কিছু করতে পারত। আক্ষরিক অর্থেই ওদের জীবন ছিল হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। হেঁটে বেড়ান জিনিসটা ছিল ওদের বেঁচে থাকার এক গভীর মেটাফর। ইংরেজরা এসে যখন পালিত পশুদের রাখার জন্য বেড়া তুলছিল, ওরা এ জিনিসের যে কী উদ্দেশ্য এক্কেবারেই বুঝে উঠতে পারেনি। তারপর এই প্রথার অর্থ বোঝার আগেই, ওরা নিজেরাই অপসারিত হল রুক্ষ অনুর্বর জমিতে, ওদের অস্তিত্বই সমাজবিরোধী ও বিপজ্জনক এই অপবাদে। ফলত তোমারও এটা যথাসম্ভব খেয়াল রাখাই শ্রেয়, শ্রীমান তামুরা কাফকা। শেষ বিচারে, এই জগতে উঁচু করে পোক্ত পাঁচিল যারা তুলে দিতে পারে সেইসব মানুষেরাই মোক্ষমভাবে বেঁচে থাকে। সেটা মানতে না চাইলেই তোমাকে মরুভূমিতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

আমি ঘরে ফিরে, মালপত্র রাখলাম। তারপর রান্নাঘরে নতুন করে কফি বানিয়ে, অন্যান্য দিনের মতই সাএকি-সানের ঘরে নিয়ে গেলাম। দু'হাতে ধাতব ট্রে, সিঁড়ি দিয়ে একটা একটা করে ধাপ খুব সন্তর্পনে উঠছি। পুরনো কাঠের পাটাতনে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে সামান্য। ল্যান্ডিং-এর রঙীন-কাঁচ তার উজ্জ্বল রঙের খানিকটা মেঝেয় ফেলেছে। সেইসব রঙের সমাহারের মধ্যে পা ফেলে ফেলে আমি হেঁটে গেলাম।

সাএকি-সান ডেস্কে বসে লেখালেখি করছেন। আমি কফির কাপটা নিয়ে রাখলাম। উনি মুখ তুলে, অন্যান্য দিনের সেই চেয়ারটায় আমাকে বসতে বললেন। কালো টি-শার্টের ওপরে উনি একটা কাফে-ও-লে ধরণের রঙের শার্ট চাপিয়েছেন। সামনের চুলগুলো হেয়ার পিন দিয়ে ওপরে তুলে, কানে ছোট্ট একটা মুক্তার দুল পরেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না। তক্ষুণি যেটা লিখেছেন সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। মুখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তিতে, সচরাচরের চেয়ে ভিন্ন কিছু নেই। কলমে ঢাকনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আটকে, কাগজপত্রের ওপরে রাখলেন। হাত ছড়িয়ে দিয়ে, আঙুলে যে কালি লেগে নেই সেটা দেখে নিলেন। রোববার বিকেলের সূর্যকিরণ জানালা দিয়ে ঢুকে এসেছে। বাগানে কে যেন দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

“ওশিমার থেকে শুনলাম, জিমে গিয়েছিলে”, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন।

“হ্যাঁ, গিয়েছিলাম”, আমি বললাম।

“জিমে গিয়ে কী ধরণের ব্যায়াম কর?”

“যন্ত্র দিয়ে আর ওয়েট নিয়ে”, আমি উত্তরে বলি।

“এছাড়া?”

আমি মাথা নাড়ি।

“একার জন্য স্পোর্টস?”

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

“নিশ্চয়ই শক্তিশালী হয়ে উঠতে চাও তুমি!”

“শক্তিশালী না হতে পারলে তো বেঁচে থাকাই যাবে না। বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে।”

“তুমি খুব একা বলে?”

“কেউ তো আর বাঁচাতে আসবে না। অন্তত‌পক্ষে এখন অবধি কেউ বাঁচাতে আসেনি। তাই নিজের জোরেই টিঁকে যেতে হবে। তার জন্য শক্তিশালী হওয়াটা খুব জরুরি। দলছুট কাকের মত। তাই আমি নাম নিয়েছি কাফকা। চেক ভাষায় কাফকা হল কাক।”

“হুঁউঁ”, যেন খানিকটা তারিফের সুরেই উনি বললেন। “তুমি তাহলে কাক।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সেরকমই", আমি বলি।

সেরকমই, কারাসু নামে ছেলেটা বলে।

"কিন্তু সেভাবে বেঁচে থাকারও তো একটা সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। শক্তিকে প্রাচীরের মত করে নিয়ে, তার ভেতরে জীবনকে একটা ঘেরাটোপের মত করে রাখতে পারা যায় নাকি। শক্তি মানেই অধিকতর শক্তির কাছে যা পরাস্ত হয়। যুক্তি তো তাই বলে।"

"যেহেতু শক্তি জিনিসটাই নৈতিকতা হয়ে পড়ে।"

সাএকি-সান স্মিত হাসেন। "তোমার বোধবুদ্ধি তারিফ করার মত।"

আমি বলি, "আমি যেটা চাইছি, যে শক্তিটা চাইছি, সেটা জেতা বা হারার শক্তি নয়। বাইরের কোনও শক্তিকে প্রতিরোধ করার মত প্রাচীরের দরকার নেই। আমার দরকার বাইরের থেকে আসা ক্ষমতাকে গ্রহণ করে, সেটাকে সামলে ওঠার মত শক্তি। বৈষম্য কি দুর্দৈব, কিংবা দুঃখ, ভুল বোঝাবুঝি, সহমর্মিতার অভাব—এইসব যেন শান্ত ভাবে সামলে উঠতে পারি, এমন শক্তি।"

"সে জিনিস সম্ভবত, এমন শক্তি যা হাসিল করা সবচেয়ে কঠিন।"

"সে আমি জানি।"

ওঁর স্মিত হাসি যেন আরেক প্রস্থ গভীর হল। "তুমি অবশ্যই যেকোনো কিছুই জান।"

আমি প্রতিবাদে মাথা নাড়ি। "তা নয়। আমার তো এখনও মাত্র পনেরো বছর বয়েস, জানা নেই এমন ভূরিভূরি জিনিস রয়ে গেছে। জানা নেই, অথচ না জানলেই নয়। যেমন, সাএকি-সান সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

কফির কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন উনি। "আমার সম্বন্ধে জানা থাকা উচিত এমন খুব একটা কিছু প্রকৃতপক্ষে নেই। অর্থাৎ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাকে জানতেই হবে এমন একটা জিনিসও আমার মধ্যে নেই।"

"সেই অনুমানের কথা মনে আছে?"

"নিশ্চয়ই", উনি বলেন। "কিন্তু সেটা তো তোমার অনুমান, আমার নয়। আর তাই, আমি সেই অনুমানের দায়িত্ব না নিলেও চলে। ঠিক কিনা?"

"ঠিকই বলেছেন। অনুমান সত্য কিনা যাচাই করতে হবে তাকেই যে অনুমান করছে", আমি বলি। "সে ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"কী নিয়ে?"

"বহুদিন আগে, সাএকি-সান বজ্রস্পৃষ্ট লোকেদের নিয়ে বই লিখে, সেটা ছাপিয়েছিলেন। তাই না?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"এখনও কি পেতে পারি সেই বইটা?"

উনি মাথা নাড়লেন। "আসলে তেমন বেশিসংখ্যক কপি বা'র করা হয়নি, আর অনেকদিন আগেই আউট অব প্রিন্ট হয়ে গিয়ে, সেই স্টক সম্ভবত ইতিমধ্যে রিসাইক্লিং হয়ে গেছে। আমার নিজের কাছে পর্যন্ত একটাও কপি নেই। আগেও বলেছি মনে হয়, আসলে বজ্রস্পৃষ্ট লোকেদের সাক্ষাতকার সংকলিত বইটাতে কারুরই তেমন আগ্রহ ছিল না।"

"সাএকি-সানের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল কীভাবে?"

"কীভাবে যে হয়েছিল। ওর মধ্যে কী যেন একটা প্রতীকাত্মক ব্যাপার আছে বলে অনুভব করেছিলাম হয়তো। হয়তো নেহাতই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে, একটা যুৎসই লক্ষ্য সৃষ্টি করে, শরীর মন চালু রাখতে চেয়েছিলাম হয়তো। সরাসরি ঠিক কী কারণ ছিল, এখন আর মনে নেই। যেভাবেই হোক, সেই সময়টায় হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে, রিসার্চ শুরু করে দিয়েছিলাম। সেই সময় আমি একটা লেখালেখির কাজ করতাম, যেহেতু টাকাপয়সা নিয়ে বিশেষ অসুবিধে কিছু ছিল না, খুশিমত সময়ও বা'র করা যেত, একটা পর্যায় পর্যন্ত নিজের পছন্দমত কাজই করতে পেরেছি। তবে কাজটা খুবই ইন্টারেস্টিং কাজ ছিল। অনেকরকম লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কতরকমের যে কাহিনী শুনতে পেয়েছিলাম। ওই চাকরিটায় না থাকলে, আমি হয়তো দ্রুত বাস্তব পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে, নিজের ভেতরে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলতাম।"

"আমার বাবাও অল্পবয়েসে গলফ কোর্সে আংশিক সময়ের ক্যাডির কাজ করাকালীন বজ্রস্পৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর সংকটাপন্ন অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। সঙ্গের লোকটি মারা গিয়েছিল।"

"গলফ কোর্সে বজ্রাহত হয়ে বেশ অনেক লোকই মারা গিয়েছে। বিস্তৃত সমতলভূমি, আশ্রয় নেওয়ার মত জায়গাও খুব একটা থাকে না যেহেতু, বজ্রের খুব প্রিয় জায়গা হচ্ছে গলফ-ক্লাব। তোমার বাবার নাম তো তামুরা-সানই হবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাই। বয়েস সাএকি-সানের মতই হবে বলে মনে হয়।"

উনি মাথা নাড়েন। "তামুরা-সান বলে কারুকে মনে পড়ছে না। আমি যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তামুরা-সান বলে কেউ ছিলেন না।"

আমি চুপ করে থাকি।

"ওটাও তোমার অনুমানের মধ্যেই ছিল তো? অর্থাৎ, বজ্রপাত নিয়ে বই লেখার সময় আমার আর তোমার বাবার মধ্যে পরিচয় হয়, আর ফলেই তোমার জন্ম বলে।"

"হ্যাঁ, তাই।"

"ব্যস, এখানেই চুকে গেল তাহলে। এরকম কিছু তো ঘটেনি। তাহলে দাঁড়াল যে তোমার অনুমানটা খাটছে না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“সেরকমও ঠিক নয়”, আমি বলি।

“সেরকমও ঠিক নয়?”

“আমি আপনার কথা সবটা বিশ্বাস করছি না যেহেতু—”

“কেন?”

“ধরুন—আমি নামটা তামুরা বলতেই, তক্ষুণি আপনি বললেন যে ওই নামে কেউ ছিল না। তেমন ভাবতেও হল না। কুড়ি বছরেরও বেশি আগে সাএকি-সান অজস্র লোকের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে তামুরা নামে কেউ ছিল কি ছিল না পর্যন্ত, অত চট করে মনে করা যায় না।”

সাএকি-সান মাথা নাড়লেন। তারপর কফিতে আবার একবার চুমুক দিলেন। একটা ফ্যাকাসে হাসি ওঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। “আরে, তামুরা, আমি তো—”, বলতে শুরু করেই মুখ বন্ধ করে ফেললেন। কথা হাতড়াচ্ছেন উনি।

উনি কথা খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম আমি।

“আমার চারপাশে কী যেন পাল্টাতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে”, সাএকি-সান বললেন।

“কী সেগুলো?”

“ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু বুঝতে পারছি আমি। বায়ুর চাপ, শব্দের ঝংকার, আলোর প্রতিফলন, শরীরের সঞ্চালন, সময়ের চলমানতা একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনের একেকটা ছোট ফোঁটা একটু একটু করে জড়ো হয়ে, একটা প্রবাহ তৈরি করে ফেলছে যেন—”

মঁ ব্লাঁ-র কালো ফাউন্টেন পেনটা হাতে নিয়ে, সেটার দিকে চেয়ে থেকে, আবার আগের জায়গায় রেখে দিলেন সাএকি-সান। তারপর সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কাল রাতে তোমার ঘরে, আমাদের মধ্যে যা ঘটলো, সম্ভবত সেটাও এরকম সঞ্চালনার একটা বলে মনে হয়। কাল রাতে আমরা যা করলাম, তা সঠিক ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু সেই সময়, আমি আর অহেতুক বিচার না করতেই চেয়েছিলাম সর্বান্তঃকরণে। তাতে কোনও প্রবাহ থেকে থাকলে, সেই প্রবাহকে পথনির্দেশ করে করে প্রবহমানতা বজায় রাখতে চেয়েছিলাম।"

"সাএকি-সানকে নিয়ে আমি যা ভাবছি সেটা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই, বলতেই পার।"

"সাএকি-সান যেটা করতে চাইছেন, সেটা সম্ভবত হল, যে সময়টুকু খুইয়ে ফেলেছেন সেটুকু পুষিয়ে নিতে।"

কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভাবতে থাকেন উনি। মুখে বললেন, "তা হবে হয়তো। কিন্তু তুমি সেটা বুঝলে কী করে?"

"যেহেতু আমিও সেই একই জিনিস করতে চাইছি—"

"খুইয়ে ফেলা সময় পুষিয়ে নিতে?"

"হ্যাঁ", আমি বলি। "আমার শৈশব থেকে অনেক অনেক জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অনেক দামি দামি জিনিস। আমাকে এর মধ্যে, তার যতটুকু পারি ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"বেঁচে থাকার জন্য?"

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "সেটা করাটা জরুরি। ফেরার মত একটা জায়গা মানুষের খুব প্রয়োজন। এখন করলে, আমি সেটা সময়মত করতে পারব। আমার পক্ষেও, সাএকি-সানের পক্ষেও।"

উনি চোখ বুজে, ডেস্কের ওপর ডানহাত আর বাঁহাতের আঙুলগুলো জড়ো করলেন। তারপর যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এভাবে চোখ আবার খুললেন। "তুমি কে?", সাএকি-সান জানতে চাইলেন। "এত কিছু এত ভালভাবে জানলে কী করে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি যে কে তা সাএকি-সানেরও জানা থাকারই কথা, তুমি বললে। "আমি 'সমুদ্রতটে কাফকা'। আপনার প্রেমিক, আপনার সন্তান। কারাসু নামের একটা ছেলে। আর আমরা দু'জন স্বাধীন হতে পারব না। আমি একটা বিশাল ঘূর্ণির মধ্যে রয়েছি। কখনো কখনো সময়ের বাইরে চলে যাই। আমরা কোথাও একটা বজ্রস্পৃষ্ট হয়েছিলাম। শব্দহীন বজ্রপাত, যা চক্ষুগোচর হয় না।"

সেই রাতে তোমরা আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হলে। ওঁর ভেতরের শূন্যতা ভরাট হওয়ার শব্দ তোমার কানে এল। সমুদ্রতীরে সূক্ষ্ম বালুর কণা চাঁদের আলোয় ভেঙে ভেঙে যাওয়ার মতো খুব শান্ত আওয়াজ। তুমি রুদ্ধশ্বাসে সেই শব্দে কান পেতে রইলে। তুমি, এই তোমার অনুমানের ভেতরে, এই অনুমানের বাইরে। আবার ভেতরে। আবার বাইরে। নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে, থেমে, ছেড়ে দিলে। নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে, থেমে, ছেড়ে দিলে। প্রিন্স তোমার মাথার ভেতরে শঙ্খের মত অবিরাম গান গেয়েই যাচ্ছে। চাঁদ উঠল, জোয়ার এল কূল ছাপিয়ে। সাগরের জল নদীখাতে বয়ে গেল। জানালার কাছে ফুলভরা গাছের ডাল থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

তুমি ওঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলে। উনি তোমার মুখটা বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। ওঁর শ্বাসপ্রশ্বাস তুমি ওঁর অনাবৃত বুকে মুখ রেখে টের পেলে। একটা একটা করে তোমার পেশিগুলো উনি অনুধাবন করলেন। তারপর উনি তোমার লাল হয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গটাকে নিরাময় করিয়ে দেওয়ার মত করে সযত্নে চেটে দিতে থাকলেন। তুমি ওঁর মুখের ভেতরে আরেকবার বীর্যপাত করলে। খুব কাঙ্ক্ষিত জিনিসের মত করে উনি সেটা পান করে নিলেন। তুমি ওঁর যোনিতে চুম্বন করলে। জিভের ডগা দিয়ে স্পর্শ করলে ওঁর শরীরের সর্বত্র। ওখানে তখন তুমি অন্য কেউ, অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছিলে। তুমি তখন অন্য কোথাও।

"তোমাকে জানতে হবে, এমন কিছুই আর আমার ভেতরে নেই", উনি বললেন। সোমবার সকাল হওয়ার আগে পর্যন্ত, তোমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, সময় বয়ে যাওয়ার শব্দে কান পেতে রইলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৪

বিশাল এক বজ্রগর্ভ মেঘ অলস গতিতে শহরের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে, ঠিক যেন লুপ্ত নৈতিকতার আনাচে কানাচে সর্বত্র ইন্সপেকটারের মত, যত পারে উপর্যুপরি বজ্রপাত ঘটিয়ে যাচ্ছিল, তবে সেসব অল্পক্ষণের মধ্যেই পূবের আকাশ থেকে এসে পৌঁছনো রুষ্ট অনুরণনের মৃদু রেশমাত্রতে পর্যবসিত হয়ে, ক্ষীণতা প্রাপ্ত হল। তার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিও হঠাৎ করেই ধরে গেল। আর এরপর নেমে এল এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য। তরুণ হোশিনো মেঝে থেকে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে, বাইরের বাতাস ঢুকে আসতে দিল। সেই কালো মেঘ উধাও, আকাশ আগের মত ফ্যাকাসে রঙের মেঘের পাতলা আস্তরণে আচ্ছাদিত। দৃষ্টিগোচর যাবতীয় বাড়িঘর বৃষ্টিতে ভিজে, দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় সৃষ্টি হওয়া ফাটলগুলো বৃদ্ধ মানুষদের কালচে শিরার মত দেখাচ্ছে। বিদ্যুতের তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে নতুন করে জল জমেছে খানিকটা করে। বজ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে কোথাও আশ্রয় নেওয়া পাখিরা বেরিয়ে এসে, বৃষ্টির পরে বেরিয়ে পড়া কীট-পতঙ্গ খুঁজতে খুঁজতে ডাকতে শুরু করেছে।

তরুণ হোশিনো কয়েকবার ঘাড় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে, শিরদাঁড়ার পরিস্থিতি যাচাই করে নিল। তারপর বড় করে একবার গলাটা টানটান করে নিল। জানালার ধারটায় বসে বাইরের বৃষ্টিস্নান করে ওঠা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে, পকেট থেকে মার্লবরো বের করে লাইটার দিয়ে ধরাল।

"কিন্তু, নাকাতা-সান। অত হ্যাপা পুহিয়ে ভারি পাথরটা উলটে দিয়ে, (প্রবেশপথটা) খুলেও তো শেষ অবধি বিশেষ কিছু ঘটল না। ব্যাঙ ট্যাঙ, জিনভূত-টুত, আশ্চর্য জিনিস কিছুই দেখা গেল না। ওগুলো ছাপিয়ে তো আর কিছু হয় না, কেবল একগাদা বাজ পড়ে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বহ্বারম্ভ করে, তেমন কোনও ফলই হল না বলে মনে হচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনও জবাব এল না। ঘুরে তাকিয়ে দেখল, নাকাতা বাবু হয়ে বসা অবস্থায় ঝুঁকে পড়ে, দুই হাত মেঝেয় স্থাপন করে, চোখ বন্ধ করে আছে। নির্জীব হয়ে পড়া পোকার মত দেখাচ্ছে ওকে।

"কী হল? সব ঠিক আছে তো?", তরুণ জানতে চায়।

"মাফ করবেন, নাকাতা একটু যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মনমেজাজ খুব একটা ভাল নেই। পারলে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে চাইছে।"

সত্যিই, নাকাতার মুখটা একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। বসে যাওয়া চোখের দৃষ্টি আনত, হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। দেখাচ্ছে যেন, এই ক'ঘন্টায় বয়েস অনেকটা বেড়ে গেছে।

"বুঝতেই পারছি। আমি এক্ষুণি তোষক পেতে দিচ্ছি, আপনি শুয়ে পড়ুন। যত পারেন ঘুমিয়ে নিন", হোশিনো বলে, "কিন্তু, সব ঠিক আছে তো? পেট ব্যথা করছে না তো, বমি পাচ্ছে কি, কান ভন্‌ভন্‌ করছে, পায়খানা পাচ্ছে না তো? ডাক্তার ডাকতে হবে? স্বাস্থ্য-বিমার কার্ড সঙ্গে আছে?"

"হ্যাঁ, গভর্নর করিয়ে দিয়েছিলেন, ব্যাগের ভেতরে যত্ন করে রাখা আছে।"

"তাহলে অসুবিধে নেই। কিন্তু, নাকাতা-সান, এরকম একটা সময়ে কথাটা ছোটখাটো ব্যাপার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্য-বিমার কার্ড আপনাকে গভর্নর দেননি। ওটা জাতীয় স্বাস্থ্য-বিমা, তাই জাপানের সরকার দিয়েছে। ভালো বলতে পারব না, তবে মনে হয় সেরকমই। যা কিছু সবই গভর্নর সামলান না। গভর্নরের কথা কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলতে চেষ্টা করুন তো", আলমারি থেকে তোষক বের করে, সেটা মেঝেতে পেতে দিতে দিতে সেই তরুণ বলল।

"হ্যা, বুঝেছি। বিমা কার্ড গভর্নর দেননি। কিছুক্ষণের জন্য গভর্নরের কথা ভুলে থাকব। তবে হোশিনো-সান, যাই করি না কেন, নাকাতার এখন ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। শুয়ে ভাল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘুমোলেই সম্ভবত ভাল হয়ে যাব।"

"আরে, নাকাতা-সান, আবারও সেই আগেরবারের মত লম্বা ঘুম দেবেন নাকি? অতক্ষণ!"

"অপরাধ নেবেন না, সে ব্যাপারে নাকাতা কিছুই জানে না। ঘুমোব বলে নিজেই আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে, সেই অনুযায়ী ঘুমোনোর ব্যাপার এটা নয়।"

"তাই-ই হবে নিশ্চয়ই", তরুণ বলে। "প্রোগ্রাম করে এরকম ঘুমোতে পারা যায় না। সে ঠিক আছে, যত খুশি ঘুমোন। যা ভয়ানক দিন গেল একটা। প্রচুর বাজ পড়ল, পাথরের সঙ্গেও কথা বলা হল। কী একটা প্রবেশপথও খুলে গেল। এমন রোজ রোজ ঘটে না। মাথাও খাটাতে হয়েছে, ক্লান্ত তো লাগবেই। কারুর তোয়াক্কা না করে, নিঃসংকোচে ঘুমোতে পারেন। বাকিটা হোশিনো নিজেই কোনওভাবে সামলাবে। নিশ্চিন্তে ঘুমোন।"

"অনেক ধন্যবাদ। হোশিনো-সানকে অনেক ঝামেলায় ফেললাম। নাকাতা যতই ধন্যবাদ দিক, যথেষ্ট নয়। হোশিনো-সান না থাকলে, নাকাতা নির্ঘাত মহা ফাঁপড়ে পড়ত। হোশিনো-সানের খুব জরুরি কাজও আছে বলেই জানি।"

"তা বটে", একটু নিষ্প্রভ গলায় হোশিনো বলে। পরের পর এত নানারকম কিছু ঘটল যে, কাজের কথা বিলকুল ভুলে গেছিল হোশিনো।

"সে কথা, একদিক থেকে ঠিকই। আমারও ক্রমে কাজে ফিরে না গেলেই নয়। কোম্পানির বড়কর্তা চটে আছেন নির্ঘাত। কাজ আছে বলে ফোনে দু তিনদিনের ছুটি চেয়ে নিয়ে, সেই থেকে আর—ফেরার পর কপালে প্রচুর তিরস্কার আছে।"

নতুন একটা মার্লবরো ধরায় ও। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। তারপর টেলিগ্রাফ পোস্টের একেবারে ওপরে বসে থাকা একটা কাককে মুখ ভেংচে দেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে হোকগে। বড়কর্তা যা খুশি বলুক, মাথা থেকে ধোঁয়া বা'র হওয়ার মত রেগে যাক, আমার তো জানার কথা নয়। এই ক'বছর আমি এমনকি অন্যের কাজ অবধি নিজের ঘাড়ে নিয়ে, আলি-সানের মত মন দিয়ে কাজ করে এসেছি। হোশিনো, ভাইটি, কারুকে পাচ্ছিনা, আজ রাতে এই অবস্থাতেই হিরোশিমা অবধি একটু যাবে? ঠিক আছে স্যার, আমি সামলে নিচ্ছি—এরকমই সব। কোনওরকম গাঁইগুঁই না করে, একটি কথা না বলে, করে দিয়েছি। এর ফলে, দেখলেনই তো, কোমরটার পর্যন্ত বারোটা বাজিয়েছিলাম। নাকাতা-সান এখন সারিয়ে দিলেন বলে, তা না হলে খুব মুশকিলে পড়ে যেতাম হয়তো। এখনও তো কুড়ির কোঠাও পেরোইনি, এমন কিছু ভাল চাকরিও নয়, এইসব করে শরীরপাত করার মত নিরুপায় তো নই। কখনো সখনো একটু ছুটি নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু, নাকাতা-সান—"

সবে বলতে শুরু করেছে, নজরে পড়ল, নাকাতা এরই মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নাকাতার চোখ আঁট করে বন্ধ, মুখ সোজা ছাদের দিকে, ঠোঁট আনুভূমিক ভাবে জোড়া, মেজাজে নাক ডেকে যাচ্ছে। মাথার কাছে ওলটানো পাথরটা ওই অবস্থায়ই গড়াগড়ি যাচ্ছে।

"একেবারে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে লোকটা", তারিফের সুরে সেই তরুণ বলে।

কীভাবে সময় কাটাবে ঠিক করতে না পেরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুয়ে পড়ে ঘরের টিভিটা দেখতে থাকল, কিন্তু বিকেলের টেলিভিশন প্রোগ্রামগুলো সবই অসহ্যরকম বোরিং। অগত্যা একটু বাইরে বেরিয়ে ঘুরে আসবে বলে ঠিক করল। পাল্টানোর মত অন্তর্বাস পর্যন্ত না নিয়ে চলে এসেছে, একসময় কোথাও কিনে নিতে হবে। কাচাকাচি জিনিসটা তরুণ হোশিনোর একেবারেই আসে না। একটা একটা করে প্যান্ট কাচতে হলে, সে বরং সস্তা দেখে নতুনই কিনে নেবে। ডর্মিটরির ফ্রন্ট-ডেস্কে গিয়ে পরের দিনের রুমচার্জ নগদে মিটিয়ে দিয়ে, সঙ্গী ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে বলে, তাকে না জাগিয়ে ওভাবেই থাকতে দিতে অনুরোধ করল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"অবশ্য, জাগাতে গেলেই যে জাগবে, তা মনে হয় না যদিও", বলে বলল।

বৃষ্টির পরের গন্ধটা নিতে নিতে হোশিনো কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরের এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করল। অন্যান্য সময়ের মতই তার পরনে চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপি, রে-ব্যানের সবুজ সানগ্লাস আর আলোহা শার্ট। স্টেশনে পৌঁছে দোকান থেকে খবরের কাগজ কিনল। চু-নিচি ড্র্যাগনস জিতেছে কিনা সেটা খেলার পাতায় চেক করে নিয়ে (হিরোশিমা স্টেডিয়ামে হেরেছিল), তারপর সিনেমার বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ বোলাল। জ্যাকি চ্যান নায়ক, এরকম একটা নতুন ফিল্ম চলছিল বলে, ঠিক করল সেটা দেখবে। সময়টাও ঠিকঠাক। পুলিশ পোস্টিং থেকে হলটা কোথায় জানতে গিয়ে, দেখা গেল যে স্টেশনের কাছেই, তাই হেঁটেই চলে গেল। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে, বাটার-পীনাট খেতে খেতে সিনেমাটা দেখল।

সিনেমা দেখে যখন বেরুল, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খিদে তেমন না পেলেও, অন্য কিছু করার না পেয়ে, খাওয়া দাওয়া করে নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। সুশির দোকান চোখে পড়তে, সেটায় ঢুকে নিগিরিজুশি[†] একপ্লেট আর বীয়ার চাইল। যা ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি ক্লান্তি এসে ভর করেছে যেন, বীয়ার অর্দ্ধেকটামাত্র খেয়ে উঠতে পারল।

"এ তো হবারই ছিল। ওরকম ভারি পাথরটা ওঠাতে হল। ক্লান্ত হয়ে গেছি না", সেই তরুণ ভাবল। "তিনটে বাচ্চা শুয়োরের মধ্যে সবচেয়ে বড়টার তৈরি নড়বড়ে বাড়িটার মত লাগছে মনমেজাজ। দুষ্টু নেকড়েটার এক ফুঁয়ে ওকায়ামার কাছাকাছি উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

সুশির দোকান থেকে বেরিয়ে, নজরে আসা একটা পাচিংকোতে[††] ঢুকে পড়লো। সেখানে মুহূর্তে ২০০ ইয়েন খরচ করে ফেলল।

[†]হাতে দলা করা সুশি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

[††]পাচিংকো, একধরণের যন্ত্র সহযোগে জুয়া খেলার আড্ডা, রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র

~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই মন লাগছে না। শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে পাচিংকো থেকেও বেরিয়ে এল। আবার খানিক শহরের পথে পথে হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হল যে অন্তর্বাস এখনও কেনা হয়নি। এসব কী হচ্ছে, ছিঃ, বেরোনোর আসল কারণই তো ছিল সেটা। দোকানপাট আছে যে মহল্লায়, সেখানে গিয়ে ডিসকাউন্ট শপে ঢুকে, প্যান্ট, টি-শার্ট, মোজা, এইসব কিনল। এতে করে শেষ পর্যন্ত নোংরা হয়ে যাওয়া জিনিসগুলো ফেলে দেওয়া যাবে। আলোহা শার্টটাও ক্রমে পালটে ফেলার সময় এসে গেছে, কিন্তু পরপর কয়েকটা দোকানে দেখে টেখে, একসময় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে তাকামাৎসু শহরে হয়তো পছন্দমত নতুন শার্ট খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শীত গ্রীষ্ম আলোহা শার্টই শুধু পরে, কিন্তু যেকোনো আলোহা শার্টই যে ভাল, এমন নয়।

অগত্যা সেই দোকানপাটের মধ্যে একটা পাঁউরুটির দোকানে ঢুকে, মাঝরাতে চোখ খুলে নাকাতার খিদে পেলে খাবে বলে কিছু পাঁউরুটি কিনল। ছোট্ট একটা অরেঞ্জ জুসের প্যাকও কিনল। তারপর ব্যাংকে ঢুকে টেলারিং মেশিন থেকে ৫০,০০০ ইয়েন বের করে মানিব্যাগে রেখে দিল। কত টাকা রয়েছে দেখে নিয়ে, এখনও ডিপোজিটে যথেষ্ট টাকা যে আছে সেটা নিশ্চিত হয়ে নিল। এখানে ক'বছর এত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে মাইনের টাকা যথেষ্ট খরচ করারও অবকাশ পাওয়া যায়নি।

চারপাশ ভালরকম অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই ওর কফি খাওয়ার ইচ্ছে হল। খাবে ভেবে আশপাশ একটু ঘুরে দেখতেই, চোখে পড়ল, দোকানপাটের মহল্লা থেকে একটু তফাতে একটা জায়গায় একটা কিস্‌সাতেন[1]-এর সাইনবোর্ড। আজকাল আর খুব একটা দেখা যায় না, এমনই ধরণের বেশ সাবেক ধাঁচের কিস্‌সাতেন। ভেতরে ঢুকে ও একটা বেশ আরামদায়ক নরম চেয়ারে বসে, কফির অর্ডার দিল। বেশ পোক্ত আখরোট কাঠের বাক্সের মধ্যে একটা বিলিতি স্পীকার, আর তার থেকে ভেসে আসছে চেম্বার মিউজিক। ও ছাড়া আর কোনও খদ্দের তখন নেই। সেই চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে দিয়ে, দীর্ঘসময় পরে সেই তরুণ মনে একটু স্বস্তি পেল। এখানে যাবতীয় কিছুই খুব শান্ত, স্বাভাবিক, শরীরের জন্যও বেশ আরামপ্রদ, সৌহার্দ্যময়। কফিটা

[1]কিস্‌সাতেন কথার অর্থ যদিও চা খাওয়া যায় এমন দোকান, সেখানে চা, কফি উভয়ই পাওয়া যায়

এল বেশ ভাল কোয়ালিটির কাপে, জোরদার, স্বাদু কফি। ও চোখ বুজে, স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে নিতে, তারযন্ত্র আর পিয়ানোর ঐতিহাসিক যুগলবন্দীতে কান পাতল। ক্লাসিকাল মিউজিক শোনার খুব একটা আদত ছিল না, কেন যেন এই মিউজিকটা মনটাকে শান্ত করে দিল। অন্তর্মুখী করে তুললও বলা যায় হয়তো।

তরুণ সেই নরম চেয়ারটায়, চোখ বুজে সংগীত শুনতে শুনতে, অনেক কিছু নিয়ে ভাবল। প্রধানত 'আমি' বলে কারুর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবল। কিন্তু যতই ভাবে, ততই মনে হতে থাকে যে জিনিসটায় তেমন অন্তঃসার বলে যেন কিছু নেই। কেবল অর্থহীন কিছু অনুষঙ্গ ছাড়া আর ওতে কিছু নেই বলে মনে হতে থাকে।

যেমন ধরা যাক, আমি এতদিন পর্যন্ত চু-নিচি ড্র্যাগনসকে মহা উৎসাহে সমর্থন করে এসেছি। কিন্তু আমার কাছে চু-নিচি ড্র্যাগনস জিনিসটা আদপে কী? চু-নিচি ড্র্যাগনস ইয়োমি-উরি জায়ান্টসকে হারালে, আমি বলে লোকটার কি একটুও উন্নতি হয়? এমন তো নয় যে হয়, বলে সেই তরুণ ভাবল। তাহলে কেন ওরকম কিছুকে, ঠিক যেন আমার নিজেরই একটা অংশ মনে করে আজ অবধি প্রাণপণ সমর্থন করে গেছি কে জানে।

নাকাতা-সান নিজেকে ফাঁপা বলে বলেন। হতেও পারে। কিন্তু আমিই বা আদপে কী? নাকাতা-সান বলছেন যে ছোটবেলায় দুর্ঘটনার ফলে উনি ফাঁপা হয়ে গেছেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তো দুর্ঘটনাও ঘটেনি। নাকাতা-সান ফাঁপা হলে, যেভাবেই ভাবি না কেন, আমি কি ফাঁপার চেয়েও নিরেস নই? নাকাতা-সানের তো নিদেনপক্ষে—নিদেনপক্ষে, একেবারে শিকোকু অবধি চলে যাওয়ার কথা আমাকে ভাবানোর মত কিছু একটা আছে। কিছু একটা আলাদা জিনিস। কিন্তু জিনিসটা যে কী, সত্যি বলতে, আমারও ভাল জানা নেই।

তরুণ আরেক কাপ কফির অর্ডার দিল।

"এখানকার কফিটা ভাল লেগেছে", শুভ্রকেশ মালিক এসে জানতে চাইলেন। (অবশ্যই হোশিনোর এটা জানা ছিল না যে উনি আসলে শিক্ষাদপ্তরের অফিসার ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর নিজের শহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকামাৎসুতে ফিরে এসে, ক্লাসিকাল মিউজিক চালিয়ে স্বাদু কফি পরিবেশন করা হয় এরকম একটা কিস্‌সাতেন খুলেছেন)।

"হ্যাঁ, খুবই সুন্দর স্বাদ। গন্ধও সত্যিই সুন্দর।"

"বীনস্‌গুলো আমি নিজে জলে ফোটাই। একটা একটা করে দানা বেছে বেছে।"

"সেইজন্যেই এত স্বাদু!"

"মিউজিকটা কানে লাগছে না তো?"

"মিউজিক", হোশিনো বলে, "আরে, খুবই সুন্দর মিউজিক। একেবারেই খারাপ লাগছে না। কে বাজাচ্ছে?"

"রুবিনস্টাইন-হাইফেৎজ-ফয়্যারম্যানের ট্রায়ো। সেই সময়ে ওদের মিলিয়ন ডলার ট্রায়ো বলা হত। সত্যিই মাস্টারলি পারফরম্যান্স। ১৯৪১ সালের পুরনো রেকর্ডিং, আওয়াজ এতটুকু অস্পষ্ট হয়নি!"

"শুনেই বোঝা যাচ্ছে। ভাল জিনিস কখনো পুরনো হয় না।"

"আরেকটু স্ট্রাকচারড, ঐতিহ্যানুসারী, নীতিনিষ্ঠ 'তাইকোও[1]ট্রায়ো' পছন্দ করেন এরকমও কেউ কেউ আছেন। যেমন ওইস্ট্রাখ ট্রায়ো।"

"না, আমার এটাই ভাল লাগছে" সেই তরুণ বলে, "কেমন একটা—প্রশান্ত অনুভূতি হয়"

"অনেক ধন্যবাদ", দোকানের মালিক 'মিলিয়ন ডলার ট্রায়ো'-র তরফে বিনম্র ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাল। মালিক সরে যেতেই তরুণ হোশিনো দ্বিতীয় কাপ কফিটার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে পূর্ববর্তী চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিল।

তবে কিনা, আমি এখনকার মত নাকাতা-সানের কাজে লাগছি। ওঁর হয়ে পড়ে দিচ্ছি, এমনকি ওই পাথরটাও আমিই খুঁজে পেলাম। কাজে যে লাগছি এতেই মনটা বেশ ভাল হয়ে যায়। এরকম একটা

[1]তাইকোও ট্রায়ো পশ্চিমে আর্চডিউক ট্রায়ো বলেই পরিচিত।

~ www.amarboi.com ~

অনুভূতি প্রায় জন্মে থেকে এবারই প্রথম। চাকরির কাজে ঢিলে দিয়ে, এরকম একটা জায়গা অবধি এসে পড়ে, একের পর এক অদ্ভুত সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি ঠিকই, আমার এতে বিশেষ কোনও অনুশোচনা নেই। কী বলব, আমি যেন ঠিক জায়গায়ই রয়েছি, এরকম একটা অনুভূতি কাজ করছে। *আমি আদপে কী,* এই প্রশ্নটা নাকাতা-সানের পাশে থাকলে, যেমনই হোক না কেন, ঠিকই আছে বলে মনে হয়ে এসেছে। তুলনা করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে হয়তো—মনে হয় বুদ্ধ কিংবা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব নেওয়া কর্মীদেরও হয়তো এরকমই মনে হত। বুদ্ধের সঙ্গে থাকলে, আমি এমনিই ভাল থাকি, না কী যেন। অনুশাসন কিংবা বাণী, এইসব কঠিন কঠিন জিনিসের আগেই ওরকম অনুভূতি হত সম্ভবত।

ছোট বেলায় দাদু বুদ্ধের শিষ্যদের গল্প শোনাতেন। একজন ছিল মিয়োগা নামে। হাবাগোবা, বুদ্ধি কম, সহজ সূত্রের একটি পংক্তিও ঠিকমত মনে করে বলতে পারত না। তাই অন্যান্য শিষ্যদের হাসির খোরাক হত। একদিন বুদ্ধ ওঁকে বললেন—"মিয়োগা, তোমার মাথাটা তো ভাল কাজ করে না, সূত্রগুলো আর মনে রাখতে না পারলেও চলবে। তার পরিবর্তে ঢোকার মুখে মাটিতে বসে সকলের জুতো পরিষ্কার করো তো"। মিয়োগা ছিল সরল, ভালমানুষ, তাই "ইয়ার্কি হচ্ছে, ভাগুন তো" এসব সে বলেনি। তারপর থেকে দশ বছর...কুড়ি বছর ধরে যথা আজ্ঞা সকলের জুতো মন দিয়ে পরিস্কার করে গেছে। তারপর একদিন হঠাৎ করেই তার দিব্যদৃষ্টি উন্মীলিত[1] হয়ে, বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যেও সবচেয়ে অগ্রগামীদের একজন হয়ে গেল—এরকম গল্পের কথা তরুণ হোশিনোর মনে পড়ে গেল। গল্পটা তরুণের মনে ছিল, কারণ ওর মনে হত যে দশ বছর, কুড়ি বছর ধরে লোকের জুতো পরিস্কার করে যাওয়ার জীবন তো সর্বতোভাবেই বিষ্ঠাবৎ। এ কী ইয়ার্কি নাকি। কিন্তু এখন, ফের ভেবে দেখতেই, গল্পটা ওর মনের মধ্যে অন্যরকম একটা অনুরণন তুলল। "জীবনমাত্রেই, যেভাবেই ভোগান্তি আসুক না কেন, বিষ্ঠাবৎ", তরুণের মনে হল। ছোটবেলায় সেটাই কেবল জানা ছিল না।

আমার বই

[1]জাপানিতে একে বলে সাতোরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আর্চডিউক ট্রায়ো' শোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কেবল এইসবই ভেবে গেল। এই সংগীত তার চিন্তাধারাকে মুক্ত করে দিয়েছে।

"এই যে, কাকু", দোকান থেকে বেরোনোর সময় মালিককে উদ্দেশ্য করে বলল, "এটা যেন কী মিউজিক? বলেছিলেন বটে, কিন্তু ভুলে গেছি—"

"বিঠোফেনের 'তাইকোও ট্রায়ো' এটা।"

"তাইকো(ড্রাম) ট্রায়ো?"

"না, তাইকো ট্রায়ো নয়, তাইকোও ট্রায়ো। এই কম্পোজিশনটা বিঠোফেন দ্বারা অস্ট্রিয়ার রুডলফ্ তাইকোও (আর্চডিউক)-কে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এটা তাই প্রথাগতভাবে দেওয়া নাম নয়, সাধারণ ভাবে এই নামে অভিহিত করা হয়। রুডলফ্ আর্চডিউক ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের পুত্র, রাজপুরুষ একজন। সংগীতে অনুরাগ নিয়ে জন্মেছিলেন, ষোল বছর বয়েস থেকেই বিঠোফেনের শিষ্যত্ব নিয়ে, পিয়ানো এবং সংগীতশাস্ত্রে শিক্ষা নিয়েছিলেন। বিঠোফেনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রুডলফ্ আর্চডিউক পিয়ানিস্ট কিংবা কম্পোজার হিসেবে খুব বড়ো কীর্তি কিছু রেখে যেতে পারেননি, জীবনধারণের পার্থিব দিকটায় একেবারেই আনাড়ি বিঠোফেনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সুদিনে দুর্দিনে সংগীতকারের সহায়তা করেছিলেন। উনি না থাকলে সম্ভবত বিঠোফেনের জীবনে চলার রাস্তা অনেক কঠিন হয়ে পড়ত।"

"জগতে এরকম লোকেরও প্রয়োজন আছে।"

"ঠিকই বলেছেন।"

"সকলেই বিখ্যাত লোক, মহা প্রতিভাধর হয়ে পড়লে, জগতটা খুব মুশকিলের জিনিস হয়ে যাবে। কাউকে একটা চারপাশে নজর রেখে বাস্তব ব্যাপারগুলো সামলাতে হবে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"এক্কেবারে যা বলেছেন। প্রত্যেকে বিখ্যাত কিংবা প্রতিভাধর হলে জগতে মহা মুশকিল হবে।"

"বেশ ভাল একটা কম্পোজিশন ছিল, না?"

"দারুণ কম্পোজিশন। যতই শুনি ক্লান্তি আসে না। বিঠোফেনের লেখা পিয়ানো ট্রায়োর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং পরিশীলিত কাজ এটাই। বিঠোফেন চল্লিশ বছর বয়সে এই কম্পোজিশনটা রচনা করেন—এটাতেই শেষ, আর দ্বিতীয়বার হাত দেননি। হয়তো এই কম্পোজিশনটার মাধ্যমেই এই মিউজিকাল ফর্মটার একেবারে শীর্ষবিন্দুতে নিজেকে তুলেছিলেন বলে ওনার মনে হয়েছিল।"

"মনে হচ্ছে যেন বুঝতে পারছি। যেকোনো কিছুতেই শীর্ষবিন্দুটা খুব জরুরি", তরুণ হোশিনো বলে।

"আবার আসবেন অনুগ্রহ করে।"

"হ্যাঁ, আসব তো!"

ঘরে ফিরে দেখে, যা ভেবেছিল তাই, নাকাতা তখনও ঘুমিয়েই যাচ্ছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘটলো বলে তরুণের কাছে আর আশ্চর্য কিছু বলে বোধ হল না। যত ইচ্ছে ঘুমোতে দিলেই হয়। বালিশের কাছে পাথরটা একইভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তরুণ পাথরটার পাশে পাঁউরুটির প্যাকেটটা রাখল। তারপর স্নানের চৌবাচ্চায় নেমে, কিছুক্ষণ কাটিয়ে, উঠে নতুন অন্তর্বাস পরে নিল। এতদিন পরা অন্তর্বাসটা কাগজের প্যাকেটের মধ্যে ঠেসে ময়লার ড্রামে ফেলে দিল। বিছানায় গিয়ে, ঐ অবস্থায়তেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল ৯টার আগেই তরুণ চোখ খুলল। নাকাতা তখনও পাশের বিছানায় একই ভাবে ঘুমোচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক, নিয়মিত। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হোশিনো একাই ব্রেকফাস্ট সেরে, ডর্মিটরির পরিচারিকাকে অনুরোধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করল সঙ্গীকে না জাগাতে, সে এখনও ঘুমোচ্ছে।

বলল, “বিছানা না তুললেও হবে, বুঝলেন”।

“এতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে—সব ঠিক আছে তো?”, পরিচারিকা বলে।

“কোনও চিন্তা নেই, কোনও চিন্তা নেই, মরবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন। ঘুমিয়ে শরীরে শক্তি ফিরিয়ে আনছে। ওঁর ব্যাপার-স্যাপার আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা আছে।”

স্টেশনে খবরের কাগজ কিনে, বেঞ্চে বসে সিনেমার বিজ্ঞাপনের পাতাটা খুঁজে দেখল। স্টেশনের কাছেই একটা হলে ফ্রঁসোয়া ক্রুফোর রেট্রোস্পেকটিভ হচ্ছে। ফ্রঁসোয়া ক্রুফো যে কে, একেবারেই জানা নেই (ছেলে না মেয়ে সেটাই ঠিকমত বুঝতে পারছে না) বটে, দু'টো দেখানো হচ্ছে, সন্ধে অবধি সময়টা কাটানো যাবে, তাই ও ঠিক করলো দেখতে যাবে। দেখানো হচ্ছিল ‘বড়রা বোঝে না’ (ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ) আর ‘পিয়ানোবাদককে গুলি কর’ (শ্যুট দা পিয়ানিস্ট)। হাতে গোনা যায় ক'জন দর্শক। হোশিনোকে ঠিক উৎসাহী চলচ্চিত্রমোদী বলা যায় না। কখনো সখনো সিনেমা হলে যায় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র কুংফুর-সিনেমা আর অ্যাকশন-ফিল্মই দেখে। তাই ফ্রঁসোয়া ক্রুফোর প্রথম দিককার কাজের এমন অনেক অংশ বা দিক আছে যা বোঝার পক্ষে খানিকটা দুরূহই, আর পুরনো ছবি বলে টেমপোটাও যেন বড্ড মন্থর। তা সত্ত্বেও ওই স্বতন্ত্র আবহ, ছবির টোন, ইঙ্গিতবহ মনস্তাত্ত্বিক বিধৃতি, এগুলো বেশ উপভোগ করতে পারল। অন্ততপক্ষে বোর হয়ে সময় আর কাটে না, এমন কিছু হল না। দেখা হয়ে গেলে, এই পরিচালকের তৈরি অন্য সিনেমাটাও দেখা যাক বলে মনে হল।

সিনেমা হল থেকে বেরনোর পরে, দোকানপাটের মহল্লা অবধি হেঁটে গিয়ে, আগের রাতের সেই কিস্‌সাতেনটাতে গিয়ে ঢুকল। মালিক মনে রেখেছেন ওর মুখটা। তরুণ একই চেয়ারে গিয়ে বসে কফি অর্ডার করল। যথারীতি অন্য কোনও খদ্দের নেই। স্পীকার থেকে চেলো কনচের্তো ভেসে আসছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হেডেন-এর কনচের্তো, ফার্স্ট। চেলোতে পিয়ের ফুরনিয়ে", কফিটা এনে দোকানের মালিক বললেন।

"সাউন্ডটা বেশ ন্যাচারাল তো", তরুণ হোশিনো বলে।

"সত্যিই তাই", দোকানের মালিক সহমত হলেন। "পিয়ের ফুরনিয়ে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বাদকদের অন্যতম। খুব দামি ওয়াইনের মত। সুগন্ধ থাকবে, জিনিসটাও থাকবে, রক্তে উষ্ণতা জাগাবে, হৃদপিন্ড চনমনে করে তুলবে। আমি ওঁকে সব সময় 'গুরু ফুরনিয়ে' বলে অভিহিত করি। অবশ্যই ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা কখনো ছিল না, কিন্তু উনিই আমার জীবনে গুরুর আসনে রয়েছেন।

ফুরনিয়ের সাবলীল ও পরিশীলিত চেলোতে কান রেখে, তরুণ তার ছোটবেলার কথা ভাবতে শুরু করল। রোজ যে কাছেপিঠের নদীতে গিয়ে পুঁটি আর অন্যান্য মাছ ধরত—তখনই ভাল ছিল, কোনও ভাবনা ছিল না, ওর মনে হল। ওই ভাবেই বেঁচে থাকতে পারলে যথেষ্ট। যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন আমি কেউ একটা। স্বাভাবিক ভাবেই সেটা মনে হত। কিন্তু কবে থেকে যেন সেরকম আর রইল না। বেঁচে থাকতে থাকতে আমি যেন কেউ নই, কিছু নই, এরকম হয়ে গেলাম। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষের তো বাঁচার জন্যই জন্ম হয়েছে না কী! ঠিক কি না? যত বাঁচছি ততই অন্তঃসার খোয়াতে খোয়াতে, নেহাত যেন ফাঁপা মানুষ হতে থেকেছি। আর এরপরে আরো যত বাঁচব ততই বেশি করে করে ফাঁপা, মূল্যহীন মানুষ হয়ে যেতে থাকব হয়তো। এটা ঠিক হচ্ছে না। এত বিদঘুটে ব্যাপার কিছুতেই হতে দেওয়া যায়না—এই গতিটাকে কোথাও পালটানো যায় না কি?

"শুনছেন, কাকু", ক্যাশ রেজিস্টারের কাছে মালিকের উদ্দেশ্যে বলে উঠল তরুণ।

"কী হয়েছে?"

"আপনার হাতে একটু সময় থাকলে, আর যদি বিরক্ত না হন, এখানে এসে একটু কথাবার্তা বলার অবসর হবে? যে হেডেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলে একজন এই কম্পোজিশনটা সৃষ্টি করেছে, তাঁর সম্বন্ধে একটু জানতে চাইছি।"

মালিক এসে, হেডেন মানুষটা আর তাঁর সঙ্গীত নিয়ে সোৎসাহে বলে গেলেন। মালিক লোকটি, বলতে কি, একটু অন্তর্মুখী ধরণেরই, কিন্তু ক্লাসিকাল মিউজিকের কথা উঠলে মহা বাক্যবাগীশ। বলতে শুরু করলেন হেডেন সংগীতকার হিসেবে নিয়োজিত হয়ে, দীর্ঘ একজীবনে বহু শাসকের সেবা করে, ফর্মাইশ অনুসারে, নির্দেশ অনুসারে, কত যে অসংখ্য কম্পোজিশন করেছেন—তিনি যে কতখানি বাস্তববাদী, সৌহার্দ্যময়, বিনয়ী, উদার ছিলেন—আর একই সঙ্গে, কতখানি যে নিরুচ্চার অন্ধকার নিজের ভেতরে ধারণ করে রাখা জটিল মানুষ ছিলেন—"হেডেন ছিলেন, এক অর্থে, এক রহস্যময় মানুষ। কত তীব্র প্যাথোজ যে তিনি মনের গভীরে ধারণ করে রেখেছিলেন, সত্যি বলতে কি, তা কেউ বলতে পারে না। সামন্ততান্ত্রিক যুগে জন্ম নিয়ে ফেলে, নিজের ইগোকে সুকৌশলে বশ্যতার মোড়কে ঢেকে, কেবলই হাসিমুখে, সপ্রতিভভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। না করলে একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতেন হয়তো। অনেকেই বাখ কিংবা মোৎজার্টের সঙ্গে তুলনা করে ওঁকে লঘু করে দেখেন। সংগীতের দিক দিয়েও, জীবনযাত্রার দিক দিয়েও। একথা ঠিক যে তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি পরিমিত রকমের উদ্ভাবনশীল ছিলেন, কিন্তু কখনোই সে ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন না। তবে মন দিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে, আধুনিক আত্মচেতনালিপ্সু প্রচ্ছন্ন আকুলতা সেখানে লক্ষ্য করতে পারারই কথা। সেটা স্ববিরোধদুষ্ট সুদূর প্রতিধ্বনি হয়ে, হেডেনের সংগীতে মৌনভাবে হৃদস্পন্দন ঘটাচ্ছে। যেমন ধরুন, এই সুরটাই শুনুন। দেখুন, শান্ত অথচ সুকুমার কমনীয় কৌতূহলে ভরা। আর একটা অন্তর্মুখী অধ্যবসায়ী নিষ্ঠা এতে রয়েছে।"

"ফ্রঁসোয়া ত্রুফোর সিনেমার মত—"

"এক্কেবারে", এই বলে মালিক, কিছু না ভেবেই, তরুণ হোশিনোর পিঠ চাপড়ে দিলেন। "সত্যিই তাই। সেটাই ফ্রঁসোয়া ত্রুফোর সৃষ্টিরও আদত কথা। সুকুমার কমনীয় কৌতূহলে ভরা। একটা অন্তর্মুখী অধ্যবসায়ী নিষ্ঠা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হেডেনের সংগীত শেষ হলে পর, তরুণ আরেকবার রুবিনস্টাইন-হাইফেৎজ-ফয়্যারম্যান ট্রায়োর বাজানো 'আর্চডিউক ট্রায়ো' শুনলো। আর কানটা ওতে রেখে, একা একা আবারও দীর্ঘসময়ের জন্য চিন্তায় নিমগ্ন হল—"আমি অবশ্যই যদ্দূর সম্ভব নাকাতা-সানকে সঙ্গ দেব। চাকরি চুলোয় যাক", হোশিনো মনস্থির করে ফেলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৫

সকাল সাতটায় ফোনটা যখন বেজে উঠল, আমি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্বপ্নের মধ্যে আমি গুহার একদম ভেতরের দিকে, টর্চ হাতে সামনে ঝুঁকে, অন্ধকারের মধ্যে কী যেন খুঁজছি। সেই সময় গুহার প্রবেশপথের আশপাশ থেকে, কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠল, কানে এল। আমারই নাম। দূর থেকে, অস্পষ্টভাবে। সেই দিকে মুখ করে জোরালো গলায় সাড়া দিলাম। কিন্তু আমার গলার আওয়াজ যেন সেই ব্যক্তি অবধি পৌঁছচ্ছে না। অবিরাম ডেকেই চলেছে। নিরুপায় হয়ে আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, গুহার প্রবেশপথের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম—'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে পাব' ভাবতে ভাবতে। আবার একই সঙ্গে, খুঁজে যে পাওয়া যাচ্ছিল না এতে মনে মনে আশ্বস্তই হচ্ছিলাম। এইসময়ই জেগে উঠলাম। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনলাম। ফোনটা বাজছে, খেয়াল হল। লাইব্রেরির ডেস্কের ফোনটা বাজছে। জানালার পর্দার ওপাশের সকালের ঝকঝকে রোদ ঘরে ঢুকে এসেছে, পাশে সাএকি-সানকে দেখা যাচ্ছে না। বিছানায় আমি একা।

টি-শার্ট আর বক্সার-শর্টস পরা অবস্থায় বিছানা থেকে নেমে, টেলিফোন যেখানে আছে, সেই অবধি গেলাম। হেঁটে যেতে অনেকটা সময় লাগলেও, টেলিফোনও হাল না ছেড়ে বেজেই যাচ্ছিল।

"হ্যালো!"

"ঘুমোচ্ছিলে", ওশিমার গলা।

"হুঁ, ঘুমাচ্ছিলাম", আমি উত্তর দিই।

"ছুটির দিনে সকালে এত তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দিলাম বলে খারাপ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাগছে, কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে—"

"মুশকিল?"

"পরিস্থিতি পরে বিস্তারিত জানাব, কিন্তু আপাতত কিছুদিন তুমি ওখান থেকে সরে এলে ভাল হয়। আমি ওখানেই যাচ্ছি, চটপট মালপত্রগুলো গুছিয়ে নেবে? আমি পৌঁছলেই, তুমি দেরি না করে পার্কিং লটে এসে, বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে চড়ে বসবে। বুঝলে তো?"

"বুঝলাম", আমি বললাম।

ঘরে ফিরে এসে, নির্দেশমত মালপত্র গোছালাম। বিশেষ তাড়াহুড়োরও প্রয়োজন নেই। পাঁচ মিনিটেই সব গুছিয়ে ফেললাম। বাথরুমে কেচে শুকোতে দেওয়া জামাকাপড়গুলো টেনে নিয়ে, টয়লেটের সামগ্রী, বই, ডায়েরি, সব রুকস্যাকে ভরতেই বাঁধাছাঁদা শেষ। পোশাক পরে নিয়ে, এলোমেলো হয়ে থাকা বিছানাটা ঠিকঠাক করে নিলাম। কুঁচকে যাওয়া তোষক টেনে ঠিক করে, খোঁদল তৈরি হওয়া বালিশে থাপ্পড় মেরে মেরে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে, চাদরের ধারগুলো টানটান করে পেতে দিলাম। আগের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেললাম। তারপর চেয়ারে বসে সাএকি-সানের কথা ভাবলাম মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে অবধিও যাঁর এখানে থাকার কথা ছিল।

কুড়ি মিনিট বাদে সবুজ রঙের মাজদা রোডস্টারটা পার্কিং লটে এসে ঢোকার আগে, আমি দুধ আর কর্নফ্লেক্স দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। ব্যবহার করা বাসনপত্র ধুয়ে গুছিয়ে রাখলাম। দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে নিলাম। আয়নায় মুখটা পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। ঠিক সেই সময় পার্কিং লটে ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল।

গাড়ি উন্মুক্ত রাখার পক্ষে একেবারে আদর্শ আবহাওয়া, কিন্তু ট্যান কালারের হুড শক্ত করে আটকানো। রুকস্যাক কাঁধে ফেলে দ্রুত পদক্ষেপে গাড়ি অবধি হেঁটে গিয়ে হেল্পারের সীটে চেপে বসলাম। ওশিমা আমার রুকস্যাকটা আগের মতই পেছনের ট্রাংকের র‍্যাকে দক্ষতার সঙ্গে বেঁধে রাখল। ও একটা আর্মানি স্টাইল গাঢ় রঙের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানগ্লাস পরে, 'ভি' গলার টি-শার্টের ওপরে ল্যাটিস প্যাটার্নের লিনেনের শার্ট পরে আছে। সাদা জিনসের সঙ্গে নেভি-ব্লু কনভার্স লো-কাট। ছুটির দিনের ক্যাজুয়াল চেহারায়। আমার দিকে একটা নর্থ ফেস-এর লোগো লাগানো নেভি-ব্লু টুপি বাড়িয়ে দিল।

"তুমি না বলেছিলে টুপি হারিয়ে ফেলেছ কোথাও একটা। এটা পরে নিতে পার। মুখ ঢাকতে খানিকটা কাজে লাগবে।"

"ধন্যবাদ", আমি বললাম। তারপর টুপিটা নিয়ে পরে দেখলাম। ওশিমা আমার টুপি পরা মুখটা খুঁটিয়ে দেখে, যেন অনুমোদন করছে, এইভাবে মাথা সামনে ঝোঁকায়।

"সানগ্লাস সঙ্গে আছে না?"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে, পকেট থেকে গাঢ় স্কাই-ব্লু রঙের রেভোর সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম।

"কুল!", আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওশিমা বলে। "টুপিটা পেছন দিকে মুখ করে পরে দ্যাখো না একটু—"

নির্দেশ মত টুপির রোদ আটকানোর অংশটা পেছন দিকে করে নিলাম।

ওশিমা আরেকবার মাথা সামনে ঝোঁকাল। "বেশ দেখাচ্ছে তো। ভালো পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা র‍্যাপ-সিংগারের মত দেখাচ্ছে!"

তারপর গিয়ার লো করে, ধীরে অ্যাকসিলারেটারে দিয়ে, ক্লাচ লাগাল।

"কোথায় যাচ্ছি", আমি জানতে চাইলাম।

"সেই আগের জায়গাটাতেই।"

"কোচির পাহাড়ে?"

ওশিমা সামনে মাথা ঝোঁকায়। "হ্যাঁ। আবারও সেই লম্বা ড্রাইভ", মুখে বলে। তারপর গাড়ির স্টিরিওর সুইচ অন করে দেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোৎজার্টের উজ্জ্বল অর্কেস্ট্রা নাম্বার ভেসে আসে। শুনেছি এটা আগে। পোস্টহর্ন সিরিনেড কি?

"পাহাড়ে বিতৃষ্ণা এসে গেছে?"

"বরং ভালই তো লাগে। কীরকম শান্ত, বই পড়া যায় খুব।"

"তবেই ভাল", ওশিমা বলে।

"মুশকিলটা তাহলে কী?"

যেন খুব কঠিন প্রশ্ন করেছি, ওশিমা ব্যাক-মিরারে সেরকমই একখানা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর আমার মুখটা ঝট করে একবার দেখে নিয়ে আবার দৃষ্টি সামনে ফিরিয়ে নিল।

"সর্বপ্রথমে, পুলিশ আবারও যোগাযোগ করেছে। গতকাল রাতে আমার বাড়িতে ফোন এসেছিল। এবার কিন্তু ওরা বেশ সিরিয়াসলি তোমাকে হদিস করার চেষ্টা করছে বলে মনে হল। মনোভাবটা আগের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন।"

"কিন্তু আমার তো অ্যালিবাই আছে। ঠিক কি না?"

"নিশ্চয়ই। তোমার খুব পোক্তরকম অ্যালিবাই আছে। ঘটনার দিন আদ্যন্ত তুমি শিকোকুতেই ছিলে। ওরা সেটাতে সন্দেহ পোষণ করছে না। কিন্তু তুমি কারুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ কিনা জানা নেই। সেই সম্ভাবনা তো থেকেই যায়—"

"ষড়যন্ত্র করেছি?"

"তুমি হয়তো কোনো খুনির সহায়তা নিয়েছ। এরকমই কিছু—"

খুনির সহায়তা? আমি মাথা নাড়ি। "এরকম কথা কোত্থেকে রটাচ্ছে?"

পুলিশ যথারীতি জরুরি কথা জানতে দেয় না। ওরা অন্যের থেকে কথা জিজ্ঞেস করতে যতই আগ্রহী হোক না কেন, কারুকে কিছু জানাতে খুবই ইতস্তত করাই স্বভাব। আমি তাই পুরো একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যে ধরে ইন্টারনেটে খবর সংগ্রহ করে দেখলাম। এটা কি জান—বিশেষ করে শুধু এই ঘটনাটার ওপর, কয়েকটা সাইট খোলা হয়ে গেছে? সেই সূত্রে তুমিও বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছ? এই কেসের চাবিকাঠি যার হাতে, সেই ভবঘুরে রাজকুমার হিসেবে!"

আমি মৃদু কাঁধ ঝাঁকালাম। ভবঘুরে রাজকুমার?

"সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগে, যতরকম খবর হাতে এসে পৌঁছয়, তা কতটা সত্যি, কিছু থেকে অনুমান করা কিনা, ঠিক করে বোঝার উপায় নেই। তবে নানা খবর জড়ো করে, মোটামুটি যা জানতে পেরেছি, সেটা এরকম। পুলিশ এখন একজন লোকের খোঁজ করছে। ষাটের কোঠার শেষের দিকে বয়েস লোকটার। ঘটনার দিন রাতে, লোকটা নোগাতার দোকান বাজারের মহল্লার কাছেই পুলিশ পোস্টিং-এ এসে, একটু আগেই কাছেই এক জায়গায় ও যে মানুষ খুন করে এসেছে, সেই স্বীকারোক্তি দেয়। ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল নাকি। কিন্তু লোকটা এটা ওটা দুর্বোধ্য সব কথা বলছিল। সেইজন্য পুলিস পোস্টিং-এ ডিউটিতে থাকা অল্পবয়েসি পুলিশ কর্মচারিটি ওকে কোনওভাবে মাথায় ছিট আছে এমন বুড়ো ভেবে পাত্তা না দিয়ে, কথাও ঠিকমত না শুনে, তখুনি ভাগিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই অপরাধ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, সেই পুলিশকর্মীর মনে পড়ে বুড়োর কথা। আর সে নিজে যে কত ভয়ানক গাফিলতি করেছে সেটা বুঝতে পারে। লোকটার নাম, ঠিকানা কিছুই জিজ্ঞেস করে রাখেনি। একথা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে ভয়ানক অনর্থ হবে। সুতরাং সে চুপটি করে মুখ বন্ধ রেখে বসেছিল। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতে—কেমন পরিস্থিতিতে, তা এখনও জানি না—সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। পুলিশকর্মীটির অবশ্যই শাস্তি হয়—দুঃখের বিষয়, বোধহয় এইজন্মে আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না সেই ধাক্কা—"

শিফ্‌টডাউন করে ওশিমা সামনের তোয়োতা-টার্সেলটাকে কাটিয়ে পেরিয়ে গিয়ে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আগের লেনে ফিরে এল।

"পুলিশ সর্বতোভাবে চেষ্টা করে সেই বৃদ্ধের পরিচয় বের করে ফেলেছে। ব্যাকগ্রাউন্ড ভাল জানা যায়নি, মনে হচ্ছে মানসিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিবন্ধী। তেমন সিরিয়াস রকম প্রতিবন্ধী কিছু নয়, তবে স্বাভাবিক-বুদ্ধি নয়। আত্মীয়স্বজনদের থেকে সাহায্য পেয়ে আর ভরণ-পোষণের ভাতা পেয়ে দিন চলত। একাই থাকত। কিন্তু যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকত, সেখানে আর নেই। পুলিশ শুলুক-সন্ধান করে জেনেছে, কোনোভাবে হিচ-হাইক করে শিকোকুর দিকে সম্ভবত গেছে। লং-ডিসট্যান্স বাসের ড্রাইভার মনে করতে পেরেছে যে কোবে থেকে ওরকম একজনকে সে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ধরণের বাচনভঙ্গীতে অদ্ভুত সব কথা বলছিল বলেই স্মরণে রয়ে গেছে। বলছে, বিশের কোঠা পেরোয়নি এরকম অল্পবয়েসী একটা ছেলে সঙ্গে ছিল। তারপর তোকুশিমা স্টেশনের সামনে দুজনে বাস থেকে নেমে গিয়েছিল। তোকুশিমার যে ডর্মিটরিতে ওরা রাত কাটিয়েছিল, সেটাও বা'র করা গেছে। ডর্মিটরির পরিচারিকার কথা অনুযায়ী, ওরা দু'জনে বোধহয় ট্রেনে তাকামাৎসুর দিকে গেছে। সেখানে তার গিয়ে হাজির হওয়া, আর তোমার বর্তমান বাসস্থান, একেবারে একটার সঙ্গে আরেকটা মিলে যাচ্ছে। তুমিও, সেই বৃদ্ধও, দু'জনেই নাকানো কু'র নোগাতা থেকে সোজা তাকামাৎসুর দিকে চলেছ। মাত্রাছাড়া আকস্মিক সমাপতন। স্বাভাবিক ভাবেই, এর মধ্যে কিছু একটা আছে বলে পুলিশ ভাবছে। যেমন, তোমরা দু'জনে সাঁট করে এই ঘটনাটার প্ল্যান করেছিলে কি না। এবার পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স এগিয়ে এসেছে। শহরব্যাপী খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি যে এই লাইব্রেরিতে থাকছ, সেটা হয়তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাই ঠিক করলাম পাহাড়েই নিয়ে যাব।"

"নাকানো কু'তে থাকে এমন মানসিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ?"

"কিছু মনে পড়ছে?"

আমি মাথা নাড়ি। "একেবারেই না।"

"ঠিকানা থেকে মনে হচ্ছে তোমার বাড়ির কাছেই থাকতেন। জায়গাটা হেঁটে পনের মিনিট মত।"

"ওশিমা-সান, নাকানো কু'তে অসংখ্য লোক বাস করে। আমার পাশের বাড়িতেই কে থাকত, আমার জানা নেই!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“এছাড়াও আরো আছে, বলব?”, ওশিমা বলে। তারপর আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে নেয়। “এই লোকটা নোগাতার দোকান-বাজার মহল্লায় ম্যাকারেল আর সার্ডিন বৃষ্টি করিয়েছিল। অন্ততপক্ষে, অনেক মাছ যে আকাশ থেকে ঝরে পড়বে, সেটা আগেরদিন পুলিশের কাছে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল।”

“দারুণ তো”, আমি বলি।

“একেবারে”, ওশিমা বলে। “সেইদিনই রাতে, বিশাল সংখ্যক জোঁক তোওমেই এক্সপ্রেস হাইওয়ের ফুজিগাওয়া সার্ভিস স্টেশনে ঝরে পড়েছিল। সেটা মনে পড়ছে?”

“খুব মনে আছে!”

“পুলিশও নির্ঘাত পরপর সেইসব ঘটনা খেয়াল রেখেছে। ওইসব অদ্ভুত ঘটনা আর সেই রহস্যময় বৃদ্ধের মধ্যে কোনওরকম সম্পর্ক হয়তো আছে বলে অনুমান করছে। গতিপ্রকৃতি সব মোটামুটি একই বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে।”

মোৎজার্টের নাম্বারটা শেষ হয়ে গিয়ে, মোৎজার্টের আরেকটা নাম্বার শুরু হল।

স্টিয়ারিং ধরা অবস্থায় ওশিমা বারকতক মাথা নাড়ে। “একেবারেই অদ্ভুত সব ঘটনার উদ্ভব হচ্ছে। শুরু থেকেই বেশ বিচিত্র ছিল, ক্রমেই আরো বেশি করে বিচিত্র হয়ে উঠল। সামনে যে কী আসছে আগেই বলতে পারছি না। তবে, কেবল একটা ব্যাপারে কোনও ভুল নেই। সেটা হচ্ছে, কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলে এসে সন্নিবিষ্ট হতে শুরু করেছে বলেই মনে হচ্ছে। তোমার লাইন আর ওই ছিটেল বৃদ্ধের লাইন, এই অঞ্চলেই কোথাও ক্রস করবে বলেই মনে হচ্ছে।”

আমি চোখ বন্ধ রেখে ইঞ্জিনের আওয়াজে কান পেতে আছি।

“ওশিমা-সান, এই অবস্থায় আমি কোনও অন্য শহরে চলে গেলেই ভাল হত না কি”, আমি বললাম। “কী হতে চলেছে জানি না, কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর পরেও আর ওশিমা-সান আর সাএকি-সানকে ঝামেলায় ফেলা ঠিক হবে না বলেই।"

"যেমন? কোথায় যেতে চাও?"

"জানি না। স্টেশন অবধি যদি পৌঁছে দেন, ওখানে গিয়ে ভাবব। অন্য যেকোনো জায়গা হলেই চলবে যেহেতু"

ওশিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "এভাবে ভাবাটা যে খুব কাজে দেবে, তা মনে হয় না। প্রথমত, স্টেশনে নির্ঘাত পুলিশ টহল দিচ্ছে। দীর্ঘদেহী, পনেরো বছরের আশেপাশে বয়েস, রুকস্যাক আর অবসেশন বয়ে বেড়ানো কু-ল একটি ছেলেকে খুঁজছে"

"নজরে রাখা হচ্ছে না এরকম দূরের কোনও স্টেশন অবধি নিয়ে গেলে হয় না?"

"একই ব্যাপার। যেখানেই যাও তোমাকে ওরা খুঁজে বা'র করবেই।"

আমি চুপ করে থাকি।

"আচ্ছা, তোমার নামে তো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোয়নি, সার্চ ওয়ারেন্টও নেই। তাই না?"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"তাই যদি হয়, তুমি এখন পর্য্যন্ত স্বাধীন এক সত্ত্বা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাব সেটা আমার খুশি। এতে আইনভঙ্গ করা হয় না। মোটামুটি ভাবে, আমি কিন্তু তোমার নিজের নামটাও এখনও জানি না, শ্রীমান তামুরা কাফকা। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি সেদিক থেকে খুব সতর্ক মানুষ। অত সহজে বেঠিক কিছু করেছি বলে বের করতে পারবে না।"

"ওশিমা-সান", আমি বলি।

"কী?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমি কারুর সঙ্গে সাঁট করিনি। যদি বাবাকে খুন করব বলে ঠিকও করতাম, কাউকে করতে বলতাম না।"

"সে আমি ভালই জানি।"

ওশিমা ট্র্যাফিক সিগনালে গাড়ি থামিয়ে, ব্যাক-মিররটা জায়গামত করে নিল। একটা লেমনড্রপ লজেন্স মুখে ফেলে, আমাকে একটা এগিয়ে দিল। আমি নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিলাম।

"এরপর?"

"এরপর বলতে", ওশিমা উলটে জিজ্ঞেস করল।

"প্রথমটা ওশিমা-সান একটু আগে বললেন। আমাকে যে পাহাড়ে গিয়ে লুকোতে হবে তার কারণ নিয়ে। প্রথম কারণ একটা থাকলে, দ্বিতীয় কারণ একটা আছে বলে মনে হয়।"

ওশিমা একদৃষ্টে সিগনালের যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সিগনাল কিছুতেই সবুজ হচ্ছে না।

"দ্বিতীয় কারণটা তেমন কিছু নয়। প্রথমটার তুলনায় আর কি—"

"তবু জানতে চাইছি।"

"সাএকি-সানের ব্যাপারে", ওশিমা বলে। যথাসময়ে সিগনাল সবুজ হতেই অ্যাকসিলেটারে পা দিল। "তুমি ওঁর সঙ্গে শুচ্ছো। তাই তো?"

আমি ঠিকমত জবাব দিতে পারলাম না।

"এমনিতে ঠিকই আছে। সে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি ধরতে পারি বলে জানি। সেইটুকুই। উনি একজন চমৎকার মানুষ, নারী হিসেবেও আকর্ষণীয়া। উনি—একেবারেই বিশেষ একজন। অনেক দিক দিয়েই। এটা ঠিক যে তোমার সঙ্গে বয়েসের ফারাক অনেকটা, তবে সেটা আলাদা করে কোনো সমস্যা নয়। সাএকি-সান যে তোমাকে খুব আকর্ষণ করেন সে আমি বুঝি। তুমি ওঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সঙ্গে সেক্স চাও বলে মনে হয়। ক্ষতি নেই। উনিও তোমার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক চান বলে মনে হয়। সেও হতেই পারে। সিম্পল ব্যাপার। আমি এনিয়ে কিছুই ভাবছি না। এতে তোমাদের ভাল হলে, আমারও ভাল।"

মুখের ভেতরে লেমনড্রপটা একটু ঘুরিয়ে নিল ওশিমা।

"কিন্তু এখন, তুমি আর সাএকি-সান একটু পরস্পরের থেকে দূরে থাকাই ভাল। নাকানো-কু, নোগাতার রক্তের গন্ধ লাগা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও।"

"কেন?"

"উনি এখন একটা খুব সংকটাপন্ন জায়গায় রয়েছেন—"

"সংকটাপন্ন জায়গায়?"

"সাএকি-সান—", বলে, তারপর কী বলবে হাতড়াতে থাকে ওশিমা। "সোজা কথায় বলতে গেলে, মরতে চলেছেন। আমি সেটা জানি। আমি এতক্ষণ শুধু সেই নিয়ে উৎকণ্ঠাই অনুভব করতে করতে আসছি।"

আমি সানগ্লাস খুলে, পাশ থেকে ওশিমার মুখটা দেখি। এক্কেবারে সোজা তাকিয়ে ও গাড়ি চালাচ্ছে। এইমাত্র কোচির এক্সপ্রেস হাইওয়েতে ঢুকল। যা সচরাচর হয় না, গাড়ি বৈধ গতিতে চলার লেনে চলেছে। একটা কালো রঙের তোয়োতা-সুপ্রা হুউশ্ করে আওয়াজ তুলে, আমাদের রোডস্টারকে কাটিয়ে চলে গেল।

"মরতে চলেছেন বলতে—", আমি বলি। "দুরারোগ্য অসুখের মত কিছু? ক্যান্সার কিংবা লিউকোমিয়া ধরণের?"

ওশিমা মাথা নাড়ে। "হতেও পারে। না-ও হতে পারে। ওঁর শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। হতে পারে যে ওরকম অসুখই বাঁধিয়ে বসেছেন। সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা নয়। তবে আমি মনে করি এটা একধরণের মানসিক সংকটের পর্যায়ে পড়ে হয়তো। বেঁচে থাকার ইচ্ছে—জিনিসটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলে মনে হয়—"

"বাঁচার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলছেন?"

"ঠিক ধরেছ। বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলছেন।"

"আপনার কি মনে হয় উনি আত্মহত্যা করবেন?"

"তা হয়তো করবেন না", ওশিমা বলে। "সত্যি বলতে কি, উনি নেহাতই নীরবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অথবা মৃত্যু ওঁর দিকে এগিয়ে আসছে।"

"রেলগাড়ি স্টেশনের দিকে যাওয়ার মত?"

"হয়তো", কথা না বলে ওশিমা ঠোঁট দৃঢ়নিবদ্ধ রাখে। "আর, শ্রীমান তামুরা কাফকা, এইখানেই তোমার আবির্ভাব। শসার মত ঠান্ডা, কাফকার মত রহস্যময়ভাবে। তুমি ও উনি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে, অল্প সময়ের মধ্যেই—ক্লাসিক অভিব্যক্তি ব্যবহার করে বলতে হয়—একটা সম্পর্কস্থাপন করলে—"

"তাতে করে?"

ওশিমা হাত দু'টো অল্পসময়ের জন্য স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে নেয়। "এটুকুই।"

আমি ধীরে মাথা নাড়ি। "তাতে করে, আমার যা মনে হচ্ছে, হয়তো ওশিমা-সান ভাবছেন—আমিই হচ্ছি সেই রেলগাড়িটা।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে ওশিমা। তারপর মুখ খোলে। "ঠিক তাই", ও স্বীকার করে। "যেটা তুমি বললে, আমিও সেটাই ভাবছিলাম।"

"আমিই মৃত্যুকে সাএকি-সানের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, এই তো?"

"তবে", ও বলে, "আমি তোমাকে তারজন্য দোষারোপ করছি না, বরং সেটাই ভাল হয়েছে বলে মনে হয়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“কীভাবে?”

এব্যাপারে ওশিমা কোনও জবাব দেয় না। ‘সে তোমার ভাবার জিনিস’, ওর নৈঃশব্দ্য তাই বলছে। নচেৎ ‘এনিয়ে ভাবারই বা কী আছে’।

আমি সীটে শরীর ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে ফেলি। শরীরে সমস্ত শক্তি নির্গত হয়ে যায়।

“বুঝলেন, ওশিমা-সান—”

“কী?”

“একেবারেই বুঝতে পারছি না আমার কী করা উচিত। আমি যে কোন দিকে যাচ্ছি সেটাই বুঝতে পারছি না। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। সামনে এগোবো, না কি পেছনে ফিরে যাব।”

প্রত্যাশিত ভাবেই ওশিমা চুপ করে রইল। কোনও জবাব এল না।

“আদপে কী করা উচিত আমার”, আমি জানতে চাইলাম।

“কিছু না করাই ভাল”, ও সংক্ষেপে উত্তর দিল।

“একেবারে কিছুই করব না?”

ওশিমা সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল। “সেইজন্যেই পাহাড়ে নিয়ে যাচ্ছি।”

“কিন্তু পাহাড়ে গিয়েই বা আমার কী করা উচিত?”

“বাতাসের শব্দ শুনতে পার”, ও বলল। “আমি সবসময় সেটাই করি।”

আমি এটা নিয়ে ভাবতে থাকি।

ওশিমা হাত বাড়িয়ে আমার হাতের ওপর আলতো করে রাখলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সবকিছু তোমার হাতে নেই। আমারও হাতে নেই। ভবিষ্যৎবাণীর হাতেও নেই, অভিশাপের হাতেও নেই। ডিএনএ-র হাতেও নেই, উদ্ভটত্বের হাতেও নেই। স্ট্রাকচারালিজমের হাতে নেই, তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের হাতেও নেই। আমরা সকলেই লুপ্ত হয়ে, হারিয়ে যাব, জগতটা চলছেই ধ্বংস ও লুপ্ত হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আমাদের অস্তিত্বও সেই সত্যেরই ছায়াচিত্রের অধিক কিছু নয়। বাতাস বয়। ঝোড়ো জোরালো বাতাস হয়, প্রীতিপ্রদ মৃদু সমীরণও বয়। কিন্তু সমস্ত বাতাসই কখনো হারিয়ে মিলিয়ে যায়। বাতাস কোনও বস্তু নয়। বায়ুর প্রতিসরণের একটা সাধারণ প্রতিশব্দের বেশি কিছু নয়। তুমি কান পেতে থেকো। এই মেটাফরটা তুমি বুঝতে পারবে।"

আমি ওশিমার হাতটা চেপে ধরি। কোমল, উষ্ণ, মসৃণ, লিঙ্গনির্বিশেষ চিকণ, সুচারু।

"ওশিমা-সান", আমি বলি। "আমার কি তাহলে এখন সাএকি-সানের থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল?"

"হ্যাঁ। তামুরা কাফকা-কুন[1]। কিছু সময়ের জন্য তোমার সাএকি-সানের থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল। আমার সেরকমই মনে হয়। ওঁকে একা থাকতে দাও। উনি বুদ্ধিমতী, শক্ত মানুষ। বহুদিন ধরে প্রবল একাকিত্ব সয়ে এসেছেন, স্মৃতির ভার বহন করে বেঁচে থেকেছেন। অনেক ব্যাপারেই উনি একা একাই শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন"

"অর্থাৎ আমি একটি শিশু এবং এক বালাইবিশেষ?"

"তা নয়", কোমল কণ্ঠস্বরে ওশিমা বলে, "সেরকম ঠিক নয়, তোমার যা করার ছিল, তুমি করেছ, উপযুক্ত কাজই করেছ। তোমার পক্ষেও উপযুক্ত, ওঁর পক্ষেও উপযুক্ত। পরেরটুকু ওঁর ওপরেই ছেড়ে দাও। এভাবে বললে খুবই শীতল শোনাবে হয়তো, কিন্তু এই মুহূর্তে সাএকি-সানের ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই। তুমি এবার পাহাড়ে প্রবেশ করে, তোমার নিজের কাজ করবে। তোমার জন্যেও ঠিক সেই পর্যায়টাই আসছে।"

[1]বয়েসে কনিষ্ঠ কিশোর কিংবা নবীনকে সম্বোধন করতে নামের পরে কুন যোগ করা হয়।

~ www.amarboi.com ~

"আমার নিজের কাজ?"

"কান পেতে থাকতে পার, তামুরা কাফকা-কুন", ওশিমা বলল। "কান পেতে থেকো। ঝিনুকের মত গভীর অভিনিবেশে—"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৬

ডর্মিটরিতে ফিরে দেখা গেল, যা ভেবেছিল তাই, নাকাতা তখনও ঘুমুচ্ছে। বালিশের কাছে রেখে দেওয়া পাঁউরুটি আর অরেঞ্জ জুসের প্যাক, যেমন কে তেমন রয়ে গেছে, খায়নি। একবার পাশও ফেরেনি। সম্ভবত একবারও চোখ খোলেনি। তরুণ হোশিনো সময় হিসেব করে দেখল। ঘুমিয়ে পড়েছিল গতকাল দুপুর দু'টো নাগাদ, তাই এযাবৎ টানা তিরিশ ঘন্টা ঘুমিয়ে আছে। তা সত্ত্বেও তরুণের মনে হল, আজ যেন কী বার? এবার তো দিন তারিখের বোধও হারিয়ে যাচ্ছে। বস্টন-ব্যাগ থেকে হ্যান্ড-মেমো বের করে দেখল ও। কোবে থেকে বাসে চেপে তোকুশিমায় পৌঁছেছিল শনিবার, নাকাতা সেই থেকে সোমবার অবধি অঘোরে ঘুমোল। তারপর সোমবার তোকুশিমা থেকে তাকামাৎসু এসে, বৃহস্পতিবার পাথর আর বাজ পড়ার ধুন্ধুমার, সেদিন দুপুর থেকে ঘুমোচ্ছে। তারপর একরাত কেটেছে—তাই আজ হচ্ছে শুক্রবার। সেদিক দিয়ে দেখলে কিন্তু, লোকটা অঘোরে ঘুমোনোর জন্যই শিকোকু অবধি এসেছে বলে মনে হবে।

আগের রাতের মতই তরুণ ওফুরোয় (গরম জলের চৌবাচ্চায়) গিয়ে নামল, তারপর কিছুক্ষণ টেলিভিশন দেখল, শেষে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তখনও নাকাতা ঘুমের মধ্যে শান্তভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। যাকগে, যা হওয়ার হবে, তরুণ ভাবল। যত খুশি ঘুমোক। সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই। এরপর ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সাড়ে দশটা।

ভোর পাঁচটায় ব্যাগের ভেতর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। হোশিনো তড়িঘড়ি চোখ খুলে উঠে ফোনটা হাতে নিল। নাকাতা তখনও পাশে মড়ার মত ঘুমোচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যালো!"

"হোশিনো-চান[1]", পুরুষকণ্ঠে বলল।

"কর্নেল স্যান্ডার্স", তরুণ বলে।

"ঠিক ধরেছ। ভালো আছ?"

"হ্যাঁ, ভালোই আছি যদিও—", তরুণ বলে, "কিন্তু, কাকু, এই নম্বরটা পেলেন কী করে? আপনাকে তো নম্বরটা বলেছি বলে মনে হয় না। তার ওপর এখানে এসে থেকে আমি ব্যাটারির সুইচ অফ করে রেখেছি। কাজের জায়গা থেকে যোগাযোগ করলে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় বলে। তা সত্ত্বেও কী করে এখানে ফোন করতে পারলেন? খুবই অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু। কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না!"

"সেইজন্যই বলেছিলাম কিনা, হোশিনো-চান। আমি ঈশ্বরও নই, বুদ্ধও নই, এমনকি মানুষও না। আমি এক বিশেষ জিনিস। আমি একটা আইডিয়া। তাই হোশিনো-চানের মোবাইল রিনরিন করে বাজানো তো বাঁয়ে হাত কা খেল, জলভাত। ব্যাটারি অন করা আছে না অফ করা আছে, তার ওপর নির্ভরই করে না। এতে আলাদা করে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তা না করে, সোজা ওখানে চলেই যাওয়া যেত, কিন্তু চোখ খুলেই, অপ্রত্যাশিত ভাবে বালিশের কাছে আমি বসে আছি দেখলে, হোশিনো-চানও ঘাবড়ে যেত।"

"সে অবশ্য আশ্চর্যের ব্যাপারই হত!"

"সেইজন্যেই এভাবে ফোন বাজাচ্ছি। এটুকু শিষ্টতা আমিও জানি।"

"এর কোনও জবাব নেই", তরুণ বলে। "কথা হচ্ছে, এই পাথরটার কী করব কাকু? নাকাতা-সান আর আমি মিলে পাথরটাকে উলটে দিয়ে, প্রবেশপথটাকে কোনোভাবে খুলে দিয়েছি। ভয়ানক বজ্রপাতের মধ্যে, পাথরটা মৃতদেহের মত ভারি বলে দেখা গেল। ইয়ে, নাকাতা-সানের কথা এখনও বলা হয়নি, না? নাকাতা-সান

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

[1]আদর করে বা বয়ঃকনিষ্ঠকে সম্ভাষণ করতে নামের পরে 'চান' যোগ করা হয়।

~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গেই বেড়াতে এসেছেন, আর—"

"নাকাতা-সানের কথা জানি", কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন। "আলাদা করে না বললেও চলবে।"

"হুমম্", হোশিনো বলে, "আচ্ছা বেশ। তারপর তো, নাকাতা-সান শীতঘুমে চলে যাওয়ার মত করে অঘোরে ঘুমিয়েই যাচ্ছেন। পাথরটা এখনও এখানেই আছে। একসময় জিনজাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসাই বোধহয় ভাল হবে। নিজে নিজে বের করে এনে, এখন অভিশাপের ভয়ে মরছি।"

"উফ্, সেই এক কথা! কতবার বললে বুঝবে যে অভিশাপ টাপ কিছু নেই", বিচলিত ভাবে কর্নেল স্যান্ডার্স বলেন। "পাথরটা ওইভাবে এখন কিছুকাল তুমি তোমার কাছে রাখ। তোমরা খুলেছো ওটা। একবার খুললে আবার বন্ধ করতে হয়। বন্ধ করে তারপর আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিও। এখনও ফেরানোর সময় হয়নি। বুঝলে কি? ও.কে.?"

"ও.কে.", তরুণ বলে। "যেটা খুলেছি, সেটা বন্ধ করব। যেটা নিয়ে এসেছি সেটা আগের মতই ফিরিয়ে দেব। হ্যা হ্যাঁ, বুঝেছি। করেই দেখা যাক। বুঝলেন, কাকু, আমি আর সাতপাঁচ ভাবা ছেড়ে দিলাম। বুঝি না বুঝি, কাকু যেমনটা বললেন, সেটাই করব। গতকাল রাতে আমার দিব্যচক্ষু পুরোপুরি খুলে গেছে। যা সহজ, স্বাভাবিক নয়, তা নিয়ে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে ভাবতে গেলে, ভাবনাটাই অর্থহীন হয়ে যায়।"

"বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। 'এলোমেলো দীর্ঘ চিন্তা কোনও চিন্তা না করারই সামিল', বলে প্রবচনই আছে।"

"প্রবচনটা ভাল।"

"গভীর তাৎপর্যময় প্রবচন।"

"আবার, 'মেষরাশির মাসগুলোয় মুনশি শালাও শলাহ্ দেয় শল্য চিকিৎসায়' বলেও একটা প্রবচন আছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সেটা আবার কী?"

"তাড়াতাড়িতে বলতে হয়। আমি বানিয়েছি।"

"এইমুহূর্তে এখানে এটা বলার মতো কোনও কারণ আছে?"

"কোনোই কারণ নেই। কেবল বলে দেখলাম—"

"হোশিনো-চান, অনুরোধ করছি, এরকম হাবিজাবি কথা আর বোলো না। ক্রমেই মাথাটা বিগড়ে যাচ্ছে। আমি এরকম উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক কিছু সহ্য করতে পারি না।"

"মাফ করে দেবেন", তরুণ বলে। "কিন্তু, কাকু, আমার সঙ্গে আপনার কোনও প্রয়োজন ছিল, ঠিক কি না? প্রয়োজন আছে বলেই না, এত ভোরভোর ফোন করলেন, তাই না?"

"তাই তো মনে হয়। এক্কেবারে ভুলে গেছিলাম সেকথা", কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন। "আসল কথাটা বলে নিতে হবে। দেরি না করে, ওই ডর্মিটরি ছেড়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো। সময় যেহেতু একদম নেই, ব্রেকফাস্ট করারও দরকার নেই। নাকাতা-সানকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তুলে, পাথরটা নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে, ট্যাক্সিতে ওঠো। ডর্মিটরি থেকে নয়, রাস্তায় বেরিয়ে এসে চালু ট্যাক্সি ধর। আর ড্রাইভারকে এই ঠিকানাটা বল। হাতের কাছে লেখার মত কাগজ আছে?"

"হ্যাঁ, আছে", বলে তরুণ ব্যাগ থেকে হ্যান্ডমেমো আর বলপেন বের করে। "ঝাঁটা, বালতি নিয়ে তৈরি।"

"বললাম না হাবিজাবি রসিকতা না করতে?", ফোনের রিসিভারে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল স্যান্ডার্স। "এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। নষ্ট করার মত একটা মুহূর্তও সময় নেই!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যান্ডমেমো আর বলপেন, দুটোই আছে।"

কর্নেল স্যান্ডার্স ঠিকানাটা বলায়, তরুণ সেটা লিখে নিয়ে, ঠিক লিখল কিনা যাচাই করার জন্য রিসিভারের মাধ্যমে সেটা পড়েও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিল। "**৩ চো-মে, ১৬-১৫, তাকামাৎসু পার্কহাইটস ৩০৮ নম্বর ঘর। এতেই হবে তো?"

"এতেই হবে", কর্নেল স্যান্ডার্স বললেন। "দরজার সামনে কালো আমব্রেলা স্ট্যান্ড, তার নিচে চাবি রাখা আছে। ওটা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে। যতক্ষণ খুশি ওখানে থাকতে পার। তখনকার মত বাইরে না বেরোলেই হল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটামুটি সবই রাখা আছে"

"বাড়িটা কি কাকুর নিজের?"

"হ্যাঁ। বাড়িটা আমার। আমার হলেও, লীজ নেওয়া আছে। তাই ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পার। তোমাদের জন্য রেডি করে রেখেছি।"

"আরিব্বাস, কাকু!" তরুণ বলে ওঠে।

"কী হয়েছে?"

"কাকু, ভগবানও নন, বুদ্ধও নন, মানুষও নন। আসলে কোনো চেহারাই নেই। এরকমই বলেছিলেন না?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

"এই ধরাধামেরই নন!"

"ঠিকই—"

"সেইরকম কেউ একজন একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিতে পারে কি? কাকু যদি মানুষই নন, তাহলে তো তার বংশপঞ্জি, নাগরিক পরিচয়ের কার্ড, ইনকাম-সার্টিফিকেট, নথিভুক্ত সীল, সীল নথিভুক্তকরণের সার্টিফিকেট, এসব নেই। এসব না থাকলে তো ঘর ভাড়া নেওয়া যায় না। কিছু জাল করেননি তো? হয়তো গাছের পাতাকেই সীল নথিকরণের সার্টিফিকেট বলে দেখিয়ে লোককে ভাঁওতা দিলেন। আর নতুন করে কোনো জটিলতার মধ্যে জড়াতে চাইছি না একদমই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"একেবারেই নির্বোধ দেখছি", কর্নেল স্যান্ডার্স জিভ দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ করে বললেন। "পুরোপুরি জঞ্জাল একটি। মগজটা জেলি দিয়ে তৈরি না তো? এরকম বলদ, খাজা রাসকেল। গাছের পাতা মানে? আমি তানুকি[1] নই। আমি হচ্ছি আইডিয়া। আইডিয়া আর তানুকি মোটেই এক জিনিস নয়। একেবারে ফালতু কীসব বলছ। আরে, আমি কি রিয়েল এস্টেটের এজেন্ট অবধি গিয়ে দেখা করে আলাদা করে এইসব হাবিজাবি ফর্ম্যালিটিজের মধ্যে যাব বলে ভাবছ নাকি? 'ভাড়াটা একটু কমানো যায় না?' এসব বলব বলে ভাবছ? বোকা কোথাকার। এই নশ্বর পার্থিব জগতের যাবতীয় কিছু সেক্রেটারি দিয়ে করাই। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সব সেক্রেটারিই ব্যবস্থা করে। সেটাই হওয়ার কথা নয় কি?"

"তাই নাকি? কাকুরও সেক্রেটারি আছে!"

"থাকারই কথা। লোকটার কথা আদপে কতটুকু জান? ভ্যাবলা হওয়ারও মাত্রা আছে। আমিও ব্যস্ত মানুষ। একজন সেক্রেটারি থাকবে, এতে আশ্চর্যের কী আছে?"

"সে ঠিক আছে, বুঝতেই পেরেছি। এত উত্তেজিত হবেন না। একটু মজা করছিলাম আর কি। কিন্তু, কাকু, এত তাড়াহুড়ো করে বেরোতে হচ্ছে কেন? ধীরেসুস্থে ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নিলে হত না? খিদে পেয়ে গেছে বেশ। তার ওপর নাকাতা-সান তো এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, জাগালেই যে তক্ষুণি চোখ খুলে ফেলবেন, এমনও নয়—"

"দ্যাখো হোশিনো, আমি রসিকতা করছি না। পুলিশ মরীয়া হয়ে তোমাদের হদিস করার চেষ্টা করছে। দলটা আজ সকালে প্রথমেই শহরের হোটেল আর ডর্মিটরির খবরাখবর নেওয়া দিয়ে শুরু করবে। ইতিমধ্যে নাকাতা-সান আর হোশিনোর চেহারার বিবরণ সবিশেষ ওদের জানা রয়েছে। সুতরাং খোঁজ নিলেই একবারে জেনে যাবে। যতই হোক, দুজনকেই বাহ্যত বেশ চোখে পড়ে যায়। একটা মুহূর্ত নষ্ট করার উপায় নেই—"

"পুলিশ", তরুণের গলা চড়ে যায়, "দাঁড়ান দাঁড়ান, কাকু। আমি কোনওরকম বিপজ্জনক কাজ কিছু করিনি তো। এটা ঠিকই,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

[1]তানুকি, ভাম্ব জাতীয় একরকম প্রাণী যাকে ঘিরে জাপানে নানা কাহিনী, লোকগাথা।

হাইস্কুলে পড়তে ক'বার সাইকেল চুরি করেছিলাম বটে, কিন্তু সেও নিজেই চেপে মজা পাওয়ার জন্য, বিক্কিরি করে দেওয়ার জন্য নয়। একটু চড়ে তারপর ঠিকমত আগের জায়গায় রেখে এসেছি। তারপরে আর কখনো, কোনওরকম অপরাধে হাত রাঙাইনি। উলটে আমি বলব, এরমধ্যে যে জিনজা থেকে পাথরটা নিয়ে এলাম, সেটা খানিকটা—সেও কাকু করতে বলায়—"

"পাথরের কথা ছাড়ো", কর্নেল স্যান্ডার্স কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন। "এমন নির্বোধ না! বলেছি যে পাথরটার কথা ভুলে যেতে! পুলিশ পাথর টাথরের কথা কিছু জানে না, জানলেও গায়ে মাখবে না। অন্ততপক্ষে ওটুকুর জন্য ভোর থেকে সারা শহর জুড়ে একইসঙ্গে তল্লাশি চালাবে না। অনেক অনেক বড় কিছু—"

"অনেক অনেক বড় কিছু?"

"সেই ব্যাপারেই পুলিশ নাকাতা-সানের পিছু ধাওয়া করেছে।"

"কিন্তু, কাকু, ভাল বুঝলাম না। নাকাতা-সান তো বোধহয়, সারা জগতে অপরাধের থেকে সবচেয়ে দূরে থাকা লোকটি। বড় কিছু বলতে আদপে কী? কী ধরণের অপরাধ? নাকাতা-সান কীভাবে এর সঙ্গে জড়িত?"

"অত কিছু ফোনে বিশদে বলার মত অবসর নেই। জরুরি হচ্ছে, হোশিনোকে এখন নাকাতা-সানকে পাহারা দিয়ে নিয়ে, পালাতে হবে। পুরোটাই এখন হোশিনো-চানের ঘাড়ে। বুঝলে তো?"

"না বুঝলাম না", ফোনের সামনে মাথা নাড়তে নাড়তে তরুণ বলে। "কাহিনীর প্লটটাই ধরতে পারছি না, একেবারেই। তাই যদি হয়, তাহলে তো আমিও অপরাধে সহায়তার দায়ে পড়ব।"

"অপরাধে সহায়তার দায় চাপবে না, জিজ্ঞাসাবাদ, খোঁজখবরের সম্মুখীন হবে। কিন্তু একদম সময় নেই, হোশিনো, তুমি কঠিন ব্যাপার স্যাপার সব গিলে ফেলে, এখন চুপচাপ যা বলছি করে যাও।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আরে আরে, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার কিন্তু, বুঝলেন কাকু, বলতে চাইছিলাম না কথাটা, পুলিশে ভীষণ আতঙ্ক। খুবই বিচ্ছিরি জিনিস। ওদের হাবভাব ইয়াকুজার[1] চেয়েও, আভ্যন্তরীন প্রতিরক্ষা বাহিনীর চেয়েও খারাপ। নোংরা কর্মপদ্ধতি, একটু দুর্বল দেখলে তাকে নির্যাতন করতে সবচেয়ে পছন্দ করে। হাইস্কুলের সময়ও, ট্রাক ড্রাইভার হওয়ার পর থেকেও, এযাবৎ ওদের সঙ্গে, খুবই আতঙ্কের চোখে দেখে, লেনাদেনা করে এসেছি। সুতরাং, পুলিশের সঙ্গে অন্তত, আমি কোনও বিবাদে যেতে চাইছি না। এদের সঙ্গে পারাও যায় না, পেছুও ছাড়বে না। বুঝতে পারছেন তো ? কী করে যে এইরকম কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। এটাই হচ্ছে কথা—"

ফোন কেটে গেল।

"এই দ্যাখো", তরুণ বলে। লম্বা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মোবাইল ফোনটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর লেগে পড়ে নাকাতাকে জাগাতে।

"এই যে, নাকাতা-সান। আরে, কাকু। আগুন লেগে গেছে। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। ভূমিকম্প হচ্ছে। বিপ্লব হচ্ছে। গডজিলা এসে গেছে। উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। প্লীজ উঠে পড়ুন!"

নাকাতার চোখ খুলতে বেশ অনেকটা সময় লাগল। "নাকাতা চেঁছে গোল করাটা শেষ করল। বাকিটুকু আগুন জ্বেলে রাখতে ব্যবহার করলাম। না, বেড়ালেরা ওফুরোতে নাইতে নামে না। নেমেছিল নাকাতা", নাকাতার মুখ দিয়ে বেরুল। ও যেন অন্য কোনও সময়ের অন্য কোনও জগতে তখন। তরুণ নাকাতার কাঁধ ঝাঁকিয়ে, নাক চেপে ধরে, কান টানাটানি করল। এভাবেই শেষ অবধি কোনওক্রমে নাকাতা হুঁশ ফিরে পেল।

"আপনি হোশিনো-সান না", নাকাতা বলল।

"হ্যাঁ, হোশিনো-সানই তো", তরুণ বলে, "জাগাতে হল বলে খারাপ লাগছে"

[1]অপরাধপ্রবণ মাফিয়া দল হিসেবে জাপানের ইয়াকুজা সর্বজনবিদিত।

আমার বই

"না না, ও নিয়ে ভাববেন না। ধীরে ধীরে জেগে ওঠার সময় এসে গেছে নাকাতার। আপনি চিন্তা করবেন না। আগুন নিভিয়ে দিয়েছি"

"ভাল করেছেন। কিন্তু জানেন, একটু বাজে একটা ব্যাপার হয়েছে। আমাদের জলদি ঘর খালি করে দিতে হবে"

"এটা কি ওই জনি ওয়াকারের ব্যাপারটা?"

"ঘটনা সবটা আমারও ভাল জানা নেই। একটা সূত্রে বিশেষ একটা খবর এসেছে। ঘর খালি করে দিতে বলল। পুলিশের আমাদের খোঁজ করছে!"

"তাই নাকি?"

"সেরকমই শুনলাম। কিন্তু, এর মধ্যে জনি ওয়াকার-সানের সঙ্গে আদপে কী হয়েছিল?"

"সেকথা হোশিনো-সানকে বলা হয়নি?"

"না, বলেননি।"

"বলেছি বলেই মনে হচ্ছে যদিও!"

"না, জরুরি কথা কিছুই শুনিনি।"

"সত্যি বলতে কী, নাকাতা জনি ওয়াকার-সানকে খুন করেছে।"

"বোঝো অবস্থা!" তরুণ বলে।

তরুণ মালপত্র ব্যাগে ভরে, স্নানের তোয়ালে দিয়ে পাথরটাকে মুড়ে নিল। পাথরটা এতক্ষণে আবার আগের ওজনে ফিরে গেছে। হালকা ঠিক নয়, তবে বয়ে নেওয়া যায় না এমন ভারি নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাকাতাও তার জিনিসপত্র ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে নিল। ডর্মিটরির ফ্রন্ট-ডেস্কে গিয়ে তরুণ বলল যে তাড়াতাড়িতে একটা প্রয়োজনে ওদের বেরিয়ে যেতে হবে। অলরেডি অগ্রিম পেমেন্ট করা ছিল বলে হিসেব চোকাতে তেমন সময় লাগল না। নাকাতার পা তখনও একটু টলমল করছিল বটে, কোনোরকমে হাঁটতে পারছিল।

"নাকাতা কতক্ষণ ঘুমিয়েছে?"

"কতক্ষণ?" তরুণ মনে মনে সময়টা হিসেব করে নেয়। "মোটামুটি চল্লিশ ঘন্টার কাছাকাছি।"

"বেশ ভাল ঘুমিয়েছি বলে বোধ হচ্ছে।"

"হচ্ছে? তা হতেই পারে। ভালমত ঘুমিয়েছেন বলে মনে না হলে, ঘুমেরও মুখ থাকে না। আচ্ছা, কাকু, আপনার খিদে পায়নি?"

"বেশ খিদে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"আরেকটু সহ্য করতে পারবেন? আমাদের, যে করে হোক, এখান থেকে সরে যেতে হবে। তারপরে খাওয়া—"

"বুঝতে পেরেছি। নাকাতা অপেক্ষা করতে পারবে।"

তরুণ হোশিনো নাকাতাকে ধরে ধরে বড় রাস্তায় বেরিয়ে, চালু ট্যাক্সি একটা থামাল। ড্রাইভারকে কর্নেল স্যান্ডার্সের বলা ঠিকানাটা দেখাল। ড্রাইভার মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে, তারপর দু'জনকে সেখানে নিয়ে গেল। পৌঁছতে মাত্র পঁচিশ মিনিট লাগল। গাড়ি শহর থেকে বেরিয়ে, জাতীয় সড়ক ধরে চলে, অল্প পরেই শহরতলীর বসতিতে ঢুকে পড়ল। এযাবৎ স্টেশনের কাছে যে ডর্মিটরিতে ওরা ছিল, আশপাশটা হঠাৎই তার থেকে অনেকটা পাল্টে গেল। অভিজাত, শান্ত পরিবেশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সর্বত্রই দেখা যায় এমনই বেশ সাধারণ একটা ছিমছাম পাঁচতলা বাড়ি। 'তাকামাৎসু পার্ক-হাইটস' বলে নাম লেখা আছে বটে, সমতল জমির ওপরে দাঁড়ানো, কাছেপিঠে পার্কও নেই। দু'জনে এলিভেটারে উঠে এলো তিনতলায়, তরুণ হোশিনো ছাতা রাখার স্ট্যান্ডের নিচে থেকে চাবি বের করল। ঘর হচ্ছে, যাকে বলে, 2LDK। দুটো ঘরের সঙ্গে একটা লিভিংরুম আর সঙ্গে ডাইনিং-কিচেন ইউনিট, বাথ সম্বলিত বাথরুম। সব ঝকঝকে তকতকে, নতুন। আসবাবপত্র যা আছে, খুব একটা ব্যবহার হওয়ার ছাপ নেই। বড় স্ক্রীনের টেলিভিশন আর ছোট একটা স্টিরিও যন্ত্র আছে। সোফাসেট। যার যার ঘরে বেড। তাতে বিছানা পাতা আছে। কিচেনে রান্নার সরঞ্জাম সব রাখা আছে, বাসনের আলমারিতে সাধারণ বাসনকোসন সার দিয়ে রাখা। দেওয়ালে রুচিসম্মত আর্টপ্রিন্ট ঝুলছে কয়েকটা। বেশি দামের বাড়ির ডেভেলপাররা, সম্ভাব্য ক্রেতাদের দেখানোর জন্য যে মডেল রুম তৈরি করে, হুবহু তার মতো।

"মোটেই খারাপ কিছু নয়", হোশিনো বলে। "একেবারে স্বতন্ত্র বলা যাবে না, তবে ঝকঝকে তকতকে।"

"সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা", নাকাতা বলে।

অফ-হোয়াইট রঙের বড়ো রেফ্রিজারেটার খুলতেই, ভিতরে কিনে আনা খাবারে ঠাসা। নাকাতা কী যেন আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখছিল, তবে, একটু বাদেই ডিম, ক্যাপসিকাম আর মাখন বের করে আনল। ক্যাপসিকাম ধুয়ে নিয়ে ছোটছোট করে কেটে, আগুনে নেড়ে নিল। তারপর বড় বাটির মধ্যে ডিম ভেঙে, চপস্টিক দিয়ে ফেটিয়ে নিল। উপযুক্ত সাইজের ফ্রাইং-প্যান একটা বেছে নিয়ে অভ্যস্ত হাতে দু'টো ক্যাপসিকাম দেওয়া ওমলেট বানাল। পাঁউরুটি টোস্ট করে দু'জনের মত পরিমানে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে, টেবিলে নিয়ে এল। জল ফুটিয়ে লাল চা বানাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“কাজেকম্মে বেশ পটু তো!” তরুণ হোশিনো তারিফ করে বলে। “খুব বড় গুণ এটা!”

“আগাগোড়া একলাই থেকেছি তো, এসবগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে।”

“আমিও একাই থাকি, কিন্তু রান্নাবান্নায় আনাড়ি।”

“অখন্ড অবসর তো, অন্য কোনও কাজই নেই।”

দু’জনে পাঁউরুটি খেয়ে, ওমলেট খেল। তাতেও দু’জনেরই খিদে খিদে পাচ্ছিল বলে নাকাতা বেকন আর পালং দিয়ে ভাজা ভাজা করে একটা পদ বানাল। আর দু’টো করে টোস্ট বানিয়ে নিয়ে খেল। এতে খিদেটা খানিকটা ধাতস্থ হল।

সোফায় গিয়ে বসে, দু’জনে দ্বিতীয়বার লাল চা খেল।

“এবার বলুন”, তরুণ হোশিনো বলে। “কাকু তাহলে মানুষ খুন করেছেন।”

“হ্যাঁ। নাকাতা মানুষ খুন করেছে”, নাকাতা বলে। তারপর নিজেই জনি ওয়াকারকে ছোরা বসিয়ে খুন করার পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

“তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি!” তরুণ হোশিনো বলে। “আশ্চর্য ঘটনা তো। অথচ, এসব বললেও, এতটা অকপটে বললেও, পুলিশ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না। এমনকি আমিও এই এখন একভাবে বিশ্বাস করতে পারছি বটে, খানিক আগে হলে সঙ্গেই নিতাম না হয়তো!”

“নাকাতার কাছেও সবটা পরিস্কার নয়।”

“তবে, সে যাই হোক না কেন, মানুষ খুন হয়েছে, খুন হলে, শুধু যে হতভম্ব হয়েই চুকে যাবে, তা তো নয়। পুলিশ হন্যে হয়ে তদন্ত করছে, একটা বাহিনী কাকুর পিছনে ধাওয়া করে শিকোকু অবধি আসছে।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হোশিনো-সানকেও ঝঞ্ঝাটে ফেললাম—"

"আচ্ছা, ধরা দিতে মন চাইছে না?"

"চাইছে না", বিরল রকম পরিস্কার গলায় নাকাতা বলে। "তখন মনে হয়েছিল ধরা দেওয়ার কথা, কিন্তু এখন হচ্ছে না। যেহেতু নাকাতার অন্য কাজ রয়ে গেছে। নাকাতা এখন পুলিশের কাছে ধরা দিলে, সেটা সম্পন্ন করতে পারবে না। আর তা হলে, নাকাতার শিকোকু অবধি আসার কোনও অর্থ থাকবে না।"

"খুলে ফেলা প্রবেশপথ আবার বন্ধ করতে হবে?"

"হ্যাঁ, হোশিনো-সান ঠিকই ধরেছেন। একবার খুললে বন্ধ করতে হয়। তার পরে নাকাতা আবার স্বাভাবিক নাকাতার অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে কিছু কাজ আছে, যা না করলেই নয়।"

"কর্নেল স্যান্ডার্স আমাদের কাজে সহায়তা করছেন", তরুণ বলে, "ভদ্রলোক পাথরটা কোথায় আছে সেটা আমাদের বলে দিয়েছিলেন, আর এভাবে আমাদের আড়াল করছেন। আদৌ এসব করছেনই বা কেন? কর্নেল স্যান্ডার্স আর জনি ওয়াকারের পরস্পরের মধ্যে কোনওরকম সম্পর্ক আছে কিনা কে বলতে পারে?"

কিন্তু যথাসাধ্য ভেবেও তরুণ চিন্তায় থই পায় না। অযৌক্তিক জিনিসে যুক্তি আরোপ করতে গিয়ে লাভ নেই বলেই ওর মনে হল।

"এলোমেলো দীর্ঘ চিন্তা কোনও চিন্তা না করারই সামিল", হাত দু'টো আড়াআড়ি ভাঁজ করে তরুণ বলে ওঠে।

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলে।

"কী, বলুন?"

"সমুদ্রের গন্ধ পাচ্ছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জানালার কাছে গিয়ে, জানালাটা খুলে, বেরিয়ে সরু বারান্দায় গিয়ে নাকে বাতাসের গন্ধ নিয়ে দেখল তরুণ। কিন্তু সমুদ্রের গন্ধ পেল না। দূরে চিরসবুজ পাইনের বন দেখা যাচ্ছে শুধু। পাইনবনের ওপরে প্রথম-গ্রীষ্মের সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

"সমুদ্রের গন্ধটন্ধ পাচ্ছি না তো!"

নাকাতা উঠে এসে, কাঠবিড়ালির মত করে নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকতে থাকল। "সমুদ্রেরই গন্ধ। ওইখানে সমুদ্র আছে", পাইনবনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল।

"হুঁ, কাকুর নাকটা ভাল তো", তরুণ বলে। "আমার সবসময়ই সাইনাসের সমস্যা থাকে বলে এগুলো একেবারে পারি না—"

"হোশিনো-সান, সমুদ্র অবধি একবার হেঁটে দেখবেন নাকি?"

তরুণ অল্প ভেবে দেখে। সমুদ্র অবধি হেঁটে গেলে আর ক্ষতি কী? "আচ্ছা বেশ, গিয়েই দেখা যাক", সে বলে।

"তার আগে নাকাতা একবার পায়খানা করে আসবে, অসুবিধে নেই তো?"

"বিশেষ তাড়া তো কিছু নেই, যতক্ষণ খুশি সময় নিয়ে করে আসুন।"

নাকাতা টয়লেটে ঢুকতে, তরুণ ততক্ষণ ঘরটায় ঘুরে ঘুরে, যা কিছু আছে, একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখতে থাকল। কর্নেল স্যান্ডার্স যেমন বলেছিল, জীবনধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই সংগ্রহ করা আছে। বাথরুমে শেভিং ক্রীম থেকে নতুন টুথব্রাশ থেকে কটন-বাড থেকে ব্যান্ড-এইড থেকে নেইল-কাটার পর্যন্ত আছে, ন্যূনতম প্রয়োজনের জিনিসগুলো মোটামুটি সবই আছে। ইস্তিরি, আয়রন-বোর্ডও আছে।

"নির্ঘাত এত খুঁটিনাটি সব সেক্রেটারিকে দিয়েই আয়োজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করিয়েছে, তবে নিষ্ঠা নিয়ে করেছে। একটা কিছু বাদ যায়নি", তরুণ নিজের মনে বলে।

ক্লোসেট খুলতেই, পোশাক পাল্টানোর জন্য অন্তর্বাস, জামাকাপড় পর্যন্ত এনে রাখা আছে। আলোহা শার্ট নেই, শুধু চেক-কাটা ওপেন শার্ট আর পোলো শার্ট আছে। দুটোই টমি হিলফিগারের, একেবারে নতুন। "কর্নেল স্যান্ডার্সকে যতটা কাজের লোক ভেবেছিলাম ততটা নন", নির্দিষ্ট কারুকে উদ্দেশ্য না করেই তরুণ অভিযোগ করে। "আমি আলোহা শার্টের ফ্যানই বলা যায়, একবার দেখলেই এটুকু বুঝতে পারার কথা। এমনকি শীতের সময়ও আমি আলোহা শার্ট পরে কাটাই। এতকিছুই যখন করলেন, একটা আলোহা শার্টের ব্যবস্থা করতে পারলেন না?"

কিন্তু এযাবৎ পরতে থাকা আলোহা শার্টটাতে ঘামের গন্ধও হয়ে গেছে, হাল ছেড়ে দিয়ে ও পোলোশার্টটায় মাথা গলিয়ে দিল। একেবারে নিখুঁত ওরই সাইজ।

সমুদ্রতীর অবধি দু'জনে হেঁটে গেল। পাইনবনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, ঢেউ আটকানোর বাঁধ পেরিয়ে, বালির বীচে নেমে এল। শান্ত খাঁড়ির জলরাশি। দু'জনে বালির বীচে পাশাপাশি বসে, অনেকক্ষণ কোনও কথা না বলে, ছোট ছোট ঢেউ, ঠিক যেন চাদর ফুলে ওঠার মত করে মাথা তুলে, অল্প আওয়াজ করে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, সেই দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখল। কূলে কয়েকটা ছোট দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। দু'জনেরই সচরাচর সমুদ্র দেখার আদত নেই বলে, দেখে দেখে আশ আর মিটছিল না।

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলল।

"কী, বলুন?"

"সমুদ্র জিনিসটা তো ভালই—"

"ঠিকই। দেখতে থাকলে মনটা শান্ত হয়ে যায়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কেন যে মনটা শান্ত হয়ে যায়, সমুদ্র দেখতে থাকলে—"

"হয়তো, অতবড়, অথচ কিছুই নেই বলে", এই বলে তরুণ সমুদ্রের ওপরটায় আঙুল দিয়ে দেখাল। "কিন্তু যদি ওখানে একটা সেভেন ইলেভেনের দোকান থাকত, সেইইয়ু[1] থাকত যদি, কিংবা একটা পাচিংকো'র পার্লার, অথবা ইয়োশিকাওয়া পনশপের হোর্ডিং, অতটা শান্ত হয়তো হত না মনটা। যতদূর চোখ যায়, কিছুই যে নেই, এতেই ভাল লাগছে"

"হ্যাঁ, তা হতে পারে", বলে নাকাতা কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইল।

"হোশিনো-সান!"

"কী, বলুন?"

"একটা অন্য কথা জিজ্ঞেস করি?"

"করুন না—"

"সমুদ্রের তলায় কী আছে?"

"সমুদ্রের তলায়, সমুদ্রের তলার জগৎটা আছে, মাছ টাছ, গেঁড়ি গুগলি, সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জ, এইরকমই নানা কিছু বাস করছে অথবা রয়ে গেছে। অ্যাকোয়ারিয়ামে যাননি কখনও?"

"জন্মে থেকে একবারও নাকাতা অ্যাকোয়ারিয়াম বলে কোথাও যায়নি। নাকাতা আগাগোড়া যেখানে থেকেছে, সেই মাৎসুমোতো বলে জায়গাটাতে অ্যাকোয়ারিয়াম ছিল না।"

"ও, তা হবে। মাৎসুমোতো তো পাহাড়ের মধ্যে, থাকার মধ্যে আছে মাশরুমের সংগ্রহশালা বড়জোর", তরুণ বলে। "অবশ্যই সমুদ্রের নিচে অনেক কিছু আছে। সাধারণভাবে এরা সব জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালায়। তাই বাতাস না থাকলেও বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের থেকে অন্যরকম। সুন্দর জিনিসও আছে, খেতে সুস্বাদু হয়তো, এমন জিনিসও আছে, বিপজ্জনক জিনিস, দেখেই কেমন লাগে এমনও অনেক কিছু আছে। যে লোক সত্যিই

[1]জাপানি সুপারমার্কেট।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেখেনি, তার পক্ষে সমুদ্রের তলাটা কেমন তা মুখে বলা কঠিন, তবে নিশ্চয়ই এখানকার থেকে একেবারেই আলাদা একটা জগৎ। খুব গভীরে গেলে, সূর্যের আলোও সেখানে খুব একটা ঢুকতে পায় না। সেখানে চূড়ান্ত ভীতিজনক সব প্রাণীরা বাস করে। বেশ, কাকু, এবারের এই ঝামেলাটা নির্ঝঞ্ঝাটে মিটে গেলে, দু'জনে মিলে কোথাও একটা অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে যাওয়া যাক। আমিও বহুদিন যাবৎ যাইনি, কিন্তু খুব মজার জায়গা। সমুদ্রের কাছেই যেহেতু, তাকামাৎসু অঞ্চলেও একটা আছে হয়তো—"

"হ্যাঁ, নাকাতাও, অবশ্য করে, অ্যাকোয়ারিয়াম বলে জায়গাটা দেখে আসতে চায়।"

"তাহলে, নাকাতা-সান—"

"হ্যাঁ, বলুন, হোশিনো-সান—"

"আমরা গত পরশু দুপুর নাগাদ পাথরটা তুলে, প্রবেশপথটা খুলেছিলাম তো?"

"হ্যাঁ, নাকাতা আর হোশিনো-সান মিলে প্রবেশপথের পাথর খুলেছিল। সেটাই হয়েছিল। তারপর নাকাতা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

"আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হল, প্রবেশপথটা যে খোলা হল, এতে আসলে কিছু ঘটল কি, ঘটলে সেটা কী ধরণের ঘটনা?"

নাকাতা সায় জানানোর মত করে সামনে মাথা ঝোঁকায়। "হ্যাঁ, ঘটেছে বলেই মনে হয়।"

"কিন্তু সেটা যে কী, তা তো এখনো বুঝতে পারছি না! "

নাকাতা পরিষ্কার মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ। এখনও জানি না।"

"সেটা হয়তো—কোথাও একটা এখন ঘটে চলেছে, তাই কি?"

"হ্যাঁ। সেরকম কিছু বলেই মনে হয়। হোশিনো-সান যেমনটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললেন, এখনও ঘটে চলেছে, মাঝপথে। আর নাকাতা সেই ঘটনাটা সারা হওয়ার অপেক্ষায় আছে।"

"তাই যদি হয়, অর্থাৎ ঘটনাটা ঘটা সম্পন্ন হয়ে গেলে আর কি, অনেক কিছু একসঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাটে সমাধা হয়ে যাবে হয়তো—"

নাকাতা আরেকবার স্পষ্ট করে মাথা নাড়ে। "না, হোশিনো-সান, সেটা নাকাতার জানা নেই। কেবল যেটুকু করতে হবে, নাকাতা শুধু সেটুকুই করছে। সেটা করার ফলে কী ঘটবে, তা না ঘটা অবধি নাকাতা জানে না। নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নেই তো, অত কঠিন ব্যাপার বুঝে উঠতে পারবে না। এর পরে কী হবে, জানা নেই।"

"যাই হোক না কেন, সবকিছু ঘটে যাওয়ার পর, তার থেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আরো খানিকটা সময় লাগবে, এই তো?"

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা সেরকমই।"

"আর, এর মধ্যে আমাদের যেন পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে। যেহেতু করণীয় কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে—"

"হ্যাঁ, হোশিনো-সান, সেটাই। নাকাতার পুলিশের কাছে যেতে আপত্তি নেই। গভর্নর যেমন বলবেন তেমনটাই করব। কিন্তু এখন একটু অসুবিধে আছে।"

"জানেন তো, নাকাতা-সান", তরুণ বলে। "ওরা আপনার এই বিদঘুটে গল্প শুনলে, তক্ষুণি সেটা বাতিল করে দিয়ে, সুবিধেমত সাক্ষ্যপ্রমাণ সাজিয়ে নেবে। সুবিধেমত একটা গল্প উলটে তৈরি করে ফেলবে। যেমন ধরা যাক, বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে, লোক ছিল বলে, একটা ছুরি নিয়ে, সেটা বসিয়ে দিয়ে খুন করেছেন গোছের কিছু। এই ধরণেরই, যে কারুরই বুঝতে সুবিধে হয় এমন গল্প বানাবে। সত্যি কি, ন্যায্য কি, ওদের তাতে কিছু এসে যায় না। ওদের গ্রেপ্তারির হার বাড়াতে অপরাধী বানিয়ে নেওয়া ওদের কাছে জলভাত। আর নাকাতা-সানকে জেলে হোক কি ভারি পাহারার মানসিক হাসপাতালে ঢুকিয়ে দেবে। এর যেকোনোটাই ভয়ানক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জায়গা। জীবনভর হয়তো ওখান থেকে বেরুতে পারবেন না। ঠিকঠাক উকিল ধরার পয়সাও আপনার কাছে নেই, কেবলমাত্র দায়সারা হতদরিদ্র গভর্নমেন্টের উকিল পাওয়া যাবে। দেখতেই পাচ্ছি যে এটাই হবে।"

"নাকাতা এসব কঠিন জিনিস ভাল বুঝতে পারে না।"

"যাই হোক না কেন, পুলিশ ওটাই করবে। আমি ভাল করেই জানি", তরুণ বলে। "সেজন্য না, নাকাতা-সান, আমরা পুলিশের সঙ্গে বিবাদে যেতে চাই না। পুলিশের সঙ্গে মাখামাখি একেবারেই ভাল নয়।"

"হ্যাঁ। হোশিনো-সানকে খুব ঝামেলায় ফেললাম।"

তরুণ হোশিনো বড় করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "তবে কিনা, কাকু, পৃথিবীতে 'বিষই খেতে হলে প্লেটটাও' বলে একটা কথা আছে।"

"এর মানে কী?"

"বিষ খেয়ে ফেলে থাকলে, এরপর যে রেকাবিতে আনা হয়েছিল সেটাও খেয়ে ফেল—"

"কিন্তু হোশিনো-সান, প্লেট খেয়ে ফেললে তো লোক মরে যাবে। দাঁতের পক্ষেও ভাল না, গলায়ও লাগবে!"

"তা অবশ্য ঠিক", তরুণ মাথা ঝাঁকায়। "আবার প্লেটটাও কেন খেতে হবে কে জানে!"

"নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই বলে ভাল জানা নেই, বিষ তো বটেই, প্লেট খাওয়াও বড্ডই কঠিন।"

"হুম্, ঠিকই বলেছেন। আমারও কেমন যেন, ক্রমে ক্রমে সব দুর্বোধ্য ঠেকছে। লজ্জার কথা হচ্ছে, আমারও তো বুদ্ধিশুদ্ধি মোটেই তেমন নেই। কিন্তু আমি যেটা এমনিতে বলতে চাইছি, অ্যাদ্দুর যখন এসে পড়েছি, তাতে এর পরেও আমি নাকাতা-সানকে আড়াল করে পালাতে থাকব। আমি কিছুতেই ভাবতে পারি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না যে নাকাতা-সান খারাপ কাজ কিছু করেছেন। কাকুকে ত্যাগ করে যাওয়া যাবে না। তাহলে আর হোশিনো-কুনের আনুগত্য বলে কিছু থাকে না।"

"ধন্যবাদ। সত্যি, কী করে যে হোশিনো-সানকে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না", নাকাতা বলে, "আরেকটু উপকার করতে হবে, নাকাতার আরেকটা অনুরোধ আছে।"

"বলুনই না!"

"সম্ভবতঃ একটা গাড়ির দরকার হবে—"

"গাড়ি বলতে, রেন্টাল-কার হলে চলবে?"

"রেন্টাল-কারের ব্যাপারটা নাকাতার ভাল জানা নেই, যেকোনওরকম একটা হলেই হবে। ছোটই হোক, বড়ই হোক, যেকোনও একটা গাড়ি হলেই হবে"

"সহজ কাজ। গাড়ির ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ। পরে একটা ভাড়া করে নেব। আমরা কি তাহলে কোথাও যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ। সম্ভবত কোথাও একটা যাওয়া হবে।"

"ওহ্, নাকাতা-সান, কাকু!"

"হ্যাঁ, হোশিনো-সান—"

"কাকু সঙ্গে থাকলে কখনও একঘেয়েমি আসে না। অনেক কিছুই ঘটে যার মাথামুন্ডু নেই, কিন্তু ওইটুকুই। কাকু সঙ্গে থাকলেই আর কখনও একঘেয়েমি আসে না।"

"ধন্যবাদ। একথা শুনলে নাকাতারও স্বস্তি হয়। কিন্তু হোশিনো-সান—"

"বলুন?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"একঘেয়েমি আসা জিনিসটা ঠিক কী ব্যাপার, সত্যি কথা বলতে কী, নাকাতা ভাল জানে না—"

"কাকুর কখনও, কোনওরকম একঘেয়েমি আসে নি, তাই না?"

"হ্যাঁ, নাকাতার একবারও ওরকম কিছু হয়নি।"

"তাই না? আমারও কথাটা আগে থেকেই মনে হচ্ছিল।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৭

পথিমধ্যে একটু বড় একটা শহরে থেমে, সুপারমার্কেটে ঢুকে আগের মতই খাবার দাবার ও মিনারেল ওয়াটার কিনে নিয়ে, পাশে ফুটপাথবিহীন পাহাড়ের রাস্তায় চলে কেবিনে গিয়ে পৌঁছলাম। একসপ্তাহ আগে শেষ যে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম, কেবিনের ভেতরটা তেমনই রয়েছে। জানালাটা খুলে ভেতরের বদ্ধ বাতাসের জায়গায় তাজা বাতাস ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর কিনে আনা খাবারদাবার গোছাতে বসলাম।

"এখানে একটু ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে", ওশিমা বলল। তারপর দু'হাতে মুখঢাকার মত করে হাই তুলল। "গতকাল রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি যে!"

এতই ঘুম পেয়েছিল যে ওশিমা বিছানায় সাধারণভাবে তোষক পেতে নিয়ে, ওই অবস্থায় চাদরের নিচে ঢুকে পড়ে, দেওয়ালের দিকে ফিরে তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ল। আমি মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ওর জন্য কফি তৈরি করে, কাঁধে ঝোলানো থার্মোফ্লাস্কে ভরে রাখলাম। তারপর দুটো খালি পলিথিনের ক্যান নিয়ে বনের মধ্যে ঝর্ণাটার থেকে জল ভরে আনতে বেরুলাম। বনের ভেতরের ছবিটা, আগে যেবার এসেছিলাম, সেবারের মতই হয়ে আছে। ঘাসের গন্ধ, পাখির ডাক, ঝর্ণার মৃদু কলধ্বনি, গাছেদের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস, ঝিরঝির করে কাঁপতে থাকা গাছের পাতার ছায়া। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেক কাছে। যেন এইসবেরই সঙ্গে আমার কত দীর্ঘ পরিচয়, এভাবেই এগুলোকে আমার নিজের একেবারে স্বাভাবিক অংশ বলেই মনে হতে থাকল।

ওশিমা যতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বেরিয়ে পর্চে গিয়ে চেয়ারে বসে সবুজ-চা খেতে খেতে বই পড়লাম। ১৮১২-তে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান নিয়ে লেখা বই। এই বহুলাংশে অনর্থক ব্যাপক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যুদ্ধের ফলে, চার লাখের মত ফরাসি সৈন্য সেই অচেনা অজানা বিস্তৃত বিদেশ বিভূঁইতে প্রাণ হারিয়েছিল। যুদ্ধ অবশ্যই নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার ছিল না, চিকিৎসার সরঞ্জামও অপ্রতুল, সেই কারণে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে বেশির ভাগ আহত সৈন্যই ওই অবস্থায় তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে মারা যায়। কী ভয়ানক মৃত্যু! কিন্তু আরো বেশি সংখ্যক মারা গিয়েছিল অনাহারে আর শীতে। সেও তো একইরকম নিষ্ঠুর আর ভয়ানক মৃত্যু! আমি পাহাড়ে পর্চে বসে পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে, গরম চা খেতে খেতে, তুষারঝড়ের প্রলয় নৃত্যের দেশ রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র আমার মাথার ভেতরে কল্পনায় ফুটিয়ে তুললাম।

এক-তৃতীয়াংশ পড়ে ফেলার পর উদ্বিগ্ন হয়ে, বই রেখে দিয়ে ওশিমার অবস্থা দেখতে গেলাম। ঘুম যত গভীরই হোক, একটু যেন বেশিই শান্ত। ও যে ওখানে আছে, তার কোনও আভাসই দিচ্ছে না। তবে, পাতলা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। আরেকটু কাছে গিয়ে দেখলাম, কাঁধটা অল্প ওঠানামা করছে বলে বোঝা যাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ ওর কাঁধটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর তখনই হঠাৎ করেই মনে পড়ল যে ওশিমা একজন মহিলা। এই সত্যটা আমার খুবই কদাচিৎ মনে পড়ে । অধিকাংশ সময়েই আমি ওশিমাকে পুরুষ বলেই ধরে নিই। ওশিমারও অবশ্যই সেটাই চাওয়ার কথা। কিন্তু ঘুমন্ত ওশিমাকে, আশ্চর্যরকম ভাবে ফের যেন মহিলা বলেই মনে হচ্ছে, অনুভব করলাম।

তারপর আবার পর্চে গিয়ে বইয়ের পরবর্তী অংশটা পড়তে থাকি। আমার মনটা ফিরে যায় স্মোলেনস্ক্ শহরতলির রাজপথে, যেখানে সার দিয়ে রয়েছে ঠান্ডায় জমে যাওয়া অগুন্তি মৃতদেহ।

দু'ঘন্টা মত ঘুমিয়ে ওশিমা জাগল। পর্চে এসে দেখে গেল ওর গাড়িটা আছে কিনা। শুকনো ফুটপাথহীন রাস্তা দিয়ে আসার ফলে সবুজ রঙের রোডস্টারটা প্রায় ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। বড়ো করে হাই তুলে, তারপর এসে আমার পাশের চেয়ারটায় বসল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"এবছর বর্ষায় তেমন একটা বৃষ্টি হল না", চোখ ঘষতে ঘষতে ওশিমা বলে। "খুব একটা ভাল কথা নয় সেটা। বর্ষায় বৃষ্টি কম হলে, গ্রীষ্মে তাকামাৎসুতে জলের টানাটানি হবেই।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "সাএকি-সান কি জানেন, আমি এখন কোথায়?"

ওশিমা মাথা নাড়ে। "সত্যি কথা বলি, এবারের এসব ব্যাপার ওঁকে কিছু বলিনি। উনি জানেনও না যে আমার এখানে একটা কেবিন আছে। মানুষটা এটা ওটা নানা খবর যতদূর সম্ভব না জানলেই ভাল বলে মনে করেছিলাম। না জানলে গোপন করারও প্রয়োজন থাকবে না, আর ততই ঝামেলায় না জড়িয়ে থাকতে পারবেন।"

আমি সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই। আমিও এটাই চেয়েছিলাম।

"মানুষটা এযাবৎ যথেষ্ট সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন", ওশিমা বলে।

"আমার বাবা যে সম্প্রতিই মারা গেছেন সেকথা আমি সাএকি-সানকে বলেছি", আমি বললাম। "উনি যে কারুর দ্বারা খুন হয়েছেন, সেকথাও। তবে, পুলিশ যে আমার পিছু নিয়েছে সেটা আর বলিনি।"

"কিন্তু তুমি না বললেও, আমি না বললেও, উনি যে খানিকটা আন্দাজ করেননি, তা নয় বলেই মনে হচ্ছে। বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ তো। তাই সোমবার লাইব্রেরিতে মুখোমুখি হয়ে গেলে যদি জানাই, 'তামুরা-কুন একটা প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য বাইরে কোথাও গেল বলে মনে হচ্ছে। সাএকি-সানকে চিন্তা না করতে বলে গেছে', সেই নিয়ে উনি এটা সেটা জিজ্ঞেস করবেন না বলেই মনে হয়। এর বেশি কিছু যদি আমি আর না বলি, উনি সায় দিয়ে, চুপ করে শুনে যাবেন।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"কিন্তু তোমার তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করবে—"

আমি চুপ করে থাকি। কী প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত বুঝতে পারি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

না। কিন্তু উত্তরটা পরিস্কার বোঝা গেল।

"ভাবতেই খারাপ লাগছে যদিও, আগেও যেটা বলেছি, তোমাদের এখন কিছুদিন একটু দূরে দূরে থাকাই ভাল", ওশিমা বলে।

"কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি দ্বিতীয়বার আর মানুষটার সঙ্গে দেখা করতে পারব না সম্ভবত—"

"হয়তো সেরকমই দাঁড়াবে", অল্প ভেবে নিয়ে ওশিমা কথাটা মানল। "তবে কিনা, নতুন করে বলার মত কিছু নয় যদিও, সবকিছুই, যতক্ষণ না ঘটতে দেখছি, ততক্ষণ অবধি ঘটেনি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটা খাটে, সব কিছুই দেখে যা মনে হয়, তা আসলে নয়।"

"সাএকি-সানের যে এখন কী মনে হচ্ছে কে জানে!"

চোখ কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকায় ওশিমা। "কী ব্যাপারে?"

"মানে আর কী—আমার সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার দেখা হবে না বুঝতে পারলে, আমার এখন যেরকম লাগছে, সাএকি-সানেরও আমার কথা ভেবে, সেই একইরকম লাগবে কি না?"

ওশিমা স্মিত হাসে। "আমাকে কেন এসব জিজ্ঞেস করছ?"

"আমি যে একেবারেই বুঝতে পারছি না। তাই ওশিমা-সানকে জিজ্ঞেস করছি। এখনও পর্যন্ত যেহেতু কারুকেই এভাবে ভালবেসে চাইতে থাকার অভিজ্ঞতা আর হয়নি। আর এখনও পর্যন্ত, আমাকেও কেউ চাইছে এমন অভিজ্ঞতাও নেই যেহেতু—"

"তাই একটু বিচলিত হয়ে পড়ে, কী করবে বুঝতে পারছ না?"

আমি মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে সায় দিই। "বিচলিত হয়ে পড়ে কী করব বুঝতে পারছি না।"

"তুমি নিজে অপরজনের জন্য একান্ত আন্তরিক ভাবে যে মনোভাব পোষণ করছ, তারও তোমার ব্যাপারে সেরকমই মনোভাব কিনা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেটা তুমি বুঝতে পারছ না", ওশিমা বলে।

আমি মাথা নাড়ি। "সেই নিয়ে ভাবতে শুরু করলে খুবই কষ্ট পেতে হবে।"

কিছুক্ষণ কোনও কথা না বলে ওশিমা চোখ কুঁচকে বনের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাখিরা এ ডাল থেকে ও ডালে ওড়াউড়ি করছে। ওর দুটো হাত ও গলার পেছনে জড়ো করে রেখেছে।

"তোমার এখন কী মনে হচ্ছে, সেটা আমি ভালই বুঝতে পারছি", ওশিমা বলে, "সে যাই হোক না কেন, এটা কিন্তু তোমাকেই নিজে নিজে ভেবে, নিজেকেই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তোমার হয়ে কেউ এটা ভাবতে পারবে না। ভালবাসা মানেই প্রয়োজনে এটা করতে হওয়া, শ্রীমান তামুরা কাফকা। রুদ্ধশ্বাসে চমৎকার সব ভাবনা ভাবা যদি তোমার একার হয়, গভীর অন্ধকারে দিশেহারা হওয়াও তাহলে তোমার একারই। তোমার নিজের দেহে মনে সেটুকু নিতে না পারলে হবে না।"

আড়াইটার সময় ওশিমা গাড়িতে চেপে পাহাড় থেকে নেমে গেল। "টেনেটুনে চালালে, এই খাবারে তোমার হয়তো সপ্তাহ খানিক চলে যাবে। তার মধ্যেই আমি এখানে ফিরে আসব। যদি কোনও পরিস্থিতিতে আসতে পারছি না এমন হয়, দাদাকে খবর দিয়ে আরো খাবার আনিয়ে নেব। ও যেখানে থাকে, হাতে এক ঘন্টা থাকলেও, চলে আসতে পারবে। তুমি যে এখানে আছ সেকথা দাদাকে বলা আছে। তাই চিন্তার কিছু নেই। বুঝলে তো?"

"বুঝেছি", আমি বললাম।

"এছাড়া, যেটা আগেও বলেছি, বনের ভেতরে ঢুকলে ভাল করে খেয়াল রাখবে। একবার রাস্তা হারালে আর বেরোতে পারবে না ওটার থেকে।"

"খেয়াল রাখব"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সামান্য আগের কথা, ঠিক এই অঞ্চলেই সম্রাটের সৈন্যদলের একটা ইউনিট বেশ ব্যাপকভাবে মহড়া দিয়েছিল। সাইবেরিয়ার ঘন অরণ্যে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে একটা যুদ্ধের কথা ভেবে এটা করা হচ্ছিল। সেই গল্প তোমায় বলিনি?"

"না বলেননি", আমি বলি।

"মাঝেমাঝেই যেন জরুরি কথাগুলো বলতে ভুলে যাচ্ছি", আঙুল দিয়ে কপালের সামনে দুটো দিক চেপে ওশিমা বলে।

"যদিও জায়গাটা দেখতে মোটেও সাইবেরিয়ার অরণ্যের মত নয়"

"ঠিকই। এই অঞ্চলে সবই চওড়া পাতাওলা গাছের বন, সাইবেরিয়ার অরণ্যের গাছের পাতা ছুঁচলো। এসব খুঁটিনাটি নিয়ে সৈন্যরা মাথা ঘামায়নি হয়তো। প্রয়োজন ছিল গভীর অরণ্যের মধ্যে ক্রটিহীন ভাবে সশস্ত্র কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধের মহড়া দেওয়া।"

ও থার্মোফ্লাস্ক থেকে আমার তৈরি করা কফি কাপে ঢেলে, তাতে অল্প একটু চিনি দিয়ে, যেন স্বাদটা উপভোগ করছে এভাবে খেতে থাকল।

"মিলিটারির থেকে নোটিস আসায়, আমার ঠাকুর্দার বাবা পাহাড়টা ব্যবহার করতে দিলেন। অনুগ্রহ করে ব্যবহার করুন, এই বলে। পাহাড়টার তো ব্যবহারই হত না। আমরা যে রাস্তায় গাড়ি করে এলাম, মিলিটারির ইউনিটটা সেই রাস্তায়ই হেঁটে এসেছিল। তারপর বনে মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরে মহড়া চলার পর, নামের তালিকা ধরে ডাকতে গিয়ে দেখা গেল দু'জন সৈনিক নেই। দু'জনে বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সময়, সশস্ত্র অবস্থায় উধাও হয়ে যায়। দুজনেই সদ্যনিযুক্ত নতুন সৈনিক। মিলিটারি থেকে অবশ্যই ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়েছিল, কিন্তু দু'জনকে শেষ অবধি আর পাওয়া যায়নি।"

ওশিমা আবার কফিতে একটা চুমুক দেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল কিনা, অথবা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল কিনা, আজ অবধিও জানা যায়নি। কিন্তু এই অঞ্চলে বন খুবই গভীর, বনের মধ্যে খাওয়ার মত তেমন কিছু নেই।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"এই যে জগৎটাতে আমরা বাস করি, এরসঙ্গেই আরেকটা জগৎ সর্বদাই রয়ে গেছে। তুমি কিছুটা পর্যন্ত ওখানে পদার্পণ করতে পার। ওখান থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে আবার ফিরেও আসতে পার। সাবধান থাকলে। কিন্তু একটা মাত্রা অতিক্রম করে গেলে ওখান থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না। ফেরার রাস্তা জানা থাকে না। সে এক গোলকধাঁধা। গোলকধাঁধা জিনিসটার ধারণা কোত্থেকে এসেছে জান তো?"

আমি মাথা নাড়ি।

গোলকধাঁধার আইডিয়াটা সর্বপ্রথম মাথায় এসেছিল, এখন অবধি যা জানা গেছে, অতীতযুগের মেসোপটেমিয়ার লোকেদের। ওরা পশুদের নাড়িভুড়ি, কিংবা হয়তো কখনও মানুষের নাড়িভুড়ি বের করে এনে, সেটার অবয়বের ধরণটা থেকে ভাগ্যগণনা করত। আর সেই জটিল ধরণটার খুব কদর করত। অতএব গোলকধাঁধার ভিত্তি হচ্ছে নাড়িভুড়ি। অর্থাৎ কিনা, গোলকধাঁধা জিনিসটার সূত্রটা তোমার ভেতরেই আছে। আর সেটাই হয়ে যাচ্ছে তোমার বাইরের ওই গোলকধাঁধা জিনিসটা।"

"মেটাফর", আমি বলি।

"একেবারেই। পারস্পরিক মেটাফর। তোমার বাইরের জিনিসগুলো তোমার ভেতরের জিনিসগুলোর ইমেজ, আর তোমার ভেতরের জিনিসগুলো তোমার বাইরের জিনিসগুলোর প্রতিমূর্তি। সেই কারণে, অনেক সময়ই তুমি তোমার বাইরে থাকা গোলকধাঁধায় পা বাড়িয়ে, তোমারই ভেতরে সেট করা গোলকধাঁধায় পদার্পণ করছ। বহু ক্ষেত্রেই সেটা বেশ বিপজ্জনক।"

"হ্যানসেল আর গ্রেটেলের বনের মধ্যে প্রবেশ করার মত?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। হ্যানসেল আর গ্রেটেলের মত। বনের মধ্যে ফাঁদ পাতছে। তুমি যত সাবধানেই বানাও না কেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাখিরা এসে রুটির গুঁড়োর চিহ্ন দিয়ে রাখলে, তা খেয়ে যাবে—"

"খেয়াল রাখব", আমি বলি।

ওশিমা রোডস্টারের ওপরটা নামিয়ে ওপেন করে দিয়ে, ড্রাইভারের সীটে চেপে বসল। সানগ্লাসটা পরে নিয়ে, শিফট নবে হাত রাখল। তারপর অতিপরিচিত ইঞ্জিনের আওয়াজ বনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল। সামনের চুলগুলো আঙুল দিয়ে পেছনে ঠেলে দিয়ে, ছোট করে হাত নেড়ে, চলে গেল। কিছুক্ষণের জন্য রাস্তার ধুলোর একটা নৃত্য তৈরি হয়েছিল বটে, অল্প সময়ের মধ্যেই বাতাস এসে সেটাকে কোথায় নিয়ে চলে গেল।

আমি কেবিনে ঢুকে, একটু আগে ওশিমা যে বিছানায় ঘুমুচ্ছিল সেখানে শুয়ে পড়ে, চোখ বুজলাম। ভেবে দেখলে আমিও গত রাতে তেমন একটা ঘুমোইনি। বালিশে, তোষকে ওশিমার উপস্থিতির রেশটুকু অনুভব করলাম। না, এটা ওশিমার রেশের চেয়েও বরং ওশিমা যে ঘুমোচ্ছিল সেটারই রেশ বলা ভাল। সেই রেশের মধ্যে আমি নিজের শরীরটাকে ডুবিয়ে দিলাম। তিরিশ মিনিট মত ঘুমোনোর পরে, কেবিনের বাইরে দমাস করে একটা বড়রকম আওয়াজ হল। গাছপালার ডাল, কিছু একটার ভার রাখতে না পেরে ভেঙে, মাটিতে পড়ার আওয়াজ। সেই আওয়াজে আমি চোখ খুলে ফেললাম। উঠে পড়ে, বেরিয়ে পর্চে এসে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু যতদূর চোখ যায়, কোথাও কিছু হয়নি তো, সব একইরকম আছে! হয়তো বনের মধ্যে যে কখনো কখনো রহস্যজনক আওয়াজ ওঠে, সেরকমই কিছু। নইলে ওটা আমার ঘুমের মধ্যে ঘটা আওয়াজও হতে পারে। দুটোর মধ্যে প্রভেদ করতে পারছি না।

ওই অবস্থায় পর্চে বসে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া পর্যন্ত বই পড়লাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অল্পকিছু খাবার তৈরি করে নিয়ে, চুপচাপ বসে খেয়ে নিলাম। বাসনপত্র গুছিয়ে রাখার পরে পুরনো সোফাটায় শরীর ডুবিয়ে দিয়ে, সাএকি-সানের কথা ভাবতে থাকলাম।

"ওশিমা যা বলল, তাতে সাএকি-সান বেশ বুদ্ধিমতী মহিলা। আর নিজস্ব একটা স্টাইলও আছে", কারাসু বলে ছেলেটা বলে উঠল।

ও সোফাতে আমার পাশেই বসে। বাবার স্টাডিতে যেভাবে বসেছিল, সেভাবেই।

"উনি তোমার থেকে অনেকটাই আলাদা", ও বলল।

উনি তোমার থেকে অনেকটাই আলাদা। এখন অবধি সাএকি-সান নানারকম পরিস্থিতি—সেগুলোও আবার খুব একটা সাধারণ বলে বলা যাবে না—পার হয়ে এসেছেন। উনি এমন অনেক কিছু জানেন, যা তোমার জানা নেই, এমন অনেক আবেগানুভূতির অভিজ্ঞতা ওঁর আছে, যা তোমার অনাস্বাদিত। মানুষের জীবনের পথে কোনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফারাক করতে পারেন। এখন অবধি বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে, তার মাধ্যমে যেসব ফললাভ করেছেন, সেগুলোও ওঁর দেখা আছে। কিন্তু তোমার তো তা নয়। তাই না? সেখানে তুমি, একটা ছোট জগতের সীমিত অভিজ্ঞতার একা একটা ছেলের বেশি কিছু নও। তুমি খুবই চেষ্টা করে এসেছ শক্তিশালী হয়ে ওঠার। আর কিয়দংশে প্রকৃতই শক্তিশালী হয়েছ। সেটুকু মেনে নিতেই হয়। কিন্তু এই নতুন জগতে, নতুন পরিস্থিতিতে, তুমি যথারীতি দিশেহারা হয়ে পড়েছ। কারণ, এগুলো সবকিছুই তোমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

তুমি দিশেহারা হয়ে পড়েছ। মহিলাদের যৌন বাসনা আছে কিনা সেটাও ভাল বুঝে উঠতে যে পার না, সেও একটা সমস্যা। তত্ত্বগত ভাবে ভাবলে, মেয়েদেরও অবশ্যই যৌন বাসনা থাকার কথা। সেটুকু তুমিও জান। কিন্তু সেটার স্বরূপটা আদৌ কীরকম, প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিটা কেমন, এসব কথা উঠলেই তুমি একেবারেই কোনও আন্দাজ পাও না। তোমার নিজের যৌন বাসনার ব্যাপারটা, তুমি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

সহজেই বুঝতে পার। খুবই সিম্পল ব্যাপার। কিন্তু মহিলাদের যৌন বাসনার ব্যাপারে, বিশেষ করে সাএকি-সানের যৌন বাসনার ব্যাপারে, তোমার কোনও ধারণাই নেই। তোমাকে জড়িয়ে ধরে তোমার মতোই শারীরিক তৃপ্তি উনি অনুভব করেন কিনা? না কি, তোমার অনুভূতির চেয়ে সেটার প্রকৃতি একেবারেই আলাদা?

যতই ভাব, তোমার নিজের বয়েস যে পনেরো বছর, সেটা ভেবেই হয়রান হয়ে যাও—হতাশাগ্রস্তই হয়ে পড়। যদি বয়েসটা কুড়ি বছর হত, এমনকি আঠারো বছর হলেও হয়, কেবল পনের না হলেই হল, তাহলেই তুমি সাএকি-সান মানুষটাকে, ওঁর কথাগুলোকে, ওঁর প্রতিটি কাজের অর্থ সঠিক বুঝতে পারার মত হতে। তখন ওগুলোতে আরো সঠিক ভাবে সাড়া দিতে পারতে। এখন তুমি খুব চমৎকার সব ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে আছ। সামনের দিনগুলোতে এরকম চমৎকার কিছু দ্বিতীয়বার ফের আসবে কিনা কে জানে। এতটাই চমৎকার। তার ওপরে সেই চমৎকারিত্ব তুমি যথেষ্ট বুঝতেও পার না। সেই অধীর আকুলতা তোমাকে আরো মরীয়া করে তুলছে।

তুমি কল্পনা করার চেষ্টা করছ, উনি এখন কী করছেন। আজ সোমবার, লাইব্রেরি বন্ধ। এই ছুটির দিনে সাএকি-সান আদৌ করছেনটা কী? কল্পনা করছ যে উনি ঘরে একা রয়েছেন। উনি জামাকাপড় ধুচ্ছেন, রান্না করছেন, কেনাকাটা করতে বেরোচ্ছেন, এইসব দৃশ্য কল্পনা করছ। যতই কল্পনা কর, তুমি নিজে যে এখানে আছ, সেটা অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। তুমি এক অসমসাহসী কাক হয়ে গিয়ে এই কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে চাও। আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, ওঁর ঘরের বাইরে এসে থেমে, সেখানে ওঁকে অনন্তকাল দেখে যেতে চাও বলে তোমার মনে হচ্ছে।

নয়তো সাএকি-সান লাইব্রেরিতে এসে তোমার ঘরে দেখতে এসেছেন হয়তো। দরজায় টোকা দিলেন। কোনও সাড়া নেই। দরজায় তালা লাগানো নেই। আর উনি আবিষ্কার করলেন যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুমি ওখানে নেই। মালপত্রও রেখে যাওনি। বিছানা সুন্দর করে পাতা আছে। তুমি কোথায় যেতে পার সেটা উনি ভাবতে থাকলেন। কিছুক্ষণ তোমার ফেরার অপেক্ষায় রইলেন হয়তো ঘরের মধ্যে। সেই সময় হয়তো ডেস্কের সামনে চেয়ারটায় বসে হাতে চিবুকের ভর রেখে, 'সমুদ্রতটে কাফকা'-র দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতীতের যে সময় ওতে ধরা আছে, সেটার কথা ভাবলেন। কিন্তু যতই অপেক্ষা করুন না কেন, তুমি ফিরলে না। অল্প পরে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পার্কিং লটে গিয়ে, ফোকস ওয়াগেনে চেপে বসে, ইঞ্জিন চালু করলেন। তুমি ওঁকে ওভাবে ফিরতে দিতে চাও না। ওখানে তুমি ছিলে, উনি আসায় ওঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে, ওঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন আলাদা আলাদা করে চিনতে চাও। কিন্তু তুমি তো ওখানে নেই। তুমি সব্বার থেকে বিচ্ছিন্ন এক জায়গায় একেবারে একা।

তুমি বিছানায় গিয়ে, আলো নিভিয়ে, মনে মনে কামনা করলে সাএকি-সান যাতে সেই ঘরে আবির্ভূত হন। সত্যিকারের সাএকি-সান না হলেও চলবে। সেই পনের বছরের মেয়েটার রূপ ধরে হলেও হয়। যেকোনো রূপ ধরেই হোক না কেন, মূর্তিমতী আত্মাই হোক বা দৃষ্টিবিভ্রমই হোক, ওঁকে স্বচক্ষে দেখতে চাও। ওঁকে পাশে আসতে অনুরোধ জানালে। তোমার মন জুড়ে তখন সেই আকুতি। শরীরটা যেন খানখান হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যতই আকুলভাবে অপেক্ষা কর না কেন, উনি এলেন না। কেবল জানালার বাইরে মৃদু বাতাসের শব্দ শোনা গেল। আর মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির ক্ষীণ ডাক। তুমি শ্বাস চেপে, অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। বাতাসের আওয়াজে কান পাতলে। ওটার মধ্যে কী যেন একটা অর্থ ধরতে চাইছ। কী যেন একটা সংকেত টের পেতে চাইছ। অথচ তোমার চারপাশে কেবল কয়েক ধাপ অন্ধকার। হাল ছেড়ে দিয়ে, তুমি চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৮

ঘরে একটা টাউন-পেজ ছিল, ওটার মধ্যে রেন্টাল-কার অফিস খুঁজে খুঁজে, উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে, হোশিনো সেখানে ফোন করল।

"সাধারণ একটা সেডান হলেই চলবে, তবে দু-তিন দিনের জন্য হয়তো ভাড়া করব। তেমন বড় কিছু না হয়ে, সম্ভব হলে, চোখে পড়ার মত নয় এমন হলেই ভাল হয়।"

"দেখুন, স্যার", ওদিক থেকে বলে, "আমাদের রেন্টাল-কার কোম্পানি মাজদা ভাড়া দেয়। কী বলব, চোখে পড়ার মত সেডান আমাদের একখানাও নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"ভালই হল।"

"ফ্যামিলিয়া হলে অসুবিধে নেই তো? ভরসা করার মত গাড়ি, শিন্তো-বৌদ্ধ দুই ধর্মের দিব্যি, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, কারুর চোখে পড়ার মত নয়।"

"হুঁ, তাহলে তো ঠিকই আছে। ফ্যামিলিয়াতেই হবে", অফিসটা স্টেশনের কাছেই, আর ঘন্টা খানিকের মধ্যেই আনতে যাবে বলে তরুণ বলে দিল।

ও একাই ট্যাক্সিতে চেপে গিয়ে, ক্রেডিট কার্ড আর লাইসেন্স দেখিয়ে, আপাতত গাড়িটা দু'দিনের জন্য ভাড়া করল। পার্কিং লটে দাঁড় করানো সাদা ফ্যামিলিয়া, সত্যিই চোখে পড়ার মত কিছু নয়। একেবারেই অজ্ঞাতপরিচয় পর্যায়ের বলে গণ্য হওয়ার মত বলেই দেখে মনে হয়। অন্যদিকে তাকিয়ে বলাই যাবে না ঠিক কেমন দেখতে।

ফ্যামিলিয়া চালিয়ে বাড়িতে ফিরে আসার পথে বইয়ের দোকানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঢুকে, তাকামাৎসু শহরের ম্যাপ আর শিকোকুর রোডম্যাপ কিনে নিল। কাছেই একটা সিডির দোকান চোখে পড়ে যাওয়ায়, দাঁড়িয়ে পড়ে, বিঠোফেনের 'তাইকোও ট্রায়ো' আছে কিনা খোঁজ করল। রাস্তার ধারের সিডির দোকানের ক্লাসিকাল মিউজিকের কাউন্টার তেমন বড় কিছু নয়, সেখানে 'তাইকোও ট্রায়ো' একটাই সুলভ মূল্যের ডিস্ক ছিল। দুঃখের বিষয়, মিলিয়ন ডলার ট্রায়োর বাজনা নয়, তরুণ ওটা কিনল ১০০০ ইয়েনে।

ঘরে ফিরে দেখে, নাকাতা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে, অভ্যস্ত দক্ষতায় মুলো আর তোফু ভাজা দিয়ে স্টু তৈরি করছে। ঘরে একটা মনোরম গন্ধ ছেয়ে আছে। "অবসর পেয়ে নাকাতা এটা ওটা দিয়ে রান্না করছে", নাকাতা বলে।

"ভালো তো, এযাবৎ তো কেবলই বাইরে খাওয়া হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে একটু সাধারণ ঘরোয়া রান্না খেতে মন চাইছিল", তরুণ বলল। "এদিকে তো, কাকু, গাড়ি ভাড়া করে এনেছি। বাইরে দাঁড় করানো আছে। এবার কি দেরি না করে কাজে লাগাব?"

"না, সেটা কাল হলেও চলবে। আজ পাথরমশাইয়ের সঙ্গে আরেকটু কথাবার্তা বলে নেব বলে ভাবছি।"

"হুঁ, সে ঠিক আছে। কথা বলে নেওয়াটা খুব জরুরি। যার সঙ্গেই হোক, যে কোনও কিছুর সঙ্গেই হোক, কথা না বলার চেয়ে কথা বলে নেওয়াই ভাল। আমিও ট্রাক চালানোর সময়, ইঞ্জিনের সঙ্গে অনেক কথা বলি। মন দিয়ে কান পেতে শুনলে, নানা কিছু শুনতে পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ। নাকাতারও তাই মনে হয়। নাকাতা অবশ্য ইঞ্জিনমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, তবে যে কারুর সঙ্গেই কথা বলে নেওয়া ভাল।"

"তাহলে, পাথরটার সঙ্গে কথায় কি খানিকটা অগ্রগতি হল?"

"হ্যাঁ, একটু একটু করে ভাবসাব হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তবে তো আর কথাই নেই। আচ্ছা, নাকাতা-সান, আমরা যে পাথরমশাইয়ের মত না নিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এলাম, তাতে রেগে যাননি তো, অসন্তুষ্ট হননি তো?"

"না। সেরকম কিছু হয়নি। নাকাতা যা বুঝলো, তাতে পাথরমশাই বোধহয় জায়গা নিয়ে আলাদা করে মাথা ঘামাচ্ছেন না।"

"তবে তো ভালই", শুনে তরুণ আশ্বস্ত হয়। "এর ওপর যদি পাথরেরও অভিশাপ নিতে হয়, তাহলে আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।"

সন্ধ্যে অবধি তরুণ কিনে আনা 'তাইকোও ট্রায়ো' শুনে কাটিয়ে দিল। মিলিয়ন ডলার ট্রায়োর মত অত চোখধাঁধানো আর সাবলীল বাজনা নয়, বলতে হয়, অনাড়ম্বর আর সুঠাম বাজনা, তবে নিকৃষ্ট কিছু নয়। সোফায় শুয়ে পিয়ানো আর তারযন্ত্রের সুরসমন্বয় নিবিষ্ট হয়ে শুনল। গভীর সৌন্দর্যমন্ডিত সেই সুর ওর বুকের অন্তঃস্থলে গিয়ে ফ্যুগুর সূক্ষ্ম বেণীবিন্যাস ধ্বনিয়ে তুলল।

একসপ্তাহ আগেও, আমি এই মিউজিক শুনে কণামাত্রও বুঝতে পারতাম না হয়তো, বলে তরুণের মনে হল। বোঝার চেষ্টা করা যাক বলেই মনে হত না হয়তো। কিন্তু, কী মনে করে হঠাৎ করেই ঘটনাচক্রে ওই ছোট্ট চা-কফির দোকানে ঢুকে পড়ে, বসেও আরাম এমন একটা সোফায় বসে বেশ স্বাদু কফি খেয়ে, ভাগ্যের কৃপায় এই মিউজিকটা স্বাভাবিকভাবেই নিতে সক্ষম হয়ে পড়ল। এটা ওর কাছে বেশ একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলেই ঠেকল।

নিজের অর্জিত এই নতুন ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নিতে ও ঐ সিডিটা বারবারই শুনল। সিডিটাতে 'তাইকোও ট্রায়ো' ছাড়াও, ওই একই কম্পোজারদের সৃষ্ট 'ইউরেই ট্রায়ো'[1] নামে একটা পিয়ানো ট্রায়োও ছিল। সেই নাম্বারটাও খারাপ নয়। কিন্তু, যা হয় আর কি, তরুণের যথারীতি 'তাইকোও ট্রায়ো'টাই বেশি পছন্দ হল। এটায় অনেক গভীরতা আছে। ততক্ষণ নাকাতা ঘরের কোণে বসে, গোল আর সাদা পাথরটাকে উদ্দেশ্য করে কী যেন বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল। মাঝেমাঝে মাথা সামনে ঝোঁকাচ্ছিল আর হাতের তালু মাথায় বুলিয়ে যাচ্ছিল। দু'জনে, একই ঘরের মধ্যে,

[1]ইউরেই হল ভুত বা অশরীরী আত্মা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজের নিজের কর্মপ্রক্রিয়ায় ডুবে রয়েছে।

"বাজনাটার জন্য পাথরমশাইয়ের সঙ্গে কথায় ব্যাঘাত হচ্ছে না তো?" তরুণ নাকাতাকে উদ্দেশ্য করে বলে।

"না না, অসুবিধে হচ্ছে না। গানবাজনায় নাকাতার কোনও ব্যাঘাত হয় না। গানবাজনা নাকাতার কাছে বাতাসের মত—"

"আচ্ছা", হোশিনো বলে, "বাতাসের মত?"

ছ'টা বাজতেই, নাকাতা ডিনারের আয়োজন করল। স্যামন বেক করে, ভেজিটেবল স্যালাড বানাল। বানিয়ে রাখা স্টু খানিকটা প্লেটে ঢালল। হোশিনো টিভি অন করে নিউজ দেখল। নাকানো ওয়ার্ডের রহস্যজনক খুনের ঘটনার তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়েছে কিনা, সেটা একবার নাকাতার মনে এসেছিল বটে, কিন্তু সেই নিয়ে কোনও কথাই উঠল না। শিশুকন্যা অপহরণ, ইজরাইল ও প্যালেস্টাইনের পারস্পরিক আঘাত-প্রত্যাঘাত, দক্ষিণ-পশ্চিম হোনশুতে গাড়ি চলার রাস্তায় ঘটা এক বিশাল ট্র্যাফিক-অ্যাক্সিডেন্ট, এক বিদেশির নেতৃত্বে গাড়ি চুরির চক্র, ক্যাবিনেট মিনিস্টারের বৈষম্যমূলক ভাষা প্রয়োগ, তথ্যশিল্প সংক্রান্ত বৃহৎ উদ্যোগে লে-অফ, কেবল এইসব নিয়ে প্রতিবেদন। একটা খবর নেই যেটা শুনে ভাল লাগে।

দুজনে টেবিলের দু'ধারে বসে খাওয়া দাওয়া করল।

"হুম, দারুন খেতে হয়েছে তো", হোশিনো তারিফ করে বলে। "কাকুর দেখছি বেশ এলেম আছে রান্নাবান্নায়!"

"ধন্যবাদ। তবে নাকাতার তৈরি খাবার, এই প্রথম এভাবে কেউ অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলেন।"

"কাকুর সঙ্গে বসে ভাত খাওয়ার মত বন্ধু বা পরিবারের কেউ ছিল না?"

"হ্যাঁ। বেড়াল ছিল। তবে বেড়াল যা খায় আর নাকাতা যা খায়, তা একেবারেই আলাদা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ, সে তো বটেই", তরুণ বলে। "তবে, যে যাই হোক, খুব ভাল খেতে হয়েছিল। বিশেষ করে এই স্টু-টা।"

"ভাল যে লেগেছে এটাই সবচেয়ে ভাল। পড়তে পারে না বলে নাকাতা একেক সময় বিদঘুটে সব ভুল করে বসে। সেই সময় বিদঘুটে সব জিনিস করে ফেলে। তাই সবসময় কেবল একই জিনিস দিয়ে নাকাতা একই রান্না করে রাখে। পড়তে পারলে, নাকাতা আরো নানারকম খাবার বানাতে পারবে।"

"কিন্তু আমার এতে কোনওরকম অসুবিধে হয়নি।"

"হোশিনো-সান", নাকাতা টানটান হয়ে সিরিয়াস গলায় বলে।

"কী হয়েছে?"

"না পড়তে পারাটা, বড় কষ্টের—"

"সম্ভবত ঠিকই বলছেন", তরুণ বলে। "তবে এই সিডিটাতে বলছে যে বিঠোফেন কানে শুনতে পেতেন না। বিঠোফেন ছিলেন খুব বড় কম্পোজার, অল্প বয়েসে পিয়ানোবাদক হিসেবেও ইয়োরোপে ওঁকে একনম্বর বলে বলা হত। কন্ডাকটার হিসেবেও বিশাল নামডাক হয়েছিল ওঁর। কিন্তু একদিন, কী একটা অসুখে বধির হয়ে গেলেন। প্রায় কিছুই শুনতে পেতেন না। কম্পোজারের পক্ষে কানে শুনতে না পাওয়া ভীষণ মুশকিলের ব্যাপার। বুঝতে পারছেন তো?"

"হ্যাঁ, কিছু একটা বুঝলাম বলেই মনে হচ্ছে—"

"কম্পোজারের কানে শুনতে না পাওয়াটা, হচ্ছে রাঁধুনির জিভে স্বাদ চলে যাওয়ার মত। ব্যাঙের জন্য আর জলাভূমি না থাকার মত। দূরপাল্লার ট্রাকের ড্রাইভারের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার মত। যে কেউই চোখে অন্ধকার দেখবে। ঠিক কি না? কিন্তু বিঠোফেন হাল ছাড়েননি। একটু হয়তো দমে গিয়েছিলেন, এই দুর্ভাগ্যের কাছে হার স্বীকার করেননি। বাধা এসেছে, দেখি তো কতটুকু বাধা—এরকম মনোভাব নিয়ে। এর পরেও আরো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কম্পোজ করতে থাকলেন, আগের চেয়েও গভীরতাপূর্ণ, দারুণ সব সংগীত সৃষ্টি করতে থাকলেন। চাট্টিখানি কথা নয়। এই যেমন, যেটা একটু আগে শুনছিলাম, 'তাইকোও ট্রায়ো'র কথাই ধরুন না কেন, কানে যখন আর যথেষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না, তার পরে কম্পোজ করেছিলেন এটা। তাই বলছি, কাকু যে বলছিলেন যে পড়তে পারেন না, সেটা অবশ্যই বেশ অসুবিধেজনক, কষ্টেরও, কিন্তু সেটুকুই সব নয়। কাকু পড়তে না পারলেও, একমাত্র কাকুই পারেন এমন কিছুও কাকুর আছে। সেদিকটাও তো দেখতে হবে। যেমন দেখুন, কাকু এমনকি পাথরের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। একথা ঠিক যে নাকাতা পাথরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে, আগে বেড়ালমশাইদের সঙ্গেও কথা বলতে পারত।"

"সম্ভবত একমাত্র নাকাতা-সানই এটা পারেন। যতই এত এত বই পড়ুক না কেন, সাধারণ লোক পাথর কিংবা বেড়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।"

"কিন্তু হোশিনো-সান, নাকাতা আজকাল খুব স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে নাকাতা পড়তে পারে। একটা কী যেন অতিরিক্ত এসে গিয়ে, যেন পড়তে পারছে। নাকাতার বুদ্ধিশুদ্ধি আর তত নিরেস নেই। নাকাতা উল্লসিত হয়ে, লাইব্রেরিতে এসে, এত্তো এত্তো বই পড়ছে। বই পড়তে পারাটা যে কী চমৎকার ব্যাপার সেটাই ভাবছি। একের পর এক বই পড়ে যাচ্ছি। যাই হোক, এমন সময় হঠাৎ করেই ঘরের আলোটা নিভে গিয়ে সব অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ একটা আলো নিভিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছুটি দেখা যাচ্ছে না। বইও আর পড়তে পারছি না। সেখানেই ঘুম ভেঙে গেল। যদিও স্বপ্নের মধ্যে, তবু অক্ষর পড়তে পারা, বই পড়তে পারা এক চমৎকার জিনিস!"

"হুম্", তরুণ বলে। "আমি যদিও অক্ষর পড়তে পারি, বই পড়ার আদত নেই। জগতের ব্যাপারস্যাপারই এরকম ছন্নছাড়া।"

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলে ওঠে।

"কী, বলুন?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আজ কী বার?"

"আজ শনিবার না?"

"আগামিকাল কি রোববার?"

"সাধারণত সেরকমই তো হয়—"

"আগামিকাল সকাল থেকে গাড়ি চালিয়ে রওনা দেওয়া যাবে?"

"তা যাবে, কিন্তু যাবটা কোথায়?"

"সেটা নাকাতাও জানে না। গাড়িতে উঠে ভাবব।"

"বিশ্বাস করবেন না হয়তো", তরুণ বলে। "আমি জানতাম এই উত্তরটাই আসবে।"

পরদিন সকাল সাতটার পরে তরুণের ঘুম ভাঙল। নাকাতা তার আগেই উঠে পড়ে, রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রেকফাস্টের আয়োজন করছিল। তরুণ বাথরুমে গিয়ে ঠান্ডাজলে ভাল করে মুখ ধুয়ে, ইলেক্ট্রিক শেভার দিয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল। গরম ভাত, বেগুন দিয়ে মিসোশিরু, ম্যাকারেলের শুঁটকি আর আচার দিয়ে ব্রেকফাস্ট। তরুণ আরেকবার ভাত নিল।

খাওয়া হয়ে গেলে পর, নাকাতা যখন গোছগাছ করছে, তরুণ আবার টিভির নিউজ দেখতে বসল। এবার নাকানো ওয়ার্ডের খুনের ঘটনার রিপোর্টিং একটুখানি ছিল। "ঘটনা ঘটার পর দশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, এখনও তেমন জোরালো সূত্র হদিস করা যায়নি", NHK[†]-র অ্যানাউন্সার নির্বিকার ভাবে বলে যাচ্ছিল। টিভির স্ক্রীনে তখন চমৎকার গেট সহ বাড়িটা দেখানো হচ্ছিল। গেটের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশে বাধা দিতে 'রোপ' টাঙানো রয়েছে। "ঘটনার অব্যবহিত আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া পনের বছরের জ্যেষ্ঠপুত্রের খোঁজ চলছে, এখনও গতিবিধির হদিস করা যায়নি। এছাড়াও, ঘটনার অব্যবহিত পরেই

[†]নিহোন হোওসোও কিওকাই হচ্ছে রেডিও জাপান

এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুলিশ পোস্টিং-এ এসে খুনের ঘটনার খবর দিতে চেয়েছিলেন কাছাকাছিই বাস করেন এমন এক ষাটোর্দ্ধ ব্যক্তি, তারও খোঁজ চলছে। এই দু'জনের মধ্যে কোনওরকম সম্পর্ক আছে কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। যেহেতু বাড়ির ভেতরে কোনওরকম ক্ষতিসাধনের সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই অপরাধ কিনা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, অপরাধের শিকার তামুরা-সানের পরিচিত ও বন্ধুদের ব্যাপারেও পুলিশ বিশদে খোঁজ নিচ্ছে। জীবিতাবস্থায় তামুরা-সানের শিল্পকীর্তির প্রশংসা করে টোকিওর জাতীয় আর্ট গ্যালারির—"

"এই যে, কাকু", রান্নাঘরে দাঁড়ানো নাকাতাকে উদ্দেশ্য করে তরুণ বলে ওঠে।

"হ্যাঁ। কী হয়েছে?"

"কাকু কি, নাকানো ওয়ার্ডে খুন হওয়া লোকটার ছেলেকে চেনেন? বলছে যে মাত্র পনের বছর বয়েস!"

"ছেলেটির কথা নাকাতা জানে না। নাকাতা চেনে শুধু, আগেও যেটা বলেছি, জনি ওয়াকার-সান আর কুকুরটাকে।"

"হুম্", তরুণ বলে। পুলিশ, মনে হচ্ছে, কাকুকে ছাড়াও, সেই ছেলের হদিস করার চেষ্টা করছে। একই ছেলে, ভাইবোন নেই। মা-বাবাও নেই। ছেলেটাও ঘটনার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে, নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?"

"ঘটনাটা ভাল বুঝতে পারছি না", তরুণ বলে। "তবে পুলিশ অনেক কিছুই জানে। তাদের থেকে খুব সামান্যই খবর পাওয়া যাচ্ছে। কর্নেল স্যান্ডার্স যা বললেন, তাতে, ওরা এটুকু জানে যে কাকু এখন তাকামাৎসুতে। আর এই হোশিনো-কুনের মত একজন হ্যান্ডসাম তরুণ যে কাকুর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে এটাও ওরা জানে। কিন্তু অতকিছু মাস-কমিউনিকেশন মিডিয়ার কাছে ফাঁস করেনি। কারণ, ওরা যে জানে যে আমরা তাকামাৎসুতেই রয়েছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেটা বাইরে লোকের কাছে ফাঁস করে দিলে, আমরা আবার অন্য কোথাও পালাব বলে ভাবছে। তাই বাইরে ভাবখানা করছে এমন, যেন আমরা কোথায় সেটা ওরা জানে না। খুব খারাপ স্বভাবের লোক এরা।"

সাড়ে আটটায় দুজনে, সামনের রাস্তায় দাঁড় করানো ফ্যামিলিয়াতে চড়ে বসল। নাকাতা গরম হোজি-চা বানিয়ে, সেটা থার্মোফ্লাস্কে ভরে নিল। আগাগোড়া কোঁচকানো মোচকানো হয়ে থাকা পর্বতারোহণের টুপি পরে নিয়ে, ছাতা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে, গাড়িতে হেল্পারের সীটে গিয়ে বসে পড়ল। তরুণ হোশিনো যথারীতি চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপিটা পরে নিতে গেল, কিন্তু ঢোকার মুখের দেওয়ালে ঝোলান আয়নায় চোখ পড়তেই চমকে গিয়ে ওর খেয়াল হল—পুলিশের কাছে তো এই তথ্য আছে যে সেই 'অল্পবয়েসি ব্যক্তিটি' চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপি, সবুজ রে-ব্যান সানগ্লাস আর আলোহা শার্ট পরে। একে তো চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপি পরা লোক কাগাওয়া জেলায় খুব একটা কেউ নেই, তার ওপর আলোহা শার্ট আর সবুজ রে-ব্যান যোগ হলে, চোখ টানার মত বৈশিষ্ট্য হয়ে চোখে পড়বে। সেটা ভেবেই কর্নেল স্যান্ডার্স, আলোহা শার্টের বদলে, মামুলি নেভি-ব্লু পোলো শার্টের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ভুল করার লোক তিনি নন। রে-ব্যান আর টুপি ও ঘরে রেখে যাওয়াই স্থির করল।

"বলুন, কোথায় যেতে হবে", তরুণ জানতে চায়।

"যে কোনও জায়গায়। শহরের ভেতরেই পাক খেতে থাকুন না—"

"যে কোনও জায়গায়?"

"হ্যাঁ। হোশিনো-সানের যেখানে পছন্দ। নাকাতা জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে থাকবে।"

"একী রে বাবা", হোশিনো গজগজ করতে থাকে, "আমি সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সে, ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানিতে টানা ড্রাইভারের কাজ করে গেছি। গাড়ি চালানোয় কিছুটা আত্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু স্টিয়ারিং-এ হাত রাখলে, চিরকাল কোথাও একটা যাওয়ার ছিল।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একেবারে সরলরেখা বরাবর গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যেতাম। এভাবেই চলে এসেছে। 'সুবিধেমত যেকোনও জায়গায় গেলেই চলবে'—এ কিন্তু একবারও কেউ বলেনি। এরকম বললে তো দিশেহারা হয়ে পড়ব!"

"আমি দুঃখিত।"

"আরে ঠিক আছে, মাফ চাওয়ার কিছু নেই। যেভাবেই হোক, যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখা যাক", হোশিনো বলে। বলে, 'তাইকো ট্রায়ো' কার-স্টিরিওর সিডি প্লেয়ারে ভরে দেয়। "আমি শহরের যেখানে সেখানে পছন্দমত চক্কর মারছি, আর কাকু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকবেন। তাহলেই হবে তো?"

"হ্যাঁ, সে-ই যথেষ্ট।"

"যেটা খুঁজছেন, সেটা দেখতে পেলে গাড়ি সেখানে থামাব। আর কাহিনীতেও মসৃণভাবে একটা নতুন পর্যায় আসবে। তাই তো?"

"হ্যাঁ। সেরকমই ঘটবে হয়তো", নাকাতা বলে।

"সেরকম হলেই তো ভাল", এই বলে তরুণ হোশিনো শহরের ম্যাপটা খুলে হাঁটুর ওপর পেতে রাখল।

দুজনে তাকামাৎসু শহরটা ঘুরল। তরুণ হোশিনো শহরের ম্যাপে মার্কার দিয়ে চিহ্ন দিয়ে গেল। একটা ব্লকের আনাচে কানাচে সর্বত্র ঘুরে, সবগুলো রাস্তায় চালিয়েছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিয়ে, পরের ব্লকটায় চলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে হোজি-চা খেয়ে নিয়ে, মার্লবরো টানল। বারবার ফিরে ফিরে 'তাইকোও ট্রায়ো' শুনল। দুপুরে খাবার সময় এলে, রেস্তোরাঁয় ঢুকে কারে-রাইস[1] খেল।

"কিন্তু, নাকাতা-সান আদপে কী ধরণের জিনিসের সন্ধানে আছেন?" খাওয়া দাওয়ার পর তরুণ জিজ্ঞেস করে দেখল।

[1]সম্ভবতঃ কারি-রাইসকেই ওভাবে উচ্চারণ করা হয়। ওখানে অনেকেরই ধারণা যে খাবারটা ভারতীয় একটা পদ। তবে ভারতীয় মাংসের ঝোল-ভাত জিনিসটার স্বাদ রন্ধন-প্রণালী একেবারেই আলাদা।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

"সে তো নাকাতারও জানা নেই। সেটা—"

"—প্রকৃত জিনিসটা চোখে পড়লে বুঝতে পারব। যতক্ষণ না চোখে পড়ছে, জানা নেই।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।"

তরুণ শিথিল ভাবে মাথা নাড়ে। "প্রথম থেকেই জানা ছিল উত্তরটা। কেবল এখনকার মত যাচাই করে নিলাম।"

"হোশিনো-সান!"

"কী, বলুন?"

"সেটা খুঁজে পেতে পেতে, অনেকটা সময় লেগে যাবে হয়তো—"

"সে ঠিক আছে। যতটা পারি চেষ্টা করে দেখা যাক। নৌকোয় যখন চেপে বসেছি।"

"এবার কী তাহলে নৌকোয় চাপা হবে", নাকাতা জানতে চায়।

"না, এখনও নৌকোয় চাপার মত হয়নি", তরুণ উত্তর দেয়।

তিনটে বাজলে, দু'জনে কফিশপে ঢুকে, তরুণ কফি খেল। নাকাতা কিছুতেই কিছু ঠিক না করতে পেরে আইস-মিল্ক চাইল। তরুণ তখন এত ক্লান্ত যে কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না। 'তাইকোও ট্রায়ো'ও, যা হয় আরকি, শুনে শুনে ক্লান্তি এসে গেছে। একই জায়গায় গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে ঘোরা ওর স্বভাবের বিপরীত। একঘেয়ে ব্যাপার, গতিও বাড়ানো যাচ্ছেনা, মনোযোগ ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। মাঝেমাঝে পুলিশের গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, হোশিনো যথাসাধ্য চোখে চোখে না তাকানোই মনস্থ করল। যতটা পারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ পোস্টিংগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়া এড়িয়ে যাচ্ছিল। মাজদা ফ্যামিলিয়া যতই চোখে না পড়ার মত মামুলি গাড়ি হোক না কেন, বারবার একই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গাড়ি চোখে পড়লে ডিউটি হিসেবেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে হয়তো। এছাড়াও অসাবধানে অন্য গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা যাতে না হয়, অন্যান্য সময়ের চেয়েও বেশি সাবধানতা অবলম্বন না করলেই নয়।

ও যতক্ষণ ম্যাপ দেখে দেখে গাড়ি চালাচ্ছে, নাকাতা ঠিক বাচ্চাদের মত বা ভাল প্রশিক্ষণ পাওয়া কুকুরের মত, দু'হাত জানালায় রেখে অপরিবর্তিত ভঙ্গিতে স্থির থেকে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকে। মনেই হচ্ছিল যে ও সত্যিই নিবিষ্ট হয়ে কিছু একটার সন্ধান করছে। সন্ধ্যে হওয়া অবধি দু'জনেই যার যার কাজে ডুবে থেকে, কথা প্রায় বললই না।

"কীসের খোঁজে আছ তুমি—", গাড়ি চালাতে চালাতে তরুণ, আর থাকতে না পেরে, ইনোউয়ে ইয়োসুইর গানটা গাইতে শুরু করল। পরের কথাগুলো ভুলে যাওয়ায়, নিজেই প্রয়োজনমত বানিয়ে নিল।

"কিছুতেই পাচ্ছ না কি?
দিনের শেষে সন্ধ্যা আসে নেমে
হোশিনো যে খিদের চোটে নাকাল
নিজেও ঘোরে, চোখও ঘোরে, এবার ছুঁল কপাল"

ছ'টা বাজলে দু'জনে বাড়িটায় ফিরে এল।

"হোশিনো-সান, সোমবার আবার এটাই চালিয়ে যাব", নাকাতা বলে।

"আজ একদিনেই শহর যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। সোমবার হয়তো বাকিটুকু ঘোরা হবে", তরুণ বলে। "তবে, একটা কথা একটু জানতে চাইছি—"

"হ্যাঁ, হোশিনো-সান। কী সেটা?"

"যদি তাকামাৎসু শহরে জিনিসটা না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কী করব?"

নাকাতা হাতের তালুটা মাথায় খানিক ঘষল। "যদি তাকামাৎসু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শহরে ওটা না পাওয়া যায়, তাহলে মনে হয় আরো বড় করে, অনেকটা জায়গা নিয়ে খুঁজতে হবে।"

"বুঝলাম", তরুণ বলে। "আর তাতেও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কী করব?"

"হ্যাঁ, তাতেও না পাওয়া গেলে, আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়ে দেখতে হবে বলে মনে হয়", নাকাতা বলে।

"অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাওয়া যায়, কেবলি আরো প্রসারিত করে যেতে হবে। কথায়ই আছে, কুকুরও হাঁটতে থাকলে লাঠির মুখে পড়ে।"

"হ্যাঁ, সেটা হতে পারে বলেই মনে হয়", নাকাতা বলে। "কিন্তু, হোশিনো-সান, নাকাতা ভাল বুঝল না, কুকুর কেন হাঁটতে থাকলে লাঠির মুখে পড়ে? আগে কখনো লাঠিতে ধাক্কা খেয়ে থাকলে কুকুর তো কাটিয়ে যেতে চাইবে!"

এ কথায় তরুণ হোশিনো মাথা নাড়ে। "ঠিক বলেছেন তো। আজ অবধি একবারও খেয়াল হয়নি তো, কেনই বা কুকুরকে লাঠির মুখে পড়তে হবে?"

"অদ্ভুত ব্যাপার!"

"আচ্ছা ঠিক আছে", হোশিনো বলে। "এরকম সব ভেবে বের করলে, ব্যাপারটা উত্তরোত্তর জটিল হতে থাকে। কুকুর আর লাঠির সমস্যাটা আপাতত সরিয়ে রাখা যাক। আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হল, খোঁজাখুঁজির পরিধিটা আদপে কত অবধি বড় করে যাব। অবাধে কেবলই পরিধি বড় করে গেলে তো পাশের এহিমে জেলা কিংবা কোচি জেলায় গিয়ে পড়তে পারি। গ্রীষ্ম চলে গিয়ে শরৎ এসে পড়বে হয়তো—"

"তা হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু হোশিনো-সান, শরৎ এসে, তারপর শীত এসে পড়লেও, নাকাতা কোনওভাবেই খোঁজ থামাবে না। অবশ্যই অনন্তকাল হোশিনো-সানের সহায়তা পাওয়া যাবে না,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তারপর থেকে নাকাতা একাই পায়ে হেঁটে খুঁজে যাবে।"

"সে নাহয় কোনওভাবে—" তরুণ অস্ফুটে বলে। "কিন্তু পাথরমশাই কি আরেকটু বিশদে সহজ করে খবরাখবর দিতে পারেন না? মোটামুটি কোন অঞ্চলটায়, *মোটামুটি* হলেই চলবে যদিও।"

"কিছু মনে করবেন না, পাথরমশাই কিছু বলছেন না।"

"তাই নাকি? পাথরটা চুপ করে আছে বুঝি—দেখেও মোটামুটি সেরকমই মনে হয়েছিল", তরুণ হোশিনো বলে। "পাথরমশাই কথাও বলেন না, সাঁতারও একদমই ভাল জানেন না বলেই মনে হয়। সে ঠিক আছে। এখন আর কিচ্ছু ভাবব না। ভাল করে ঘুমিয়ে নিয়ে, কাল আবার শুরু করা যাবে।"

পরদিনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হল। তরুণ শহরটার পশ্চিমের দিকের অর্দ্ধেকটা, আগের দিনের মত একই প্রক্রিয়ায় গাড়ি চালিয়ে ঘুরল। শহরের ম্যাপটা হলুদ রঙের মার্কার দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে ভরাট করে ফেলল। তফাতের মধ্যে, তরুণের তোলা হাইয়ের সংখ্যা যেন কিছুটা বেড়ে গেল। নাকাতা অপরিবর্তিতভাবে জানালায় মুখ ঠেকিয়ে রাখার মত করে, সিরিয়াস চোখে কিছু একটা খুঁজছিল। যথারীতি দু'জনের মধ্যে তেমন কথাবার্তার বিনিময় ছিল না। পুলিশ চোখে পড়ছে কিনা সেদিকে নজর রেখে তরুণ স্টিয়ারিং ধরে রইল, নাকাতা অক্লান্তভাবে তার খোঁজ চালিয়ে গেল। কিন্তু জিনিসটা পাওয়া গেল না।

"আজ কি সোমবার", নাকাতা জানতে চাইল।

"হুঁ, গতকাল রোববার ছিল তো, তাই আজ সোমবার", তরুণ বলে। তারপর প্রায় হয়রান হয়ে গিয়ে, যা মনে আসে এমন কথায় যুৎসই কোনও সুর লাগিয়ে নিয়ে গাইতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"যদি আজ হতে হয় সোমবার

কাল তবে মঙ্গল জেনো খাঁটি

পিঁপড়েরা জুড়িহীন কর্মী

পোশাকে সোয়ালো পাখি পরিপাটি

চিমনিটা কী বিরাট লম্বা, সূর্য ডুবছে দ্যাখো লাল"

"হোশিনো-সান", একটু পরে নাকাতা বলে।

"কী, বলুন?"

"পিঁপড়েদের কাজ করে যাওয়া, যতই দেখি না কেন, দেখে দেখে ক্লান্তি আসে না কিন্তু, না?"

"ঠিকই বলেছেন", তরুণ বলে।

দুপুর হয়ে গেলে দু'জনে ঈলমাছের দোকানে ঢুকে, লাঞ্চ-সার্ভিসের উনা-দোন[†] খেল। তিনটের সময় কিসসাতেনে ঢুকে কফি খেয়ে, কোম্বু-চা[††] খেল। ছ'টা বাজতে বাজতে ম্যাপটা হলুদ রঙে ভরে গেছে, শহরের রাস্তাঘাট মাজদা ফ্যামিলিয়ার অতুলনীয় কিন্তু অনামী টায়ারের ভরসায় প্রায় সর্বত্র চক্কর দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু যা খোঁজা হচ্ছে তার তখনও কোনও হদিস নেই।

"আরে, খুঁজছিটা কী—", তরুণ এবার নির্জীব কণ্ঠে উল্টোপাল্টা কথায় গান গাইতে থাকে।

"এখনো তো খুঁজে পাওয়া গেল না

শহর তো ঘুমায় প্রায় পুরোটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

[†]একবাটি ভাতের ওপরে ঈলমাছ

[††]এই চায়ের উপাদান সমুদ্র থেকে আহৃত

~ www.amarboi.com ~

বদরক্তেও টনটনে ব্যথা

ধীরে ধীরে ফেরার সময় কি এল না"

"এ জিনিস চলতে থাকলে, আমি তদ্দিনে পুরোদস্তুর সিংগার-সংরাইটার হয়ে পড়ব বলে মনে হচ্ছে", হোশিনো বলে।

"সেগুলো কী", নাকাতা জানতে চায়।

"সেগুলো কিছু না। নির্দোষ রসিকতা মাত্র।"

দুজনে হতাশ হয়ে তাকামাৎসু শহর ছেড়ে, জাতীয় সড়ক ধরে বাড়িতে ফেরার উদ্যোগ করল। কিন্তু তরুণ চিন্তামগ্ন ছিল বলে, বাঁদিকে ঘোরার ল্যান্ডমার্কটা ভুল করল। কোনওভাবে ফের জাতীয় সড়কে ফিরে আসার চেষ্টা করল বটে, রাস্তাটা অদ্ভুত কোণাচেভাবে এঁকে বেঁকে গেছে, এবং তার সঙ্গে এত বেশি ওয়ান-ওয়ে যে তার মধ্যে কোনদিকে যাবে আর বুঝে উঠতে পারছিল না। একসময় খেয়াল করল যে একটা অজানা অচেনা বসতি অঞ্চলে দু'জনে ঢুকে পড়েছে। আশেপাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রাচীন অভিজাত বাড়ি রাস্তার ওপর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটা অদ্ভুতরকম শুনশান, লোকজন চোখেই পড়ে না।

"আমাদের বাড়িটার থেকে দূরত্বের দিক থেকে হয়তো তেমন দূরে হওয়ার কথা নয়, আমার সব একেবারে গুলিয়ে গেছে", তরুণ একটা উপযুক্ত জায়গা দেখে গাড়িটা সেখানে নিয়ে গিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে, সাইডব্রেক টেনে, ম্যাপ খুলে বসল। টেলিগ্রাফের খুঁটিতে লেখা রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর খুঁজে দেখে, জায়গাটাকে ম্যাপের ওপরে সন্ধান করছিল। কিন্তু চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েই হয়তো কিছুতেই পাচ্ছিল না।

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলে উঠলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কী, বলুন—"

"আপনি এখন ব্যস্ত আছেন, তবু জিজ্ঞেস করছি, ওই যে গেটটাতে টাঙানো সাইনবোর্ডে কী লেখা আছে বলতে পারেন?"

শুনে তরুণ হোশিনো ম্যাপ থেকে চোখ তুলে, নাকাতা যেদিকে নির্দেশ করছিল সেদিকে তাকাল। উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে, একটু এগিয়ে একটা পুরোনো ধাঁচের গেট, গেটের পাশে কাঠের তৈরি বিরাট সাইনবোর্ড টাঙানো আছে। কালো রঙের পাল্লা, গেট আঁট করে বন্ধ।

"কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগার", হোশিনো পড়ে, "এরকম জনমানবশূন্য নিরিবিলি জায়গায় লাইব্রেরি একটা ! সবচেয়ে বড় কথা লাইব্রেরির মত দেখাচ্ছেই না। সাধারণ একটা বড় বাড়ির মত!"

"কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগার?"

"হ্যাঁ। সম্ভবত কোওমুরা নামের কোনও লোকের স্মৃতিতে তৈরি লাইব্রেরিই হবে। কোওমুরা যে কে, তা যদিও একেবারেই জানি না।"

"হোশিনো-সান!"

"কী, বলুন", ম্যাপ দেখতে দেখতে হোশিনো উত্তর দেয়।

"ওই ওখানেই—"

"ওখানে বলতে, কোনটা?"

"নাকাতা যেটা এযাবৎ খুঁজেই যাচ্ছিল, সেটা ওই জায়গাটা।"

হোশিনো ম্যাপ থেকে মুখ তুলে, নাকাতার চোখের দিকে তাকায়। তারপর ভুরু কুঁচকে লাইব্রেরির গেটের দিকে তাকায়। আরেকবার ধীরে ধীরে সাইনবোর্ডের লেখাগুলো পড়ে। মার্লবরোর প্যাকেট বের করে, একটা সিগারেট টেনে নিয়ে মুখে গুঁজে দিয়ে, প্লাস্টিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নেয়। ধোঁয়াটা ধীরেসুস্থে টেনে নিয়ে, খোলা জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দেয়।

"সত্যিই?"

"হ্যাঁ। কোনও ভুল নেই।"

"*হঠাৎ এমনিই* কথাটা একটা ভয়ঙ্কর জিনিস, তাই না", তরুণ বলে।

"সত্যিই তাই", নাকাতাও সায় দিয়ে বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৯

পাহাড়ে দ্বিতীয় দিনটা অন্যান্য দিনের মতই নিরবচ্ছিন্নভাবে ধীরেসুস্থে কেটে গেল। একটা দিনের সঙ্গে আরেকটা দিনের তফাৎ বলতে, মোটামুটিভাবে কেবল আবহাওয়ার তফাৎটুকু। যদি আবহাওয়াটা একই থাকত, দিন তারিখের বোধই হারিয়ে যেত। গতকাল আর আজ, আজ আর আগামিকাল, ঠিকমত আলাদা করে ওঠাই অসম্ভব হয়ে পড়ল। সময় নোঙরহীন নৌকোর মত দিকনির্দেশহীন বিশাল সমুদ্রে এলোমেলো হয়ে পড়ল।

আমি হিসেব করে দেখলাম আজ মঙ্গলবার। সাএকি-সান অন্যান্য দিনের মতই—অবশ্য দেখতে চেয়ে লোক এলে তবেই—লাইব্রেরির ভেতরটায় মোটামুটি একটা ট্যুর করাচ্ছেন হয়তো। যেদিন প্রথমবার কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগারের গেট দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেদিনকার মত—সরু হীলের জুতো পরে উনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। সেই আওয়াজ শুনশান সেই বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঝকঝকে স্টকিং, ধপধপে সাদা ব্লাউজ, ছোট্ট মুক্তোর দুল, ডেস্কের ওপর মঁ ব্লাঁ-র কলম। শান্ত স্মিত হাসি (আর তাতে দীর্ঘ নিরাশার ছায়া পড়েছে)। সবই মনে হয় যেন অনেক দূরের জিনিস। মনে হতে থাকে, কী বলব, প্রায় যেন বাস্তববহির্ভূত কিছু।

আমি কেবিনের সোফার ওপরে, সেই রঙ জ্বলে যাওয়া কাপড়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, আরেকবার সাএকি-সানের সঙ্গে সেক্সের কথা ভাবলাম। ক্রমানুযায়ী স্মৃতি অনুসরণ করে, কল্পনায় ফুটিয়ে তুললাম। উনি ধীরে ধীরে পোশাক ছেড়ে ফেললেন। তারপর বিছানায় উঠে এলেন। এসব মোটেই বলার মত নয়, আমার পুরুষাঙ্গ বেশ শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ওতে আর আগের দিনের ব্যথাটা নেই। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের লাল ভাবটা কবে যেন মিলিয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যৌনতার এই উদ্দাম বিভ্রমে পীড়িত হতে হতে ক্লান্ত হয়ে একসময় বাইরে বেরিয়ে এসে, যে ব্যায়ামগুলো নিয়মিত করি, সেগুলোতে লেগে পড়লাম। পর্চের রেলিং ব্যবহার করে পেটের পেশির ব্যায়াম করলাম। দ্রুতগতির বৈঠক দিয়ে নিয়ে, হার্ড স্ট্রেচিং করলাম। প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে, বনের মধ্যে ঝর্ণায় তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে গা মুছলাম। ঠান্ডা জলে আমার মনের আকুলতাটা খানিকটা প্রশমিত হল। তারপর পর্চে বসে, মিনিডিস্ক ওয়াকম্যানে রেডিওহেড শুনতে থাকলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ইস্তক আমি মোটামুটি একই মিউজিক বারবার শুনে যাচ্ছি। রেডিওহেডের 'কিড এ' আর প্রিন্সের 'গ্রেটেস্ট হিটস', এছাড়া কখনও কখনও জন কলট্রেনের 'মাই ফেভারিট থিংস্'।

দুপুর দু'টোয়—ঠিক যখন লাইব্রেরি ট্যুরটা শুরু হয়—আমি আবার বনের মধ্যে ঢুকলাম। সেই আগের সুঁড়িপথটা ধরে, খানিকটা হেঁটে সেই আগের ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে হাজির হলাম। ওখানে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে, ছড়িয়ে পড়া ডালপালার মধ্যে গোলাকার একটা ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখলাম। গ্রীষ্মের মেঘের সাদা প্রান্তভাগ চোখে পড়ল। এই পর্যন্ত নিরাপদ অঞ্চল। এখান থেকে হলে, কেবিনে ফিরে যেতে কোনও সমস্যা হবে না। যারা প্রথম খেলছে তাদের জন্য গোলকধাঁধার, ভিডিও গেমের পরিভাষায় 'লেভেল ওয়ান', সহজেই ক্লিয়ার করতে পারব। কিন্তু এখান থেকে আর সামনে এগোতে হলে গভীর থেকে গভীরতর চ্যালেঞ্জিং গোলকধাঁধায় প্রবেশের জন্য পা বাড়াতে হবে। পায়ে চলা সুঁড়িপথ উত্তরোত্তর সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে, ফার্নের সমুদ্রের গ্রাসে পড়ে হারিয়ে গেছে।

তা হলেও, আমি ঝুঁকি নিয়ে আরেকটু সামনে এগিয়ে দেখব বলে ঠিক করলাম। ভাবলাম, পরীক্ষা করে দেখাই যাক, এই অরণ্যের কতটা ভেতর অবধি ঢুকে পড়া যায়। গিয়ে সেখানে যে কিছু না কিছু বিপদ আছে তা জানি। কিন্তু ঠিক কতখানি বিপদ, কী ধরণের বিপদ সেটা, নিজের চোখে প্রকৃতই যাচাই করে দেখে নিতে চাই, একেবারে ত্বক দিয়ে অনুভব করে দেখতে চাই। এটা না করলে চলবে না। পেছন থেকে কীসে যেন আমাকে ঠেলছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি গভীর সাবধানতা অবলম্বন করে, সামনে যেটা রাস্তা বলে মনে হচ্ছে, সেটা ধরে এগোই। গাছপালা ক্রমেই চোখে পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মত হয়ে উঠছে, আশপাশের বাতাস ঘন হয়ে, ভারি হয়ে উঠছে। গাছের ডালের ওপরে ডাল জড়ো হয়ে মাথার ওপরটা ছেয়ে রেখেছে, আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। একটু আগেও গ্রীষ্মের যেটুকু ক্ষীণ আভাস বিরাজ করছিল, সেটাও এর মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ঋতু বলে কিছুর আদতে অস্তিত্বই নেই বলে মনে হয়। অবিলম্বেই, যে পথটা ধরে হাঁটছি সেটা সত্যিই পথ কিনা নিশ্চিত থাকতে পারলাম না। এটা পথের মতই দেখাচ্ছে, চেহারাটা পথের মত হলেও প্রকৃত পথ নয় বলেও মনে হচ্ছে। বিষন্ন সবুজের গন্ধের মধ্যে সবকিছুর পরিচয়ই যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। যা কিছু যুক্তিযুক্ত আর যা কিছু তা নয়, সব যেন একটা আরেকটার সঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপরে একটা কাক তীক্ষ্নস্বরে খানিক ডাকল। খুবই তীক্ষ্নস্বরে। হয়তো আমাকে উদ্দেশ্য করেই কোনও সতর্কবার্তা। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে, গভীর মনোযোগ সহকারে চারপাশে তাকালাম। সঙ্গে যথেষ্ট যন্ত্রটন্ত্র ছাড়াই এর চেয়ে আর সামনে এগোনো বিপজ্জনক। না ফিরলেই নয় বলে মনে হল।

কিন্তু সে অত সহজ নয়। সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেয়েও সম্ভবত অনেক কঠিন। নেপোলিয়নের সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ের মতই। পথ বিভ্রান্তিজনক, তার ওপর চারপাশের গাছপালা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে, ঘন কালো দেওয়ালের মত পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। আমার নিজেরই শ্বাসপ্রশ্বাস কানে আশ্চর্যরকম জোরালো শোনাচ্ছে। যেন পৃথিবীর কোনও এক কোণ থেকে বয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের মত। আয়তনে হাতের তালুর সমান বড় কুচকুচে কালোরঙের একটা প্রজাপতি, আমার চোখের সামনে দিয়ে পতপত করে উড়ে গেল। আকৃতিতে আমার সাদা শার্টে লেগে থাকা রক্তের দাগের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। প্রজাপতিটা গাছপালার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে, ধীরে বাতাসে ভেসে গিয়ে, আবার গাছপালার ছায়ায় মিলিয়ে গেল। প্রজাপতিটা মিলিয়ে যেতেই চারপাশের পরিস্থিতিটা যেন একেবারে উদ্বেগজনক হয়ে উঠল, বাতাস আরো একটু ঠান্ডা হয়ে গেল। হয়তো সঠিক পথটা হারিয়ে ফেলেছি, এরকম একটা ভয়ে আক্রান্ত হলাম। কাকটা মাথার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওপরে আবার খানিক তীক্ষ্ণস্বরে ডাকল। সেই আগের পাখিটাই, আগের বার্তাটাই দিতে চাইছে যেন। দাঁড়িয়ে পড়ে আরেকবার ওপরে নজর বোলালাম। কিন্তু যথারীতি তাকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করেই মনে পড়ে যাওয়ার মত করে মাঝে মাঝে সত্যিকারের বাতাস বয়ে গিয়ে, কালো কালো পাতা পায়ের কাছে খসখস করে অস্থির আওয়াজ তুলছে। কয়েকটা ছায়া যেন পেছনে দ্রুতপদে ধাওয়া করছে এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু চট করে ঘুরে দাঁড়ালে, তারা ততক্ষণে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ফেলছে।

কিন্তু আমি কোনোভাবে সেই আগের গোল মত প্রশস্ত জায়গাটাতে—সেই নিরাপদ অঞ্চলটাতে—ফিরে আসতে পারলাম। ঘাসের ওপরে আরেকবার বসে পড়ে, গভীর ভাবে শ্বাস নিলাম। গোল করে তৈরি হওয়া, উজ্জ্বল, সত্যিকারের আকাশের দিকে তাকিয়ে, বারবার করে নিশ্চিত হয়ে নিলাম যে আমি আগের জগতটায় এসে পৌঁছতে পেরেছি। সেখানে চিরমনোরম গ্রীষ্মের চিহ্ন বিরাজ করছে। সূর্যের আলো আমাকে পাতলা আস্তরণের মত ঢেকে ফেলে, উষ্ণতা দিল। কিন্তু ফেরার পথে অনুভব করা ভয়ের অনুভূতিটা, বাগানের এককোণে গলতে গলতেও থেকে যাওয়া তুষারের মতই, অনেকক্ষণ আমার শরীরে রয়ে গেল। হৃৎপিন্ড একেক সময় অনিয়মিত আওয়াজ করছিল, তখনও সামান্য গায়ে কাঁটা দিয়ে রয়েছে।

সেই রাতে, আমি দম চেপে অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে, শুধু চোখটুকু পরিষ্কার খোলা রেখে, অন্ধকারের মধ্যে কেউ একজন দেখা দেবে এই অপেক্ষায় থাকি। দেখা দিক, কামনা করতে থাকি। কামনা করলে, তার কোনও ফল হয় কিনা জানা নেই। কিন্তু মন একাগ্র করে, *সেটা* জোরালো ভাবে চাইতে থাকি। জোরালো ভাবে চাইতে চাইতে, প্রার্থনা করি সেই চাওয়াটা যেন তখন ওখানে কার্যকর হয়।

কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। আমার চাওয়াটা প্রত্যাখ্যাত হয়। গতরাতের মতই, সাএকি-সান এসে আবির্ভূত হলেন না। অন্ধকার অন্ধকারই রইল। ঘুমের মধ্যে চলে যাওয়ার আগে, প্রবল যৌন তাড়নায় পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয়ে পীড়িত হলাম। অন্যান্য সময়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চেয়েও প্রবলরকম শক্ত। কিন্তু হস্তমৈথুন করলাম না। সাএকি-সানের সঙ্গে সেক্সের স্মৃতি, এখন কিছুক্ষণ, অক্ষুন্ন ভাবে বজায় রাখব বলে মনস্থ করলাম। দু'হাত আড়াআড়ি জড়ো করে, ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রার্থণা করলাম, সম্ভব হলে যেন সাএকি-সানকে স্বপ্নে দেখি।

কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম সাকুরাকে।

মনে হয় যেন স্বপ্ন নয়। সবটা এতটাই স্পষ্ট আর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। ঝাপসা কিছু একেবারেই নেই। জানি না এটাকে কী বলব। প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলে, অবশ্যই স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমি ওর অ্যাপার্টমেন্টের ঘরে রয়েছি। ও বিছানায় ঘুমোচ্ছে। আমি স্লীপিং-ব্যাগের মধ্যে শুয়ে আছি। এর আগে যে ওখানে ছিলাম, সেই একই পরিস্থিতি। সময় পিছিয়ে গিয়ে, আমি একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

মাঝরাতে গলা শুকিয়ে প্রবল তৃষ্ণায় জেগে গেলাম। স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে জল খেলাম। বেশ কয়েক গ্লাস জল খেলাম। পাঁচ গ্লাস কি ছয় গ্লাস মত। আমার ত্বকের ওপর পাতলা ঘামের আস্তরণ, আর যথারীতি প্রবলভাবে পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয়ে আছে। বক্সার শর্টসের সামনেটা শক্ত হয়ে উঁচু হয়ে আছে। ওটার অনুভূতি, চেতনা, সব আমার থেকে আলাদা, আলাদা একটা সিসটেম অনুসরণ করে কাজ করে যাওয়া অন্য একটা প্রাণীর মত দেখায়। আমি জল খেলে, তার একটা অংশ ওটাও অটোম্যাটিকালি পেয়ে যায়। ওটা যে জল টেনে নিচ্ছে, তার শব্দও যেন সামান্য আমার কানে আসে।

গ্লাসটা বেসিনে রেখে, খানিকক্ষণ দেওয়ালে হেলান দিয়ে থাকি। সময়টা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু ঘড়ি চোখে পড়ে না। সম্ভবত রাত্রির সবচেয়ে গভীর যাম। এমনকি ঘড়িও কোথাও হারিয়ে ফেলার মত সময়। আমি সাকুরার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। শহরের আলো পর্দার ওপাশ থেকে ঘরে ঢুকে এসেছে। সাকুরা আমার দিকে পেছন ফিরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিছানার পাতলা চাদরের থেকে পায়ের ছোট ছোট, সুচারু গোড়ালি দু'টো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে আছে। আমার পেছনে কে যেন নিঃসাড়ে কীসের একটা সুইচ টিপে অন করে দিল। ঠক করে মৃদু একটা আওয়াজ শোনা গেল। একটার ওপরে আরেকটা গাছপালার শাখাপ্রশাখায় আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ওখানে তখন ঋতু বলেও কিছু নেই। আমি মনস্থির করে, সাকুরার পাশে গিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়লাম। ছোট সিংগল খাট দু'জনের ওজনে অল্প আওয়াজ করে উঠলো। আমি ওর গলার পেছনের গন্ধটা নিলাম। সামান্য ঘামের গন্ধ। পেছন থেকে আলতো করে ওর কোমরে হাত রাখলাম। সাকুরা গলা দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করেও, তারপর আবার ঘুমোতে থাকল। একটা কাক ডাকল তীক্ষ্নস্বরে। আমি ওপর দিকে তাকালাম। কিন্তু পাখিটাকে দেখতে পেলাম না। আকাশও চোখে পড়ল না।

আমি সাকুরার পরণের টি-শার্টটা তুলে ওর নরম স্তন স্পর্শ করলাম। স্তনবৃন্ত আঙুল দিয়ে ধরলাম। রেডিওর ডায়াল ঘোরানোর মত করে। আমার দাঁড়িয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গ ওর পুষ্ট উরুর পেছনে জোরে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু সাকুরা কিছু বলছে না। শ্বাসপ্রশ্বাসেও এতটুকু ব্যাঘাত নেই। নির্ঘাৎ গভীর কোনও স্বপ্ন দেখছে বলে আমার মনে হল। কাকটা আবার ডাকল। পাখিটা আমাকে আবারও কোনও বার্তা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তার মর্মোদ্ধার করতে পারছি না।

সাকুরার শরীরটা গরম, আমার মতই ঘামে আর্দ্র। উপায়ান্তর না দেখে, আমি ওর দেহের অবস্থানটা পালটে দিলাম। আমার দিকে টেনে নিয়ে মুখোমুখি করে নিলাম। ও বড় করে শ্বাস ফেলল। কিন্তু জেগে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখাল না। আমি ওর ড্রইংপেপারের মত সমতল পেটে কান রাখলাম। ওটার নিচের গোলকধাঁধার মধ্যে স্বপ্নের প্রতিধ্বনি শোনার চেষ্টা করলাম।

পুরুষাঙ্গ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল ওটা যেন অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। ওর শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা ছোট্ট সূতীর অন্তর্বাস ধরে টানলাম। সময় নিয়ে পা থেকে টেনে খুলে ফেললাম। তারপর যৌনাঙ্গের অনাবৃত রোমে হাতের তালুটা রাখলাম। তার ভেতরের অংশে আলতো করে আঙুল দিলাম। গরম, আর্দ্র, যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমি ধীরে আঙুল চালিয়ে দিলাম। তখনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাকুরা জাগছে না। গভীর স্বপ্নের মধ্যে আবারও একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র।

একই সঙ্গে, আমার ভেতরে যে একটা শূন্যতার জায়গা ছিল, সেখানে কিছু একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করতে থাকল। এর মধ্যে কখন যেন আমি নিজেরই ভেতরে দৃষ্টিক্ষেপের একজোড়া অন্তর্মুখী চোখ পেয়ে গেছি। আর তাতেই সেই দৃশ্য আমি পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। জিনিসটা ভাল কিছু, না কি খারাপ কিছু, আমার এখনও জানা নেই। তবে, যেটাই হোক না কেন, আমার পক্ষে জিনিসটার অগ্রগতি ঠেলে পিছিয়ে দেওয়ারও উপায় নেই, থামানোরও উপায় নেই। আর জিনিসটার কোনো মুখ নেই, পিচ্ছিল একটা জিনিস। একসময় খোলস ছেড়ে বেরিয়ে, দস্তুরমত মুখেরও অধিকারী হয়ে, জেলির মত আবরণও ঝেড়ে ফেলবে হয়তো। সেটা করলে তবেই ওটির প্রকৃত রূপটি জানা যাবে। কিন্তু এখন অবধি, ওটার কোনও আকৃতি নির্দিষ্ট হয়নি, কেবল একটা প্রতীকী উপস্থিতির বেশি কিছু নয়। জিনিসটা, এখনও পুরো হাত হয়নি এমন হাত বাড়িয়ে, খোলসের সবচেয়ে নরম জায়গাটা ভেতর থেকে ছিঁড়ে বেরোনোর চেষ্টা করছে। আমি সেই নড়াচড়া নজর করে দেখলাম।

আমি মনস্থির করে নিলাম।

না, তা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কিছুই স্থির করিনি। আমার নিজের স্থির করার মত আর কিছু ছিল না বলে। বক্সার শর্টস খুলে, পুরুষাঙ্গ বাইরে উন্মুক্ত করলাম। সাকুরার শরীরটা জড়িয়ে ধরে, পা দু'টো ছড়িয়ে ফাঁক করে নিয়ে, ভেতরে প্রবেশ করলাম। কঠিন কিছু নয়। ও অত্যন্ত নরম, আমি অত্যন্ত শক্ত। আমার পুরুষাঙ্গে আর ব্যথা করছে না। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ এই ক'দিনে বেশ শক্ত হয়ে গেছে। সাকুরা তখনও স্বপ্নের মধ্যে। ওর স্বপ্নের মধ্যে আমার শরীরটা নিমজ্জিত করে দিলাম।

সাকুরা হঠাৎ করেই জেগে উঠল। আর বুঝতে পারল যে আমি ওর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছি।

“আরে, তামুরা-কুন, করছটা কী?”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সাকুরা-সানের ভেতরে ঢুকেছি বলে মনে হচ্ছে", আমি বললাম।

"এটা করলে কেন", সাকুরা ভয়ানক কঠোর গলায় বলে। "তোমায় আগেই পরিষ্কার বলে রেখেছি না, যে এটা করা যাবে না!"

"কিন্তু উপায় ছিল না।"

"ঠিক আছে, এখন বন্ধ কর। তাড়াতাড়ি ওটা বের কর—"

"বের করতে পারব না", বললাম। আর মাথা নাড়লাম।

"তামুরা-কুন, ভাল করে শুনে রাখ। প্রথমত আমার একজন নির্দিষ্ট প্রেমিক আছে। দ্বিতীয়ত আমার মত ছাড়াই তুমি আমার স্বপ্নের ভেতরে প্রবেশ করেছ। এটা ঠিক নয়।"

"আমি জানি।"

"এখনও সময় আছে। আসলে তুমি আমার মধ্যে ঢুকলেও, এখনও নড়তে শুরু করনি, বীর্যপাতও করনি। শান্তভাবে কেবল ওখানে আছ। যেন ভাবছ। তাই তো?"

আমি সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই।

"বেরিয়ে এস", ধমক দেওয়ার মত করে বলল। "আর এটার কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। যেহেতু আমিও ভুলে যাব, তুমিও ভুলে যাও। আমি তোমার দিদি, তুমি আমার ছোটভাই। যদিও রক্তের সম্পর্ক নেই, আমরা দিদি আর ভাই ছাড়া অন্য কিছু নই। সেটা বুঝতে পারছ তো? আমাদের মধ্যে পারিবারিক সূত্রে সম্পর্ক আছে। এসব করা উচিত নয়।"

"দেরি হয়েই গেছে", আমি বলি।

"কেন?"

"আমি যেহেতু সেরকমই মনে করি", আমি বলি।

"*তুমি যেহেতু সেরকমই মনে কর*", কারাসু বলে ছেলেটা বলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তুমি আর নানাজনের দ্বারা তাদের খুশিমত একবার এদিকে, একবার ওদিকে চালিত হতে চাও না, হয়রান হতে চাও না। ইতিমধ্যেই, যিনি তোমার পিতা, তাঁকে হত্যা করেছ, যিনি তোমার মা, তাঁর সঙ্গে অবৈধ সংগম করেছ। আর এভাবে, যে তোমার দিদি, তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আছ। এতে যদি অভিশাপ লাগার হয়, এগিয়ে গিয়ে নিজের ঘাড়ে নিয়েছ। একগুচ্ছ প্রোগ্রাম তক্ষুণি সমাপন করে ফেলতে চাও বলে মনে হয়। একেবারে তক্ষুণি সেই ভার ঘাড় থেকে নামিয়ে, অতঃপর কারুর একটা বাসনার মধ্যে জড়িয়ে পড়া কেউ একজন না হয়ে একেবারে স্বতন্ত্র একজন হিসেবে কাটিয়ে যাচ্ছ। এটাই তোমার মনোবাসনা।

দুহাতে মুখ ঢেকে সাকুরা খানিক কাঁদে। তোমার ওর জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু এখন আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তোমার পুরুষাঙ্গ ওর ভেতরে গিয়ে উত্তরোত্তর বড় আর শক্ত হয়ে উঠছে। যেন একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে ওখানে।

"বুঝেছি, আর কিছু বলব না",ও বলে, "তবে এটুকু মনে রেখো, তুমি কিন্তু আমাকে রেপ করছ। তোমাকে পছন্দই করি, কিন্তু এধরণের কিছুর মোটেই ইচ্ছে নেই। আমাদের সম্ভবত আর দ্বিতীয়বার দেখা হবে না। এর পরে আর দেখা করার যতই জোরালো ইচ্ছে হোক না কেন। তাতেও আপত্তি নেই, তাই তো?"

তুমি একথার কোনও জবাব দিলে না। ভাবনাচিন্তার সুইচ অফ করে দিয়েছ। এবার ওকে জড়িয়ে ধরে কোমর সামনে পেছনে চালনা করতে শুরু করলে। খুব সাবধানে নম্রভাবে, তারপর একসময় প্রবলভাবে। ফিরে আসার সময় কাজে লাগবে ভেবে এক এক করে পেরিয়ে যাওয়া গাছপালাগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইছিলে, গাছপালাগুলো সব একইরকম চেহারা ধারণ করে, অনতিবিলম্বেই নামগোত্রহীনতার সমুদ্রের গ্রাসে চলে গেল। সাকুরা চোখ বন্ধ করে, সেই অঙ্গসঞ্চালনে শরীর সমর্পণ করে দিল। কিছু বলছিল না। প্রতিরোধও করছিল না। মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই, মুখ একপাশে ফেরানো। কিন্তু ওর অনুভব করা শারীরিক আনন্দ তুমি নিজেরই প্রসারিত একটা অংশে ঘটছে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অনুভব করে নিতে পারছ। এখনকার মত তুমি সেরকমই জান। গাছপালারা একটার পর একটা জড়ো হয়ে ঘন কালো একটা দেওয়াল তৈরি করে দৃষ্টি অবরোধ করে দাঁড়াচ্ছে।পাখিটা আর কোনও মেসেজ পাঠাচ্ছে না। তোমার এরপর বীর্যপাত হয়ে গেল।

বীর্যপাত করলাম।

চোখ খুললাম। আমি বিছানায়, আশেপাশে কেউ নেই। মাঝরাত। যতদূর দৃষ্টি যায় গভীর অন্ধকার, আর সেখান থেকে সমস্ত ঘড়ি হারিয়ে গেছে। আমি বিছানা থেকে নেমে, অন্তর্বাস খুলে ফেলে, রান্নাঘরে গিয়ে জল দিয়ে সেটার থেকে বীর্য ধুয়ে ফেললাম। অন্ধকারের জন্ম দেওয়া অবৈধ সন্তানের মতই ওগুলো সাদা, ভারি, ঘন স্নেহজাত পদার্থের মত। পরপর বেশ ক'গ্লাস জল খেলাম। কিন্তু যতই জল খাই না কেন, আমার ভেতরের তৃষ্ণা কিছুতেই মেটে না। বেসামাল রকম একা হয়ে পড়ি। মাঝরাতে গভীর অন্ধকারের মধ্যে চারপাশে অরণ্য পরিবেষ্টিত হয়ে, যারপরনাই একাকি হয়ে পড়লাম। সেখানে ঋতু নেই, আলো নেই। বিছানায় ফিরে এসে, বসে পড়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অন্ধকার আমাকে ঢেকে ফেলল।

তোমার ভেতরের সেই কী একটা জিনিস, এবার পরিষ্কার করে স্বমূর্তি প্রকাশ করেছে। একটা কালো ছায়া হয়ে সেখানে শরীরকে বিশ্রাম দিচ্ছে। খোলসটা আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। খোলসটা পুরোপুরি ছিঁড়ে, ফেলে দিয়েছে। তোমার দু'হাতে সেই ঘন পিচ্ছিল পদার্থটা লেগে আছে। কেমন যেন মানুষের রক্তের মত। তুমি হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরলে। কিন্তু কিছু দেখতে পাওয়ার মত যথেষ্ট আলো নেই। ভিতর, বাহির, বড় বেশি অন্ধকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪০

‘কোওমুরা স্মৃতি পাঠাগার’ লেখা সাইনবোর্ডের পাশে নানা তথ্য জ্ঞাপক একটা বোর্ড। সেখানে, সোমবার যে ছুটির দিন, লাইব্রেরি যে ১১টা—৫টা খোলা থাকে, কোনও প্রবেশমূল্য যে নেই, ইচ্ছুক দর্শনার্থীদের জন্য যে মঙ্গলবার দুপুর দু’টোয় লাইব্রেরির ভেতরটা দেখার জন্য খুলে দেওয়া হয়, এইসব লেখা আছে। তরুণ হোশিনো সেগুলো নাকাতাকে পড়ে শোনাল।

“আজ যেহেতু সোমবার, একেবারেই বন্ধ”, তরুণ বলে। তারপর রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকায়। “আরে, সে যেই বারই হোক, বন্ধ হওয়ার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে, তাই একই ব্যাপার।”

“হোশিনো-সান!”

“কী, বলুন?”

“এর আগে হোশিনো-সানের সঙ্গে যে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম, তার থেকে অনেকটাই অন্যরকম দেখতে, তাই না”, নাকাতা বলে।

“হুঁ, ওটা ছিল বড় একটা পাবলিক লাইব্রেরি, আর এটা যেহেতু নিজস্ব মালিকানার লাইব্রেরি। একেবারেই আলাদা মাপের ব্যাপার।”

“নাকাতা ভাল বুঝল না, ব্যক্তিগত মালিকানা বলে জিনিসটা ঠিক কী ধরণের জিনিস?”

“অর্থাৎ কিনা, কোনও জায়গার একজন নেহাতই সম্পন্ন ব্যক্তি একটা জায়গার ব্যবস্থা করে, নিজের সংগ্রহের অনেক অনেক বই সমাজের সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিল। আপনারা খুশিমত পড়ুন, এই বলে। খুব বড় কেউ। গেট দেখলেই বোঝা যায়, চমৎকার লোক।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সম্পন্ন কাকে বলে?"

"অর্থবান লোক আর কী—"

"অর্থবান আর সম্পন্নের মধ্যে তফাৎ কী?"

হোশিনো মাথা নাড়ে, "তা বটে, তফাৎ যে ঠিক কী, আমারও ভাল জানা নেই। তবে, যে নেহাতই 'অর্থবান', তার চেয়ে 'সম্পন্ন' সম্ভবত খানিকটা সংস্কৃতিবান বলে মনে হয়।"

"সংস্কৃতিবান?"

"অর্থাৎ কিনা, কেবল অর্থ থাকলেই যে কেউই অর্থবান হতে পারে। এমনকি আমিও, কিংবা নাকাতা-সানও, কেবল পয়সা থাকলেই 'অর্থবান' হতে পারি। কিন্তু কিছুতেই 'সম্পন্ন' হতে পারব না। সম্পন্ন হতে গেলে আরেকটু সময় লাগবে।"

"কঠিন ব্যাপার!"

"কঠিন ব্যাপারই বটে। আমাদের সঙ্গে অবশ্য কোনরকম সম্পর্কই নেই এটার। আমাদের যেহেতু এমনকি অর্থবানটুকু হওয়ারও কোনও আশা নেই—"

"হোশিনো-সান!"

"কী, বলুন?"

"সোমবার যেহেতু বন্ধ, আগামিকাল যদি এগারোটায় এখানে আসি, লাইব্রেরি তখন খোলা থাকবে, তাই তো", নাকাতা বলে।

"তাই তো হওয়ার কথা। আগামিকাল মঙ্গলবার।"

"নাকাতাও কি লাইব্রেরিতে ঢুকতে পাবে?"

"যে কেউই ঢুকতে পারে বলেই আপাতত সাইনবোর্ডে লেখা আছে। তাই নাকাতা-সানও ঢুকতে পারেন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"পড়তে না পারলেও ঢুকতে পারা যায়, তাই তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অসুবিধে নেই। পড়তে পারে কি পারে না, সেসব অত খুঁটিয়ে ঢোকার মুখে জিজ্ঞেস করার রেওয়াজ নেই", তরুণ বলে।

"তাহলে নাকাতা ভেতরে ঢুকতে চায়।"

"সে ঠিক আছে। কাল সকালে প্রথমেই এখানে এসে, দু'জনে মিলে এখানে ঢুকে পড়া যাক তাহলে", তরুণ বলে। "তার আগে, কাকু, একটা কথা নিশ্চিত করে জেনে রাখি, এই জায়গাটাই সেই জায়গা তো? এই লাইব্রেরির মধ্যেই ওই সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা, যেটা খোঁজা হচ্ছে, আছে তো?"

নাকাতা পর্বতারোহণের টুপিটা খুলে, হাতের তালু দিয়ে ছোট ছোট চুলের মাথাটা ক'বার ঘষে নিল। "হ্যাঁ, থাকারই কথা।"

"আর খুঁজতে বেরুতে হবে না তাহলে, তাই তো?"

"হ্যাঁ। এরপর আর খোঁজার কিছু নেই—"

"এটা খুব ভাল হল", তরুণ আশ্বস্তস্বরে বলে। "শরৎ অবধি লেগে গেলে কী করা উচিত, সেই নিয়ে চিন্তিত ছিলাম—"

কর্নেল স্যান্ডার্সের সেই বাড়িটায় ফিরে, দুজনে কষে ঘুম লাগাল। পরদিন সকাল এগারোটায় কোওমুরা লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বাড়ি থেকে কুড়ি মিনিট হাঁটার মত দূরত্ব বলে, দু'জনেই হেঁটেই যাবে বলে স্থির করল। সকাল থাকতেই রেন্টাল কারটা স্টেশনের সামনে ফেরত দিয়ে আসতে গেল হোশিনো।

দু'জনে যখন কোওমুরা লাইব্রেরিতে গিয়ে পৌঁছল, গেটটা তখন বড় করে খোলা। মনে হচ্ছিল দিনটা গুমোট যাবে। চারপাশে জল ছেটানো হয়েছে। গেটের ভেতর দিয়ে সুন্দর কেয়ারি করা বাগান চোখে পড়ল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তাহলে, কাকু", তরুণ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

"হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলুন?"

"লাইব্রেরির ভেতরে ঢুকে, তারপর আমাদের করণীয়টা কী? হঠাৎ করে বিদঘুটে কিছু করে বসলে, আমাদেরই মুশকিল হবে বলে, আগে থেকেই জিজ্ঞেস করে রাখছি। আমার দিক থেকে, ঠিকমত মানসিক প্রস্তুতিও খুব জরুরি।"

নাকাতা চিন্তিত হয়ে পড়ল, "ভেতরে ঢুকে তারপর করণীয় কী তা তো নাকাতারও ভাল জানা নেই। কিন্তু এটা যেহেতু লাইব্রেরি, আপাতত বই টই পড়া হবে বলে মনে হয়েছিল। নাকাতাও একটা ফোটোগ্রাফ কিংবা ছবির বই বেছে নেবে আর হোশিনো-সানও একটা কোনও বই বেছে নিয়ে পড়ুন।"

"বুঝতে পেরেছি। লাইব্রেরি যেহেতু, প্রথমে বই পড়া হবে। যুক্তিসঙ্গত কথা।"

"করণীয় কী, সেই বিষয়ে এরপর ক্রমে ক্রমে ভাবব।"

"ঠিক আছে। পরের কথা পরেই ধীরে ধীরে ভাবা যাবে। এও অত্যন্ত সুস্থ চিন্তাধারা", তরুণ বলল।

দুজনে বিনীত ভাবে সুন্দর করে রক্ষণাবেক্ষণ করা বাগানের ভেতর দিয়ে এসে, সাবেক ধাঁচের সামনের মূল প্রবেশদ্বারের ভেতর দিয়ে ঢুকে এল। ঢুকেই কাউন্টার, ছিপছিপে সুদর্শন এক তরুণ সেখানে বসে। সাদারঙের সূতীর বাটনডাউন শার্ট। ছোট চশমা। সামনের দীর্ঘ সুচিক্কণ চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। ফ্রঁসোয়া ত্রুফোর সাদা-কালো ছবিতে এই টাইপের লোকেরা থাকত, হোশিনোর মনে হল। সেই সুদর্শন তরুণ দু'জনের মুখের দিকের তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

"কোন্নিচিবা[1]" হোশিনো অত্যন্ত আন্তরিক কণ্ঠস্বরে বলে।

"কোন্নিচিবা", উল্টোদিক থেকে প্রত্যাভিবাদন করে বলে। "আসুন, আসুন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

[1]'দিন শুভ হোক'--দিনের মধ্যে প্রথম দেখা হওয়ার সময় স্বাভাবিক অভিবাদন।।

~ www.amarboi.com ~

"ইয়ে, বই পড়তে চাই, তাই।"

"অবশ্যই", সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে ওশিমা বলে। "অবশ্যই, ইচ্ছেমত বই পড়ুন। এই লাইব্রেরি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া আছে। বইয়ের তাক থেকে যে কেউ ইচ্ছেমত বেছে নিতে পারেন। রেফারেন্সের জন্য কার্ড আছে। কম্পিউটারেও রেফারেন্স পেতে পারেন। কোনও কিছু বুঝতে না পারলে, কোনও দ্বিধা না করে এসে বলুন প্লীজ। সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত হব।"

"অনেক ধন্যবাদ!"

"কোনও বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ আছে কি, অথবা কোনও বিশেষ বইপত্র খুঁজছেন কি?"

হোশিনো মাথা নাড়ে। "না, আপাতত তেমন কিছু নেই। আসলে, বইয়ের থেকেও এই লাইব্রেরিটার ব্যাপারেই আগ্রহ বেশি। এমনিই সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে, ইন্টারেস্টিং মনে হওয়ায়, একটু ঢুকে দেখা যাক বলে মনে হল। কী দারুণ একখানা বাড়ি!"

ওশিমা বেশ সম্ভ্রান্তভাবে ছোট করে স্মিত হেসে, সুন্দর তীক্ষ্ণ করে কাটা লম্বা পেনসিলটা হাতে নিল।

"অনেকেই এভাবে এসে দেখে যান।"

"ভালই হল", হোশিনো বলে।

"আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে, দু'টো থেকে লাইব্রেরির ভেতরে একটা ছোটখাট ট্যুর আছে। ইচ্ছুক দর্শনার্থী পাওয়া গেলে, প্রতি মঙ্গলবার দুপুরে এটা হয়। উর্দ্ধতন অধিকর্তা এই লাইব্রেরির পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করেন। ঘটনাক্রমে আজ মঙ্গলবার।"

"বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! অ্যাঁ, কী বলেন, গিয়ে দেখাই যাক, নাকাতা-সান?"

তরুণ আর ওশিমা যখন কাউন্টারের দুই দিকে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল, মাথা থেকে খোলা পর্বতারোহীর টুপিটা হাতে শক্ত করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ধরে থেকে নাকাতা ততক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চারদিকে দেখছিল, কিন্তু তরুণের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনেই, হুঁশে এল।

"হ্যাঁ, কী হয়েছে?"

"ব্যাপার হল, দু'টো থেকে লাইব্রেরির ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখানো হবে বলে জানলাম, কী করবেন, দেখতে চান?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোশিনো-সান, ধন্যবাদ। নাকাতা দেখতে চায়", নাকাতা বলে।

ওশিমা দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। নাকাতা আর হোশিনো, এদের মধ্যে আদপে সম্পর্কটা কী? আত্মীয় বলেও মনে হচ্ছে না। বয়েসের দিক থেকেও, বাহ্যত দেখেও, বেশি আজব এক জুড়ি। কোথাও কোনওরকম সাধারণ লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার ওপরে এই নাকাতা-সান বলে বয়স্ক লোকটির বাচনভঙ্গিটা কেমন যেন অন্যরকম। ওঁর মধ্যে এমন কিছু একটা ভাব আছে যেটা মানুষকে টানে। অবশ্য তার মধ্যে খারাপ কিছু আছে বলে বোধ হচ্ছে না।"

"দূর থেকে দেখতে এসেছেন কি", ওশিমা জিজ্ঞেস করে দেখে ওদের।

"হ্যাঁ, আমরা নাগোয়া থেকে আসছি", নাকাতা মুখ খোলার আগেই তড়িঘড়ি তরুণ হোশিনো হড়বড় করে উত্তর দেয়। নাকাতার মুখ দিয়ে যদি বেরিয়ে যায়, "নাকানো ওয়ার্ড থেকে এসেছি" তো ঘটনা জটিল আকার নেবে। নাকানো ওয়ার্ডের খুনের ঘটনায় নাকাতার মতই এক প্রবীণ যুক্ত আছে, সেটা ইতিমধ্যেই টেলিভিশনের নিউজের কল্যাণে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যের কথা, ওর যদ্দূর জানা আছে তাতে নাকাতার মুখের কোনও ফোটোগ্রাফ এখনও দেখায়নি।

"সে তো অনেক দূর", ওশিমা বলে।

"হ্যাঁ, ব্রিজ পেরিয়ে এসেছি। বিশাল বড়, দারুণ ব্রিজ", নাকাতা বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ঠিকই। খুব বড় ব্রিজ। আমার এখনো একবারও পেরোনো হল না", ওশিমা বলে।

"জন্মে থেকে নাকাতা এত বড় ব্রিজ আর দেখেনি!"

"ব্রিজটা বানাতে", ওশিমা বলে, "এত দীর্ঘ সময় আর এত বিশাল পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছে যা খুবই বিরল। পত্রিকায় পড়েছি, ব্রিজটা আর হাইস্পীড হাইওয়ে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাবলিক কর্পোরেশনকে কমবেশি ১০০০ ওকু[†] ইয়েন ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে বছরে। যেটা পূরণ করতে হচ্ছে আমাদের দেওয়া ট্যাক্স থেকে"

"১০০০ ওকু ইয়েন যে কী সেটা নাকাতার ভাল জানা নেই"

"সত্যি বলতে কী, আমারও জানা নেই", ওশিমা বলে। "যা কিছুই হোক না কেন, সংখ্যাটা একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, জিনিসটার বাস্তবতা হারিয়ে যায়। সোজা কথায়, অনেক অনেক টাকা।"

"এই সবকিছুর জন্য অনেক ধন্যবাদ", পাশ থেকে হোশিনো বলে ওঠে। এভাবে চলতে থাকলে, নাকাতা যে কী বলে ফেলবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। "ঘুরে দেখতে হলে দু'টোর সময় এখানে এলেই হবে তো?" তরুণ বলে।

"হ্যাঁ, হবে। দু'টোয়, অনুগ্রহ করে, এখানে এসে পড়বেন। উর্দ্ধতন অধিকর্তা লাইব্রেরির ভেতরটা আপনাদের দেখিয়ে দেবেন", ওশিমা বলে।

"ততক্ষণ অবধি ওইখানটায় বসে বই পড়ছি", তরুণ হোশিনো বলে।

হাতের মধ্যে পেনসিলটা ঘোরাতে ঘোরাতে ওশিমা পেছন থেকে ওদের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর ফের যে কাজটা করছিল সেটাতে মন দিল।

দু'জনে তাক থেকে পছন্দমত বই বেছে নিল। তরুণ হোশিনো বাছল 'বিঠোফেন ও সেই যুগ' বলে একটা বই। নানা ফার্নিচারের

[†]এক ওকু হচ্ছে ১০ কোটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফোটো দেওয়া আছে এরকম বেশ কয়েকটা বই এনে নাকাতা টেবিলের ওপর রাখল। তারপর গভীর মনোযোগ সহকারে কুকুরের মত ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে, এদিক ওদিক ছুঁয়ে দেখে, গন্ধ শুঁকে, একটা জায়গার দিকে নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বারোটা বাজা অবধি রীডিংরুমে অন্য কেউ না থাকায় নাকাতার এইসব কার্যকলাপ চোখে পড়ে যাওয়ার মত কেউ ছিলও না।

"শুনুন, কাকু", হোশিনো নিচুস্বরে বলে।

"হ্যাঁ। কী হয়েছে?"

"ইয়ে, একটা জরুরি কথা বলে রাখছি, নাকানো ওয়ার্ড থেকে যে আসছেন, পারতপক্ষে সেটা যেন মুখ ফস্কে বেরিয়ে না পড়ে।"

"কেন?"

"সে বলতে গেলে, অনেক কথা বলতে হবে, এককথায়, সেটাই ভাল বলে আমার মনে হয়। নাকাতা-সান নাকানো ওয়ার্ড থেকে এসেছেন জানতে পেলে, অন্য লোকেরা ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিতে পারে যেহেতু—"

"বুঝেছি", বলে নাকাতা মাথাটা অনেকটা সামনে ঝোঁকায়। "ঝঞ্ঝাটে না পড়াই ভাল। হোশিনো-সান যেমনটি বললেন, সেইমত নাকাতা যে নাকানো ওয়ার্ড থেকে আসছে সেটা আর বলবে না।"

"তা যদি করেন, তবে অনেক ধন্যবাদ", তরুণ বলে। "ভাল কথা, যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা খুঁজছিলেন, সেটা পেলেন?"

"না হোশিনো-সান, এখন অবধি কিছুই পাইনি।"

"তবে, জায়গাটা যে এখানেই, সেটায় কোনও ভুল নেই, তাই তো?"

নাকাতা সামনে মাথা ঝোঁকায়। "কাল রাতে শোয়ার আগে পাথরমশাইয়ের সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলে নিয়েছি। এটাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে সেই জায়গা এতে কোনও ভুল নেই বলেই মনে হয়।”

“তবে তো ভালই!”

হোশিনো মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে, আবার বিঠোফেনের জীবন কাহিনীতে ফিরে গেল। বিঠোফেনের অহং ছিল আকাশছোঁয়া, নিজের প্রতিভার ওপর আস্থা ছিল চূড়ান্ত, অভিজাত শ্রেণীকে একেবারেই তোষামোদ করতেন না। আর্ট, আবেগের যেকোনও উপযুক্ত অভিব্যক্তি, এগুলোই হচ্ছে জগতের সর্বোচ্চ জিনিস, সম্মান পাওয়ার মতই জিনিস। উনি মনে করতেন, রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, এদের কাজ হচ্ছে আর্টকে সেবা করা। হেডেন যখন অভিজাতদের বাড়িতে থাকতেন (অধিকাংশ সময়েই তাই থাকতেন), ভৃত্যশ্রেণীর সঙ্গে একসঙ্গে আহার গ্রহণ করতে হত তাকে। হেডেনের জীবিতাবস্থায়, সেযুগের সংগীতকাররা ভৃত্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হত (সবচেয়ে উদারমনা ও অমায়িক মানুষ হেডেন, অভিজাতদের সঙ্গে কঠোর প্রথানুসারী কৃত্রিম পরিবেশে খাওয়াদাওয়া করার চেয়ে, ভৃত্যদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার্যগ্রহণ করতেই পছন্দ করতেন)।

কিন্তু বিঠোফেনকে ওরকম অমর্যাদার চোখে দেখলে, উনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, জিনিসপত্র দেওয়ালে ছুঁড়ে মেরে, অভিজাতবর্গ ও সমগোত্রীয়দের টেবিলে এসে বসার দাবি জানাতেন। বিঠোফেন অল্পেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন (বেশিরভাগ সময়ে রেগেই থাকতেন), একবার রাগ হলে শান্ত করা মুশকিল হত। রাজনৈতিক দিক থেকেও চিন্তাধারা ছিল র‍্যাডিকাল ধরণের, এবং সেটা লুকোনোরও চেষ্টা করতেন না। শ্রবণশক্তি যতই কমে আসছিল, ততই সেই স্বভাব উত্তরোত্তর আরো প্রকট হয়ে উঠছিল। যত বয়েস বাড়ছিল ততই ওঁর সংগীত ব্যাপ্তিতে আরো বিশালতা পেয়ে, একই সঙ্গে আরো নিবিষ্টভাবে অন্তর্মুখী হয়ে উঠছিল। একই সঙ্গে এই বৈপরীত্য বজায় রেখে যাওয়া বিঠোফেনের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এরকম অসাধারণ সৃষ্টিশীলতা ওঁর বাস্তব জীবনকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মানুষের এই নশ্বর দেহ আর স্পিরিট, এদের একটা সীমা আছে, অত কঠোর শ্রম সহ্য করার মত করে তৈরি নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"মহান মানুষ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়", হোশিনো মাঝপথে বইটা রেখে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অভিভূত হয়ে রইল। স্কুলের মিউজিক রুমে বিঠোফেনের ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তি ছিল, সেই তেতো গিলে ফেলা মুখভঙ্গিটুকুই শুধু মনে ছিল, লোকটা যে এত প্রতিকূলতায় ভরা জীবন কাটিয়ে গিয়েছিল, সেটা জানা ছিল না। ওরকম কঠোর মুখ না করে উপায় ছিল না, তরুণের মনে হল।

"সে যাই হোক, আমার আর খুব একটা বড়ো কেউ হওয়ার সম্ভাবনা নেই", তরুণ ভাবে। তারপর নাকাতার দিকে তাকিয়ে দেখে। নাকাতা লোকশিল্পের আসবাবপত্রের ছবি চুপ করে দেখতে দেখতে, বাটালি মেরে, ছোট একটা র‍্যাঁদা চালানোর মত ভঙ্গি করছিল। ফার্নিচার দেখলেই, অভ্যাসবশত আপনা থেকেই ও সেই ভাবে হাত-পা চালাতে থাকে।

"হতে হলে এই ইনি হতে পারবেন মহান মানুষ", তরুণ ভাবে। "সাধারণ লোকের কম্মো নয়, এঁর মত হওয়া। আলাদা মাপের মানুষ!"

বারোটা বাজতে রীডিং রুমে অন্য লোক (দু'জন মধ্যবয়সী মহিলা) এসে গেল বলে, দু'জনে একটু বিরতি নিতে বাইরে বেরিয়ে এল। তরুণের কাছে দুপুরে খাওয়ার জন্য পাঁউরুটির ব্যবস্থা ছিল। নাকাতা, তার সঙ্গে, অন্যান্য সময়ের মতই ছোট থার্মোফ্লাস্কে ভরে ব্যাগের মধ্যে হোজি চা নিয়ে এসেছিল। হোশিনো গিয়ে কাউন্টারে ওশিমার থেকে জানতে চাইল, এখানে কোথাও একটু খাওয়াদাওয়া করে নেওয়া যায় কিনা।

"অবশ্যই", ওশিমা বলে। "ওই ওখানে গ্রীন-জোন আছে। বাগান দেখতে দেখতে ধীরেসুস্থে খাওয়াদাওয়া সারতে পারেন। আপত্তি না থাকলে, এসে একটু কফি খান। ব্যবস্থা আছে, কোনওরকম সংকোচ করবেন না।"

"অনেক ধন্যবাদ", হোশিনো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলে। "এ তো দেখছি একেবারে নিজের বাড়ির মত লাইব্রেরি!"

ওশিমা স্মিত হেসে, সামনের চুল পেছনে ঠেলে দেয়। "হ্যাঁ, অন্যান্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সাধারণ লাইবেরির থেকে একটু আলাদাই। সত্যিই বাড়ির মতই বলা যায় সম্ভবত। আমরা চাইছি, শান্তিমত বই পড়া যায় এরকম একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

বেশ ভাল তো, হোশিনো ভাবে। বুদ্ধিমান, পরিচ্ছন্ন, ভালো পরিবেশে বড় হয়েছে বলে মনে হয়। তার ওপরে খুবই সহৃদয়। সম্ভবত 'গে' হতে পারে, ওর মনে হয়। তবে, 'গে' নিয়ে হোশিনোর মনে কোনও অস্বস্তি বা সংস্কার নেই। মানুষের মধ্যে একেকজনের একেকরকম রুচি। পাথরের সঙ্গে কথা বলতে পারে এমন মানুষও আছে। পুরুষমানুষের সঙ্গে পুরুষমানুষ শুলে সেটা অদ্ভুত কিছু নয়।

খাওয়া সারা হলে, হোশিনো উঠে পড়ে বড় করে হাই তুলে, তারপর একাই কাউন্টারে গিয়ে, গরম কফি খেল। নাকাতা কফি খায় না, সে গ্রীনজোনে বসে, বাগানে আসা পাখিদের দেখতে দেখতে থার্মোফ্লাস্কের হোজি চা খাচ্ছিল।

"কেমন লাগছে, উৎসাহব্যঞ্জক বই কিছু পেলেন", ওশিমা হোশিনোকে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, আমি তো বিঠোফেনের জীবনকাহিনীই কেবল পড়ে গেলাম টানা", হোশিনো বলে। "খুব ইন্টারেস্টিং বই। বিঠোফেনের জীবন অনুসরণ করে দেখলে, ভাবার মত অনেক কিছু আছে।"

ওশিমা সামনে মাথা ঝোঁকায়। "হ্যাঁ, বিঠোফেনের জীবন যে খুবই কঠিন জীবন ছিল, বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।"

"হ্যাঁ, খুবই কঠিন জীবন", তরুণ বলে। "তবে কিনা, নেহাতই আমার নিজের ধারণা যদিও, এর জন্য অনেকটাই উনি নিজেই দায়ি ছিলেন। অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটা ওঁর স্বভাবে ছিল না, নিজের কথা ছাড়া ভাবতেনই না। নিজের কথা, আর নিজের সংগীতের কথা, এছাড়া আর কিছুই মাথায় থাকত না। তার জন্য কী ত্যাগ করতে হল সেই নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। বাস্তবে কাছের কেউ হলে সে সহ্য করবে কেন? আমি হলে বলে ফেলতাম হয়তো, 'আরে, লুডভিগ, এবারে ক্ষ্যামা দাও'। ওঁর ভাইপো যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল সে একেবারে অকারণ নয়। কিন্তু ওঁর সংগীতের তুলনা নেই। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। অদ্ভুত মানুষ!"

"ঠিকই বলেছেন", ওশিমা সায় দেয়।

"কিন্তু কেন যে বিশেষ করে অমন কঠোর জীবন কাটাতে হল কে জানে। আরেকটু স্বাভাবিক ভাবে, সাধারণ জীবন যাপন করলেও তো হত বলে মনে হয়—"

ওশিমা হাতের মধ্যে পেনসিলটা ঘোরাতে থাকে। "সেটাই হচ্ছে কথা। কিন্তু বিঠোফেনের যুগে হয়তো ইগোকে অভিব্যক্তি দেওয়াটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। তার আগে, অর্থাৎ রাজন্যবর্গের চূড়ান্ত আধিপত্যের যুগে, হয়তো ওই ধরণের আচরণকে অসমীচীন গণ্য করে, সামাজিক স্খলন হিসেবে, কঠোরভাবে দমন করা হত। উনবিংশ শতকে প্রবেশ করে, সমাজের প্রকৃত ক্ষমতা যখন বুর্জোয়াজি শ্রেণীর হস্তগত হল, তখন তার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধরণের বালাইয়ের থেকে মুক্ত হল সমাজ। আত্মাভিমান তার অভিব্যক্তির জন্য অনেকাংশে একটা মুক্ত পরিবেশ পেল। স্বাধীনতা, ও আত্মাভিমানের প্রসারকে সমার্থক বলা চলে। শিল্পকলা, বিশেষ করে সংগীত, সবার আগে এমত পরিবর্তনের ঢেউয়ের মুখে পড়েছিল। বিঠোফেনের পরে সেই পথ দিয়ে যাঁরা এসে আবির্ভূত হয়েছেন, বার্লিওজ, ওয়াগনার, লিসট, শুম্যান—যাঁর যাঁর নিজের মত করে একসেন্ট্রিক, উদ্দাম জীবন কাটিয়ে গেছেন। ওই ধরণের একসেন্ট্রিসিটিই জীবনযাপনের একটা আদর্শ ধরণ বলে সেই সময়ে মনে করা হত। এর মধ্যে কোনও জটিলতা ছিল না। ওটাকে বলা হয় রোমান্টিকতার যুগ। তবে, আসলে কিন্তু, এই এঁদের পক্ষে, এধরণের জীবনযাত্রা সময় সময় বেশ কঠোরই হয়ে পড়ত বলে মনে হয়", ওশিমা বলে, "বিঠোফেনের সংগীত খুব পছন্দ?"

"পছন্দ কি না বলার মত অতটা বিস্তারিত শুনিনি বিঠোফেন", তরুণ হোশিনো অকপটে বলে। "অধিকাংশই শুনিনি বলেই বলা যায়। আমার কেবল 'তাইকোও ট্রায়ো' বলে নাম্বারটা খুব ভাল লাগে"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“আমারও ওটা খুব ভাল লাগে”

“মিলিয়ন ডলার ট্রায়োরটা আমার খুব মনে ধরেছে”, তরুণ বলে।

ওশিমা জানায়, “ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দ চেকোস্লোভাকিয়ার সুক-ট্রায়ো। খুব সুন্দর ব্যালান্স আছে ওতে, যেন সবুজ ঘাসজমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের মত গন্ধ পাওয়া যায়। তবে, আমি মিলিয়ন ডলার ট্রায়োরটাও শুনেছি। রুবিনস্টাইন-হাইফেৎজ -ফিউয়ারম্যান, ওটাও মনে থেকে যাওয়ার মত সুন্দর বাজনা।”

“ইয়ে, ওশিমা-সান”, কাউন্টারে নাম লেখা আছে, সেটাতে চোখ রেখে তরুণ বলে। “আপনি দেখছি সংগীতের বিষয়ে বিস্তারিত জানেন!”

ওশিমা স্মিত হাসে। “বিস্তারিত বলে ঠিক বলা যায় না, তবে প্রিয় জিনিস। যখন একা থাকি, প্রায়শই শুনি—”

“আচ্ছা, একটা কথা একটু জানতে চাইছি, সঙ্গীতের মধ্যে কি মানুষকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা আছে? অর্থাৎ কিনা, কোনও এক সময় কোনও একটা সঙ্গীত শুনে, তার প্রভাবে নিজের ভেতরে কিছু একটা হঠাৎ করে একেবারে অনেকটা পালটে গেল, এরকম কিছু?”

ওশিমা সামনে মাথা ঝোঁকায়। “অবশ্যই”, সে বলে। “তা তো হয়ই। কোনও একটা অভিজ্ঞতায়, আমাদের ভেতরে কিছু একটা ঘটে গেল। রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন হয়। আর তারপর আমরা নিজেরা নিজেদের ভেতরে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে খেয়াল করি যে সেখানে সবকিছুরই লেভেলটা এক ধাপ ওপরে উঠে গেছে। নিজের জগৎটা এক রাউন্ড প্রসারিত হয়ে গেছে। আমার নিজেরও এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। অল্পই ক'বার হয়েছে বটে, তবে হয়েছে ক'বার। প্রেমের মতই।”

হোশিনোর অবশ্য তেমন বড়সড় প্রেমের অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল, [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশ বড়ো ব্যাপার, তাই না", মুখে বলে। "মানে আর কি, আমাদের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে—"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়", ওশিমা উত্তর দেয়। "এরকম কিছু একেবারেই না থাকলে, জীবন সম্ভবতঃ খুবই মামুলি, নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়বে। বার্লিওজ বলেছেন। *হ্যামলেট* তখনও পড়া হয়নি, এই অবস্থায় যদি আপনার জীবনাবসান হয়ে যায়, তাহলে সেটা সারাটা জীবন কয়লার খনির ভেতরে কাটিয়ে যাওয়ার মতই হবে।"

"কয়লার খনির ভেতরে—"

"উনবিংশ শতকীয় যুক্তি অবশ্য, একটু বাড়াবাড়ি থাকবেই।"

"কফির জন্য ধন্যবাদ", হোশিনো বলে। "কথা বলতে পেরেও ভাল লাগল!"

খুশি হওয়ার ভাব দেখিয়ে ওশিমা স্মিত হাসল।

দু'টো পর্যন্ত সেই তরুণ আর নাকাতা বই পড়ল। নাকাতা আগের মতই হাত-পা নেড়ে, মহা উৎসাহে ফার্নিচারের ছবির সংকলন দেখছিল। দু'জন মহিলা ছাড়াও, দুপুরের পরে আরও তিনজন এলেন রীডিংরুমে বই পড়তে। কিন্তু লাইব্রেরির ভেতরটা ঘুরে দেখতে চায় এমন কেবল সেই তরুণ আর নাকাতা।

"ঘুরে দেখবে তো মাত্র দু'জন, অসুবিধে হবে না তো? কেবলমাত্র আমাদের জন্য এতটা পরিশ্রম করবেন ভাবলে খারাপই লাগছে", তরুণ ওশিমাকে বলে।

"এ নিয়ে ভাববেন না। একজন হলেও খুশি হয়েই ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখান হবে", ওশিমা বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দু'টো বাজতে, সুন্দর মুখশ্রীর এক মাঝবয়েসি মহিলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। মেরুদন্ড টানটান করে হাঁটার ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর। আঁটোসাঁটো কাটের ডার্ক-ব্লু স্যুট পরা, পায়ে কালো হিলের জুতো। চুল পিছনে গোছা করা, বড় করে উন্মুক্ত গলায় সরু রূপোর নেকলেস দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত পরিশীলিত, কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই, রুচির ছাপ স্পষ্ট।

"কোন্নিচিবা। আমি সাএকি। এই লাইব্রেরির অধিকর্তা হিসেবে কাজ করি", মহিলা বললেন। আর শান্তভাবে স্মিত হাসলেন। "তবে, এখানে আমি আর এই ওশিমা-সান, মাত্র এই দু'জনই আছি।"

"আমি হোশিনো", তরুণ বলে।

"নাকাতা নাকানো ওয়ার্ড থেকে এসেছে", পর্বতারোহীর টুপিখানা শক্ত করে দু'হাতে ধরে নাকাতা বলে।

"দূর থেকে আসছেন, স্বাগত জানাচ্ছি", সাএকি-সান বলে। তরুণ হোশিনো প্রস্তরিভূত হয়ে গিয়েছিল, তবে সাএকি-সান যেন খেয়ালই করলেন না। নাকাতাও একেবারে কিছুই খেয়াল করল না।

"হ্যাঁ। নাকাতা একটা খুব বড়ো ব্রিজ পেরিয়ে এসেছে।"

"কী দারুণ একখানা বিল্ডিং," পাশ থেকে তরুণ হোশিনো প্রসঙ্গ পালটে বলে। একবার ব্রিজের গল্প শুরু হলে আরও অনেক কথা বেরিয়ে আসতে থাকবে তখন।

"হ্যাঁ। এই বিল্ডিংটা মেইজি যুগের গোড়াতে, একেবারে প্রথমে ছিল কোওমুরা পরিবারের একটা অতিরিক্ত আর্কাইভ, অতিথিরা এসে থাকার জন্য একটু তফাতে তৈরি করা। বহু সারস্বত ব্যক্তিত্ব এখানে দেখতে এসে, কিছু সময় অতিবাহিত করে গেছেন। ক্রমে তাকামাৎসু শহরের এক মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে এটি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সারস্বত ব্যক্তিত্ব", নাকাতা জিজ্ঞেস করে।

সাএকি-সান মৃদু হাসেন। "সাহিত্যকর্মে অংশগ্রহণ করা লোকেরা—লেখালেখি করে, কবিতা পাঠ করে, উপন্যাস লেখে এমন লোকেদের বলে। সেকালে জায়গায় জায়গায় সম্পন্ন লোকেরা এধরণের শিল্পচর্চাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। শিল্প কথাটার অর্থ এখনকার থেকে তখন আলাদা ছিল, এখনকার মত করে খাওয়ার জিনিস ওটা ঠিক ছিল না। কোওমুরা পরিবারও এখানে, বহুবছর ধরে এইভাবে সংস্কৃতির রক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্পন্নদের অন্যতম ছিল। এই লাইব্রেরিও সেরকম একটা ইতিহাস ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়ে, এখনও চালু আছে।

"সম্পন্নদের কথা নাকাতাও জানে", নাকাতা বলে ওঠে, "সম্পন্ন হতে সময় লাগে।"

মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে সাএকি-সান মাথা ঝোঁকান। "ঠিকই। সম্পন্ন হতে সময় লাগে। যতই অর্থ থাকুক না কেন, সময়কে কেনা যায় না। এবার তাহলে প্রথমে দোতলা থেকে দেখাতে শুরু করি?"

ক্রমান্বয়ে দোতলার এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরছিল ওরা। প্রত্যেকবারই সাএকি-সান সেই ঘরে থেকে যাওয়া সাহিত্যিক, গুণীদের সম্বন্ধে বলে নিয়ে, তাঁদের রেখে যাওয়া লেখা কিংবা কোনও শিল্পকৃতি দেখাচ্ছিলেন। সাএকি-সানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত স্টাডিতে টেবিলের ওপরে, যথারীতি অন্যান্য সময়ের মতই সাএকি-সানের ফাউন্টেন পেনটা রাখা ছিল। ট্যুর চলাকালীন, নাকাতা ওখানকার যাবতীয় কিছু একটা একটা করে গভীর কৌতূহল সহকারে দেখছিল। ওগুলো সম্বন্ধে বলা কথাগুলো খুব একটা কানে যাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। হোশিনোর দায়িত্ব ছিল সাএকি-সানের দেওয়া বিবরণে সায় দিয়ে যাওয়া। সায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিতে দিতেই, নাকাতা কোনওরকম বেচাল কিছু করতে শুরু করে কি না, আতঙ্কিত হয়ে আড়চোখে দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু নাকাতা নেহাতই ওখানকার এটা ওটা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। সাএকি-সানের তরফে, নাকাতা কী করছে না করছে তা খেয়াল করার খুব একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। উনি হাসিমুখে মূল লাইব্রেরির ভেতরের ব্যাপারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁকে খুবই আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ভেবে তরুণ হোশিনো মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

কুড়ি মিনিট মত সময়ের মধ্যেই ট্যুর সমাপ্ত হয়ে গেল। দু'জনে সাএকি-সানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। সবকিছু দেখাতে দেখাতে সাএকি-সান একবারের জন্যও মুখ থেকে স্মিত হাসিটি বিসর্জন দেননি। কিন্তু ওঁকে দেখতে দেখতে, অনেক কিছুই একটু একটু করে বুঝতে পারছে না বলে তরুণ হোশিনোর মনে হচ্ছিল। মানুষটা হাসিমুখে আমাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। অথচ একই সঙ্গে কিছুই যেন দেখছেনও না। অর্থাৎ যেন, আমাদের দেখছেন বটে, আবার একই সঙ্গে অন্যকিছুও দেখছেন। বুঝিয়ে বলতে বলতেও, মাথার মধ্যে যেন অন্য কিছু ভাবছেন। ওঁর ব্যবহারে শিষ্টতা নিখুঁত রকমের, সঙ্গে অমায়িক। প্রশ্ন করলে অমায়িকভাবে সহজ করে উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল যে ওঁর মন তখন ওখানে নেই। অবশ্যই উনি অনিচ্ছুকভাবে কাজটা করছিলেন না। উনি এরকম একটা হাতেকলমে কাজের দায়িত্ব যে ত্রুটিহীনভাবে সামলাচ্ছেন, সেটাতেই খানিকটা খুশিও হচ্ছিলেন। কেবল মনটা ওখানে নেই, এই মাত্র।

দু'জনে রীডিংরুমে ফিরে, সোফার ওপরে যার যার বইয়ের পাতা নিঃশব্দে ওলটাতে থাকল। তরুণ বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে, একই সঙ্গে সাএকি-সানের কথাও ভাবছিল। এই সুন্দরী মহিলার মধ্যে কী যেন একটা অদ্ভুত দিক আছে। কিন্তু সেই অদ্ভুতত্বটা ভাষায় ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছে না। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে ও লেখাপড়ায় ফিরে গেল।

তিনটে বাজতে, নাকাতা কোনও পূর্বাভাস না দিয়েই উঠে দাঁড়াল। নাকাতার চলন বলনের তুলনায় বেশ বিরল ও চোখে পড়ার মত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দৃঢ়তা সহকারে। হাতে পর্বতারোহীর টুপিটা শক্ত করে ধরা।

"আরে, কাকু, কোথাও যাচ্ছেন নাকি", নিচুগলায় তরুণ জানতে চায়। কিন্তু নাকাতা জবাব দেয় না। ঠোঁট দৃঢ়নিবদ্ধ, দ্রুতপদে ঢোকার মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে। মালপত্র পায়ের কাছে মেঝের ওপর রাখা। হোশিনোও বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। হাবভাবটা স্বাভাবিক লাগছে না।

"আরে, একটু দাঁড়ান", হোশিনো বলে। তারপর যখন বুঝতে পারে যে নাকাতা দাঁড়াবে না, তড়িঘড়ি ওর পিছু নেয়। রীডিংরুমের অন্যরা মুখ তুলে ওদের চেয়ে দেখে।

নাকাতা ঢোকার মুখের সামনে এসে বাঁদিকে মোড় নিয়ে, ইতস্তত না করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে। সিঁড়িতে ওঠার মুখে 'বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ' লেখা প্লেট লাগানো আছে, কিন্তু নাকাতা সেটা অগ্রাহ্য করে—অবশ্য ও তো পড়তেই পারে না। টেনিস শ্যু'র ক্ষয়ে যাওয়া রাবারের সোল পায়ের নিচে কাঠের তক্তায় কিচকিচ করে আওয়াজ তুলছিল।

"এই যে, শুনছেন", বলে ওশিমা কাউন্টার থেকে উঠে এগিয়ে আসার উপক্রম করে নাকাতাকে পেছন থেকে বলল। "এখন ওখানে ঢুকতে পারবেন না।"

কিন্তু সেই ডাক যেন নাকাতার কানে গেল না। হোশিনো পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। "কাকু, ওদিকে না, ওদিকে না। যেতে দেবে না", ওশিমাও কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে, তরুণের পিছনে পিছনে উঠতে লাগল।

নাকাতা বিনা দ্বিধায় করিডর ধরে এগিয়ে, স্টাডিতে ঢুকে গেল। স্টাডির দরজা অন্যান্য সময়ের মতই খোলা ছিল। সাএকি-সান জানালার দিকে পিঠ করে, ডেস্কে বসে বই পড়ছিলেন। পায়ের আওয়াজ কানে যেতেই উনি মুখ তুলে, নাকাতাকে দেখতে পেলেন। ডেস্কের সামনে এসে, সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুখোমুখি সাএকি-সানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নাকাতার মুখেও কথা নেই, সাএকি-সানও কথা বলছেন না। তক্ষুণি পেছন পেছন তরুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হোশিনো এসে পড়ল। ওশিমাও এসে হাজির।

"কাকু, এ কী!" হোশিনো বলে। তারপর পেছন থেকে নাকাতার কাঁধে হাত রাখে। "নিজে থেকে এখানে ঢুকে পড়া যায় না। সেটাই নিয়ম। তাই চলুন, আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া যাক।"

"নাকাতার কিছু কথা আছে", সাএকি-সানকে উদ্দেশ্য করে নাকাতা বলে।

"কী কথা", শান্ত গলায় সাএকি-সান জানতে চান।

"কথাটা পাথর নিয়ে। প্রবেশপথের পাথরটার বিষয়ে কথা বলতে চাই।"

সাএকি-সান কিছুক্ষণ চুপ করে নাকাতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখে এক উদাসীন উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে। তারপর কয়েকবার চোখের পলক ফেলে নিয়ে, যে বইটা পড়ছিলেন, শান্তভাবে সেটা বন্ধ করলেন। দু'টো হাত জড়ো করে টেবিলের ওপরে রেখে, সম্বিত ফিরে পেয়ে নাকাতার দিকে তাকালেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কী করা উচিত স্থির করে উঠতে পারছেন না, একবার কেবল ছোট্ট করে সামনে মাথা ঝোঁকালেন। তরুণ হোশিনোর দিকে তাকিয়ে, তারপর ওশিমার দিকে চেয়ে দেখলেন।

"শুধু আমরা দু'জনে কথা বলতে পারলে ভাল হত", ওশিমাকে উনি বললেন, "এই ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে একটু কথা বলব। দরজাটা বন্ধ রেখো তো—"

ওশিমা এক মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্তত করেও, শেষপর্যন্ত মাথা সামনে ঝোঁকাল। তারপর তরুণ হোশিনোর কনুইটা আলতো করে ধরে, করিডরে বেরিয়ে এসে স্টাডির দরজা বন্ধ করে দিল।

"কিছু হবে না তো", হোশিনো জিজ্ঞেস করে।

"সাএকি-সানের বিচারবুদ্ধি খুব প্রখর", হোশিনোকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওশিমা বলে। "উনি রাজি থাকলেই হবে। ওঁর ব্যাপারে বলতে পারি, চিন্তার কিচ্ছু নেই। নিচে গিয়ে আমরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না হয় কফি খাই, হোশিনো-সান।"

"নাকাতা-সানের ব্যাপারে বলতে হলে বলতে হয়, চিন্তা করাটাই নিরর্থক। একেবারেই", তরুণ হোশিনো মাথা নাড়তে নাড়তে বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪১

এবার আঁটঘাট বেঁধে বনে গিয়ে ঢুকলাম। কম্পাস, ছুরি, ওয়াটার বটল, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে খাওয়ার জন্য কিছু খাবারদাবার, মিলিটারির দস্তানা, কিছু যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতির কুঠুরিতে পাওয়া হলুদরঙের স্প্রে-পেইন্ট আর ছোট একটা সোর্ড। এগুলো সব ছোট একটা নাইলনের ডে-প্যাকের মধ্যে (এটাও ওই যন্ত্রপাতির সঙ্গেই ছিল) ভরে, বনের মধ্যে ঢুকলাম। ত্বকের অনাবৃত অংশে কীট-নিবারক স্প্রে লাগালাম। ফুলহাতা শার্ট পরলাম, গলার চারপাশে তোয়ালে জড়িয়ে, ওশিমার থেকে পাওয়া টুপিটা পরে নিলাম। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গুমোট হয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি একবার হবেই। ডে-প্যাকের মধ্যে বৃষ্টি-বাদলায় পরার জন্য পনচো ভরে নেওয়া মনস্থ করলাম। পাখির ঝাঁক নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করতে করতে, নিচু ফ্যাকাসে মেঘের পশ্চাদপটে আকাশের এদিক থেকে ওদিক পার হয়ে যাচ্ছিল।

অন্যান্যবারের মতই, গোল মত ফাঁকা জায়গাটা অবধি সহজেই এগোলাম। মোটামুটি ভাবে উত্তরমুখোই যে চলেছি সেটা চুম্বক দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে, তারপর উত্তরোত্তর বনের আরো ভেতরে পা বাড়ালাম। এবার পেছনে ফেলে আসা গাছপালার গুঁড়িতে, স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে জায়গায় জায়গায় হলুদরঙের চিহ্ন দেগে রাখলাম। ওগুলো অনুসরণ করে করে, আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারার কথা। হ্যানসেল আর গ্রেটেলের গল্পের পাঁউরুটির চিহ্ন আর স্প্রে-পেইন্ট এক নয়, পাখিতে খেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

আপাতত যে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি, তাতে ভয়টা আর আগের মত তীব্র নেই। তবে মনের ওপর চাপ তো অবশ্যই আছে। কিন্তু হৃৎপিন্ডের গতি অনেক শান্ত, ধীর। যেটা আমাকে ঠেলছে, সেটা হল কৌতূহল। এই সুঁড়িপথ ধরে গিয়ে সামনে কী আছে, সেটা জানতে হবে। যদি কিছু না থেকে থাকে, কিছু যে নেই সেটাই জানতে চাই। *ওটা আমাকে জানতেই হবে*। গভীর মনোযোগ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সহকারে চারপাশের সবকিছু মাথায় রেখে রেখে, এক'পা এক'পা করে নিশ্চিত পদক্ষেপে সামনে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছি।

কখনো কখনো কোথাও একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কেমন যেন, কিছু একটা মাটির ওপরে এসে পড়ার মত আওয়াজ, কিংবা ভারি কিছুর মেঝেয় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তোলার মত পরিচিত আওয়াজ। এছাড়াও, ভাষায় ঠিকমত প্রকাশ করা যায় না এমন সব অদ্ভুত আওয়াজ। কিন্তু এগুলোর কী অর্থ, আমার জানা নেই। অনুমান করাই কঠিন। এই আওয়াজগুলো যেন বেশ দূর থেকে আসছে বলেও মনে হয়, আবার একেবারে কাছেপিঠেই কোথাও বলেও কখনো মনে হচ্ছে। এখানে দূরত্ববোধটা কখনো দীর্ঘায়িত হচ্ছে, কখনো সংকুচিত হচ্ছে বলে মনে হয়। মাথার ওপরে পাখিদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই শব্দ আশ্চর্যরকম জোরালো হয়ে, হয়তো আসলটার চেয়েও উচ্চকিত হয়ে উঠছে। ওরকম শব্দ শুনলে, আমি হাঁটা থামিয়ে, কান পেতে শুনি। রুদ্ধশ্বাসে কিছু একটা ঘটবে বলে অপেক্ষা করি। কিন্তু কিছুই ঘটে না। আমি আবার হাঁটতে থাকি।

সময় সময় এরকম হঠাৎ করে হওয়া শব্দের কথা বাদ দিলে, চারপাশে মোটামুটি নৈঃশব্দ্যই বিরাজ করছে। হাওয়া নেই, মাথার ওপরে গাছের পাতার মর্মরধ্বনিও নেই। শোনা যাচ্ছে শুধু ঘাসের মধ্যে দিয়ে সামনে এগিয়ে চলা আমার পায়ের শব্দ। পায়ের কাছে পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা মাড়িয়ে গেলে, খটাস করে শব্দ চারদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

পাথরে শাণ দিয়ে নেওয়া তলোয়ারটা আমার ডানহাতে ধরা। দস্তানা না পরা হাতের তালুতে তলোয়ারের বাঁটের রুক্ষ স্পর্শ। ওটার শাণিত ফলাটা সত্যিই কাজে লাগবে এমন পরিস্থিতি আপাতত নয়। কিন্তু হাতে ওটার যুৎসই ওজনটা, আমি যে সুরক্ষিত এই ভরসা দিচ্ছে। আমি সুরক্ষিত—কিন্তু আদৌ কীসের থেকে? শিকোকুর এই অরণ্যে ভালুকও নেই, নেকড়েও নেই। বিষধর সাপ হয়তো অল্প কিছু থাকতে পারে। তবে, ভাল করে ভেবে দেখলে, জঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণীটি হয়তোবা আমিই বলে মনে হল। প্রকৃতপক্ষে আমি তো আমার নিজের সেই দিকটারই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আশঙ্কায় মরছি, তাই না?

তা সত্ত্বেও জঙ্গলের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে, কেউ আমাকে দেখছে, কেউ আমার কথা শুনছে এরকম মনে হতে থাকে। কিছু একটা, কোনও জায়গা থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। শ্বাস চেপে রেখে, চারপাশের দৃশ্যের মধ্যে নিজের চেহারা লুকিয়ে রেখে, আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। দূরে কোথাও, কিছু একটা, আমার করা কোনও শব্দ কান খাড়া করে শুনছে। আর, আমি কী উদ্দেশ্যে, কোথায় চলেছি তা আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি *ওদের* সম্বন্ধে না ভাবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এগুলো সম্ভবত বিভ্রম, বিভ্রম এমনই জিনিস, যতই এই নিয়ে ভাবা যায়, ততই আরও ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠে, আরও স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। তারপর একসময় আর নেহাত বিভ্রম হয়ে থাকে না।

নৈঃশব্দ ভরাট করতে আমি শিস দিতে শুরু করি। 'মাই ফেভারিট থিংস', জন কলট্রেনের সোপ্র্যানো স্যাকস। অবশ্যই আমার এলোমেলো অস্পষ্ট শিস, পর্দাগুলোর ঘনসন্নিবেশ ঘটিয়ে বিস্তার করা ওই জটিল অ্যাড-লিব মোটেই অনুসরণ করতে পারছিল না। স্মৃতি থেকে, ওই সুরের চলনে কিছুটা কিছুটা করে পর্দা বসাতে পারছিলাম কেবল। তবে, নেই মামার চেয়ে কানামামা ভাল। হাতের ঘড়িতে চোখ রাখলাম। সকাল সাড়ে দশটা। নির্ঘাত ওশিমা এখন লাইব্রেরি খোলার ব্যবস্থা করছে। আজ বুধবার। বাগানে জল দিয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল মুছে, জল গরম করে কফি বানানোর কথা মনে ফুটে উঠল। এগুলো সাধারণত আমিই করি। কিন্তু এখন আমি এভাবে গভীর বনের মধ্যে। আর, আরো গভীর জঙ্গলের দিকে হেঁটে চলেছি। কেউ জানেনা যে আমি এখানে। জানার মধ্যে আমি, আর *ওরা*।

একটা পথ ধরে চলেছি। হয়তো এটাকে পথ বলা কঠিন। হয়তো জলধারা বয়ে বয়ে গিয়ে অনেকটা সময় নিয়ে তৈরি হওয়া একটা প্রাকৃতিক প্যাসেজ। অরণ্যে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হলে, উচ্চগতিসম্পন্ন জলস্রোত প্রবলভাবে মাটিতে ক্ষয় ধরিয়ে, ঘাস উপড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, গাছপালার শিকড়কে অনাবৃত করে ফেলে। বড় পাথর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

থাকলে তাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তা করে নেয়। বৃষ্টি থেমে জল সরে গেলে ওটা শুকনো নদীখাত হয়ে গিয়ে, লোক চলাচলের রাস্তার মত হয়ে যায়। এহেন রাস্তার বেশিরভাগটাই ফার্নে কিংবা সবুজ ঘাসে ঢাকা পড়ে যায়। সতর্ক না থাকলে অনতিবিলম্বেই রাস্তা দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে। কোথাও কোথাও খাড়া উৎরাই থাকায়, আমি গাছের শেকড় ধরে ধরে সেগুলো বেয়ে উঠে গেলাম। কখন যেন জন কোলট্রেন শিস দিয়ে সোপ্র্যানো স্যাকসের সোলো থামিয়ে ফেলেছে। আর এখন, কানে বাজছে ম্যাককয় টাইনারের পিয়ানো সোলো। বাঁহাত মিশিয়ে দিচ্ছে ওঠাপড়াহীন রিদম্-প্যাটার্ন, আর ডানহাত জড়ো করছে ওজনদার সব নিষিদ্ধ কর্ড। এটা কারুর একটা (নামহীন, মুখাবয়বহীন কারুর) ঝাপসা অন্ধকার অতীতকে, নাড়িভুড়ির মত সড়সড় করে অন্ধকারের ভেতর থেকে টেনে বের করে এনে সেটার চেহারাটা খুঁটিনাটি সহকারে পরিষ্কার ভাবে, একেবারে পুরানকাহিনীর দৃশ্যের মত ফুটিয়ে তুলছে। অন্তত আমার কানে সেরকমই শোনাল। প্রবল অধ্যবসায় সহকারে উপর্যুপরি একটু একটু করে বাস্তবের জমিকে কেটে টুকরো টুকরো করে আবার জুড়ে দিচ্ছে। এখানে একটা আবছা সম্মোহনী বিপদের গন্ধ আছে। অরণ্যের সঙ্গে যার খুব মিল।

বাঁহাতে ধরা স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে গাছপালার গুঁড়িতে চিহ্ন দিতে দিতে, আমি সামনে এগোতে থাকি। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে, সেই হলুদ দাগ ঠিকমত দেখা যাচ্ছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছিলাম। ঠিকই আছে, কোনও সমস্যা নেই। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ফেরার রাস্তা নির্দেশ করার চিহ্নগুলো সমুদ্রের ওপর বয়ার মত একটু এলোমেলো ভাবে পরপর চলে গেছে। নিশ্চিত করতে আমি তলোয়ার দিয়ে গাছের গুঁড়িতে জায়গায় জায়গায় দাগ কেটে রাখছিলাম। ওটাও একটা চিহ্নই। যেকোনও গাছেই ঠিকমত দাগ কাটা যায় না। এই ছোট্ট সোর্ডটা দিয়ে একেবারেই দাঁত বসানো যায় না এমন জিনিসও আছে। তেমন মোটা নয়, নরম বলে মনে হচ্ছে এমন গাছ থাকলে, আমি সেটায় সোর্ড দিয়ে একেবারে নতুন আঁচড়ের দাগ কেটে দিচ্ছি। গাছেরা নীরবে সেই আঘাত সহ্য করে নিচ্ছে। বড়বড় কালো মশা মাঝেমাঝে, ঠিক যেন টহলদারের মত এসে হাজির হচ্ছে। ওরা আমার চোখের চারপাশের খোলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জায়গার মাংসে হুল ফোটানোর চেষ্টায় আছে। পুনপুন করে পাখা আন্দোলিত করার আওয়াজ কানে এসে ঢুকছে। ওগুলো হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছি, নইলে থাপ্পড় দিয়ে থেঁতো করে দিচ্ছি। হাত দিয়ে মারলে, ফচ করে উঠছে। কখন যেন এরই মধ্যে আমার রক্ত খেয়ে ফুলে আছে। চুলকোচ্ছে একটু পর থেকে। হাতের তালুতে লেগে যাওয়া রক্ত, গলায় জড়ানো তোয়ালেতে মুছে নিচ্ছি।

এই বনের মধ্যে মার্চ করে যাওয়া অনেককাল আগের সৈন্যরাও, যদি সেটা গ্রীষ্মকাল হয়ে থাকে, মশার দ্বারা উত্যক্ত হয়েছিল হয়ত। কিন্তু *সম্পূর্ণ রণসজ্জা* বলে জিনিসটার ওজন কীরকম ছিল? লোহার বান্ডিলের মত পুরাকালের রাইফেল, প্রচুর গুলিগোলা, বন্দুকের বেয়নেট, লোহার হেলমেট, কিছু হ্যান্ড-গ্রেনেড, সঙ্গে অবশ্যই খাবারদাবার আর জল, ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য কাঁধে ঝোলানো বেলচা, বাসনপত্র—কুড়ি কিলো মত হবে না কি? বেশ ভারী হওয়ারই কথা। আমার এই নাইলনের ডে-প্যাকের মত নয়। সামনেই যে ঝোপটা, ওখানে মোড় নিলেই ওই সৈন্যদের মুখোমুখি হব এরকম একটা অলীক কল্পনা আমাকে পেয়ে বসল। যদিও, সেই যে সৈন্যরা এখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সে আজ ষাট বছরেরও বেশি আগের ঘটনা।

কেবিনের পর্চে বসে পড়া নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের কথা আমার মনে পড়ল। ১৮১২ সালের গ্রীষ্মে মস্কো অবধি দীর্ঘ পথ মার্চ করে আসা ফ্রান্সের মিলিটারির সৈন্যরাও, হয়তো মশার কবলে পড়েছিল। পড়ারই কথা। একথা কেউ বলবে না যে একমাত্র মশার ঝঞ্ঝাটই তাদের পোহাতে হয়েছিল। ফ্রান্সের মিলিটারির সৈন্যদের অন্যান্য আরও অনেক কিছুর সঙ্গেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করতে হয়েছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা, কর্দমাক্ত খারাপ রাস্তা, ছোঁয়াচে অসুখ, গুমোট গরম, তীব্র গরম, দীর্ঘায়িত রসদ সরবরাহ লাইন আক্রমণ করা কসাক ঝটিকাবাহিনী, চিকিৎসার সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, আর অবশ্যই রাশিয়ার প্রশিক্ষিত রেগুলার আর্মির বিরুদ্ধে বেশ কিছু বড়ো যুদ্ধ। শহরবাসীরা পালিয়ে গেছে এমন জনহীন মস্কোতে শেষ অবধি দখল নিতে ঢুকতে পারা সৈন্যের সংখ্যা, প্রাথমিক পাঁচ লক্ষ থেকে নেমে এক লক্ষতে দাঁড়িয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হাঁটা থামিয়ে, ওয়াটার বটলের জলে গলা ভিজিয়ে নিলাম। হাতের ঘড়িতে দেখাচ্ছে ঠিক এগারোটা। লাইব্রেরি খোলার সময়। কল্পনা করলাম, ওশিমা গেট খুলে, কাউন্টারের চেয়ারে এসে বসল। ডেস্কের ওপরে অন্যান্য দিনের মতোই তীক্ষ্ণ করে কাটা পেনসিলটা রাখা রয়েছে নির্ঘাত। মাঝেমাঝে ও পেনসিলটা নিয়ে, হাতের মধ্যে বনবন করে ঘোরাচ্ছে। রাবারের দিকটা দিয়ে কপালের এক কোণে চেপে ধরে আছে। এইসব দৃশ্য মাথার মধ্যে কল্পনায় একেবারে প্রত্যক্ষের মত ভেসে উঠছে। কিন্তু সে জায়গা তো কী বিষম দূর!

ওশিমা বলেছিল। আমার তো ঋতুক্ষরণ হয় না। *স্তনবৃন্তে কোনও বিশেষ অনুভূতি নেই, তবে ক্লিটোরিসে অনুভূতি আছে। যৌনসংগম যোনি দিয়ে নয়, পায়ু দিয়ে হয়।*

কেবিনের খাটে, দেওয়ালের দিকে ফিরে ঘুমন্ত ওশিমার কথা মনে পড়ল। আর তারপর ওর ওখানে অবস্থানের, রেখে যাওয়া রেশটুকুর কথাও মনে পড়ল। ওই একই খাটে আমি যেন সেই রেশটুকু পরিবৃত হয়ে ঘুমোলাম। তবে সেই নিয়ে এর চেয়ে বেশি আর না ভাবাই ভাল।

তার পরিবর্তে যুদ্ধ নিয়ে ভাবতে থাকলাম। নেপোলিয়নের যুদ্ধ নিয়ে ভেবে, যে যুদ্ধে জাপানের মিলিটারির সেনাদের লড়তে হয়েছিল, সেটা নিয়ে ভাবলাম। সোর্ডের ভরসাজনক ওজনটা হাতের মধ্যে অনুভব করলাম। ওটার সদ্য শাণ দেওয়া ধারালো প্রান্তভাগের ঔজ্জ্বল্য নতুন করে আমার চোখে এসে বিঁধল। কিছু ভাবার আগেই আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। লোকেরা লড়াই করে কেন? কেনই বা লক্ষ লক্ষ লোককে দলবদ্ধ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে হয়? এই লড়াই কি ঘৃণাবশত সংঘটিত হয়, না কি ভয়ের থেকে হয়? না কি, ভয় আর ঘৃণা, একই সত্ত্বার আলাদা আলাদা পার্শ্বতল বই কিছু নয়?

গাছপালার গুঁড়িতে সোর্ড দিয়ে আঘাত করলাম। ওরা নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠল, অদৃশ্য রক্তপাত হল। আমি হাঁটতে থাকলাম। জন কলট্রেন আবার সোপ্র্যানো স্যাকস হাতে তুলে নিল। ফের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফিরে আসা পুনরাবৃত্তি বাস্তবের জমিকে খন্ড খন্ড করে ফেলে, ফের একত্র করল।

আমার মনটা কখন যেন স্বপ্নের জগতে পা বাড়িয়ে ফেলেছে। নিঃশব্দে ওটা ফিরে আসছে। আমি সাকুরাকে জড়িয়ে ধরে আছি। আমার দুহাতের মধ্যে ওর শরীরটা, আমি ওর মধ্যে প্রবেশ করেছি। এটা সেটা খুশিমত আমায় হয়রান করে যাবে, এ আর আমি হতে দেব না। কিছুতেই দোনামোনা করব না। এর মধ্যেই পিতাকে হত্যা করেছি। এর মধ্যেই মা'কেও ধর্ষণ করেছি। আর এইভাবে দিদির ভেতরে প্রবেশ করেছি। যদি এতে কোনও অভিশাপ লাগার হয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে গ্রহণ করব। তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে ফেলতে হবে কাজটা। এক্ষুণি এই ভার কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলতে চাই। আর তারপরে কারুর একটা প্রত্যাশার মধ্যে জড়িয়ে আটকে পড়া কেউ একজন না হয়ে, আমি আমার মত করে বাঁচতে চাই। এটাই আমার বাসনা। এরপরেই আমি ওর অভ্যন্তরে বীর্যপাত করলাম।

"এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও, তোমার ওটা করা উচিত হয়নি", কারাসু বলে ছেলেটা আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল।

ও আমার পেছনেই ছিল। আমার সঙ্গেই বনের মধ্যে হাঁটছে ও।

"আমি তখন তোমাকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তোমারও সেটা জানার কথা। আমার কথা তুমি ঠিকমতই শুনতে পেয়েছ বলেই মনে হয়। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না। আগের মতই অগ্রসর হতে থাকলে।"

আমি জবাবও দিলাম না, ফিরে তাকালামও না, কেবলমাত্র চুপচাপ পা টেনে টেনে এগিয়ে চললাম।

"এইসব করে তুমি ভেবেছিলে যে তোমার ওপর যে অভিশাপ, সেটা অতিক্রম করে যেতে পারবে। তাই না? কিন্তু করে কি সেটা হল", কারাসু বলে ছেলেটা প্রশ্ন করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু করে কি সেটা হল? পিতাকে হত্যা করে, মা'কে ধর্ষন করে, দিদিকে ধর্ষন করলে। ভবিষ্যৎবাণীকে এক এক করে বাস্তবে রূপ দিয়েছ। তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এতে করে পিতার দেওয়া অভিশাপের পরিসমাপ্তি ঘটার কথা। কিন্তু আসলে একটারও পরিসমাপ্তি ঘটেনি। পেরিয়েও যেতে পারনি। ওই অভিশাপ বরং আগের চেয়েও প্রকটভাবে তোমার অন্তরকে দগ্ধ করছে। ওটা তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে চতুর্দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসে ভর করে জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। তোমার ভেতরের অশুভ বিভ্রান্তি, তোমার অজান্তেই, ওর মধ্যে আছে। তাই নয় কি? তোমারই আমন্ত্রণ করে আনা ভয়, ঘৃণা, অস্থিরতাবোধ একটুও অপসারিত হয়নি। ওগুলো এখনও তোমার মধ্যে থেকে গিয়ে, নিরন্তর তোমাকে পীড়া দিয়ে যাচ্ছে।

"একটা কথা বলি, লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য লড়াই বলে কিছু নেই, জান তো", কারাসু বলে ছেলেটা বলে। "লড়াই, লড়াইয়েরই মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে। হিংসার মাধ্যমে বইয়ে দেওয়া রক্ত পান করে, হিংসার মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতের মাংস চিবিয়ে পুষ্টি পায়। লড়াই জিনিসটা একধরণের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী। এটা তোমাকে জানতে হবে!"

দিদি, আমার মুখ দিয়ে বেরোয়।

সাকুরার সঙ্গে জোর খাটিয়ে সংগম করা আমার উচিত হয়নি। *এমনকি স্বপ্নে হলেও।*

"এখন তাহলে আমি কী করতে পারি", সামনে মাটির দিকে তাকিয়ে আমি জানতে চাই।

"সেটাই তো, যেটা করতে হবে, সেটা সম্ভবত এই যে তোমাকে তোমার ভেতরের ভয়, ঘৃণা, এগুলোকে অতিক্রম করে যেতে হবে", কারাসু বলে ছেলেটা বলে। ওখানে আলো প্রবেশ করতে দিয়ে, তোমার মনের হিমায়িত অংশটিকে গালিয়ে ফেলতে হবে। সেটাই হল সত্যিকারের টাফ হয়ে ওঠা। বুঝতে পারছ তো আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

যেটা বলছি? এখনও দেরি হয়ে যায়নি। এখনও তুমি সত্যিই নিজেকে ফিরে পেতে পার। মাথা খাটিয়ে ভাব। ভাব, কী করা উচিত। তুমি আদৌ নির্বোধ নও। ভাবতে পারার কথা।"

"আমি কি সত্যিই বাবাকে খুন করেছি", আমি জানতে চাই।

কোনও উত্তর নেই। আমি পিছন ফিরি। কারাসু বলে ছেলেটা আর ওখানে নেই। আমার প্রশ্নটা নৈঃশব্দ গ্রাস করে নেয়।

গভীর অরণ্যের মধ্যে, এক্কেবারে একা, আমি নিজে মানুষটা ভয়ানক ফাঁপা, শূন্য বলে মনে হতে থাকে। কবে যেন আমি, সেই ওশিমা যে বলেছিল, 'শূন্যগর্ভ মানুষ', সেটাই হয়ে গেছি বলে মনে হল। আমার মধ্যে একটা বড় শূন্যতার পরিসর আছে। আর সেই শূন্যতা এখনও একটু একটু করে ফুলেফেঁপে উঠে, আমার মধ্যে পড়ে থাকা অন্তঃসারটুকু দ্রুত কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। 'আমি' বলে জিনিসটার অস্তিত্বই টের পাচ্ছি না ক্রমে ক্রমে। আমি সত্যিই দিশেহারা বোধ করছি। যেখানে কোনও দিকনির্দেশ নেই, আকাশও নেই, মাটিও নেই। সাএকি-সানের কথা ভেবে, সাকুরার কথা ভেবে, আমি ওশিমার কথা ভাবলাম। কিন্তু ওরা যেখানে, আমি সেখান থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে আছি। বাইনোকুলারের উলটো দিক দিয়ে দেখলে যেমন, যতদূরই হাত বাড়াই না কেন, ওদের ছুঁতে পারব না। আমি একাকি, ঝাপসা অন্ধকারে গোলকধাঁধার মধ্যে রয়েছি। বাতাসের শব্দে কান পেতে শুনো, ওশিমা বলেছিল। আমি কান পাতলাম। কিন্তু কই, বাতাস বইছে না। কারাসু বলে ছেলেটাও কোথায় উধাও।

মাথা খাটিয়ে ভাব। ভাব, কী করা উচিত।

কিন্তু এখন আর কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। যাই ভাবি না কেন, শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছচ্ছি সেটা গোলকধাঁধার আশেপাশেই কোথাও। কিন্তু আমার ভেতরে আছেটা কী? সেটা কি শূন্যতাকে প্রতিরোধ করতে পারবে?

এখানে এই অবস্থায়, আমার নিজের অস্তিত্বটাকেই মুছে দিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারলে কেমন হয়, গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলাম সেটা। গাছপালার এই পুরু দেওয়ালের মাঝখানে, পথ নয় এমন পথের ওপরে, শ্বাস নেওয়া থামিয়ে, চেতনাকে শান্তভাবে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে, হিংসাকে ধারণ করে রাখা এই অশুভ রক্ত শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত বইয়ে, যাবতীয় জিন ভূপৃষ্ঠে আগাছার মধ্যে পচতে দিয়ে। এটা করলেই হয়তো সর্বপ্রথম আমার লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমার তাই মনে হয়। আর যদি সেটা না করি, অনন্তকাল পিতাকে হত্যা করে যাব, মা'র সম্মানহানি করে যাব, দিদির সম্মানহানি করে যাব, পুরো পৃথিবীরই ক্ষতি করে যেতে থাকব হয়ত। চোখ বুজে, নিজের কেন্দ্রটিকে অবলোকন করার চেষ্টা করলাম। ওটাকে ছেয়ে আছে এক ভয়ানক অসমান রুক্ষ অন্ধকার। কালো মেঘ ফাঁক হয়ে গেলে, অতসীগাছের পাতাগুলো, চাঁদের আলো পড়ে হাজারটা ফলার মত চকচক করতে থাকে।

এই সময় ত্বকের একেবারে ভেতরে কিছু একটা নতুন করে ভেঙেচুরে রূপ নিচ্ছে বলে অনুভব করলাম। মাথার ভেতরে ঠুনঠুন করে শব্দ শোনা গেল যেন। আমি চোখ খুললাম, গভীর করে শ্বাস টেনে নিলাম। আর, স্প্রে পেইন্টের কৌটোটা পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সোর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কম্পাসও ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সবগুলোই সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল। যেন অনেক দূর থেকে আসা শব্দের মত শোনাল। নিজেকে অনেক হালকা বোধ করতে লাগলাম। পিঠ থেকে ডে-প্যাকটা নামিয়ে সেটাও মাটিতে ফেলে দিলাম। আমার স্পর্শানুভূতি আগের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। চারপাশের বাতাস আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। বনের মধ্যে যে আছি এই অনুভূতিটা আরো ঘন হয়ে আসে। কানের ভেতরে জন কলট্রেন এখনো গোলকধাঁধার মত সেই সোলো চালিয়ে যাচ্ছে। ওই জিনিসের পরিসমাপ্তি বলে কিছু হয় না।

পুনর্বিবেচনা করে দেখে, ডে-প্যাকের ভেতর থেকে হান্টিং নাইফটা বের করে, পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। বাবার ডেস্কের থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম ধারালো ছুরিটা। প্রয়োজন পড়লে কব্জির শিরা কেটে, আমার ভেতরের সব রক্ত মাটিতে বইয়ে দেওয়া যাবে। তাতেই যন্ত্রটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি জঙ্গলের একেবারে অভ্যন্তরের দিকে পা বাড়ালাম। *আমি এক শূন্যগর্ভ মানুষ*। সমস্ত অন্তঃসার গিলে ফেলতে থাকা একটা শূন্যতা। সেই জন্যেই আর ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। কোনও কিছুকেই।

এবার আমি অরণ্যের অভ্যন্তরে পা বাড়ালাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘরে যখন শুধু দুজনই, সাএকি-সান নাকাতাকে চেয়ারে বসতে আর্জি জানালেন। একটু ভেবে নিয়ে নাকাতা সেখানে বসল। কিছুক্ষণ কোনও কথা না বলে, টেবিলের দুদিক থেকে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। নাকাতা কোলের ওপর পর্বতারোহীর টুপিটা রেখে, অন্যান্য সময়ের মতই হাতের তালু দিয়ে ছোট করে ছাঁটা চুলে বেগে হাত বুলোতে থাকল। সাএকি-সান টেবিলের ওপর দুহাত জড়ো করে রেখে, নাকাতার ওই হাবভাব শান্ত হয়ে দেখতে থাকলেন।

"আশা করি ভুল বুঝবেন না, আমি সম্ভবতঃ, আপনার আসার প্রতীক্ষায় ছিলাম", সাএকি-সান বললেন।

"হ্যাঁ। সেরকম হওয়ারই সম্ভাবনা বলে নাকাতাও মনে করে", নাকাতা বলে। "তবে, সময় লাগল। খুব বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করাইনি তো? নাকাতার পক্ষে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করেছে নাকাতা, একেবারে যথাসাধ্য।"

সাএকি-সান মাথা নাড়লেন। "না, না। সেরকম কিছুই নয়। এর চেয়ে তাড়াতাড়িই হোক, বা এর চেয়ে দেরিতেই হোক, আমি যে খুব দিশেহারা হয়ে পড়তাম, তা তো নয়। আমার কাছে, এখনই হচ্ছে একেবারে সঠিক সময়।"

"হোশিনো-সান দয়া করে অনেক সাহায্য করেছেন। উনি না থাকলে নাকাতার একার পক্ষে আরও অনেক সময় লাগত বলে মনে হয়। নাকাতার যেহেতু অক্ষরজ্ঞানই নেই।"

"হোশিনো-সান আপনার বন্ধু, তাই তো?"

"হ্যাঁ", নাকাতা বলে। তারপর মাথা সামনে ঝোঁকায়। "তাই হবে হয়ত। তবে সত্যি বলতে কী, নাকাতার এই দিকটা ভালো জানা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেই। বেড়ালমশাইদের কথা বাদ দিলে, জন্মে থেকে অদ্যাবধি, বন্ধু বলা যায় এমন একজনও ছিল না নাকাতার।"

"আমারও, দীর্ঘ সময় ধরে, বন্ধু বলা যায় এমন কেউ ছিল না", সাএকি-সান বললেন। "স্মৃতিচারণের কথা যদি না ধরি আর কি!"

"সাএকি-সান!"

"হ্যাঁ", সাএকি-সান উত্তর দেন।

"সত্যি কথা বলতে কী, নাকাতার কোনও স্মৃতি নেই। আর তার সঙ্গে বলব,সেটা নাকাতার মাথাটা নিরেস বলেই। স্মৃতি জিনিসটা, আদৌ কেমন জিনিস?"

সাএকি-সান টেবিলের ওপরে রাখা নিজের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে, তারপর আবার নাকাতার মুখের দিকে তাকালেন।

"স্মৃতি ভেতর থেকে আপনার শরীরকে উষ্ণতা দেয়। আবার একই সঙ্গে, আপনার দেহকে ভেতর থেকে উন্মত্ত ভাবে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে—"

নাকাতা মাথা নাড়ে, "কঠিন সমস্যা। স্মৃতি ব্যাপারটা নাকাতা এতেও ভাল বুঝতে পারল না। একমাত্র এই সময়ের কিছু হলে নাকাতা ঠিকমত বোঝে।"

"কী করে যেন আমি এর ঠিক উলটোটা", সাএকি-সান বলে।

কিছুক্ষণের জন্য গভীর নৈঃশব্দ নেমে আসে ঘরের মধ্যে। নাকাতাই শেষপর্যন্ত সেই নৈঃশব্দকে ছিন্ন করল। ছোট করে গলা খাকারি দিল।

"সাএকি-সান!"

"বলুন, কী?"

"আপনি তো প্রবেশপথের পাথরটার কথা অবগত আছেন, তাই না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ, জানি", উনি বলেন। ওঁর হাতের আঙুল গিয়ে ডেস্কের ওপরের মঁ ব্লাঁ ফাউন্টেন পেনটাকে ছুঁল। "অনেক আগে এক জায়গায় *ওটার* মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম আমি। হয়ত বা অজানা থেকে গেলেই ভাল হত। কিন্তু সে তো আর আমার হাতে ছিল না।"

"নাকাতা কয়েকদিন আগে ওটা আরেকবার খুলেছিল। দুপুরের পরে খুব বাজ পড়ছিল। অনেক বজ্রমশাই শহরের ওপরে এসে পড়লেন। হোশিনো-সান আমাকে সাহায্য করেছিলেন। নাকাতা একা পারত না। বাজ পড়ার দিনের কথা অবগত আছেন কি?"

সাএকি-সান মাথা সামনে ঝোঁকালেন, "মনে আছে।"

"খুলতেই হত বলে নাকাতা ওটা খুলেছিল।"

"বুঝতে পেরেছি। নানা কিছুকে ফের জায়গা মত ফিরিয়ে আনার জন্য।"

নাকাতা এবার মাথা সামনে ঝোঁকায়। "ঠিকই বলেছেন।"

"আপনার মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে।"

"যোগ্যতা জিনিসটা নাকাতা ভাল বুঝতে পারে না। কিন্তু, সাএকি-সান, আমাদের কোনভাবেই কোনও উপায়ান্তর ছিলনা। সত্যি কথাটা হল, নাকাতা নাকানো ওয়ার্ডে একজন লোককে খুন করেছে। নাকাতার খুন করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জনি ওয়াকার-সানের নির্দেশ মত, ওখানে যে পনের বছরের ছেলেটার থাকার কথা ছিল, তার জায়গায় নাকাতা গিয়ে একজন লোককে খুন করল। নাকাতাকেই কাজটার ভার নিতে হল।"

সাএকি-সান চোখ বন্ধ করে, তারপর আবার খুলে নাকাতার মুখের দিকে তাকালেন। "সুদূর অতীতে আমি ওই প্রবেশপথের পাথরটা খুলে ফেলেছিলাম বলেই কি এত কিছু ঘটল? ওটার কি এখনও কার্যকারিতা রয়ে গেছে, এখনও এখানে ওখানে বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাকাতা মাথা নাড়ে, "সাএকি-সান!"

"হ্যাঁ", উনি বলেন।

"নাকাতার অদ্দূর অবধি জানা নেই। নাকাতার কারবার হচ্ছে, এই এখন, এখানে, বর্তমানের সবকিছু, ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত, সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। সেই উদ্দেশ্যেই নাকানো ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে, বড় একটা ব্রিজ পেরিয়ে, শিকোকু অবধি এসেছে। আর এটাও জানেন হয়তো, সাএকি-সান এখানে আর থাকতে পারবেন না।"

সাএকি-সান স্মিত হাসেন। "বেশ", উনি বলেন। "বহুদিন ধরে আমি সেটাই চাইছিলাম, নাকাতা-সান। অতীতেও এটাই চেয়েছি, বর্তমানেও এটাই চাইছি। কিন্তু কিছুতেই সেটা হচ্ছিল না। আমার কাজ ছিল—এককথায়, এইসময়টা এসে হাজির হওয়ার—কেবল স্থির হয়ে অপেক্ষায় থাকা। অনেক পরিস্থিতিতেই কাজটা ছিল কষ্টকর। তবে কিনা, সেই কষ্টটা নির্ঘাত দায়িত্ব হিসেবেই আমার ওপর বর্তেছিল বলে মনে হয়।"

"সাএকি-সান", নাকাতা বলে। "নাকাতার ছায়াটা অর্দ্ধেক। সাএকি-সানের মতই।"

"হ্যাঁ।"

"ওটা নাকাতা এর আগে, যুদ্ধের সময় খুইয়েছিল। কেন যে ওরকম হয়েছিল, কেনই বা ওটা নাকাতার ক্ষেত্রেই ঘটতে হল, নাকাতা ঠিক জানে না। সে যাই হোক না কেন, তারপর বহুদিন কেটে গেছে। আমাদের এবার ক্রমে ক্রমে এস্থান ত্যাগ করতে হবে।"

"জানি সেটা।"

"নাকাতা দীর্ঘকাল বেঁচে আছে। কিন্তু একটু আগেই যেটা বললাম, নাকাতার স্মৃতি বলে কিছু নেই। তাই, সাএকি-সান যে বললেন, 'কষ্টকর', এই অনুভূতিটা নাকাতা ঠিক বুঝতে পারল না। তবে, নাকাতার ধারণা, যতই কষ্টকর হোক না কেন, সেই স্মৃতি সাএকি-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সান সম্ভবত হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না, তাই না?"

"হ্যাঁ", সাএকি-সান বললেন। "ঠিকই বলেছেন। ওটাকে আঁকড়ে থাকা যতই কষ্টদায়ক হোক, যতদিন বেঁচে আছি ওই স্মৃতি হাতছাড়া করব বলে মনে হয় না। বেঁচে থাকার ওটাই একমাত্র অর্থ ও প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নাকাতা নীরবে সামনে মাথা ঝোঁকায়।

"প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে, আমি বহু মানুষ ও জিনিস হারাতে থেকেছি", উনি বলে চলেন। "আপনি যে পনের বছরের ছেলেটার কথা বললেন, সেই ছেলেটার সঙ্গে আমার যৌনসম্পর্ক হয়েছে। এই সেদিনের কথা। আমি ওই ঘরে আরো একবার পনের বছরের ছেলেটার কাছে ফিরে গিয়ে ওর সঙ্গে সংগম করেছি। সেটা ঠিক হোক, বেঠিক হোক, আমার না করলে চলছিল না। কিন্তু ওটা করে, আরো কী একটা অন্য জিনিস হারিয়ে ফেললাম হয়তো। এটুকুই আফশোস—"

"যৌন আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা নাকাতা বোঝে না", নাকাতা বলে। যেমন স্মৃতি নেই, তেমনই যৌন আকাঙ্ক্ষা বলে জিনিসটাও নেই। আর তাই, সঠিক যৌন আকাঙ্ক্ষা আর বেঠিক যৌন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তফাৎটা ঠিকমত বোঝে না। তবে কিনা, ওটা যদি হয়ে থাকে, তাহলে হয়েছে। সঠিকই হোক, বেঠিকই হোক, যা কিছু ঘটেছে সবগুলোকেই গ্রহণ করে, সেগুলোর মাধ্যমেই তো আজকের এই নাকাতা। নাকাতা এরকমই মনে করে।"

"নাকাতা-সান!"

"হ্যাঁ। কী, বলুন?"

"আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।"

সাএকি-সান পায়ের কাছের ব্যাগটা হাতে নিয়ে, তার থেকে ছোট একটা চাবি বের করলেন। তারপর সেটা দিয়ে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুললেন। ড্রয়ারের ভেতর থেকে বেশ কয়েকটা মোটা মোটা ফাইল বের করে এনে ডেস্কের ওপরে রাখলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বললেন, "এ শহরে ফিরে এসে থেকে আমি টানা এই পান্ডুলিপিটা তৈরি করছি। আমি যে জীবন যাপন করেছি, তা লিখে লিখে রাখছি। খুব কাছেই একজায়গায় জন্মগ্রহণ করে, এই বাড়িতে থাকত এমন একজনের গভীর প্রেমে পড়েছিলাম। এর চেয়ে গভীরভাবে আর ভালবাসা যায় না। সেও আমাকে অতটাই ভালবাসত। আমরা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলাম। সবকিছুই সেই বৃত্তের অভ্যন্তরে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এরকমটা অবশ্যই চিরকাল ধরে চলে না। আমরা বড় হচ্ছিলাম, সময়ও এগিয়ে চলছিল। বৃত্তের জায়গায় জায়গায় ফাঁকফোকর তৈরি হয়ে, বাইরের জিনিস সেই স্বর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এসে, অভ্যন্তরের জিনিস বাইরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সময়ের আমি, সেটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলে মানতে পারলাম না। ফলে আমি সেই অনুপ্রবেশ এবং নির্গমন রোধ করতে প্রবেশপথের পাথরটা খুলে দিয়েছিলাম। কী করে যে সেটা করে উঠতে পেরেছিলাম, সেটা এখন আর ঠিক মনে করতে পারছি না। কিন্তু ওকে যাতে হারাতে না হয়, বেরিয়ে আসা জিনিস যাতে আমাদের জগতটার ক্ষতি না করতে পারে, তাতে যা হয় হোক ভেবে পাথরটা খুলে দিতেই হবে বলে মনস্থির করেছিলাম। এর পরিণতি কী হতে পারে, সেটা বোঝার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। আর, বলাই বাহুল্য, তার শাস্তিও পেয়েছিলাম।"

কথা থামিয়ে, কলমটা হাতে নিয়ে উনি চোখ বন্ধ করলেন।

"আমার কাছে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে কুড়ি বছর বয়েসেই। তারপর থেকে যে জীবন, পাক দিয়ে দিয়ে দীর্ঘায়িত করা পরের দিনের এপিসোডগুলোর মত, তার বেশি কিছু নয়। আধো অন্ধকারে এঁকেবেঁকে চলে, কোথাও না পৌঁছনো দীর্ঘ করিডরের মত। কিন্তু সেই জীবনও আমাকে যাপন করে যেতে হল। শূন্যতাময় একেকটা দিন এসে, শূন্য অবস্থাতেই চলে যেত কেবলি। ঐ দিনগুলোতে আমি বহু ভুল করেছি। সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হয়, আমি অধিকাংশ সময় কেবল ভুলই করে গেছি বলেই মনে হয়। একেক সময় আমি একা একা নিজের ভেতরেই আবদ্ধ থেকে কাটিয়ে দিতাম। গভীর কুঁয়োর একেবারে নিচে একা একা বেঁচে থাকার মত। বাইরের সবকিছুকে অভিসম্পাত করতাম, সবকিছুকে ঘৃণা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতাম। একেকসময় বাইরে বেরিয়ে, বেঁচে থাকার ভাণ করতাম। যেকোনও কিছুই গ্রহণ করে, অনুভূতিহীন ভাবে পৃথিবীর ভেতর দিয়ে গলে যেতাম। বহুপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছি। একবার এমনকি একটা বিয়েও যেন করেছিলাম। এছাড়াও—তবে, এই সবকিছুই ছিল অর্থহীন। সবই মুহূর্তের মধ্যে অতীতের গর্ভে চলে যেত, কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। যা কিছুকে আমি কুবাক্যে বিদ্ধ করেছি, ক্ষতবিক্ষত করেছি, সেগুলোরই কিছু ক্ষতচিহ্ন কেবল রয়ে গেছে।"

ডেস্কের ওপর একটার ওপর আরেকটা করে চাপানো তিনটে ফাইলের ওপরে হাত রাখলেন উনি।

"সেই সব ঘটনাই আমি এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রেখেছি। আমি নিজেকেই সামলে নিতে এগুলো লিখে গেছি। আমি নিজে ঠিক কেমন, কীরকম জীবন অতিবাহিত করে এসেছি, সেই সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিশ্চিত হয়ে নিতে চেয়েছি। অবশ্যই আমার নিজেকে ছাড়া আর কারুকে দোষারোপ করার উপায় নেই, তবে নিজের মাংস নিজেই কাটার মত কষ্টকর কাজ এটা। কিন্তু সেই কাজ শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে এনেছি। সব লেখা হয়ে গেছে। আমার আর এতে কোনও প্রয়োজন নেই। এরপর অন্য কেউ সেটা পড়ুক, সেই বাসনাও নেই। কারুর চোখে পড়ে গেলে, আবার হয়তো নতুন করে কারুর ক্ষতি করে বসব। যে কারণে, আমি এটা কোথাও নিয়ে গিয়ে পুরোটা পুড়িয়ে ফেলতে চাই। কোনও চিহ্নই যাতে না থাকে। এই কাজটা নাকাতা-সানকে করতে অনুরোধ করতে চাইছি, যদি সম্ভব হয়। আমার কাছে নির্ভরযোগ্য লোক বলতে শুধু নাকাতা-সান। স্বার্থপরের মত অনুরোধ করে বসলাম, অসুবিধে হবে না তো?"

"বুঝতে পেরেছি", নাকাতা বলে। সঙ্গে ক'বার আন্তরিকভাবে সামনে মাথা ঝোঁকায়। "সাএকি-সান যদি এটাই চান, নাকাতা ওটা ভাল করে পুড়িয়ে ফেলবে। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"ধন্যবাদ", সাএকি-সান বলেন।

"লেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই না", নাকাতা জানতে চায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন। লেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেটা লিখে ফেলেছি, সম্পূর্ণ হওয়ার পর যেটা, সেটার কোনও তাৎপর্য নেই।"

"নাকাতা যেহেতু পড়তে লিখতে পারে না, কিছু লিখে রেখে যেতে পারবে না" নাকাতা বলে, "নাকাতাও বেড়ালমশাইদের মতই।"

"নাকাতা-সান—"

"কী, বলুন?"

"আপনাকে যেন বহুদিন ধরে চিনি বলে মনে হচ্ছে", সাএকি-সান বলেন, "আপনি *ওই ছবিটাতে* ছিলেন না? সমুদ্রতটের পশ্চাদপটে একজন লোক হয়ে? সাদা ট্রাউজারের পা'টা গোটান, যে লোকটা সমুদ্রে পা ভেজাচ্ছিল?"

নাকাতা শান্তভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, সাএকি-সান যে চেয়ারে বসে আছেন, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ফাইলের ওপরে রাখা সাএকি-সানের হাতের ওপরে নিজের বলিষ্ঠ রোদে পোড়া হাতটা রাখল। তারপরে নিবিষ্ট হয়ে কীসে যেন কান পেতে আছে এইভাবে ওখানকার সমস্ত উত্তাপ নিজের হাতেসঞ্চারিত করল।

"সাএকি-সান—"

"হ্যাঁ—"

"নাকাতাও খানিকটা জানে।"

"কী জানে?"

"স্মৃতি জিনিসটা যে কী, সাএকি-সানের হাতের ভেতর দিয়ে নাকাতাও অনুভব করেছে।"

সাএকি-সান মৃদু হাসলেন, "ভালই হল", উনি বললেন।

নাকাতা ওঁর হাতের ওপরে নিজের হাতটা রেখেই দিল। একটু পরেই সাএকি-সান চোখ বন্ধ করে, স্মৃতির ভিতরে শান্তভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডুব দিলেন। ওতে আর তখন কোনও বেদনা নেই। কে যেন সব বেদনা চিরকালের জন্য শুষে বের করে নিয়েছে। বৃত্ত আরেকবার সম্পূর্ণ হল। উনি দূরের কোনও ঘরের দরজা খুলে, তার দেওয়ালে দেখলেন সুন্দর দু'টো সুরের কর্ড টিকটিকিদের মতো করে ঘুমোচ্ছে। সেই টিকটিকিদের উনি আলতো করে স্পর্শ করলেন। ওদের শান্ত নিশ্চিন্ত ঘুম উনি যেন আঙুলের ডগায় অনুভব করতে পারলেন। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। সেটা বোঝা যাচ্ছে পুরনো পর্দাটার মাঝেমাঝে দুলে ওঠা দেখে। ঠিক যেন কীসের একটা রূপক হয়ে গভীর অর্থবহ সেই দুলে ওঠা। উনি একটা লম্বা ঝুলের হালকা নীল পোশাক পরে আছেন। অনেক আগে কোথায় যেন পরেছিলেন এই ড্রেসটা। হাঁটলে পরে ড্রেসের ঝুলে মৃদু আওয়াজ উঠছে। জানালার বাইরেই বালুতট। ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কার যেন গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে লবনের গন্ধ টের পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকাল। সর্বদাই যেন গ্রীষ্মকাল। স্পষ্ট প্রান্তরেখার কয়েকটা সাদা ছোট ছোট মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নাকাতা সেই মোটা মোটা তিনটে ফাইল জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ওশিমা কাউন্টারে বসে রীডিংরুমে পড়তে আসা একজনকে কিছু একটা বলছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা নাকাতার মুখের দিকে তাকিয়ে ও আন্তরিকভাবে হাসিমুখ করল। প্রত্যুত্তরে নাকাতাও আন্তরিক ভাবে মাথা ঝোঁকালো। তারপর ওশিমা আবার আগের কথাবার্তায় ফিরে গেল। তরুণ হোশিনো তখন মহা উৎসাহে রীডিংরুমে বসে বই পড়ে যাচ্ছে।

"হোশিনো-সান", নাকাতা বলে।

বই টেবিলের ওপর রেখে তরুণ নাকাতার দিকে চোখ তুলে তাকাল। "এই যে, বেশ অনেকক্ষণ বাদে। দরকার মিটেছে?"

"হ্যাঁ। নাকাতার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে। হোশিনো-সানের অসুবিধে না থাকলে এখন ক্রমে ক্রমে ফেরা যাক।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমার কোনও অসুবিধে নেই। যে বইটা পড়ছিলাম ওটাও মোটামুটি পড়ে ফেলেছি। বিঠোফেন মারা গেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলছে। দারুণ অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া। কমবেশি ২৫,০০০ লোক সেই অন্তিমযাত্রায় সমাধিস্থল অবধি গিয়েছিল, স্কুলটুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল।"

"হোশিনো-সান!"

"কী, বলুন?"

"আর শুধু একটাই। নাকাতার হোশিনো-সানের কাছে প্রার্থণা—"

"বলেই দেখুন না।"

"এগুলো কোথাও পুড়িয়ে ফেলতে চাই।"

তরুণ হোশিনো নাকাতার জড়িয়ে ধরে রাখা ফাইলগুলোর দিকে তাকায়। "আচ্ছা, এগুলোর তো অনেক ওজন, তাই না? এতটা ওজন হলে, যেকোনও জায়গায় রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না হয়তো। কোথাও একটা চওড়া নদীর শুকনো খাতে, কিংবা ওরকমই কোথাও না হলে তো—"

"হোশিনো-সান!"

"কী, বলুন?"

"তাহলে শুকনো নদীর খাত খুঁজতে বেরুনো যাক।"

"ফের দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করাটা অভব্যতা যদিও, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তাই না? কোথাও একটা ফেলে দিয়ে আসা যাবে না?"

"হ্যাঁ, হোশিনো-সান। খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। পুড়িয়ে না ফেললে হবে না। ধোঁয়া করে ফেলে, বাতাসে উড়িয়ে দিতে হবে। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে করে আসতে হবে।"

হোশিনো উঠে দাঁড়িয়ে, বড় করে আড়মোড়া ভাঙলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"বুঝতে পেরেছি। চলুন তাহলে দু'জনে মিলে চওড়া নদীর শুকনো খাত খুঁজতে যাওয়া যাক। জানি না কোথায় আছে, ভাল করে খুঁজলে শিকোকুতেও একটা না একটা নদীর শুকনো খাত আছে হয়তো"

বিকেলে এতটা ব্যস্ততা কখনো হয় না। পড়ার জন্য বহু লোক এসে পড়েছে, তার মধ্যে কয়েকজন বিশেষ সব বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করছে। সেগুলোর উত্তর দিতে, ওরা পড়তে চায় এমন বইপত্র খুঁজতে ওশিমা হিমশিম খাচ্ছিল। কিছু জিনিস এমনও ছিল যা কম্পিউটারে দেখে নিতে হবে। সচরাচর এরকম হলে অবশ্যই সাএকি-সানের সহায়তা চাইত, কিন্তু আজ মনে হয় সেটা করা যাবে না। এইসবের মধ্যে বেশ ক'বার চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে হওয়ায়, নাকাতা যে ফিরে যাচ্ছে সেটা খেয়াল হয়নি। ব্যস্ততা একটু কমলে, চারপাশে চোখ বুলিয়ে দু'জন যে আর লাইব্রেরিতে নেই সেটা বুঝতে পেরে, ওশিমা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় সাএকি-সানের স্টাডিতে গিয়ে হাজির হল। যা সচরাচর হয় না, দরজাটা বন্ধ। আস্তে করে দু'বার টোকা দিয়ে ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনও সাড়া নেই। আরেকবার টোকা দিল। "সাএকি-সান", বলে দরজার বাইরে থেকে ডাক দিল। "সব ঠিক আছে তো?", যথারীতি কোনও সাড়া নেই।

দরজার হাতলটা আলতো করে ঘুরিয়ে দেখল। লক করা নেই। ওশিমা দরজাটা অল্প ফাঁক করে, ভেতরে উঁকি দিল। চোখে পড়ল সাএকি-সান ডেস্কের ওপরে উপুড় হয়ে রয়েছেন, চুলগুলো সামনে ঝুলে পড়ে মুখটা ঢেকে রেখেছে। ওশিমা একটু দিশেহারা বোধ করল। নেহাতই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়তো। কিন্তু এখন অবধি একবারও সাএকি-সানকে দিনে ঘুমোতে দেখেনি ও। কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, সেই টাইপের লোকই নন। ঘরের ভেতর ঢুকে ডেস্ক অবধি হেঁটে গেল। তারপর শরীর ঝুঁকিয়ে, সাএকি-সানের কানের কাছে নাম ধরে ডাকল। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ও সাএকি-সানের কাঁধটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে, কব্জিটা টেনে নিয়ে, আঙুল রাখল ওতে। কোনও স্পন্দন নেই। তখনও ডেস্কে খানিকটা উত্তাপ লেগে আছে, কিন্তু ভয়ানক অস্পষ্টরকম ক্ষীণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাএকি-সানের চুলগুলো হাতে তুলে নিয়ে, মুখটা দেখে নিল। দুটো চোখই অল্প ফাঁক হয়ে আছে। উনি ঘুমোচ্ছেন না। মারা গেছেন। কিন্তু ওতে, শান্ত কোনও স্বপ্ন দেখতে থাকা লোকের যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, ঠিক যেন সেটাই ফুটে উঠেছে। মুখের কাছে তখনও একটা স্মিত হাসির ক্ষীণ ছায়া রয়ে গেছে। মৃত্যুর সময়ও মানুষটা নিজের সুষমা হারাননি। ওশিমার সেরকমই মনে হল। চুল আগের জায়গায় রেখে দিয়ে, টেবিলের ওপরে টেলিফোনের রিসিভারটা ও হাতে তুলে নিল।

এরকম একটা দিন যে শিগগিরির মধ্যেই আসবে, তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিলই। কিন্তু সত্যি সত্যিই এভাবে মৃত সাএকি-সানের সঙ্গে সেই নৈঃশব্দ্যময় ঘরে মাত্র দুজনে রয়ে গিয়ে, কী করা উচিত ও বুঝতে পারছিল না। মনের ভেতরটা যেন খাঁ খাঁ করে উঠল। 'আমার এই মানুষটাকে প্রয়োজন ছিল', বলে ওশিমা ভাবল। হয়তো আমার ভেতরের শূন্যতা পূরণ করতে এই মানুষটার অস্তিত্ব আমার কাছে জরুরি ছিল। কিন্তু আমি এই মানুষটা যে শূন্যতা ধারণ করে ছিল, সেটা পূরণ করতে পারিনি। একেবারে শেষ পর্যন্ত, সাএকি-সানের শূন্যতাটা ছিল কেবল ওনারই।

কে যেন সিঁড়ির নিচ থেকে ওকে নাম ধরে ডাকছিল। গলাটা আগের শোনা বলেই মনে হল। দরজাটা খোলা ছিল, সিঁড়ির নিচে লোকজনের ব্যস্ত হয়ে যাওয়া আসার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। ফোনও বেজে উঠল। কিন্তু ওশিমা এসব কিছুই খেয়াল করছিল না। ও দেখে যাচ্ছিল, চেয়ারে বসে থাকা সাএকি-সানের চেহারাটা। আমাকে ডাকতে হলে, যতবার খুশি ডেকো। ফোন করতে হলে, যত খুশি এসে করে যেও। একটু পরেই দূরে অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ পাওয়া গেল। ক্রমেই যেন কাছে এগিয়ে আসছে ওটা। আরেকটু পরেই লোকজন এসে পড়ে, ওঁকে কোথাও একটা নিয়ে যাবে। চিরকালের জন্য। বাঁহাতের কব্জিটা তুলে ধরে রিস্ট-ওয়াচে চোখ রাখল ও। ৪টে বেজে ৩৫ মিনিট। মঙ্গলবার বিকেলের ৪টে বেজে ৩৫ মিনিট। সময়টা মনে রাখতে হবে, ওর মনে হল। এই বিকেলের কথা, এই দিনটার কথা চিরকাল মনে করে রাখতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তামুরা কাফকা-কুন", পাশের দেওয়ালের দিকে ফিরে ফিসফিস করে ও বলল। "এটার কথা আমার তোমাকে জানাতেই হবে। অবশ্য, যদি তুমি এখনো জেনে না থাক, আর কি—"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৩

মালপত্র ফেলে দিয়ে, হালকা শরীরে বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকলাম। সামনে এগিয়ে যাওয়ার ওপরেই মনোনিবেশ করলাম। আর তো গাছপালার গায়ে চিহ্ন দিয়ে রাখার প্রয়োজনও নেই। ফেরার রাস্তা মনে রাখারও প্রয়োজন নেই। এমনকি চারপাশের দৃশ্য সবটা দেখতে থাকাও বন্ধ করলাম। কোনওভাবেই দৃশ্যাবলী এর চেয়ে ভাল কিছু হয়ে উঠবে না। গায়ে গায়ে লেগে থেকে মাথা উঁচু করা গাছপালা, ঘন হয়ে গজানো ফার্ন, গাছ বেয়ে নেমে আসা আইভি লতা, এখানে ওখানে ফুলে ফুলে ওঠা শেকড়, তাল তাল পচে যাওয়া ঝরাপাতা, কীসব যেন পোকামাকড়ের শুকনো খোলস, শক্ত আঠালো মাকড়সার জাল। আর অসংখ্য গাছপালার শাখা—ওটা একেবারেই শাখাপ্রশাখার জগত। ভীতিজনক শাখাপ্রশাখা, একটু জায়গা পাওয়ার জন্য বিবাদরত শাখাপ্রশাখা, সুকৌশলে নিজেকে লুকিয়ে রাখা শাখাপ্রশাখা, এঁকেবেঁকে পাক খাওয়া শাখাপ্রশাখা, ভাবুক শাখাপ্রশাখা, শুকিয়ে মরতে বসা শাখাপ্রশাখা। এই দৃশ্যেরই অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। পুনরাবৃত্তির সঙ্গেই সবটা একটু একটু করে আরও গভীর হয়ে যাচ্ছে।

আমি সেই রাস্তা ধরে—রাস্তার মত যেটা, সেটা বরাবর—মুখ বন্ধ রেখে চলতে থাকি। পথটা আগাগোড়াই উৎরাই, তবে আপাতত তেমন ভয়ানক খাড়াই নয়। হাঁফিয়ে যাওয়ার মতো খাড়া নয়। সময়ে সময়ে ফার্নের সমুদ্রে, আর কাঁটাওলা ঝোপের মধ্যে পথটা হারিয়ে যাচ্ছে, তবে খেয়াল রেখে এগিয়ে গেলে, আবার পথের মত কিছু একটা ফুটেও উঠছে। আমি আর জঙ্গলকে ভয় পাচ্ছি না। ওখানেও নিয়মের মত কিছু একটা আছে। নতুবা প্যাটার্নের মত কিছু একটা আছে। একবার ভয় পাওয়া বন্ধ করলে, সেগুলো ক্রমে ক্রমে দৃশ্যমান হতে থাকে। এই পুনরাবৃত্তিকে আত্মস্থ করে, আমি নিজেরই একটা অংশের মত করে তুললাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এখন আর আমার কাছে কিছু নেই। একটু আগেও খুব জরুরি মনে করে হাতে ধরে থাকা হলুদরঙের স্প্রে-পেইন্টও আর নেই, শাণিত তলোয়ারও আর নেই। ডে-প্যাকও কাঁধে ঝোলানো নেই। ওয়াটার বটলও নেই, খাবারদাবারও নেই। কম্পাসও নেই। যা কিছু ছিল পথিমধ্যে পথে ফেলে রেখে এসেছি। এইভাবেই আমি নিজেকে নিয়ে আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, আর সেইকারণেই আমি নিরস্ত্র হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে অরণ্যকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই। কিংবা নিজেকেই জানাতে চেয়েছি। শক্ত খোলস ত্যাগ করে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে একাই গোলোকধাঁধার কেন্দ্র লক্ষ্য করে চলেছি। আর, নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছি শূন্যতার কাছে।

কানের ভেতরে কেবলই বেজে যাওয়া সংগীতও কখন যেন মিলিয়ে গেছে। রেখে গেছে শুধু মৃদু হোয়াইট নয়েজ। বিশাল বিছানার ওপর বিছিয়ে রাখা, এতটুকু ভাঁজ নেই এমন সাদা চাদরের মত। আমি সেই চাদরে আঙুল রেখে, আঙুলের ডগা সাদার ওপর দিয়ে বোলালাম। কেবল সাদা আর সাদা। আমার বগলের নিচে ঘাম হতে শুরু করেছে। গাছপালার উঁচু ডালের ফাঁক দিয়ে সময় সময় যে আকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে একেবারে সর্বত্র সমান ধূসর মেঘ ছেয়ে আছে, কোথাও কোনও ফাঁকফোঁকর নেই। এখনই বৃষ্টির লক্ষণ নেই। কিন্তু মেঘের এতটুকু নড়াচড়া নেই, পরিস্থিতি একেবারে একই অবস্থায় বজায় আছে। উঁচু ডালে বসা পাখিরা ছোট ছোট ডাকে অর্থপূর্ণ সংকেত পাঠাচ্ছে। পোকামাকড়েরা ঘাসের মধ্যে থেকে কীসের যেন পূর্বলক্ষণের মত গুঞ্জন করছে।

নোগাতায় আমার সেই বাড়ির কথা মনে হল, যেখানে কেউ আর এখন বাস করছে না। এখন হয়তো বন্ধই থাকার কথা। অসুবিধে নেই, বন্ধ থাকাই ভাল বলে মনে হয়। রক্তের ছোপ ওই অবস্থায় রেখে দেওয়াই ভাল। আমার জানার দরকার নেই। আর দ্বিতীয়বার ওখানে ফেরার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। সাম্প্রতিক সেই রক্তপাতের ঘটনার আগে থেকেই, অনেক কিছুই সেখানে মৃত হয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ, অনেক কিছুই ওখানে খুন হয়ে গিয়েছিল।

অরণ্য কখনো মাথার ওপর থেকে, কখনো পায়ের কাছ থেকে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। ঘাড়ের ওপর ঠান্ডা নিঃশ্বাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেলছে। চামড়ার ওপর হাজারটা চোখ দিয়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। নানা উপায়ে ঠেলে বের করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, যেন কোনও বহিরাগত বস্তু। কিন্তু আমিও ক্রমে ক্রমে এইসব ভীতিপ্রদর্শনকে দক্ষভাবে এড়িয়ে যাওয়া শিখে নিচ্ছি। এখানকার এই অরণ্য, আসলে তো আমার নিজেরই একটা অংশ—একসময় আমিও এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে শিখে গেছি। আমি আমার নিজেরই অন্তঃস্থল পরিভ্রমণ করছি। রক্ত যেমন রক্তবাহী শিরার ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়, সেইভাবে। আমি নিজের অন্তঃস্থলকে এই চোখেই দেখছি, যেগুলোকে ভীতিপ্রদর্শন বলে মনে হচ্ছে, সেগুলো আমারই মনের ভেতরের ভয় আর আশঙ্কাগুলোর প্রতিধ্বনি। ওখানকার মাকড়সার জাল, আমারই মন ওখানে লাগিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপরে যে পাখিরা ডাকছে, ওরা আমার নিজেরই পুষে বড় করা পাখি। ওই ইমেজগুলো আমারই মধ্যে জন্ম নিয়ে, শেকড় নামিয়ে দিয়েছে।

যেন পেছন থেকে এক বিশাল হৃৎপিন্ডের স্পন্দন আমাকে ঠেলছে, এইভাবে বনের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সেই পথ গিয়েছে নিজেরই মধ্যে একটা বিশেষ জায়গার দিকে। ওটা অন্ধকারকে পাক দিয়ে অপসারিত করার আলোর উৎস, নিঃশব্দ অনুরণনের জন্ম দেওয়ার জায়গা। আমি গিয়ে দেখতে চাই ওখানে কী আছে। গোপন দূত হয়ে, পোক্ত করে সীল করে দেওয়া এক স্বাক্ষরিত বার্তা নিজে হাতে বয়ে নিয়ে চলেছি নিজেরই কাছে।

প্রশ্ন।

কেন সে আমাকে ভালবাসল না?

আমার কি মায়ের ভালবাসাটুকু পাওয়ারও যোগ্যতা ছিল না?

এই জিজ্ঞাসা দীর্ঘ বহু বছর, মাস পার হয়ে, আমার মনকে নিদারুণভাবে দগ্ধ করে, আমার আত্মাকে কুরে কুরে খেতে থেকেছে। আমারই কোনও গভীর সমস্যার কারণে হয়ত আমি মা'র ভালবাসা পাইনি। জন্মগত অপবিত্রতার মত কিছু বহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

করতে থাকা মানুষ হয়ত আমি। লোকের সঙ্গে চোখাচোখি এড়িয়ে চলার মত মানুষ হিসেবেই আমার জন্ম হয়েছে কি না, কে জানে।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে একবার শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনও করে যায়নি মা। এমনকি একটা কথাও বলে রেখে যায়নি। আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে, দিদিকে সঙ্গে নিয়ে কিচ্ছুটি না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে, ধোঁয়ার মত, কেবল আমার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আর সেই ফিরিয়ে নেওয়া মুখ, চিরকালের মত আমার থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখল।

মাথার ওপরে আবার পাখিটা তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। সেখানে কেবল মসৃণ ধূসর মেঘ। কোনও হাওয়া নেই। আমি কেবলই হেঁটে চলেছি। চেতনার তটভূমিতে আমি হাঁটছি। চেতনার তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে, আর ফিরে যাচ্ছে। এসে পড়ে কিছু লিখে রেখে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই এসে সেটা মুছে দিয়ে যাচ্ছে। লিখে রেখে যাওয়া কথাগুলো আমি দুটো ঢেউয়ের মাঝের সময়টায় চট করে পড়ে ফেলার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে অত সহজ নয়। শেষ অবধি পড়ে ওঠার আগেই পরবর্তী ঢেউ এসে সেই বাক্য ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ধন্দে ফেলে দেওয়া শব্দ দিয়ে তৈরি সেই খন্ডাংশটুকু কেবল চেতনায় থেকে যাচ্ছিল।

মনটা আবার নোগাতার বাড়িতে ফিরে গেল। সেদিনটার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে, যেদিন মা দিদিকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেল। আমি একা গ্রীনজোনে বসে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছি। গ্রীষ্মের গোড়ার দিনটায় গোধূলিতে গাছপালার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে আসছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। কীভাবে যেন, আমাকে যে একা ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, সেটা আমি জানতে পেরে গেছি। এই ঘটনা যে সেদিন থেকে আমার ওপর গভীর ও নিশ্চিত ছাপ ফেলে যাবে সেটা বুঝতে পারছিলাম। কেউ আমাকে সেটা বলে দেয়নি। আমি *কেবল বুঝতে পারছিলাম*। বাড়ির ভেতরটা কোনও প্রত্যন্ত প্রদেশের পরিত্যক্ত পর্যবেক্ষণ-বিন্দু, খালি পড়ে আছে, জনমানবহীন। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ে, নানাকিছুর ছায়া একটু একটু করে পৃথিবীকে ঢেকে ফেলছে, আমি বসে দেখছি। সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলে কিছু আছে এই পৃথিবীতে, কিছুই আর পরে ফিরে আসে না। ছায়ার বাড়ানো হাত একদাগ, আরো একদাগ, করে করে নিত্য নতুন ভূমি গ্রাস করে নিচ্ছে, একটু আগেও মায়ের মুখটা যেখানে ছিল, অল্প পরেই অন্ধকার উত্তাপহীন অঞ্চল এসে সেটাকে গিলে ফেলছে। মা'র সেই ফিরিয়ে রাখা কঠিন মুখ, আমার স্মৃতি থেকে আপনা থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে স্মৃতি থেকে।

বনের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে, সাএকি-সানের কথা ভাবলাম। ওঁর মুখটা মনে ভেসে উঠল। সেই শান্ত ম্লান স্মিত হাসি মনে ভেসে উঠে, হাতের উত্তাপ মনে পড়ে গেল। এই সাএকি-সান আমার মা হয়ে, সবে চার বছর বয়েসের আমাকে রেখে চলে যাওয়াটা কল্পনা করে দেখি। কিছু না ভেবেই মাথা নাড়ি। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক এবং সঙ্গতিহীন বলে মনে হল। সাএকি-সানকে কেন ওরকম করতে হবে? সাএকি-সানকে কেনই বা আমাকে আর আমার জীবনকে আঘাত দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিতে হবে? নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, স্পষ্ট হচ্ছে না এরকম কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, যার গভীর অর্থ থাকার কথা।

ওঁর সেই সময় কেমন লাগছিল, একইভাবে অনুভব করার চেষ্টা করে দেখলাম। ওঁর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দেখলাম। সেটা অবশ্যই সহজ কাজ নয়। কেননা, এটাতে যেমন আমাকে যে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল এরকম একটা দিক আছে, উনি যে আমাকে ফেলে রেখে গেছিলেন, সেই দিকটাও আছে। কিন্তু সময় নিয়ে, আমি নিজেকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করলাম। আমার সত্ত্বাটা আমি নামক এই শক্ত হয়ে যাওয়া পোশাকটা থেকে বেরিয়ে, একটা কুচকুচে কালো কাক হয়ে বাগানের একটা পাইন গাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসে, সেখান থেকে গ্রীনজোনে বসে থাকা চার বছর বয়েসের আমাকেই দেখতে থাকল।

কল্পনায় একটা কালো কাক হয়ে গেলাম।

"তোমার মা তোমাকে ভালবাসতেন না এমন নয়", কারাসু নামের বাচ্চা ছেলেটা পেছন থেকে বলে উঠল। "আরও সঠিকভাবে বললে, উনি তোমাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন। তোমাকে আগে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেটা বিশ্বাস করতে হবে। ওখান থেকে শুরুটা করতে হবে"।

"কিন্তু উনি তো আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। একটা অনুপযুক্ত জায়গায় আমাকে একা রেখে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আমি সম্ভবত ওতে গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম। এখন আমিও সেটা বুঝতে পারি। সত্যি যদি ভালবাসতেন, কীভাবে এটা করতে পারলেন?"

"ফল যা হল, তাতে সত্যিই সেরকমই দাঁড়াল বটে", কারাসু নামের ছেলেটা বলে। "তুমি খুবই গভীর রকম আঘাত পেয়েছিলে। আর সেই থেকে তুমি সেই আঘাত টানা বহন করে চলেছ। ব্যাপারটা দুঃখজনক। তুমি এখনও সেটা সামলে উঠতে পার। তোমার বয়েস অল্প, তুমি টাফও বটে। নমনীয়তায় সমৃদ্ধ। ক্ষতস্থান বুজিয়ে, মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে যেতেই পার। কিন্তু উনি আর সেটা পারবেন না। উনি নেহাতই ওই অবস্থায় হারিয়ে গেছেন। কথাটা, কে ভাল আর কে খারাপ সেই নিয়ে নয়। বাস্তবিক অর্থে, অ্যাডভান্টেজ তো তোমার। তোমার এটা ভেবে দেখা উচিত।"

আমি চুপ করে থাকি।

"দ্যাখ, এগুলো তো সব আগেই ঘটে গেছে", কারাসু বলে ছেলেটা বলে চলে। "এখন সেটা ভাঙা প্লেট জুড়ে দেওয়ার মতই অসম্ভব। কিছু করার নেই। ওঁর তখন তোমাকে ফেলে যাওয়া উচিত হয়নি, তোমার ওঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়াটা ছিল অনুচিত। কিন্তু যা ঘটে গেছে, তা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাওয়া প্লেটের মতই। যতই মেহনত কর না কেন, আগের মত আর হবে না। ঠিক কি না?"

আমি মাথা সামনে ঝোঁকাই। যতই মেহনত করি না কেন, আগের মত আর হবে না। সত্যিই তো।

কারাসু বলে ছেলেটা বলেই চলে, "দ্যাখ, তোমার মা'র মধ্যেও কিন্তু জোরালো রকম ভয় ও ঘৃণা ছিল। এই এখনকার তোমার মতই। সেই কারণেই, ওঁর সেই সময় তোমাকে ফেলে রেখে না গিয়ে উপায় ছিল না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমাকে ভালবাসা সত্ত্বেও?"

"হ্যাঁ", কারাসু বলে ছেলেটা বলল। তোমাকে ভালবাসা সত্ত্বেও তোমাকে ফেলে রেখে না গিয়ে উপায় ছিল না। তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হল সেই সময়ের ওঁর মনটা বুঝতে পেরে এ কথা গ্রহন করা। সেই সময় যে বিবশ করে ফেলা ভয় ও ঘৃণা উনি অনুভব করেছিলেন সেটা তোমাকে বুঝতে হবে আর নিজের বলে গ্রহণ করতে হবে। সেটাকেই ওঁর থেকে পেয়ে আবার ওটাই না করে। অন্যভাবে বলতে হলে, তোমার ওঁকে ক্ষমা করে দিতে হবে। সেটা অবশ্যই সহজ নয়। কিন্তু না করে উপায় নেই। একমাত্র এটাই তোমার পরিত্রাণের উপায়। আর এছাড়া কোনও পরিত্রাণের উপায় নেই।"

আমি এটা নিয়ে ভাবলাম। যত ভাবি ততই বিভ্রান্ত বোধ করি। মনটা অস্থির হয়ে পড়ে, শরীরে জায়গায় জায়গায় চামড়া যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে এমন যন্ত্রণা হয়।

"আচ্ছা, সাএকি-সান কি সত্যিই আমার মা", আমি জিজ্ঞেস করি।

কারাসু বলে ছেলেটা বলে, "উনিও কি বললেন না যে সেটা এখনও অনুমান হিসেবেই কাজ করছে? এককথায় সেটাই। 'সেটা এখনও অনুমান হিসেবেই কাজ করছে'। আমিও সেটুকুই বলতে পারি।"

"এমন অনুমান যার বিপরীতে কোনো কার্যকরি প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি—"

"তা ঠিক", কারাসু বলে ছেলেটা বলে।

"আর এই অনুমানের বিষয়ে আমাকে সনিষ্ঠ ভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে—"

"তাও ঠিক", কারাসু বলে ছেলেটা স্পষ্টস্বরে বলে। "কার্যকরি প্রমাণ যার বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন অনুমান অনুসন্ধানেরই যোগ্য। আর এখনকার মত, এটা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো ছাড়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমার আর করণীয়ও কিছু নেই। এটা ছাড়া তোমার হাতে আর বিকল্প বলে কিছু নেই তো। এই কারণেই তোমাকে, এমনকি নিজের শরীরটা ত্যাগ করে হলেও, ওটা নিয়ে ভাল করে অনুসন্ধান করতে হবে।”

“নিজের শরীরটা ত্যাগ করে”, কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুরণন আছে। আমি সেই অনুরণন ঠিকমত আত্মস্থ করতে পারলাম না।

কিন্তু কোনও জবাব এল না। আমি বিচলিত হয়ে পিছন ফিরলাম। কারাসু বলে ছেলেটা তখনও সেখানে রয়েছে। ও তক্ষুণি আমার সঙ্গে তালে তালে পেছনে হাঁটতে থাকল।

“সাএকি-সানের মনে সেই সময় কেমন ভয় আর ঘৃণা বাসা বেঁধেছিল? তার উদ্ভব কোথা থেকে”, আমি সামনে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে ওকে জিজ্ঞেস করি।

“তোমার কী মনে হয়, ওঁর মনে তখন আদপে কেমন ভয় আর ঘৃণা বাসা বেঁধেছিল”, উলটে কারাসু বলে ছেলেটা আমাকে প্রশ্ন করে। “ভাল করে ভাব তো। এগুলো তোমার নিজের মনের মধ্যে ভাল করে না ভাবলে চলবে না। মন জিনিসটা নইলে আছে কেন?”

আমি ভাবি। দেরি হয়ে যাওয়ার আগে, জিনিসটা বুঝতে পেরে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমি চেতনার সমুদ্রতটে রেখে যাওয়া ছোট ছোট হরফ পড়ে উঠতে পারছি না। ফিরে যাওয়া ঢেউ আর ধেয়ে আসা ঢেউয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বড্ড কম।

“আমি সাএকি-সানকে ভালবাসি”, আমি বলি। কথাটা খুব স্বাভাবিকভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

“সে আমি জানি”, কারাসু বলে ছেলেটা নির্বিকারভাবে বলল।

“আমার মনের অবস্থা এরকম আগে কখনো হয়নি। আর আমার কাছে এখন এটাই অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি তাৎপর্যময়”, আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলি।

"অবশ্যই তাই", কারাসু বলে ছেলেটা বলে। "সে আর বলতে। অবশ্যই এটা তাৎপর্যপূর্ণ। সেই জন্যই কি তুমি এতদূর এসে পৌঁছোওনি?"

"কিন্তু জান তো, আমি এখনও বুঝতে পারছি না। দিশেহারা হয়ে রয়েছি। তুমি বলছ যে মা আমাকে ভালবাসত। খুবই গভীর ভাবে ভালবাসত। আমি তোমার কথাই বিশ্বাস করতে চাই। কিন্তু জান তো, এটা যদি সত্যিও হয়, তবু বুঝে উঠতে পারছি না। জিনিসটা হল, কেন কারুকে গভীরভাবে ভালবাসাটা সেই তাকেই গভীর ভাবে ক্ষতবিক্ষত করার মত কিছু হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ কিনা, তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে কারুকে গভীরভাবে ভালবাসার অর্থটা কী দাঁড়ায়? আদৌ কেন এরকম হতে হয়?"

আমি উত্তরের অপেক্ষায় থাকি। অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করে রইলাম। কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

পিছন দিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু সেখানে আর কারাসু বলে ছেলেটা তখন নেই। মাথার ওপরে ঝটপট করে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম।

তুমি দিশেহারা হয়ে পড়েছ।

অল্প পরেই দুই সৈনিক আমার সামনে আবির্ভূত হল।

দু'জনেই পূর্বতন ইম্পীরিয়াল আর্মির স্থলসৈন্যের পোশাক পরা। গ্রীষ্মের উপযোগী অর্দ্ধেক হাতা পোশাক। গেইটারস জড়ানো, কাঁধে ন্যাপস্যাক। হেলমেট নেই, ওপরে গার্ড লাগানো সাধারণ টুপি পরা। মুখে কালো ফেস-পেইন্ট। দু'জনই অল্পবয়েসি সৈনিক। একজন লম্বা, গোল মেটালফ্রেমের চশমা পরা, পাতলা চেহারা। অন্যজন বেঁটে, চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ গড়ন। দু'জনে পাশাপাশি একটা বড় সমতল পাথরের ওপর বসে। কোনওরকম লড়াকু মনোভাবের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরিচয় নেই। সেইসময়ের মডেলের ইনফ্যান্ট্রি রাইফেল পায়ের কাছে হেলান দিয়ে রাখা। লম্বা সৈন্যটি বোর হয়ে গিয়ে দাঁতে ঘাস কাটছে । দুজনেই ওখানে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে রয়েছে। কোনও ইতস্তত নেই, শান্ত চোখে আমার এগিয়ে আসা দেখতে লাগল।

চারপাশটা একটু প্রশস্ত আর সমতল। ঠিক যেন সিঁড়ির ল্যান্ডিং।

"এই যে", অপেক্ষাকৃত লম্বা সৈনিক বেশ খুশির গলায় বলে উঠল।

"কোন্নিচিবা", বলিষ্ঠজন একটু শুধু ভ্রুভঙ্গি করে বলে।

"কোন্নিচিবা", আমি প্রত্যাভিবাদন করে বলি। আমার সম্ভবত ওদের দেখে চমকে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি তেমন আশ্চর্য হইনি। অদ্ভুত বলেও মনে হয়নি। এরকম তো হতেই পারে।

"আমরা অপেক্ষা করছিলাম", অপেক্ষাকৃত লম্বাজন বলে।

"আমার", আমি বলি।

"নিশ্চয়ই", ওদিক থেকে উত্তর আসে। "আপাতত তুমি ছাড়া এখানে আসার মত অন্য কেউ তো নেই!"

"অনেক অপেক্ষা করতে হল", বলিষ্ঠজন বলে।

"সময় অবশ্য তেমন বড় সমস্যা কিছু নয়", লম্বাজন যোগ করে। "তবে, যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশি লাগল।"

"আপনারা সেই বহু আগে এখানে পাহাড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া লোকেরা না? মহড়া দিচ্ছিলেন", আমি জানতে চাই।

বলিষ্ঠজন সামনে মাথা ঝোঁকায়, "ঠিকই ধরেছ।"

"সবাই অনেক খুঁজেছিল বলে মনে হয়", আমি বললাম।

"তা জানি", বলিষ্ঠজন বলে। "সবাই যে খুঁজেছিল সেটা জানি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই বনে যা কিছু ঘটে, তার সবটাই জানি। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা যতই ঘুরে ঘুরে খুঁজুক, খুঁজে পাবে না—"

"সঠিকভাবে বলতে হলে, আমরা ঠিক হারিয়েও যাইনি", শান্তস্বরে লম্বাজন বলে, "আমরা পালিয়ে গিয়েছিলাম!"

"পালিয়ে বললেও, হঠাৎ করেই এই জায়গাটা দেখতে পেয়ে গিয়ে, এখানেই থেকে গেছি বলাই শ্রেয় হয়ত", বলিষ্ঠজন সঙ্গে যোগ করে, "নেহাতই হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে অন্যরকম—"

"কেউ খুঁজে পাওয়ার মতোই নয়", লম্বা সৈনিক বলে, "কিন্তু আমরা দু'জন এটা দেখতে পেয়ে গেছি, তুমিও দেখতে পেয়ে গেছ। অন্তত আমাদের দু'জনের পক্ষে এটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল।"

"ওভাবেই থেকে গেলে, নির্ঘাত সৈন্য হিসেবে বিদেশবিভূঁইতে নিয়ে যেত", বলিষ্ঠজন বলে, "আর, মানুষ মারতে হত এবং মানুষের হাতেই মারা যেতে হত। আমরা ওরকম কোথাও যেতে চাইনি। আমি আসলে একজন সাধারণ লোক, এ তখন সবে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। যতই হোক, একেবারে মানুষ মারতে চাইছিলাম না, আর মানুষের হাতে খুন হওয়াটা খুবই আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল। নেহাতই যেমনটা হয় আর কি।"

"তুমি কী চাও? মানুষ মেরে, মানুষের হাতে খুন হতে চাও", লম্বা সৈনিক আমাকে প্রশ্ন করে।

আমি মাথা নাড়ি। আমি কাউকে খুন করতে চাই না। কারুর হাতে খুন হতেও চাই না।

"যেকারুর ক্ষেত্রেই এটা সত্যি", লম্বাজন বলে, "মানে, বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। কিন্তু যুদ্ধে যেতে চাই না বললেই, 'তাই নাকি, তুমি যুদ্ধে যেতে চাও না নাকি? ঠিক আছে, না গেলেও হবে' দেশ তো আর স্নেহশীলভাবে সেকথা বলবে না। পালাতেও পারবে না। এই জাপানে, পালানোর মত জায়গা কোথাও নেই। যেখানেই যাও, অবিলম্বে বের করে ফেলবে। ছোট একটা দেশ বই তো নয়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দ্বীপ দিয়ে তৈরি। তাই আমরা এখানেই থেকে গেছি। এটাই ছিল একমাত্র গা-ঢাকা দেওয়ার মত জায়গা।"

একবার মাথা নেড়ে, সে আবার বলতে থাকে।

"আর, এভাবেই আগাগোড়া এখানেই থেকে গেছি। তুমি যেমন বললে, সেই *অনেক আগে* থেকে। কিন্তু আগেই যেটা বলেছি, সময় জিনিসটা এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কিছু নয়। এখন আর অনেক আগের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই", বলিষ্ঠজন বলে, আর হাত দিয়ে এক ঝটকায় কী একটা উড়িয়ে দেওয়ার মত ভঙ্গি করে।

"আমি যে এখানে এসে পড়ব, সেটা তাহলে আগে থেকেই জানতেন", আমি জিজ্ঞাসা করি।

"নিশ্চয়ই", বলিষ্ঠজন বলে।

"আমরা এখানে আগাগোড়া নজর রেখে যাচ্ছি বলে, কে আসবে তা ঠিকই জানতে পারি। আমরা বনেরই একটা অংশের মত", আরেকজন বলে।

"এককথায়, এটাই প্রবেশপথ", বলিষ্ঠজন বলে। "আর আমরা দু'জন এখানে পাহারায় আছি।"

"ঘটনাক্রমে প্রবেশ পথ এখন খোলা আছে", লম্বাজন আমাকে জানায়, "তবে, অবিলম্বেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। সেই কারণে এখানে সত্যিই ঢুকতে চাইলে, এখনই ঢুকে পড়তে হবে। যেহেতু এটা খোলা থাকাটা সর্বক্ষণের ব্যাপার নয়।"

"এখানে ঢুকতে হলে, আমরা এর পর থেকে পথ দেখাতে থাকব। পথ ঠাহর করা কঠিন, তাই পথ দেখানোটা জরুরি", বলিষ্ঠজন বলে।

"আর, না ঢোকার হলে, যে পথ ধরে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও", লম্বাজন বলে। "এখান থেকে ফিরে যাওয়া তেমন কঠিন কিছু নয়। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ঠিকমতই ফিরতে পারবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর, যে জগত থেকে এসেছ, সেখানে এখন অবধি যে জীবন যাপন করেছ, সেটাই চালিয়ে যেতে পারবে। কোনটা করবে তা একেবারেই তোমার ওপর নির্ভর করছে। ঢোকো বা না ঢোকো, কেউ জোরাজুরি করবে না। কিন্তু একবার যদি ঢোকো, পরে আবার ফিরে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে।"

"সঙ্গে নিয়ে চলুন", ইতস্তত না করে আমি উত্তর দিলাম।

"সত্যি তো", বলিষ্ঠ বলে।

"ভেতরে এমন কেউ আছে যার সঙ্গে দেখা করতেই হবে—হয়ত আছে", আমি বলি।

দু'জনে আর কিছু না বলে পাথরটার ওপর থেকে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে তুলে নিল। তারপর একবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিয়ে আমার সামনে সামনে হাঁটতে শুরু করল।

"কেন আমরা এখনও এরকম ভারি লোহার বান্ডিল বয়ে চলেছি, তোমার নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগছে সেটা", লম্বাজন ফিরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, "কোনও কাজেই আসে না যদিও, এমনকি গুলিও সাধারণত ভরা থাকে না—"

"আসলে, এটা একটা চিহ্ন", আমার দিকে না তাকিয়ে বলিষ্ঠজন বলল, "যা আমরা ফেলে এসেছি, পিছনে রয়ে গেছে, তারই প্রতীক।"

"প্রতীক জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ", লম্বাজন বলে, "আমরা ঘটনাচক্রে এভাবে বন্দুক নিয়ে, এরকম সৈনিকের পোষাক পরে আছি বলে, এখানেও আবার প্রহরীর কাজ নিয়েছি— ভূমিকা— প্রতীকই নির্দেশ করে দেয় সেটাও।"

"তোমার কাছে সেরকম কিছু আছে? যা কিনা চিহ্ন হতে পারে", বলিষ্ঠজন বলে।

আমি মাথা নাড়ি, "না। নেই। আমার কাছে কিছুই নেই। আছে শুধু স্মৃতি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হুম্", বলিষ্ঠজন বলে, "স্মৃতি—"

"কোনও চিন্তা নেই, অবশ্যই", লম্বাজন বলে, "ওটাও চমৎকার প্রতীক হতে পারে। স্মৃতি, খুব বেশি হলে কতদিন বজায় থাকে, প্রকৃতপক্ষে কতটা নির্ভরযোগ্য, সেটা যদিও ভাল করে জানা নেই।"

"সম্ভব হলে অবয়ব আছে এরকম জিনিস হলেই ভাল হয়", বলিষ্ঠজন তার মত জানায়, "ওটাই বোঝা সহজ বলেই ভাল।"

"যেমন ধরা যাক রাইফেল", লম্বাজন বলে, "সে যাই হোক, তোমার নামটা?"

"তামুরা কাফকা", আমি উত্তর দিই।

"তামুরা কাফকা", দু'জনেই বলে ওঠে।

"একটু কেমন যেন নামটা", লম্বাজন বলে।

"সত্যিই", বলিষ্ঠজন তাতে বলে।

বাকি রাস্তাটা, আমরা কথা না বলে, নিশ্চুপে হাঁটতে থাকি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

৪৪

দু'জনে জাতীয় সড়ক বরাবর শুকনো নদীর খাতে নিয়ে গিয়ে সাএকি-সানের দেওয়া ফাইল তিনটে পোড়াল। তরুণ হোশিনো কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে লাইটারের তেল কিনে এনে, সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইলগুলোর ওপর ঢেলে, লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। পাণ্ডুলিপির একটা একটা করে পাতা আগুনের শিখায় ঢেকে যাচ্ছে, এটা দু'জনে পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখে গেল। বাতাস প্রায় ছিলই না। ধোঁয়াগুলো সোজা আকাশে উঠে গিয়ে, নিচে নেমে আসা ছাইরঙা মেঘের ভেতর নিঃশব্দে মিশে গেল।

"আমরা এখন যে পাণ্ডুলিপিটা পোড়াচ্ছি, ওটা কি একেবারেই পড়া যাবে না", হোশিনো জানতে চায়।

"হ্যাঁ। পড়া বারণ", নাকাতা বলে। "একটা অক্ষরও না পড়ে পুড়িয়ে ফেলবে বলে নাকাতা সাএকি-সানকে কথা দিয়েছে। অঙ্গীকার পালন করা নাকাতার দায়িত্ব।"

"হুঁ, তা ঠিক। অঙ্গীকার রক্ষা করাটা খুব জরুরি", ঘামতে ঘামতে হোশিনো বলে। "সবার পক্ষেই সেটা জরুরি। কেবল, জানেন তো, শ্রেডারে দিয়ে দিলে খাটুনির দিক থেকেও, সময়ের দিক থেকেও অনেক সহজ হয়ে যেত বলেই মনে হয়। কোনও একটা কপি-শপে গেলেই, ভাড়া দেওয়া হয় এমন বড়সাইজের শ্রেডার রাখা আছে। খুব একটা বেশি পয়সা লাগে না। অভিযোগ করছি না, তবে বছরের এরকম একটা সময়ে আগুন জ্বালালে, সত্যি বলতে কী, বড্ড গরম লাগে। শীতের সময় হলে এটা তখন বেশ ভালই লাগত।"

"মাফ করবেন, নাকাতা এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলবে বলে সাএকি-সানকে কথা দিয়েছিল। সেইজন্যই আর কি, পুড়িয়ে না ফেললে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলবে না।”

“না না, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে তো—বিশেষ করে, হাতে যখন এমন কিছু কাজ নেই যাতে তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে। এমনও নয় যে একটু আধটু গরমও সহ্য করতে পারব না। আমি নেহাতই, কী বলব, একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম।”

নদীতীরে দুজনে যে অসময়ের ঋতুতে আগুন জ্বালিয়েছে, কাছ দিয়ে যাওয়া একটা বেড়াল দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন গভীর কৌতূহল সহকারে, সেটা দেখছিল। রোগা একটা ঘন বাদামি রঙের ডোরাকাটা বেড়াল। লেজের ডগাটা অল্প বাঁকানো। বেশ শিষ্ট স্বভাবের বেড়াল মনে হওয়ায় নাকাতা একটু বাতচিৎ করে দেখতে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়ল, কিন্তু পাশেই যে হোশিনো রয়েছে সেটা মনে পড়তেই ক্ষান্ত দিল। নাকাতা একা না থাকলে বেড়ালেরা সাবধান হয়ে থাকে। তার ওপর, আগের মত করে ঠিকঠাক বেড়ালের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে কিনা, নাকাতার আর সেই আত্মবিশ্বাস নেই। নাকাতার কোনও ইচ্ছেই নেই বিদঘুটে কিছু বলে বেড়ালদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার। বেড়াল ততক্ষণে আগুন দেখায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, গাত্রোত্থানপূর্বক সে রওনা দিয়ে একদিকে চলে গেল।

ফাইল তিনটে পুরোপুরি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যেতে অনেকটা সময় লাগল। তরুণ হোশিনো তারপর সেই ভস্মাবশেষ পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়োগুঁড়ো করে দিল। জোরে বাতাস দিলে সবটা কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কাকেদের বাসার দিকে উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছিল।

“আরে, কাকু, এতে করে তো কেউই আর পাণ্ডুলিপিটা পড়তে পেল না”, তরুণ হোশিনো বলল, “জানি না ওতে কী লেখা ছিল, শেষপর্যন্ত সবটাই পরিষ্কার হারিয়ে গেল। জগতের থেকে, আকৃতি আছে এমন জিনিস খানিকটা কমে গিয়ে, শূন্যতা জিনিসটা ততটুকুই বেড়ে গেল—”

“হোশিনো সান...”

“কী, বলু...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"একটা কথা জানতে চাইছি।"

"বলুন না—"

"শূন্যতা কি বাড়তে পারে?"

তরুণ হোশিনো অল্প কিছুক্ষণ ঘাড়টা হেলিয়ে রেখে, এই নিয়ে ভাবতে থাকে, "এ খুবই কঠিন প্রশ্ন", শেষটায় বলে, "শূন্যতা কি বাড়ে? শূন্যতাপ্রাপ্ত হলে তো জিরো হয়ে যায়, জিরোর সঙ্গে জিরো যোগ করলে তো সেই জিরোই হয়!"

"নাকাতাও ঠিক জানে না—"

"হোশিনো-কুনও জানে না ঠিকমত। এইসব জিনিস ভেবে ভেবে বের করলে, ক্রমশই মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে।"

"তাহলে এখন আর চিন্তা করা বন্ধ করি।"

"আমারও মনে হয়, সেটাই ভাল", তরুণ বলে, "পান্ডুলিপি তো ঠিকমতই পোড়ানো হয়ে গেছে। ওতে যেসব কথা ছিল, তার একটিও আর নেই, মিলিয়ে গেছে, শূন্যতাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে আমরা বলছি—"

"হ্যাঁ। নাকাতাও এতে স্বস্তি পেয়েছে।"

"এবার তাহলে কি এখানে আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে", তরুণ জানতে চায়।

"হ্যাঁ। মোটামুটি কাজটা হয়ে গেছে। এরপর শুধু প্রবেশপথটা আগের মত বন্ধ করে দেওয়া।"

"সেটাও তো জরুরি।"

"হ্যাঁ। খুবই জরুরি। একবার খুললে, বন্ধও করতে হবে—"

"তাহলে এখনই সেটা করে ফেলা যাক। শুভস্য শীঘ্রম।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হোশিনো-সান—"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, সেটা করা যাবে না—"

"কেন?"

"এখনও তার সময় আসেনি বলে", নাকাতা বলে, "প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, বন্ধ করার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর নাকাতাকে তার আগে ভাল করে ঘুমিয়ে নিতে হবে। নাকাতার ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে।"

তরুণ নাকাতার মুখের দিকে তাকায়, "মানে, ওই আগের মতই আবার কয়েকদিন ধরে টানা ঘুমিয়ে থাকা?"

"হ্যাঁ, ঠিক যে কী হবে বলতে পারি না, সম্ভবত ওরকমই হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"বলছি যে, অনেকটা সময় শুয়ে থাকতে হবে তো, তার আগে ঘুমটা একটু চেপে রেখে কাজটা সেরে নেওয়ার উপায় নেই বলে বলছেন? যে কারণে বলছি, সেটা হল যে, কাকু একবার ঘুম মোড়ে চলে গেলে তো কিছুরই আর কোনও অগ্রগতিই হয় না।"

"হোশিনো-সান—"

"কী, বলুন?"

"মাফ করবেন। ভাবছি, কত ভাল হত বলুন তো সেটাই করা গেলে। নাকাতাও তাহলে, সাধ্যে কুলোলে, আগে প্রবেশপথ খোলা বন্ধ করার কাজটা সেরে নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাকাতাকে আগে ঘুমিয়ে নিতে হবে। আর ঠিকমত চোখ খুলে রাখতে পারছে না।"

"একেবারে ব্যাটারি অফ হয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার দেখছি।"

"সেরকমই হয়তো। যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশি সময় লাগল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাকাতার শক্তি নিশ্চিত করে ফুরিয়ে আসছে। ঘুমোনোর জায়গায় একটু নিয়ে যাবেন দয়া করে?”

“আহা রে। ট্যাক্সি ধরে এক্ষুণি সেই বাড়িটায় ফিরে যাব। যত খুশি, একেবারে গাছের গুঁড়ির মত পড়ে ঘুমোতে পারবেন।”

ট্যাক্সির সিটে বসেই নাকাতা তক্ষুণি একেবারে ঝিমোতে শুরু করল।

“কাকু, ঘরে পৌঁছে যতখুশি অঘোরে ঘুমোবেন, এখন একটু সামলে থাকুন।”

“হোশিনো-সান!”

“হ্যাঁ—”

“কতরকম ঝঞ্ঝাটে যে আপনাকে ফেলছি”, নাকাতা উন্মনা অস্ফুট স্বরে বলে।

“সত্যিই ঝঞ্ঝাটে ফেলছেন বলে মনে হচ্ছে”, তরুণ সায় দিয়ে বলে, “কিন্তু জানেন তো, এখন পর্যন্ত ঘটনাক্রম পুরোটা বিবেচনা করলে, আমি নিজে থেকেই কাকুর সঙ্গে জুটে গেছি। কিংবা বলা যায়, আমি নিজেই উপযাচক হয়ে এগিয়ে এসে ঝঞ্ঝাট নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। কারুর অনুরোধে করছি না এটা। শখ করে বেলচা দিয়ে বরফ সরানোর মত আর কি। সুতরাং প্রত্যেকবার কাকুকে আলাদা করে চিন্তিত হতে হবে না। খুশিতে থাকুন!”

“হোশিনো-সান না থাকলে নাকাতা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ত বলেই মনে করি। এই কাজের অর্দ্ধেকও করে উঠতে পারতাম না হয়তো—”

“তা যদি বলেন, তবে তো হোশিনো-কুনের পরিশ্রম সার্থক!”

“নাকাতা খুবই [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু, নাকাতা-সান—"

"হ্যাঁ—"

"এই বান্দারও নাকাতা-সানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে উপায় নেই।"

"তাই নাকি—?"

"আমরা এভাবে এদিক ওদিক দশ দিনেরও বেশি দু'জনে হেঁটে বেড়াচ্ছি", তরুণ বলে, "এই সময়টা আমি একটানা আমার নিজের কাজে যাইনি। গোড়ার দিকে কয়েকদিন আমি ছুটি নিচ্ছি বলে অফিসকে জানিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মাঝে একসময় থেকে দিব্যি বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত রয়েছি। আগের কাজে সম্ভবত আর ফেরা যাবে না। যদিও বার বার খুব করে মাফ চাইলে হয়তো কোনওভাবে ক্ষমা করে দিতেও পারে। সে না হয় ঠিকই আছে। গর্ব করে বলছি না, ড্রাইভার হিসেবে আমার হাত ভাল, কাজের লোক, কোনও একটা চাকরি ঠিকই খুঁজে নেব। তাই ওই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না, নাকাতা-সানও চিন্তা করবেন না। যাই হোক না কেন, যেটা বলতে চাইছি, আমার এই নিয়ে একেবারেই কোনো অনুশোচনা নেই। এই দশ দিন ধরে আমার বহুরকম সব অদ্ভুত ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে আকাশ থেকে জোঁক ঝরে পড়াই বলুন, কর্নেল স্যান্ডার্স কোত্থেকে আবির্ভূত হয়ে, ইউনিভার্সিটিতে দর্শন না কী পড়ছে এমন অতুলনীয় একটা মেয়ের সঙ্গে দারুণ সেক্স হওয়ার কথাই বলুন, জিনজা থেকে প্রবেশপথের পাথর নিয়ে হাঁটা দেওয়াই বলুন, কিংবা আরো নানা বিদঘুটে সব ব্যাপারই বলুন। এক জীবনে যত বিদঘুটে কিছু ঘটতে পারে তার সবটা এই দশ দিনের মধ্যে হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। ঠিক যেন দূরপাল্লার জেট-কোস্টারের ট্রায়াল রানে চেপে বসেছি এমন অনুভূতি—"

কথা থামিয়ে, এরপর কী বলবে ভাবতে থাকে তরুণ।

"কিন্তু, কাকু—"

"হ্যাঁ—"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"আমার মনে হয়েছে, এইসবের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত কিন্তু, যাই বলুন, কাকু আপনি নিজে। হ্যাঁ, নাকাতা-সানই। কেন বলছি অদ্ভুত, আমার মত লোককে পর্যন্ত কাকু একেবারে বদলে দিয়েছেন। হ্যাঁ। এই গত দশ দিনে, আমি যেন অনেকটা পালটে গেছি বলে মনে হচ্ছে। অনেকরকম দৃশ্যই চোখে অনেকটাই অন্যরকম ঠেকছে। এযাবৎ যেসব জিনিস একপলক চোখ বুলিয়ে ভ্রূক্ষেপই করতাম না, এখন চোখে অন্যরকম ঠেকছে। তখন অবধি যে সঙ্গীত আদৌ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়নি, কী আশ্চর্য, তা একেবারে ছবির মত মনে বসে যায়! একই ধরণের জিনিস সম্বন্ধে অবহিত কারুর সঙ্গে সেই অনুভূতি নিয়ে কথা বলতে পেলে ভাল হয় বলে মনে হতে থাকে। এসব, জানেন তো, এযাবৎ কখনও আমার হয়নি। তাহলে, কেন এরকম হল? হল, কারণ আমি আদ্যন্ত নাকাতা-সানের পাশে পাশে ছিলাম। আর, নাকাতা-সানের চোখ দিয়েই যেন দেখছিলাম বলেই। যা কিছুই দেখেছি, সবই যে নাকাতা-সানের চোখ দিয়েই দেখেছি, তা অবশ্যই নয়। তবে কিনা, খুবই স্বাভাবিক ভাবে কাকুর চোখ দিয়ে দেখার মত করে বিভিন্ন জিনিস দেখেছি। যদি বলেন কেন এরকম করলাম, জগতের প্রতি কাকুর দৃষ্টিভঙ্গীটা আমার বেশ মনে ধরেছিল। সেইজন্যেই হয়তো, আমি, এই হোশিনো-কুন, এখন অবধি টানা কাকুর সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেলাম। কাকুর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারিনি। এটাই এযাবৎ আমার জীবনে ঘটা সবচেয়ে ফলবান জিনিসগুলোর একটা। এ ব্যাপারে, আমার দিক থেকেই বরং কাকুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়, সুতরাং কাকুর আর আমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর দরকার নেই। কেউ কৃতজ্ঞতা জানালে অবশ্যই খারাপ লাগে না যদিও। আমি শুধু বলতে চাই যে নাকাতা-সান আমার অনেক উপকার করেছেন। এই যে, বুঝলেন?"

কিন্তু নাকাতা কোনও কথাই শুনছিল না। ইতিমধ্যেই সে চোখ বুজে ফেলেছে, ঘুমের মধ্যে নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

"লোকটা এক্কেবারে নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছন্দ মানুষ", বলে হোশিনো বড় করে শ্বাস ফেলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাকাতাকে ধরে ধরে এনে অ্যাপার্টমেন্টের সেই ঘরে ফিরে এসেই, তরুণ তাকে খাটে শুইয়ে দিল। পোশাক যেমন ছিল তেমনই রইল, কেবল জুতোটা খুলে দিল, শরীরের ওপরে পাতলা একটা লেপ দিয়ে দিল। নাকাতা নড়ে চড়ে মোড়ামুড়ি দিয়ে অন্যান্য সময়ের মতই সোজা ছাদের দিকে তাকানোর মত করে, শান্ত ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে নিতে, একসময় আর নড়াচড়া একদম বন্ধ করে দিল।

"দ্যাখো দ্যাখো, নির্ঘাত এইভাবে দু-তিন দিন আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে", তরুণ মনে মনে ভাবল।

কিন্তু ঘটনাক্রম তরুণের অনুমান অনুসরণ করল না। পরদিন বুধবার দুপুরের আগে নাকাতা মারা গেল। গভীর ঘুমের মধ্যে সমাহিত ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। মুখের ভাব সর্বক্ষণের মতই অত্যন্ত শান্ত, একপলক দেখলে ঘুমিয়ে আছে বই আর কিছু মনে হবে না। কেবল শ্বাস নিচ্ছে না, এই যা। তরুণ বার কয়েক নাকাতার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে, নাম ধরে ডেকে দেখল। কিন্তু এতে কোনও ভুল নেই যে নাকাতা মারা গেছে। নাড়ি ছেড়ে গেছে, মুখের কাছে হাতে ধরা আয়না এনে ধরাতেও সেটা ঝাপসা হল না। শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ। এই পৃথিবীতে ও আর কখনো চোখ খুলে তাকাবে না।

মৃতব্যক্তির সঙ্গে একই ঘরে থাকলে, অন্য সব শব্দ একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হতে থাকে। আশেপাশের বাস্তব শব্দগুলো, ক্রমে ক্রমে বাস্তবতা হারাতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থবহ শব্দগুলো মৌন হয়ে যায়। সেই মৌনতা সমুদ্রের নিচে জমে ওঠা কাদার মতই কেবলই গভীর হতে থাকে। পায়ের কাছে জমে, কোমর অবধি জমে উঠে, বুক অবধি জমে। তা সত্ত্বেও, তরুণ অনেকটা সময় ধরে নাকাতার সঙ্গে সেই ঘরে থেকে, জমে ওঠা নৈঃশব্দ্যের গভীরতা চোখ দিয়ে মাপছিল। সোফায় বসে, নাকাতার মুখের একপাশের দিকে তাকিয়ে সেই মৃত্যুটাকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল। সবটা অনুধাবন করে উঠতে অনেকটা সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাগল। বাতাস যেন বিশেষরকম ভারি হয়ে গেছে, নিজে এখন যেটা অনুভব করছে আর ভাবছে, সেটা সত্যিই এখন অনুভব করছে কিনা, ঠিকমত যাচাই করে নেওয়া যাচ্ছে না। অথচ তার জায়গায়, কিছু কিছু জিনিস স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছিল।

মৃত্যুর সূত্রে নাকাতা-সান হয়তো স্বাভাবিক নাকাতা-সানে ফিরে যেতে পারল, তরুণের মনে হল। নাকাতা-সান এত দীর্ঘদিন ধরে এই নাকাতা-সান হয়ে আছেন যে স্বাভাবিক হতে হলে মৃত্যু ছাড়া উপায় ছিল না।

"এই যে, কাকু", তরুণ নাকাতাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে। "বললে কেমন যেন শোনায় যদিও, মৃত্যু হতে হলে এভাবে হওয়াটা খারাপ কিছু নয়।"

নাকাতা গভীর ঘুমের মধ্যে, হয়তো কোনও চিন্তা ছাড়াই, শান্তভাবে ওই অবস্থায়ই মারা গেছে। মৃত্যুতেও মুখে প্রশান্তি, কোনও কষ্টের ছাপ চোখে পড়ে না, অনুশোচনাহীন, কোনও ইতস্তভাব নেই। 'নাকাতা-সানের মত করেই'—তরুণ মনে মনে ভাবল। নাকাতা-সানের জীবনটা আদপে কী ছিল, সেটার তাৎপর্যই বা কী, সেসব জানা নেই। কিন্তু সেকথা বললে, কারুরই জীবন জিনিসটা অত স্পষ্টরকম অর্থবহ নয়। মানুষের ক্ষেত্রে যেটা সত্যিই মূল্যবান, সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অবশ্যই তার মৃত্যুর ধরণটা, তরুণ ভেবে দেখল। যেভাবে মৃত্যু হল, তার তুলনায় যেভাবে বেঁচে ছিল সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় সম্ভবত। আর তা হলে তো, মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে সেটাই নির্ধারণ করবে মৃত্যুটা কীভাবে হবে। মৃত নাকাতার মুখের দিকে তাকিয়ে এইসবই তরুণ ভেবে গেল।

কেবল একটাই বড় সমস্যা এরপরেও রয়ে গেল। সেটা হল, প্রবেশপথটা পাথর দিয়ে বন্ধ করবে কে। নাকাতা-সান তার অধিকাংশ আরব্ধ কাজ শেষ করে গেলেও, এই একটাই বাকি রয়ে গেছে। পাথরটা তো সোফার পায়ার কাছে আছেই। সময় এলে, ওটা উলটে দিয়ে আমাকে প্রবেশপথটা বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু নাকাতা-সান বলেছিলেন যে পাথরটা ঠিকমত সামলাতে না পারলে, গড়বড় হয়ে গেলেই বিপদ হবে। নির্ঘাত উলটে দেওয়ার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কোনও সঠিক তরিকা আছে। গায়ের জোর খাটিয়ে বেকায়দায় উলটে দিলে জগতটাই এলোমেলো হয়ে পড়বে এমন সম্ভাবনা আছে।

"আরে, কাকু, মরে গেলে কিছু করার নেই যদিও, কিন্তু এভাবে জরুরি কাজ ফেলে রেখে গেলে তো খুব মুশকিলে পড়তে হয়" , মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তরুণ বলে ওঠে। কিন্তু অবধারিতভাবে কোনও উত্তর আসে না।

আরো একটা ব্যাপার, নাকাতা-সানের মৃতদেহের সৎকার কীভাবে হবে সেই সমস্যাও রয়েছে। অবশ্যই প্রথাগতভাবে যেটা করণীয় সেটা হল সত্বর পুলিশকে হোক, হাসপাতালকে হোক ফোন করে মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। পৃথিবীর নিরানব্বই শতাংশ মানুষদের ক্ষেত্রেই যেটা করা হয়। সম্ভব হলে তরুণও সেটাই করতে চাইছিল। কিন্তু এইমুহূর্তে নাকাতা হল, খুনের ঘটনায় পুলিশ খুঁজছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এরকম একজন লোকের কার্যকলাপের সঙ্গে দশ দিন ধরে যুক্ত হয়ে আছে জানলে তরুণ নিজেই বেশ মুশকিলের পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়বে। পুলিশ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই জিনিসটাই যেভাবে হোক এড়াতে চাইছিল ও। এখন অবধি যা কিছু হয়েছে, সব খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করার ঝামেলা তো আছেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ একেবারে অখাদ্য হয়। এইসবের সঙ্গে যথাসম্ভব জড়িয়ে না পড়াই ভাল।

"তাছাড়াও", তরুণ চিন্তায় পড়ে, "এই অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে ঘরটার ব্যাপারেই বা কী ব্যাখ্যা দেওয়া যায়?"

কর্নেল স্যান্ডার্সের বেশ ধরে থাকা এক বৃদ্ধ এই ঘরটা আমাদের ধার দিয়েছেন। তোমাদের জন্যই এই ঘরটার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পার, এই মর্মে সেই কাকু বলেছিলেন— পুলিশ কি নির্বিবাদে সেকথা বিশ্বাস করবে? কিছুতেই না। কর্নেল স্যান্ডার্স কে? অ্যামেরিকান মিলিটারির কেউ? না, দেখুন, ইয়ে, কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেনের সাইনবোর্ডের সেই কাকু। আপনি গোয়েন্দা, আপনিও জানেন নিশ্চয়ই। সেই উনিই। চশমা পরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সাদা দাড়ি রেখেছেন—সেই লোক তাকামাৎসুর গলিতে বেশ্যার দালালি করছেন। ওখানেই আলাপ। মেয়ে সাপ্লাই দিয়েছিলেন। এসব বললে, "নির্বোধ রাসকেল, ফাজলামি হচ্ছে", বলে এক ঘা দেবে তার সঙ্গে। এরা সব দেশের থেকে মাইনে পাওয়া মাফিয়া ছাড়া কিছু নয়।

গভীর করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুণ।

আমাকে যেটা করতে হবে, সেটা হল এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। স্টেশন থেকে বেনামে ফোন করব পুলিশকে। এই বাড়িটার ঠিকানা দিয়ে, বলে দেব যে ওখানে একজন মরে পড়ে আছেন। তারপর সোজা ট্রেনে চেপে নাগোয়আ ফিরে যাব। এটা করলেই আমাকে আর এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হবে না। সবদিক থেকেই স্বাভাবিক মৃত্যু, তাই পুলিশও এই নিয়ে আর হৈচৈ করবে না। নাকাতা-সানের আত্মীয়স্বজনরা মৃতদেহ গ্রহণ করে, সাদাসিধে একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করবে। আর আমি অফিসে গিয়ে মালিকের কাছে মুখ বুজে মাথাটি নিচু করে দাঁড়াব। মাফ করবেন, এবার থেকে খুব মন দিয়ে কাজ করব। কোনও না কোনও ভাবে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব।

ও জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। পালটানোর মত পোশাক ব্যাগের ভেতরে ভরে নিল। চু-নিচি ড্র্যাগনসের টুপিটা পরে নিয়ে, পনিটেইলটা টুপির পেছনদিকের ফুটোটার ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিল আর সবুজ সানগ্লাসটাও পরে নিল। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রিজ থেকে ডায়েট পেপসি বের করে খেল। ফ্রিজের দরজায় হেলান দিয়ে ওটা খাওয়ার সময় সোফার পায়ার কাছে রাখা গোল পাথরটাতে হঠাৎ করেই চোখ পড়ে গেল। উলটো করে রাখা অবস্থায় 'প্রবেশপথের পাথর'। এবার ও শোয়ার ঘরে গিয়ে শায়িত নাকাতার দিকে আরেকবার তাকাল। মরে গেছে বলে মনে হচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তখনও শান্তভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। যেন ওই অবস্থা থেকে চট করে উঠে পড়ে, "হোশিনো-সান, নাকাতা যে মারা গেছে বলে ভাবছেন, সেটা ঠিক নয়", বলে বসবে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। নাকাতা নিশ্চিতভাবেই মৃত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিরাকেল কিছু ঘটবে না। অনেক আগেই নাকাতা পরপারের সীমানা পেরিয়ে গেছে।

পেপসির ক্যান হাতে ধরা অবস্থায় তরুণ মাথা নাড়ে। এরকম করা যাবে না, ওর মনে হল। পাথরটা এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। এটা করলে নাকাতা-সান হয়তো ঠিকমত মরতেও পারবেন না। নাকাতা-সানের স্বভাবটাই ছিল এমন যে সবকিছু শেষ অবধি সনিষ্ঠভাবে গুছিয়ে উঠতে না পারলে শান্তি হত না। কিন্তু তার আগেই ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল যে। তাই অনিচ্ছাবশত হলেও, শেষ বড় কাজটা আর গুছিয়ে করে যেতে পারলেন না। অ্যালুমিনিয়াম ক্যান হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে থেঁতলে, আবর্জনার ড্রামে ফেলে দিল ও। এতেও গলাটা শুকনোই লাগছে দেখে রান্নাঘরে ফিরে ফ্রিজ থেকে দ্বিতীয় একটা ডায়েট পেপসি বের করে এনে আংটায় টান দিয়ে খুলল।

নাকাতা-সান আমায় বলেছিলেন, মৃত্যুর আগে একবারের জন্য হলেও অক্ষর পড়তে সক্ষম হতে চান। তাহলে লাইব্রেরিতে গিয়ে যতখুশি বই পড়তে পারবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই মারা গেলেন। নিশ্চয়ই মরে গিয়ে, অন্য জগতে চলে গিয়ে, সেখানে স্বাভাবিক নাকাতা-সান হয়ে পড়তে পারছেন সম্ভবত, কিন্তু এই জগতে যতদিন ছিলেন, শেষদিন পর্যন্ত পড়তে পারতেন না। বলতে কী, উলটে নাকাতা-সান সর্বশেষ যেটা করলেন, সেটা হল অক্ষর সব পুড়িয়ে দিয়ে গেলেন। ওখানে অজস্র যেসব শব্দ, বাক্য ছিল, একটিও বাকি না রেখে, সব শূন্যতার মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে গেলেন। এ এক আয়রনি। সেক্ষেত্রে, আমার দিক থেকে, এই লোকটার আরেকটা প্রার্থণা কোনওভাবে মঞ্জুর করে যেতে হবে। প্রবেশপথটা বন্ধ করে দেওয়া। ওটা খুব জরুরি। শেষ অবধি তো আর সিনেমা হলেও নিয়ে যাওয়া হল না, অ্যাকোয়ারিয়ামেও নিয়ে যাওয়া হল না।

দ্বিতীয় ডায়েট পেপসিটা খাওয়া শেষ হলে, সোফার সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে, পরখ করতে পাথরটা তুলে নিয়ে দেখল। পাথরটা ভারি লাগছে না। হালকা কোনওভাবেই নয়, তবে একটু শক্তি প্রয়োগ করে সহজেই তুলে ফেলতে পারল। কর্নেল স্যান্ডার্সের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সঙ্গে জিনজায় গিয়ে ছোট্ট মন্দিরটা থেকে বের করে আনার সময় এরকমই ভারি ছিল। আচার তৈরি করতে চাপা দেওয়ার পাথরের যেটুকু মাঝারি ওজন হয় সেরকম। তরুণের মনে হল, তার মানে এখনকার মত এটা নেহাতই একটা পাথর। প্রবেশপথের পাথরের ভূমিকা পালন করতে হলে তখন যতটা ভারি হয়ে যায় তাতে আর এটুকু শক্তিতে তুলে ফেলা যায় না। যতক্ষণ হালকা, ততক্ষণ নেহাতই একটা পাথরের বেশি কিছু নয়। বিশেষ কিছু একটা ঘটে গিয়ে, ওই পরিস্থিতিতে পাথরটা প্রথমে অস্বাভাবিক ওজন ধারণ ক'রে, 'প্রবেশপথের পাথর' হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে। ধরা যাক, শহরের মধ্যে বজ্রপাতের মত কিছু ঘটে—

তরুণ জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে, বারান্দা থেকে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ আগের দিনের মতই নিস্প্রাণ ধূসর মেঘে ছাওয়া। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার কোনও আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। বজ্রপাত হবে বলেও মনে হচ্ছে না। কান খাড়া করে রেখে, বাতাসের গন্ধ শুঁকে দেখল। অস্বাভাবিক কিছু নেই। আজকের পৃথিবীর কেন্দ্রীয় থীম যেন 'স্থিতাবস্থা বজায় রাখা'।

"এই যে, কাকু", মৃত নাকাতাকে উদ্দেশ্য করে ও বলে, "এর মানে হল, সেই বিশেষ কিছু এসে পড়ার অপেক্ষায়, এই ঘরের মধ্যে আমি আর কাকু এই দুজনকে থাকতে হবে হয়তো। কিন্তু সেই বিশেষ কিছুটা আসলে কেমন জিনিস? আমার তো একেবারেই কোনও ধারণা নেই। আরও সমস্যা হল, সেটা যে কখন এসে হাজির হবে তাও তো জানা নেই। পরিস্থিতি ততোধিক খারাপ হওয়ার কারণ, এটা জুন মাস, ফেলে রাখলে কাকুর শরীরে একটু একটু করে পচন ধরতে থাকবে। এমনকি গন্ধও বেরুবে। কাকুও এসব কথা খুব একটা শুনতে চাইছেন না যদিও, কিন্তু এটা তো প্রকৃতিরই ইচ্ছা। আর যতই সময় যাবে, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে ততই দেরি হতে থাকবে, আমার পরিস্থিতিও আরো বেশি বেশি করে বিচ্ছিরি হতে থাকবে। কোনওভাবে আমি নিজে নিজে যতটুকু পারি চেষ্টা করে দেখব, তবে সেই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনিও অবহিত থাকলে ভাল হয়—"

তবে, উত্তর অবশ্যই কিছু এল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তরুণ ঘরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াতে থাকল। মনে হচ্ছে, কর্নেল স্যান্ডার্স হয়তো যোগাযোগ করতে পারেন। ওই কাকুই জানবেন, পাথরটা নিয়ে কী করা যায়। চাঙ্গা হয়ে ওঠার মত কোনও পরামর্শ দেবেন হয়তো, যা করে লাভ আছে। কিন্তু টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে যতই বসে থাকুক, বেজে উঠল না। অবিচল নীরবতা পালন করে গেল। নীরব হয়ে থাকা টেলিফোন যন্ত্রটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আত্মমগ্ন বলে মনে হচ্ছিল। দরজায়ও কেউ করাঘাত করল না। একটা কোনও মেইলও এল না। বিশেষ কিছু একটাও ঘটল না। আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন নেই, কোনও অশুভ আশঙ্কাও মনে উঁকি দিল না। সময় নেহাৎই অভিব্যক্তিহীনভাবে কেটে যেতে থাকল। দুপুর এল, তারপর একসময় বিকেল শান্তভাবে সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে গেল। দেওয়ালের ইলেকট্রিক-ঘড়ির কাঁটা সময়ের ওপর দিয়ে, জলের উপরিতলে জলের পোকার মত মসৃণভাবে এগিয়ে গেল, আর খাটের ওপর নাকাতা মরে পড়ে রইল। খিদে কোনও কারণে একটুও চাগাড় দিয়ে উঠল না। সন্ধ্যেবেলা তরুণ তৃতীয় পেপসিটা খেয়ে, নিয়মরক্ষার মত করে কয়েকটা বিস্কুট চিবোল।

ছ'টা বাজতে তরুণ সোফায় বসে পড়ে, রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে টিভিটা অন করল। NHK-র নির্দিষ্ট সময়ের নিউজটা দেখল বটে, মনোযোগ আকর্ষণ করার মত একটাও খবর তাতে নেই। অন্যান্য দিনের মতই, বিশেষত্বহীন একটা দিন। নিউজ শেষ হলেও টিভিটা অফ করে দিল। অ্যানাউন্সারের কথা বলার ধরণটা ভয়ানক ক্লান্তিকর। বাইরে অন্ধকার একটু একটু করে বেড়ে, শেষে একেবারে রাত নেমে এল। রাতের সঙ্গেই সেই ঘরে নেমে এল এক গভীর নৈঃশব্দ।

"এই যে, কাকু", তরুণ হোশিনো নাকাতাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, "একটু জেগে উঠুন না, হোশিনো-কুনের এবার একটু দিশেহারা মত লাগছে। আর, কাকুর গলাটাও একটু শুনতে চাইছি।"

নাকাতা অবশ্যই তাতে কোনও উত্তর করল না। যথারীতি সে এখনও পরপারেই। নির্বাক, মৃতাবস্থায়। গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কান পাতলে ভূগোলকের ঘূর্ণনের আওয়াজ অবধি শোনা যায় যেন।

লিভিংরুমে গিয়ে 'তাইকোও ট্রায়ো'-র সিডি চালিয়ে দিল ও। সর্বপ্রথম মুভমেন্টের থীমটা শুনতে শুনতে, দু'চোখ থেকে জল উপচে পড়ল। অনেক অনেক জল। দ্যাখো, দ্যাখো, এর আগে আর কবে কেঁদেছি আমি—হোশিনো ভাবার চেষ্টা করল, কিন্তু মনে করতে পারল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৫

‘প্রবেশপথের’ মুখটা থেকে সামনের রাস্তাটা সত্যিই বুঝে ওঠা বেশ কঠিন। বলা চলে, পুরোটাই এখন আর পথ হয়ে নেই। সামনেও অরণ্য বৃদ্ধি পেয়ে গভীর ও বিশাল হয়ে গেছে। পায়ের নিচের ঢাল নিরন্তর আরো খাড়াই, ঘন ঝোপ আর আগাছা মাটিকে একেবারে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। আকাশ প্রায় দেখাই যায় না, চারদিক গোধূলির স্তিমিত আলোর মত ম্লান হয়ে রয়েছে। পুরু মাকড়সার জাল ছেয়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায়, উদ্ভিজ্জের থেকে উৎসারিত গন্ধ ঘন হয়ে আছে। নৈঃশব্দ্য উত্তরোত্তর ভারি হয়ে, অরণ্য মানুষের অনুপ্রবেশ প্রত্যাখ্যান করছে। অথচ সৈনিকেরা পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে আগে আগে অনায়াসে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দিয়ে গলে যাচ্ছে। দু’জনের পদক্ষেপ আশ্চর্যরকম দ্রুত। নিচের দিকে ছড়ানো গাছের ডালের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে, পাথরের ঢিবির ওপরে চড়ে, খানাখন্দ লাফিয়ে পার হয়ে, দক্ষতা সহকারে কাঁটাওলা ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

পিছনে পিছনে, ওরা যেন চোখের আড়াল হয়ে না যায় এভাবে, মরীয়া হয়ে ওদের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। আমি পেছনে পেছনে আসছি কিনা, এমনকি সেটুকু পর্যন্ত সৈনিকেরা নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছিল না। ওরা যেন আমার ক্ষমতা পরখ করে দেখছে। আমি কতটা সহ্য করতে পারি মেপে নিচ্ছে। এমনও হতে পারে যে আমার ওপরে হয়তো (কী কারণে জানি না) খানিকটা অসন্তুষ্ট। একটিও কথা মুখ থেকে খসাচ্ছে না ওরা। আমার সঙ্গে শুধু নয়, নিজেদের মধ্যেও কোনও বাক্যবিনিময় নেই। একমনে সামনের দিকে হেঁটে চলেছে ওরা। দু’জনেই কেউ কোনও কথা ছাড়াই, পালা করে একজন সামনে, অন্যজন তার পেছনে এইভাবে এগিয়ে চলেছে। সৈনিকদের কাঁধে ঝোলান রাইফেলের কালোরঙের নলগুলো, চোখের সামনে নির্দিষ্ট ছন্দে ডাইনে-বাঁয়ে দুলে চলেছে। একেবারে একজোড়া মেট্রোনোমের মত। ওগুলোকে লক্ষ্য করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

হাঁটতে থাকলে, কেমন যেন সম্মোহিত লাগতে থাকে। চেতনা অন্যত্র অভিমুখ পরিবর্তন করে, বরফের ওপরে পিছলে যাওয়ার মত করে সরে যায়। কিন্তু আমি যে করেই হোক, শুধু ওদের গতির তুলনায় যেন শ্লথ হয়ে না পড়ি এই ভেবে, ঘামতে ঘামতে চুপচাপ হেঁটে চলি।

"একটু বেশিই দ্রুত হাঁটা হয়ে যাচ্ছে কি", শেষপর্যন্ত সৈনিকদের মধ্যে বলিষ্ঠজন পেছন ফিরে জানতে চাইল। কণ্ঠস্বরে শ্বাসপ্রশ্বাসের এতটুকু পরিবর্তনের আভাস নেই।

"না", আমি বলি, "ঠিকই আছে। সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারব।"

"তোমার বয়েস অল্প, ঠিকই আছে বলে মনে হয়", সামনের দিকে মুখ করে লম্বাজন বলে।

"আমরা এই রাস্তায় সচরাচর আসাযাওয়া করে অভ্যস্ত তো, না জেনেই জোরে জোরে পা ফেলতে থাকি", সৈনিকদের মধ্যে বলিষ্ঠজন কৈফিয়ত দেওয়ার মত করে বলে। "তাই বেশি জোরে হয়ে গেলে বোলো যে জোরে হয়ে যাচ্ছে। দ্বিধা কোরো না। তাহলে আরেকটু ধীরে হাঁটব না হয়। নেহাতই আমরা প্রয়োজনের চেয়ে ধীরে হাঁটতে চাই না বলেই। বুঝলে তো?"

"সঙ্গে সঙ্গে যেতে না পারলে, বলব সেটা", আমি উত্তর দিই। জোর করে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে, বেদম হয়ে পড়াটা ওদের বুঝতে না দিয়ে বলি, "আরও কি অনেকটা?"

"তেমন দূরে নয়", লম্বাজন বলে।

"আর একটুখানি", অন্যজন বলে।

তবে, ওদের ধারণার ওপর খুব একটা নির্ভর করা যায় না বলেই মনে হল। ওরা নিজেরাই বলেছে, এখানে সময় জিনিসটা তেমন বড় জিনিস নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আবার চুপচাপ হাঁটতে থাকলাম। কিন্তু তখন আর গতিবেগ আগের মত প্রবল নয়। মনে হচ্ছে এতক্ষণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছে।

"এই বনে বিষাক্ত সাপটাপ নেই", উদ্বেগের কথা জিজ্ঞেস করে দেখলাম।

"বিষাক্ত সাপ", লম্বা, চশমা পরা সৈনিক পেছনদিকে না ফিরেই বলল। এ সাধারণত সামনের দিকে তাকিয়েই কথা বলে। মনে হয় যেন যে কোনও সময় সামনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এসে লাফিয়ে পড়তে পারে, "সেই নিয়ে কখনো ভাবিনি যে!"

"আছে সম্ভবত", বলিষ্ঠজন পিছনদিকে ফিরে বলে, "দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, সম্ভবত আছে। কিন্তু থাকলেও, আমাদের ভাবার কিছু নেই—"

"আমরা যেটা বলতে চাইছি, সেটা হল", লম্বাজন খানিকটা হালকা চালে বলে, "তোমার কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছা এই বনের নেই।"

"সুতরাং সাপখোপ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই", বলিষ্ঠ সৈনিক বলে দেয়, "কী, স্বস্তি হল তো?"

"হ্যাঁ, আমি বলি।

"বিষাক্ত সাপ, বিষাক্ত মাকড়সা, বিষাক্ত পোকা, বিষাক্ত মাশরুম, কোনওরকম অপরপক্ষ এখানে তোমার ক্ষতি করবে না", লম্বা সৈনিক যথারীতি সামনের দিকে মুখ করে বলল।

"অপরপক্ষ", আমি ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, হয়তো ক্লান্তির কারণেই, কথাটা মাথায় ঠিক কোনও ছবি তৈরি করল না।

"অপর কেউ, অন্য যা কিছু", সে বলে, "কোনওরকম অন্য কেউই এখানে তোমার ক্ষতি করবে না। যেহেতু এই জায়গাটাই বনের সবচেয়ে ভেতরের অংশ। কেউই, সম্ভবত তুমিও নিজেও, তোমার কোনও ক্ষতি করবে না।"

আমি ওর এই কথাগুলো বুঝে ওঠার চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু শ্রান্তি, ঘাম, উপর্যুপরি পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমির সম্মোহনী প্রভাব,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটার ওপর আরেকটা চেপে চিন্তাশক্তি খুবই হ্রাস পেয়ে গেছে। সুস্থিরমত কিছু ভাবতে পারছিলাম না।

"যখন সৈন্য ছিলাম, বেয়নেট অপরপক্ষের পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া প্র্যাকটিস করানো হয়েছিল", বলিষ্ঠ সৈনিক বলে, "তুমি কি জান, বেয়নেট কী করে ঢোকাতে হয়?"

"না", আমি বলি।

"প্রথমে বেয়নেটটা অপরপক্ষের পেটে আমূল ঢুকিয়ে দিয়ে, ঐ অবস্থায় ওটা পাশে ঘোরাতে হয়। এতে শত্রুর নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এটা করলে শত্রু ঐ অবস্থায় কষ্ট পেয়ে মারা যায়। মৃত্যু হতে সময় লাগে এবং যন্ত্রণা পায় ভয়ানক। কিন্তু শুধু ঢুকিয়ে দিয়ে, সঙ্গে যদি ঘোরানো না হয়, শত্রু তক্ষুণি উঠে এসে, এবার উলটে তোমার নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এরকম একটা জগতের মধ্যে আমাদের রাখা হয়েছিল।"

নাড়িভুড়ি, আমি ভাবতে থাকি। ওশিমা শিখিয়েছিল যে ওটা হচ্ছে গোলকধাঁধার মেটাফর। আমার মাথার ভেতর নানাকিছু জড়িয়ে মড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছে। কোনটা যে কী, আর কোনটা যে কী নয়, জট ছাড়িয়ে ঠিকমত আলাদা করতে পারছি না।

"কেন মানুষকে মানুষের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হতে হয়, তা কি তোমার জানা আছে", লম্বা সৈনিক বলে।

"জানি না", আমি জানাই।

"আমিও ঠিক জানি না", লম্বা চেহারার সৈনিক বলে, "অপরপক্ষ চিনের সৈন্য হোক, রাশিয়ার সৈন্য হোক, আমেরিকার সৈন্য হোক, তা বলে একেবারে নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া, এটা ভাবতে পারছিলাম না। তবে কিনা, আমরা তো ওরকমই একটা পৃথিবীতে বাস করছিলাম। তাই আমরা পালিয়ে এসেছি। ভুল বুঝলে কিন্তু খুব মুশকিল, আমরা মোটেই দুর্বল মানুষ নই। বরং সৈনিক হিসেবে খুবই ভাল বলেই মনে করি। নেহাতই ওরকম হিংসাপরায়ণতায় সামিল হওয়াটা সহ্য হয়নি মাত্র। তুমিও বিশেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুর্বল মানুষ নও, তাই না?"

"নিজে ভাল বুঝতে পারি না", আমি অকপটে বলি, কিন্তু এযাবৎ সবসময়ই চেয়ে এসেছি আরেকটু শক্তিশালী হয়ে উঠতে।"

"সেটা খুব বড় ব্যাপার", বলিষ্ঠ সৈনিক আমার দিকে ঘুরে বলল, "খুবই বড় ব্যাপার। শক্তিশালী হয়ে ওঠার সংকল্প নিয়ে চেষ্টা করে যাওয়াটা।"

"তুমি যে শক্তিশালী সেটা না বললেও বেশ বোঝা যায়", লম্বাজন বলল, "এই বয়েসে, একেবারে এতটা অবধি আসতে পারার কথা নয়!"

"বেশ শক্তপোক্ত", বলিষ্ঠজন তারিফের সুরে বলে।

জায়গাটায় এসে দু'জনে শেষ পর্যন্ত থামল। দীর্ঘদেহী সৈনিক চশমাটা খুলে নাকের দু'পাশ আঙুল দিয়ে ক'বার জোরে জোরে ঘষে নিয়ে, তারপর আবার চশমাটা পরে ফেলল। ওদের দু'জনের হাঁফও ধরেনি, ওরা ঘেমেও যায়নি।

"গলা শুকিয়ে গেছে", দীর্ঘদেহী সৈনিক আমাকে জিজ্ঞেস করে।

"একটু", আমি বললাম। সত্যি কথা বলতে কী, ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল। ডে-প্যাকটা যেহেতু ফেলে দিয়ে এসেছি—ওটার মধ্যে জলের বোতল ছিল। ও কোমরের সঙ্গে বাঁধা অ্যালুমিনিয়ামের ফ্লাস্কটা নিয়ে আমাকে দিল। সেই ইষৎ গরম জল আমি ক'ঢোক খেলাম। জলটা শরীরের আনাচে কানাচে সর্বত্র খানিক আর্দ্রতা এনে দিল। ফ্লাস্কের মুখটা বন্ধ করে ওটা ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, "ধন্যবাদ"। নীরবে মাথা সামনে ঝোঁকাল সেই দীর্ঘদেহী সৈনিক।

"এটা পর্বতশিরা", বলিষ্ঠ সৈনিক জানায়।

"না থেমে টানা নেমে যাব, দেখো পড়ে যেও না যেন", দীর্ঘদেহী সৈনিক বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা দুর্গম ঢালু রাস্তা ধরে গভীর সাবধানতা সহকারে নামতে শুরু করলাম।

খাড়াই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া দীর্ঘ রাস্তার অর্দ্ধেক নেমে, অনেকটা বেঁকে বন থেকে বেরুতে যাব, আমাদের চোখের সামনে হঠাৎই দেখা দিল সেই জগতটা।

সৈনিক দু'জন হাঁটা থামিয়ে পেছনে ঘুরে আমার মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলছিল না। কিন্তু ওদের চোখ নীরবে আমাকে কিছু বলল—'এটাই সেই জায়গা, তুমি এখানে এসে গেছ'। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ে, জগতটাকে দেখতে থাকলাম। ভূতলের প্রাকৃতিক আকৃতিটাকে সুন্দর করে কাজে লাগিয়ে, প্রশস্ত করে তৈরি করে নেওয়া একটা সমতল বেসিন। ওখানে লোকজন কীরকম সংখ্যায় বাস করে, আমার জানা নেই। তবে দেখে যা মনে হচ্ছিল, তাতে সেই সংখ্যাটা যে খুব বেশি নয়, তা নিশ্চিত। কয়েকটা রাস্তা আছে, রাস্তার ধার দিয়ে কিছু কিছু করে সার দিয়ে বাড়ি। ছোট ছোট রাস্তায় ছোট ছোট বাড়ি। রাস্তায় মানুষের ছায়াটিরও দেখা নেই। বাড়িগুলো কেমন অভিব্যক্তিহীন, বহিরঙ্গের সৌন্দর্যের চেয়েও ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতেই তৈরি হয়েছে বলে দেখে মনে হচ্ছে। 'শহর' বলার মত বড় কিছু নয়। দোকান নেই, বড় কোনও পৌর ব্যবস্থাও নেই। কোনও সাইনবোর্ড নেই, ছোট করে বিজ্ঞপ্তিও নেই। কেবল, কী মনে করে যেন, একই সাইজের, একই আকৃতির সাধারণ বাড়িঘর দিয়ে একটা বসতি তৈরি হয়েছে। কোনও বাড়িতেই বাগান নেই, রাস্তায় একটাও গাছপালা চোখে পড়ে না। যেন, চারপাশের বনেই তো কত আছে!

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। বাতাস বনের ভেতর দিয়ে এসে আমার চারপাশে এখানে ওখানে গাছের পাতা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সেই অনির্দিষ্ট ঝিরঝির আওয়াজ আমার মনের ওপরে যেন বালুতে বাতাসের তৈরি নকশার মত কিছু রেখে যাচ্ছে। আমি একটা গাছের গুঁড়িতে হাত ছুঁইয়ে চোখ বন্ধ করলাম। সেই নকশায় সাংকেতিক কী যেন আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি এখনও সেটার অর্থোদ্ধার করে উঠতে পারছি না। একেবারেই অজানা কোনও বিদেশি ভাষার লিপির মত দেখাচ্ছে আমার কাছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ খুলে, সেই নতুন জগতকে পুনর্বার দেখলাম। সেই ঢালের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, সৈনিকদের সঙ্গে একসঙ্গে জায়গাটার দিকে শান্তভাবে তাকালাম, এবার যেন সেই নকশাটা অনেকটা দূরে সরে গেছে বলে বোধ হল। আর তারসঙ্গেই সেই সংকেতগুলোও পুনর্বিন্যস্ত হয়ে মেটাফর বদলে গেল। আমি আমার নিজেরই থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়ে, ভেসে যাচ্ছি এরকম একটা অনুভূতি হল। আমি প্রজাপতি হয়ে পৃথিবীর কানা দিয়ে পতপত করে উড়ছি। কানার ওধারটায় একটা পরিসর যেখানে শূন্যতা আর বস্তু, পরিষ্কার একটা আরেকটাতে সমাপতিত হয়ে একাকার হয়ে আছে। অতীত ও ভবিষ্যৎ দিয়ে সীমাহীন একটা লুপ তৈরি হয়ে আছে—নিরন্তর—অন্তহীন। এমন সব সংকেত ইতস্তত সঞ্চরমান যা কেউ পড়েনি, এমন সব সঙ্গীতের কর্ড, যা কেউ শোনেনি।

আমি নিঃশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে নিতে থাকি। আমার মনটা এখনও বিক্ষিপ্ত, ঠিক গুছিয়ে একত্র হয়নি। কিন্তু কোনও আশঙ্কা নেই।

সৈনিকেরা কোনও কথা না বলেই আবার হাঁটা শুরু করে দিল, আমিও চুপচাপ ওদের পিছনে পিছনে চললাম। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে, একসময় শহর এগিয়ে আসতে লাগল। একটা ছোট নদী রাস্তার ধার দিয়ে বয়ে চলেছে—পাথর দিয়ে বাঁধানো পার। কী সুন্দর জলের আওয়াজ কানে আসছে। সুন্দর স্বচ্ছ জল। এখানে সবকিছুই সহজ সাধারণ, সংহতভাবে রয়েছে। জায়গায় জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি, আর তাতে তার লাগানো আছে। দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ অ্যাদ্দূর অবধি পৌঁছেছে তাহলে। বিদ্যুৎ? বিদ্যুৎ কি এখানে থাকার কথা—আমার খটকা লাগে!

চারদিকে পর্বতশিরা দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটা। আকাশ এখনও পুরোটা ছাইরঙা মেঘে ঢাকা। আমি আর সেই সৈনিকেরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বটে, এতক্ষণের মধ্যে পাশ দিয়ে একটা লোকও গেল না। আশেপাশে শ্মশানের নিস্তব্ধতা, কোথাও কোনও শব্দ নেই। লোকজন হয়তো যার যার বাড়ির ভেতর রুদ্ধশ্বাসে, রাস্তা দিয়ে আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সৈনিকেরা আমাকে নিয়ে গেল একটা বাড়িতে। আয়তনে, আকৃতিতে ওশিমার সেই কেবিনের সঙ্গে এটার অদ্ভুত মিল। দেখে মনে হচ্ছে, যেন এদুটোর কোনও একটাকে মডেল করে অন্যটা বানানো হয়েছে। সামনেটায় পর্চ, সেখানে চেয়ার রাখা আছে। একতলা বাড়ি সবগুলো, ছাদ থেকে ফায়ারপ্লেসের চিমনি বেরিয়ে আছে। ওশিমার কেবিনের সঙ্গে ফারাক হচ্ছে, বেডরুমগুলো লিভিংরুমের থেকে কিছু তফাতে, মাঝখানে বাথরুম, আর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়। রান্নাঘরে বিদ্যুচ্চালিত রেফ্রিজারেটার আছে। অনতিবৃহৎ, পুরনো মডেলের ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটার। সীলিং থেকে বৈদ্যুতিক বাতিও নেমে এসেছে। টিভিও আছে। টিভি?

শোয়ার ঘরে, কোনওরকম অঙ্গসজ্জাবিহীন সিংগল খাট একটা রাখা আছে। খাটে শোয়ার জন্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা আছে।

“সব কিছু ঠিকঠাক হওয়া অবধি, এখনকার মত এখানেই থাকা ঠিক হয়েছে”, বলিষ্ঠজন বলে, “খুব বেশিদিনের জন্য নয়—এখনকার মত।”

“আগেই বলেছি, এখানে সময় জিনিসটা তেমন একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না”, লম্বাজন বলে।

“একেবারেই বড় ব্যাপার নয়”, বলিষ্ঠজন মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে বলে।

ইলেকট্রিসিটি কোত্থেকে আসছে?

দু’জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

“একটা বাতাসচালিত জেনারেটার, ছোটই যদিও, বনের ভেতরের দিকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ওখানে সবসময় বাতাস বইতে থাকে”, লম্বাজন ব্যাখ্যা করে দেয়, “বিদ্যুৎ না থাকলে তো মুশকিল!”

“বিদ্যুৎ না থাকলে রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করা যাবে না, রেফ্রিজারেটার না থাকলে খাবারদাবার সংরক্ষণ করা যাবে না”, বলিষ্ঠজন বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"না থাকলে কোনোভাবে চালিয়ে নেওয়া যায় অবশ্য—", লম্বাজনের বক্তব্য, "থাকলে সুবিধে।"

"খিদে পেলে, ফ্রিজের মধ্যে যা আছে, যে কোনোটা খেতে পার। ভাল কিছু তেমন নেই যদিও", বলিষ্ঠজন বলে।

"এখানে মাংসও নেই, মাছও নেই, কফি, মদ এসব নেই", লম্বাজন জানিয়ে দেয়, "গোড়ার দিকে একটু খারাপ লাগবে হয়তো, শিগগিরিই অভ্যাস হয়ে যাবে।"

"ডিম, চীজ আর গরুর দুধ আছে", বলিষ্ঠ সৈনিক বলে, "এইজন্য যে প্রাণীজ প্রোটিনও তো কিছুটা প্রয়োজন—"

দীর্ঘদেহী বলে, "এসব এখানে তৈরি হয় না বলে পেতে গেলে অন্যত্র যেতে হয়। জিনিসের বদলে জিনিস, এভাবে আনতে হয় ওদের থেকে।"

"অন্যত্র"?

দীর্ঘদেহী সামনে মাথা ঝোঁকায়, "হ্যাঁ, অন্যত্রই। এই জায়গাটা পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। অন্য জায়গাও আছে। তুমিও একটু একটু করে অনেক কিছু জানতে পারবে।"

"সন্ধ্যে হলে কেউ একটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবে", বলিষ্ঠ সৈনিক বলে, "ততক্ষণ বোর লাগলে টিভি দেখা যেতে পারে।"

টিভিতে কোনও প্রোগ্রাম হচ্ছে নাকি?

"উমম্, কী যে হচ্ছে, সেটা ঠিক—", যেন একটু মুশকিলেই পড়েছে, এমনভাবে লম্বাজন বলে। তারপর মাথা নেড়ে, বলিষ্ঠ সৈনিকের দিকে তাকায়।

বলিষ্ঠ সৈনিকও মাথা নাড়ে আর মুখটা বিপন্ন করে, "আসলে টিভির ব্যাপার খুব একটা জানি না। দেখিনি তো কখনও।"

"সদ্য আগত লোকেদের জন্য হয়তো কাজে লাগতে পারে ভেবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওটা রাখা আছে আর কি", লম্বাজন জানায়।

"কিন্তু কিছু তো একটা দেখানোরই কথা সম্ভবত", বলিষ্ঠজন বলে।

"এখনকার মত এখানে খানিক বিশ্রাম নাও", লম্বাজন আমাকে বলে, "আমাদের আবার নিজেদের জায়গায় ফিরতে হবে।"

সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন বলে ধন্যবাদ।

"না না, এ তো সহজ কাজ", বলিষ্ঠজন বলে, "অন্যদের তুলনায় তোমার পা অনেক বেশি মজবুত। ঠিকমত সঙ্গে নিয়ে আসা যায় না এরকম বহু লোক আছে। এরকমও হয়েছে যে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। তোমার ক্ষেত্রে অনেক সহজ ছিল।"

"তুমি দেখা করতে চাও এরকম একজন এখানে আছে বলে বলছিলে যেন", দীর্ঘদেহী সৈনিক বলে।

"হ্যাঁ!"

"মনে হয় এরমধ্যেই কখনও দেখা হয়ে যাবে", দীর্ঘদেহী বলে, আর বারকতক মাথা সামনে ঝোঁকায়, "এই জায়গাটা যেহেতু ছোটই—"

"তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে গেলেই ভাল", বলিষ্ঠ সৈনিক বলে।

"একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, তারপর খুব ভাল লাগবে", লম্বা সৈনিক বলে।

"ধন্যবাদ।"

দু'জনে ঠিকমত ভঙ্গীতে দু'পা জড়ো করে দাঁড়িয়ে স্যাল্যুট করে। তারপর পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে, বাইরে বেরিয়ে যায়। আর দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তা দিয়ে হেঁটে, নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়। দিনরাত ওরা ওই প্রবেশপথের মুখটা পাহারা দেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের ভেতরটায় উঁকি দিলাম। ভেতরে অনেক টোম্যাটো আর চীজ জড়ো করে রাখা আছে। ডিমও আছে। চিনেমাটির বড় বোতলে দুধ রয়েছে। মাখনও আছে। তাকে পাঁউরুটি রাখা আছে, একটা দিক একটু ছিঁড়ে খেয়ে দেখলাম। একটু শক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু স্বাদ খারাপ নয়।

রান্নাঘরে সিংক আছে, জলের ট্যাপও আছে। কল ঘোরাতেই জল বেরোল। পরিষ্কার ঠান্ডা জল। বিদ্যুৎ আছে, তাই হয়তো কুয়োঁ খুঁড়ে মোটরচালিত পাম্প দিয়ে জল তোলা হয়। কাপে নিয়ে খেয়ে দেখলাম।

জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটায় তাকালাম। আকাশ একইরকমভাবে ধূসর মেঘে আচ্ছন্ন, বৃষ্টিপাতের কোনও আভাস নেই। জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু যথারীতি মানুষজন চোখে পড়ল না। শহর যেন একেবারে মৃত বলে বোধ হল। নতুবা লোকেরা কোনও কারণে আমার চোখে পড়ে যাওয়াটা এড়িয়ে চলছে হয়তো।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে চেয়ারে বসলাম। সোজা হয়ে বসার মত শক্ত কাঠের চেয়ার। চেয়ার মোট তিনটে। মুখোমুখি একটা ডাইনিং টেবল। বর্গক্ষেত্রাকৃতি সেই টেবিলে কয়েকবারই বার্নিশের প্রলেপ পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। চারদিকের প্লাস্টার করা দেওয়ালে কোনও ছবি কিংবা ফোটো কিংবা ক্যালেন্ডার টাঙানো নেই। নেহাতই সাদা দেওয়াল। সীলিং থেকে একটা বাল্‌ব ঝুলছে। বাল্‌বের সঙ্গে একটা খুব সাদামাটা কাচের শেড লাগানো আছে। শেডটা উত্তাপে উত্তাপে হলদে হয়ে গেছে।

ঘরটা পরিচ্ছন্নভাবে ঝাড়পোঁছ করা। কি টেবলের ওপরে, কি জানালার ফ্রেমে, এতটুকু ধুলো জমেনি, আমি আঙুল বুলিয়ে দেখে নিলাম। জানালার কাচ কোথাও এতটুকু ঝাপসা হয়ে নেই। ডেকচি, বাসনপত্র, রান্নার সরঞ্জাম, কোনওটাই নতুন নয়, কিন্তু ঠিকমত কাজের উপযোগী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়, সেটা বোঝা যায়। রান্নাঘরের টেবিলের একধারে পুরনো ধাঁচের দু'টো ইলেকট্রিক ওভেন রাখা আছে। পরখ করতে আমি সুইচ অন করে দেখলাম। তক্ষুণি কয়েলটা লাল হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টেবিল আর চেয়ার বাদ দিলে, ঘরের একমাত্র আসবাব হচ্ছে কাঠের ফ্রেম লাগানো বড় একটা পুরনো ধরণের কালার-টিভি। তৈরি হওয়ার পরে পনের কি কুড়ি বছর কেটে গেছে। সঙ্গে কোনও রিমোট-কন্ট্রোল নেই। ফেলে দেওয়া জিনিস কোত্থেকে যেন তুলে নিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে (কেবিনের যেসব ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, সবই অতিরিক্ত হয়ে যাওয়া জিনিস ফেলে দেওয়ার জায়গা থেকে নিয়ে আসা বলে মনে হয়। অপরিষ্কার নয়, কাজ চলে যাওয়ার মত, সবই রঙ জ্বলে যাওয়া পুরোন আমলের)। সুইচ অন করতেই দেখি, টিভিতে পুরনো সিনেমা দেখাচ্ছে। *সাউন্ড অব মিউজিক*। প্রাইমারি স্কুলে পড়তে স্কুলের টিচারের সঙ্গে গিয়ে সিনেমা হলের বড় স্ক্রীনে দেখেছিলাম। ছোটবেলায় দেখা অল্পই কয়েকটা সিনেমাগুলোর একটা (সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়ার মত বড় কেউ আশেপাশে ছিল না যেহেতু)। কঠোর নিয়মতান্ত্রিক বাবা ক্যাপ্টেন ফন ট্র্যাপ ভিয়েনায় গেছেন, এই অবসরে গভার্নেস মারিয়া বাচ্চাদের পিকনিকে নিয়ে গেছে পাহাড়ে। সেখানে ঘাসের ওপর বসে গিটার বাজিয়ে কয়েকটা নির্দোষ গান গাইল। খুব বিখ্যাত সীন এটা। টেলিভিশনের সামনে বসে, আকৃষ্ট হয়ে সিনেমাটা দেখলাম। আমার ছেলেবেলায় মারিয়ার মত কেউ যদি পাশে থাকত, আমার জীবনটা অনেকটাই অন্যরকম হয়ে যেত হয়ত (সিনেমাটা প্রথমবার দেখার সময়ও এটা মনে হয়েছিল)। তবে বলাই বাহুল্য, আমার জীবনে ওরকম কেউ আবির্ভূতা হননি।

আকস্মিকই বাস্তবে ফিরে এলাম এরপরে। আমাকে কেন এখন এরকম একটা জায়গায় মনোযোগ দিয়ে *সাউন্ড অব মিউজিক* দেখতে হচ্ছে? প্রথমত *সাউন্ড অব মিউজিক*-ই কেন? এখানকার লোকেরা স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা ব্যবহার করে, কোন জায়গা থেকে সম্প্রচারিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরতে পারছে হয়ত। কিংবা হয়ত অন্য কোনও জায়গায় ভিডিও-টেপ ধরণের কিছু চালাচ্ছে। টেপই হবে বলে আমার মনে হয়। কারণ চ্যানেল পালটেও দেখলাম, *সাউন্ড অব মিউজিক* ছাড়া অন্য কিছু হচ্ছে না। একটা ছাড়া সব চ্যানেলেই নেহাতই স্যান্ড-স্টর্ম দেখা যাচ্ছে। সেই ঝিরঝিরে, একেবারে সাদা ছবি আর অজৈব কোলাহল, আমাকে আক্ষরিক অর্থেই জোরালো বালুর ঝড়ের কথা মনে করাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যেখানে 'এডেলভাইস' গাইছে, সেখানে আমি টিভিটা সুইচ অফ্ করে দিলাম। আগের মত শান্ত ভাবটা ঘরে ফিরে এল। তেষ্টা পেয়েছিল বলে রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের ভেতর থেকে বড় বোতলে রাখা দুধ বের করে খেলাম। ঘন টাটকা দুধ। কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে কিনে যে দুধ খাই, তার থেকে অনেকটাই তফাৎ। সেই দুধ পরপর কয়েক গ্লাস খেতে খেতে হঠাৎ করেই ফ্রঁসোয়া ক্রুফোর সিনেমা *বড়রা ধরতে পারে না*[†]-র কথা মনে পড়ল। সিনেমায় আঁতোয়ান বলে ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে খিদে পেয়েছিল বলে, খুব ভোরে কোনও একটা বাড়িরই সামনে সদ্য ডেলিভারি দেওয়া দুধ চুরি করে, ত্রস্তপদে হেঁটে পালাতে পালাতে খাওয়ার সীন ছিল। বড় বোতল একটা, পুরোটা খেয়ে ফেলতে বেশ সময় লাগল। খুবই দুঃখের, বেদনাদায়ক দৃশ্য একটা। কিছু একটা খাওয়া যে এতটা কষ্টের ব্যাপার হতে পারে, বিশ্বাস করা যায় না। ওটাও ছোটবেলায় দেখা অল্পই কয়েকটা সিনেমার মধ্যে একটা। প্রাইমারিতে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়, নামটা দেখে আকৃষ্ট হয়ে একাই সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলাম। ট্রেনে চেপে ইকেবুকুরো অবধি গিয়ে, সিনেমা দেখে, আবার ট্রেনে চেপে ফিরে এসেছিলাম। সিনেমা হল থেকে বেরিয়েই অমনি দুধ কিনে খেয়েছিলাম। না খেয়ে থাকতে পারিনি।

দুধ খাওয়া শেষ হতে টের পেলাম যে ভয়ানক ঘুম পেয়েছে। মুড অফ্ করে দেওয়া প্রবল ঘুম। চিন্তার গতি ক্রমে ধীর হয়ে এসে, ট্রেন যেভাবে স্টেশনে এসে দাঁড়ায় সেভাবে থেমে গিয়ে, অল্পসময়ের মধ্যেই চিন্তা করার ক্ষমতাটা পুরোপুরি চলে গেল। শরীরটা একেবারে ভেতর থেকে দ্রুত জমে যাচ্ছে যেন। আমি শোওয়ার ঘরে গিয়ে, অগোছালোভাবে ট্রাউজার আর জুতো খুলে খাটে শুয়ে পড়লাম। বালিশে মুখ গুঁজে, চোখ বন্ধ করলাম। বালিশে সূর্যালোকের গন্ধ। হারিয়ে যাওয়া প্রিয় গন্ধ। শান্ত হয়ে তাতে শ্বাস নিয়ে, শ্বাস ছাড়লাম। মুহূর্তে ঘুম এসে গেল।

চোখ যখন খুললাম, চারপাশ ঘন অন্ধকার। চোখ খুলে, অচেনা অন্ধকারের মধ্যে, ভাবতে থাকলাম আমি এখন কোথায় সেই

[†]দ্য ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিয়ে। দু'জন সৈনিক বনের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছে, এসে হাজির হয়েছি একটা ছোট শহরে যাতে নদী আছে। একটু একটু করে মনে পড়তে থাকল। দৃশ্যগুলো একত্রিত হয়ে জুড়ে যেতে থাকল। আগে শুনেছি এরকম একটা সুর কানে বাজতে লাগল। এডেলভাইস। রান্নাঘরের দিকে সসপ্যানের ঠুংঠাং গেরস্থালির মৃদু আওয়াজ। শোওয়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো ঢুকে এসে মেঝেতে হলুদ রঙের সরলরেখা টেনেছে। অতিপরিচিত গুঁড়োগুঁড়ো আলো।

খাট থেকে উঠতে গেলাম, শরীরে সুপ্তি রয়ে গেছে। সারা শরীরেই। জোরে শ্বাস নিয়ে সীলিং-এর দিকে তাকালাম। বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকির আওয়াজ হল। কেউ একটা মেঝের ওপরে ব্যস্ত হয়ে এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে সেই শব্দ পেলাম। সম্ভবত আমার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। শেষ অবধি খাট থেকে নেমে মেঝেয় দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে ট্রাউজারটা পরে, মোজা, জুতো পরে নিলাম। নিঃশব্দে ডোর-নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুললাম।

রান্নাঘরে একটা মেয়ে রান্না করছে। আমার দিকে পেছন ফিরে সসপ্যানের ওপর ঝুঁকে পরে, চামচ দিয়ে চেখে দেখছে। আমি দরজাটা খুলতেই মুখ তুলে, আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কোওমুরা পাঠাগারে রোজ রাতে আমার ঘরে এসে, দেওয়ালের ছবিটা দেখত যে মেয়েটা, সে! হ্যাঁ, পনের বছর বয়েসের সময়ের সাএকি-সান। সেই সময়ে যে পোশাক পরা ছিল, সেটাই পরে আছে। হালকা নীল রঙের লম্বা ঝুলের ওয়ানপিস। তফাৎ বলতে চুলের কাঁটা দিয়ে চুল বেঁধেছে। আমার মুখটা দেখে, মেয়েটা আন্তরিক ভাবে স্মিত হাসল। চারপাশের জগতটা একেবারে যেন এলোমেলো হয়ে যাওয়ার মত করে জোরে দুলছে বলে মনে হল। সবকিছুর আকৃতি যেন খন্ড খন্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর আবার নতুন করে আকৃতি ফিরে পেতে থাকল। অথচ মেয়েটা মায়াও নয়, ভুতও নয়। সত্যিকারের রক্তমাংসের একটা মেয়ে, ছুঁয়েও দেখা যায়। সন্ধ্যের সময় বাস্তবেই রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে, আমার জন্য বাস্তবেই খাবার তৈরি করছে। বুকে অল্প একটু স্ফীতি এসেছে, ঘাড়ের পেছনটা সদ্যনির্মিত চিনেমাটির মতই সাদা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"উঠে পড়েছো", ও বলে।

আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। এখনও আমি নিজেকে সবে খানিকটা করে গুছিয়ে তুলছি।

"মনে হচ্ছে, গভীর ঘুম ঘুমিয়েছ অনেকক্ষণ", ও বলে, তারপর আবার পেছন ফিরে চাখার কাজটা চালিয়ে যায়, "ভেবেছিলাম, ঘুম থেকে যদি না ওঠ, কেবল খাবারটা রেখে চলে যাব।"

"এতটা গভীরভাবে যে ঘুমোব, সেটা ভাবিনি", অবশেষে গলার স্বর ফিরে আসে আমার।

"এসেছ তো বনের ভেতর দিয়ে", ও বলে, "খিদে পায়নি?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, পেয়েছে হয়তো!"

ওকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল। সত্যিই ছুঁয়ে দেখা যায় কিনা শুধু সেটুকু যাচাই করে দেখতে। কিন্তু তা করা যাবে না। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে, ওকে স্থির দৃষ্টিতে দেখতে থাকলাম। ওর শরীরের নড়াচড়ায় যেটুকু শব্দ হচ্ছিল কান পেতে শুনলাম।

মেয়েটা সসপ্যানে গরম করা স্টু সাধারণ একটা প্লেটে ঢেলে টেবিলে নিয়ে এল। একটা কানা উঁচু পাত্রে টোম্যাটো আর গ্রীন স্যালাড তার সঙ্গে। আর বড় একটা পাউঁরুটি। স্টুতে আলু আর গাজর রয়েছে। অনেকদিন আগের একটা প্রিয় গন্ধ পেলাম। ফুসফুসে সেই গন্ধটা টেনে নিতেই খুব যে খিদে পেয়েছে সেটা টের পেলাম। কিছু একটা দিয়ে পেটটা ভরাতে হবে। পুরনো ক্ষতবিক্ষত কাঁটাচামচ আর চামচ দিয়ে আমি যতক্ষণ খাচ্ছি, একটু দূরে একটা চেয়ার এনে রেখে তাতে বসে ও আমার খাওয়া দেখতে থাকল। ঠিক যেন এটাও কাজের একটা জরুরি অংশ, এরকম সিরিয়াস মুখ করে। আর মাঝে মাঝে চুলটা হাত দিয়ে সামলাচ্ছিল।

"শুনলাম তোমার পনের বছর বয়েস", জানতে চাইল।

"হুঁ", রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে আমি বললাম, "সবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরমধ্যে পনের হয়েছে।”

“আমারও পনের বছর বয়েস”, ও বলে।

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই। জানি তো, আরেকটু হলেই যেন বলে ফেলছিলাম। কিন্তু এখনই একথা মুখে বলার সময় আসে নি। আমি চুপচাপ খেতে থাকলাম।

“এখন কিছুদিন আমিই এখানকার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করব”, মেয়েটা বলে, “ঘর ঝাড়পোছ, কাচাকাচিও করব। শোওয়ার ঘরে দেরাজের মধ্যে জামাকাপড় রাখা আছে, খুশিমত ব্যবহার করতে দ্বিধা কোরো না। কাচাকাচির জিনিস বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলে, আমি করে রাখব।”

“কেউ তোমাকে এসব কাজের ভার দিয়েছে?”

ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কোনও উত্তর দেয় না। আমার প্রশ্নটা যেন সার্কিট ভুল করেছে, এইভাবে একটা নামহীন পরিসর ওটাকে গিলে ফেলে। প্রশ্নটা ওইভাবেই মিলিয়ে যায়।

“তোমার নামটা”, আমি এবার অন্য প্রশ্ন করি।

ও অল্প করে মাথা নাড়ে, “নাম নেই। এখানে আমাদের নাম হয় না।”

“কিন্তু নাম না থাকলে তো, তোমাকে ডাকতে চাইলে ঝঞ্ঝাট হবে হয়ত—”

“ডাকার দরকারও তো নেই”, ও বলে, “প্রয়োজন পড়লে, তখন সেখানে আমাকে পাওয়া যাবে।”

“এখানে আমারও তো তাহলে নামের দরকার নেই হয়ত—”

ও সামনে মাথা ঝোঁকায়, “যেহেতু তুমি তো তুমিই, অন্য কেউ তো নও। তুমি নিশ্চয়ই তুমিই?”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“সেরকমই তো মনে হয়”, আমি বলি, কিন্তু তেমন ভরসাও নেই। আমি সত্যিই আমিই তো?”

ও একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

“লাইব্রেরির কথা মনে আছে,” হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি।

“লাইব্রেরি”, ও মাথা নাড়ে, “না, মনে নেই তো। লাইব্রেরি এখান থেকে অনেক দূরে। অনেকটা দূরত্ব এখান থেকে। কিন্তু এখানে নেই।”

“লাইব্রেরি আছে?”

“হ্যাঁ। কিন্তু সেই লাইব্রেরিতে বই রাখা নেই।”

“লাইব্রেরিতে বই নেই তো কী আছে?”

জবাব দিল না। কেবল ঘাড়টা একটু হেলিয়ে রইল। এই প্রশ্নটাও আবার সেই ভুল সার্কিটে চলে গেল।

“তুমি ওখানে গেছ কখনও?”

“অনেক অনেক আগে”, ও বলে।

“কিন্তু বই পড়ার জন্য নয়—”

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দেয় ও, “যেহেতু ওখানে বই নেই।”

এরপর খানিকক্ষণ আমি চুপচাপ খেতে থাকি। স্টু খেলাম, স্যালাড খেলাম, রুটিটা খেলাম। মেয়েটাও কোনও কথা না বলে, যথারীতি আমার খাওয়াটা সিরিয়াস চোখে দেখে গেল।

“খাবার কেমন হয়েছে”, আমি সবটা খেয়ে নেওয়ার পর ও আমাকে জিজ্ঞেস করল।

“ভালো হয়েছে”, [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"মাছ, মাংস ছাড়াই?"

আমি ফাঁকা হয়ে যাওয়া প্লেটের দিকে নির্দেশ করলাম, "দ্যাখো না, কিছুই তো পড়ে নেই!"

"আমি বানিয়েছি।"

"খেতে খুব ভাল লাগল", আমি আবারও বলি, আর কথাটা তো সত্যি।

মেয়েটার সামনে, হিমায়িত একটা ছুরির ফলা যেন কেউ বুকে বসিয়ে দিয়েছে এমন বেদনার অনুভূতি হয়। প্রবল বেদনা হলেও, আমি উলটে সেই ব্যথায় কৃতার্থ বোধ করি। সেই হিমায়িত বেদনার সঙ্গে আমি যে নিজের অস্তিত্বকে যুক্ত করতে পারছি। সেই বেদনা যেন একটা কাছির মত মোটা দড়ি হয়ে আমাকে এখানে বেঁধে রাখছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে, জল ফুটিয়ে গরম সবুজ চা বানাল মেয়েটা। আর আমি যতক্ষণ টেবিলে বসে সেই চা খাচ্ছি, ততক্ষণ এঁটো বাসনগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বেসিনের জলে ধুতে শুরু করল। আমি সেই দৃশ্য পিছন থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলাম। কিছু একটা বলব বলে ভাবলাম। কিন্তু মনে হল, ওর সামনে সমস্ত কথাই ততক্ষণে কথা হিসেবে তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। নচেৎ শব্দের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করে যে অর্থ, তা যেন উধাও হয়ে গেছে। আমি নিজের দু'হাতের দিকে চেয়ে থাকি। আর জানালার বাইরে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল অতসী গাছটার কথা ভাবি। আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে যে হিমায়িত ছুরির ফলা, সেটা ওখানে আছে।

"তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে তো", আমি জিজ্ঞেস করি।

"নিশ্চয়ই", মেয়েটা উত্তর দেয়। "আগেই বললাম তো, তোমার আমাকে প্রয়োজন পড়লেই, আমি সেখানে উপস্থিত।"

"কোথাও হঠাৎ করে চলে যাবে না তো?"

কোনও কথা না বলে, কেমন যেন অদ্ভুত চোখে ও আমার দিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাকাল। 'আমি এমনিতে কোথায় আর যাব' যেন বলতে চায়।

"তোমার সঙ্গে এর আগেও আমার দেখা হয়েছে", সাহস করে আমি বলি, "অন্য জায়গায়, অন্য লাইব্রেরিতে।"

"তুমি বলছ যখন", চুলে হাত দিয়ে চুলের কাঁটা জায়গামত আছে কিনা দেখে নিচ্ছিল। বলার মধ্যে তেমন একটা আবেগ নেই। যেন আমাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে এই প্রসঙ্গটাতে ওর তেমন উৎসাহ নেই।

"আর আমি সম্ভবত তোমার সঙ্গে আরেকবার দেখা করার জন্যই এখানে এসে হাজির হয়েছি। তুমি আর আরেকজন মহিলার সঙ্গে দেখা করার জন্য।"

ও মুখ তুলে তারপর সিরিয়াস মুখে মাথা সামনে ঝোঁকাল, "গভীর বন পেরিয়ে—"

"ঠিকই। তুমি আর সেই আরেকজন মহিলার সঙ্গে আমাকে যেভাবেই হোক দেখা করতেই হত।"

"আর আমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেল।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"বলেছি হয়ত", মেয়েটা আমাকে বলে, "তোমার দরকার পড়লেই আমাকে সেখানে পাবে।"

ধোয়ামোছার কাজ হয়ে গেলে, খাদ্যবস্তু যে পাত্রে করে এনেছিল সেটা জুকস-প্যাকের ভেতরে ভরে, কাঁধে ফেলল।

"আবার কাল সকালে", আমাকে বলল ও, "এখানে তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে গেলেই ভাল।"

আমি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে, ওর চেহারাটা অল্প এগিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখলাম চেয়ে চেয়ে। সেই কেবিনে এবার আমি একা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়ে গেলাম। বদ্ধ বৃত্তের ভেতরে রয়েছি আমি। সময় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। এখানে কারুর নাম নেই। আমি প্রয়োজন বোধ করলে, তবেই ও আসবে। এখানে ওর বয়েস পনের বছর। হয়ত অনাদিকাল ধরে। কিন্তু *আমি মানুষটা আদপে কেমন হয়ে পড়ব? আমিও কি যথারীতি এখানে* সেই পনের বছরেরই থেকে যাব নাকি? বয়েসও কি এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় নাকি?

মেয়েটার চেহারা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পরেও, আমি তখনও একা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকি। আকাশে চাঁদ, তারা কিছুই নেই। বাড়িগুলোর কয়েকটাতে আলো জ্বলছে। জানালা গলে সেই আলো বাইরে এসে পড়ছে। এঘরের আলোর মতই চেনা হলুদ আলো। কিন্তু যথারীতি মানুষের দেখা নেই। শুধু ল্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছে। বাইরে ঘন অন্ধকার ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। আর তার ভেতরে, অন্ধকার না বলে বলা উচিত ঘন কালো পর্বতশিরা মাথা তুলে রয়েছে, গভীর অরণ্য দেওয়ালের মত যে এই শহরকে ঘিরে রেখেছে সে তো আমার জানাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৬

নাকাতা যে মারা গেছে সেটা বোঝার পর থেকে, তরুণ হোশিনো সেই বাড়ির ঘরটা থেকে কোথাও যেতে পারছিল না। 'প্রবেশপথের পাথর'টা ওখানে রয়েছে, কখন, কোন পরিস্থিতিতে কী ঘটে যায় বুঝতে পারছে না, সেই 'কিছু একটা' ঘটে গেলে, পাথরটার কাছে থেকে, বিনা বিলম্বে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার হবে। সেটা ওর ওপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। নাকাতার দায়িত্ব সরাসরি ওর ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে। নাকাতার মৃতদেহ যে ঘরে শায়িত রয়েছে, সেই ঘরের এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রার সেটিংটা ও সবচেয়ে নিচে নামিয়ে, বাতাস আসার পরিমাণটা সর্বোচ্চ করে দিয়ে, জানালাটা যে ঠিকমত বন্ধ আছে সেটা নিশ্চিত করল।

"এই যে, কাকু, খুব বেশি শীত না করলেই ভাল", নাকাতার দিকে ফিরে তরুণ বলে ওঠে। নাকাতা অবশ্য সে ব্যাপারে কোনও মতামত দিল না। ঘরে ভেসে বেড়ান বাতাসে যে বিশেষ ভারি ভাবটা, সেটা যে অনেকটা সময় ধরে মৃতের শরীর থেকে একটু একটু করে নির্গত হয়েছে তাতে কোনও ভুল নেই।

লিভিংরুমের সোফায় বসে তরুণ, আর কিছু না করে কেবল বসে থেকে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছিল। মিউজিক শুনতেও ইচ্ছে করছিল না, বই পড়তেও ইচ্ছে করছিল না। সন্ধ্যে হয়ে আসায় ঘরের আনাচে কানাচে ক্রমেই আলো কমে আসছিল, তবু উঠে গিয়ে এমনকি আলোর সুইচটা অন করেও এল না। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে, একবার বসে পড়ার পর আর ঠিকমত উঠে দাঁড়াতে পারা যাচ্ছিল না। সময় ধীরে এসে, ধীরে চলে যাচ্ছিল। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল যেন ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে পিছিয়েও যাচ্ছে কি না কে জানে।

দাদু যখন মারা যান, তখনও ওর পরিস্থিতি অবশ্যই সঙ্গিন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এতটা যেন নয় বলেই ওর মনে হল। দাদুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেলায়, মৃত্যু এসেছিল দীর্ঘ রোগভোগের পর, ততদিনে বোঝাই গিয়েছিল যে মারা যাবেন। তাই যখন সত্যিই মারা গেলেন, মনটা তার জন্য কিছুটা তৈরিই ছিল। ধাপে ধাপে মানসিক প্রস্তুতি থাকা আর না থাকার মধ্যে একটা বড় ফারাক এখন দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু সেটুকুই শুধু নয় বলে ওর মনে হচ্ছে। নাকাতার মৃত্যু যেন তরুণকে কি একটা গভীর ভাবনার মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

সামান্য খিদে খিদে পাচ্ছে মনে হওয়ায়, রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের ভেতর থেকে ঠান্ডা ফ্রায়েড রাইস বের করে, মাইক্রোওয়েভে ঠান্ডাটা কাটিয়ে নিয়ে অর্দ্ধেকটা খেল। আর খেল ক্যান-বীয়ার, এক ক্যান। খাওয়া হয়ে গেলে, পাশের ঘরে নাকাতার অবস্থা দেখে আসতে গেল। মনে হল, যদি গিয়ে দেখে যে বেঁচে উঠেছে। কিন্তু নাকাতা যথারীতি আগের মতই মৃতাবস্থায়। ঘরটা রেফ্রিজারেটারের মত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এত ঠান্ডায় এমনকি আইসক্রীমও সহজে গলানো যাবে না।

মৃতের সঙ্গে একই ছাদের নীচে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সেই কারণেই কিনা, মনটা কিছুতেই এক জায়গায় স্থির থাকছিল না। এই নিয়ে আলাদা করে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলেই তরুণের মনে হল। খুব যে একটা খারাপ লাগছে এমনও নয়। নেহাতই, একজন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কাটানোর অভ্যেস নেই কিনা। সময়ের প্রবাহ জিনিসটা মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পৃথক রকম। শব্দের অনুরণনও আলাদা। সেইজন্যেই এরকম, কেমন যেন থিতু হতে পারছে না। কিন্তু কিছু করার নেই। কেননা, নাকাতা-সান এখন মৃতদের জগতে আছেন, আর আমি আছি জীবিতদের জগতে। ফারাক তো আছেই। সোফা থেকে নেমে, ও গিয়ে বসল পাথরটার পাশে। আর বেড়ালের গায়ে হাত বোলানোর মত করে গোল পাথরটার গায়ে হাতের তালু বোলাতে থাকল।

“ঠিক কী করা উচিত”, বলে ও পাথরটার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল, “নাকাতা-সানকে কোথাও একটা ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই, কিন্তু তোমার কিছু একটা গতি না করে সেটা করে উঠতে পারছি না। তাই একটু মুশকিলেই পড়েছি। হোশিনোর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এখন কী করা উচিত, জানা থাকলে, একটু বলে দেবে নাকি?"

কিন্তু কোনও জবাব নেই। এখনকার মত নেহাতই একটা পাথর। সেটা হোশিনোও বুঝতে পারল। যা-ই পরামর্শ করুক, জবাব পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। তবু তরুণ সেই পাথরটার পাশে বসে, পাথরটার গায়ে হাত বুলিয়ে চলল। কয়েকটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে, যুক্তি সাজিয়ে পীড়াপীড়ি করে দেখল। সমবেদনাও জাগানোর চেষ্টা করল। বুঝতেই পারছিল যে সবই নিষ্ফল চেষ্টা। কিন্তু এছাড়া আর কী করা যায়, বিশেষ ভেবে উঠতে পারল না। তাছাড়া, নাকাতা-সানও তো সর্বদা এই পাথরটার সঙ্গে এভাবেই কথা বলতেন।

"কিন্তু একটা পাথরের কাছে সমবেদনা ভিক্ষা করে আবেদন করাটাও তো, খুবই করুণ পরিণতি", তরুণের মনে হল, "যতই হোক, কথায়ই বলে,পাথরের মত নিষ্প্রাণ!"

টিভিতে নিউজ দেখবে ভেবে মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েও, সিদ্ধান্ত পালটে নিবৃত্ত হল। আবার ফের পাথরটার পাশে বসে পড়ল। হয়ত এখন নীরবে বলাটাই জরুরি, তরুণের মনে হল। কান পেতে, আমাকে কিছু একটার অপেক্ষায় থাকতে হবে। কিন্তু আমার তো আবার অপেক্ষা করাটা খুব একটা ভাল আসে না, পাথরের উদ্দেশ্যে তরুণ বলল। ভেবে দেখলে, সেই কবে থেকেই একেবারে ধারাবাহিকভাবে ধৈর্যের অভাবে ব্যর্থ হতাম। না ভেবেচিন্তে, কিছু একটা মাথায় এলেই ছটফট করে কিছু করে বসে, চিরটা কাল কেঁচিয়ে ফেলেছি। 'বসন্তের শুরুতে বেড়ালের মতই কিছুতেই মাথা ঠান্ডা করে থিতু হতে পারিস না তুই', দাদুও বলত। কিন্তু একমাত্র এখানে, থেবড়ে বসে কেবল অপেক্ষায় আছি। ধৈর্য ধর, হোশিনো-কুন, নিজেই নিজেকে আদেশ করে তরুণ।

একেবারে ম্যাক্সিমামে চালানো পাশের ঘরের এয়ারকন্ডিশনারের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ কানে আসছিল না। ঘড়িতে একসময় ন'টা বেজে, তারপর দশটা বাজল। তবু কিছুই ঘটল না। নেহাতই সময় বয়ে গিয়ে রাত আরো গভীর হল মাত্র। তরুণ নিজের ঘর থেকে কম্বল নিয়ে এসে, সোফায় শুয়ে পড়ে ওটা গায়ে দিল। এমনকি ঘুমোনোর সময়ও যতটা পারা যায় পাথরটার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি থাকাই ভাল বলে মনে হল। আলো নিভিয়ে দিয়ে, সোফার ওপর চোখ বুজল।

"এই যে, পাথর-কুন, আমি এবারে শুয়ে পড়লাম কিন্তু", পায়ের কাছে পাথরটাকে উদ্দেশ্য করে বলে রাখে, "আবার কাল সকালে কথাবার্তা বলা যাবে'খন। লম্বা একটা দিন গেল তো। হোশিনো-কুনেরও ঘুম পেয়েছে।"

লম্বা একটা দিনই তো, আবারও ভেবে দেখে ওর মনে হল। দীর্ঘ একটা দিন। একদিনের মধ্যে সত্যিই নানা কিছু ঘটে গেছে।

"এই যে, কাকু", তরুণ হোশিনো এবার পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "নাকাতা-সান। শুনছেন?"

উত্তর নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তরুণ চোখ বন্ধ করে। বালিশটা জায়গামত করে নিয়ে, ওই ভাবেই ঘুমিয়েও পড়ে। একবারও স্বপ্ন না দেখে, সকাল হওয়া পর্যন্ত চোখ না খুলে, ঘুমোল। পাশের ঘরে, নাকাতাও যথারীতি স্বপ্নটপ্ন না দেখে, পাথরের মতই শক্ত হয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রইল।

সকাল সাতটা হতেই চোখ খুলে, দেরি না করে ও গেল পাশের ঘরে নাকাতার অবস্থা দেখতে। এয়ারকন্ডিশনারটা একই ভাবে, শব্দ করতে করতে, ঠান্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে চালান করে যাচ্ছিল। সেই ঠান্ডার মধ্যে নাকাতা যথারীতি মৃতাবস্থাতেই রয়েছে। গতরাতে যেমন দেখেছিল তার চেয়েও যেন মৃত্যুর লক্ষণ আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। ত্বক অত্যন্ত ফ্যাকাসে, চোখ বোজার ধরণটাও কেমন যেন অপরিচিত লোকের মত। নাকাতা যে ঝট করে জেগে উঠে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে নিতে বলে উঠবে, "কিছু মনে কোরো না হোশিনো-কুন, নাকাতা একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাফ চাইছি এর জন্য। এর পরেরটুকুর ভার নাকাতাই নিয়ে নিচ্ছে। আর ভাবনার কিছু নেই", আর তারপর প্রবেশপথের পাথরটা নিয়ে যা করার ঠিকমত করবে, এরকমটা আর কিছুতেই ঘটার নয়। নাকাতা-সান পুরোপুরি মৃত, এবং এটা এমন একটা নিশ্চিত সত্য,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যার নড়চড় কেউ করাতে পারবে না।

তরুণ ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে, ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে কফি-মেকারে কফি তৈরি করে, দু'কাপ খেল। তারপর টোস্ট বানিয়ে নিয়ে, তাতে মাখন আর জ্যাম লাগিয়ে খেল। খাওয়া হয়ে গেলে রান্নাঘরের চেয়ারে বসে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কয়েকটা সিগারেট খেল। রাতের মধ্যেই মেঘেরা কোথাও প্রস্থান করে, জানালা দিয়ে বাইরে সরাসরি গ্রীষ্মের নীল আকাশ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। আগের মতই, সোফার পায়ার কাছে পাথরটা রয়েছে। পাথরটা গতকাল রাত থেকে ঘুমায়ওনি, চোখও মেলেনি, স্রেফ যেন গুঁড়ি মেরে স্থির হয়ে বসে রয়েছে। পরখ করে দেখতে ও ওটাকে তুলে দেখল। সহজেই তোলা গেল।

"এই যে", পাথরকে উদ্দেশ্য করে আন্তরিকভাবে বলে ওঠে তরুণ, "এই আমি, হোশিনো-কুন, চেনা লোক। মনে পড়ছে তো? আজও দিনটা তোমার সঙ্গেই কাটবে বলে মনে হচ্ছে।"

পাথর আগের মতই নীরব।

"আচ্ছা, ঠিক আছে। না মনে পড়লেও হবে। এখনও অনেক সময় আছে, নিজেদের মধ্যে ধীরেসুস্থেই হোক না হয়!"

ওখানেই বসে পড়ে, ডানহাত দিয়ে পাথরের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে, পাথরের সঙ্গে আদৌ কী ধরণের কথাবার্তা বলা যায় সেই ভাবনায় ফিরে গেল। এখন অবধি পাথরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অভিজ্ঞতা একবারও হয়নি বলে, উপযুক্ত প্রসঙ্গও সহজে ভেবে বের করে উঠতে পারছিল না। কিন্তু এত সকালে খুব একটা ভাবগম্ভীর, প্রথাগত কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা করার উপায় নেই বলেই ওর মনে হল। সারাদিনে অনেকটা সময় পড়ে আছে, যতক্ষণ না সেরকম কিছু বেরোয়, তৃপ্তি সহকারে কথা বলা যায় এমন কোনও প্রসঙ্গই ভাল হবে।

একটু ভেবে নিয়ে, মেয়েদের প্রসঙ্গেই কথাবার্তা বলবে বলে স্থির করল। এযাবৎ যে মেয়েদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ হয়েছে, তাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একেকজনকে নিয়েই বলবে বলে তরুণ ঠিক করল। যাদের নাম জানা আছে, শুধু তাদের ধরলে সংখ্যাটা তেমন কিছু নয়। তরুণ আঙুলে কর গুণে দেখে নেয়। ছ'জন। যাদের নাম জানা নেই তাদেরও যোগ করলে সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যাবে বটে, এবারকার মত সেটা বাদই রাখা যাক।

"পাথরের সঙ্গে, এযাবৎ যেসব মেয়েদের সঙ্গে শুয়েছি, তাদের নিয়ে কথাবার্তা বলে লাভ নেই বলেই মনে হচ্ছে", তরুণ জানায়, "পাথর-কুন এত সকালে এই প্রসঙ্গে কিছু শুনতে ইচ্ছুক নাও হতে পারে। কিন্তু এছাড়া আর যে কী নিয়ে কথাবার্তা বলা যায়, কিছুতেই তা মাথায় আসছে না। আর পাথর-কুনেরও কখনো সখনো এরকম লঘু কথাবার্তা শুনতে ভালই লাগবে হয়ত। শোনা থাকলে পরে কাজে লাগতে পারে।"

স্মৃতি থেকে, সেইসব মহিলাদের সম্বন্ধে, যতটুকু মনে পড়ে, খুঁটিনাটি সহকারে পরিষ্কার করে সব এপিসোড ও বলে গেল। প্রথমে হাইস্কুলের সময়ের। যখন বাইকে চেপে এটা ওটা সব দুষ্কর্ম করে বেড়াত। মেয়েটি ছিল তিন বছরের বড়। গিফু শহরে একটা স্ন্যাকবারে কাজ করত মেয়েটি। অল্প ক'দিনের জন্য হলেও, ওরা লিভ টুগেদারের মতই করেছিল। কিন্তু সে মেয়ে সিরিয়াসলি জড়িত হয়ে পড়ে সম্পর্কটায়, ধরে নেয় যে জীবনে মরণে বাঁধা পড়ে থাকবে ওরা, বাড়িতে ফোনও করে বসে, এদিকে বাড়িতে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, এইভাবে বেশ ঝঞ্ঝাট তৈরি হয়ে, সবে তখন ও হাইস্কুল পাশ করেছে, সব ছেড়েছুড়ে সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে ঢুকে যায়। ঢুকেই গ্যারিসনের সঙ্গে ইয়ামানাশিতে চলে যেতে হয়। ওর সঙ্গে সেখানেই সমাপ্তি। আর কখনো দেখা হয়নি।

"ফলে বুঝলে তো, ঝঞ্ঝাট জিনিসটা হোশিনো-কুনের জীবনের একেবারে পাস-ওয়র্ড", পাথরকে ব্যাখ্যা করে বলে তরুণ, "পরিস্থিতি একটু ঘোরালো হয়ে পড়লেই আমি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পালাই। লোককে বলার মত কথা নয় যদিও, আমি পালাতে পারি দ্রুত। সেইজন্য এযাবৎ, কোনও কিছুর একেবারে শেষ অবধি লেগে থেকেছি এমন কখনও হয়নি। এটা হোশিনো-কুনের একটা সমস্যার দিক।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়জন ইয়ামানাশির গ্যারিসনের কাছেই আলাপ হওয়া একটা মেয়ে। একদিন ডিউটি ছিল না, রাস্তার পাশে সুজুকি আলটোর টায়ার পাল্টাতে সাহায্য করার সূত্রে ঘটনাচক্রে ঘনিষ্ঠতা হয়। একবছরের বড়, নার্সিং স্কুলের ছাত্রী ছিল।

"ভাল স্বভাবের মেয়ে", *পাথরকে উদ্দেশ্য করে তরুণ বলে,* "বুক দু'টো বেশ বড়, প্যাশন ছিল গভীর। ওটা করতে খুব ভালওবাসত। আমারও তখন সবে উনিশ বছর বয়েস, যা হয়, দেখা হলে সারাদিন চাদর ঢাকা দিয়ে করে যেতাম। কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই ঈর্ষাকাতর, সন্দেহপ্রবণ ছিল যে ডিউটি নেই এমন একটা দিনও যদি দেখা না হত, কোথায় গেছিলে, কী করলে, কা'র সঙ্গে দেখা হল, এরকম হাজার কথার থেকে নিস্তার ছিল না। অস্থির করে মারবেই। সত্যি কথা বলে উত্তর দিলেও কিছুতেই বিশ্বাস করত না। শেষ অবধি এই কারণেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বছরখানেক হয়তো একসঙ্গে ছিলাম। পাথর-কুনের কেমন লাগে জানি না, আমার ভাই, কেবলই এটা ওটা নিয়ে জেরা করে গেলে একদম নিতে পারি না। দমবন্ধ লাগে, আর ভাল লাগে না। ফলে, পালালাম। সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে থাকার একটা সুবিধে হল, কিছু হলে ওখানে পালিয়ে থাকা যায়। গোলমাল শান্ত হয়ে আসা পর্যন্ত দেওয়ালের বাইরে না এলেই হল। ওধার থেকে কেউ হাত বাড়াতে পারবে না। বিনা উপদ্রবে কোনও মেয়ের হাত থেকে ছাড়া পেতে হলে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে ঢুকে যাওয়া। পাথর-কুনও এটা মনে রাখলে ভাল করবে। যদিও কেবলই গর্ত খোঁড়া আর বালির বস্তা একটার ওপর আরেকটা চাপাতে হওয়া খুব বিচ্ছিরি কাজ।"

পাথরটাকে সঙ্গী মনে করে কথাবার্তা চালাতে চালাতে খেয়াল হওয়ায়, তরুণ এই সত্যটি টের পেল যে এখন পর্যন্ত সে যা করে এসেছে তার বেশিটারই কোনও মানে নেই। যে ছ'জনের সঙ্গে তার সাহচর্য হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্তত চারজনই ছিল বেশ ভাল স্বভাবের মেয়ে (বাকি দু'জন সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বললে, তাদের ব্যক্তিত্বেই কিঞ্চিৎ সমস্যা ছিল বলে যেন মনে হয়)। তারা সাধারণ ভাবে তরুণের প্রতি সহৃদয়তাই দেখিয়েছিল। একেবারে বাক রোধ করিয়ে দেওয়ার মত সুন্দরী না হলেও, প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে মিষ্টি মেয়ে ছিল তারা। যেমন খুশি সেক্স

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করতে দিত। উপযুক্তরকম ফোরপ্লে'র ঝামেলায় না গিয়ে করতে চাইলেও কখনো আপত্তি করেনি। ছুটির দিনে খাবার বানিয়ে আনত ওর জন্য, জন্মদিনে উপহার কিনে আনত, মাইনের দিন আসার আগে টাকা ধারও দিয়েছে (ফেরত দিয়েছিল বলে মনে পড়ে না), প্রতিদান হিসেবে আলাদা করে কিছু চায়ওনি। তাতেও আমার এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। যেন এসব আমার প্রাপ্যই ছিল বলে ভাবছিলাম!

কোনো একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব থাকতে থাকতে অন্য কারো সঙ্গে আর শোয়নি। বিশ্বাসভঙ্গ হওয়ার মত একবারও কিছু করেনি। সেদিক থেকে ঠিক ছিল। কিন্তু মেয়েটা যদি একটু আধটুও অভিযোগ তুলেছে, কি যুক্তি দিয়ে দাবিয়ে দিয়েছে, কিংবা সন্দেহপ্রবণতা দেখিয়েছে, বা টাকা বাঁচিয়ে জমাতে বলেছে, নিয়ম করে অল্পস্বল্প হিস্টিরিয়ার আশ্রয় নিয়েছে, নচেৎ ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা বলতে শুরু করেছে, তো ব্যস, সায়োনারা। ওর কাছে, মেয়েদের সঙ্গে ভাব হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, পরে যেন কোনও ঝামেলা না হয়। কোনওরকম ঝামেলার কিছু বেরুলেই, ও তাড়াতাড়িতে হাওয়া। আরেকটা মেয়ে খুঁজে নিয়ে, আবারও প্রথম থেকেই সেই আগের জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি। মনে হয়েছিল, এটাই সাধারণ লোকের বেঁচে থাকার ধরণ।

"বুঝলে তো পাথর-কুন, যদি মেয়ে হতাম, আর যদি আমার মত আত্মকেন্দ্রিক লোকের সঙ্গে ভাব হত, কথাটা মনে এল", তরুণ পাথরটাকে বলতে থাকে, "এখন ভেবে দেখলে, আমার নিজেরই মনে হয়, এসত্ত্বেও ওরা সবাই অতদিন ধরে আমাকে সহ্য করেছিল তো! একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও ভাল বুঝতে পারি না—"

একটা মার্লবরো ধরিয়ে, ধীরে ধোঁয়াটা ছাড়তে ছাড়তে, একহাতে ও পাথরটার ওপর হাত বোলাতে থাকল।

"এও তো ঠিক কিনা? হোশিনো-কুন দেখতে আলাদা করে তেমন হ্যান্ডসাম নয়, সেক্সের ব্যাপারেও বিশেষরকম দড় কিছু নয়। পয়সাকড়িও নেই, স্বভাব ভাল নয়—যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, অনেকেই মুশকিলের দিক আছে। গিফুর গ্রামাঞ্চলের গরীব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাষীর ছেলে, সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে তেমন কিছু করতে পারেনি, দূরপাল্লার ট্রাকের ড্রাইভার। তা সত্ত্বেও, বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় যে আজ অবধি মেয়েদের কাছ থেকে বেশ দাক্ষিণ্যই পেয়ে এসেছি। বিশেষ রকম ফেভারিট ছিলাম বলে বলা যায় না, কিন্তু কখনো অভাববোধ ছিল বলে মনে পড়ছে না। করতে দিত, ভাত রেঁধে দিত, টাকা পর্যন্ত ধার দিয়েছে। কিন্তু জান তো, পাথর-কুন, ভাল জিনিস বোধহয় চিরকাল স্থায়ী হয় না। ক'দিন ধরে উত্তরোত্তর সেরকমই মনে হচ্ছে। ওরে, হোশিনো-কুন, এরমধ্যেই একদিন পাশা পালটে যাবে!"

এইভাবে তরুণ পাথরের কাছে অতীতে যেসব মেয়ের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক হয়েছিল তাদের নিয়ে বলে যাচ্ছিল আর তারসঙ্গে পাথরটার গায়ে হাতও বুলিয়ে যাচ্ছিল। যতই হাত বোলানোতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল, ততই ক্রমে সেটা থামানো অসাধ্য হয়ে উঠছিল। বারোটা যখন বাজল, কাছের একটা স্কুলের ঘন্টাধ্বনি কানে এল। রান্নাঘরে গিয়ে উদোন বানিয়ে খেয়ে নিল ও। পেঁয়াজ কুচিকুচি করে, ডিম ফেটিয়ে তাতে ঢালল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তরুণ আবারও 'তাইকোও ট্রায়ো' শুনল।

"এই যে, পাথর-কুন", প্রথম মুভমেন্টটা শেষ হওয়ার জায়গায় পাথরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, "কেমন লাগল, দারুণ মিউজিক না? শুনতে শুনতে মনটা উদার হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় না?"

পাথর নিরুত্তর। পাথর সেই সংগীত শুনছে কি শুনছে না, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তরুণ সেই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে গেল।

"সকাল থেকেই যেটা বলে যাচ্ছি, এ পর্যন্ত আমি অনেকই ভয়ানক কাজ করে এসেছি। স্বার্থপরের মত কাজ। যেগুলো এখন আর কিছুতেই করে উঠতে পারব না। ঠিক কি না? কিন্তু এই সংগীত স্থির হয়ে শুনতে থাকলে, বেঠোফেন যেন আমাকে এইভাবে বলছেন বলে মনে হয়, 'এই যে, হোশিনো-চান, এমনিতে এসব ঠিকই আছে। জীবন তো এরকমই। এমনকি আমিও, এভাবে দেখলে, বেশ ভয়ানক সব কাজ করেই বেঁচে ছিলাম। কিছু তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তেমন করার নেই, জীবন এরকমই। ঘটনাক্রম বলেও তো কিছু আছে। তাই এখন আবার নতুন করে চেষ্টা করাই ভাল' এইসব বলে। অবশ্যই বেঠোফেন এমনই লোক ছিলেন, সত্যি সত্যি এমন কথা কিছুতেই বলবেন না যদিও, কোনওভাবে এরকম একটা অনুভূতি যেন একটু একটু করে আমার কাছে পৌঁছে দেন। তোমার এরকম মনে হয় না?"

পাথর নীরব।

"আচ্ছা ঠিক আছে", তরুণ বলে, "যত যাই হোক, এটা নেহাতই আমার ব্যক্তিগত ধারণা বই তো নয়। অত কিছু না বলে, চুপচাপ মিউজিকটা শোনা যাক।"

দু'টো বাজতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখা গেল, মোটা কালো একটা বেড়াল বারান্দার রেলিং-এ চড়ে ঘরের ভেতরটায় উঁকি দিচ্ছে। তরুণ জানালাটা খুলে দিয়ে, একঘেয়েমি কাটাতে বেড়ালটাকে ডেকে বলে উঠল, "এই যে, বেড়ালমশাই, আজ আবহাওয়াটা বেশ ভাল, তাই না?"

"ঠিকই বলেছেন, হোশিনো-চান", বেড়াল উত্তরে বলল।

"হয়ে গেল", তরুণ বলে ওঠে। তারপর মাথা নাড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারাসু বলে ছেলেটা

কারাসু বলে ছেলেটা বনের ওপরে, বড় একটা বৃত্ত টানার মত করে ধীরে উড়ছিল। একটা বৃত্ত টানা হয়ে গেলে, একটু সরে গিয়ে অন্য কোথাও যথানিয়মে একই রকম আরেকটা বৃত্ত তৈরি করছিল। এই করে বেশ কয়েকটা বৃত্ত আকাশে আঁকল, আঁকা হচ্ছিল আর মিলিয়ে যাচ্ছিল। দেখলে মনে হবে, ঠিক যেন টহলদারির বিমানের মত করে নিচটা চষে ফেলছিল। ও যেন ওখানে কিছু একটা খুঁজে বের করতে চাইছে। কিন্তু সহজে খুঁজে পাচ্ছে না। অরণ্য কূলহীন বিশাল সমুদ্রের মত ফুলে উঠতে উঠতে নীচে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সবুজ ডালপালা, একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িয়ে, একটা আরেকটার ওপর চেপে, অরণ্য এক ঘন বুনোট, নামহীন বস্ত্রে আবৃত হয়ে আছে। আকাশ ধূসর মেঘে ঢাকা, হাওয়া নেই। এতটুকু আলোর দাক্ষিণ্য কোথাও চোখে পড়ে না। কারাসু বলে ছেলেটা সেই মুহূর্তে সম্ভবত জগতের সবচেয়ে একাকি একটি পাখি। কিন্তু তার তখন এইসব খেয়াল করার মত অবকাশ নেই।

তারপর একসময় কারাসু বলে ছেলেটা সেই বিস্তীর্ণ বনানীর মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক খুঁজে বের করে, সেটা লক্ষ্য করে সোজা নেমে এল। সেই ফাঁকের নিচে পরিষ্কার করা ছোট্ট একটা গোল উঠোনের মত জায়গা। মাটিতে অল্প আলো এসে পড়েছে, কীসের যেন চিহ্নের মত সবুজ ঘন ঘাস গজিয়েছে সেখানে। ধারগুলো গোল করা একটা বড় পাথরের ওপর একজন লোক বসে আছে বলে দেখা গেল। পুরো শরীর জুড়ে উজ্জ্বল লালরঙের জার্সির ট্রেনিংস্যুট পরা। মাথায় কালোরঙের সিল্ক হ্যাট পুরু হিলের পর্বতারোহীর জুতো, পায়ের কাছে খাকি রঙের একটা কাপড়ের ব্যাগ রাখা আছে। বেশ অদ্ভুত চেহারা লোকটার, তবে কারাসু বলে ছেলেটার এসবে কিছু যায় আসে না। নির্ঘাত এই লোকটাকেই ও খুঁজছিল। তাকে যেমনই দেখতে হোক, কিছু এসে যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হঠাৎ করে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনে লোকটা চোখ তুলে তাকিয়ে, দেখে কাছেই বড় একটা ডালে কারাসু বলে ছেলেটা বসে আছে। "এই তো", ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে আন্তরিক গলায় লোকটা বলল।

কারাসু বলে ছেলেটা কোনও উত্তরই করল না। গাছের ডালে বসা অবস্থায়ই, অপলকে ও লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কোনও অভিব্যক্তি ছাড়াই। মাঝে মাঝে ঘাড়টা অল্প হেলিয়ে।

"তোমার কথা তো জানি", লোকটা বলে, আর একটা হাত বাড়িয়ে সিল্ক হ্যাটটা হালকা করে তুলে, আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেয়, "শিগগিরিই কখনো এসে হাজির হবে বলেই ভাবছিলাম!"

লোকটা গলা খাঁকরে, মুখটা বিকৃত করে, মাটিতে থুতু ফেলল। জুতোর হিল দিয়ে সেটাকে জোরে জোরে ঘষে দিল।

"এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আর কি, কথা বলার লোক নেই বলে বোর হচ্ছিলাম। এদিকে একটু আসবে নাকি? পাশাপাশি বসে একটু কথাবার্তা বলা যাক। তোমাকে এই প্রথম দেখছি যদিও, একেবারে কোনোই সম্পর্ক নেই এমনও তো নয়", লোকটা বলে।

কারাসু বলে ছেলেটা মুখ মোটে খুলছিল না। ডানা শরীরের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। সিল্ক হ্যাট পরা লোকটা হালকা ভাবে মাথা নাড়ল।

"একি, তুমি তো দেখছি কথা বলতে পার না। সে ঠিক আছে। এখানে তাহলে একা আমাকে দিয়েই বলাও। দুজনের মধ্যে কে বলল সেই নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। যেমন ধর, মুখ খুলতে না পারলেও তুমি এরপর কী করতে যাচ্ছ, সবই আমার জানা। এক কথায়, তুমি আমাকে আর বেশিদূর যেতে দিতে চাও না তো? ঠিক কি না? সেটুকু আমারও জানা আছে। অন্তর্দৃষ্টি। আর আমাকে এগোতে দিতে চাও না তুমি। অথচ আমি অবশ্য করেই চাইছি আগে যেতে। কারণ হল, এই সুযোগ আর আসবে না। চোখের সামনে পেয়ে হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। কারণ, একেই বলে সুবর্ণসুযোগ!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকটা হাতের তালু দিয়ে পর্বতারোহনের জুতোর গোড়ালির কাছটায় থাপ্পড় মারল।

"শেষ অবধি যা সাব্যস্ত হবে সেখান থেকেই শুরু করি, তুমি আমার অগ্রগতি রুখতে পারবে না। কেন বলছি একথা, কারণ সেই যোগ্যতা তোমার নেই। যেমন ধর, আমি এখানে অল্প একটু বাঁশি বাজিয়ে দেখতে পারি। যেই বাজাব, তুমি আর আমার কাছে এগিয়ে আসতে পারবে না। এমনই আমার এই বাঁশি। তুমি জান কিনা আমার জানা নেই, খুবই স্পেশাল এই বাঁশি। সাধারণ সব বাঁশির চেয়ে আলাদা। এই ব্যাগের ভেতর বেশ কয়েকটাই জড়ো করে রাখা আছে—"

হাত বাড়িয়ে পায়ের কাছের কাপড়ের ব্যাগটাতে সাবধানে চাপড় মেরে ঠংঠং করে আওয়া তুলল লোকটা। আর যে বড় ডালটাতে কারাসু বলে ছেলেটা বসে আছে, সেটার দিকে আরেকবার চোখ তুলে তাকাল।

"বেড়ালদের আত্মা সংগ্রহ করে করে আমি এই বাঁশি তৈরি করেছি। জীবন্ত অবস্থায় চিরে ফাঁক করে ফেলা প্রাণিদের আত্মা জড়ো করে এই বাঁশি তৈরি হয়। চিরে ফাঁক করে ফেলা বেড়ালদের প্রতি যে আমার কোনও করুণার অনুভূতি হয় না এমনও নয়, কিন্তু এরকম না করে আমার উপায় নেই। আমি লোকটা ভালো কি মন্দ, সহৃদয় না ঘৃণ্য, মর্ত্যলোকের এইসব বিচারের অনেক উর্দ্ধে এই বাঁশি। এ জিনিস তৈরি করতে বহু সময় ধরে সাধনা করতে হয়েছে। আমি সনিষ্ঠভাবে সেই সাধনায় লেগে থেকে আমার মামুলি দায়িত্বটি সম্পন্ন করেছি। এরজন্য কারুর কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই এই জীবনে। বিয়ে করে ঘরে বউ আনলাম, সন্তান জন্মাল, বহুসংখ্যক বাঁশি তৈরি করলাম। তাই এখন আর নতুন করে বাঁশি বানাব না। এটা এখানে তোমার আর আমার মধ্যেই থাক, আমি এখানে জড়ো করা এই বাঁশিগুলো দিয়ে অনেক বড় একটা বাঁশি বানাব বলে ভাবছি। অনেক বড় আর অনেক জোরালো। এমন একটা এক্সট্রা-লার্জ সাইজের বাঁশি যাতে শুধু ওটাই একটা সিসটেম হয়ে যায়। আর ভাবছি সেই বাঁশিটা বানানোর জায়গায় এবার চলে যাব। এই বাঁশিটা বানিয়ে উঠতে পারলে তার ফল ভাল হবে না খারাপ হবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেটা ঠিক করা আমার কাজ নয়। এবং অবশ্যই তোমারও নয়। আমি কখন কোথায় আছি, তার ওপর নির্ভর করে সেটা পালটে পালটে যাবে। সেই অর্থে আমি একজন নিরপেক্ষ মানুষ। যেমন, ইতিহাস বা আবহাওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাত বলে কিছু হয় না। আর পক্ষপাত নেই বলেই, আমি একটা সিসটেম হয়ে উঠতে পারব।"

সিল্ক হ্যাটটা খুলে, ওপরের দিকে পাতলা হয়ে আসা চুলে খানিক হাতের তালুটা বুলিয়ে, তারপর আবার টুপিটা ও পরে নিল। টুপির কানাটা আঙুল দিয়ে ঠিক করে নিল।

"এই বাঁশিটা বাজালে তোমাকে অবলীলায় হটিয়ে দিতে কোনও ঝামেলাই হবে না। কিন্তু পারতপক্ষে এখন আমি বাঁশিটা বাজাতে চাই না। কারণ বাঁশিটা বাজানো এমনিতে বেশ ক্ষমতাসাপেক্ষ। অহেতুক শক্তি প্রয়োগ করতে আমি খুব একটা চাই না। ভবিষ্যতের জন্য যতটা পারি শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে চাই। তা ছাড়াও, বাঁশি বাজাই বা না বাজাই, তুমি তো কোনওভাবেই আমার কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সেটা এখন, যে যাই বলুক, সূর্যালোকের মত পরিষ্কার।"

লোকটা আবারও গলা খাঁকারি দিল। আর জার্সির ওপর দিয়েই, স্ফীত হতে শুরু করা পেটের ওপর ক'বার হাত বোলাল।

"আচ্ছা, তুমি লিমবো কী জান? লিম্‌বো হচ্ছে জীবিত আর মৃত জগতের মাঝখানে ঠিক মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। ঈষৎ ম্লান, বিষন্ন একটা জায়গা। সেটাই এককথায়, আমি এখন যেখানে আছি। এখনকার মত এই বন। আমি মারা গিয়েছিলাম। স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও আমি পরবর্তী জগৎটাতে ঢুকিনি। অর্থাৎ, স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা এক আত্মা। যে আত্মা স্থানান্তরিত হচ্ছে, সে কোনও আকার ধারণ করে নেই। কেবল এভাবে একটা অস্থায়ী আকৃতি নিয়ে আছি মাত্র। এই কারণে, তুমি এই এখনকার আমাকে আহত করতে পারবে না। বুঝলে কি? যেমন, আমার যদি প্রবল রক্তপাতও হয়, সেটা সত্যিকারের রক্ত নয়। যদি আমার প্রচন্ড ক্লেশও হয়, সেটা সত্যিকারের ক্লেশ নয়। এই এখনকার আমাকে মুছে দিতে পারে একমাত্র সে, যার এগুলো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করার ক্ষমতা আছে। দুঃখের বিষয়, তোমার সেই যোগ্যতা নেই। কারণ, যাই বল না কেন, তুমি নেহাতই অপরিণত, অকিঞ্চিৎকর এক মায়ার বেশি কিছু নও। যত দৃঢ় ইচ্ছাই থাকুক না কেন, তুমি আমাকে মুছে দিতে পারবে না"

লোকটা কারাসু বলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল।

"কেমন, একটু পরখ করে দেখবে নাকি?"

যেন কথাটায় কোনও সংকেত ছিল, এইভাবে কারাসু বলে ছেলেটা ডানা পুরো মেলে দিয়ে, পায়ের ধাক্কায় ডাল থেকে উঠে, সোজা লোকটার দিকে উড়ে এল। একেবারে সরলরেখায় চকিত উড়ানে। লোকটার বুকের ওপর দুপায়ের নখ উঁচিয়ে নেমে এসে, মাথাটা আরো পেছনে হেলিয়েই, ঠিক যেন গাঁইতি বাগিয়ে ধরেছে, এইভাবে ঠোঁটের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে লোকটার ডান চোখে সর্বশক্তি দিয়ে ঠুকরে দিল। ওর কুচকুচে কালো ডানায় এই সময় বাতাসে ঝটাপট আওয়াজ উঠছিল। লোকটা একেবারেই বাধা দিল না। যেমন ছিল তেমনই রইল, একটা হাতও নাড়ল না, একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়ল না। আর্তনাদও করে উঠল না। উলটে হো হো করে হেসে উঠল। টুপিটা মাটিতে পড়ে গেল, চোখের মণি মুহূর্তে দুভাগ হয়ে চোখের খোদল থেকে বেরিয়ে এল। কারাসু বলে ছেলেটা লোকটার দু'চোখেই বারংবার আক্রমণ করল। চোখের জায়গাটা গর্তের মত হয়ে গেলে পর, এবার মুখের সর্বত্র অবিশ্রান্ত ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে থাকল। মুহূর্তে লোকটার মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়ে, জায়গায় জায়গায় ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মুখটা লালে মাখামাখি, চামড়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মাংস খুবলানো, কেবল একতাল মাংসের মত হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে চুল যেখানে পাতলা হয়ে এসেছে, সেই অংশেও নির্মম ভাবে ঠোকরালো। লোকটা কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিরাম হেসে যাচ্ছিল। অদ্ভুত ও অসহ্যভাবে। কারাসু বলে ছেলেটা যত প্রবলভাবে আক্রমণ হানছিল, সেই হাসি ততই আরো জোরালো হচ্ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখের মণি খোয়ানো সেই ফাঁকা চোখ কারাসু বলে ছেলেটার থেকে একবারের জন্যও না সরিয়ে লোকটা হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে, হাসির ফাঁকে ফাঁকে কিছু বলে যাচ্ছিল।

“দ্যাখো, দ্যাখো, বলেছিলাম কি না? আর এত হাসিও না। যতই শক্তি থাকুক, আমার কোনও ক্ষতিই তুমি করতে পারবে না। যেহেতু তোমার সেই যোগ্যতাই নেই। তুমি একান্তই একটা ফালতু মায়ার বেশি কিছু নও। একটা মূল্যহীন প্রতিধ্বনির মত মাত্র। কোনওভাবেই কিছু করতে পারবে না। এখনও বুঝতে পারছ না?”

এবার কারাসু বলে ছেলেটা সেই কথা বলা মুখের ভেতরে ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে থাকল। সেই বিশাল ডানা আগের মতই প্রবলভাবে ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে, তার থেকে কয়েকটা কালো চকচকে পালক খসে গিয়ে আত্মার টুকরোর মত শূন্যে নাচছিল। কারাসু বলে ছেলেটা লোকটার জিভ খুবলে নিয়ে সেখানে গর্ত করে ফেলল। তারপর ঠোঁট দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছিঁড়ে বের করে আনল। ভয়ানক মোটা, আর লম্বা জিহ্বা। গলার ভেতর থেকে টেনে বের করে আনার পরেও, ঠিক যেন শামুকের মত সুড়ুৎ সুরুৎ করে চারপাশে বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছিল ওটা। অন্ধকারের বার্তা যেন একটা রূপ ধারণ করেছে। জিভহীন লোকটা, যা হয়, আর হাসতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল যেন দমও নিতে পারছে না। তা সত্ত্বেও লোকটা নিঃশব্দে পেট চেপে ধরে আরো বেশি বেশি করে হেসেই যাচ্ছিল। কারাসু বলে ছেলেটা সেই শব্দহীন হাসি শুনতে পাচ্ছিল। দূরে মরুভূমি পার হয়ে বয়ে যাওয়া শুকনো বাতাসের মত অশুভ আর শূন্য হাসির আওয়াজ কিছুতেই আর থামছিল না। একটা অন্য জগত থেকে আসা বাঁশির আওয়াজের সঙ্গে যেন সেটার কী একটা মিল আছে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৭

রাত ভোর হতেই চোখ খুললাম। ইলেকট্রিক হিটারে জল ফুটিয়ে সবুজ চা বানিয়ে খেলাম। জানালার ধারে চেয়ারে বসে, বাইরের পরিস্থিতি দেখতে থাকলাম। রাস্তায় যথারীতি জনমনিষ্যির ছায়াও নেই, কোনওরকম শব্দও শোনা যাচ্ছে না। ভোরের পাখিদের ডাকাডাকিরও কোনও লক্ষণ নেই। চারপাশ উঁচু পাহাড়ে ঘেরা বলে রাত ভোর হয় দেরি করে, দিন শেষ হয় তাড়াতাড়ি। পূবদিকের পাহাড়ের চূড়া সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মাত্র। সময় দেখার জন্য শোওয়ার ঘরে গিয়ে বালিশের কাছের রিস্ট-ওয়াচটা হাতে নিয়ে দেখলাম। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। ডিজিটাল ঘড়ির ডিসপ্লে-স্ক্রীন মুছে গেছে। পরখ করে দেখতে কয়েকটা সুইচ এলোমেলো টিপে দেখলাম, কিন্তু একেবারেই কোনও সাড়া নেই। এখনই ব্যাটারির ফুরিয়ে যাওয়ার সময় হয়নি। যখন ঘুমোচ্ছিলাম, কোনওভাবে ঘড়িটা চলা বন্ধ করে দিয়েছে। রিস্ট-ওয়াচ টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে, ঘড়িটা সবসময় যে হাতে পরি সেই বাঁহাতের কব্জিটা ডানহাত দিয়ে ক'বার ঘষে দেখলাম। 'এই জায়গায় সময় জিনিসটা তেমন বড় কোনও সমস্যা নয়'।

পাখিদের দেখা পর্যন্ত নেই, বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হল কোনও একটা বই পড়তে পেলে ভাল হত। যেকোনও বই। ছাপার অক্ষরে, বইয়ের মত দেখতে হলেই হবে। সেটা হাতে নিয়ে পাতা উলটে, সার সার অক্ষর চোখ দিয়ে অনুসরণ করে যেতে চাই। কিন্তু একটাও বই নেই। হ্যাঁ, ছাপার অক্ষর জিনিসটার এখানে একেবারে অস্তিত্বই নেই বলে মনে হচ্ছে। আরেকবার ঘরের ভেতরটায় একচক্কর চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু যেটুকু নজরে এল, তাতে লেখা আছে এমন কিছু চোখে পড়ল না।

শোওয়ার ঘরের দেরাজ খুলে, ভেতরে রাখা পোশাকগুলো নেড়েচেড়ে দেখলাম। পোশাকগুলো পাটপাট করে ভাঁজ করে ড্রয়ারের মধ্যে গুছিয়ে রাখা আছে। কোনওটাই নতুন নয়। রঙও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিকে হয়ে এসেছে, বারবার ধোয়ার ফলে বুনোটও নরম হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতই পরিচ্ছন্ন। গোল গলার শার্ট আর অন্তর্বাস। মোজা। কলার লাগানো সূতির শার্ট। সূতির ট্রাউজার্স। মোটামুটি সবগুলোই—একবারে নিখুঁত ফিট না করলেও—আমারই সাইজ। কোনও পোশাকেই নকশা কাটা নেই। বিনা ব্যতিক্রমে প্লেইন। যেন জগতে কখনো নকশাকাটা পোশাকের অস্তিত্বই ছিল না। একঝলক যেটুকু দেখলাম, কোনও পোশাকেই প্রস্তুতকারক সংস্থার কোনও চিহ্ন দেখলাম না। কোনওরকম হরফও লেখা নেই সেই জায়গায়। এযাবৎ পরে থাকা, ঘামের গন্ধওয়ালা টি-শার্টটা খুলে, ড্রয়ারের ভেতরে রাখা গ্রে রঙের টি-শার্ট পরে নিলাম। শার্টে রোদের আর সাবানের গন্ধ।

কিছুক্ষণ পরে—কে জানে কতক্ষণ পরে—মেয়েটা এসে গেল। অল্প টোকা দিয়ে, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজাটা খুলল। দরজায় তালা ধরণের কিছু লাগানো নেই। কাঁধ থেকে বড় কাপড়ের ব্যাগটা নামিয়ে রেখেছে। ওর পশ্চাদপটে দেখা যাচ্ছে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মেয়েটা আগের রাতের মতই রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে, কালোরঙের ছোট একটা ফ্রাইংপ্যানে ডিম রান্না করল। ফ্রাইংপ্যানে তেল গরম করে, ডিম ফাটিয়ে ওতে ঢাললে, চমৎকার একটা হুউশ করে আওয়াজ হয়। টাটকা ডিমের গন্ধটা ঘরে ভাসে। পুরনো দিনের সিনেমায় দেখা যেত এরকম একটা ছোট, পুরু টোস্টারে পাঁউরুটি টোস্ট করল। গতকাল রাতের মতই ও একটা হালকা নীল রঙের ওয়ানপিস পরেছে, চুলও আগের মতই হেয়ারপিন দিয়ে পিছন দিকে করা। কী সুন্দর মসৃণ ত্বক! দুটি মৃণাল বাহুলতা চিনেমাটির মত মসৃণ, সকালের আলো পড়ে উজ্জ্বল। জগতটাকে আরেকটু পূর্ণতা দিতে খোলা জানালা দিয়ে ছোট্ট একটা মৌমাছি ঢুকে এসেছে। ও খাবারটা টেবিলে নিয়ে এসে, কাছেই একটা চেয়ারে বসে, আমার খাওয়া পাশ থেকে দেখতে লাগল। আমি সবজি দেওয়া ওমলেট খেয়ে, টাটকা মাখন রুটিতে লাগিয়ে খেলাম। হার্বাল চা খেলাম। ও নিজে কিছুই খেল না, কিছু পানও করল না। সবকিছুই গতকাল রাতের একইভাবে পুনরাবৃত্তি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"এখানে যারা থাকে, সবাই নিশ্চয়ই নিজেরাই খাবার তৈরি করে নেয়", ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যদিও এভাবে আমার জন্য খাবার তৈরি করে দিচ্ছ—"

"নিজেরাই তৈরি করে নেয় এমন লোকও আছে, আবার যাদেরটা অন্য কেউ তৈরি করে দেয় এমন লোকও আছে", মেয়েটা বলে, "তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এখানে যারা থাকে তারা *খুব একটা* কিছু খায় না।"

"খুব একটা খায় না?"

মেয়েটা সামনে মাথা ঝোঁকায়, "মাঝেমাঝে খেলেই হয়। কখনো সখনো খেতে ইচ্ছে হলে খায়।"

"অর্থাৎ, আমি এখন যে খাচ্ছি, অন্য লোকেরা সেরকম খায় না?"

"তুমি পুরো একদিন কিছু না খেয়ে থাকতে পারবে?"

আমি মাথা নাড়ি।

"এখানে যারা থাকে, পুরো একদিন কিছু না খেলেও কোনও কষ্ট হয় না তাদের, সত্যি কথা বলতে কি, প্রায়ই খেতে ভুলেই যায়। কখনো কখনো কয়েকদিন ধরেই।"

"কিন্তু আমি এখনও এখানে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি বলে, খানিকটা করে খাওয়াদাওয়া করতে হচ্ছে—"

"সম্ভবত", মেয়েটা বলে, "তাই ঠিক হয়েছে যে আমি তোমার জন্য খাবার তৈরি করে দেব।"

আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। "আমার এখানে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে কতটা সময় লাগতে পারে?"

"কতটা সময়", ও কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, তারপর ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ করে মাথা নাড়ে, "সেটা জানি না। সময়ের ব্যাপার এটা নয়। কতটা সময়, তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, *সেই সময়টা* এলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেখা যাবে তুমি ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছ।”

আমরা এখন টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি কথা বলছি। ও হাত দু'টো টেবিলের ওপরে রেখেছে। হাত দু'টো জড়ো করা, হাতের পাতার পেছনটা ওপর দিকে। সুবিন্যস্ত দৃঢ়সংবদ্ধ দশটা আঙুল স্পষ্ট অবস্থিতিতে রয়েছে। আমি মুখোমুখি সোজা ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ওর চোখের পলকের সূক্ষ্ম নড়াচড়া লক্ষ করতে করতে, ক'বার পলক ফেলছে সেটা গুনছি। সামনের চুলগুলোর মৃদু দোলন দেখতে পাচ্ছি। ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না।

“*সেই সময়টা?*”

ও বলে, “তুমি তখন কোনও কিছুতে ছেদ ঘটাবে না, কোনও কিছু বর্জন করবে না। আমরা ওগুলো বর্জন না করে আত্মস্থ করে নিই।”

“আমি ওগুলো আত্মস্থ করে নেব—”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে”, আমি জানতে চাই, “আমি ওগুলো আত্মস্থ করে নিলে, আদপে ঘটবেটা কী?”

মেয়েটা ঘাড়টা একটু হেলিয়ে ভাবতে থাকে। হেলানোর ভঙ্গিটা খুব স্বাভাবিক। ওটার সঙ্গে সঙ্গে ওর সামনের সোজা চুলগুলোও সামান্য হেলে।

“সম্ভবত তুমি তখন পুরোপুরি তুমি হয়ে যাবে”, ও বলল।

“তার মানে, আপাতত আমি পুরোপুরি আমি নই!”

“তুমি এখনও যথেষ্ট তুমিই”, ও বলে। তারপর একটু চিন্তায় ডুবে যায়, “তবে, আমি যেটা বলছি সেটা একটু আলাদা। ভাল করে মুখের কথায় বুঝিয়ে বলতে পারছি না আর কি।”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সত্যি সত্যি ওরকম হয়ে ওঠার আগে আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে না, তাই তো?"

ও সামনে মাথা ঝোঁকায়।

ওর দিকে তাকিয়ে একটা কষ্টের অনুভূতি হলে, আমি চোখটা বন্ধ করি। তারপরেই আবার খুলি। ও ওখানেই আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিতে।

"এখানে কি সবাই মিলে একটা যৌথ জীবন যাপন করে?"

ও আবারও একটু ভাবে। "ঠিকই, এই জায়গায় সবাই একসঙ্গে কাটাচ্ছে আর সত্যি সত্যিই কিছু কিছু জিনিস যৌথভাবে ব্যবহারও করে। যেমন শাওয়ার নেওয়ার ব্যবস্থা আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, বিনিময়ের ব্যবস্থা—এইসবের ব্যাপারে কিছু কিছু সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া সহজ সিদ্ধান্ত আছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেগুলো তেমন বড় ব্যাপার নয়। আলাদা করে খুঁটিয়ে না ভাবলেও বোঝা যায়। আলাদা আলাদা করে মুখে না বলেও জানিয়ে বা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সেই কারণেই, 'এটা এভাবে করতে হয়' কিংবা 'এখানে এরকম না করলে চলে না' এভাবে তোমাকে আমার বলে দেওয়ার মত খুব বেশি কিছু নেই। যেটা সবচেয়ে জরুরি কথা সেটা হল, আমরা সক্কলে জনে জনে এখানে নিজেকে গালিয়ে দ্রবীভূত করে ফেলেছি। যতক্ষণ সেটা বজায় রাখছি, কোনও সমস্যাই দেখা দেবে না।"

"নিজেকে গালিয়ে দ্রবীভূত করে ফেলব?"

"মানে আর কি, ধর তুমি যখন বনের মধ্যে, নিশ্ছিদ্রভাবে বনেরই একটা অংশ হয়ে রয়েছ। যখন বৃষ্টিপাতের মধ্যে, নিশ্ছিদ্রভাবে বৃষ্টিপাতের একটা অংশ তুমি। সকালবেলায় তুমি, সকালবেলারই একটা অংশ, ফাঁক নেই কোনও। আমার সামনে যখন তুমি, তখন তুমি আমারই একটা অংশ হয়ে যাও। সেরকমই ব্যাপার। সহজ করে বললে।"

"তুমি যখন আমার সামনে, তখন তুমি নিশ্ছিদ্রভাবে আমারই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটা অংশ হয়ে যাও!"

"হ্যাঁ।"

"সেটা যে কীরকম অনুভূতি, কে জানে। তুমি পুরোপুরি তুমিই, অথচ একেবারে এতটুকু ফাঁক না ছেড়ে তুমি আমার একটা অংশ হয়ে যাওয়াটা?"

ও সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে আছে। তারপর চুলের কাঁটায় হাত দেয়। "আমি আমি হয়ে থেকেও এতটুকু ফাঁক না ছেড়ে তোমার একটা অংশ হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। একবার অভ্যেস হয়ে গেলেই খুব সহজ। আকাশে ওড়ার মতই।"

"তুমি আকাশে উড়তে পার?"

"উদাহরণ হিসেবে বললাম", বলে ও একটু হাসল। তাতে কোনও গভীর অর্থও নেই, কোনও ইঙ্গিতও নেই। কেবল হাসার জন্যেই হাসা। "আকাশে ওড়াটা যে কী, সেটা আকাশে উড়ে না দেখলে সত্যিকারের বোঝা যায় না, তাই না? ঠিক সেরকমই।"

"এতই স্বাভাবিক যে ও নিয়ে ভাবতেই হয় না!"

ও মাথা সামনে ঝোঁকায়, "হ্যাঁ। এতই স্বাভাবিক, অবলীলায় আর শান্তভাবে যে ব্যাপারটায় ভাবারই কিছু নেই। কোনও ফাঁকফোকরই নেই।"

"আচ্ছা, আমি কি খুব বেশি প্রশ্ন করে ফেলছি তোমার কাছে?"

"তা কেন? মোটেই তা নয়", ও বলে, "যদিও আরেকটু ঠিকঠাক করে বুঝিয়ে বলতে পারলে ভাল হত।"

"তোমার কি স্মৃতি বলে কিছু আছে?"

ও আবারও মাথা নাড়ে। টেবিলের ওপর আরেকবার হাত দু'টো রাখে। এবারে তালু ওপর দিকে রেখে। সেই তালুর দিকে একটু তাকিয়ে দেখে। কিন্তু সেই তাকানোয় চোখে কোনও বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো না।

"আমার স্মৃতি নেই। সময় যেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, স্বাভাবিক ভাবেই স্মৃতিও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্যই গতকাল রাতের কথা মনে করতে পারি। আমি তোমার জন্য এখানে এসে, ভেজিটেবল স্টু বানিয়েছিলাম। আর তুমি সেটা চেটেপুটে খেয়েছিলে। তাই না? তার আগের দিনের কথাও কিছু কিছু মনে আছে। কিন্তু তারও আগের কথা হলে আর ভাল বলতে পারব না। সময় আমার ভেতরে ঢুকে গলে মিশে যায়। কোনও একটা জিনিস আর তার পাশের অন্য একটা জিনিসের মধ্যে প্রভেদ করতে পারি না।"

"স্মৃতি এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছু নয়!"

ও মিষ্টি করে হাসে, "ঠিকই, স্মৃতি এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছু নয়। আমাদের ওপর নয়, স্মৃতি জিনিসটার ভার লাইব্রেরির ওপর।"

ও ফিরে যাওয়ার পরে, আমি জানালার কাছে গিয়ে সূর্যের রোদে হাত মেলে দিয়ে দেখলাম। জানালার ফ্রেমে হাতের ছায়া পড়েছে। পাঁচটা আঙুলের আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মৌমাছিটা ওড়াউড়ি থামিয়ে জানালার কাচের ওপর গিয়ে শান্ত হয়ে বসেছে। আমারই মত ওটাও কিছু একটা নিয়ে সিরিয়াসভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে বলে দেখে মনে হচ্ছে।

সূর্য মধ্যগগন ছাড়িয়ে একটু যেতেই সেই নারী আমার বাড়ি কোথায় জানতে চাইল। কিন্তু সে ওই বাচ্চা মেয়ে সাএকি-সান নয়। অল্প টোকা দিয়ে, ঢোকার দরজাটা খুলল। মুহূর্তের জন্য আমি সেই মেয়েটা আর এই নারীর মধ্যে ভালমত প্রভেদ করতে পারলাম না। আলোটা যেভাবে এসে পড়ছে সেটা একটু পালটে গিয়ে, নতুবা বাতাস যেভাবে বইছিল সেটার একটু পরিবর্তন হয়ে, সবকিছু সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা গেল। এক মুহূর্ত পরে সেই মেয়েটা হয়ে গিয়ে, আবার পরমুহূর্তে যেন সাএকি-সান

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়ে ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলে তা হয়নি। আমার সামনে যিনি রয়েছেন তিনি একান্তই সাএকি-সান, অন্য কেউ নন।

“কোন্নিচিবা”, খুবই স্বাভাবিক গলায় সাএকি-সান বললেন। লাইব্রেরির করিডরে পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে যেভাবে বলতেন, ঠিক সেই ভাবে। ঘন নীলরঙের লম্বাহাতা ব্লাউজের সঙ্গে ঘন নীলরঙেরই স্কার্ট পরা। সরু রূপোর নেকলেস আর কানে ছোট্ট মুক্তোর দুল। পরিচিত সাজে। পর্চের কাঠের মেঝেয় ওঁর জুতোর হিলে খট খট করে ছোট ছোট আওয়াজ হয়েছিল। সেই আওয়াজে ছিল এই ছোট জায়গাটার পক্ষে বেমানান অনুরণন।

দরজায় ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে সাএকি-সান, একটু দূরত্ব রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যেন যাচাই করে নিচ্ছেন আমি সত্যিই আমি কিনা। কিন্তু আমি তো নিশ্চিত করেই স্বয়ং আমি। উনি যেমন স্বয়ং উনিই।

“ভেতরে এসে একটু চা খাবেন না”, আমি বলি।

“ধন্যবাদ”, সাএকি-সান বললেন, এবং যেন মনস্থির করে নিয়ে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে ইলেকট্রিক হিটারের সুইচ অন করে, জল ফোটাতে থাকলাম। আর সেই অবসরে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিলাম। সাএকি-সান ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। একটু আগেও যে চেয়ারটায় মেয়েটা বসে ছিল, ঠিক সেই চেয়ারটায়।

“এভাবে তো, মনে হচ্ছে ঠিক যেন লাইব্রেরিতেই রয়েছি!”

“একদম সেরকম না”, আমি সায় দিয়ে বলি, “কফিটা নেই, আর ওশিমা-সান কেবল নেই।”

“আর বই একটাও নেই”, সাএকি-সান বললেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হার্বাল-টী দু'জনের মত বানিয়ে, কাপে ঢেলে টেবিলে নিয়ে এলাম। টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে আছি আমরা। খোলা জানালা দিয়ে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। মৌমাছিটা এখনও কাচের জানালার ওপরে ঘুমিয়ে আছে।

সাএকি-সানই প্রথমে মুখ খুললেন। "এখন এখানে আসাটাও, সত্যি কথা বলতে কি, তেমন সহজ ছিল না। কিন্তু যে করেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই, "এসেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।"

সর্বদার হাসিটি মুখে ফুটে উঠল, "সেকথা তো আমার তোমাকে বলতে হবে", উনি বলেন। হাসিটা অনেকটাই মেয়েটার হাসির মতই। তবে, সাএকি-সানের হাসিতে আরেকটু গভীরতা আছে। এই সামান্য তফাৎটুকু আমার মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

সাএকি-সান দুহাতের তালু দিয়ে কাপটা জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। আমি ওঁর কানের ছোট্ট মুক্তার দুলটার দিকে তাকিয়ে থাকি। উনি একটু কী ভাবছেন। অন্যান্য সময়ের তুলনায়, ভাবতে একটু সময় নিলেন।

"আমি সমস্ত স্মৃতি পুড়িয়ে ফেলেছি", ধীরে ধীরে শব্দ নির্বাচন করে উনি বললেন, "সবটাই ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেছে। সেইজন্য তেমন দীর্ঘ সময়ের নানা কিছু আর মনে করতে পারি না। নানা কিছু, সব কিছুই। তোমার কথাও তার মধ্যে পড়ে। তাই একটু তাড়াতাড়িই তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চেয়েছি। যতদিন নানা কথা মনে করতে পারছি, তার মধ্যেই।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে জানালার কাচের ওপর মৌমাছিটাকে দেখি। জানালার ফ্রেমে আলাদা একটা বিন্দুর মত হয়ে মৌমাছিটার কালো ছায়া পড়েছে।

"আগে সবচেয়ে জরুরি কথাটা", শান্তস্বরে সাএকি-সান বললেন, দেরি হয়ে যাওয়ার আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়। বনের ভেতর দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে আগের জীবনে ফিরে যাও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এরমধ্যেই কখনো প্রবেশপথটা বন্ধ হয়ে যাবে যেহেতু। এটা করার আয়োজন কর।"

আমি মাথা নাড়ি, "দেখুন সাএকি-সান, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমার ফেরার মত কোনও জগত নেই। জন্মে থেকে এই অভাজন, কারুর থেকে প্রকৃত ভালবাসা পায় নি, কেউ তাকে চায়নি। সেরকম কোনও স্মৃতি নেই। নিজের ওপর ছাড়া আর কারুর ওপর নির্ভর করা যায় কিনা, সেও জানা নেই। আপনি যে বললেন, 'আগের জীবন', কথাটার আমার কাছে কোনও অর্থ নেই!"

"তাহলেও তোমাকে ফিরে যেতেই হবে—"

"সেখানে কিছু না থাকা সত্ত্বেও? সেখানে যে কেউই চায় না, আমি ওখানে থাকি, তা সত্ত্বেও?"

"তা তো নয়", উনি বলেন, "আমি তো সেটা চাই। যে তুমি ওখানে থাক"

"কিন্তু *তুমি* তো সেখানে নেই। তাই না?"

সাএকি-সান দু'হাতে জড়িয়ে ধরে থাকা চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নামালেন, "তা অবশ্য ঠিক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আর ওখানে এখন নেই—"

"তাহলে আমি *ওখানে* ফিরলে আমার থেকে সাএকি-সান আদপে কী প্রত্যাশা করেন?"

"তোমার থেকে একটাই প্রত্যাশা আমার", সাএকি-সান বলেন, আর মুখ তুলে সোজা আমার চোখের দিকে তাকান, "আমি চাই তুমি আমার কথা স্মরণে রাখ। শুধুমাত্র তুমি যদি আমার কথা মনে রাখ, অন্য সবাই ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই।"

নীরবতা নেমে আসে আমাদের মধ্যে। গভীর নীরবতা। আমার বুকের মধ্যে একটাই প্রশ্ন উদ্বেল হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা গলার কাছে আটকে গিয়ে, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ার মত বড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনওভাবে ওটাকে ভেতরে গিলে ফেলি আমি।

“স্মরণ করা কি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু”, আমি অন্য একটা প্রশ্ন করি।

“পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে”, উনি বললেন। তারপর হালকা করে চোখটা বন্ধ করলেন, “পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।”

“কিন্তু আপনি নিজেই তো সেসব পুড়িয়ে ফেলেছেন!”

“কারণ, আমার কাছে ওগুলোর কাজ ফুরিয়ে গিয়েছিল”, হাত দু’টো উপুড় করে টেবিলের ওপরে পাশাপাশি রাখলেন সাএকি-সান। ঠিক মেয়েটা যেভাবে রেখেছিল। “শোনো তামুরা-কুন, তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। *ওই* ছবিটা তুমি নিয়ে যাও।”

“লাইব্রেরিতে আমি যে ঘরে থাকতাম, সেখানে টাঙানো সমুদ্রতটের ছবিটা?”

সাএকি-সান সামনে মাথা ঝোঁকালেন। “হ্যাঁ। ‘সমুদ্রতটে কাফকা’। ওই ছবিটা তোমার নিয়ে যাওয়া চাই। যেখানেই যাও না কেন। এবার তুমি যেখানে যাবে—”

“কিন্তু ছবিটার তো কোনও একজন মালিক আছে!”

উনি মাথা নাড়েন। “ওটা আমার জিনিস। ও টোকিওতে স্কুলে পড়তে যাওয়ার সময় আমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমি সদাসর্বদা ছবিটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম। কোথাও গিয়েও নিজের ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতাম। কোওমুরা গ্রন্থাগারে কাজ পাওয়ার পর, তখনকার মত ওই ঘরেই ফের রেখে দিয়েছিলাম। আগের জায়গায়। আর, ওটা আমি তোমাকে হস্তান্তর করলাম বলে ওশিমাকে চিঠি লিখে, লাইব্রেরিতে আমার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। এতে করে ওই ছবিটা প্রকৃতপক্ষে তোমার জিনিসই হয়ে গেছে।”

“আমার জিনিস?”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উনি মাথা সামনে ঝোঁকান। "কেননা, তুমি ওখানে ছিলে। আর আমি তার কাছেই থেকে, তোমাকে দেখছিলাম। অনেক আগে, সমুদ্রতটে। বাতাস বইছিল, ধপধপে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। ঋতুটা সবসময় গ্রীষ্মকাল—"

আমি চোখ বুজে ফেললাম। আমি গ্রীষ্মের সমুদ্রের তীরে। ডেকচেয়ারে শোওয়া। সেই ঈষৎ রুক্ষ, বালি বালি ক্যানভাসের বুনোট ত্বকে অনুভব করতে পারছি। লোনা জলের সুঘ্রাণ নিতে পারছি বুক ভরে। চোখের পাতা বন্ধ করে রাখলেও উজ্জ্বল আলো এসে পৌঁছচ্ছে। ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেই শব্দ সময়ের দোলায় একবার দূরে চলে গিয়ে, আবার কাছে চলে আসছে। একটু তফাতে, আমার ছবি আঁকছে কেউ একটা। কাছেই হালকা নীলরঙের হাফহাতা ওয়ানপিস পরা মেয়েটা বসে, এদিকে দেখছে। রিবন লাগানো সাদা খড়ের টুপি মাথায়, আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ছে। সোজা সোজা চুল, দৃঢ় ও দীর্ঘ আঙুল। পিয়ানোবাদকের আঙুল। সূর্যের রশ্মিতে স্নান করে, চিনেমাটির মত সাদা মসৃণ দু'টো হাত চকচক করছে। একটা স্বাভাবিক হাসি ফুটে আছে ঠোঁটের দুপ্রান্তে। আমি ওকে ভালবাসি। ও আমাকে ভালবাসে।

এসবই স্মৃতি।

"আমি চাই যে ওই ছবিটা তুমিই রেখে দাও", সাএকি-সান বলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে উনি জানালার ধারে গেলেন। আর বাইরে তাকালেন। সূর্য সবে মাঝ আকাশ পার হয়েছে। মৌমাছিটা তখনও ঘুমোচ্ছে। সাএকি-সান ডানহাতটা তুলে রোদ আড়াল করার মত করে ধরে দূরে তাকালেন। তারপর আমার দিকে ঘুরলেন।

"এখনই না গেলে আর", উনি বললেন।

আমি উঠে গিয়ে ওঁর পাশে দাঁড়ালাম। ওঁর কানটা আমার গলা ছুঁয়ে আছে। দুলটার কঠিন স্পর্শ অনুভব করা যাচ্ছিল। সামনে থেকে আমি ওঁর পিঠে দু'টো হাতের তালু স্থাপন করলাম। এমনভাবে, যেন কোনও চিহ্নের অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা করছি। ওঁর চুল আমার গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওঁর দুটো হাত আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আঙুলের ডগা আমার পিঠে বসে যাচ্ছে। সময় নামের দেওয়ালকে আঁকড়ে ধরা আঙুল। লোনা জলের গন্ধ পাওয়া গেল। ঢেউ ভাঙার আওয়াজ। কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। অনেক দূর থেকে।

"তুমি কি আমার মা", আমি অবশেষে জানতে চাইলাম।

"এর উত্তর তো তোমার এতদিনে জানা থাকার কথা", সাএকি-সান বললেন।

ঠিকই, আমি এর উত্তর জানি। আমিও জানি, উনিও জানেন, কিন্তু মুখে বলতে পারছি না। মুখে বললে সেই উত্তর তার অর্থ হারিয়ে ফেলবে।

"আমি দূর অতীতে, ফেলে দেওয়া যায় না এমন জিনিস ফেলে দিয়েছিলাম", সাএকি-সান বলেন, "যে জিনিস আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। একসময় যে জিনিস হারিয়ে ফেলব ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকতাম। তাই নিজের হাতে সে জিনিস ফেলে না দিয়ে উপায় রইল না। যদি কেউ কেড়ে নেয়, উত্থানপতনের জেরে যদি আর না থাকে, তারচেয়ে ফেলে যাওয়া ভাল বলে ভেবেছিলাম। অবশ্যই প্রশমনহীন রাগও তার মধ্যে ছিল। কিন্তু সেটা ভুল হয়েছিল। কিছুতেই ফেলে দেওয়া যায় না এমন জিনিস তো।"

আমি নীরব হয়ে থাকি।

"আর তোমাকে ফেলে দিয়ে গেল এমন একজন, ফেলে গেলে যার চলে না", সাএকি-সান বলেন, "বল তো, তামুরা-কুন, তুমি কি আমাকে মাফ করবে?"

"আমার কি সেই অধিকার আছে যে আমি তোমাকে মাফ করি?"

আমার কাঁধের দিকে ফিরে উনি বেশ ক'বার মাথা ঝোঁকান, "যদি না রাগ আর ঘৃণা তোমায় বাধা দেয়।"

"সাএকি-সান, আমার সেই অধিকার থেকে থাকলে, আমি তোমাকে মাফ করলাম", আমি বললাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মা, তুমি বললে, আমি তোমাকে মাফ করলাম। আর তোমার মনের মধ্যে ঠান্ডায় জমাট বেঁধে থাকা কিছু একটা, আওয়াজ করে উঠল।

সাএকি-সান নীরবে আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করেন। তারপর চুল সামলানোর চুলের কাঁটা খুলে নিয়ে, কোনওরকম ইতস্তত না করে, তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ নিজের বাঁহাতের ভেতরের দিকটায় সজোরে বসিয়ে দেন। খুব জোরে। আর ডানহাত দিয়ে কাছের একটা শিরা বেশ জোর দিয়ে চেপে ধরেন। অল্প পরেই ক্ষতমুখ থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল। প্রথম ফোঁটাটা মেঝেতে পড়ে, আশ্চর্যরকম জোরালো শব্দ হল। এরপর উনি মুখে কিছু না বলে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আবার একফোঁটা রক্ত মেঝেয় পড়ল। আমি শরীর ঝুঁকিয়ে, ছোট্ট ক্ষতমুখে ঠোঁট দিলাম। আমার জিভ ওঁর রক্ত চেটে নিল। চোখ বুঝে তার স্বাদটা নিলাম। টেনে নেওয়া রক্ত মুখে রেখে, ধীরে ধীরে গিলে নিলাম। ওঁর রক্ত গলাধঃকরণ করলাম। আমার হৃদয়ের শুষ্ক ত্বক সেই রক্ত নিঃশব্দে শুষে নিতে থাকল। আমি যে কতখানি সেই রক্তের জন্য আকুল ছিলাম সেটা এই প্রথম মনে পড়ল। আমার মনটা কত যে দূরের এক পৃথিবীতে রয়েছে। অথচ একই সঙ্গে আমার শরীরটা এই *এখানে* দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন এক অতৃপ্ত আত্মা। ওঁর সবটা রক্ত আমি টেনে নিতে চাই বলেও মনে হল। কিন্তু তা করা যায় না। ওঁর হাত থেকে ঠোঁট সরিয়ে, ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

"সায়োনারা, তামুরা কাফকা-কুন", সাএকি-সান বললেন, "আগের জায়গায় ফিরে যাও, আর বেঁচে থাক।"

"সাএকি-সান", আমি বলি।

"কী-ই?"

"আমি বাঁচা কথাটার অর্থ ভাল জানি না!"

উনি আমার শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। আর আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। হাত বাড়িয়ে আমার ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ছবিটা দেখো", শান্তস্বরে উনি বললেন, "আমি যেটা করতাম, সেভাবেই ছবিটা সবসময় দেখো।"

উনি চলে গেলেন। দরজাটা খুলে, পিছন না ফিরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, পিছন থেকে ওঁকে চলে যেতে দেখলাম। দ্রুত পদক্ষেপে উনি কোনও একটা বাড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জানালার ফ্রেমে হাত রেখে, ওঁর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জায়গাটার দিকে তাকিয়েই রইলাম। কিছু একটা বলতে ভুলে গেছেন বলে, মনে পড়ে গিয়ে উনি হয়তো আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু সাএকি-সান ফিরে এলেন না। অনুপস্থিতির আকারে একটা শূন্য পরিসর থেকে গেল মাত্র।

ঘুমন্ত মৌমাছিটা ঘুম ভেঙে উঠে, আমার চারপাশে খানিকক্ষণ উড়ে নিল। একটু পরেই, কী যেন মনে পড়ে গেছে এইভাবে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সূর্যের আলো তখনও রয়ে গেছে। আমি ডাইনিং টেবিলে ফিরে, চেয়ারে বসে পড়লাম। টেবিলের ওপরে ওঁর কাপটায় এখনও অল্প হার্বাল-টী রয়ে গেছে। কাপটায় হাত না দিয়ে, ওইভাবেই ওটা রেখে দিলাম। অল্প পরেই যে স্মৃতি হারিয়ে যায়, কাপটা তার মেটাফর বলে মনে হচ্ছে।

পরণের শার্টটা খুলে, আগের ঘামের গন্ধওয়ালা টি-শার্টটা পরে নিলাম। তারপর মৃত রিস্ট-ওয়াচটি নিয়ে বাঁহাতের কব্জিতে বাঁধলাম। ওশিমার থেকে পাওয়া টুপিটা উল্টোদিক করে পরে নিয়ে, আকাশী নীল সানগ্লাসটা চোখে দিলাম। ফুলহাতা শার্টও চাপিয়ে নিলাম। রান্নাঘরে গিয়ে, কলের জল গ্লাসে ভরে একনিঃশ্বাসে খেয়ে নিলাম। গ্লাসটা সিঙ্কে রেখে, ফিরে গিয়ে ঘরের ভেতরটা ঘুরে দেখে নিলাম। ডাইনিং টেবিল আছে, চেয়ার আছে। ওই চেয়ারে মেয়েটাও বসেছিল, সাএকি-সানও বসেছিল। টেবিলের ওপরে এখনও খানিকটা খাওয়া কাপটা রয়ে গেছে। চোখ বুজে একবার মাত্র গভীর ভাবে শ্বাস নিয়ে ছাড়লাম। 'এর উত্তর তো তোমার এতদিনে জানা থাকার কথা', সাএকি-সান বললেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দরজা খুলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। পর্চের সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। মাটিতে আমার ছায়া পড়েছে স্পষ্ট ভাবে। দেখাচ্ছে যেন আমার পায়ের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে। সূর্য এখনো উঁচুতেই।

অরণ্যে প্রবেশের মুখে দুই সৈনিক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আছে, যেন আমার অপেক্ষায়। আমাকে দেখতে পেয়েও, ওরা কোনও প্রশ্ন করল না। যেন ওদের জানাই আছে আমি কী ভাবছি। আগের মতই পিঠে রাইফেল ঝোলানো। লম্বা সৈনিকের মুখে ঘাসের ডাঁটি।

"প্রবেশপথ কিন্তু এখনো খোলাই আছে", মুখে ঘাসের ডাঁটিটা রেখেই লম্বা সৈনিক বলল, "অন্ততঃপক্ষে, একটু আগেও যখন দেখলাম, খোলাই ছিল—"

"আগের মত গতিতে এগিয়ে গেলে অসুবিধে নেই তো", বলিষ্ঠজন বলে, "পিছন পিছন আসতে পারবে তো?"

"কোনও অসুবিধে হবে না। পিছন পিছন যাব।"

"ওপ্রান্তে পৌঁছে যদি ততক্ষণে প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে যায়, তোমারও নিশ্চয়ই মুশকিল হবে", লম্বাজন বলে।

"ফিরে আসা বিফলে যাবে", অন্যজন বলে।

"হ্যাঁ", আমি বললাম।

"এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে তোমার কোনও দ্বিধা নেই তো", লম্বা সৈনিক বলে।

"নেই।"

"তাহলে, তাড়াতাড়ি!"

"পেছন ফিরে না তাকানোই ভাল", বলিষ্ঠজন বলে।

"হ্যাঁ, সেটাই ভাল" লম্বা সৈনিক বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা আবার বন থেকে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে, একবার শুধু আমি একঝলক পিছন ফিরেছিলাম। ফিরে না দেখাই ভাল বলে সৈনিকেরা বলেছিল। কিন্তু পিছন না ফিরে উপায় ছিল না। শহরটার দিকে দৃষ্টিপাতের ওইটাই ছিল শেষ বিন্দু। ওই বিন্দুটা ছাড়িয়ে গেলে, গাছপালার দেওয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ ওখানকার জগৎটা হয়তো চিরতরে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

যথারীতি রাস্তায় কোনও লোকের দেখা নেই। বেসিনের এধার থেকে ওধার সুন্দর একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, রাস্তার দু'পাশে সার দিয়ে ছোট ছোট বাড়ি, সমান দূরত্ব বজায় রাখা সার সার বিদ্যুতের খুঁটি মাটিতে ঘন ছায়া ফেলেছে। আমি একমুহূর্তের জন্য ওখানে নিথর হয়ে গেলাম। কী যেন একটা ওখানে আছে, যে জন্য আমাকে ওখানে ফিরে যেতেই হবে বলে মনে হল। অন্ততঃ সন্ধ্যে অবধি তো ওখানে থাকি। সন্ধ্যে হলে, কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে মেয়েটা আমার ঘরে এসে যাবে। 'আমার প্রয়োজন হলেই, ও সর্বদা সেখানে হাজির থাকবে'। বুকটা সহসা উত্তপ্ত হয়ে উঠল, জোরালো চৌম্বকশক্তি যেন আমাকে পেছনে টানছে। পায়ে ঠিক যেন সীসে ভরে দেওয়া হয়েছে, নাড়াতে পারছি না। এই জায়গাটা ছাড়িয়ে চলে গেলে, আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা হবে না। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সময়ের গতি সম্বন্ধে আর অবহিত নই। সামনে হেঁটে যাওয়া সৈনিকদের পেছন থেকে ডাকতে গেলাম। আমি ফিরে যাব না, এখানেই থেকে যাব, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। কথা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

আমি তখন শূন্যতা আর শূন্যতার মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। কোনটা যে ঠিক, আর কোনটা যে বেঠিক, নির্ধারণ করতে পারছি না। আমি নিজে যে কী চাই, সেটাও জানি না। প্রবল বালির ঝড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। নিজেরই বাড়ানো হাতের অগ্রভাগও চোখে পড়ছে না। কোনওদিকেই যেতে পারছি না। হাড়ের গুঁড়োর মত সাদা বালি আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু, কোত্থেকে যেন সাএকি-সান আমাকে কিছু বলে উঠলেন। "এসব সত্ত্বেও তোমাকে ফিরতেই হবে", স্পষ্ট বললেন সাএকি-সান, "আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেটাই চাই। *তোমার ওখানে থাকাটা*"

আবিষ্ট ভাবটা কেটে গেল। আমি আরেকবার নিজেকে সংহত করে নিলাম। শরীরে উষ্ণ রক্ত ফিরে পেলাম। ওঁরই থেকে পাওয়া রক্ত। ওঁর সর্বশেষ রক্ত। পরমুহূর্তেই আমি সামনের দিকে মুখ করে, সৈনিকদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করলাম। মোড় ঘুরতেই, গিরিখাতের সেই ছোট্ট জগৎ নজর থেকে হারিয়ে গেল। দু'টো স্বপ্নের মধ্যবর্তী গহ্বরে তলিয়ে গেল। এরপর মনোসংযোগ করলাম কেবল বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসাতে। দৃষ্টি থেকে যেন রাস্তাটা হারিয়ে না যায়। রাস্তা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ি। ওটাই সবচেয়ে জরুরি।

প্রবেশদ্বার এখন খোলা। সন্ধ্যে অবধি সময় আছে। সৈনিক দু'জনকে ধন্যবাদ জানালাম। ওরা রাইফেল নামিয়ে, আগের মতই একটা বড় সমতল পাথরের ওপরে বসল। লম্বা সৈনিক ঘাসের ডাঁটি মুখে পুরে দিল। যথারীতি ওরা একটুও হাঁফিয়ে পড়েনি।

"বেয়নেটের ব্যাপারটা যেন ভুলে যেও না", লম্বা সৈনিক বলে, "অপরপক্ষকে বিদ্ধ করে, জোরে পাশে ঘোরাবে জিনিসটা। নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাবে। না করলে, তোমার ওপরই ওটা করা হবে। ওটা অন্য একটা জগৎ—"

"তবে, সেটুকুই শুধু নয়", বলিষ্ঠজন বলে।

"অবশ্যই", লম্বা সৈনিক তাতে বলে। তারপর একবার গলাটা খাকরে নেয়। "আমি কেবল নেগেটিভ দিকটা বলছি।"

"আর, ভালমন্দ বিচার করাও তো খুব কঠিন", বলিষ্ঠ সৈনিক এতে বলে।

"কিন্তু, করতে তো হয়", লম্বা সৈনিক বলে।

"হয়তো তাই", বলিষ্ঠজন বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আরও একটা কথা", লম্বাজন বলল, "এখান থেকে যেতে শুরু করে, গন্তব্যে পৌঁছোনো পর্যন্ত, একবারও আর পেছনে ফিরে তাকানো চলবে না।"

"এটা কিন্তু খুব জরুরি কথা", বলিষ্ঠজন বলে।

"একটু আগে কোনওভাবে পার পেয়ে গেছ", লম্বাজন বলে, "এবার কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা সিরিয়াস। পৌঁছনোর আগে, পিছনে ফিরে দেখা যাবে না।"

"কিছুতেই না", বলিষ্ঠজন জানায়।

"বুঝেছি", আমি বললাম।

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে, দু'জনকে বিদায় জানালাম। "সায়োনারা" বললাম।

ওরা উঠে দাঁড়িয়ে, গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করল। আর হয়তো ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। সেটা আমি জানি। ওরাও সেটা জানে। সেভাবেই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম।

ওদের থেকে আলাদা হওয়ার পর, একা একা কীভাবে ওশিমাদের কেবিন অবধি পথ চিনে ফিরে এসেছিলাম, খুব একটা মনে নেই। গভীর বন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে, সেই সময় অন্য কিছু চিন্তা করছিলাম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পথ নজরছাড়া করিনি। যেটুকু ঝাপসা মনে পড়ছে, যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া ডে-প্যাক চোখে পড়ে গিয়ে, প্রায় আপনা থেকেই হাতে তুলে নিয়েছিলাম যেন। একইভাবে কম্পাস, তরোয়ালটা, স্প্রে-পেইন্টের কৌটো, সব কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। রাস্তার ধারের গাছের গুঁড়িতে যে হলুদরঙের চিহ্ন এঁকে গিয়েছিলাম সেগুলো যখন দেখা গেল, সেই সময়ের কথাও মনে আছে। ওগুলোকে যেন বিশাল মথেদের ছেড়ে যাওয়া খোলসের মত দেখাচ্ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কেবিনের সামনে খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলাম। যখন খেয়াল হল, আমার চারপাশে প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর প্রাকৃতিক নানা আওয়াজ। পাখির ডাক, নদীর জলের শব্দ, বাতাসে গাছের পাতা নড়ার শব্দ—সবই খানিকটা করে। কিন্তু ঠিক যেন কানে গোঁজা তুলো কোনোভাবে টেনে খুলে ফেলায় এইসব শব্দ চমকে দেওয়ার মত প্রাণবন্ত, ঘনিষ্ঠ হয়ে আমার কানে এসে পৌঁছোচ্ছে। সবগুলোই একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত হয়ে, মিলেমিশে গিয়েও, আলাদা আলাদা করে যেটা যেরকম শুনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাঁহাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে চোখ ফেললাম। কখন যেন চলতে শুরু করেছে। সবুজ ডায়ালে ডিজিটাল সংখ্যাগুলো ফুটে উঠে, যেন কিছুই হয়নি এইভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে সংখ্যা পালটে পালটে যাচ্ছে। ৪ঃ১৬—এখনকার সময়।

কেবিনে ঢুকে, পোশাক পরা অবস্থাতেই খাটে শুয়ে পড়লাম। গভীর বন থেকে বেরিয়ে আসার পর, শরীরটা প্রবলভাবে বিশ্রাম চাইছিল। চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজলাম। একটা মৌমাছি জানালার কাচের ওপরে জিরিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটার হাতদুটো সকালের আলোয় চিনেমাটির মত উজ্জ্বল, "উদাহরণ হিসেবে, আর কি", সে বলল।

"ছবিটা দ্যাখো", বললেন সাএকি-সান, "যেটা আমি করতাম!"

মেয়েটার সরু সরু আঙুলের ফাঁক দিয়ে সময়ের ধবধবে সাদা বালি বেরিয়ে আসছে। ছোট ছোট ঢেউ ভাঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাথা তুলে এগিয়ে এসে, নেমে, ভেঙে যাচ্ছে। মাথা তুলে এগিয়ে এসে, নেমে, ভেঙে যাচ্ছে। আর আমার চেতনাকে আবছা অন্ধকার একটা অলিন্দের মত জায়গায় টেনে নিচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৮

“হয়ে গেল”, তরুণ ফের একবার বলে।

“হয়ে যাওয়ার তো কিছু নেই, হোশিনো-চান”, ভারিক্কি চালে কালো বেড়াল বলে। মুখটা বড়, মনে হয় বেশ বয়েস হয়েছে। “একা একা বোর হচ্ছ তো? শেষে পাথরটার সঙ্গে সারাদিন ধরে কথা বলে যাচ্ছ—”

“কিন্তু মানুষের ভাষায় কথা বলছ কেন?”

“মানুষের ভাষায় তো বলছি না!”

“বুঝলাম না। তাহলে আমরা এভাবে কথাবার্তা বলছি কী করে? বেড়াল আর মানুষের মধ্যে!”

“আমরা জগতের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, দুজনেই বলতে পারি এমন ভাষায় কথা বলছি। এছাড়া কিছু নয়।”

তরুণ ভাবতে থাকে, “জগতের একপ্রান্তে? দুজনেই বলতে পারি এমন ভাষা?”

“বুঝতে না পারলে ক্ষতি নেই। বুঝিয়ে বলতে গেলে সে অনেক কথা” এই বলে, যেন এসব বাজে ঝামেলা এড়াতে, ক’বার লেজটা অল্প ঝাড়ল বেড়ালটা।

“তুমি, কর্নেল স্যান্ডার্স নও তো”, তরুণ বলে।

“কর্নেল স্যান্ডার্স”, বিরক্ত হয়ে বেড়াল বলে, “এরকম কারুকে চিনি না তো। আমি আমিই, অন্য কেউ নই। রাস্তার সাধারণ বেড়াল।”

“কোন [illegible]”

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"নাম একটা আছে—"

"কী নাম?"

"তোরো", যেন বলতেই চাইছিল, এইভাবে বলে।

"তোরো", তরুণ বলে। "তোরো সুশি†?"

"হ্যাঁ", বেড়াল জানায়। "আসলে, এপাড়ারই একটা সুশির দোকানের পোষা। কুকুরও পোষে, সেটার নাম তেক্কা।"

"তা তোরো-সান, তুমি আমার নাম জান দেখছি!"

"তুমি তো বেশ বিখ্যাত, হোশিনো-চান", কালো বেড়াল তোরো বলে। এবং অবশেষে মুহূর্তের জন্য হাসে। সেই প্রথম বেড়ালকে হাসতে দেখা। কিন্তু সেই হাসি তখনই মিলিয়ে গিয়ে, বেড়াল আবার আগের শিষ্ট মুখভাব ফিরিয়ে আনে।

বেড়াল বলে, "বেড়ালেরা সব জানে। নাকাতা-সান যে গতকালই মারা গেছে, একটা যে গুরুত্বপূর্ণ পাথর রয়েছে। এই অঞ্চলে যা যা ঘটে, তা আমি জানি না এমন হয় না। বহুদিন ধরে বেঁচে আছি তো!"

"হুঁউ", তারিফের সুরে তরুণ বলে, "বলছি যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমরা, ভেতরে এলে হয় না, তোরো-সান?"

রেলিং-এর ওপরে শোয়া অবস্থায় বেড়াল মাথা নাড়ে, "না, আমি এখানেই ঠিক আছি। ভেতরে ঢুকলে অস্বস্তি হবে, বাইরের আবহাওয়াটাও ভাল, এখানেই কথা বলা যাক না—"

"আমার অবশ্য কোনও জায়গাতেই অসুবিধে নেই", তরুণ বলে, "খিদে পাচ্ছে না? খাবার তো আছে বলেই মনে হয়!"

বেড়াল মাথা নাড়ে, "মাফ কোরো, খাবারের তো অভাব নেই, বরং ওজন কমানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। সুশিওয়ালার পোষ্য তো, কোলেস্টেরল জমতে শুরু করেছে। মোটা হয়ে গেলে, উঁচু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

†ছোটো একদলা ভাতের ওপরে একখন্ড কাঁচা মাছ দিয়ে তৈরি সুস্বাদু খাবার

~ www.amarboi.com ~

জায়গায় ওঠানামা করতে কষ্ট হয়।"

"তোরো-সান", তরুণ বলে্ "আজ কি কোনও প্রয়োজনে এসেছিলে?"

"ওহো", বেড়াল বলে ওঠে, "ভাবলাম তুমি হয়তো মুশকিলে পড়েছ। একা পড়ে গিয়ে ওই গোলমেলে পাথরটাকেই নিয়ে বসেছ।"

"ঠিকই। একেবারে যা বলেছ। সেটাই পরিস্থিতি, আটকা পড়ে গেছি।"

"তাই ভাবলাম, মুশকিলে পড়ে থাকলে একটু পরিত্রাণের চেষ্টা করে দেখি।"

"তবে তো আমার তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ", তরুণ বলে, "বেড়ালেরও সাহায্য নেওয়া বলে তো কথাই আছে।"

"সমস্যা তো পাথরটাকে নিয়ে", তোরো বলে, তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে, কোত্থেকে এসে হাজির হওয়া একটা মাছিকে তাড়ায়। "পাথরটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে, তোমার কর্তব্য শেষ। পছন্দমত যেকোনও জায়গায় ফিরে যেতে পার। তাই তো?"

"হ্যাঁ, সেরকমই ব্যাপারটা। প্রবেশপথের মুখটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলে, কাহিনীর সেখানেই শেষ। নাকাতা-সান বলেছিলেন, একবার যা খোলা হল, সেটা আবার বন্ধ করতেই হয়। সেটাই নিয়ম।"

"তাহলে, কী করতে হবে সেটা আমি কি বলে দেব?"

"তুমি কি জানো, কী করতে হবে", তরুণ জিজ্ঞেস করে।

"অবশ্যই জানি", বেড়াল বলে। একটু আগেই বললাম না, বেড়ালেরা সব জানে। কুকুরের মত নয়।"

"কী করতে হবে তাহলে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

“ওটাকে মেরে ফেলতে হবে”, ভদ্রস্বরে বেড়াল বলে।

“মেরে ফেলতে হবে”, তরুণ জিজ্ঞাসা করে।

“হ্যাঁ। হোশিনো-চান, ওটাকে মারবে।”

“ওটা মানে কে?”

“যখন সত্যি করে দেখবে, তখন বুঝতে পারবে। যে এটাই ওটা”, কালো বেড়াল বলে। “কিন্তু সত্যি করে না দেখলে বুঝতে পারবে না। ওটার আসলে তেমন নির্দিষ্ট আর স্পষ্ট কোনও অবয়ব নেই। সময়ের সঙ্গে পালটায়।”

“ওটা কি কোনও লোক?”

“লোক নয়। সেটুকু নিশ্চিত—”

“তাহলে, কেমন রূপ ধরে আছে?”

“সেসব আমি জানি না”, তোরো বলে, “একটু আগেই বললাম না? একঝলক দেখলেই বুঝবে। না দেখলে বুঝবে না। দেখেই বোঝা যায়।”

বড় করে শ্বাস ফেলে হোশিনো। “কিন্তু, প্রথমত ওটা আদতে জিনিসটা কী?”

“সেসব তুমি না জানলেও চলবে”, বেড়াল বলে, “বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন, তারচেয়ে বরং, তুমি না জানলেই সুবিধে। যে কারণেই হোক, ওটা এখন স্থির হয়ে আছে। অন্ধকার কোনও জায়গায় রুদ্ধশ্বাসে চারপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে। কিন্তু অনন্তকাল স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। কখনো না কখনো বেরিয়ে আসবে। সম্ভবত আজই কখনো। আর, নিশ্চিত করেই ওটা তোমার সামনে দিয়ে যাবে। আজই উপযুক্ত সময়।”

“উপযুক্ত সময়?”

“বলে না, হাজার বছরে একবারই আসে সে সুযোগ। তেমনই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা সময়", ব্যাখ্যা করে বলে কালো বেড়াল, "তুমি স্থির হয়ে অপেক্ষায় থেকে, ওটাকে মারলেই হবে। তাহলেই গল্প খতম। তারপর তুমি যেখানে খুশি যেতে পার।"

"কোনও আইনগত সমস্যা হবে না তো, ওটাকে মারলে?"

"আইন ব্যাপারটা আমি ভাল জানি না", বেড়াল জানায়, "যতই হোক, আমি তো একটা বেড়াল। তবে, ওটা যেহেতু মানুষ নয়, আইনের ব্যাপার হয়তো কিছু নেই। যাই হোক না কেন, ওটাকে মারা জরুরি। এটুকু রাস্তার বেড়ালেও জানে।"

"কিন্তু কীভাবে মারা যায়? কত বড়, কেমন দেখতে কিছুই জানি না যে। এতে তো কীভাবে মারব সেটাই ঠিক করে রাখতে পারছি না!"

"সে যেভাবেই মারো না কেন। হাতুড়ি দিয়ে মারলেও হয় ক'ঘা। ছুরি বসিয়ে দিলেও হয়। গলা টিপে ধরতে পার। পুড়িয়েও দিতে পার। কামড়ে মারো। যেভাবেই হোক, যেন প্রাণটা যায়। তোমার পছন্দমত যেকোনও উপায় অবলম্বন করতে পার। অপ্রতিরোধ্য হয়ে, লক্ষ্য স্থির রেখে, অবিচলিতভাবে শেষ করে দাও। মোটের ওপর, কখনও সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে ছিলে তো। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বন্দুক ছোঁড়া শেখানো হয়েছিল নিশ্চয়ই। বেয়নেটে ধার দেওয়া শেখানো হয়েছিল। সৈনিক তো একজন। কী করে মারবে নিজে ভাব।"

"সাধারণ যুদ্ধ কীভাবে করতে হয় সেটা সেলফ ডিফেন্স ফোর্সে শেখানো হয়েছিল", ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে তরুণ বলে, "মানুষ নয়, আকার, আয়তন কিছুই জানা নেই এমন কিছুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে, তাও আবার হাতুড়ি দিয়ে, মেরে ফেলার ট্রেনিং পাইনি—"

"ওটা ঢোকার মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইবে", তরুণ যা বলল সেটাকে অগ্রাহ্য করে তোরো বলল, "কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দিলে চলবে না। যা-ই ঘটুক, ঢুকে পড়া একেবারে বারণ। ওটা ঢোকার মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ার আগে মেরে ফেলতেই হবে। সেটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সবচেয়ে জরুরি। বুঝলে তো?"

"হাজার বছরে একবার মাত্র আসা উপযুক্ত সময়—"

"ঠিক তাই", তোরো বলে, "যদিও, হাজার বছরে একবার—কথাটা অবশ্যই ভাষার কায়দা বলে মনে হয়।"

"কিন্তু তোরো-সান, ওটা সম্ভবত বেশ বিপজ্জনক কিছু, তাই না", হোশিনো মিনমিন করে জিজ্ঞেস করে, "মারব ভেবে গিয়ে, উলটে আমিই হয়তো ওর শিকার হলাম?"

"যখন স্থান পরিবর্তন করছে, তখন *বোধহয়* অতটা বিপজ্জনক হওয়ার কথা নয়", বেড়াল বলে, "স্থান পরিবর্তন করা শেষ হলে, তখনই ওটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বেশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তাই স্থান পরিবর্তন করার সময় ওটাকে পালাতে দিলে চলবে না। তখনই শেষ করে দিতে হবে।"

"বোধহয়", হোশিনো বলে।

কালো বেড়াল এর কোনও উত্তর দেয় না। চোখটা সরু করে, রেলিং-এর ওপর একবার শরীরটা টানটান করে নিয়ে, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ায়, "আবার পরে কখনও, হোশিনো-চান। ওটাকে মারতে ভুল কোরো না। নাহলে, নাকাতা-সান মরেও শান্তি পাবেন না। তুমি নাকাতা-সানকে ভালবাসতে কিনা?"

"সে তো বটেই। খুব ভাল লোক ছিলেন।"

"সেইজন্যেই ওটাকে মেরে ফেলো। অপ্রতিরোধ্যভাবে, লক্ষ্যে স্থির থেকে, বিচলিত না হয়ে শেষ করে দাও। সেটাই নাকাতা-সান চাইছিলেন। নাকাতা-সানের কথা ভেবেই, তুমি ওটা করবে। সেই ক্ষমতা তোমাতে বর্তাবে। এতদিন তুমি 'জীবনের দায়িত্ব এড়ালেও চলে' ভেবে কাটিয়ে দিয়েছ। এখন সেই ঋণ শোধ করার সময়। কেচিয়ে ফেলো না কিন্তু। আমিও অলক্ষ্যে সহায়তা করে যাব।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"একথায় ভরসা পেলাম", তরুণ বলে, "তবে, একটা কথা মনে হল।"

"কী?"

"প্রবেশপথের মুখটা পাথর দিয়ে বন্ধ না করে এখনও যে খোলা রাখা আছে, সে কি ওটাকে টোপ দেখিয়ে আনার জন্য নাকি?"

"তা হতেও পারে", কালো বেড়াল একটা নিরপেক্ষভাব বজায় রেখে বলল, "আরে গুরু, হোশিনো-চান, একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। ওটা কেবল রাত্রিতে নড়াচড়া করে। সম্ভাবনা আছে যে গভীর রাত্রে ব্যাপারটা ঘটবে। তাই দিনের বেলায় ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। ঝিমুতে থাকলে, সেই সুযোগে চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালালে খুব মুশকিল হবে।"

কালো বেড়াল রেলিং থেকে চকিতে পাশের ছাদে লাফিয়ে নেমে, ল্যাজটা একেবারে খাড়া করে, হেঁটে চলে গেল। শরীরটা যত বিশাল, সেই তুলনায় বেশ চটপটে। পেছন থেকে তরুণ তার অপসৃয়মান চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না বেড়ালটা।

"দ্যাখো দ্যাখো", তরুণ বলে ওঠে, "হয়ে গেল!"

বেড়ালটা মিলিয়ে যেতেই, তরুণ রান্নাঘরে গিয়ে তখনকার মত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার মত একটা কিছু খুঁজতে থাকল। ধারালো ফলার মাছ কাটার ছুরি, আর সোর্ডের আকৃতির ওজনে ভারি ছুরি আছে। রান্নাঘরে নেহাতই রান্না করতে কাজে লাগে এমন জিনিসই থাকে, কেবল ছুরিই জড়ো করে রাখা আছে অনেক রকমের। ছুরি ছাড়া, বড় সাইজের হাতুড়ি, নাইলনের দড়িও পাওয়া গেল। বরফ ভাঙার আইসপিকও পাওয়া গেল।

"এই সময়, একটা অটোম্যাটিক রাইফেল থাকলে কাজে দিত", রান্নাঘরে খুঁজতে খুঁজতে হোশিনোর মনে হল। সেলফ ডিফেন্স

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফোর্সে থাকার সময় অটোম্যাটিক রাইফেল ছোঁড়া শেখানো হয়েছিল। শ্যুটিং প্র্যাকটিসে সবসময় ভাল ফল করত ও। রান্নাঘরে অবশ্য একেবারে অটোম্যাটিক রাইফেল অবধি ছিল না। তার ওপর এরকম মোটামুটি শান্ত পাড়ায় অটোম্যাটিক রাইফেল ছুঁড়ে বসলে, ভয়ানক আওয়াজ হবে তার।

শোওয়ার ঘরের টেবিলে দুটো ছুরি, আইসপিক, হাতুড়ি আর দড়ি সাজিয়ে রাখলো ও। পকেট টর্চও রাখল। আর, পাথরের কাছে বসে পড়ে, ওটায় হাত বোলাতে থাকল।

"দ্যাখো দেখি, একেবারে", পাথরকে উদ্দেশ্য করে হোশিনো বলে, "হাতুড়ি আর ছুরি দিয়ে অজানা এক কিম্ভূত জিনিসের মোকাবেলা করতে হবে। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার না! তাও আবার পাড়ার এক কালো বেড়ালের নির্দেশে। আমি আর আমাতে নেই, একেবারেই।"

কিন্তু, পাথর অবশ্যই কোনও উত্তর করল না।

"কালো বেড়াল তোরো-সান বলছিল বটে যে ওটা সম্ভবত বিপজ্জনক কিছু নয়, কিন্তু সেও বড়জোর 'সম্ভবত'। নেহাতই একটা আশাবাদী অনুমানের বেশি কিছু নয়। কোনওরকম গোলমাল হয়ে গিয়ে 'জুরাসিক-পার্ক' জাতীয় কিছু একটা যদি সড়াৎ করে বেরিয়ে আসে, হোশিনো-কুন তখন কী করবে বল তো? একদম গেছি তো তাহলে!"

নীরবতা।

হোশিনো লোহার হাতুড়িটা হাতে নিয়ে, ক'বার শূন্যে ঝাঁকিয়ে দেখল।

"ভেবে দেখলে, এসবই নিয়তির অনিবার্যতা। সেই যে আমি ফুজিগাওয়া সার্ভিস এরিয়া থেকে নাকাতা-সানকে গাড়িতে তুলে নিলাম, মোটামুটি সেই সময় থেকেই, শেষে যে এরকমটা হবে, ভবিতব্য হিসেবে ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল, জানত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না কেবল হোশিনো-কুন। পুরোই ভাগ্য, কেউ বদলাতে পারবে না", হোশিনো বলে, "কী বল, পাথর-কুন। পাথর-কুনেরও কি সেটাই মনে হয় না?"

নীরবতা।

"যাকগে, উপায় তো নেই। এখন যা-ই বলি না কেন, এ পথ তো আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। শেষ অবধি যেতেই হবে। যত বদখত দেখতে জিনিসই বেরুক না কেন, কোনও ধারণাই নেই যদিও, তাই সই, হোশিনো-কুনও সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। জীবন বেশিদিনের নয়, কিছু কিছু মনোরম স্মৃতিও আছে। ইন্টারেস্টিং পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও গিয়েছি। কালো বেড়াল তোরো-কুন যা বলল তাতে এটা হাজার বছরে একবার মাত্র আসার মত একটা চান্স। এতে যদি হোশিনো-কুনের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হয়, মন্দ কী?, সবই নাকাতা-সান কাকুর জন্য!"

পাথর একইভাবে নীরবতা পালন করে যায়।

বেড়াল যেমন বলেছিল সেইভাবে তরুণ রাতের প্রস্তুতিতে সোফার ওপরে ঘুমিয়ে নিল। বেড়ালের কথায় দিবানিদ্রায় যাওয়াটা একটু অদ্ভুতই, কিন্তু সত্যি করে শুতেই একটি ঘন্টা অঘোরে ঘুমোল। সন্ধ্যে হতে রান্নাঘরে গিয়ে ঠান্ডায় জমানো চিংড়ির ঝোল গরম করে নিয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে খেল। আর চারপাশ যখন অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করেছে, পাথরটার কাছে বসে, ছুরি আর হাতুড়ি যাতে হাত বাড়ালেই পেয়ে যায় এমনভাবে রাখল।

ঘরের আলো নিভিয়ে, ছোট একটা টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে রাখল। মনে হল সেটাই ভাল হবে। জিনিসটা কেবল রাতে নড়াচড়া করে। যতটা পারা যায় অন্ধকার করে রাখা যাক। হোশিনো-কুনের দিক থেকেও যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে রাখতে চায়। বেরিয়ে আসতে হলে বেরিয়ে পড়ো। তাড়াতাড়িই সমাধা করে ফেলা যাক। এরপর আমি নাগোইয়া-র অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে, কোনো একটা মেয়েকে ফোনটোন করব।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাথরটার সঙ্গে আর খুব একটা কথাবার্তা বলতে গেল না। চুপচাপ স্থির হয়ে বসে মাঝেমাঝে ঘড়ির দিকে চোখ ফেলছিল। বোর হয়ে গেলে, ছুরি আর হাতুড়ি হাতে নিয়ে বাতাসে চালিয়ে দেখছিল। ওর মনে হল, কিছু একটা ঘটতে হলে, সম্ভবত প্রকৃত মাঝরাত্তিরেই ঘটবে। তবে কিনা, এমনকি তার আগেও হতে পারে, ওর দিক থেকে ওটাকে চোখের সামনে দিয়ে পালাতে দেওয়া যাবে না। যতই হোক, এক হাজার বছরে একবার আসে এমন সুযোগ। হাতছাড়া করা যাবে না। মুখটা কেমন লাগছিল বলে ক'টা বিস্কুট চিবিয়ে, অল্প একটু মিনারাল ওয়াটার খেয়ে নিল।

"এই যে, পাথর-কুন", মাঝরাত্তির হতেই নীচুস্বরে হোশিনো পাথরটাকে বলল, "শেষ অবধি বারোটা তো বাজল। এবার ভুতটা আসার সময় হয়েছে। সঙ্গিন মুহূর্ত। কী ঘটে, দু'জনে ভাল করে নজর করে দেখব।"

হোশিনো পাথরটাকে হাত দিয়ে ছোঁয়। অন্যান্য সময়ের চেয়ে পাথরের গা'টা একটু যেন বেশি গরম ঠেকল। কিন্তু সেটা নেহাত কল্পনাও হতে পারে। নিজেকে একটু সাহস দিতে ও ক'বার তালু দিয়ে পাথরটার গায়ে হাত বোলাল।

"পাথর-কুন, তুমিও অলক্ষ্যে আমার একটু মদত কর তো। হোশিনো-কুনের কেবল একটু ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার—"

নাকাতার মৃতদেহ যেই ঘরে আছে সেখান থেকে কীসের যেন মৃদু খচখচ আওয়াজ শোনা গেল, রাত তিনটের একটু পর নাগাদ। মাদুরে ঢাকা মেঝের ওপর কিছু যেন বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নাকাতা যে ঘরে, সেখানে মাদুর নেই। মেঝেয় কার্পেট পাতা। তরুণ মুখ তুলে শব্দটা কান পেতে শোনে। কোনও ভুল নেই। কীসের আওয়াজ বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু নাকাতা যে ঘরে শোয়ানো সেখানে পরিষ্কার কিছু একটা হচ্ছে। ওর বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ডে জোরে আওয়াজ হতে শুরু করে। ডানহাতে মাছ কাটার ছুরিটা শক্ত করে চেপে ধরে তরুণ পকেট-টর্চটা বাঁহাতে নেয়। তারপর হাতুড়িটা প্যান্টের বেল্টের ভেতরে গুঁজে নিয়ে মেঝে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে উঠে দাঁড়ায়।

"এইবার এসো", অজ্ঞাত কা'র উদ্দেশ্যে যেন বলে ও।

পা টিপে টিপে নাকাতার ঘরে যাওয়ার দরজার সামনে গিয়ে, আস্তে করে খোলে দরজাটা। আর পকেট-টর্চটার সুইচ অন করে, চট করে নাকাতার মৃতদেহটা যেখানে সেই জায়গায় আলো ফেলে। খচমচ করে আওয়াজটা নিশ্চিত করে ওখান থেকেই এসেছে। পকেট-টর্চের আলোয় সাদামত, সরু আর লম্বা একটা জিনিস চোখে পড়ল। জিনিসটা মৃত নাকাতার মুখ থেকে, অস্থিরভাবে শরীরটা সামনে পেছনে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে সবে বেরিয়ে আসছিল। আকৃতিটা মোটা একটা শসার কথা মনে করিয়ে দেয়। পূর্ণবয়স্ক একজন পুরুষমানুষের হাতের মত মোটা। দৈর্ঘ্যে পুরোটা কতখানি বোঝা যাচ্ছে না, তখন অবধি মোটামুটি অর্দ্ধেকের কাছাকাছি বাইরে বেরিয়ে এসেছে সবে। শরীরটা শ্লেষ্মার মত পিচ্ছিল, চকচক করছে। ওটা যাতে বেরিয়ে আসতে পারে, নাকাতার মুখটা একেবারে সাপের মুখের মত ব্যাদান হয়ে বড় করে হাঁ করা। এমন হতে পারে যে চোয়ালের হাড় খুলে গেছে।

হোশিনো রীতিমতো শব্দ করে ঢোঁক গিলে ফেলল। টর্চ ধরা হাতটা অল্প কাঁপছিল। সেইমতো আলোটাও দুলছিল। দ্যাখো দেখি, এটাকে কীভাবে মারা যায়, ও ভাবার চেষ্টা করে। বাহ্যত হাত নেই, পা নেই, চোখও নেই, নাকও নেই। পিচ্ছিল বলে ধরাও যাবে না। এহেন জিনিসের প্রাণনাশ কীভাবে করা যায়? তার ওপর, এটা আদপে কী ধরণের প্রাণী? পরজীবী প্রাণীর মত, এটা এতদিন নাকাতা-সানের শরীরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। নাকি এটা নাকাতা-সানের আত্মা ধরণের কিছু? নাহ্, ওসব নয়। ওরকম কিছু হয় বলে মনে হয় না। কী করে যেন ওর এরকম একটা প্রতীতি জন্মাল। এরকম বিচ্ছিরি দেখতে জিনিসটা ওই নাকাতা-সানের ভেতরে থাকা সম্ভবই নয়। এটুকু আমিও বুঝি। এটা সম্ভবত কোথাও থেকে উদয় হয়ে, নাকাতা-সানের ভেতর থেকে বেরিয়ে, শুধু সেই প্রবেশপথের ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছে। পছন্দমত সময়ে এসে, নাকাতা-সানকে সুবিধেমত প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহার করে নিচ্ছে মাত্র। নাকাতা-সানকে তো এভাবে ব্যবহৃত হতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেওয়া যায় না। সুতরাং যেভাবে হোক এটাকে আমার নিকেশ করে ফেলতেই হবে। কালো বেড়াল তোরো যেটা বলেছিল, 'অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে, লক্ষ্য স্থির রেখে অবিচলিতভাবে শেষ করে দাও'।

যা থাকে কপালে করে ও নাকাতার পাশে গিয়ে, সেই সাদা জিনিসটার মাথা লক্ষ্য করে মাছ কাটার ছুরিটা বসিয়ে দিল। টেনে বের করে নিয়ে, আবার বসিয়ে দিল। বারবার ওই একই জিনিস করে গেল। কিন্তু ছুরি বসিয়ে দেওয়ায় প্রায় কোনো বাধাই আসছিল না। ঠিক যেন নরম কোনও সবজিতে ছুরি চালানোর মত কুচকুচ করে একটা অনুভূতি মাত্র। পিচ্ছিল সাদা উপরিতলের নিচে কোনও মাংস নেই, হাড় নেই। নাড়িভুঁড়িও নেই, ঘিলুও নেই। ছুরিটা টেনে বের করে নিলে ক্ষতমুখ তক্ষুণি ভরাট হয়ে যাচ্ছে শ্লেষ্মায়। জায়গাটা থেকে রক্তও বেরোচ্ছে না, অন্য কোনও তরলও বেরোচ্ছে না। এটা একেবারেই বোধশক্তিহীন বলে তরুণের মনে হল। হোশিনো যতই আঘাত করুক, সাদামতো জিনিসটা তা একেবারে গ্রাহ্যই করছে না, নাকাতার মুখের ভেতর থেকে সড়াৎ সড়াৎ করে দিব্যি বাইরে বেরোতেই থাকছে।

হোশিনো মাছ কাটার ছুরিটা মেঝেতে ফেলে রেখে, লিভিংরুমে গিয়ে, টেবিলের ওপরে রাখা সোর্ডের মত দেখতে বড় সাইজের একটা ছুরি নিয়ে ফিরে এল। আর সেটা দিয়ে সাদা জিনিসটাকে তাক করে সর্বশক্তি দিয়ে একটা কোপ বসাল। সেই এক আঘাতে সাদা জিনিসটার মাথার কাছটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই, ভেতরে কিছুই নেই। বাইরেটার মতই সাদা কী এক পদার্থ দিয়ে ভর্তি। তা সত্ত্বেও বেশ ক'বার কোপ বসিয়ে, মাথার দিকটা শেষ অবধি আলাদা করে দেওয়া গেল। আলাদা হয়ে যাওয়া অংশটা মেঝের ওপর কিছুক্ষণ শামুকের মত শরীরটা আগুপিছু চাগিয়ে চাগিয়ে উঠতে থাকল বটে, একসময় মরে যাওয়ার মতই নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু এতেও বাকি শরীরটার এগিয়ে যাওয়া থামানো গেল না। ক্ষতমুখ তক্ষুণি শ্লেষ্মা দিয়ে ভরাট করে, ফাঁকা হয়ে যাওয়া অংশটা পূরণ করে ফেলে আবার আগের আকারে ফিরে গেল। আর, যেন কিছুই হয়নি এমনই অবিচলিতভাবে ওটা এগোতে থাকল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাদা জিনিসটা নাকাতার মুখ থেকে বেশ প্রত্যয়ীভাবে বেরিয়ে এসে, মোটামুটি পুরো চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল। দৈর্ঘ্যে পুরোটা এক মিটারের কাছাকাছি, ল্যাজ আছে। শেষ অবধি ল্যাজটির সৌজন্যে সামনেটা আর পিছনটার মধ্যে দেখে তফাৎ করা যায়। স্যালামান্ডারের মত ছোট, মোটা ল্যাজ। একেবারে পিছনদিকে হঠাৎ করেই সরু হয়ে গিয়েছে। পা নেই। চোখ নেই, মুখ নেই, নাক নেই। কিন্তু নিশ্চিত করেই জেদ আছে। *ধুর, এটার শুধু জেদই আছে,* তরুণের মনে হল। কোনও যুক্তিটুক্তি ছাড়াই ও সেটা বুঝল। শুধু যখন স্থান পরিবর্তন করে, এককেটা পরিস্থিতিতে এটা এরকমই কোনও একটা আকার নেয়। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ভয়ানক শীতল স্রোত নেমে গেল যেন। যে করেই হোক এটাকে নিকেশ করতে হবে।

তরুণ এবারে হাতুড়িটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখল। কিন্তু সেও খুব একটা ফলপ্রদ হল না। লোহাটা দিয়ে মারতেই, সেই অংশটা গভীরভাবে বসে গিয়ে, খোঁদলটা নরম আবরণটুকু আর শ্লেষ্মা দিয়ে ভরে দিয়ে, ওটা আবার আগের আকৃতিতে ফিরে যাচ্ছে। ছোট একটা টেবিল নিয়ে এসে, তার পায়াটা দিয়ে সাদা জিনিসটাতে আঘাত করতে থাকল। কিন্তু যত জোরেই মারুক, সেই সাদা জিনিসটার গতিরোধ করতে পারা গেল না। কখনোই দ্রুত নয়, অলস সাপের মতো শরীরটা মুচড়ে মুচড়ে স্থিরগতিতে পাশের ঘরের প্রবেশপথের পাথরটার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল।

কোনও প্রাণীর সঙ্গেই এটার কোনও মিল নেই, তরুণের মনে হল। কোনও অস্ত্রেই এটাকে নিকেশ করা যাবে না। বিদ্ধ করার মত হৃদপিন্ড নেই, টিপে ধরে শ্বাসরোধ করার মত গলাও নেই। কী করা যায় আদৌ? তবে যাই হোক না কেন, এটাকে প্রবেশপথে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। কেননা এটা একটা অশুভ কিছু। কালো বেড়াল তোরো বলেছিল, 'একপলক দেখলেই বুঝে যাবে'। সেরকমই। সত্যিই একপলক দেখলেই বোঝা যায়। এটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

লিভিংরুমে ফিরে গিয়ে অস্ত্র হতে পারে এমন জিনিস খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর হঠাৎ করেই পায়ের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাছে পাথরটার দিকে চোখ পড়ে গেল। প্রবেশপথের পাথর। এটা দিয়ে তো থেঁতলে দেওয়া যেতে পারে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে পাথরটাতে সচরাচরের তুলনায় একটু লাল আভা ধরেছে বলে দেখে মনে হল। তরুণ শরীর ঝুঁকিয়ে, পরখ করতে ওটাকে তোলার চেষ্টা করে দেখল। পাথরটা ভয়ানক ভারি হয়ে গেছে, একচুলও নড়ানো গেল না।

"আরে, তুমি তো প্রবেশপথের পাথর হয়ে গেছ দেখছি", তরুণ বলে, "বলছি যে, ওটা এখানে এসে পড়ার আগেই তোমাকে দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারলে, ওটা আর ভেতরে ঢুকতে পারবে না।"

তরুণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পাথরটা তুলতে গেল। কিন্তু যথারীতি, নড়াতেই পারল না।

"নড়াতেই পারছি না", জোরে শ্বাস নিতে নিতে তরুণ পাথরটাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আরে, পাথর-কুন, তুমি তো আগের বারের চেয়েও আরো ভারি হয়ে গেছ দেখছি। অন্ডকোষ বেরিয়ে এসে খুলে পড়ে যাওয়ার মতই ভারি!"

পেছনে সেই খচমচ শব্দটা হয়েই যাচ্ছে। সাদামত জিনিসটা স্থিরগতিতে এদিকে এসে পড়ছে। আর বেশি সময় বাকি নেই।

"আরেকবার চেষ্টা করে দেখব", বলে তরুণ ডানহাতটা বাড়াল। তারপর মরীয়া হয়ে গভীরভাবে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিয়ে, দমবন্ধ করল। মনোযোগ এক জায়গায় নিবদ্ধ করে পাথরটার একদিকে দুহাত লাগাল। এভাবে তুলতে না পারলে, আর অন্য উপায় নেই। এই এখানে হোশিনো-কুন, নিজের উদ্দেশেই বলে উঠলো তরুণ। এবারেই হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। ওরই একদিন কি আমারই একদিন। এরপর দেহের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে, হুঙ্কার সহকারে পাথরটাকে তুলতে গেল। একটুখানি কেবল উঠল। আরেকবার শক্তি প্রয়োগ করে, ওটাকে মেঝে থেকে বিচ্ছিন্ন করার মত করে তুলতে গেল।

মাথার ভেতরটা একদম সাদা হয়ে গেল। দু'হাতের পেশিগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি হল। অন্ডকোষ দু'টো আগেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেঝেয় পড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু পাথর সরল না। নাকাতা-সানের কথা ভাবল ও। এই পাথরটা দিয়ে খোলা, বন্ধ করতে গিয়েই সম্ভবত নাকাতা-সানের প্রাণটা অকালে গেল। যে করেই হোক, নাকাতা-সানের হয়ে কাজটা শেষ অবধি সম্পন্ন করতেই হবে। সেই ক্ষমতা তোমাতে বর্তাবে, কালো বেড়াল তোরো বলেছিল। শরীরের মধ্যে পেশিগুলো তাজা রক্তের যোগান চাইছে। সেই রক্ত তৈরি করে দিতে প্রয়োজনীয় টাটকা বাতাস চাইছে ফুসফুস। কিন্তু বাতাস টানতে পারছে না। বুঝতে পারল যে নিজেই মৃত্যুর যারপরনাই সন্নিকটে চলে গেছে। চোখের সামনে শূন্যতার এক অতল গহ্বর বিস্তৃত হচ্ছে। তবু তরুণ আরেকবার যথাসাধ্য শক্তি সংহত করে পাথরটাকে নিজের দিকে টান মারল। পাথরটা কোনোক্রমে একটু উঠে, বিরাট শব্দ করে, মেঝেতে উলটে পড়ল। মেঝেটা দুলে উঠল সেই সংঘাতে। জানালার কাচের পাটগুলো ঠিনঠিন করে কেঁপে কেঁপে উঠল। অবিশ্বাস্য ওজন। তরুণ ওখানে বসে পড়ে বড় করে শ্বাস ফেলল।

“দিব্যি করেছ, হোশিনো-কুন”, একটু পরে তরুণ নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলে।

একবার প্রবেশপথটা বন্ধ হয়ে যেতেই সেই সাদা জিনিসটাকে শেষ করে দেওয়া সহজ হয়ে পড়ল। গন্তব্যস্থল অবরুদ্ধ। সাদা জিনিসটাও সেটা জানত। ওটা তখন আর এগোন থামিয়ে দিয়ে, লুকোনোর জায়গা খুঁজতে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক করতে লাগল। নাকাতার মুখের ভেতরে ফিরে যাবে বলে ভাবছিল হয়তো। কিন্তু পালানোর মত শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। তরুণ দ্রুতপায়ে ওটার পেছনে ধেয়ে গিয়ে সোর্ডের মত ছুরিটা দিয়ে কয়েক টুকরো করে ফেলল। তারপর টুকরো হয়ে যাওয়া জিনিসটাকে আরো ছোট ছোট টুকরো করে ফেলল। সেই সাদা কুচিগুলো মেঝের ওপর কিছুক্ষণ মোচরাচ্ছিল বটে, একসময় শক্তি হারিয়ে নড়াচড়া বন্ধ করল। শক্ত, গোল গোল হয়ে গিয়ে মরে গেল। ওদের শরীর থেকে নির্গত তরলে কার্পেটটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে চকচক করছিল। সেইসব মৃতবস্তু হোশিনো ডাস্টপ্যান দিয়ে জড়ো করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ময়লা ফেলার থলেয় ফেলে, থলের মুখ দড়ি দিয়ে আঁট করে বেঁধে, সেটা আবার অন্য একটা থলেয় ভরল। সেই থলিটার মুখও আঁট করে বাঁধল। তারপর দেরাজের ভেতর থেকে পুরু কাপড়ের থলে বের করে, তার ভেতরে ভরল। এটুকু করেই, প্রাণটা যেন বেরিয়ে গেছে এভাবে মেঝেয় উবু হয়ে বসে পড়ে, বড়ো করে শ্বাস নিতে থাকল। শ্বাসের সঙ্গে ওর কাঁধ নামছিল উঠছিল। হাত দু'টো থরথর করে কাঁপছিল। কিছু একটা বলে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা ঠিকমত ভাষা খুঁজে পেল না।

“দারুণ করে দেখিয়েছ, হোশিনো-কুন”, একটু পরে নিজেকে উদ্দেশ্য করেই বলল।

সাদা জিনিসটাকে আক্রমণ করতে গিয়ে, পাথর উলটে দিতে গিয়ে হয়তো এমন শব্দ হয়েছে, বাড়িটার অন্য বাসিন্দারা জেগে গিয়ে পুলিশকে ফোনটোন করেছে কিনা এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ল তরুণ। কিন্তু কপাল ভাল যে সেরকম কিছু ঘটেনি। সাইরেনের আওয়াজও পাওয়া গেল না, কেউ দরজায় টোকাও দিল না। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের পদার্পণ ঘটলে কথার আর শেষ থাকবে না।

টুকরো টুকরো করে থলের মধ্যে ভরা সাদা জিনিসটা এরমধ্যে যে প্রাণ ফিরে পাবে না, তা হোশিনোও জানে। ওটার এখন আর যাওয়ার জায়গা নেই। কিন্তু সাবধানের মার নেই। রাত ভোর হলে কাছেই সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়ে ভাল করে পুড়িয়ে ফেলবে। একেবারে ছাই করে ফেলতে হবে। আর সেটা হয়ে গেলে নাগোইয়া ফিরে যাবে।

চারটের কাছাকাছি বাজে তখন। একটু পরেই রাত ভোর হয়ে যাবে। বেরিয়ে পড়ার সময়। নিজের বস্টন-ব্যাগে জামাকাপড় ভরে নিল তরুণ। সাবধানতার প্রয়োজনে সান-গ্লাস, চু-নিচি ড্রাগনসের টুপি, সব ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিল। এতকিছুর পরে পুলিশে ধরলে আর রক্ষা নেই। আগুন ধরানোর জন্য স্যালাড অয়েলের বোতল নিয়ে নিল। মনে করে 'তাইকোও ট্রায়ো'-র সিডিও ব্যাগে ভরে নিল। তারপর সবশেষে নাকাতা যে খাটে শোয়ানো, সেখানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেল। এয়ারকন্ডিশনার তখনও সবচেয়ে জোরে চালানো আছে, ঘরটা ঠান্ডায় হিম হয়ে আছে।

"এই যে, নাকাতা-সান, আমি এবার যাচ্ছি", তরুণ বলে, "বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এখানে তো চিরদিন থেকে যাওয়া যাবে না। স্টেশনে পৌঁছে পুলিশকে ফোন করে কাকুর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করব। পরেরটুকু মামাদের দয়ার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। এর পরে আর দেখা হবে না যদিও, কাকুর কথা আমি ভুলব না। ভুলে যাব ভাবলেও অত সহজে ভুলতে পারব না।"

এয়ারকন্ডিশনারটা খটাং করে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

"আমার মনে হয়", তরুণ বলে চলে, "এখন থেকে, যখনই কিছু একটা হবে, প্রত্যেকবারই, নাকাতা-সান হলে এই সময় কী বলতেন, নাকাতা-সান হলে কী করতেন, আলাদা করে ভাবব। যে কারণেই হোক, এরকমই মনে হচ্ছে। এটা কিন্তু বেশ বড় কথা বলেই আমার মনে হয়। অর্থাৎ একদিক থেকে দেখলে, নাকাতা-সানের একটা অংশ আমার মধ্যে এখন থেকে বেঁচে থাকবেন। সত্যি বলতে কি, খুব একটা উপযুক্ত আধার আমি নই যদিও, তবে কিছুই না হওয়ার চেয়ে এটা ভাল হয়তো।"

কিন্তু যার কাছে এসব কথা বলা, সে তো নাকাতার খোলসটুকুর বেশি কিছু নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, অনেক আগেই, অন্য কোথাও প্রস্থান করেছেন। তরুণও সেটা ভালই জানে।

"আর, এই যে পাথর-কুন", পাথরকেও বলতে থাকে তরুণ। ওটার ওপরে হাত বোলায়। পাথর আবার সাধারণ বস্তু হয়ে গেছে। ঠান্ডা, রুক্ষ।

"আমি এবার চললাম। এবার নাগোইয়ায় ফিরব। নাকাতা কাকুর মতই তোমার ব্যাপারটাও মনে হচ্ছে মামাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সত্যি বলতে কি, আগের সেই জিনজাতে ফিরিয়ে দিলেই ভাল হত, কিন্তু হোশিনো-কুনের স্মৃতিশক্তি ভাল নয়, কোন জিনজা সেটা একদমই মনে করতে পারছি না। এটা ঠিক নয়, তবু মাফ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করে দিও। শাপটাপ দিও না। সবটাই কর্নেল স্যান্ডার্সের কথা অনুযায়ী করেছি। তাই শাপ দিতে হলে, ওকেই দিও বরং। তবে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লেগেছিল, পাথর-কুন। তোমার কথাও ভুলব না।”

এরপর পুরু হিলের নাইকের স্নিকার পরে, সেই বাড়িটা থেকে তরুণ বেরোল। দরজায় তালা দিল না। ডানহাতে নিজের বস্টন-ব্যাগটা নিয়ে, বাঁহাতে নিল সেই সাদা জিনিসটার মৃতাবশেষ ভরা কাপড়ের থলেটা।

“ভদ্রমহোদয়গণ, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো”, ফর্সা হয়ে আসা পূবের আকাশের দিকে তাকিয়ে ও বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৯

পরদিন সকালে, ন'টার একটু পরে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ এগিয়ে আসতে শুনে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু পরেই গাড়ির উচ্চতা বাড়িয়ে দেওয়া জবরদস্ত টায়ার লাগানো ছোট একটা ট্রাক দেখা গেল। ফোর-হুইল ড্রাইভের ডাটসান, অন্ততপক্ষে গত ছ'মাসে একবারও ধোয়া হয়েছে বলে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না। লাগেজ ক্যারিয়ারে, ভালরকম ব্যবহার হয়েছে এমন দু'খানা লং-সার্ফবোর্ড চাপানো। ট্রাকটা এসে কেবিনের সামনে থামল। ইঞ্জিন থামতেই, চারপাশের শান্ত ভাবটা ফিরে এল। দরজা খুলে নেমে এলেন দীর্ঘদেহি একজন লোক। বড়ো সাইজের সাদা টি-শার্টের সঙ্গে খাকি হাফপ্যান্ট আর গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া স্নিকার পরা। তেলের দাগ লাগা টি-শার্টে NO FEAR লেখা। সম্ভবতঃ তিরিশের কাছাকাছি বয়েস। চওড়া কাঁধ, ত্বকের বর্ণ অবিমিশ্র রোদে পোড়া, গালে তিন দিনের না কামানো দাড়ি। কান ঢেকে যাওয়ার মত লম্বা চুল। অনুমান করলাম, ইনিই কোচিতে সার্ফ-শপ দেওয়া ওশিমার সেই দাদা হয়তো।

"এই তো", উনি বললেন।

"কোন্নিচিবা", আমি বললাম।

উনি হাত বাড়িয়ে দেওয়ায়, আমরা পর্চের ওপরেই করমর্দন করলাম। বিশালাকার শক্তিশালী হাত। আমার অনুমান সঠিক। ওশিমার দাদাই। বললেন যে ওঁকে সবাই 'সাদা' বলে ডাকে। ধীরেসুস্থে শব্দচয়ন করে কথা বলেন। কোনও তাড়াহুড়ো নেই। যেন, হাতে যথেষ্ট সময়ের কোনও অভাব নেই।

"তাকামাৎসু থেকে ফোন পেয়ে এই অবধি এসেছি তোমাকে নিতে, সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাব", উনি বললেন, "মনে হয়, কী একটা কাজ আছে, দেরি করা চলবে না"।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"কাজ আছে, দেরি করা চলবে না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কী কাজ, তা জানি না।"

"এতটা পথ আসতে হল আপনাকে", আমি বললাম।

"এর জন্য বিব্রত হওয়ার দরকার নেই", উনি বলেন, "এক্ষুনি রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হতে পারবে?"

"পাঁচ মিনিট সময় পেলে পারব।"

আমি যতক্ষণ জিনিসপত্র গুছিয়ে রুকস্যাকে ভরছি, ততক্ষণ উনি শিস দিতে দিতে দরজা জানালা বন্ধ করায় হাত লাগালেন। জানালা বন্ধ করে, পর্দা টেনে দিয়ে, গ্যাসের মুখ চেক করে, অবশিষ্ট খাবার দাবার গুছিয়ে নিয়ে, সিঙ্কটা অনায়াসে ধুয়ে ফেললেন। এই কেবিনটাকে যে ওঁর শরীরেরই একটা বর্দ্ধিত অংশ বলে বিবেচনা করেন, এই প্রত্যেকটা কাজে সেটা টের পাওয়া গেল।

"ভাই তোমাকে বেশ পছন্দ করে বলে মনে হয়", ওশিমার দাদা বলেন, "খুব বেশি লোককে ভাই পছন্দ করে না। স্বভাবটা একটু কঠোর।"

"আমার প্রতি খুব সদয়—"।

সাদা-সান মাথা সামনে ঝোঁকান, "সদয় হবে ঠিক করলে, খুবই সদয় হয়ে ওঠে", ছোট করে ওঁর মন্তব্য রাখলেন।

ট্রাকের হেলপারের সীটে উঠে বসে, রুকস্যাকটা পায়ের কাছে রাখলাম। সাদা-সান ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিলেন। শেষবারের মত জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাইরে থেকে কেবিনটা আরেকবার ধীরেসুস্থে পরিদর্শন করে নিয়ে, তারপর অ্যাকসিলারেটারে পা দিলেন।

"আমাদের দাদা ভাইয়ের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক মিলের মধ্যে একটা হল এই পাহাড়ি কেবিনটার ব্যাপারে", অভ্যস্ত হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় নামতে নামতে সাদা-সান বললেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"দু'জনেই, মাঝেমাঝে যখন মর্জি হয়, এই পাহাড়ি কেবিনে এসে হাজির হয়ে, একা একা ক'দিন কাটিয়ে যাই।"

নিজের মুখ দিয়ে বেরুনো কথাটাই কিছুক্ষণ বিবেচনা করে নিয়ে, তারপর আবার কথাবার্তা শুরু করলেন।

"আমাদের, দাদা আর ভাইয়ের দু'জনের কাছেই, চিরকাল এটা একটা খুব বিশেষ জায়গা, এখনো তাই হয়ে আছে। এখানে এলেই, বেশ একটা বল পাই। খুবই শান্তিপূর্ণ বল অবশ্য। বুঝতে পারছ তো, কী বলতে চাইছি?"

"মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি", আমি বলি।

"ভাই বলছিল যে তুমি বুঝতে পারবে", সাদা-সান বলেন, "যে লোক বুঝবে না, সে কোনোদিন বুঝবে না।"

রঙ উঠে যাওয়া কাপড়ের তৈরি সীটে সাদা কুকুরের লোম লেগে আছে অনেক। কুকুরের গন্ধ মেশানো সমুদ্রের লোনা জলের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। আর সার্ফ-বোর্ডের ওপরে লাগানো ওয়াক্সের গন্ধ। সিগারেটের গন্ধ। এয়ারকন্ডিশনিং কমানো বাড়ানোর নবটা খুলে গেছে, নেই। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই স্তূপ হয়ে আছে। গাড়ির দরজার পকেটে ঢাকনা ছাড়া ক্যাসেট-টেপ এলোমেলোভাবে ডাঁই করা আছে।

"বেশ কয়েকবারই বনের ভেতরে ঢুকেছিলাম", আমি বললাম।

"অনেকটা ভেতরে?"

"হ্যাঁ", আমি বলি, "ওশিমা-সান যদিও সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে বেশি ভেতরে যাওয়া চলবে না—"

"কিন্তু তুমি অনেকটা ভেতর অবধি গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ", আমি বলি।

"আমিও একবার জেদ করে, অনেকটা ভেতর অবধি গিয়েছিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা সে দশ বছরেরও বেশি আগের কথা অবশ্য।"

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে, স্টিয়ারিং-এ রাখা হাত দু'টোর ওপর মনোযোগ স্থাপন করলেন উনি। দীর্ঘ একটা ঘোরানো রাস্তায় চলেছি। একটা পাথরের চাঁইয়ের নীচ দিয়ে যেতে যেতে মোটা টায়ার থেকে নুড়ি পাথর ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে কখনো কখনো কাক দেখা যাচ্ছিল। গাড়ি ওদের কাছে এসে পড়লেও সরে না গিয়ে, আমাদের চলে যাওয়া এমন ভাবে দেখছিল যেন খুবই বিরল কিছু।

"সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল", সাদা-সান এমনভাবে জানতে চাইলেন যেন কিছুই না। যেন সময় জানতে চাইছেন।

"রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায় যে দু'জন সৈনিক?"

"হ্যাঁ", সাদা-সান বলেন। তারপর পাশ থেকে একঝলক আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন, "সেই অবধি গিয়েছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ", আমি উত্তর দিই।

ডানহাত দিয়ে হালকা করে স্টিয়ারিং সামলাতে সামলাতে, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। কী ভাবছেন, সেটা আর পুরোটা বলেন না। অভিব্যক্তিও বদলায় না।

"সাদা-সান", আমি বলি।

"হুঁ", উনি বলেন।

"বছর দশেক আগে যখন ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন কী করেছিলেন", আমি প্রশ্ন করি।

"ওই সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হয়ে, কী করেছিলাম সেখানে", আমার প্রশ্নটাই উনি ফের আরেকবার করেন।

মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে নিয়ে, তারপর উত্তরের অপেক্ষায় থাকি। ব্যাক-মিরারে পেছন দিকে কী যেন দেখে নিলেন উনি, তারপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আবার সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

"সেই গল্প আমি আজ অবধি কারুর সঙ্গে করিনি", উনি বলেন, "ভাইকেও বলিনি। ভাইই বল আর বোনই বল, যেকোনোটাই বলতে পার, ভাইই না হয়। ভাই কিন্তু সৈনিকদের গল্প একেবারেই জানে না।"

আমি নীরবে সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"মনে হয় না এর পরেও সেকথা আর কারুকে বলব বলে। এমনকি তোমার কাছেও। আর তুমিও একথা এরপরে আর কারুকে বলবে বলে মনে হয় না। এমনকি আমাকেও। যা বলছি তার অর্থ বুঝতে পারছ তো?"

"মনে হয় বুঝতে পারছি", আমি বলি।

"সেটা কী বলে মনে হয় তোমার?"

"যেহেতু ভাষার মাধ্যমে সে জিনিস ঠিক মত বুঝিয়ে বলা যায় না। কেননা, প্রকৃত উত্তরটা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।"

"ঠিক তাই", সাদা-সান বলেন, "ওরকমই। সুতরাং, ভাষায় ঠিকমত বুঝিয়ে বলা যায় না এমন জিনিস, একেবারে না বলাই ভাল।"

"এমনকি নিজের কাছেও", আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ। এমনকি নিজের কাছেও", সাদা-সান বললেন, "এমনকি নিজের কাছেও কিছুই বুঝিয়ে না বলাই ভাল।"

সাদা-সান আমাকে কুল-মিন্ট দেওয়া একটা চ্যুইংগাম অফার করলেন। ওঁর থেকে নিয়ে খেতে থাকলাম।

"সার্ফিং করেছ কখনো", উনি জানতে চাইলেন।

"করিনি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সুযোগ হলে এবার শিখিয়ে দেব", উনি বলেন, "অবশ্য তোমার ইচ্ছে হলে তবেই। কোচির সমুদ্রের ধারে খুব ভাল ঢেউ ওঠে। তেমন বেশি লোকজনও হয় না। সার্ফিং জিনিসটা, দেখে যা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরতা আছে এমন একটা স্পোর্ট। সার্ফিং করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে না যাওয়ার কথাটা মনে রাখি। তা সে যতই উদ্দাম হয়ে উঠুক না কেন।"

পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন, মুখে পুরে, ড্যাশবোর্ডের লাইটার দিয়ে ধরালেন।

"এটাও ভাষার মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা যায় না এমনই একটা জিনিস। উত্তর হ্যাঁ-ও নয়, আবার না-ও নয়, সেরকম একটা ব্যাপার", উনি বলেন।

এরপর চোখটা কুঁচকে, ধীরে ধীরে ধোঁয়াটা জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দেন।

বললেন, "হাওয়াইতে টয়লেট ব্যোল বলে একটা স্পোর্ট আছে। এগিয়ে আসা ঢেউ আর চলে যেতে থাকা ঢেউ পরস্পর ধাক্কা খেয়ে বিশাল ঘূর্ণি তৈরি হয়। কমোডের জলের ঘূর্ণির মতই পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে থাকে। তাই ওয়াইপ আউট করে একবার নীচে টেনে নিলে কিছুতেই ভেসে থাকা যায় না। ঢেউয়ের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, এমনও হতে পারে যে আর ভেসে উঠতেই পারলে না হয়ত। অথচ তোমাকে সমুদ্রের নীচে ঢেউয়ের চাপ আর আঘাতের মধ্যে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। অস্থির হয়ে যুঝে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। উলটে শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসবে। সত্যি বলছি, সেদিক দিয়ে দেখলে, এরকম ভীতিজনক ব্যাপার আর হয় না। কিন্তু একবার অন্তত সেই আতঙ্ক অতিক্রম করে না এলে সার্ফার হিসেবে পরিণত হয়ে ওঠা হবে না। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে, তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে, সেটার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া। ঘূর্ণির নিচে গিয়ে নানা কথা মনে আসে, এক অর্থে মৃত্যুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে, অকপটে কথাবার্তাও হয়।"

যেখানে সীমানার বেড়া, সেখানে এসে ট্রাক থেকে নেমে, গেট বন্ধ করে তালা দিলেন। কয়েকবার গেটটায় ঝাঁকি দিয়ে, খুলে যে যাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না সেটা দেখে নিলেন।

এরপর আমরা টানা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। FM রেডিওর গানের প্রোগ্র্যাম চালিয়ে দিয়ে, উনি গাড়ি চালাতে থাকলেন। যদিও বুঝতেই পারছিলাম যে উনি তার কিছুই শুনছেন না। যেন কিছু একটার চিহ্ন হিসেবে চালিয়ে রেখেছেন। টানেলে ঢোকার পর সম্প্রচার ব্যাহত হয়ে, শুধু ঘষঘষে এলোমেলো আওয়াজ, কিন্তু তাতে ওঁর একেবারেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এয়ারকন্ডিশনারটা নষ্ট হয়ে আছে, হাই-স্পীডের রাস্তায় প্রবেশ করেও জানালাটা আগাগোড়া খোলা রয়েছে।

"সার্ফিং শিখতে চাইলে, আমার ওখানে আসতে পার", খাঁড়িটা যেখানে এসে চোখে পড়ে, সেই অঞ্চলে এসে সাদা-সান বললেন। "ফাঁকা ঘর আছে, খুশিমত থাকতে পারবে।"

"ধন্যবাদ", আমি বললাম, "যাব কখনো। কবে যে হবে তা জানি না।"

"ব্যস্ত?"

"কিছু কিছু জিনিসের একটা সমাধা করে নিতে হবে।"

"সে তো আমারও আছে", সাদা-সান বলেন, "গুমোর দেখিয়ে বলছি না কিন্তু!"

তারপর আবার দীর্ঘক্ষণ আমরা আর মুখ খুললাম না। উনি ওঁর সমস্যা নিয়ে ভাবলেন, আমি ভাবলাম আমার সমস্যা নিয়ে। উনি স্থিরভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে, স্টিয়ারিঙের ওপরে বাঁ হাত রেখে, মাঝেমাঝে সিগারেট টানছিলেন। ওশিমার সঙ্গে ওঁর প্রভেদ হল, উনি কখনও স্পীড তোলেন না। ডানহাতের কনুই জানালার ফ্রেমে রেখে, আইনমাফিক গতিতে ধীরেসুস্থে শ্লথগতির লেন ধরে চালান। সামনে সত্যিই খুব ধীরে যাওয়া কোনও গাড়ি পড়ে গেলেই শুধু, স্পীড বাড়িয়ে লেন পালটে, সাবধানে অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে, আবার অবিলম্বেই আগের লেনে ফিরে আসছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সাদা-সান কি অনেকদিন ধরেই সার্ফিং করছেন", আমি জানতে চাইলাম।

"তা অবশ্য করছি", উনি বললেন। আবারও নীরবতা। আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটাই যখন ভুলতে বসেছি, তখন উত্তরটা শেষ অবধি এল।

"হাইস্কুলের সময় থেকেই সার্ফিং করে আসছি। নিজেই এটা ঠিক করেছিলাম। বছর ছ'য়েক আগে থেকে সিরিয়াসলি করছি। টোকিওতে বড় একটা বিজ্ঞাপণ সংস্থায় চাকরি করতাম। কাজটা পছন্দ হচ্ছিল না বলে ছেড়ে দিয়ে, এখানে ফিরে এসে, সার্ফিং শুরু করলাম। জমানো টাকা দিয়ে, মা-বাবার থেকে টাকা ধার নিয়ে, সার্ফ-শপ খুললাম। একা যেহেতু, কিছুটা পর্যন্ত পছন্দসই কাজ করা যায়।

"শিকোকুতে ফিরতে চাইছিলেন?"

"সেটাও ছিল", উনি বলেন। "কাছেই সমুদ্র আর পাহাড় না থাকলে মনটা বসে না। একটা মানুষ, খানিকটা অন্তত, কোথায় জন্মে বেড়ে উঠেছে, তার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। চিন্তাধারা, অনুভূতিগুলো, এগুলো সম্ভবত স্থলভাগটা কেমন, তাপমাত্রা, বাতাসের অভিমুখ, এসবের সঙ্গে যুক্ত। তুমি জন্মেছিলে কোথায়?"

"টোকিওতে, নাকানো ওয়ার্ড অঞ্চলে।"

"নাকানোতে ফিরতে চাও?"

আমি মাথা নাড়ি, "না।"

"কেন?"

"কেননা, ফেরার কোনও কারণ নেই।"

"ওহ্, আচ্ছা", উনি বলেন।

"স্থলভাগটা যেমন, বা বাতাসের অভিমুখের সঙ্গে ততটা যুক্ত নই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলেই মনে হয়”, আমি বলি।

“তাই”, উনি বলেন।

এরপর আবার আমরা নীরব হয়ে পড়ি। কিন্তু এই নীরবতা সাদা-সানের যেন ঠিক ভাল লাগছিল না। আমরও আলাদা করে ভাল বিশেষ লাগছিল না। কোনও চিন্তা ছাড়াই অন্যমনস্কভাবে রেডিওর মিউজিক শুনছিলাম। উনি পুরোটাই রাস্তায় সামনের দিকে তাকিয়ে। সবশেষে আমরা হাইস্পীড রাস্তা থেকে নেমে উত্তরদিক করে তাকামাৎসু শহরে ঢুকলাম।

দুপুর একটার কিছু আগে কোওমুরা পাঠাগারে পৌঁছলাম আমরা। সাদা-সান আমাকে কোওমুরা পাঠাগারের সামনে নামিয়ে দিয়ে, নিজে গাড়ি থেকে না নেমেই, ইঞ্জিন না থামিয়ে, সোজা কোচিতে ফিরে গেলেন।

“ধন্যবাদ”, আমি বললাম।

“আবার দেখা করা যাক এরমধ্যে কখনো”, উনি বললেন।

তারপর জানলা দিয়ে হাত বের করে সংক্ষেপে একবার মাত্র হাত নেড়ে, পুরু টায়ারে ক্যাঁচ করে আওয়াজ তুলে চলে গেলেন। বিশাল ঢেউ, ওঁর নিজের জগৎ, ওঁর নিজের সমস্যার মধ্যে ফিরে গেলেন।

আমি রুকস্যাক ঘাড়ে নিয়ে, লাইব্রেরির গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। সুন্দর করে কেয়ারি করা বাগানের গাছপালার গন্ধ নাকে গেল। মনে হল যেন কত মাস আগে লাইব্রেরিটা শেষবার দেখেছি। কিন্তু ভেবে দেখলে, মাত্র চার দিন কেটেছে তার পরে।

কাউন্টারে ওশিমা বসে। যেটা সচরাচর কখনোই করে না, গলায় নেকটাই বাঁধা। ধবধবে সাদা বাটন-ডাউন শার্টের সঙ্গে সর্ষে আর সবুজের স্ট্রাইপ দেওয়া টাই। হাতা কনুই অবধি গোটানো। শার্টের ওপরে কিছু পরা নেই। সামনে যথারীতি কফির কাপ রাখা, ডেস্কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওপর তীক্ষ্ণ করে কেটে রাখা দু'টো লম্বা পেনসিল পাশাপাশি।

"এই যে", ওশিমা বলে। তারপর অন্যান্য সময়ের মতই হাসে।

"কোন্নিচিবা", আমি শিষ্টতাসূচকভাবে বলি।

"দাদা এই অবধি পৌঁছে দিল তো?"

"হ্যাঁ।"

"কথাবার্তা বেশি বলেনি নির্ঘাত", ওশিমা বলে।

"খানিকটা বলেছেন", আমি বলি।

"তাহলে তো ভালই হয়েছে। তোমার সৌভাগ্য। তেমন লোক হলে, পরিস্থিতি তেমন হলে, একটা কথাও বলেনি এমনও হয়েছে।"

"এখানে কী হল", আমি জানতে চাইলাম, "অবিলম্বে কী যেন প্রয়োজনের কথা হচ্ছিল!"

ওশিমা সামনে মাথা ঝোঁকায়, "তোমাকে বলা দরকার এমন কিছু কথা ছিল। প্রথমত, সাএকি-সান মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাকে। মঙ্গলবার বিকেলে, আমি গিয়ে দেখলাম দোতলার ঘরে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে মরে পড়ে আছেন। আকস্মিক মৃত্যু। দেখে মনে হল না কোনও কষ্ট পেয়েছেন বলে।"

আমি প্রথমে কাঁধ থেকে রুকস্যাকটা নামিয়ে, মেঝের ওপরে রাখলাম। তারপর কাছেই অফিসের একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

"মঙ্গলবার বিকেলে", আমি জানতে চাইলাম, "আজ শুক্রবার তো, তাই না?"

"হ্যাঁ, আজ শুক্রবার। সাএকি-সান মঙ্গলবারের ট্যুর শেষ করে মারা গেলেন। আরও আগেই তোমাকে জানানো উচিত ছিল হয়তো, আমিও ঠিকমত ভেবে উঠতে পারছিলাম না।"

চুপ করে চেয়ারে নিথর হয়ে বসে রইলাম। ওশিমা আর আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দু'জনেই অনেকক্ষণ কোনও কথা বলছিলাম না। আমি যেখানে বসা, সেখান থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছিল। ভাল করে পালিশ করা কালো রেলিং, ল্যান্ডিং-এর সামনের রঙীন কাঁচ। ওই সিঁড়ি আমার কাছে সর্বদাই গভীর অর্থবহ একটা জিনিস। ওটা দিয়ে উঠলেই সাএকি-সানের সঙ্গে দেখা করা যেত। কিন্তু এখন ওটা অর্থহীন মামুলি একটা সিঁড়ি হয়ে গেছে। উনি আর ওখানে নেই।

"আগেই যেটা বলেছি, সম্ভবত এটা আগে থেকেই স্থির করা ছিল", ওশিমা বলে। "আমিও জানতাম, উনিও জানতেন। বলাবাহুল্য, সত্যিই ঘটতে দেখলে তখন আর নেওয়া যায় না।"

এখানে খানিকটা বিরতি দিল ওশিমা। কিছু একটা বলা দরকার বলে মনে হল। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না।

"মৃতের শেষ ইচ্ছা অনুসারে অন্ত্যেষ্টি বলে কিছু হবে না", ওশিমা বলতে শুরু করে, "সেই কারণেই, শরীর ওই অবস্থাতেই দাহ করা হয়েছে। ওঁর উইল, দোতলার ঘরে ওঁর টেবিলের মধ্যে রাখা ছিল। মৃত্যুর পরে ওঁর যাবতীয় সম্পতি কোওমুরা পাঠাগার পরিচালন ট্রাস্টকে দান করার কথা লেখা আছে। আমার জন্য মঁ ব্লাঁ পেনটা স্মারক হিসেবে রেখে গেছেন। তোমার জন্য একটা অয়েলপেন্টিং। সমুদ্রতটে সেই ছেলেটার ছবিটা। নেবে তো?"

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাই।

"নিয়ে যাওয়ার সুবিধের জন্য প্যাক করে রাখা আছে।"

"ধন্যবাদ", আমি অবশেষে বলে উঠলাম।

"দ্যাখো, তামুরা কাফকা-কুন", ওশিমা বলে, একটা পেনসিল হাতে নিয়ে, অন্যান্য সময়ের মতই সেটা ঘোরাতে থাকে, "কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করব।"

"সাএকি-সান যে মারা গেছেন, আমি এভাবে বলার আগেই তুমি সম্ভবত জানতে, তাই না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি আরেকবার সামনে মাথা ঝোঁকাই, "জানতাম।"

"সেরকমই মনে হচ্ছিল", ওশিমা বলে। আর বড়ো করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "জলটল কিছু খাবে? সত্যি বলতে কি, মরুভূমির মত করে আছ মুখটা।"

"যদি দেন একটু", আমি বললাম। সত্যিই গলাটা ভয়ানক শুকিয়ে গিয়েছিল। ওশিমা বলাতে, প্রথম টের পেলাম সেটা।

ওশিমা জল নিয়ে এল, সেই বরফ দেওয়া জল একনিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললাম। মাথার ভেতরটা একটু ব্যথা করে উঠল। খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর ফের রেখে দিলাম।

"আর খাবে?"

আমি মাথা নেড়ে বারণ করলাম।

"এখন কী করবে বলে মনস্থ করেছ", ওশিমা প্রশ্ন করে।

"টোকিওতে ফিরে যাব বলে ভাবছি", আমি বললাম।

"টোকিওতে ফিরে কী হবে?"

"প্রথমেই পুলিশের কাছে গিয়ে এযাবৎ ঘটা যাবতীয় কিছু ওদেরকে বলব। না হলে এরপর থেকে কেবলই পালিয়ে বেড়াতে হবে। আর, হয়তো স্কুলে ফিরে যাওয়াও স্থির হবে। ফেরার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যতই হোক, জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত তো বাধ্যতামূলক শিক্ষা। ফিরে না গেলে চলবে না। তারপর ক'মাস কাটাতে পারলেই তো পাশ করে যাব, একবার পাশ করে গেলে, পরে সব কিছু পছন্দমত করা যাবে।"

"ওহ্, আচ্ছা", ওশিমা বলে। চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। "ঠিকই বলেছ, সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে।"

"ক্রমেই মনে হচ্ছিল যে সেটা করাই যায়।"

"পালিয়ে বেড়ালেও, কোথাও আর যাওয়াই হয় না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সম্ভবত", আমি বলি।

"তুমি বড় হয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে", ও বলে।

আমি মাথা নাড়ি। বলার মত কিছু পেলাম না।

ওশিমা পেনসিলের রাবারের অংশটা দিয়ে কপালের দু'পাশে ক'বার হালকা করে চাপ দিল। টেলিফোনটা বেজে ওঠা সত্ত্বেও, ও ওটা অগ্রাহ্য করল।

"আমরা সকলেই, নানা দামি জিনিস খুইয়ে চলেছি", টেলিফোনের আওয়াজটা বন্ধ হলে ও বলে। "খুব দামি সুযোগ, অথবা সম্ভাবনা, আর ফিরে পাওয়া যায় না এমন আবেগ। জীবনের সেটাও একটা অর্থ। কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে, মাথার মধ্যে বলেই তো মনে হয়, এইসব জিনিসগুলো স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্য ছোট ছোট ঘর আছে। লাইব্রেরির এই বুককেসগুলোর মত সব ঘর। আর আমাদের যাতে নিজেদের মনের সঠিক জায়গাগুলো জানা থাকে, এই ঘরগুলোর জন্য সার্চ-কার্ড তৈরি করে যেতে হয়। ঝাড়পোছ করা, বাতাস চলাচল করতে দেওয়া, ফুলদানির জল পালটে পালটে দেওয়াও প্রয়োজন হয়। এমনও বলা যায় যে তুমি চিরটা কাল তোমার নিজের লাইব্রেরিতেই জীবন কাটিয়ে দাও"

আমি ওশিমার হাতের পেনসিলটার দিকে চেয়ে থাকি। কথাগুলো আমার একদম ভাল লাগে না। কিন্তু আমাকে আরো কিছুদিন জগতের সবচেয়ে টাফ পনের বছরের ছেলে হয়ে থাকতে হবে। অন্ততপক্ষে সেরকমই ভাণ করে যেতে হবে। একবার বড়ো করে শ্বাস নিয়ে ফুসফুসে বাতাস ভরে, আবেগ টাবেগগুলো সব কোনোক্রমে ভেতরে ঠেলে পাঠিয়ে দিই।

"আবার কখনো কি এখানে ফিরে আসতে পারি", আমি জানতে চাই।

"নিশ্চয়ই", ওশিমা বলে। আর, পেনসিলটা কাউন্টারের ওপর রেখে দেয়। মাথার পেছনে হাত দু'টো জড়ো করে, আমার মুখের দিকে মুখোমুখি চেয়ে থাকে। "বলা হচ্ছে, এখন কিছুদিন নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি একাই এই লাইব্রেরিটা চালাব। হয়তো একজন সহকারিও দরকার হয়ে পড়বে। পুলিশ টুলিশ, স্কুল, এসবের একটা ব্যবস্থা করে ফ্রী হয়ে গেলে তখন ইচ্ছে করলে এখানে ফিরে আসতেও পার। এই শহর, এই আমি তো আর আপাতত কোথাও চলে যাচ্ছি না। মানুষের তো নিজের বলে একটা কোনো জায়গা থাকা দরকার। কমবেশী—"

"ধন্যবাদ", আমি বললাম।

"দোও ইতাশিমাশিতো, ও বলে।

"আপনার দাদাও বলছিলেন যে সার্ফিংটা শিখিয়ে দেবেন।"

"সে তো ভালই। দাদার পছন্দ হয় এমন লোক বেশি নেই", ও বলে, "সেদিক দিয়ে স্বভাবটা সুবিধের নয়!"

মাথা সামনে ঝোঁকাই আমি। আর হাসি। দাদা আর ভাইয়ের স্বভাবে বেশ মিল আছে।

"জান তো, তামুরা-কুন", ওশিমা উঁকি দিয়ে আমার মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে, "ভুলও হতে পারে, আমার মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম একটুখানি হলেও তোমাকে হাসতে দেখলাম"

"তা হতে পারে", আমি বললাম। আমি সত্যিই হাসছিলাম। লাল হয়ে গেলাম।

"টোকিওতে কবে ফিরছ?"

"এখনই ফিরব বলে ভাবছি।"

"সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করবে না? লাইব্রেরি বন্ধ করে, তারপর গাড়ি করে স্টেশনে পৌঁছে দিতাম।"

একটু ভেবে নিয়ে মাথা নাড়লাম। "ধন্যবাদ। কিন্তু সম্ভবত এখনই বেরিয়ে পড়া ভাল।†

ওশিমা সামনে মাথা ঝোঁকায়। ভেতরের ঘর থেকে সাবধানে

†ধন্যবাদ জানালে প্রত্যাভিবাদনে এটা বলার নিয়ম। মোটামুটি এর অর্থ, 'কী করে যে'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্যাক করে রাখা ছবিটা নিয়ে এল। তারপর 'সমুদ্রতটে কাফকা' রেকর্ডটাও জ্যাকেটে ভরে আমার হাতে দিল।

"এটা আমার তরফ থেকে প্রেজেন্ট।"

"ধন্যবাদ", আমি বলি্ "সবশেষে আরেকবার দোতলায় সাএকি-সানের ঘরটা একটু দেখতে চাই, অসুবিধে নেই তো?"

"একেবারেই নেই। যতখুশি দেখতে পার।"

"ওশিমা-সানও সঙ্গে আসবেন একটু?"

"আচ্ছা বেশ।"

দোতলায় উঠে আমরা সাএকি-সানের ঘরে ঢুকলাম। আমি ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওটার ওপরটা হাত দিয়ে আলতো করে স্পর্শ করলাম। দীর্ঘ সময় ধরে কত কী ওটা আত্মস্থ করেছে, সেকথা ভাবলাম। টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ওঁর সর্বশেষ চেহারাটা মনে ভেসে উঠল। তারপর মনে পড়ল, সবসময় জানালার দিকে পিঠ করে বসে মনোযোগ দিয়ে লেখালেখি করার ছবিটা। আমি সবসময় সাএকি-সানের জন্য কফি করে নিয়ে যেতাম। দরজা খোলা রেখে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, উনি মুখ তুলে আমাকে দেখে, সবসময় একইভাবে মৃদু হাসতেন।

"সাএকি-সান এখানে বসে কী লিখতেন", আমি জানতে চাইলাম।

"কী লিখতেন উনি, সেটা আমি জানি না", ওশিমা বলে, "একটাই কথা বলতে পারি যে উনি নানা গোপন কিছু ভেতরে গিলে নিয়ে, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।"

'নানা অনুমান আর ধারণা ভেতরে গিলে নিয়ে', আমি মনে মনে যোগ করি।

জানালা খোলা, জুন মাসের বাতাস সাদা লেসের পর্দার প্রান্ত নিঃশব্দে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সাগরের লোনা জলের মৃদু গন্ধ পাওয়া গেল। মনে পড়ল হাতে সমুদ্রের তীরে বালি স্পর্শ করার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অনুভূতি। টেবিলের সামনে থেকে সরে এসে, ওশিমার কাছে গিয়ে ওকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম। ওশিমার ছিপছিপে শরীরটাকে মনে হল যেন ভয়ানক পরিচিত। ওশিমা আমার চুলে নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

"জগতটা একটা মেটাফর, তামুরা কাফকা-কুন", আমার কানের কাছে মুখ এনে ওশিমা বলল। কিন্তু জানো তো, আমার কাছে, তোমার কাছেও, এই লাইব্রেরিটা কোনও কিছুর মেটাফর নয়। এই লাইব্রেরিটা শুধু, শেষ অবধি এই লাইব্রেরিটাই। তোমার আর আমার মধ্যে, এটুকুই শুধু পরিষ্কার করে বলে রাখতে চাই।"

"সে তো অবশ্যই", আমি বললাম।

"খুব সলিড, স্বতন্ত্র, বিশেষ একটা লাইব্রেরি। অন্য কোনও কিছু দিয়েই এর বিকল্প হয় না।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় জানাই।

"সায়োনারা, তামুরা কাফকা-কুন", ওশিমা বলে।

"সায়নারা ওশিমা-সান", আমি বলি, "টাইটা কিন্তু দারুণ!"

আমার থেকে একটু সরে গিয়ে, আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ও অল্প হাসে, "কেবল অপেক্ষায় ছিলাম, কখন এটা বলবে তুমি!"

রুকস্যাক কাঁধে চাপিয়ে স্টেশন অবধি হেঁটে গিয়ে, ট্রেনে চেপে তাকামাৎসু স্টেশন অবধি গেলাম। স্টেশনে কাউন্টারের জানালায় টোকিও যাওয়ার টিকিট কিনলাম। বেশ রাত হয়ে গেল টোকিও পৌঁছতে। আপাতত কোথাও একটা রাতটা কাটিয়ে, তারপর সম্ভব হলে নোগাতার বাড়িতে ফেরা যাবে। কেউ থাকে না এমন বিশাল বাড়িতে ফিরে, আমি আবার সেখানে একা হয়ে যাব। কেউ আমার ফেরার অপেক্ষায় নেই। কিন্তু ওখানে ছাড়া ফেরার মত অন্য কোনও জায়গা নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্টেশনের পাবলিক টেলিফোন থেকে সাকুরার মোবাইলে ফোন করলাম। একটা কাজের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু অল্প একটু কথা বলা যেতে পারে। খুব বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না কিন্তু। একটু বললেও হবে, আমি বললাম।

"এবার টোকিওতেই ফিরে যাব বলে ঠিক হয়েছে", আমি বললাম, "এখন তাকামাৎসু স্টেশনে আছি। এটুকুই জানাতে চেয়েছিলাম।"

"আর বাড়ির বাইরে থাকবে না, তাই না?"

"সেরকমই ঠিক হয়েছে।"

"বাড়ির বাইরে থাকার পক্ষে পনের বছর বয়েসটা সত্যিই একটু বেশিই আগে হয়ে গেছে", ও বলে, "কিন্তু টোকিওতে ফিরে তারপর কী করবে?"

"সম্ভবত স্কুলে ফিরে যাব।"

"ভাল করে ভেবে দেখলে, সেটাও অবশ্য খারাপ কিছু নয়", ও বলে।

"সাকুরা-সানও তো টোকিওতে ফিরবেন।"

"হ্যাঁ, সম্ভবত সেপ্টেমবরে। গ্রীষ্মে কোথাও একটা যাব বলে ভেবে রেখেছি।"

"দেখা হবে, টোকিওতে এলে?"

"হতেই পারে। নিশ্চয়ই", ও বলে, "তোমার ফোন নম্বরটা একটু বলবে?"

আমি বাড়ির নম্বরটা ওকে বলি। ও টুকে রাখে।

"জান তো, এরমধ্যে তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম", ও বলে।

"আমিও সাকুরা-সানকে স্বপ্নে দেখেছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"বেশ রগরগে স্বপ্নে, তাই না?"

"হয়তো", আমি মেনে নিলাম, "কিন্তু সে তো নেহাতই স্বপ্ন। সাকুরা-সানেরটা ?"

"না, আমার স্বপ্ন কোনও রসালো স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্নে দেখলাম তামুরা-কুন বড় একটা গোলকধাঁধার মত বাড়িতে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি একটা বিশেষ ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছ, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছ না ঘরটা। কিন্তু সেই বাড়িতে, উলটে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন একজন আছে। আমি চেঁচিয়ে তোমাকে সাবধান করে দিতে চাইছি, কিন্তু আমার কথা ঠিকমত পৌঁছচ্ছে না। খুব ভয়ের স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে এমন জোরে চেঁচাচ্ছিলাম যে জেগে উঠে খুব ক্লান্ত লাগছিল। তাই তোমার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।"

"ধন্যবাদ", আমি বলি, "কিন্তু সেও তো স্বপ্নই।"

"কোনওরকম খারাপ কিছু হয়নি তো এরমধ্যে?"

"খারাপ কিছু হয়নি।"

কোনওরকম খারাপ কিছু হয়নি এরমধ্যে, আমি নিজেকেই শুনিয়ে রাখলাম।

"সায়োনারা। কাফকা-কুন", ও বলে, "এবার একটু কাজটা ফের ধরি, আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করলে, যেকোনও সময় এখানে ফোন করতে পার।"

"সায়োনারা", আমি বললাম, "দিদি", সঙ্গে জুড়ে দিলাম।

ব্রিজ পেরিয়ে, সমুদ্র পার হয়ে, ওকাইয়ামা স্টেশনে নেমে ট্রেন পালটে বুলেট ট্রেনে চাপলাম। আর সীটে বসে চোখ বন্ধ করলাম। ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে শরীর অভ্যস্ত হতে থাকল। সুন্দর করে প্যাক করা 'সমুদ্রতটে কাফকা' ছবিটা পায়ের কাছে রাখা আছে। পায়ে সেটার স্পর্শ অনুভব করতে পারছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমি চাই তুমি আমাকে মনে রাখো", সাএকি-সান বললেন। তারপর সোজা আমার চোখের দিকে তাকালেন। "শুধু তুমি মনে রাখলেই, অন্য সবাই ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই।"

ঘনসন্নিবিষ্ট সময়, নানা অর্থ বয়ে আনা পুরনো স্বপ্নের মত তোমার ওপর এসে ভর করছে। সেই সময়ের হাত এড়িয়ে যাওয়ার মত করে সরে সরে যাচ্ছ। এমনকি জগতের একেবারে কিনারায় চলে গিয়েও, সেই সময়ের থেকে তোমার নিস্তার নেই। কিন্তু, তা হলেও, জগতের কিনারায় না গিয়ে তোমার উপায় নেই। জগতের কিনারায় না গিয়ে পারবে না বলেই স্থির হয়ে আছে।

নাগোইয়া ছাড়ানোর সময় থেকেই বৃষ্টি শুরু হল। কালো কাঁচের ওপরে রেখা এঁকে যাওয়া বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে থাকলাম। মনে পড়ল টোকিও ছেড়ে যাওয়ার সময়ও বৃষ্টি পড়ছিল। নানা জায়গায় বৃষ্টির কথা মনে পড়ল। বনের মধ্যে বৃষ্টি, সমুদ্রের ওপরে পড়া বৃষ্টি, হাইওয়ের ওপরে বৃষ্টি, লাইব্রেরির ওপরে বৃষ্টি, জগতের কিনারায় পড়া বৃষ্টি।

চোখ বুজে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে, আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া পেশিগুলোকে শিথিল করে দিলাম। ট্রেন চলতে থাকার একঘেঁয়ে শব্দই শুনতে থাকলাম। প্রায় কোনও আগাম পূর্বাভাস না দিয়েই চোখের জলের একটা ফোঁটা নেমে এল। গালের ওপর তার উষ্ণ স্পর্শ পেলাম। আমার চোখ উপচে বেরিয়ে এসে, গাল বেয়ে নেমে, মুখের কাছে এসে থেমে গিয়ে, সেখানেই ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। পড়ুক, নিজেই নিজেকে বললাম। নেহাতই একটা ফোঁটা। এমনকি ওটা আমার চোখের জল নয় বলেও ভেবে নেওয়া যায়। ওটা যেন জানালায় এসে আছড়ে পড়া বৃষ্টিরই অংশ। আমি সঠিক কাজই করলাম তো?

"তুমি সঠিক কাজই করেছ", কারাসু বলে ছেলেটা বলল। "সবচেয়ে সঠিক কাজই করেছ। অন্য কেউই তোমার মত এতটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিকঠাক করে উঠতে পারত না। কারণ জগতের সবচেয়ে টাফ পনের বছরের ছেলে আসলে তুমিই!"

"কিন্তু আমি এখনও বেঁচে থাকার অর্থ জানি না", আমি বলি।

"ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখো", ও বলে, "বাতাসের শব্দ শুনো—"

আমি সামনে মাথা ঝোঁকাই।

"তুমি পারবে—"

আমি মাথা ঝোঁকাই।

"ঘুমিয়ে পড়ো এবার", কারাসু বলে ছেলেটা বলল। "যখন জাগবে, তখন তুমি নতুন এক জগতের একজন।"

ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগল না।

জেগে উঠে, তুমি নতুন এক জগতের একজন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও